KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Accessed No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : মৌরীন্দ্র নাথ দাস
Title : শনিবারের চিঠি	Size : 4.5" X 6.5" 11.43 X 16.51 c.m.
Vol. & Number : ১২/১-১২ ১৩/১-৫	Year of Publication : মে-আশ্বিন, ১৩৪৭ কার্তিক, ১৩৪৭-চৈত্র, ১৩৪৭
	Condition : Brittle Good
Editor : সজনীকান্ত দাস	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৯

শনিবারের চিঠি

ষাণ্মাসিক সূচী

কার্ত্তিক-চৈত্র—১৩৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অতি-আধুনিক—"বনফুল"	২১৮
অনাধুনিক—"দিঙ্‌নাগ"	৪৮৫
অরণ্যে—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১
আমরা প্রেতের জাতি— শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	৪৬০
আলোচনা—শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন	৫৯১
আ-শরীরী— শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫১৯
আশ্বিন মাস—মধুসূদন	২৫
ঈশানপুরের মশান— শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ	৪৯
এক রাত্রি— শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
ওমরখৈয়ম	৬৭৩
ক খ গ—"বনফুল"	৪৪
কনে—"ভাস্কর"	৩৩৫
কাক-ডাকা—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	৫৭৩
কাল্‌চার—শ্রীবিনয় ঘোষ	১৮৮
চতুর্দ্দশী—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪৯
চলচ্চিত্র—"শার্দ্দূল"	১৩৪
চলচ্চিত্র	৩০৪
চূড়ান্ত	২২৪
ছাতা	২৩৪
জনৈক বাঙালী কবির প্রতি জনৈক ইংরেজী কবিতা— শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	২৩৩
জীববিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ— শ্রীআর্য্যকুমার সেন	২৩৫
তাৎক্ষণিক—"বনফুল"	৭৮৮
তারপর	৩৪
তাসের দেশে	৫৭২
দাড়ি ও সাহিত্য—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়	৯৫
ধনসাম্যবাদ—শ্রীকৃষ্ণ দে	৩২৭
ধূমকেতু	৬৫০
ধোপদুরস্ত—"সম্বুদ্ধ"	৬৩৬
নব বিধান—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী	৭৪২
নর্ত্তকী বাকা বন—"বনফুল"	৭৯
নূতন সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীবিনয় ঘোষ	৩৫
পথ-ভুলে—"অকূব"	৩৯৬
পন্নগ ও বিহঙ্গ—শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ	৪৯৫
পান—"ভাস্কর"	৭৯৩
পালিশ ও ভোঁতা— শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	২৬০
পুস্তক-পরিচয়	১৪৯
পূজার চিঠি—পত্র—"বনফুল"	১৩৭
পূজার চিঠি—জবাব—"চন্দ্রহাস"	১৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূজার ছুটি—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর	৬৩৪
পূর্ব্ব বাংলা সংবাদপত্র— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৭৯
প্রশ্ন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৪৫
প্রসঙ্গ-কথা	২৭৫, ৩৬৭, ৪৩৮, ৫৬১, ৭৯৭
প্রোলিটারিয়েট কবিতা—"বনফুল"	৩২
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৯
বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ—অঃ বিঃ আঃ	৭৬৩
বজ্র আঁটন ফস্কা গেরো	৪৮
বন্ধনী—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৮২
বল্লভপুরের মাঠ— শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	৭৪৪
বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ— শ্রীরাজশেখর বসু	৬৬৭
বাঙালীর প্রতিষ্ঠান— শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু	২২৫
বাজিমাত—শ্রীগুপ্তানন্দ ভারতী	৪৫৮
বাধ্যতামূলক	৪৩
বিধান— শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৪
বিভাবরী	৭৪১
বেবি—শ্রীঅমলা দেবী	৫৯৭
ব্ল্যাক-আউট	৩৮৩
ভ্রমান্ধ—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫১৮
মনঃসমীক্ষণ—শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র	২৫২, ৬৪১
মরণ আজি মেলেছে পাখা— শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী	৪৯৪
মুক্তি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৫৯৬
মৃত্যু-প্রশস্তি	২১৬
যদি	৬৪৮
যন্ত্র, মানুষ ও কবি	২৬
রঙ্গ—শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী	৩১
রাত্রি—"বনফুল"	২৪১, ৩৫১, ৪৬১, ৬৫১, ৭১৭
রাবণ—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	৭৭০
রূপ নিয়ে করি খেলা—"রুদ্রবীণ"	৪৭
শ্রীমধুসূদন—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১, ১৫৯, ২৮৭, ৪১৩, ৫৪১, ৬৮৫
সংবাদ-সাহিত্য	১৩৯, ২৮০, ৪০৫, ৫৩৫, ৬৭৪, ৮১৮
সরল-রেখা	১০১
সাধারণ	৭৪৩
সাম্প্রতিক কবিতার সাফাই— শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	৩২০
সিজার ও আলেক্‌জাণ্ডার	২৩২
সীতা	৩১৯
সেন্সাস—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত	৮১৭
সোভিয়েটে শনিবার—শ্রীসত্যনারায়ণ	৪৪৮
স্বপ্ন ও সত্য—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	২১৭
হিমালয়ের পূজারী—শ্রীসত্যনারায়ণ	৬২৭
হেঁয়ালি—"কপিঞ্জল"	৪০৪

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৭ [১ম সংখ্যা

শ্রীমধুসূদন

'মেঘনাদবধ কাব্য'-পাঠ—কল্পনা ও কবিশক্তি (১)

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছন্দনিহিত যে কবিত্ব, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে * আলোচনা করিয়াছি। সে প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ছন্দ শুধুই কবিত্বের অঙ্গ নয়—কল্পনারই একটা রূপ; ঐ ছন্দ কেবল শিল্পসৃষ্টিই নয়, কাব্যসৃষ্টির মতই একটা সৃষ্টি—কবির কাব্যসৃষ্টির যে প্রতিভা, তাহাই এই ছন্দকেও সৃষ্টি করিয়াছে। এই ছন্দই সর্গের পর সর্গে যে ভাবে যে গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যেন কাব্যের ভাব ও ঘটনাবস্তু আকার ও আয়তন লাভ করিয়াছে। এক্ষণে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কল্পনা ও কবিশক্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এ কাব্যের মূল প্রেরণা কি, সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রেরণা হইতে যে কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে—যে কবিস্বপ্ন কাব্যের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে—এইবার তাহারই পরিচয় করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ একবার প্রসঙ্গক্রমে—সেই একটিবার মাত্র এ কাব্যের

* 'শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ ১৩৪৬।

কবিকল্পনার অভিনবত্ব স্বীকার করিয়া—যাহা বলিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিব ; সে কথাগুলি এই—

মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।...তিনি [মধুসূদন] স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।...এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য, ইহার হর্ম্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।...যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

এ কাব্যের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই—রাম লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি পক্ষপাত এই কারণেই ঘটিয়াছে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টির কল্পনামুখে এই প্রেরণা দ্বিধাযুক্ত হইয়াছে, কবির আত্ম-ভাব সৃষ্টির রস-প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কবি যখন প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত মানব-পুত্তলের অবস্থা ও পরিণাম চিত্রিত করিতে খাঁটি সৃষ্টি-কল্পনার বশীভূত হইলেন ;—বস্তুনিরপেক্ষ ভাব-গীতিময় কাব্য নয়—মানুষেরই কাহিনী-রচনায় অগ্রসর হইলেন, তখন সেই শক্তির দম্ভ ও মহিমার প্রতি তাঁহার যতই আন্তরিক আনুগত্য থাকুক, অপর এক বিরুদ্ধ শক্তির অমোঘ শাসনে সেই মহিমার মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া গেল—সেই দুর্ব্বার স্বতঃস্ফূর্ত্ত কামনা-শক্তির জয়গান করিতে গিয়া, কবি তাহার নিষ্ফল পরিণামকেই প্রত্যক্ষ করিলেন। এক দিকে আত্মস্ফূর্ত্তির দুর্জ্জয় কামনা, অপর দিকে আত্মক্ষয়কারী স্নেহপ্রীতির পারবশ্য ; মানুষের প্রকৃতিগত এই দ্বন্দ্ব ও দুরবস্থার নামই মনুষ্যত্ব। কবি-মানুষের প্রাণে স্বাধীনতার আবেগ যতই প্রবল হউক, যখন সেই আবেগ সৃষ্টি-কল্পনার অধীন হয়, তখন তাহাকে এই নিয়তির অনুবর্ত্তন করিতেই হয় ; মানুষের মূর্ত্তি মৃত্তিকার দ্বারাই গড়িতে হয়। 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র কবিকেও তাহা করিতে হইয়াছে ; মানুষের সুরাসুর-

বিদ্রোহী বাসনাকে মহাকাব্যের ছন্দে বাঁধিতে গিয়া তাহার নিয়তির নিদারুণ পরিহাসকেই চূড়ান্ত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। অতএব কাব্যের বহিরঙ্গে যাহাই থাকুক, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, এই অটল শক্তির দম্ভকেই কবি আরতি করিতে পারেন নাই ; বরং তাহার অন্তরালে, তাহার সেই পরাজয়ের মধ্যেই মানবতার যে নিয়তি রহিয়াছে, তাহার মহিমাকেই কবি অন্তরের সহিত বরণ করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছন্দ যে আবেগ হইতে জন্মিয়াছে সেই ছন্দ, সেই আবেগ কবির কল্পনাসহযোগে যখন মানুষের জীবন-লীলার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, তখন সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে ছুটাছুটি করিয়াও মানুষের জন্য এমন কোন উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠা-শিখর আবিষ্কার করিতে পারিল না, যেখান হইতে তাহার সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত দুর্ব্বার কামনা প্রপাতের রূপ ধরিয়া এক নূতন গঙ্গোত্তরীর সৃষ্টি করিতে পারে। মানুষের যে মহিমা-গান তিনি করিলেন তাহা বীররসের নয়, কারুণ্যের ; প্রবৃত্তির নাগপাশ ও দৈব শক্তির ষড়যন্ত্রে, মানুষের ঐশ্বর্য্য ও বলবীর্য্যের যে পরাজয়—আত্মবিশ্বাসী, অপ্রতিহত-শক্তি, দিগ্বিজয়ী বীরের নিয়তি-নিহত মূর্ত্তির যে আরক্তিম দীপ্তি—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাগরোর্ম্মিদল মানব-জীবনের অন্ধকারময় সৈকতে আছাড়িয়া পড়িয়া তাহারই নৈশ সঙ্গীতে উদ্বেলিত হইয়াছে।

এই জীবনের প্রতীক হইল রাবণ। কবি কাব্যরচনার যত কিছু সরঞ্জাম সকলই ঠিক করিয়া নানা রসের আয়োজন, এবং দেশী ও বিদেশী কাব্যশাস্ত্রের অনুশাসন যতদূর সম্ভব পালন করিয়া, তাঁহার কাব্যকল্পনায় এই একটি মনোগত ভাবের দ্বারা অবশে পরিচালিত হইয়াছেন ; মানব-জীবনের সেই দুর্ব্বোধ্য নিয়তি এ কাব্যের সকল কবিত্ব, ঘটনাকাহিনী ও ঐশ্বর্য্যবর্ণনার অন্তরালে একটি বিরাট শূন্য গহ্বরের মত মুখব্যাদান করিয়া আছে। কাব্যের পটভূমিতে যে নদীনির্ঝর-অরণ্য-উপবন-শোভিত গিরিভূমি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতে প্রকৃতির যে রক্ত-শ্যামল-হরিৎ-পাটল বর্ণচ্ছটা বিলসিত হয়, তাহা যে উদ্ধত উন্নত পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া তাহারই শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই গিরিশিখররূপী রাবণ আপনার অভ্যন্তরে সর্ব্বনাশের অগ্নি বহন

করিতেছে; যাহার শৌর্য্যবীর্য্য এবং মানবসুলভ নানা গুণে ঐ সুখৈশ্বর্য্যের অমরাপুরী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই পাপে সে সকল ধ্বংস হইবে। মেঘনাদবধের রাবণ দুরাচারী দুর্ম্মদ রাক্ষস মাত্র নহে; কবি তাহার চরিত্রকে সর্ব্ববিধ মর্য্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছেন—রাজা, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, যোদ্ধা ও সরলস্বভাব ভক্ত রূপে তিনি তাহার যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার কোথাও নীচতা বা কপটতা নাই। সমগ্র রাক্ষস-পরিবার (এক বিভীষণ ছাড়া) তাহার অনুরক্ত ও বশীভূত। কিন্তু সেই রাবণ পাপ করিয়াছে, ধর্ম্মে ও সমাজে সে পতিত; ন্যায় ও নীতির বিচারে, কর্ম্মফলের অমোঘ নিয়মে, তাহাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কবি সে পাপকে মানিয়াছেন, পাপের শাস্তিকেও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সে পাপের দায়িত্ব কাহার, সে বিষয়ে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্ন যেন রাবণের কাহিনীতে ইঙ্গিতরূপে উদ্যত রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, রাবণের এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে ধর্ম্মভীরু মানুষ ও দেবতার দলকে প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করিয়াছেন, তাহাদের সেই ধর্ম্মাচরণের মূলে চিত্তের দৈন্য, স্বার্থপরতা অথবা কাপুরুষতাকে প্রচ্ছন্ন পরিহাসে ধিক্কৃত করিয়াছেন। রাবণ যে পাপ করিয়াছে, তাহা যেন এমন ধর্ম্মাচরণের চেয়ে শতগুণে শ্রেয়ঃ। যে পুরুষ প্রাণবান ও শক্তিমান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তিমত্তার সে কোন বাধা মানে না; সেই প্রবল প্রবাহবেগে সে কোথাও গড়ে, কোথাও ভাঙে—কোন হিসাব-জ্ঞান তাহার থাকে না; সকল বাধাকে উন্মূলিত করিয়া, নিজশক্তির অপ্রমেয়তা আস্বাদন করিয়া সে চরিতার্থ হইতে চায়। ইহা যদি পাপ হয়, তবে তাহার জন্য সৃষ্টির নিয়মই দায়ী; ইহার পরিণাম যদি ভয়াবহ হয়, তবে সৃষ্টিই আত্মদ্রোহী। এ রহস্য দুরবগাহ; কোন ধর্ম্মনীতির উদ্ভাবনায় এ প্রশ্নের সমাধান বা নিরসন হয় না। তাই কবি তাঁহার কাব্যের প্রতি রন্ধ্রে, এক দুর্ব্বোধ্য অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে দীর্ঘশ্বাস ভরিয়া দিয়াছেন। প্রথমে তাহার কথাই বলিব।

২

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাহিনী রাবণের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনীই বটে। তথাপি সে যে পাপ করিয়াছে, সে বোধ তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বপ্নসঞ্চরণরোগী রাত্রিকালে যাহা করে, সকালে তাহা স্মরণ থাকে না। কাব্যের আরম্ভেই, রাবণের প্রথম পরিচয়ে, কবি যেন ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বীরবাহু মরিয়াছে তাহারই পাপে—এই কথা বলিয়া বীরবাহু-জননী রাবণ-মহিষী চিত্রাঙ্গদা শোকে-দুঃখে তাহাকে কঠিন ভর্ৎসনা করিয়া গেল—

হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

—শুনিয়া রাবণ বিচলিত হয় মাত্র, পুত্রশোকের মধ্যে তাহার দারুণ অভিমান হয়, রোষে ক্ষোভে সে অধীর হইয়া উঠে। কাব্যের মধ্যে এই একবার মাত্র আমরা রাবণকে সাক্ষাৎভাবে অভিযুক্ত হইতে শুনি; কিন্তু কোথাও নিজ দুষ্কৃতির জন্য স্বগতভাবেও তাহাকে অনুশোচনা করিতে দেখি না। বরং, কবি তাহার মুখে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি কথা দিয়াছেন—সে কথা অর্থপূর্ণ, সে যেন কবির নিজেরই প্রাণগত আক্ষেপোক্তি। রাবণের কোন ভয় নাই, সংশয় নাই—স্বাভাবিক বাহুবল ও হৃদয়বলের দ্বারাই সে সুরক্ষিত; নিজশক্তির উপরে তাহার অটল বিশ্বাস। কিন্তু এতদিনে সেই বিশ্বাস যেন টলিয়াছে—কোন অদৃশ্য শক্তির মায়াবলে তাহার সেই শক্তি নিষ্ফল হইতেছে। এ যেন এক অপ্রাকৃতিক ব্যাপার—রাবণকে একেবার বিমূঢ় করিয়া দেয়। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে বিস্ময়বিমূঢ় রাবণ বলিয়া উঠে—

অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

অন্যত্র সে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিতেছে—

হায়, বিধি বাম মম প্রতি,
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে?

বাহিরের যে দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য শক্তিকে রাবণ বারবার "বিধি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে—সেই বিধির সহিত তাহার নিজ জীবনের, অর্থাৎ অন্তরের যোগ কোথায়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি—সে কথা পরে বলিব। এই বিধি দেবতাদিগেরও মান্য, তাঁহারাও ইহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। রাবণ যেমন তাহার সর্ব্বনাশের জন্য এই বিধিকেই দায়ী করে, তেমনই কাব্যের নানা স্থানে অপর পাত্র-পাত্রীর মুখেও আমরা এই বিধির কথাই শুনি। সরমাও সীতাকে বলিতেছে—

বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা!

এই বিধির আর এক নাম—প্রাক্তন। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের পূর্ব্বকর্ম্ম-সমষ্টি নয়; এ প্রাক্তন সৃষ্টিগত—নিখিলের কর্ম্মধারায় ইহা অনুস্যূত; এই প্রাক্তনের ফলদাতাই বিধি। স্বয়ং মহাদেবকে বলিতে শুনি—

হায়, দেবি, দেবে কি মানবে
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?

কিন্তু রাবণ এই প্রাক্তন সম্বন্ধেও অজ্ঞান; যদিও কপালে করাঘাত করিয়া সেও এমন কথা বলে—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

তথাপি আসলে এই পাপের সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। কেবল যখনই তাহার শক্তির গতিরোধ হয়, কামনার পরাজয় ঘটে, তখনই সে যেন এক দুর্ব্বোধ্য দুর্নিবার শক্তির সম্মুখীন হইয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া থাকে। ইহাকেই সে "বিধি" নাম দিয়াছে। ইহা যেন সকল নিয়মের অতীত; ইহার নিকটে ভাল নাই, মন্দ নাই—শক্তি-অশক্তি, উচ্চ-নীচ সকলই সমান। তাহার মতে এই বিধিই সকল ব্যাপারের জন্য দায়ী—

শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।

তথাপি রাবণের ভয় নাই, বিস্ময়বিমূঢ়তাই আছে। যেন দেব-দৈত্য-নর প্রভৃতির মত এই "বিধি"র সঙ্গে সাক্ষাৎ যুদ্ধ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহার উপায় নাই

বলিয়াই সে বিকল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদেও সে ভয় পায় নাই; তখনও তাহার মুখে সেই এক কথা—

জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশ খ্যাতি সম? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বাম মম প্রতি; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!

তখনও ভয় নয়, বরং বলিতে শুনি—

সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়, কপট-সমরী;
বৃথা যদি যত্ন আজি আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!

৩

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মূল কাহিনীতে কবি রাবণের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাপ বা দুরাচারের উল্লেখ নাই; রাবণের ব্যবহারে—আচারে ও কার্য্যে, নায়কোচিত গুণের অসদ্ভাব কোথাও নাই। কেবল, "অশোক কানন" নামক সর্গে সীতা-সরমা-সংবাদে, পূর্ব্বাপর ঘটনা বিবৃত করিবার প্রয়োজনে, মূল রামায়ণের অনুসরণ করিয়া কবিকে রাবণের দুষ্কৃতির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। তথাপি সেই সীতাহরণ-কাহিনীর—রাবণের সর্ব্বাধিক পাপের—বিবৃতির মধ্যেও কবি রাবণ-চরিত্রের মূল তত্ত্বটি যে ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট কবি-শক্তির নিদর্শন। রাবণ সীতাকে লইয়া পুষ্পকরথে আকাশে চলিয়াছে। পথে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে জটায়ু তাহার গতিরোধ করিল। রাবণকে দেখিয়া—

'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীরবর—'চোর তুই লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজ হরিলি দুর্ম্মতি?

কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য-কর্ম্ম জানি।
অস্ত্রিদল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে। আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে ?'

এই গর্জ্জন শুনিয়া সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; মূর্চ্ছান্তে দেখিলেন, তাঁহাকে ভূতলে রাখিয়া—

গগনমার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।

তারপর সীতার আবার মূর্চ্ছা হইল—মূর্চ্ছার মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে সীতা এবার যাহা দেখিলেন, সরমাকে তাহাই বলিতেছেন—

মিলি' আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী,
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
কহিলা রাঘবরিপু,—'ইন্দীবর-আঁখি
উন্মীলি দেখ'লো চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগৎ-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন,
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'

এই কাহিনীটুকু হইতেই—এ কাব্যের বাহিরে, অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ট্র্যাজেডির পূর্ব্বে—আমরা রাবণের স্বরূপের পরিচয় পাই, এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারি, এ চরিত্রে পাপপুণ্যের ভাবনা, লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কিছুই নাই। জটায়ু যে কারণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, রাবণের নিকটে তাহা অর্থহীন; তাহার সেই গালাগালি ও ধিক্কারে রাবণ ক্রোধ পর্য্যন্ত করে না—সে যেন মূর্খের প্রলাপোক্তি মাত্র। রাবণের পরাক্রমকে তুচ্ছ করিয়াছে, ইহাই জটায়ুর একমাত্র অপরাধ; সেই স্পর্দ্ধার শাস্তি দিতে পারিয়াছে বলিয়া রাবণ উল্লসিত; সুন্দরী রমণীর নিকটে সে আপন পৌরুষের প্রমাণ দিয়াই যেন সকল পাপ প্রক্ষালিত করিয়াছে। কিন্তু মুমূর্ষু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিও তাহার

অনুকম্পা হয়—সেটুকুও তাহার প্রকৃতিগত মনুষ্যত্ব, তাহাই তাহার মহত্ত্ব। সে "জগৎ-বিখ্যাত গরুড়-নন্দন"কে জানে, তাহার বীরত্বের প্রশংসা করে; কিন্তু সে তাহার ধর্ম্মজ্ঞানের প্রশংসা করে না, কারণ তাহার মর্ম্ম সে বোঝে না। সেই জটায়ুকে এমন ভাবে মরিতে দেখিয়া, সে নিজজয়গৌরবের মধ্যেও একটু দুঃখ অনুভব করে,—জটায়ুর সেই ঘৃণা ও কটূক্তি আর মনে থাকে না, তাহাকে মারিয়া ফেলার জন্য যেন একটু অনুতাপ হয়, তাই যেন নিজেকেই বুঝাইবার জন্য বলিয়া উঠে—

নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন,
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?

ইহাই রাবণ-চরিত্রের একটি প্রধান দিক। রাবণ কেবল নিজকেই জানে, আর কাহাকেও জানে না; সে নিজেই নিজের ধর্ম্ম, আর কোন ধর্ম্ম মানে না। সে যেন বলে—আমি আমিই; আমার শক্তিতে আমি যাহা করি, তাহার বিরুদ্ধেও শক্তিকেই মানি, আর কিছুকে নয়। পরের মধ্যেও আমি শক্তিকেই বিশ্বাস করি; দেব, দৈত্য, নর, যেই হউক, এই শক্তি ভিন্ন আর কিছু দ্বারা আমাকে কেহ দণ্ডিত করিতে পারিবে না। কিন্তু এক্ষণে রাবণের এ ভুল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে—মানুষ যত বড় শক্তিমান হউক, নিয়তির হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই; সে নিয়তি তাহার নিজের মধ্যেই লুক্কাইত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাই সে পরাজয় এত মর্ম্মভেদী।

এই শক্তির মহিমায় কবিহৃদয় যে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই, মানুষের যে দুর্ব্বলতা তাহার মনুষ্যত্বের নিদান তাহাও তাঁহাকে সমধিক ব্যাকুল করিয়াছে; এমন কি, ইহাই যেন এ কাব্যের মূল গীতিসুর। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য, রাবণের রাজসম্পদ এখনও অটুট আছে—সে মহিমার বর্ণনায় কবির কোথাও কার্পণ্য নাই, সে বর্ণনার বর্ণবাহুল্য শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের চিত্তে অম্লান হইয়া থাকে। রাবণের শাস্তি অন্যরূপ, ক্রমাগত তাহার কুলক্ষয় হইতেছে—এবং তাহাতে বলক্ষয় অপেক্ষা তাহার অন্তরের আশ্রয়স্থলই ধসিয়া যাইতেছে। স্বর্ণ-লঙ্কার ঐশ্বর্য্য যেমন রাবণেরই এক রূপ, তেমনই সেই পুরীর অভ্যন্তরে জ্ঞাতি বন্ধু পত্নী পুত্র ও পুত্রবধূর যে সংসার, তাহাও রাবণের জীবন-বৃক্ষে পুষ্পমঞ্জরীর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ কাব্যে রাবণের ঐশ্বর্য্যের

অভ্রভেদী চূড়া নয়—তাহার অন্তরের সেই লতাপুষ্পের কুঞ্জবিতান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রাবণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে যাতনা ভোগ করিতেছে, সে অনুশোচনার জ্বালা নয়, পরাজয়-জ্বালাও নয়—আত্মীয়বিয়োগের জ্বালা। রাক্ষসপুরীর অধীশ্বর গোষ্ঠীপতি রাবণ সর্ব্বপরিজনহীন নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করিয়া নিরাশায় মুহ্যমান হইয়াছে।—

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

—কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের এই যে হাহাকার—ইহাই চরম হইয়া উঠিয়াছে শেষ সর্গে; সেখানে কবি, সিন্ধুকূলের শ্মশানে, রাবণের অন্তর-পুরীর অসীম রিক্ততাকে—তাহার হৃদয়ের শ্মশানকেই—উন্মুক্ত করিয়া, সেই জীবননাট্যের যবনিকাপাত করিয়াছেন। সেই মহাশ্মশানে—

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল রাজা
রাবণ; বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল বনিতা
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে।
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।

তারপর যখন পুত্র-পুত্রবধূর চিতা জ্বলিয়া উঠিল, তখন—

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;—
"ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;

সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ডাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।...
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনা ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?' শুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী, 'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে, হায় রে কি কয়ে?

এই শ্মশানদৃশ্যই এ কাব্যের যথার্থ পরিণাম ও সমাপ্তি; ইহারই জন্য মেঘনাদবধের আয়োজন ও মেঘনাদবধ। এই পরিণামকেই লক্ষ্য করিয়া কবির কল্পনা নয়টি সর্গের নানা বেশভূষায় শোভাযাত্রা করিয়াছে।

অতএব রাবণের পরাজয় বাহিরে নয়, ভিতরে। তাহার বলবীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পরিণাম যতই শোকাবহ হউক, তাহা অপেক্ষাও ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘটিতেছে তাহার হৃদয়-রাজ্যে। তাই এ কাব্যে যুদ্ধের এত আয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধ নাই; কেবল একটি মাত্র সর্গে যুদ্ধবর্ণনা আছে। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাবণই সেই একবার যুদ্ধ করিয়াছে। মেঘনাদও যুদ্ধ করিতে পারে নাই। "অলঙ্ঘ্য সাগর সম রাঘবীয় চমূ" লঙ্কার পুর-প্রাচীরের বাহিরে—এ কাব্যের নিতান্ত বহিরঙ্গরূপেই বিরাজ করিতেছে; কাব্যের যত কিছু মর্ম্মস্পন্দন, রাবণের সংসারে তাহারই প্রিয়-পরিজনের মধ্যে ঘটিতেছে; সে সকল ঘটনা রাক্ষসরাজের রাজকীয় মহিমা নয়, তাহার পারিবারিক জীবনের সৌভাগ্য সূচনা করে। এত বড় বিপদের কালে, ভ্রাতা বিভীষণ ছাড়া তাহার আর কোন গৃহশত্রু নাই, এবং বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আর কেহ তাহাকে পাপের জন্য ভর্ৎসনা করে না। ভক্ত ভৃত্য, পতিকুলগরবিনী মূর্ত্তিমতী জয়শ্রীর মত পুত্রবধূ, ভক্তিমান বীর্য্যবান আদর্শ পুত্র, এবং সমদুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নী—এই সকলকে লইয়াই রাবণ; ইহারাই তাহার জীবন-মুকুটের রশ্মিচ্ছটা; ইহাদের যত কিছু দীপ্তি, তাহা রাবণকেই দীপ্তিমান করিয়াছে।

রাজসভার বন্দীদল মাঝে মাঝে এই সৌভাগ্যের গাথাই গান করিতেছে ; কখনও লঙ্কাপুরীর বন্দনা করিয়া গাহিতেছে—

গুণীগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী বীরেন্দ্রকেশরী
কামিনীরঞ্জনরূপে দেখ মেঘনাদে !
ধন্য রাণী মন্দোদরী, ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয় ! ধন্য লঙ্কা বীরধাত্রী তুমি !

কোথাও বা মেঘনাদের উদ্দেশে বলিতেছে—

তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?
কার বা এ হেন মাতা ?

আবার রাণী মন্দোদরীর বন্দনা করিয়া গাহিতেছে—

হে কৃত্তিকে হৈমবতি ! শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয়—আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা ! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ, পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে ! ভাগ্যবতী তুমি !
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিত বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী !

এই যে সংসার, ইহাও রাবণের ; রাবণকেই মধ্যস্থলে রাখিয়া কবি এই যে গ্রহমণ্ডল রচনা করিয়াছেন, ইহারই আলোকে, রাবণের ভাগ্য, ও তথা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাব্যপ্রেরণা বুঝিয়া লইতে হইবে। এই জীবনের ট্র্যাজেডিই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ট্র্যাজেডি। বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে সে ট্র্যাজেডি অন্যরূপ ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।"

৪

এক দিকে কল্পনার এই মূল প্রবৃত্তি, অপর দিকে একটি বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী কাব্যনির্ম্মাণ—ও তাহার প্রসাধনে কবি-মানসের বিলাসকলা-কুতূহল ; শুধু তাহাই নয়, বাংলা কাব্যে নবজীবনসঞ্চারের আশা, যথা—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কিম্বা—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল—ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ;

—ইহার ফলে কবিচিত্ত, শুধু কাব্যসৃষ্টি নয়—কাব্যের ভূষণ-প্রসাধনের মোহে বার বার বিচলিত হইয়াছে, উপলক্ষ্য অনেক স্থলে লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই যে ভাবপ্রতিমা এ কাব্যের আরাধ্য ইষ্ট-দেবতা—কাব্য-কলা-উৎসবের সাড়ম্বর শোভাযাত্রায়, সেই প্রতিমা কখন কখন উহ্য হইয়া গেছে। কিন্তু তথাপি রাবণ-চরিত্র ও রাবণ-ভাগ্যই সেই অতি স্থূল কাব্যকুসুমমাল্যের অন্তরালে তাহার ডোর-রূপে অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে।

এ কাব্যের আর সকল চরিত্র সর্ব্বজনগ্রাহ্য সুপরিচিত আদর্শের ছাঁচে ঢালা—কবি এ সকল চরিত্রের কিছু বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা বিধান করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু রাবণ এ সকল হইতে স্বতন্ত্র, এ চরিত্র সাধারণ সংস্কারের বিরোধী। প্রথমতঃ, অংশতঃ রামায়ণের সেই রাবণ হইয়াও সে অনেকাংশে তাহার বিপরীত ; দ্বিতীয়তঃ, কবি তাহার অমিত ঐশ্বর্য্য ও অসীম পরাক্রম ঘোষণা করিয়াও তাহার দুর্ব্বল অবসন্ন শোককাতর মূর্ত্তিই আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। তবে কি পাপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের শোচনীয় পরিণাম, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীন দেব-দ্রোহী বলদৃপ্ত অহঙ্কারের অনিবার্য্য শাস্তিভোগ—এই লৌকিক নীতির সমর্থনই এ কাব্যের অভিপ্রায় ? তাহা যে নয়, সে বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি ; সমগ্র কাব্যখানিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। রাবণেরও একটা ধর্ম্ম আছে, কেবল সে ধর্ম্ম রামের ধর্ম্ম হইতে পৃথক। রাবণেরও ইষ্টদেবতা আছে, সে রামের চেয়ে বড় ভক্ত। সে নিজে যেমন সরল—অবোধ ও অবাধ প্রাণশক্তির আধার, তাহার ইষ্টদেবতা মহাদেবও তেমনই আত্মভোলা, আশুতোষ, ক্রোধে রুদ্র, স্নেহে অন্ধ। সে সেই

দেবতার নিকটে কোন গোপন সাহায্য বা ষড়যন্ত্রের আশ্বাসে নিজের ভয় ও দুর্ব্বলতা দমন করিতে চায় না; দারুণ দুর্যোগের দিনেও তাহার প্রতি রাবণের বিশ্বাস অটল। এ ভক্তি বীরের ভক্তি, ইহার মধ্যে দীনতা বা কাঙালপনা নাই।

ধর্ম্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তই দেখি, পাপ দেখি না; কবি যেন পাপ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন—দুঃখের অনল মধ্যে, মানুষের প্রাণের আয়স-ধাতুকে প্রদীপ্ত লোহিত মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহাতে পাপের সে কৃষ্ণ বর্ণ আর নাই, কেবল হৃদ্‌পিণ্ডের কোমল উজ্জ্বল রূপই উদ্ভাসিত হইয়াছে। অপর পক্ষে, রাম-বিভীষণ প্রভৃতির সমাজে—এই পাপ-বোধ, ধর্ম্ম-ভীরুতা, ও দেব-সেবার যে ভাব কবি, ঘটনায় ও চরিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে স্পষ্ট অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। লক্ষ্মণ যখন, দেবতাদের সাহায্যে, হীন তস্করের মত, ইন্দ্রজিৎকে গুপ্ত-হত্যা করিয়া সগর্ব্বে রামের শিবিরে ফিরিয়া আসিল, তখন—

চুম্বি শির, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে;—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য!.....
এ যশঃ তব ঘুষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম; নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে!"

রামের মুখে এই বাক্যগুলি দিয়া কবি দেববলে-বলী মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব নিঃসংশয় করিয়া তুলিয়াছেন। এ কাব্যের দেবতা-গুলির চরিত্রও কবির ঐ একই মনোভাবের পরিচয় দেয়। রাক্ষস-পুরীর রাজলক্ষ্মী যিনি, তিনি দেবী বলিয়াই বিভীষণ অপেক্ষাও বিশ্বাসহন্ত্রী ও হৃদয়হীন। অন্যান্য দেবদেবীরাও মানুষ অপেক্ষা ধর্ম্মহীন, যেমন ভয়বিহ্বল, তেমনই স্বার্থপর। হোমারের দেবদেবীরা, ঈর্ষা, আত্মাভিমান, দুর্নীতি ও মিথ্যাচার বিষয়ে ইহাদের অপেক্ষা হীন না

হইলেও, তাহারা খুশি ও খেয়ালের শক্তিতে মানব-ভাগ্যের যতটা নিয়ামক, ইহারা তাহাও নয়; ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র ও হীনবীর্য্য, রাবণের মত পুরুষের ভয় বা ভক্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য। এ কাব্যে প্রধান ধার্ম্মিক চরিত্র দুইটি—রাম ও বিভীষণ; রাম ও বিভীষণ উভয়েই নিষ্পাপ। কিন্তু পৌরুষ ও সহজ মানবধর্ম্মের দিক দিয়া উভয়েই, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের তুলনায় হীন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। রাম ধার্ম্মিক হইলেও দুর্ব্বল, বিভীষণ ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও মনুষ্যত্বহীন, তাহার আত্মীয়বাৎসল্য নাই, সে ধার্ম্মিকতার অভিমানে মানুষের সহজ ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাহার যে অবস্থা, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ভীষ্মেরও সেই অবস্থা; কিন্তু উভয়ের ধার্ম্মিকতায় কি প্রভেদ! ধর্ম্মহীন যে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্বহীন যে ধর্ম্ম—কবি এই উভয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট ভেদ-রেখা টানিয়াছেন, এবং মনুষ্যত্বকে, এমন কি, নীতিজ্ঞানহীন সহজ মানব-ধর্ম্মকে আর সকল ধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়াছেন। যে মানুষ সহজ মনুষ্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার ন্যায়নিষ্ঠাও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নয়। এই মনুষ্যত্ববোধই শ্রেষ্ঠ আত্মমর্য্যাদা-বোধ—ভীষ্মের তাহা ছিল বলিয়াই, তাঁহার ধার্ম্মিকতা এত বড়। বিভীষণের ধার্ম্মিকতা যে খাঁটি নয়, কবি তাহার নিজের কথাতেই তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সে স্বপ্নে শুনিয়াছে, রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিতেছেন—

হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি?.....
কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুল-নাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি, বিধির বিধানে...
রে ভাবি কর্ব্বুররাজ!

এ যেন ম্যাক্‌বেথের কানে ডাইনীদের পাপ-মন্ত্র! আবার যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের অনুযোগের উত্তরে—

মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশির ফণী,
মলিন-বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি রাবণ-আত্মজে ;—
"নহি দোষী আমি, বৎস ! বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি। নিজ কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কণক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?"

—তখনও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় মেঘনাদ ইহার উত্তরে যাহা বলিল, তাহা যেন কবির নিজেরই কথা—

কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা। হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

আবার যখন কোন দেবদূত রামকে উপদেশ দেয়—

শুন, রঘুমণি !
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা—দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র-আদি বলি যত—
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ। এ সার কথা কহিনু তোমারে।

—তখন তাহার মুখে এই হিতোপদেশ, এবং তাহাতে রামের বালকোচিত আত্ম-প্রসাদ ধর্ম্মকথাকেও কৌতুককর করিয়া তোলে।

রামের ধর্ম্ম ও রাবণের অধর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্যে কবি যে বৈষম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকেই তিনি যেন গৌণ করিয়া তুলিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, মধুসূদনের কাব্যের আদি-প্রেরণা ছিল মিল্‌টনের মহাকাব্যের সেই অমর বাক্য—"To be weak is miserable doing or suffering" ; কিন্তু, তাঁহার কল্পনা সে বাক্যের বশীভূত হয় নাই, তিনি সেই দম্ভকে রাবণের চরিত্রে জয়ী হইতে দেন নাই, এবং সেই বাক্যের মধ্যে যে হতাশ্বাস আছে, তাহাকেই তাঁহার কাব্যে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন।

৫

মধুসূদনের রাবণ মিল্‌টনের শয়তান নয়, শেক্‌স্পীয়ারের ম্যাক্‌বেথও নয়—গ্রীক কবির প্রোমিথিউস্ তো নয়ই। এ চরিত্র মধুসূদনের নিজ অন্তরের সৃষ্টি, এজন্য এই কাব্যই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীর্ত্তি। এই কাব্যেই কবির যথার্থ আত্মস্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে ; এবং আধুনিক কালের বাংলা কাব্যে সেই প্রথম একজন কবির জন্ম হইয়াছিল। মধুসূদন আর যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে—এমন কি সনেটগুলিতেও—তিনি ভাষা ও ছন্দের সহিত নানাবিধ কবি-ভাব বা 'কবিচিত্ত-ফুলবন-মধু'র যোগে বিচিত্র কাব্যরসসৃষ্টির সাধনা করিয়াছিলেন—নিজ কবিশক্তির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একমাত্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই তিনি আপনার কবি-স্বপ্নের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যের কবি ইংরেজী-শিক্ষিত, য়ুরোপের মানবতা-মন্ত্রে দীক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙ্গালী। বাংলার জলবায়ু ও বাঙ্গালী জাতির রক্তগত সংস্কারের প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনে, প্রেম-স্নেহের যে অপূর্ব্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল—মানবতার যে একটি মধুর মোহময় আকৃতি ও অনুভূতি একটি বিশেষ আদর্শকে জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এ কাব্যের প্রেরণায় তাহার প্রচুর প্রভাব আছে। যে ভোগ-স্পৃহা—প্রাণের অবাধ স্ফূর্ত্তির স্বপ্নময় আবেগ—পুরুষকারের অভাবে অতৃপ্তির দুঃখ ভোগ করে, সেই স্পৃহা ও তাহার দুঃখ বাঙ্গালী-কবিকে, মহাকাব্যের কল্পনাতেও উৎকণ্ঠিত

করিয়াছে। এই দুঃখকেই আর একরূপে, অতিসূক্ষ্ম মানস-বিরহের গীতিমূর্চ্ছনায় অভিষিক্ত করিয়া একালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী-কবি আর এক সুরে গাহিয়াছেন—

কে দিয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসীতীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে,
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

সেই দুঃখই মানুষের আদিম প্রকৃতির আদর্শস্বরূপ রাবণকে কেন্দ্র করিয়া এই কাব্যের রসসৃষ্টি করিয়াছে। রাবণের কামনা কোন সূক্ষ্ম আত্মসচেতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, তাই রাবণের দেশ 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ' নয়। তথাপি সে দেশ মানব-মানসের উত্তুঙ্গ বাসনা-শৈলে অবস্থিত, এবং মানুষ সেখানে সশরীরে বাস করে বলিয়াই পাপ, প্রাক্তন, কর্ম্মফল প্রভৃতির বিধিবিড়ম্বনায় সেখানে এমন বাস্তব সর্ব্বনাশের অগ্ন্যুৎপাত হয়; সে অভিশাপ কেবল অন্তরের ভাববিলাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয় না।

কিন্তু রাবণের চরিত্র-সৃষ্টিতে, একত্র দুইটি ভিন্ন উপাদানের সদ্ভাব ঘটিয়াছে। এক দিকে, য়ুরোপীয় পুরুষকারের আদর্শ—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীলতা, সর্ব্ববিধ নিয়তির উপরে ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা; অপর দিকে, মানবতার আর এক আকৃতি কবিকে তেমনই মুগ্ধ করিয়াছে। যে শক্তি কেবলমাত্র অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের শক্তি, যাহা দুর্দ্দমনীয়তায় সর্ব্বদ্রোহী, এবং স্নেহ-প্রেমের বশ্যতাও স্বীকার করে না বলিয়া পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয়—সে শক্তি বাঙ্গালী-কবির বিস্ময় উদ্রেক করিলেও তাহাকে হৃদয়ে বরণ করা সম্ভব হয় নাই। তাই—'To be weak is miserable doing or suffering'—কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলভোগ, দুই-ই শক্তির সহিত করিতে হইবে, অশক্তিই সকল দুঃখের নিদান—এই বাক্যের সত্যতা কবি যেমন স্বীকার করেন, তেমনই, দুঃখ যদি কোথাও, কোন কারণেই, না থাকে, সেখানে মানুষ মানুষই নয়, অতএব তেমন চরিত্র কল্পনা করিতেও কবির বাধে। রাবণের

চরিত্রে এমন বীরত্বের অবকাশও কবি রাখেন নাই; যাহা করিয়াছি তাহার জন্য শাস্তিভোগ করিতেও প্রস্তুত—রাবণের পক্ষে এমন মনোভাব অসম্ভব, কারণ তাহার কোন পাপ-বোধই নাই। কবির কল্পনা এমনই করিয়া, এক দিকে সবল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণধর্ম্মের—সেই আদিম পৌরুষের আদর্শ, এবং অপর দিকে মানবজীবনের আর এক সম্পদ—যাহা আমাদের এই বাঙ্গালীর সংসারে একটু বিশেষ সৌরভ ও শোভায় বিকশিত হইয়াছে—সেই স্নেহ-মমতার দুর্ব্বলতা, এই দুইকে রাবণের চরিত্রে মিলাইয়াছে। যাহার মমতা আছে, তাহার দুঃখ অনিবার্য্য—ইহা আমরা সকলেই জানি; একজন মহাজ্ঞানী বলিয়াছেন—"He who hath wife and children hath given hostages to fortune"—কিন্তু সে পুরুষ লঙ্কেশ্বর রাবণ হইলেও তাহার নিস্তার নাই। ইহার কারণ, কবি—যত বড় বীর হউক, মানুষের এই দুর্ব্বলতাকেই, মানবতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করেন; বিশেষতঃ সে মানুষ যদি সহজ সুস্থ মানুষ হয়। মিল্‌টনের শয়তান মানুষ নয়, তাই তাহার আত্মাভিমানের দম্ভ এমন নভোস্পর্শী হইয়াছে; ম্যাক্‌বেথ পাপের আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া জীবনের ভস্মরাশির অকিঞ্চিৎকরতা অপরোক্ষ করিয়াছে—চরম নৈরাশ্যের যে পরম আশ্বাস তাহার বলে মহাবিনাশের নিয়তিকে তুচ্ছ করিয়াছে। রাবণ-চরিত্রে তাহারও অবকাশ নাই; কারণ রাবণ এপিক-কল্পনার আদিম সুস্থ মানুষ; তাহার বাসনায় ব্যাধি নাই, সে ম্যাক্‌বেথের মত আত্ম-সচেতন নয়। স্নেহমমতার এই মজ্জাগত দুর্ব্বলতাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণকে বিড়ম্বিত করিয়াছে; বাহিরের বিধির শক্তি যেমনই হউক, রাবণকে কাতর করিয়াছে এই অন্তরের বিধি—ইহাই তাহার অদৃষ্ট।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কল্পনা-মূলে যে মানবতার আবেগ আছে, এইরূপ মমতার মোহই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া, এ কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে—রাবণের সর্ব্বশেষ বিয়োগ-ব্যথার ঘটনা—পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু। মানুষের পক্ষে এত বড় শোক আর নাই। এক পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হইতেই কাব্য আরম্ভ হইয়াছে, আমরা প্রথম সর্গেই রাবণের মুখে শুনি—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!

রাবণের এই শোক-জর্জ্জরিত মূর্ত্তিই সর্ব্বক্ষণ আমাদের সমক্ষে বিরাজ করে। পরে, মেঘনাদের মত পুত্রের মৃত্যুতে পিতা রাবণের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া স্বয়ং ধূর্জ্জটি কৈলাসে হৈমবতীকে বলিতেছেন—

এই যে ত্রিশূল, সতি! হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!

এইজন্যই রাবণ এ কাব্যের নায়ক। অতএব রাবণের চরিত্র রীতিমত বীরচরিত্র হইল না কেন, অথবা, 'মেঘনাদবধ কাব্য' শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হইতে পারে নাই, বলিয়া অভিযোগ করিলে, সমগ্র কাব্যখানিকেই অস্বীকার করিতে হয়। এ সকল অভিযোগের উত্তরে কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এ কাব্যে কবির নিজস্ব একটা কবি-ভাব বা কবি-স্বপ্ন ছিল বলিয়াই ইহা হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র মত জোর করিয়া মহাকাব্য হইবার চেষ্টা করে নাই, ইহা সত্যকার কাব্য হইয়াছে, ফরমায়েসী মহাকাব্য হয় নাই। খাঁটি মহাকাব্য হইতে পারিলে আমরা অবশ্যই খুশি হইতাম, কারণ বাংলায় একখানিও খাঁটি মহাকাব্য নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর ধাতুতে তাহা যে হইবার নয়, 'বৃত্রসংহার' তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। বীরত্বের যে আদর্শ, বীররসের যে ছড়াছড়ি আমরা 'বৃত্রসংহারে' দেখিতে পাই, তাহাতে, সে রসে বাঙ্গালীর লোভ না হওয়াই ভাল। রাবণের ন্যায় চরিত্র ও তাহার ভাগ্য সুগোচর করিবার জন্য যে কল্পনা, রুদ্রপীড়ের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রজিৎ, ঐন্দ্রিলার পরিবর্ত্তে মন্দোদরী, এবং ইন্দুবালার পরিবর্ত্তে প্রমীলা বা সীতার মত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কবিশক্তি যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ কি? সে কল্পনা যে কেমন, আশা করি এতক্ষণে তাহার একটা আভাসও দিতে পারিয়াছি।

৬

এই রাবণকেই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র কাব্যখানি যে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাবণের যে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের কথা এক্ষণে বলিতেছিলাম, তাহারই সমর্থনে কবি তাহার সংসারে ভক্তি প্রীতি প্রেম ও স্নেহের বন্যা বহাইয়াছেন—সেই স্নেহ-প্রেমের নির্ঝরসলিলে রাবণ যেন শুচি-স্নান করিয়াছে। প্রমীলা ও মেঘনাদের যে দাম্পত্য প্রেম তাহাও যে রাবণের ঘরে শোভা পায়, সে রাবণের সংসার যে কত বড় সুখের সংসার তাহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি। রাবণের ভাগ্যবিড়ম্বনা যে কত বড়, তাহাও এই সকল চিত্র ও চরিত্রের সাহায্যে কবি আমাদের মানসে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছেন। কিন্তু এই দৌর্ব্বল্যের যে আর এক দিক সেই একই কল্পনায় নিরন্তর উঁকি দিয়াছে—পৌরুষের বিঘ্ন নয়, পৌরুষের বিপরীত রূপে সেই দুর্ব্বলতার লজ্জাও যে কবি অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত এই কাব্যে আছে। এক দিকে রাবণ যেমন সরস সতেজ-বৃন্ত কুসুম হইয়াও এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের তাপে শুকাইয়া যাইতেছে, তেমনই, অপর দিকে, ইহাই নিছক দুর্ব্বলতার রূপে রামের চরিত্রকে কীটদষ্ট প্রসূনের মত শীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়াছে। এ দুর্ব্বলতার চিত্র—রাবণেরই বিপরীত দিক; 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' পাঠকালে পাঠক যাহাতে ইহা সহজেই অনুভব করে, কবি সে বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই; শুধু কাহিনীর প্রয়োজনেই নয়, রাবণের চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই, অন্যান্য সকল উপকরণের মত, রামের চরিত্রও কল্পিত হইয়াছে। রামের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য রামকেই শোভা পায়; এতখানি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য রাবণের চরিত্রে অসম্ভব। এই দুর্ব্বলতার চিত্র আঁকিতে গিয়া কবির বাঙ্গালী-প্রাণ স্থানে স্থানে আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই—রামের কাহিনীতে এ কাব্যের সেই সকল অংশই সর্ব্বাপেক্ষা কবিত্বময়, কবির হৃদয় যেন কারুণ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। যথা (বিভীষণের প্রতি রাম)—

হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়, ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি

পিতৃসত্য-রক্ষাহেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে।
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ; উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।

আবার, শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পাশে মূর্চ্ছিত হইয়া, অবশেষে—

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে
লক্ষ্মণ, কুটিরদ্বারে, আইলে যামিনী
ধনুঃ করে হে সুধন্বি ! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু ! লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?

—এমন কান্না রাবণ কখনও কাঁদিতে পারে না। শোক যতই হউক, রাবণ কখনও এত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে না যে, তাহার মুখে এমন কথাও বাহির হইবে—

কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ;
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

ইহার পরের কথাগুলি অবশ্য রাবণের মুখেও শোভা পাইত, এ কবিত্বের সুযোগ কবি কোথাও ত্যাগ করেন নাই। যথা—

তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, শুধিবেন যবে

মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?

এ বস্তু কবির পক্ষে কাব্যরসসৃষ্টির সহায় হইলেও, ইহার নগ্ন দীন মূর্ত্তি তাঁহাকে সমধিক বিতৃষ্ণ করিয়াছে—রামের কাপুরুষতার চিত্র আঁকিতে কবিও বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে একরূপ বিনা যুদ্ধে বিনা ক্লেশে হত্যা করিবার সকল সুবিধা লাভ করিয়াছে—একালের রাজা-জমিদারেরা যেমন, অনেক ক্ষেত্রে, সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত হইয়া হস্তী-ব্যাঘ্র শিকারের আমোদ উপভোগ করিতে যান—লক্ষ্মণ তাহা অপেক্ষাও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া মেঘনাদবধ করিতে চলিয়াছে, তথাপি রামের ভয় আর ঘোচে না, নারী অপেক্ষাও ভয়ভূতগ্রস্ত হইয়া রাম বলিতে থাকে—

হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে…
…কে আর আছে রে
আমার সংসারে ভাই, যার মুখ দেখি,
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আসিনু আমরা।

—ইহাও কি বাঙ্গালী-কবির আত্ম-লাঞ্ছনা ? বাঙ্গালী-চরিত্রের এই সাধারণ দুর্ব্বলতাকেই কবি রাবণ-চরিত্রের উপাদান করিয়া, তাহাকে এক নূতন মহিমা দান করিয়াছেন। সেখানে এই দুর্ব্বলতাই মানুষের

মনুষ্যত্বের নিদান; ইহা তাহার পৌরুষকে ব্যর্থ করিলেও সেই পৌরুষের অন্তরায় নয়—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সপ্তম সর্গে কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। মমতার সহিত পৌরুষের মিলনে বীরহৃদয়ের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হয়, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধযাত্রাকালে, রাবণের কয়েকটি কথায়, কবি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাও তাঁহার কবিশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রণমদে মত্ত সাজে রক্ষঃকুলপতি……
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী,……
…রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে,
রক্ষোরাজ;—"বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণী,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি! জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহ। যাও ফিরি, কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরি?
বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে,
গগন রতন শশী চিররাহু গ্রাসে!"

—ইহার সহিত রামের সেই কাতরোক্তি—"নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি" প্রভৃতির তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবি এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে স্বীকার করিয়াও মানবতার কোন্ আদর্শকে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

* * *

রাবণ-চরিত্রসৃষ্টির মূলে যে কল্পনা আছে—কবিমানসের যে এক নূতন বিচিত্র ভাব-প্রেরণা আছে, সেই কল্পনাই সমগ্র কাব্যখানিকে

একটি অখণ্ড সৃষ্টিসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে, ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ কাব্যের বীররস হোমার-মিল্টনের কাব্যের বীররস নয়—কেন নয়, এবং কেন যে ইহা রীতিমত মহাকাব্য হইতে পারে নাই, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা এ প্রসঙ্গে করিয়াছি। এ কাব্যে মানবতার যে একটি বিশিষ্ট আদর্শ কবিচিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহার মূল কোথায়—বাঙ্গালীর সংসার ও বাঙ্গালী-জীবনের সেই সংস্কৃতির কথাও বলিয়াছি। পাশ্চাত্য আদর্শের পৌরুষময় বীরবীর্য্যের প্রতি আকর্ষণ কবিকল্পনাকে কতখানি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে; রাবণ-চরিত্রে সেই পৌরুষ কি অর্থে কতটুকু সত্য হইয়া আছে; এই পৌরুষের পরাজয়ে কাব্যের যে ট্র্যাজেডি, এবং তাহার মূলে যে বিধি-নির্যাতন এই ট্র্যাজেডিকে রসোজ্জ্বল করিয়াছে;—তাহা বলিয়াছি। ইহার পর—এ কাব্যের বারো আনা যে গ্রীক—কবির নিজের সেই উক্তি—কতখানি সত্য, তাহাও দেখিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই একই কল্পনার অনুসরণ করিয়া মেঘনাদবধের অপর চরিত্রগুলির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষ-মর্দ্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে;
বামে কম-কায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণ-বীণা করে;
শিখী-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁ'র শরে হত
তারক—অসুর-শ্রেষ্ঠ; গণ-দল যত,
তা'র পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ;—আদি-ব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ! পূর্ব্ব-কথা কেন ক'য়ে, স্মৃতি,
আনিছ, হে, বারি-ধারা আজি এ
নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব-ভকতি?

—মধুসূদন

যন্ত্র, মানুষ ও কবি

টিকটিক চলে ঘড়ি, দম-দেওয়া গতি অবিরাম।
সেকেণ্ড মিনিট আর ঘণ্টার কাঁটা
পড়ি যন্ত্র-নিয়মের ফাঁদে
সুনির্দ্দিষ্ট বৃত্ত রচি ডায়ালেরে করে আবর্ত্তন ;
সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা দিন মাস বর্ষ চলি যায়।
লিফ্‌ট ও বোনাস ছোটে পেন্‌শনের স্থির লক্ষ্য ধরি,
নির্ম্মম ইন্‌কাম-ট্যাক্স, প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড-কাট আপাত কঠোর,
জীবন-বীমার প্রিমিয়াম ;
কেরানীর প্রাণগতি আঁতুড়ের বন্ধন ছেদিয়া
শ্মশান-মুক্তির পথে প্রতিদিন আগাইয়া চলে।

চলে দিন দিন-মজুরের—
দিন-আনা দিন-খাওয়া দিনশেষে দিনান্তের রোজ,
হপ্তাশেষে তাড়ি পচুয়ের—
নিষিদ্ধ আনন্দরসে সপ্তাহের শক্তির সঞ্চয় ;
শয্যাহীন শয্যা 'পরে তন্দ্রাহীন ঘুম,
মাড়-ভাত লবণ-ব্যঞ্জনে।
নাহি সঞ্চয়ের গ্লানি, রক্ষণের ক্লিষ্ট ব্যাকুলতা,
ইহলোকে দেহ আর পরলোকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি সার,
নিশ্চিহ্ন-বিস্মৃতি-সুখ জীবযাত্রা-শেষে।
দিন চলে দিন-মজুরের,

প্রতি দিবসের
সূর্য্যের উদয় অস্তে সারা জীবনের পরিমাণ।

"পুনশ্চে"র বারান্দায় একা ব'সে কবি ও মানুষ—
দূর দিক্‌চক্রবালে লঘু মেঘে দৃষ্টি স্থির করি ;
দীর্ঘদেহ তালচূড়ে উড়িতেছে প্রভাতের চিল,
গরুর গাড়ির সারি গ্রামপথে চলিছে মন্থর,
উড়িছে ধূসর ধূলারাশি।
নিজহাতে পোঁতা দুটি বিশীর্ণ বিরলপত্র গাছে
ফুটিয়াছে গুচ্ছে গুচ্ছে অগ্নিবর্ণ কোমল পলাশ,
বসন্তের অগ্রদূত কোকিলের ডাক শোনা যায়,
চূতমঞ্জরীর গন্ধ ভাসিতেছে নীরস বাতাসে,
খসিতেছে অবিশ্রাম নিষ্পত্র শিমুলশাখা হ'তে
লজ্জারাঙা গুরুভার ফুল।

সম্মুখের পোড়ো জমি বাগানের নির্ম্মম বিলোপে,
স্বর্ণবর্ণ স্বর্ণঝুরি যেথায় ঝুরিত একদিন—
ভিত সেথা হ'ল খোঁড়া, "উদীচী"র প্রথম আশ্রয়।
ধরার নরম মাটি, সুকঠোর সজ্জিত ভাটায়
পুড়িয়া হইল ইট, এল চূর্ণ পাথরের কুচি,
মিস্ত্রী ও সাঁওতাল-কুলী,
হিসাব-নিকাশকারী কেরানীরা বাঁধা-মাহিনায় ;
কবি দেখিলেন চেয়ে চেয়ে,
মাটির গগন-বুকে ইটের অরুণ-আভা ধীরে
উঠিছে প্রদীপ্ত হয়ে, মধ্যদিনে ঝলিবে ভাস্বর।

কবি লিখিছেন গান—'ডাকঘর' হবে অভিনয়,
অনেক নূতন গান জোড়া হবে পুরানো নাটকে।
হবে নাকো বেমানান নূতনে ও অতি পুরাতনে।
যন্ত্রের কৌশল নয়, কেরানীর নহে কো হিসাব,
নহে দিন-মজুরের পেশীলব্ধ বাস্তব সাধনা ;
কিছুই বিচিত্র নয় মানুষের মনের পরশে
কবিত্বের মুক্ত কল্পনায়।
অতি সাদা কথা সব, ছন্দ আর সুরের যাদুতে
ফুটিছে গানের নভে স্থিরদীপ্তি তারাফুল হয়ে ;
কথা যবে ফুরাইয়া যায়,
গানের বিচিত্র সুর কবি-মনে রহে তরঙ্গিতে।

খেলিতে খেলিতে এই অপরূপ সুর-সৃষ্টি খেলা,
কবি দেখিলেন চাহি নিতান্ত উদাস দৃষ্টি মেলি
ইটরূপী মৃত্তিকার ঊর্দ্ধমুখী গতি সুমন্থর,
সমাপ্তি-সুষমা ল'য়ে জাগে কি না হতেছে সন্দেহ।
চঞ্চল কবির প্রাণ, এ জড়তা অসহ্য তাঁহার,
তিল তিল সঞ্চয়ের এ বিলম্ব অতি অকারণ ;
উঠে না প্রাসাদ-সৌধ উৎসারিত মৃত্তিকার বেগে
ভূমিকম্পে যথা হিমাচল ;
আলাদিন-প্রদীপের স্মৃতিসুখে অধীর যে কবি।

সহসা কহেন কবি, এ কি কাণ্ড হে কর্ম্ম-সচিব,
"উদীচী" উদিবে বুঝি ক্লান্ত রবি অস্তাচলে গেলে ?

'গীত-বিতানে'র সূচী বেড়ে যায়, সুরের আকাশে
গানের বিহঙ্গ উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কথার পাখায়।
মাটি-পোড়া ইট যত, চুন-সুর্কি-সিমেণ্ট-প্রলেপে,
জড়তার পিরামিড উঠিতেছে উচ্চচূড়া হয়ে,
নিয়ন্ত্রিত গতি তার গজ আর ইঞ্চির নিরিখে,
যান্ত্রিক হিসাবে চলে সাঁওতালী কুলীদের রোজ।

বার্ত্তা ছুটে বাতাসের আগে—
মানুষ চঞ্চল,
সামঞ্জস্য কিসে হবে কাব্য আর বস্তুর গতিতে
কবি আর যন্ত্রের পাল্লায় !
জড় চিন্ময়ের দ্বন্দ্ব—অসহায় বিপন্ন মানুষ !

সচিব পাঠান বার্ত্তা শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সকাশে,
ললাটে হানিয়া কর ঊর্দ্ধদৃষ্টি বিশ্বকর্ম্মা ছুটে।
হুঙ্কারি হুকুম দেন, রাতারাতি উঠাও মন্দির।
যন্ত্র আর মানুষের দ্বন্দ্ব চলে কবির খেয়ালে,
মানুষের কালো দেহে অবিরত ছুটে কালঘাম।
নিশীথের কালো বুকে সারি সারি "ডে-লাইট" জ্বলে,
হাঁকে ডাকে রাজমিস্ত্রী—ছোটে, ওঠে সাঁওতাল-কুলী,
যান্ত্রিক হিসাব দলি কবীন্দ্রের "উদীচী" প্রবেশ !
মানুষ সহায় হ'ল তাঁর।

খুশি কবি, হেরি চোখে মানুষের কর্ম্ম-নিপুণতা,
যন্ত্র-জড়ত্বের পরাজয়।

কাব্য-যন্ত্র দ্বন্দ্বে প'ড়ে মানুষের ব্যগ্র-ব্যাকুলতা,
রোজে ও হিসাবে ক্লান্ত দেহ খোঁজে শয্যার আশ্রয়,
কেরানী ঝিমায়,
কুলীরা তাড়ির প্রেমে বেহুঁশে কোথায় প'ড়ে থাকে।
নির্দ্দিষ্ট গতিতে শুধু ক্লক ঘড়ি টিকটিক চলে
বেশি কম যাই থাক দম,
যন্ত্র রহে যন্ত্র, হায়, মানুষ মানুষ।

"শ্যামলী", "পুনশ্চ" আর "উদীচী"র একই ইতিহাস।
আলোছায়া অন্ধকারে কবি-মন দেখিতে কি পায়
নিশীথের অন্ধকারে আলো-জ্বালা শ্রান্তি মজুরের,
উপহসি কাল-যন্ত্রে কালো কুলীদের কালঘাম ?

আমরা যে শুনি গান, ছন্দে সুরে করি অনুভব,
কল্পনা-বিলাসী কবি আনন্দে কথার পাখা মেলি
ভাসেন গানের নভে, সৃজনের আনন্দ অপার ;
সে আনন্দে যন্ত্র আর মানুষের বিরোধের গ্লানি কিছু নাই,
ছুটিছে কবির মন কলমের বহু আগে আগে।

জড়তার জয়যাত্রা মানুষেরে বিদলিত করি—
মানুষ মজুর কুলী, মানুষ কেরানী মরে কেঁদে,
ইতিহাসে সে ক্রন্দন কোনদিন নাহি থাকে লেখা,
শুধু থেকে যায়
কবির আনন্দ-স্বর্গে মানুষের নিত্য অধিকার।

রঙ্গ

(রবীন্দ্রনাথের ছড়ার অনুসরণে)

শনিবারের ভাগ্য ভাল রবিকবির চিত্তে
ছড়ার ছাঁদে কাব্য জাগে নতুনতর বিত্তে।
"রামছাগলে" আর "বাঁদরে" দেখায় কত রঙ্গ,
রঙ্গ দেখে চমক লাগে শিউরে ওঠে অঙ্গ।
তেঁতুল-বনে হরির লুঠে হয় বাতাসা বৃষ্টি,
ছড়ার ছাঁদে আসল কথা কাব্যরসের সৃষ্টি।
গভীর জলে কাতলা নড়ে, উপর জলে ভেলকি,
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—ছন্দে গড়া Shell কি ?
বাইরে বাজে তাই-রে-না-রে ডুগডুগিতে বাদ্যি,
গভীর জলে কি সুর বাজে বোঝে কাহার সাধ্যি !
সামনে নাচে আলোর ধুলো, আসে আঁধার রাত্রি,
ডুগডুগিতে তাল মিলিয়ে রাস্তা চলে যাত্রী।
বুগবুগিতে বাক্যবলে অতল তলের কাতলা,
লাগছে ভাল বাদলা দিনে খেতে গরম সাঁতলা।
রাঙা বাঁদর নাচায় ভাল চতুষ্পদী জন্তু,
নাচন দেখে আঁতকে ওঠে লেঙটিপরা সন্তু।
বুদ্ধিমানে বিদ্যে শিখে চশমা এঁটে চক্ষে
ভাবছে ব'সে, কেমন ক'রে দেশকে করি রক্ষে !
খঞ্জনিতে আওয়াজ তুলে বাউল করে নৃত্য—
রঙ্গ দেখে হরিহরের যায় যে জ্ব'লে পিত্ত।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

প্রোলিটারিয়েট কবিতা

(দেবতা-বিষয়ক)

১

ইন্দ্রকে ডাকি ব্রহ্মা কয়,
"ছি ছি হে ইয়ার, কচ্ছ কি,
সারাটা বদন মেচেতা-ময়—
দিনে দিনে তুমি হচ্ছ কি ?"

"শোন তবে ভাই চতুর্ম্মুখ,
শিটি মেরে মেরে ফতুর বুক,
কবিতাই বুঝি লিখতে হয় ;—
বাণীর প্রসাদ কি ক'রে পাই,
ভারতী শুনছি বেয়াড়া ভাই—
আমিষ-ভক্ত মোটেই নয়।
বুকের ভেতর জ্বলছে যা,
খাক হয়ে গেল কলজেটা—"

২

কুঞ্চিত করি আটটা চোখ
'কান্‌হি' মারিয়া ব্রহ্মা কয়,
"আপ্‌সাও কেন মিছে নাহক,
কিচ্ছু তোমার নাইক ভয়।

সত্যি যদিও বাগ্‌দেবী
সবজি এবং শাক-সেবী,
সাত্ত্বিক ভোগ কেবল চান ;
কিন্তু ভুলো না পুরন্দর,
হাঁসটি তাঁহার ধুরন্ধর—
ডুবে ডুবে তিনি গুগলি খান।"

"মাইরি বেম্মা, বলছ কি,
গুগলি-ভক্ত গোল-চোখী ?"

৩

"গুগলির যম"—ব্রহ্মা কয়,
"ছাড়ে না কা'কেও ধরলে সে,
ভেতরে ভেতরে বাণী যে নয়,
তাই বা তোমায় বললে কে ?

এমন বুদ্ধি এমন ধার—
শাক পাতা খেয়ে সবটা তার,
এইটে আমায় বোঝাতে চাও ?
বাইরেতে আমি বুঝব তাই,
ভেতরে ভেতরে কিন্তু ভাই,
হাঁসের কাছেতে ভেট পাঠাও।
এ বুড়ো বান্দা জানে না কি ?
পর্দ্দা থাকার মানেটা কি ?"

৪

বাহির করিয়া হলদে দাঁত
মুগ্ধ ইন্দ্র চাহিয়া রয়,
"ধরাও" বলিয়া অকস্মাৎ
কান থেকে বিড়ি ব্রহ্মা লয় ;
কয় চুপি চুপি, "না ক'রে গোল
বারুণী পাঠাও দুটি বোতল,
পুষ্ট একটি ভেড়ার রাং,
বাণীর বীণার সাতটা তার
তুলবে দেখো না কি ঝঙ্কার—
উথলে উঠবে ভাবের গাং।"

"জানত কে এত পাঁচালি ভাই !
মাইরি বেম্মা, বাঁচালি ভাই।"

"বনফুল"

তারপর ?

তারপর ? তারপর চিরন্তন জল আর মাটি,
রক্তস্রোত মিশে যাবে ধূলি হয়ে গোধূলি-আকাশে,
মাটির পঞ্জরবক্ষ ভূমিকম্পে পুনরায় ফাটি
জলধারা ছুটে যাবে ফেনহাস্যে সাগর-সকাশে।
মাটি ও জলের বুকে অ্যামিবারা খেলিবে নির্ভয়ে,
ধাপে ধাপে পুনরায় নররক্তে তিতিবে মেদিনী,
ক্ষতি লাভ কিছু নাই এর ওর জয়-পরাজয়ে,
মহাকাল দিবে তাল, কালী-পদে বাজিবে কিঙ্কিণী।
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে শিব ভূশয্যায় শুইয়া আছেন,
সভয়ে প্রতীক্ষা করি কালী কবে আবার নাচেন।

নূতন সাহিত্যের ভূমিকা

মানুষ কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইথারের ভিতর দিয়ে কোন অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে না, অনাদি অনন্তকাল ধ'রে ইতিহাসের উর্দ্ধে যে মূর্ত্তি চিরবিরাজমান, বিমূর্ত্ত সে মানুষ আমার কল্পনার বাইরে। অনৈতিহাসিক, অবিনশ্বরতা ও শাশ্বতের ছায়াতলবাসী সে মানুষের অদ্ভুত মূর্ত্তি আমার ধারণাতীত। আমার 'মানুষ' ঐতিহাসিক, সভ্যতার কঙ্কালের প্রত্যেকখানি পাঁজর যে নিজের হাতে গড়েছে, বিচিত্র আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উদ্দীপনায়, আবেগে যে তাতে রক্তমাংস দিয়ে জীবন্ত ক'রে এই বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে। মানুষের কথা মনে হ'লে তাই ইতিহাসের অন্দর-মহলের কপাট সব একে একে খুলে যায়, দেখি, যূথচারী মানুষ মরু-প্রান্তর-পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে আহার অন্বেষণে, প্রকৃতি যেখানে সদয়া হন, যাযাবর জীবনে সেখানে এক একটি ছেদ পড়ে, তারপর এই মানুষই ক্রীতদাস হয়, সামন্তপ্রভু হয়, শ্রমিক হয়, ধনিক হয়, বণিক হয়, আর ওদিকে তার তীর-ধনুক, পাথর, লোহা ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎচালিত বিশাল দানবীয় যন্ত্রে পরিণত হয়। রাজার কবর ছেড়ে এই মানুষের স্থপতি-শিল্পই কলিকাতা, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম, বার্লিন শহর গড়ে ; মন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায় তার চিহ্ন র'য়ে যায়। এই মানুষেরই মুখে মুখে রচিত আদিম অর্থহীন যৌথসঙ্গীত দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে, মানুষের উদ্দেশ্যে ছন্দে ও অর্থে, সজীবতায় ও শব্দসুষমায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এই যে মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস, এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ক্লেদ ও মালিন্য, কিন্তু সেই মালিন্যকে জয় করেছে প্রাণের

আলো, জীবনের শক্তি। প্রাণের সেই আলোকে বিভূষিত হয়ে, জীবনের সেই শক্তিতে মহীয়ান হয়ে, দ্বন্দ্ব-বিরোধে জয়ী হয়ে, প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে যুগে যুগে মানুষের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা। কারণ যাদুবিদ্যার যুগে এই দেবতাই ছিল মানুষের কাছে জীবনের প্রতীক, মৃত্যুর শত্রু ("...they thought that by performing certain magical rites they could aid the god, who was the principle of life, in his struggle with the opposing principle of death."—James Frazer)।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সুর হচ্ছে প্রাণদ, প্রাণঘাতী নয়। লেনিন বলেছেন: "Life will assert itself"—জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ কথা প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পও বলে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাণীও জীবনের বাণী, সংগ্রামমুখরিত মানবেতিহাসের অক্ষরে অক্ষরে তার বোধন-রাগিণী ছন্দিত হয়, মহত্তর জীবনের আগমনী-নৃত্যের নূপুরশিঞ্জন তার অতিক্রান্ত পথে পথে আজও শোনা যায়। সংস্কৃতি তাই মানুষের কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর নয়। মানুষের জীবনই তার বেদী। যুগে যুগে ইতিহাসের অপরিহার্য্য দ্বন্দ্ব-গতির আবর্ত্তে এক এক শ্রেণী সেই বেদীর উপর অর্ঘ্য সঞ্চয় করে, যুগান্তরী মানুষ গতিবন্যায় তার শৈবালদাম ও আবর্জ্জনার অংশ ধৌত ক'রে এগিয়ে যায়। বোধ করি, ম্যাক্সিম গোর্কির নিম্নোদ্ধৃত উক্তির মধ্যে সংস্কৃতির এই তাৎপর্য্যেরই ইঙ্গিত আছে:—

"It is stupid to say that culture is a bourgeois invention and therefore bad for us. Culture belongs to us; it is our lawful property, our inheritance. We'll find out for ourselves what is superfluous in it and cast aside whatever is not wanted."—*Fragments from my Diary*: Maxim Gorky)

এই জীবনমন্ত্রের নামই মানবতা (Humanism),—সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বনেদী বনিয়াদ, চিরশ্যামল ভিত্তিভূমি। এ যুগের সাহিত্য বা নূতন সাহিত্যেরও বনিয়াদ হবে এই জীবনমন্ত্র, তারও অন্তরে অনুরণিত হবে এই প্রাণের সুর।

এখন দেখব, এ যুগের সুর কি? এ যুগের বনিয়াদও মানুষের সংগ্রাম, জীবনের কল্লোল; কিন্তু গদিয়ান হয়ে বসেছে ধনিক-সভ্যতা। তারই শাখা-প্রশাখা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিজ্‌ম। তাই মানুষের সংগ্রাম এই শ্রেণী-সভ্যতার বিরুদ্ধে, মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে নয়। মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাশিস্টদের অর্থলালসা, রক্তপিপাসা ও নৃশংসতার ফলে মহাযুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে ব'লে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে পরাজয়ের গ্লানি আচ্ছন্ন করবে কেন? মৃত্যুর বিজয়-নিশান সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর কেন উড়বে? "ওয়েস্টল্যাণ্ড"-এর এলিয়ট, লরেন্স, হাক্সলী, এবং সেই বিষ-জর্জ্জরিত, সেই বীজাণু-সংক্রামিত আমাদের এই বাংলা দেশের সুধীন্দ্র-বিষ্ণু-সমর-জীবনানন্দ,—এঁদের বিকৃত ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা, দুর্ব্বলতাজনিত নৈরাশ্যবাদ, নিউরসিস-জনিত পাগলামি, স্ব-শ্রেণীজাত ভণ্ডামি, কেতাব-প্রসূত ন্যাকামি, বিলাস-ক্লান্ত স্নায়ুজাত অসূয়া, নিষ্ক্রিয়তাজাত অবসাদ,—এই কি সত্য (Truth) ও বাস্তব (Reality)? জীবনের সমগ্রতার পরিচয় যার মধ্যে নেই, তা সত্যও নয়, বাস্তবও নয়। এই সব সাহিত্যিক, তাঁদের অস্বভাবী মনে আবেদন করে, এ রকম কোনও ঘটনাকে গ্রহণ ক'রে তারই 'ক্লোজ আপ', 'মিড শট' দেখান, পরিপূর্ণ জীবন দেখবার মত

দৃষ্টির গভীরতা তাঁদের নেই। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, বিলাসী মন, আর নিষ্ক্রিয় অন্তর নিয়ে মহৎ শিল্পী হওয়া যায় না। বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর সভ্যতার অপজাত অংশকে নস্যাৎ করতে গিয়ে তাই তাঁরা 'মানব-সভ্যতা' ও 'মানব-সংস্কৃতি'কে 'জাহান্নমে যাক' ব'লে অভিশাপ দেন। সভ্যতার যে অপজাত অংশ আজ ধ'সে পড়ছে, তারই পাশে মাটির জীবন্ত রসে পুষ্ট হয়ে যে নূতন শ্রেণীহীন বিশাল মানব-সভ্যতা অঙ্কুরিত হচ্ছে, তা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় না। খণ্ড রূপ, বিকৃত প্রতিরূপের ব্যভিচারেই তাঁদের আনন্দ, আমি তাঁদের করুণা করি। (এখানে প্রসঙ্গত ভ্রাতুষ্পুত্র ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের কাছে লিখিত জে. এ. স্পেণ্ডারের 'আধুনিক কাব্য' সম্বন্ধে একখানি চিঠির কয়েকটি কথা আমার মনে পড়ছে। জে. এ. স্পেণ্ডার লিখেছেন: Be pessimistic, if you must, but don't be misanthropic. Man, after all, is the king of beasts, and if you wish to influence him, you must treat him with respect. He "lives by admiration, hope and love"; you must give him something to admire, something to hope for, something to love. এই কথা ব'লে জে. এ. স্পেণ্ডার বলেছেন, I speak as an impenitent traditionalist. অনেক সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট হয়তো আঁতকে উঠবেন, কিন্তু কম্যুনিজ্‌মকে শ্রদ্ধা ক'রেও আমি বলতে পারি যে, আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই ট্র্যাডিশনালিস্ট স্পেণ্ডারের এই উপদেশ পালনে উপকৃত হবেন, আমরাও হব।) আমি বলি, যত খুশি ঘৃণা কর ধনিকশ্রেণী-সভ্যতার আপজাত্যকে, যে সভ্যতা মানবতাকে অশ্রদ্ধা করে, ধর্ম্মের মুখোশ প'রে অধর্ম্মের উপাসনা করে, ভদ্রতার ছদ্মবেশে বর্ব্বরতার জয়গান গায়; নারী যার কাছে নিলামের পণ্যের মত, শিশু যার কাছে বলিদানের বস্তু—সে সভ্যতাকে প্রাণভরে অভিশাপ দাও, সেই খুনে

বুর্জ্জোয়াশ্রেণীকে অন্তরভরে ঘৃণা কর; কিন্তু তাই ব'লে মানুষের সভ্যতাকে, সংস্কৃতিকে, সাহিত্যকে ঘৃণা ক'র না, দিকভ্রান্ত হয়ো না। পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী, জনগণ, সংস্কৃতির স্রষ্টা ও পূজারী যারা, আজ তারা যে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব-সভ্যতাকে উন্নততর পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই শ্রেণীহীন সমাজগঠনের আদর্শ নিয়ে বিশ্বাস ফিরিয়ে আন, আশা আন, জয় হবেই। কারণ এই তো জীবন, জীবনের পরাজয় নেই।

কিন্তু মানবতা বা মনুষ্য-প্রীতি সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত আমরা বলতে পারি না যে, "মহান্ পুরুষে"র প্রতি যে প্রেম এবং তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞান, আমাদের সকলের মধ্যে,—অর্থাৎ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে—সেই প্রেম ও জ্ঞান বিদ্যমান; সে প্রেম সকল প্রেমের তুলনায় শ্রেষ্ঠ; এবং সেই প্রেমের পূর্ণতার জন্য কোন ক্লেশই, এমন কি মৃত্যুও, দুঃখদায়ক নয়। উপনিষদের সেই "ঈশকে" (ঈশ্বর) উপলব্ধি করা, এবং তাঁর প্রেম ও সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ("We must realise...the love and wisdom that belong to the Supreme Person, whose Spirit is over us all, love for whom comprehends love for all creatures and exceeds in depth and strength all other loves, leading to difficult endeavours and martyrdoms that have no other gain than the fulfilment of this love itself."—*The Religion of Man*: Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রনাথের এই বিমূর্ত্ত বিশ্বমানবিকতার সরল অর্থ হচ্ছে—ঈশ্বর-প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের একাত্মীকরণ। এই মানুষ অনৈতিহাসিক, শ্রেণী-উত্তর ও বায়বীয় গুণসমষ্টি-বলে অতি-মানুষ (Super-man) ও

বিরাটাত্মা (Super-soul) হয়। কিন্তু আমরা বলি যে, এ শুধু জাগর-স্বপ্ন, বাস্তব থেকে বিসঙ্গতার ফলে আধ্যাত্মিক দর্শন এর আশ্রয়স্থল হয়। এ অসম্ভব, আজগবি, মানুষের ইতিহাস-বিরোধী। এমন কি, এই অধ্যাত্মবাদ আজ ধনিকবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদের হাতে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র হয়েছে। এ আমার গবেষণা নয়, (শ্রদ্ধেয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশও নয়) ইতিহাসের রায়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্য্যন্ত চার্চগুলি তাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য প্রধানত সংস্কারের উপর নির্ভর করেছে, এবং স্বর্গের সুখ ও নরকের বিভীষিকা সম্বন্ধে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে তারা সফলও হয়েছে। ১৮৩৯ সালে রেভারেণ্ড জে. ফ্রান্সিস চার্টিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "রাজনৈতিক আন্দোলন ও গোলযোগ দমন করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, সকলকে নরকের বিভীষিকাময় অস্তিত্বে বিশ্বাস করানো, এবং দুষ্টেরা যে চিরদিন সেখানে নিদারুণ যন্ত্রণা ও কঠোর শাস্তি ভোগ করে—এই ধারণার সৃষ্টি করা।" এমন কি নরকাগ্নির এই নীতিতে মানুষের বিশ্বাস দিন দিন ক'মে যাচ্ছে দেখে গ্ল্যাডস্টোন পর্য্যন্ত বলেছিলেন যে, সেণ্ট পলের এই বশীকরণ-অস্ত্র ব্যবহার না করলে রাজনৈতিক অশান্তির সম্ভাবনা আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের আধুনিক অস্ত্র (শাণিত) "প্রেম" ও "ভ্রাতৃভাব"; কারণ এই আফিম খাইয়ে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, বিরোধ থেকে তাদের বিপথে চালিত করবার এইটাই সুপ্রশস্ত পথ। চতুর্দ্দশ বেনেডিক্ট গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁর প্রচারপত্রে সেইজন্য লিখেছিলেন: "এই ভীষণ অশান্তির কারণ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি শাসিতদের উপযুক্ত শ্রদ্ধার অভাব। যেদিন থেকে ত্রিভুবনাধীশ্বর ভগবানকে অস্বীকার ক'রে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি হয়েছে মানুষের শক্তির উৎস, সেদিন থেকে সাধারণ নিম্নস্তরের মানুষ

তাদের শ্রদ্ধেয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠদের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। মানুষকে আমরা সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তারা যেন মনে রাখে যে, ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শক্তি নেই, এবং মানুষের উপর যে শক্তিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, দেবতাই সেই শক্তির উৎস।" ফ্যাশিজ্‌ম-এর মধ্যেও এই "অতি-মানুষ", "দেবতা" ও "বিরাটাত্মার" জয়গান উচ্চতম গ্রামে ধ্বনিত হয়েছে। এক কথায় বলা চলে যে, "পরমেশ্বর" বা "অতি-মানুষই" ফ্যাশিজ্‌ম-এর শক্তির সর্ব্বপ্রধান উৎস। ইতালীয় ফ্যাশিজ্‌ম-এর সরকারী দার্শনিকের উক্তি উদ্ধৃত করছি: "Human being is naturally religious. To think means to contemplate God. The more one thinks, the more one feels oneself in the presence of God. As against man, God is everything, man is nothing."—Giovanni Gentile: *Fascism and Culture.*

এর পরেই সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হন হিট্‌লারের মধ্যে, মুসোলিনীর ও জাপানের সমরকর্ত্তাদের মধ্যে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে বলিদান দেওয়া হয়; কারণ এ তো হত্যা নয়, আত্মোৎসর্গ, দেবতার বেদীমূলে বিনা অভিযোগে আত্মদান। আমাদের এ দেশেও এই দেবতা অনেক সৎসঙ্গে, অনেক 'বাবা'র আশ্রমে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, সময়মত কোনও বীরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে কালবিলম্বও করবেন না। (এখানে অনেকে রুষ্ট হয়ে বলবেন যে, আমি পারতপক্ষে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথকে 'ফ্যাশিস্ট' বলেছি, আমি বাচাল। আমার উত্তর এই যে, রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে', 'রাশিয়ার চিঠি,' 'কালান্তর' প্রভৃতি পড়েছি। অতএব শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু 'দার্শনিক' বা 'বিশ্বপ্রেমিক' রবীন্দ্রনাথকে জীবন্ত ইতিহাস যদি অস্বীকার করে, তা হ'লে আমি সহায়হীন।)

এর পর স্বাভাবিক প্রশ্ন হবে (যদিও প্রশ্ন অর্থহীন) যে, ধর্ম্ম যদি অধার্ম্মিকের কবলে প'ড়ে উন্মার্গ হয়, তার পুনরাভিষেক কি সম্ভব নয়? সমবেত কণ্ঠে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উত্তর দেবেন: "সম্ভব নয়।" যুগে যুগে, হাজার বৎসর ধ'রে এই ধর্ম্মের পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং সে পরীক্ষার ব্যর্থতা রক্তাক্ষরে আজ মানুষের ললাটে লেখা রয়েছে। অতএব পরীক্ষা শেষ হোক—ভয়ানক 'ছিনিমিনি' খেলা শেষ হোক, 'ভেকেরা' বাঁচুক। ক্ষতি কি? জগদ্বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি-সাধক ডাঃ ফ্রেজার মানব-ধর্ম্মের ও মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণা ক'রে যে কথা বলেছেন, তা আমাদের চিন্তার যোগ্য নয় কি?

"To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of men in the past, and they will be the primary wants of men in the future...Other things may be added to enrich and beautify human life, but unless these wants are first satisfied, humanity itself must cease to exist." *The Golden Bough*—Part IV—"Adonis, Attis, Osiris," James G. Frazer.

সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ও শিল্পের মত নূতন সাহিত্যেরও ভিত্তি হবে মানবতা, কিন্তু সে মানবতা ঈশ্বর-ধর্ম্মের উর্দ্ধটানে নভোচারী মানবতা হবে না। এই নভোচারী মানবতাকে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন "পাশবিকতা" বা 'Philistinism' (Maxim Gorky-র *Culture and the People* পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এ যুগের মানবতা বা Proletarian Humanism" বৈষ্ণবী প্রেমের মহিমাকীর্ত্তন করবে না, অস্পষ্ট ছায়ালোকে মূর্ত্তিহীন, জীবনেতিহাসহীন মানুষের আরাধনা করবে

না। যে শ্রেণীর সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা, বিজ্ঞান-ক্রীতদাসত্ব ও জিঘাংসা মানবতা-বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে, তাকে ঘৃণা করবে, অশ্রদ্ধা করবে, কটূক্তি করবে; সঙ্গে সঙ্গে সুগম করবে শ্রেণীহীন মানব-সমাজে বিশাল মানবতার বিকাশের পথ। 'নূতন সাহিত্যে'র এই হচ্ছে ভূমিকা, এবং এই 'মানবতা' নূতন সাহিত্যের ভিত্তি। এর পরিণতি বিশ্বমানবতায়, কারণ তখন মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে না, শ্রেণী-প্রভুত্ব থাকবে না; সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্য হবে শিব ও সুন্দর দুইই। সে মানবতা নভোচর না হয়ে হবে স্থলচর, এবং মহাশূন্যযাত্রী শিল্পীর স্বপ্নচারিতাও দূর হবে।

শ্রীবিনয় ঘোষ

বাধ্যতামূলক

বাধ্য হইয়া মানুষ করছে স্থানত্যাগ,
বাধ্য হইয়া মিশবেই জানি তেলে ও জলে,
ধলায় কালায় হলদে সাদায় প্রণয় তো
পেটের জ্বালায় পৃথিবী জুড়িয়া চলবে জানি।
রাজকন্যারা ঘুমায় না আর রাজপ্রাসাদে,
প্রজার ছেলেরা হোটেলে পল্‌কা নাচতে পারে।
বোমার আঘাতে আহত মানুষ সর্ব্বদাই
পরস্পরের মুখ চেয়ে হেথা বাঁচতে চায়।
মধ্য-এশিয়া বাধ্য হয়েই নামল নীচে—
পশ্চিম আসে, শেষাশেষি দুয়ে মিলবে পুবে।

ক খ গ

[জ্যামিতিক গল্প]

১

ক ও খ অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

শুধু তাহাই নহে, উভয়েরই জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার। ধার করে, ধার করিয়া ধার শোধ করে, আবার ধার করে। জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার হইলেও ইহাদের সান্ধ্যগতিপথ সরলরেখাকৃতি। সন্ধ্যার সময় উভয়েই সোজা এক স্থানে গমন করে এবং সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সকালে সোজা স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায়। যেদিন রাত্রেই ফিরিতে হয়, সেদিন অবশ্য গতিপথটা সরল থাকে না, একটু এঁকা বেঁকা হইয়া যায়।

ধার বাড়ে।

জীবন অর্থহীন হইয়া পড়িতে চায়। আবার নূতন অর্থ মেলে।

ক বস্তুতান্ত্রিক।

খ ভাবতান্ত্রিক।

খ পরিচিত মহলে কখনও বক্তৃতা দিয়া, কখনও কাঁদিয়া কাটিয়া, কখনও অভিনয় করিয়া কাজ হাসিল করে। সোজা চাহিয়া না পাইলে ক পকেট মারে। বস্তুতান্ত্রিক ক।

২

গ।

ষোড়শী গ। কয়ের কন্যা। মাতৃহীনা একমাত্র কন্যা। তবু অনূঢ়া। তাহার অন্তরের কামনা সর্ব্বাঙ্গে প্রকট।

ক দেখে; বস্তুতান্ত্রিক ক কিন্তু কিছু করিতে পারে না। এত লম্বা পকেট বঙ্গদেশে কাহারও নাই, যাহা মারিয়া পণের টাকা সংগ্রহ করা যায়।

ক ও গ, দুইজনেরই নিশ্বাস পড়ে।

খ আসে।

ক খ গ, ত্রিভুজ নয়,—পিতা, পিতৃবন্ধু ও কন্যা।

ক খ বাহির হইয়া পড়ে, সোজা সরলরেখায় সেই স্থানে যায়, যেখানে গেলে চতুর্ভুজ হওয়া যায়।

৩

ভাবতান্ত্রিক খ।

মনে ভাব জাগে, ভাষা মেলে না।

কবিতা লিখিতে চায়, মিল জোটে না।

গোলাপের সহিত জোলাপ ছাড়া অন্য মিল আসে না।

না—না—না। সমস্ত জীবনটাই না।

তবু—আকাশে রামধনু উঠে—সাতটা নয়, সাতশো রঙ।

খয়ের অন্তর খলবল করে।

দিন কাটে।

৪

দুই মাস কাটিয়া গেল।

সানাই বাজিতেছে। করুণ পূরবী সন্ধ্যার আকাশে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। পাড়ায় মিত্রদের মেয়ের বিবাহ।

নিজের বাসায় ক বসিয়া আছে—বস্তুতান্ত্রিক ক—খয়ের অপেক্ষায়। পূরবী তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, বিলম্ব তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। খ এত দেরি করিতেছে কেন, দেরি হইলে আবার—

আধ ঘণ্টা কাটিল, এক ঘণ্টা কাটিল।

"শালা—"

ক্ষুব্ধ ক উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।
আজ একাই যাইবে সে।
পূরবী বাজিতেছে।
গয়ের বুক ভাঙিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

৫

ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল।

খুব বিরক্ত হইয়া ফিরিল, বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সেখানে দ্বার বন্ধ। আসিয়া আরও বিরক্ত হইল। বিস্মিতও হইল। এখানেও ঘরে খিল কেন!

ধাক্কা দিল।

একবার, দুইবার, তিনবার।

লজ্জিতা গ খিল খুলিয়া দিল।

বিছানায় খ বসিয়া আছে।

ক ও খ নির্নিমেষে পরস্পরের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তকাল মাত্র।

তারপর সহসা ক বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় শিকল তুলিয়া তালা দিয়া গেল। ভীতা গ খকে বলিল, তুমি জানলা দিয়ে পালাও।

লোহার গরাদে আছে যে!

আরও ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল—বস্তুতান্ত্রিক ক।

সঙ্গে পুরুত।

কর শালা, বিয়ে কর।

খ রাজি হইয়া গেল।

সানাই তখন ইমন ধরিয়াছে।

"বনফুল"

"রূপ নিয়ে করি খেলা"

সারাদিন বসি রূপ নিয়ে করি খেলা,
কেটে যায় রাত সকাল বিকাল বেলা—
ভাবি মনে মনে তাই,
ভাবনার কিছু নাই,
দক্ষিণ কূলে লেগেছে আমার ভেলা।

রঙ আর রেখা, রূপ আর ধূপগুলি
সাজাই, জ্বালাই, যাই আপনারে ভুলি—
গোপন গগনে যাহা,
ছিল কামাতুর তাহা,
রূপ নিতে আসে ধূম্র স্বপন তুলি।

একা আমি গড়ি বসি মোর উপবনে,
পরিচয়-প্রীতি গাঢ় হয় ক্ষণে ক্ষণে,
যক্ষ রক্ষ—দেখি
দাঁড়ায় দুয়ারে একি!
অজানা রূপের সন্ধান জাগে মনে।

নানা লোক হতে ছুটে আসে রূপদল
গন্ধে ও গানে চঞ্চলি ছায়াতল—
কাহারও বরণ আছে,
কেহ—দুটি রেখা যাচে,
ধোঁয়া চায় দাহ, দাহ হতে চায় জল।

ভাবি ব'সে আমি, কি করিব রূপ নিয়া !
রূপের ভারেতে পিষে যায় বুঝি হিয়া,
চমকে ঝলকে যেটি,
রূপে রূপে ভরা সেটি
রূপ ধরি কই এল না আঙিনা দিয়া !

আজি একা বসি ভাবিতেছি উদাসীন,
ভেঙে ভেঙে যায় যাহা ধরি নিশিদিন।
রূপ একি মোর ? রূপ ?
ধোঁয়াহীন সুখী ধূপ ?
নয়ন রবে না রূপের প্রতিমাহীন !

"রুদ্রবীণ"

বজ্র আঁটন ফস্কা গেরো

বজ্র আঁটন ফস্কা গেরো,
সারবার কাজ আগেই সেরো ;
মারবার যদি থাকেই কিছু
ধর্ম্মের নামে প্রেম্‌সে মেরো।
খোঁয়াড়ের ভিড় বাড়ল ব'লে,
সেথানে ঢুকেই হাত পা ছেড়ো।

ঈশানপুরের মশান

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বল হরি হরিবোল।—সুউচ্চ কোলাহলের রেশটা ভাসিয়া আসিল, কে মরিয়াছে ?

ভোরের দিকে আজকাল বেশ কনকনে শীত পড়ে। একটা চাদর আর ছিন্ন কম্বলের উত্তপ্ত আশ্রয়ের সুখস্পর্শ ত্যাগ করিয়া এখনই উঠিতে হইবে ভাবিয়া নীলকান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু—ওগো, ও ছোটবাবু, ওঠ।—শ্মশানের চণ্ডাল কালী আসিয়া দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল।

নীলকান্ত সাড়া দিল না।

ছোটবাবু, শুনছ, ও ছোটবাবু !

নাঃ, তাহাকে উঠিতেই হইবে, উপায় নাই। নীলকান্ত চাদরটা দেহে জড়াইয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইল। গুদাম-ঘর খুলিয়া দাওয়ার উপরকার তক্তাপোশের উপর একটি শতরঞ্জি বিছাইয়া, দুইটি খাতা ও দোয়াত কলম আনিয়া তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কে গো, দলের কত্তা কে ?

শবযাত্রীদের মধ্য হইতে একজন বয়স্ক লোক আগাইয়া আসিয়া বলিল, এই যে, সাত মণ কাঠ চাই বাবা।

বেশ। কালী !

হুঁ।

সাত মণ।

কালী নিরুত্তরে গুদাম-ঘরের বারান্দায় কাঁথা মুড়ি দিয়া উপবিষ্ট তন্দ্রাচ্ছন্ন পুত্র ভোলাকে ডাকিল। ভোলার বয়স চৌদ্দ বৎসর।

ভোলা হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, হোই দেখ, আবার ঘুম পাচ্ছে গো।

কালী ধমক দিল, আরে, ওঠ হারামজাদা, যা, কাঠ নীচে লামাগে।

ভোলা উঠিল। কালী কাঠ ওজন করিতে লাগিল, সে সেগুলি

মাথায় করিয়া নীচে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গুদাম-ঘর হইতে নদীর তীর ঢালু হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে, নদীতীরের বালু-মিশ্রিত নরম মাটির উপর অঙ্গার আর অস্থিকণা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

একটি খাতায় নীলকান্ত তারিখ লিখিয়া যত মণ কাঠ বিক্রি হইল, তাহার হিসাব রাখিল, পরে অপর খাতাটি খুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে মরেছে?

কমলা দেবী।

হুঁ, বয়েস কত?

আটাশ।

আটাশ। কার বউ?

নিবারণ চক্রবর্ত্তীর।

কি নাম বললেন?

নিবারণ চক্কোত্তীর।

নীলকান্ত লোকটিকে চিনে।

ওঃ, কি অসুখ হয়েছিল?

জ্বর।

নীলকান্ত সমস্ত উত্তরগুলি সেই খাতায় লিখিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিতে গেল।

মিনিট পনরো পরে একটি দাঁতন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে উপর হইতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে শবানুষ্ঠান দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, চিতা সজ্জিত হইলে মৃতা কমলা দেবীর আবরণ উন্মোচিত করা হইল। এককালে সে সুন্দরী ছিল, প্রাণহীন দেহটায় এখনও তাহার পাণ্ডুর আভাস। অথচ চার পাঁচ ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বেও কিন্তু সে জীবিতা ছিল, তাহার দেহে ছিল উত্তাপ, চোখে ছিল এই পৃথিবীর ছায়া, মনে ছিল সংসারের সুখ-দুঃখের কথা, কিন্তু অকস্মাৎ কে যেন তাহার জীবনের গতিপথে একটি পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিল—সুন্দরী কমলা দেবী মারা গেল। কিন্তু তাহাতে কি এমন রহস্য আছে? অতি

সাধারণ ঘটনা মাত্র, মাটি হইতে রসধারা না পাইলে যেমন বৃক্ষলতা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়, তেমনই কমলা দেবীও জীবনের রসধারা হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া মারা গিয়াছে। তাহাতে ভয়ের, ভাবিবার কিছু আছে কি? নীলকান্ত নিজের মনে হাসিল।

ক্ষণপরেই চিতা জ্বলিয়া উঠিল, প্রথমে অল্প-অল্প, ক্রমে তাহা লেলিহান হইয়া উঠিল, তীরবর্ত্তী কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ভোরের ধূসর আলোককে তাহা ক্ষীণ করিয়া দিল। ঊর্দ্ধমুখী ধোঁয়ার সৃষ্টি করিতে করিতে, উত্তপ্ত রক্তজিহ্বা মেলিয়া, শেষ হেমন্তের মৃদু বাতাসের শীতলতাকে লোলুপভাবে লেহন করিতে করিতে চিতাগ্নিশিখা যেন করতালি দিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল।

দূরে পূর্ব্বদিগন্তে, কুয়াশামণ্ডিত ভাগীরথী যেখানে আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেইখানে ধীরে ধীরে একটি ক্ষীণ রক্তিমাভা দেখা গেল। কতকগুলি পাখী ডানার আঘাতে বায়ুস্তরে কম্পন তুলিয়া, কলরব করিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে জানাইয়া গেল, সূর্য্য উঠিতেছে।

সূর্য্য উঠিতেছে। দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ সে এইখান হইতে ঐ ভাগীরথীর প্রতি তরঙ্গশীর্ষে উদয়োন্মুখ সূর্য্যালোককে কাঁপিতে দেখিয়াছে এবং উপলব্ধি করিয়াছে যে, একটি নূতন দিনের প্রভাত হইল; মহাকালের আবর্ত্তে বিলুপ্ত বিগত দিনের বিসর্পিল স্মৃতিচিহ্ন ললাটের উপর আরও গভীর হইয়া উঠিল। ভাগীরথী প্রতি বৎসর তাহার গতি পরিবর্ত্তন করে, এক বর্ষায় কখনও সে দূরে চলিয়া যায়, আর এক বর্ষায় নিকটস্থ হয়; পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে পরিবর্ত্তনও নানা প্রকারের ঘটিল, কত মানুষ জন্মাইল, কত মরিল; কিন্তু ঐ পূর্ব্বাকাশ ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয়ের কোনও ভুলচুক হয় নাই, আর নীলকান্তেরও তাহার দর্শনের ভুল হয় নাই। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া সে এইখানে, এই নদীতীরে, এই শ্মশানে রহিয়াছে। আগে ভাল লাগিত না, মন হাঁপাইয়া উঠিত—পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিত; কিন্তু আজকাল কিছুই মনে হয় না, ভালও না, মন্দও না, তীরের উপরকার ঐ সকল বৃক্ষলতাদের মত সেও নিজেকে এই শ্মশানের মাটির সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দী করিয়াছে।

জলের উপরকার কুয়াশার মধ্য দিয়া দূরের জিনিস যেমন অস্পষ্ট

বোধ হয়, তেমনই অস্পষ্ট, আবছা সেই দিনকার কাহিনী—যেদিন সে প্রথম এখানে আসিল। যাত্রার দল হইতে পলাতক, আত্মীয়হীন অনাথ নীলকান্ত এক নৌকা হইতে এখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে আসিয়া নামিয়াছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সে এই ঈশানপুরের শ্মশানে আসিয়া শ্রীনাথের নিকট কাঁদিয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বলিয়াছিল, শ্রীনাথ দয়া করিয়া সেইদিন তাহাকে আহার ও আশ্রয় দিয়া একটি কাজও দিয়াছিল। সেই কাজ সে এখনও করিতেছে। ভাগীরথীর পুণ্যজলে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার লোভে দূরবর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে শবযাত্রীরা আসে, রোজই একটি দুইটি করিয়া মড়া তো পোড়েই, মাঝে মাঝে তাহার বেশিও হয়; সুতরাং শ্রীনাথের কাঠের দোকানটি চলে বেশ। তাহা ছাড়া মরা মানুষদের নামধাম ও রোগের বিবরণ প্রভৃতি লিখিবার জন্য শ্রীনাথ সরকার হইতে উপরন্তু পনরো টাকা বেতন হিসাবে লাভ করে। নীলকান্ত আসিবার পর হইতে এই কাজ ও দোকান দেখার ভার তাহার উপর পড়িল। আগে সে কিছুই পাইত না, দুই বেলা শ্রীনাথের বাড়ি খাইত আর দোকানে শুইত, কিন্তু দুই বৎসর যাবৎ সে আর তাহার বাড়িতে খায় না, নিজেই দুই বেলা রান্না করিয়া লয়। সেইজন্য মাহিনা বাবদ শ্রীনাথ তাহাকে আট দশ টাকা আজকাল দেয়।

চিতাটা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কমলা দেবীর সুন্দর দেহ পুড়িতেছে। অগ্ন্যুত্তাপে তাহার দক্ষিণ পা কাঠের চাপ ঠেলিয়া এক পাশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, রুক্ষ কেশের রাশি পুড়িয়া শেষ হইয়া অবশেষে চামড়া স্পর্শ করিয়াছে; শীতার্ত্ত ভোরের ভারী বাতাসে দগ্ধ নারীমাংসের দুর্গন্ধ।

নীলকান্ত ঘরে গিয়া মুড়ি ও বাতাসা বাহির করিয়া চিবাইতে বসিল।

কালী একটি বাঁশ দিয়া শবের দক্ষিণ পাটা আগুনের ভিতর ঠেলিয়া দিল। ভোলা মৃতার শাড়িটি জলে ধুইয়া লইতেছে, সেটি তাহার বোন মতি পরিবে। মতি! বেশ নামটি, আর চেহারাটিও ভারী সুন্দর। নীলকান্ত নিজের মনে হাসিল। সে মতিকে দেখিয়া বহুদিন

যাবৎ মুগ্ধ হইয়াছে, এমন কি ঐ নীচজাতীয়া মেয়েটিকে ভালও বাসিয়াছে। হয়তো এ তাহার যুবজনোচিত মনের ক্ষণিক উন্মাদনা, একটা হাস্যকর ব্যাপার, তবুও এ দুর্ব্বলতাকে সে জয় করিতে পারে নাই, পারে না।

চিতাটা জ্বলিতেছে। নিবারণ চক্রবর্ত্তী কমলা দেবীকে বড় ভালবাসিত।

ঘণ্টাখানেক কাটিল। চিতার আগুন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, ওদিকে ভাগীরথীর জল রূপালী রৌদ্রে জ্বলিতেছে, ছিন্নভিন্ন কুয়াশার ক্রমবিলীয়মান অস্তিত্ব ক্ষীণ ধোঁয়ার মত দুই এক জায়গায় দেখা যাইতেছে।

নীলকান্ত উনুনে আগুন দিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতে বসিল।

ভোলা আসিয়া বলিল, বাজারে যেতে হবে নাকি গো ছোটবাবু?

হ্যাঁ রে।

তা হ'লে পয়সা দাও।

নীলকান্ত তাহাকে মাছ কিনিবার জন্য পয়সা দিল। তরকারি যাহা আছে, তাহাতেই আজ চলিয়া যাইবে।

এই দিদি, লে এই শাড়িটা।

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল। গুদাম-ঘরের উত্তর দিকে কাশবনের ধারে দাঁড়াইয়া মতি চিতাটি দেখিতেছে। মতি আগাইয়া আসিল, নীলকান্তকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া হাসিল।

ভোলা বিরক্তির সুরে বলিল, লে না, আমি বাজারে যাই।

মতি শাড়িটা হাতে লইয়া একটু মুগ্ধ কণ্ঠে বলিল, বাঃ, সুন্দর শাড়িটা তো, একেবারে নতুন!

হুঁ, একটো মেয়েনোক মরেছে—তার।

ভোলা চলিয়া গেল।

নীলকান্ত ডাকিল, মতি।

ডাগর ডাগর চোখ দুইটি তাহার দিকে তুলিয়া মতি বলিল, কি?

নীলকান্ত হাসিল, শাড়িটা ভারী সুন্দর, না?

হু। মতি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে না, সে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, নীলকান্ত তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। কালো দেহের নিখুঁত গাঁথনিতে পল্লবিত যৌবনের পরিপূর্ণ শ্রী, মাথায় অজস্র কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশের ভারী খোঁপা, ডোরা-কাটা মলিন শাড়ি-বেষ্টিতা ক্ষীণ কটিদেশ; দেখিতে দেখিতে নীলকান্তের মনে যেন নেশা লাগে। এ নেশা মদের মত নয়, কারণ মদ তো সে নিত্যই পান করে, সে নেশায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়, মাথা ঝিমঝিম করে, গতি অসংযত হয়; এ নেশা আলাদা। এতে বুকের ভিতরে রক্তের স্রোত অকস্মাৎ উদ্দাম হইয়া উঠে; মস্তিষ্কের কোন নিভৃততম প্রদেশে মন উন্মাদ হয়, সূক্ষ্মতত্ত্ব রহস্যের যবনিকা পারিপার্শ্বিককে বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

নেশার ঘোরে মানুষ যেমন টানিয়া টানিয়া কথা বলে, তেমনই ভাবে নীলকান্ত আবার ডাকিল, মতি!

উঃ।

তোকে যদি আমি একটা নতুন আর একটা সুন্দর শাড়ি কিনে দিই, নিবি?

ধেৎ।—মতি সলজ্জ হাসি হাসিল।

কালী দূর হইতে মতিকে দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিল, তুই এখেনে কি করছিস রে?

শাড়িটা লিতে এসেছি।—মতি অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলিল, আসল কথাটা তাহার মনেই জমা রহিল।

রান্না চড়ায়েছিস?—কালী জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ।

তবে তুই এখেনে দাঁড়িয়ে কেনে রে মুখপুড়ী, যা, বাড়ি যা।

মতি বাড়ির দিকে পা বাড়াইল, নীলকান্ত বলিল, আমার কথার জাবাব দিলি না মতি?

মতি মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ক্ষুদ্র একটি জবাব দিল, ধেৎ।

মতি চলিয়া গেল। গাছপালাগুলির ভিতর দিয়া যে সংকীর্ণ পথটি গুদাম-ঘরের বাঁ দিক হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার শেষ প্রান্তে মতিদের কুঁড়েঘর। শ্মশান হইতে মিনিট দুয়েকের রাস্তা মাত্র।

উনুনের সম্মুখে বসিয়া নীলকান্ত ফুটন্ত জলের টগবগ শব্দ শুনিতে লাগিল। বেশ লাগে। বাহিরে কোথায় যেন একটি ঘুঘু ডাকিতেছে, তাহারই শব্দ ভাসিয়া আসে, মনের ভিতর কি যেন একটা আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে চিতা নিবাইয়া, স্নান সারিয়া শবযাত্রীরা চলিয়া গেল, জলসিক্ত চিতার উপর ভগ্ন কলসটি পড়িয়া রহিল। সময় কাটিতে লাগিল।

কালী আসিয়া বলিল, কি রাঁধছ গো ছোটবাবু?

এই ডালটা এবার নামাব।

হুঁ। আচ্ছা, আমিও এবার বাড়ি চললাম।

আচ্ছা।

কালী যাইতেই ভোলা আসিয়া মাছ দিয়া গেল।

সূর্য্য যখন অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে নীলকান্ত খাইতে বসিল।

সেই সময়েই বাহির হইতে শ্রীনাথ ডাকিল, নীলু!

নীলকান্ত মুখের গ্রাসটা নামাইয়া সাড়া দিল, আজ্ঞে।

শ্রীনাথ আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। ওঃ, খাচ্ছিস, যাই, আমি বিছানাটা পেতে বসিগে। তোর উনুনে আগুন আছে?

আছে বোধ হয়।

তবে খেয়ে এক ছিলিম সেজে দিস তো বাবা।

আচ্ছা।

তক্তাপোশের উপর শতরঞ্চি বিছানো ছিল, গুদাম-ঘর হইতে একটি বালিশ লইয়া আসিয়া শ্রীনাথ তাহার উপর গড়াইয়া পড়িল, কাপড়ের বাঁধন আলগা করিয়া দিয়া, একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল, তেল-চকচকে মুখমণ্ডলে একটি আরামের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। পিছনকার গাছপালাগুলির ছায়া ঘন হইয়া উঠিয়াছে, উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসের মৃদু বেগ আসিয়া

দেহে বেশ সুমধুর একটি শিহরণ জাগায়, চোখের পাতা দুইটি ভারী হইয়া উঠে।

খাওয়া শেষ হইলে নীলকান্ত শ্রীনাথকে তামাক সাজিয়া দিল।

তামাক টানিতে টানিতে শ্রীনাথ বলিল, আজ মড়া পুড়েছে দেখছি একটা।

হ্যাঁ।

ক মণ কাঠ বিক্রি হ'ল ?

সাত মণ।

মাত্র! কমবয়েসী ছিল বুঝি ?

মেয়েমানুষ।

ওঃ, কার বউ ?

নিবারণ চক্রবর্ত্তীর।

শ্রীনাথ তাড়াতাড়ি হুঁকা নামাইল, কে বললি ? নিবারণ ?

হ্যাঁ।

শ্রীনাথ হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, ভগবান আছেন রে, বুঝলি নীলু, ভগবান আছেন।

নীলকান্ত মনে মনে হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা হবেন।

হবে নয়, নিশ্চয়ই আছেন, নইলে আর কারও বউ না ম'রে নিবারণেরই বউ মরল কেন, অ্যাঁ ? আর কেউ না জানুক, আমি জানি কেন মরেছে, মরেছে নিবারণের পাপের ফলে, আমার অভিশাপে। জমির মামলায় হেরেছি বটে, কিন্তু ভগবান জানেন, ও কার হকের জিনিস ; কেমন, ব্রাহ্মণের অতি দুঃখের অভিশাপ, ফলল কি না, হাঃ হাঃ হাঃ।

অভিশাপ! ভগবানও যাহা বোধ হয় জানেন না, নীলকান্ত তাহা জানে, সে জানে সেই জমির মামলার ইতিহাস, সে জমি আসলে কাহার তাহাও তাহার অবিদিত নাই। শ্রীনাথের তাহা পরম লজ্জার বিষয়। জীবনে তাহার অপরাজেয় লোভ ঐ একবারই পরাজিত হইয়াছে। নিবারণ মোকদ্দমায় জিতিয়াছিল, সুতরাং তাহার স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্রীনাথের আনন্দিত হইবার কারণ আছে বইকি। নীলকান্ত মনে মনে একটু

আহত হয়, কিন্তু কি বলিবে সে, শ্রীনাথ তাহার আশ্রয়দাতা। তাহা ছাড়া দীর্ঘ বারো বৎসরের শ্মশানবাস, নিত্যকার চিতানলে উত্তপ্ত বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া সে শুষ্ক ও নীরস হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ মানুষ মারা গেল, কোন্ মানুষ তাহার ন্যায্য দাবি হইতে বঞ্চিত হইল, দুঃখ পাইল, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার, ভাবিবার তাহার সময় নাই।

মৃদু হাসিয়া সে সায় দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীনাথ ধীরে ধীরে হাসি থামাইল।

নীলকান্ত খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, আমি একটু বেড়াতে যাই তা হ'লে ?

অ্যাঁ ?

আমি বেড়াতে যাচ্ছি।

ওঃ, তা বেশ, যাবার পথে অমনই কালীকে পাঠিয়ে দিও।

আচ্ছা।

নীলকান্ত মনে মনে হাসিল। শ্রীনাথ না বলিলেও সে কালীর বাড়ি যাইত, যদি মতিকে দেখা যায়, তাহার সহিত কথা বলা যায়, এই আশায়।

শ্রীনাথ ঝিমাইতেছিল।

কালী আসিয়া একটু কাসিয়া বলিল, আমায় কি জন্যে ডেকেছেন কত্তা ?

কে ? ওঃ, কালী। তুই মাদুরটা বিছিয়ে ব'সে থাক বাপু, আমি একটু ঘুমোই। গাঙুলি তো আজ আর এল না।

চটিজুতার শব্দে তীরভূমি কাঁপাইয়া গুদাম-ঘরের পশ্চাতে হইতে সম্মুখে আসিয়া নবীন গাঙুলি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, সে কি হে মুখুজ্জে, অ্যাঁ ? জলজ্যান্ত লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি হে, আর তুমি বলছ, এল না, এল না!

শ্রীনাথ খুশি হইয়া উঠিল, আরে, এস এস, ব'সে ব'সে ঘুম পাচ্ছিল, অথচ ঘুমোতে ইচ্ছে করে না, চিরকালের অভ্যেসের একটু এদিক ওদিক

হ'লেই বড় বিচ্ছিরি লাগে হে। দাঁড়াও, দাবার ছক আর ঘুঁটিগুলো আনি।

গাঙুলি বসিল, পরিত্যক্ত হুঁকার নলটি খুলিয়া লইয়া একটি টান দিয়া হাসিয়া বলিল, এঃ, পুড়িয়ে যে একেবারে ছাই ক'রে রেখেছ হে মুখুজ্জে।

দাবার ছক পাতিতে পাতিতে শ্রীনাথ হাসিল, আচ্ছা, আর এক ছিলিম চড়াচ্ছি, তুমি ততক্ষণ ঘুঁটিগুলো সাজাও দেখি।

একটু পরেই খেলা আরম্ভ হইল।

সময় কাটিতে লাগিল, মধ্যাহ্ন ক্রমে অপরাহ্ণের দিকে গড়াইয়া চলিল। খেলা খুব জমিয়া উঠিল।

শ্রীনাথ গজের চাল দিয়া হাসিয়া উঠিল, হাঃ হাঃ হাঃ, বাগে পেয়েছি, গজ দিয়ে তোমার ঘোড়া মেরেই কিস্তি দোব, সামাল, সামাল।

গাঙুলি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বটে! তার আগে তোমার গজের পথ আমি এই নৌকা মেরে বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

শ্রীনাথের হাসি থামিল, ললাটে গভীর চিন্তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তাই তো!

অন্য ঘরের বারান্দায় কালী নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। প্রতিটি নিশ্বাসের সহিত তাহার বিশাল বক্ষ একটি হাপরের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

একটি যাত্রীবাহী ষ্টীমার ভাগীরথীর বুকে বড় বড় তরঙ্গ তুলিয়া নাজিরগঞ্জের দিকে চলিয়া গেল। ষ্টীমারের কালো ধোঁয়ার রাশি আকাশকে অভিবাদন করে। জলে তাহাদের ছায়া কাঁপে।

বাঃ, খেলা যে খুব জমেছে দেখছি।

শ্রীনাথ আর নবীন গাঙুলি দুইজনেই মুখ তুলিয়া চাহিল। ব্রজেশ্বর দত্ত—খুব খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, গলায় তুলসীর মালা, সর্ব্বদা হাসিখুশি ভাব।

শ্রীনাথ একটি নূতন চালের কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে বলিল, ব'স ভাই।

ব্রজেশ্বর মাথা নাড়িল, তা বসছি, কিন্তু খেলার কি হয়েছে! ওকি! মন্ত্রী সামলাও, মন্ত্রী সামলাও নবীন।

শ্রীনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিল, আঃ, তুমি সব মাটি করলে দত্ত, কেন ব'লে দিলে?

মন্ত্রীকে দুই ঘর সরাইয়া গজের আড়ালে লইয়া গিয়া গাঙুলি হাসিয়া বলিল, হেঁ হেঁ, ও না বললেও আমি মন্ত্রী সামলাতাম হে, খেলে খেলে ওসব বিষয়ে ঝানু হয়ে গিয়েছি, হেঁ হেঁ।

খেলিতে খেলিতে শ্রীনাথ আর গাঙুলি সব ভুলিয়া যায় এবং তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে ব্রজেশ্বরও আত্মবিস্মৃত হয়, কালী ওদিকে তেমনই অঘোরে ঘুমাইতেছে। একবার খেলা শেষ হইল, শ্রীনাথ জিতিল, আবার আরম্ভ হইল।

বাহিরে প্রতি মুহূর্ত্তে গাছের ছায়া, গুদাম-ঘরের ছায়া দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিতেছে, সময় কাটিতেছে। শালিক, চড়ুই আর কাঠঠোকরাদের কিচিরমিচির শব্দে যেন ঘুম আসে, উত্তরের বায়ুবেগে উত্থিত মর্ম্মরধ্বনি বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসের মত শোনায়, দূরে পশ্চিম দিকে, যেখানে ভাগীরথী বিড়ালাক্ষী গ্রামের দিকে বাঁক ফিরিয়াছে, সেইখানে প্রথম শীতের নির্ম্মল জলের উপরে বাদামী রঙের পাল উড়াইয়া দিয়া একটি মহাজনী নৌকা অদৃশ্য হইয়া যায়। আকাশের সিঁড়ি বাহিয়া শঙ্খচিলেরা বারম্বার উঠা-নামা করিতে করিতে নীচের পৃথিবীকে দেখে। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন।

বল হরি হরিবোল—দূর হইতে ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। শ্রীনাথ গাঙুলি আর ব্রজেশ্বর খেলা বন্ধ করিয়া সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া কান পাতিল।

কা কা কা—কাকের কর্কশ কণ্ঠ। নির্জ্জনতার স্বর ভঙ্গ হয়।

কে মরল?—ব্রজেশ্বর প্রশ্ন করিল। সে একটু ভাবপ্রবণ মানুষ, মৃত্যুকে তাহার ভারী ভয়।

কে মরল হে মুখুজ্জে?—ব্রজেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

কি ক'রে বলব, বল।

জয় মা শ্যামা দিগম্বরী!—একটি গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

আসুন, আসুন।—শ্রীনাথ বলিল।

গাঙুলিও সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে অভ্যর্থনা জানাইল, আসুন ঠাকুর মশাই।

পিঙ্গলজটাজুটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত একটি দীর্ঘ ও শীর্ণকায় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আসিয়া বসিল, সর্ব্বদা জলন্ত ও রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, ভাল তো?

শ্রীনাথ জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ। তান্ত্রিক বাহিরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

গাঙুলি আবার খেলার দিকে মন দিল, ঘোড়াটা দেখছি এবার খেয়ে ফেলবেই, অ্যাঁ?

বল হরি হরিবোল—শবযাত্রীরা শ্মশানে আসিয়া থামিল।

শ্রীনাথ হাসিয়া বলিল, এবার থাক ভাই, তুমি বরং ব্রজর সঙ্গে খেল, আমায় তো এবার চিত্রগুপ্তের দপ্তর নিয়ে বসতে হবে।

গাঙুলিও হাসিল।

ব্রজেশ্বর মাথা নাড়িল, উঁহু, আর না, আমি এবার বাড়ি যাব।

গাঙুলি অনুযোগ করিল, সেকি! কি রকম লোক তুমি, আরে, এখনও যে সবে দুপুর।

ব্রজেশ্বর শুনিল না, দাঁড়াইয়া বলিল, সূয্যি কোথায় দেখ তো, তা ছাড়া আমার কাজ আছে। উড়ুনিটা কাঁধে ফেলিয়া, একবার শবদেহটির দিকে চকিতে চাহিয়া সে দ্রুতপদে পথে নামিয়া গেল। এই শ্মশানে সে প্রতি দুপুরেই আসে, কিন্তু মৃতদেহ আসিলেই সে আর বসিতে চায় না, তখন তাহার নিজের বার্দ্ধক্যের কথা স্মরণ হয়, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতেই শিহরিয়া উঠিয়া সে পলায়ন করে; নির্জ্জন পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে প্রাণপণে বাতাসের মধ্য হইতে জীবন সংগ্রহ করিয়া সে মনে মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানায়, হে ঈশ্বর, আমাকে বাঁচিতে দাও, আমাকে বহুদিন বাঁচিতে দাও।

গাঙুলির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, ব্রজ ভারী ভীতু মানুষ।

হুঁ।

তান্ত্রিক চক্ষু বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছে, ললাটের রেখাগুলি সেই ভাবনার স্পর্শে জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

শবযাত্রীদের মধ্য হইতে একজন আসিয়া শ্রীনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল।

খাতা খুলিয়া শ্রীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, কে মরেছে?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন রায়।

কোন্ গ্রাম?

হাঁসখালি।

নলদীঘির উত্তরে, না?

আজ্ঞে হাঁ।

হুঁ। বয়েস কত?

পঁয়তাল্লিশ।

কি রোগ হয়েছিল?

টাইফয়েড।

শ্রীনাথ সব লিখিল।

এবার কাঠ চাই।—লোকটি বলিল।

হ্যাঁ, এই হচ্ছে, ওরে কালী, কালী!

এজ্ঞে।

ন মণ ওজন কর।

কালী উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীনাথ লোকটিকে প্রশ্ন করিল, সংসারে আর কে কে আছেন ওঁর?

সবাই—ভাই, বোন, মা, বউ, ছেলে, মেয়ে সব।

আহা!—গাঙুলি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ছেলের অসুখের কথা শুনে কলকাতা থেকে এসেছে, এসেই জ্বরে পড়ল, আর উঠল না। ছেলে বেঁচে উঠল, বাপ গেল।

গাঙুলি মাথা নাড়িল, এই তো জগৎ, এই তো জীবন, ভরা নৌকা কখন যে হুস ক'রে ডুবে যাবে, কে জানে!

লোকটি সায় দিয়া বলিল, হুঁ।

হঠাৎ তান্ত্রিক অবরুদ্ধ গর্জ্জন করিয়া শূন্যস্থিত কাহাকে যেন লক্ষ্য বলিয়া উঠিল, খুলে দে মা, খুলে দে।

শ্রীনাথ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কি খুলে দেবে ঠাকুর?

তান্ত্রিক তাহার কথার উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল, এত আবরণ কেন মা, খুলে ফেল, নইলে যে ভয় পাব মা।

শবযাত্রীটি গাঙুলির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে হাসিয়া নিম্ন কণ্ঠে বলিল, ওই শ্মশানকালী-মন্দিরের পুরুত ঠাকুর, মাথাটা একটু খারাপ।

তান্ত্রিক বিড়বিড় করিয়া নিজের মনে কি বলিতে বলিতে তীরভূমি ধরিয়া অদূরবর্ত্তী মন্দিরের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

শ্রীনাথ ডাকিয়া বলিল, চললেন নাকি ঠাকুর মশাই?

তান্ত্রিক উত্তর দিল না, শ্রীনাথের কথা বোধ হয় সে শুনিতেই পায় নাই। চলিতে চলিতে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত দিয়া শূন্যে কয়েকবার আঘাত করিল, কেন সেই জানে।

ওদিকে চিতা সজ্জিত হইতেছে। কয়েকজন ছোকরা শবযাত্রী লুকাইয়া বিড়ি খাইতেছে।

কি ভাবছ গাঙুলি?—শ্রীনাথ প্রশ্ন করিল।

কিছু না, এমনই, ভাবছি যে, দিন ফুরিয়ে এল।

ক্যাশবাক্স বন্ধ করিতে করিতে শ্রীনাথ বলিল, ওসব কথা ছাড়, নাও, এস তো, এক হাত খেলে নিই।

গাঙুলি ধীরে ধীরে উঠিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, না, আজ থাক। হঠাৎ মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। আজকের মত চললাম।

আহা, ব'সই না নবীন, আর এক হাত হয়ে যাক। মরা মানুষ দেখে দুঃখ ক'রে লাভ কি? যেদিন তাগিদ আসবে, সেদিন খেলবার জন্য এতটুকুও সময় তুমি পাবে না, নাও, এস দেখি, এস।

গাঙুলি অন্যমনস্কভাবে একবার শ্রীনাথের দিকে চাহিল, তা হবে, কিন্তু আজ সত্যি থাক মুখুজ্জে, আর ভাল লাগছে না।—বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছাতাটা বগলে তুলিয়া লইয়া সে গুদাম-ঘরের পশ্চাৎবর্ত্তী জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। আকাশের পটভূমিকায় ওপারের বৃক্ষশ্রেণীগুলি নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভাগীরথীর জলকল্লোলের তালে তালে নৌকার নৃত্য। শ্মশানে নিস্তব্ধতা আবার ঘনাইয়া আসিতেছে। শবযাত্রীরা বেশি কথা বলিতেছে না, ছোকরারা চুপ, কালীও চুপ, আর পাখীর দলও চুপ। সব চুপ। ঊর্দ্ধের ধূসর আকাশও মৌন। এত চুপ কেন?

চিতাটা জ্বলিয়া উঠিল। কুণ্ডলায়িত ধোঁয়া। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সুরেন্দ্রমোহন রায়ের দেহে অগ্ন্যুত্তাপে বড় বড় ফোস্কা পড়িয়া ফাটিয়া যাইতেছে। একটু পরেই তাহার দেহ দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে—বিগতপ্রাণ শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত।

শ্রীনাথ বসিয়া বসিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির বিসর্পিল নৃত্যভঙ্গি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল।—সে সুখী। তাহার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, নাতি-নাতনী, অর্থ সব আছে। ঈশানপুরের হাটে আর গোবিন্দপুরে ছেলেরা দোকান চালায়, রোজগারও বেশ করে, মেয়েদের বিবাহও শ্রীনাথ ভাল জায়গায় দিয়াছে, সংসারে তাহার নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ধারা সদাসর্ব্বদা প্রবাহিত। সে সুখী। কিন্তু সে মানুষ। মানুষ মরিবেই। সেও মরিবে। ঐ রকমভাবে তাহার মেদবহুল দেহও একদিন ভস্মীভূত হইবে। কিন্তু থাকুক ওসব কথা—অর্থহীন কথা, ওসব ভাবিয়া কি লাভ? মৃত্যু যেদিন আসিবার আসিবেই, যখন আসিবে, তখন না হয় সে বিষয়ে ভাবা যাইবে। কিন্তু তবুও—মৃত্যুর কথা মনে পড়িলেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠে।

শ্রীনাথের ঘুম পায়। চাদরটা দেহে জড়াইয়া সে তক্তাপোশের উপর গড়াইয়া পড়িল। ভাগীরথীর জলকল্লোলধ্বনি ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া আসে—ঘুম আসিতেছে। কিন্তু হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন একটি ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিল, শ্রীনাথ চোখ মেলিল, কিন্তু দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। কালীকে একবার ডাকিবার চেষ্টা করিয়া সে বিস্ময়ে অনুভব করিল যে, সে যেন হঠাৎ বোবা হইয়া গিয়াছে, ব্যাপার কি? শ্রীনাথ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এ রকম ব্যথা সে ইতিপূর্ব্বে আরও দুই এক বার অনুভব করিয়াছে, কিন্তু

আজকার ব্যথাটা যেন অধিকতর তীব্র। একটু পরেই আবার শ্রীনাথ পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল, নিশ্বাস সে সহজে লইতে পারিল, দৃষ্টিও পরিষ্কার হইল। সে হাসিল। ও কিছু নয়, বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত জীর্ণ দেহের একটু সাময়িক অস্বস্তিবোধ মাত্র। দূরে যেন কোথায় আবার একটি ঘুঘু ডাকিতেছে। অ—নে—ক দূ—রে। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়া সেই ডাক ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। শ্রীনাথের তাহা ভারী মিষ্ট লাগিল, এত মিষ্ট যে শুনিতে শুনিতে রক্তের স্রোতে নামে মন্থরতা, একটা অন্ধকার বিস্মৃতি যেন মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঘনাইয়া আসে, ঘুম পায়—ঘুম।

চিতাটা জ্বলিতেছে। দাউদাউ করিয়া। উত্তরের ক্রমবর্দ্ধমান ঠাণ্ডা বাতাসে দগ্ধ নরমাংসের দুর্গন্ধ।

ফিরিবার পথে নীলকান্ত আর একবার মতিকে দেখিতে চেষ্টা করিল। মতির বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে দেখিল যে, বাহিরে কেহই নাই। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া, একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া সে ডাকিল, মতি।

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

নীলকান্ত আবার ডাকিল, কণ্ঠস্বর এবার একটু উচ্চ করিল, মতি, মতি!

মিহি সুরের একটি ক্ষুদ্র উত্তর ভাসিয়া আসিল, উঁ।

নীলকান্তের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা অতিরিক্ত মাত্রায় ধুকধুক করিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে মতি বাহির হইয়া আসিল, দাওয়ার উপরে একটি বাঁশের খুঁটি ধরিয়া হাসিল।

নীলকান্ত হঠাৎ যেন আর কথা খুঁজিয়া পায় না। সারা রাস্তা ধরিয়া সে অনেক কথাই মনে মনে আওড়াইয়া ঠিক করিয়াছিল, অনেক মিষ্টি কথা, বড় বড় কথা, যাত্রার বইয়ের নায়কদের মত উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছন্দোযুক্ত কথা; কিন্তু মতির সহিত মুখামুখী দাঁড়াইয়াই সে কথাগুলি আর মুখ দিয়া বাহির হইল না, মনের নিভৃততম প্রদেশে হারাইয়া গেল। নিঃশব্দে শুধু সে মতিকে দেখিতে লাগিল। সকালবেলার কমলা দেবীর

শাড়িটি সে এখন পরিয়াছে। মৃতা কমলা দেবী। কমলা দেবী কি মতির মধ্যে বাঁচিল? মুখখানিকে মতি বেশ ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়াছে, মাথার ভারী খোঁপাতে দুই তিনটি করবীফুল গুঁজিয়া কানে রূপার দুল পরিয়াছে, স্বাস্থ্যের একটি কমনীয় দীপ্তি ঝকঝক করিতেছে তাহার সারা দেহে, ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটিতে একটি অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা। নীলকান্তের মনে আবার নেশার ছোঁয়াচ লাগে।

মতি নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, ডাকলে কেনে বাবু?

নীলকান্ত মতির প্রশ্নে হঠাৎ কথা খুঁজিয়া পায়, বারো বৎসর আগেকার শোনা একটি যাত্রার বইয়ের নায়কের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সে উত্তর দিল, তোকে দেখব ব'লে।

মতি একটুও চঞ্চল হইল না, শুধু একটু হাসিয়া বলিল, দেখ তবে।

নীলকান্তের কথা তখনও শেষ হয় নাই, হারানো কথাগুলি আবার সে খুঁজিয়া পাইয়াছে, তোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মতি।

মতি নিরুত্তরে আবার হাসিল, কৌতুকভরা দৃষ্টি মেলিয়া নীলকান্তের দিকে চাহিল।

মতি, তোকে আমি ভালবাসি।—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া নীলকান্ত অনুভব করিল যে, তাহার বুকটা অনেক হালকা হইয়া গিয়াছে।

মতি এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেন যে সে হাসিতেছে, তাহা নীলকান্ত বুঝিতে পারে না। ভালবাসার কথায় হাসিবার কি আছে?

আঁচলে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে হাসিতে মতি বলিল, তা তো জানি, কতবার তো ও কথা বলেছ গো ছোটবাবু, কিন্তু অত ভয়ে ভয়ে, কাঁদ-কাঁদ সুরে বলছ কেনে বল তো? উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ সামলাইতে সামলাইতে মতি হঠাৎ দৌড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

নীলকান্তের সব অদ্ভুত লাগিল। মতি হাসিল কেন, ভিতরে দৌড়াইয়াই বা গেল কেন? কিন্তু মনে মনে সে এবার হঠাৎ লজ্জিতও হইল। সে বড় ভাবপ্রবণ, তাহার উচ্ছ্বাসের মাত্রাজ্ঞান নাই; তাহা ছাড়া মতিকে ভালবাসা জানাইয়া এবং মতির ভালবাসা পাইয়াই বা

তাহার কতদিন চলিবে? মতি চণ্ডালকন্যা, তাহাকে তো সে বিবাহ করিতে পারিবে না, চিরদিনের জন্য পাইবে না। মতির বয়স হইয়াছে, আর কিছুদিন পরেই কোনও একটি অপরিচিত চণ্ডাল-যুবকের গৃহে গিয়া সে সংসার পাতিবে, তাহাকে ভালবাসিতে শিখিবে, সন্তানের জননী হইবে, সময়ের বিবর্ত্তনে ঈশানপুরের মশানের বাসিন্দা নীলকান্তের ভালবাসার কথা ভুলিয়া যাইবে। সুতরাং এ থাকুক, অবিশ্বাসী মনকে প্রশ্রয় দিয়া লাভ নাই, যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহকে উত্তেজিত করিয়া ফল নাই, তাহার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন একটানা তরঙ্গকে ক্ষণিক ঝড়ের দোলায় বিক্ষুব্ধ করার ইতি হউক, শান্তি আসুক। তৃণখণ্ডের স্রোতমুখে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই—না।

মতি ঘর হইতে আবার আসিল, এখন তাহার হাসি থামিয়াছে, চোখে মুখে নামিয়াছে গাম্ভীর্য্যের অন্ধকার। নীচে নামিয়া, নীলকান্তের একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ফিসফিস করিয়া সে বলিল, তুমি আমায় ভালবাস বলছিলে, না ছোটবাবু?

নীলকান্ত নিরুত্তরে মতির দিকে চাহিয়া শুধু মাথা নাড়িল। মাথা নাড়িতে গিয়া সে হঠাৎ লক্ষ্য করিল যে, মতির চোখের কোণে কি যেন চকচক করিতেছে! মতি কি কাঁদিতেছে? কিন্তু সে তো হাসিতেছিল! তবে? বিস্মিত হইয়া নীলকান্ত মতির চোখের দিকে ভাল করিয়া চাহিল। মতির চোখে কি যেন একটা দুর্ব্বোধ্য ভাষা, একটা কঠিন কটাক্ষ। মতি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

ম্লান হাসিয়া মতি বলিল, বেশ, তা তো ভাল কথা, কিন্তু এবার তুমি বাড়ি যাও ছোটবাবু, লতুন মড়া ঘাটে এয়েছে, না গেলে বড়কত্তা রাগ করবেন।

নীলকান্ত আর কিছু বলিবার মত খুঁজিয়া পায় না, তা হ'লে যাই?

হ্যাঁ, এস।

সূর্য্যের আলো কালীর বাড়ির চালার উপর দিয়া পশ্চাতের জামরুল-গাছটার উপর পড়িয়াছে। ম্লান আলো।

উঠানের করবীগাছটার পাশে দাঁড়াইয়া মতি নীলকান্তের গমন-পথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। মৃদু বায়ুবেগে স্বল্প-কম্পিত

কচি পাতার মত তাহার পাতলা ঠোঁট দুইটি কেন যে একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহা সেই জানে।

নীলকান্ত শ্মশানে পৌঁছাইয়া দেখিল যে, শ্রীনাথ বাহিরের তক্তা-পোশের উপর ঘুমাইতেছে। নিজের ঘরে গিয়া সে একটি বিড়ি ধরাইল।

বাহিরে চিতা জ্বলিতেছে। লোকগুলি ও ছোকরারা গল্পগুজব করিতেছে, কালী বাঁশ হাতে চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সূর্য্য অস্তপ্রায়।

কি ভাবছ ছোটকত্তা?—ভোলা আসিয়া দাঁত মেলিয়া হাসিল।

তোর মাথা।

হিঃ হিঃ হিঃ—ভোলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মতির হাসি—দুর্ব্বোধ্য।

ক্ষেতের কাজ হয়ে গেছে ভোলা?

হিঁ। একটু থামিয়া, গলাটা নামাইয়া বিনীতভাবে ভোলা বলিল, একটো বিড়ি দাও না ছোটবাবু।

নীলকান্ত হাসিয়া তাহাকে একটি বিড়ি দিল। এই বয়সেই ভোলা বেশ ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে, বিড়িটা ধরাইয়া কয়েক টানেই সে তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ভোলা হঠাৎ বলিল, হৈগো, বড়কত্তাকে জাগাবে না, সাঁঝ হয়ে এল যে?

ঠিক বলেছিস রে।

নীলকান্ত উঠিয়া শ্রীনাথের নিকট গেল।

কাকাবাবু, কাকাবাবু!

শ্রীনাথ জাগিল না। নীলকান্ত গলা চড়াইল, তবু শ্রীনাথ কোনও সাড়াশব্দ দিল না।

নীলকান্ত একটু বিরক্ত হইয়া শ্রীনাথের পায়ে হাত দিয়া ঝাঁকানি দিল, কিন্তু তাহাতেও সে নড়িল না। তাহার পা শক্ত, শীতল। ব্যাপার কি?

কালী, কালী, শিগগির এস তো।

যাই।

ভোলা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কি হয়েছে গো ছোটবাবু?

নীলকান্ত নিরুত্তরে শ্রীনাথের নাড়ী পরীক্ষা করিল, কিন্তু ক্ষীণমাত্র স্পন্দনও সে অনুভব করিল না, হাতটি ছাড়িয়া দিবামাত্রই শুষ্ক ও ভারী কাষ্ঠখণ্ডের মত তাহা একপাশে পড়িয়া গেল।

কি হ'ল?—কালী আসিয়া প্রশ্ন করিল।

নীলকান্তের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে, সে শ্রীনাথকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিল।

কালী শ্রীনাথের দেহ স্পর্শ করিয়া, তাহার বুকে একবার হাত রাখিয়া, পরমুহূর্তেই তাহা উঠাইয়া লইয়া নীলকান্তের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া বলিল, কত্তা ম'রে গেছে।

নীরস কণ্ঠে নীলকান্ত বলিল, ঠিক?

হুঁ, ঘণ্টাখানিকের বেশি হবে, মারা গেছে। শরীল দেখছ নি, ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে?

নীলকান্ত ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। হাঁ, শ্রীনাথ মারা গিয়াছে। কমলা দেবী, সুরেন্দ্রমোহন রায়, শ্রীনাথ মুখুজ্জে—তারপর?

সময় কাটিতে লাগিল।

অবশেষে পশ্চিম আকাশের সাদা মেঘে আগুন ধরাইয়া দিয়া, পশ্চিমের জলরাশিকে সোনালী করিয়া, লাল থালার মত বড় সূর্য্য অস্ত গেল। সূর্য্য অস্ত গেল, আর ধোঁয়ার মত অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাত্রি আসিল।

শ্মশানে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমিয়া গেল। শ্রীনাথের বউ, ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনী, নবীন গাঙুলি ও পাড়ার লোকেরা প্রায় সকলেই আসিল, কেবল ব্রজেশ্বর আসিল না। শ্রীনাথ কবে কি করিয়াছিল, কবে কি বলিয়াছিল, কত ভাল লোক ছিল সে, তাহার কতগুণ ছিল—এই সব কথা লইয়া তাহার আত্মীয়স্বজনেরা উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল। শ্মশান মুখর হইয়া উঠিল।

নীলকান্ত কিন্তু কাঁদিল না। মানুষ মরিলে কাঁদিয়া কি লাভ?

ওদিকে সুরেন্দ্রমোহনের চিতা নিবিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক কাটিল।

শ্রীনাথের দেহ চিতায় চড়ানো হইল। শ্মশানের ভিড় কমিল।

ঘণ্টা আড়াই পরে শ্রীনাথের দেহ তো নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চিতা নিবাইয়া স্নান শেষ করিয়া সকলে বাড়ি ফিরিয়া গেল। শ্মশানের বুকে আবার নিস্তব্ধতার রাজ্য ঘনাইয়া আসিল। ভাগীরথীর একটানা স্রোত-ধ্বনি সেই স্তব্ধতাকে আরও নিবিড় করিয়া তুলে। নীলকান্তও স্নান করিয়াছিল, শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া সে উনুন ধরাইয়া হাঁড়ি চাপাইয়া দিল। শ্রীনাথের আত্মীয়েরা আজ শোকভারে অনাহারেই থাকিবে, কিন্তু শ্রীনাথ নীলকান্তের কে? শ্রীনাথের সাহায্যের জন্য সে কৃতজ্ঞ, তাহার মৃত্যুতে সে দুঃখিতও হইয়াছে বইকি, তাহা কি যথেষ্ট নয়?

কালী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এবার দরজার সামনে আসিয়া বসিল। একমনে কি যেন সে ভাবিতেছে।

দূরে শ্মশানকালীর মন্দিরে আরতি হইতেছে। ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। তান্ত্রিক আরতি করিতেছে।

কি ভাবছ কালী?

কত্তার কথা।

ওঃ।

বড় ভাল লোক ছিল তিনি।

ভাল লোক! হ্যাঁ, মানুষের নিন্দে করতে নেই, তা তিনি ছিলেন।

কালী আর কথা বলিল না।

বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

কালী উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললে কালী?

হ্যাঁ, খেতে যাই।

বেশ।

কালী চলিয়া গেল। ভাগীরথীর বুকে শীতের কুয়াশা জমিতেছে। হাঁড়ির জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, নীলকান্ত তাহাতে চাল

ছাড়িয়া দিল। বাহিরে ঝিঁঝি পোকাদের ঐকতান আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীনাথ মরিয়াছে। কিন্তু তাহাতে চিন্তিত হইবার, আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? সব মানুষই মরিবে। নীলকান্তও। হয়তো শ্রীনাথের মতই অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে। এই শ্মশানের বুকে তাহার ভস্ম হয়তো বর্ষাকাল পর্য্যন্ত উড়িয়া বেড়াইবে। এই শ্মশানেই? কিন্তু কেন? মৃত্যু তো আসিবেই, তাই বলিয়া সে এইখানেই মরিবে কেন? যন্ত্রের মত ক্লান্তিকর জীবনের একঘেয়ে কাজগুলি করিয়া এইখানেই সে কেন নিশ্চিহ্ন হইবে? পৃথিবী বিরাট, তাহাতে কত মানুষ, কত ঐশ্বর্য্য, সে সমস্ত কি সে দেখিবে না? এই অজ্ঞাত অখ্যাত শ্মশানের এক কোণেই পড়িয়া থাকিবে? গাছের মত অসংখ্য শিকড় মেলিয়া একই জায়গার মৃত্তিকা আঁকড়াইয়া থাকিবে? সে তো মানুষের মত বাঁচিয়া নাই। মানুষ বিবাহ করে, সংসার করে, ভোগ করে, ভালবাসে, পরিপূর্ণ করে, আবার অজস্রভাবে নিজেকে বিলাইয়া দেয়। তাহাই তো জীবন। সেই জীবনের আস্বাদগ্রহণে সে কি বঞ্চিত থাকিবে? না। নিতান্ত দুর্ভাগার মত দিনের পর দিন এমনই ভাবে কাটাইয়া সে কি তাহার যৌবনকে ক্ষয় করিবে, তিলে তিলে তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য মৃত্যুকে অবাধ সুযোগ দিবে? না—না।

নীলকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। চাদরটা ভাল করিয়া দেহে জড়াইয়া লইয়া, ভাঙা তোরঙ্গটা খুলিয়া সঞ্চিত যাহা কিছু টাকাপয়সা ছিল, তাহা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হাঁড়িতে তখন চাল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফেনা গড়াইয়া পড়িতেছে।

উত্তর দিকের পথটা ধরিয়া সে বাজারের রাস্তা ধরিল। চলিতে চলিতে সে ভাবিতে থাকে। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, দপদপ করিতেছে। কোথায় যাইবে সে? ওপারে শহরে চলিয়া যাইবে? কিন্তু যাইয়া কি করিবে? সেখানে তাহাকে চেনে কে আর কিই বা তাহার সম্বল আছে? মানুষের মত জীবন চাহিলে, সংসার চাহিলে, যে মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাহা তো তাহার নাই। পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছেই, কিন্তু তাহার জন্য তাহা হয়তো নহে। ঈশানপুরের

শ্মশানে সে যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়াছে, অন্যত্রও যে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহা সে চায় না। সে চায় মানুষের ভালবাসা, নারীর প্রেম। নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়ের অদৃষ্টে কি তাহা জুটিবে? কি দরকার তাহার অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার? পশ্চাতে ফেলিয়া আসা ঐ শ্মশানে তো তাহাকে সকলেই ভালবাসে। কালী ভালবাসে, ভোলা ভালবাসে। কেষ্ট, গজানন, হাবলু—তাহার বন্ধুরা, হোক না কেন তাহারা লম্পট ও গেঁজেল, তবু তাহারা তো তাহাকে ভালবাসে। আর মতি? মতিও তাহাকে ভালবাসে বইকি, মুখে না বলিলেও কি মনের ভাব বোঝা যায় না? হোক সে চণ্ডালকন্যা, তবুও সে নারী, তাহার বক্ষে প্রেমের উত্তাপ আছে; ভালবাসা কি, সে তাহা জানে। নূতন করিয়া আশ্রয় খুঁজিবার, ভালবাসার মানুষ খুঁজিবার কি দরকার? মতিকেই তো সে বিবাহ করিতে পারে। শ্মশানবাসীর সমাজের কোনও প্রয়োজন নাই, ভয়ও নাই। নীলকান্ত থামিল। অসংখ্য অদৃশ্য বাহু মেলিয়া ঈশানপুরের মশান তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, আহ্বান করিতেছে, তাহার আর চলিবার শক্তি নাই, কোথায় যাইবে সে? সে আমরণ ঐখানকার। এক জায়গার গাছ তো অন্য জায়গায় সহজে বাঁচে না। তাহাকে ফিরিতেই হইবে।

নীলকান্ত দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। শীতের মধ্যেও সে ঘামিয়া উঠিয়াছে।

দূরবর্ত্তী জঙ্গলের একদল শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল।

নীলকান্ত সোজা কালীর বাড়ি গেল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়সংবদ্ধ, ললাট রেখাসঙ্কুল।

সে ডাকিল, কালী।

উঠানের করবীগাছে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।

মতি প্রদীপহস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, নীলকান্তকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, বলিল, কি চাই ছোটবাবু?

তোর বাবা কোথায়?

বাবা খেয়ে বাজারে গেছে, বোধ হয় মদ গিলতে।

হুঁ।

কি চাই, বল না?

নীলকান্ত স্থির দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, আর ভোলা কই?

সে তো খেয়ে তোমার ওখানেই গেছে।

বেশ।

বেশ! কি জন্যে এয়েছ, বল না কেনে?

নীলকান্ত নিঃশব্দে মতির দিকে অগ্রসর হইল। মতি একটু ভয় পায়, নীলকান্তকে প্রকৃতিস্থ মনে হইতেছে না, আর রাত্রিও তো বাড়িতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ সে আসিল কেন?

মতি!

ভয়ে ভয়ে মতি উত্তর দিল, উঁ?

তুই আমায় ভালবাসিস?

মতি মাথা নীচু করিল।

নীলকান্ত কঠিন কণ্ঠে বলিল, কথার জবাব দে মতি, এবার হাসলে চলবে না।

মতি মাথা নাড়িল, হাঁ। রাজ্যের লজ্জা যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে মূক ও অবশ করিয়া তুলিল।

একটু গলা নামাইয়া নীলকান্ত বলিল, আচ্ছা মতি, আমায় বিয়ে করবি?

মতি চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল, বিস্ময়ে তাহার ডাগর চোখের কালো তারাগুলি আরও কালো, আরও বড় হইয়া উঠিল, হাতের প্রদীপটা কাঁপিতে লাগিল।

বল না মতি, বিয়ে করবি?

মতির হাতের প্রদীপ পড়িয়া গেল, মুহূর্ত্তে সব অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারে মতির একান্ত সন্নিকটে গিয়া, তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া নীলকান্ত প্রশ্ন করিল, বলবি না?

মতির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর দিল, তুমি কি ঠাট্টা করছ ছোটবাবু?

ঠাট্টা! না না।

মতি হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া নীলকান্তের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল, নীলকান্ত অনুভব করিল যে, মতি চাপা গলায় কাঁদিতেছে। নিঃশব্দে সে দাঁড়াইয়া রহিল, মতির কান্না আর থামিতে চায় না। আর মতি কাঁদিবেই বা না কেন? সুখস্বপ্ন সত্য হইলে মানুষ হাসিতে পারে না, অত্যধিক আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলে। ভাল, মতি কাঁদুক। ভালভাবে আগুন জ্বলিবার পূর্ব্বে একটু ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়ই।

মতি!

উঁ?

আর কাঁদিস না।

না।

পা ছেড়ে দে তবে।

মতি উঠিয়া দাঁড়াইল।

তোর বাবা এলে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিস, আজই তাকে আমি বিয়ের কথা বলব।

মতি হঠাৎ আকুলভাবে নীলকান্তের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল—নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

ঘরে ঢুকিতেই ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় গিছলে গো ছোট-বাবু? ভাত পুড়ে যে ছাই হয়ে গেল।

তাই নাকি রে?

হিঁ।

ঘরের ভিতর সত্যই পোড়া ভাতের গন্ধ। হাঁড়িটা সে নামাইয়া রাখিল, আজ আর রাঁধিবে না, ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে।

আর রাঁধবে না ছোটবাবু?

না।

না খেয়ে থাকবে?

হ্যাঁ রে।

ভোলা অবাক হইয়া গেল। ছোটবাবু না খাইয়া কি করিয়া থাকিবে? তাহার তো ক্ষুধা পাইলে ভারী কষ্ট হয়।

পকেট হইতে কিছু পয়সা বাহির করিয়া নীলকান্ত বলিল, একটা কাজ করবি ভোলা ?

কি ?

বনমালীর দোকান থেকে দৌড়ে এক পাত্তর মদ আর দু পয়সার ফুলুরি নিয়ে আয় তো। আমার নাম বললে বেশি দেবে, বুঝলি ?

ভোলা দৌড়াইতে দৌড়াইতে দাঁত বাহির করিয়া বলিল, হিঁ গো।

একটা বিড়ি ধরাইয়া বিছানাটা পাতিয়া নীলকান্ত বসিল। মাথাটা এতক্ষণে হালকা হইয়া গিয়াছে, এতদিনকার দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তিবোধের সমাপ্তি ঘটিয়াছে ; সে এইখানেই থাকিবে। এই ভাল। কালই সে থানার দারোগার চিঠি লইয়া সদরে গিয়া দেখা করিবে, শ্রীনাথের কাজটি চাহিয়া লইবে। তাহা হইলে সে মোট পনরো টাকা পাইবে, আর শ্রীনাথের দোকানের জন্য তাহার ছেলেরা যদি কিছু দেয়, তবে মোট দাঁড়াইবে কুড়ি টাকার কাছাকাছি। তাহা তাহাদের দুইজনের পক্ষে যথেষ্ট, আর তাহা যদি না হয়, তবে কালীর জমিতে চাষের কাজ করিবে। তাহার পিতাও যে চাষা ছিল, অধিকারী সে কথা একদিন তাহাকে বলিয়াছিল।

লাও ছোটবাবু।—ভোলা ফিরিয়া আসিয়াছে।

নীলকান্ত তাহাকে কয়েকটি ফুলুরি দিয়া নিজেও একটি মুখে দিল।

ফুলুরি চিবাইতে চিবাইতে মিহি স্বরে ভোলা বলিল, ছোটবাবু !

অ্যাঁ ?

আমারেও টুকুস দেবে ?

কি দোব রে ?

মদ।

পালা পাজী কোথাকার।

দাও না।

না না, ছেলেমানুষরা এসব খায় না।

আমি বুঝি ছেলেমানুষ ! বাঃ রে, আমি তো প্রায়ই খাই, সেদিন দেখ নি, বাবা নিজে আমায় দিলে ?

আচ্ছা, নে তবে। অত যুক্তিতর্কের পর না দিলে চলে না।

যতটুকু পাইল, তাহাই ভোলা পরম পরিতৃপ্তির সহিত এক চুমুকে নিঃশেষ করিল।

নীলকান্ত তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, ভারী ভাল লাগে, না ?

হ্যাঁ। ভোলার চক্ষু জলজলে হইয়া উঠিয়াছে।

তোর বাবা কি বনমালীর ওখানেই রে ?

হিঁ।

কি করছে ?

মদ খাচ্ছে আর তাস খেলছে।

দূর হইতে ধ্বনি ভাসিয়া আসিল—বল হরি হরিবোল।

ঐ একটা আসছে। ভোলা, তুই একলাই কাঠ ব'য়ে নামাতে পারবি তো ?

নিশ্চয়। ভোলা বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। সে শক্তিশালী।

বল হরি হরিবোল—ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইল। কে মরিয়াছে ? আজ অনেকগুলি মরিল, বহুদিন এত মড়া আসে নাই।

খানিক পরে শব লইয়া একদল আসিয়া পৌঁছাইল।

নীলকান্ত খাতা খুলিয়া বসিল, মদ খাওয়া তখন আর হইল না।

একজন বৃদ্ধ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কে মরেছে ?

অনুকূল শীল।

হুঁ, বয়েস কত ?

পঁয়ত্রিশ।

কোন্ রোগে মারা গেল ?

যক্ষ্মা।

গ্রাম ?

সোনাকান্দা।

নীলকান্ত সব লিখিল।

হ্যাঁ, ক মণ কাঠ চাই ?

আট মণ।

ভোলা কাঠ ওজন করিতে লাগিল।

অনুকূল শীলের দশ বৎসরের ছেলেটি ডুকরাইয়া কাঁদিতেছে।

বৃদ্ধ লোকটি সান্ত্বনা দেয়, কেঁদো না দাদু, বাবা তো সগ্‌গে গেছেন।

ছেলেটি থামে না।

বসন্তের দাগে বিকৃতমুখ, খর্ব্বনাসা একজন লোক আসিয়া নীলকান্তকে বলিল, বড় শীত পড়েছে মশাই, না?

হুঁ।

ইস, এই শীতের মধ্যে ঘোড়ার ডিম চান করতে হবে আবার, হ্যা।

নীলকান্ত মৃদু হসিল।

ভগবানের মার মশাই, ভগবানের মার, কেন রে বাপু, অনুকূল যদি দিনে মরত, তাতে কি ক্ষতিটা হ'ত?

এই অভিযোগের উত্তরে নীলকান্ত কি বলিবে?

এদিক ওদিক চাহিয়া এতক্ষণে লোকটি আসল কথা পাড়িল, মশায়, একটা বিড়ি দেবেন? সাততাড়াতাড়িতে শালার বিড়িগুলো ফেলে এসেছি, আর ইদিকে শীতে জ'মে যাচ্ছি। উঃ।

নিন না। নীলকান্ত তাহাকে বিড়ি ও দেশলাই দিল। লোকটি বিড়ি টানিতে টানিতে নীচে নামিয়া গেল।

সময় কাটিতে লাগিল।

শবকে চিতায় শায়িত করা হইল। মুখাগ্নি করিতে গিয়া কঙ্কালসার মৃত পিতার স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখিয়া ছোট ছেলেটি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চিতাটি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নীলকান্ত কাঠের হিসাব লিখিতে বসিল। শ্রীনাথের চিতায় আট মণ কাঠ লাগিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ দেয় নাই। শ্রীনাথের হয়তো মরিয়া দুঃখ হইতেছে, কারণ এই আট মণ কাঠে তাহার লাভ কিছুই হয় নাই।

ঘরের ভিতর দীর্ঘ ছায়া পড়িল। তান্ত্রিক আসিয়াছে।

জয় মা করালবদনে।

নীলকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, বসুন ঠাকুর মশাই।

না, বসব না। হ্যাঁ, নীলকান্ত!

বলুন।

শ্রীনাথ মারা গেছে, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অথচ সে দুপুরে বেঁচে ছিল।

নীলকান্ত হাসিল, মরবার আগে তো সকলেই বেঁচে থাকে।

তান্ত্রিক তাহার ঘোর রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি তীক্ষ্ণ করিয়া মাথা নাড়িল। নিস্তব্ধ পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত ঘরের মধ্যে, ম্লান দীপালোকে তান্ত্রিকের দীপ্ত চক্ষু যেন হঠাৎ রহস্যময়ভাবে ভয়াবহ মনে হয়; রক্তবস্ত্রপরিহিত, পিঙ্গলজটাজুটধারী, শীর্ণ ও দীর্ঘকায় তান্ত্রিকের অবস্থিতি যেন একটি অদৃশ্য প্রেতলোকের সৃষ্টি করে। নীলকান্তের বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

তান্ত্রিক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, সে কথা আমি জানি, আমিও তাই বলেছি। আমার কথার অর্থ এই যে, জীবন অনিশ্চিত।

ওঃ।

নীলকান্তের নিকটে আসিয়া ফিসফিস করিয়া তান্ত্রিক বলিল, হ্যাঁ, জীবন অনিশ্চিত, কিন্তু তাই ব'লে নিশ্চিত কিছুই যে এ সংসারে নেই, তা বলছি না; কিছু আছে, সেইটি জানার জন্যেই আমার সাধনা—মাতৃ-সাধনা।

নীলকান্ত অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, যেদিন জানবেন, আমায় তা বলবেন ঠাকুর মশাই।

তান্ত্রিক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের মনে বলিতে লাগিল, ঘোর অমানিশায় মায়ের শেষ সাধনা একদিন করব—তপ্ত রক্ত দিয়ে, নরমাংস দিয়ে দেখব সেদিন, সেই নিশ্চিতের সন্ধান মা দেন কি না।—বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধদিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বিড়-বিড় করিয়া নিজের মনে কি যেন বলিতে বলিতে তান্ত্রিক দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চললেন?—নীলকান্ত প্রশ্ন করিল।

অন্ধকারে তান্ত্রিকের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, হ্যাঁ।

নিঃশব্দ রাত্রির বাতাসে বড় একটি ঘণ্টাধ্বনি যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে মিলাইয়া যায়, তান্ত্রিকের কণ্ঠস্বরও নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে একটি স্পন্দন তুলিয়া তেমনই ভাবে মিলাইয়া গেল।

নীলকান্ত হাসিল। পাগল, বদ্ধ পাগল ঐ তান্ত্রিক। জীবনের পরে কি আছে না আছে, তাহা জানিবার চেষ্টায় কি লাভ? এই জীবনকে জানিলেই যথেষ্ট, হোক তা অনিশ্চিত।

বাহিরে ছোট ছেলেটির কান্না থামিয়াছে, বোধ হয় দাদুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চিতাটা জ্বলিতেছে দাউদাউ করিয়া। কমলা দেবী, সুরেন্দ্রমোহন রায়, শ্রীনাথ মুখুজ্জে, অনুকূল শীল, তারপর? ভোলা চিতার অদূরে বসিয়া আছে। ঊর্দ্ধমুখী চিতাগ্নি-শিখার বিসর্পিল নৃত্য-ভঙ্গিতে জমাট অন্ধকার কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। ভাগীরথীর মৃদু কল্লোলধ্বনি, শীতের রাত্রির পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা। হাঁ, জীবন অনিশ্চিত। তান্ত্রিক ঠিক বলিয়াছে, ঐ নক্ষত্রহীন অন্ধকার মৌন আকাশের বুক হইতে হয়তো এই মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যতক্ষণ মৃত্যু না আসে, ততক্ষণ সে জীবনকে ভোগ করিবে, সংসার গড়িবে শ্মশানের মধ্যে, তাহার সন্তানদের মধ্যে নিজের ক্ষয়িষ্ণু যৌবন ও জীবনকে নবীন বেশে মূর্ত্ত করিয়া যাইবে। মতি, মতি, মতি। বেশ নামটি।

ফুলুরি চিবাইতে চিবাইতে নীলকান্ত মদের পাত্রে চুমুক দিল; গলাটা, বুকটা একটা তীব্র জ্বালাময় তিক্ততায় জ্বলিয়া উঠিল, মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরিয়া গেল, মস্‌লিনের মত পাতলা একটা পর্দ্দা যেন দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নীলকান্ত হাসিয়া বলিল, আঃ।

বাহিরে মৃত ক্ষয়রোগীর পোকায়-খাওয়া মাথাটা সশব্দে ফাটিয়া গেল।

শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ

নর্ত্তকী ব্যকা বন*

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়—
তাই নয় শুধু, সুধাকান্ত
মেঘের অন্তরালে মেঘনাদ বাণ চালে,
এ কথা কেই বা বল জানত।

জানলেও মানত কি, নব্যরা শান্ত কি?
অশান্ত তাহাদের পক্ষ
নানাকাশে পাক খায়, নাব্যিক ধাক্কায়
ব্যাকরণ করিও না লক্ষ্য।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়—
দরজাটা সদর, না খিড়কি,
টিটকারি-টঙ্কারে যেন বীণা ঝঙ্কারে,
শোনা যায় পরিচিত মীড় কি?

এই মধু রিনিঝিনি কঙ্কণ-কিনিকিনি
শুনেছিনু কবে কোন্ গীতিকায়,
আকুলিয়া মন প্রাণ কে যেন গেয়েছে গান
পূরবীতে ঘন বনবীথিকায়!

একদা যে ছন্দের গভীর আনন্দের
ঘন রসে চিত ছিল স্তব্ধ—
হয়তো হতেছে ভুল, সুধাকান্তীয় হুল
করেছে বুদ্ধি-মূল বিদ্ধ।

* উল্টাইলে "নব কাব্যকীর্ত্তন"—আশ্বিনের 'ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়—
গুরু গুরু গরজন, তাই তো!
চমকায় বিদ্যুৎ, ছন্দের নাই খুঁত,
দেখা যায় ঠিক রোশনাই তো।

নহে চিত্ত সুস্থির, নানাবিধ কুস্তির
আখড়া যে বীণাপাণি-কুঞ্জ—
গণ্ড ও গোল তায় ভীমরুল বোলতায়
বিদূরিত করে অলিপুঞ্জ।

কেউ নয় দমবার, শব্দের সম্ভার
সুতরাং শূন্যেরে কম্পায়,
শেষটায় রাগ করি বখরায় ভাগ করি
লাভ করে কলা—মানে রম্ভায়।

অর্থটি করি গ্রাস গভীর জলেতে বাস
করে যত নব কবি-নক্র,
শব্দ শুনিয়া যাও, অর্থটি যদি চাও,
অমনি তুলিবে তারা চক্র।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়—
বড় বেশি মনোহর কান্তি,
বাষ্পের অলকায় বিদ্যুৎ ঝলকায়—
এ কি মায়া সত্য, না ভ্রান্তি!

শক্ত এ চিপিটক! ওই জলপিপি বক,
জিরাফ সে শালগম-গন্ধী—
বাদুড়ের পিত্তির নব নব কীর্তির
ইতিহাস আনে অনুসন্ধি।

কিড্ হই ক্রোম হই, শব্দ যে ব্রহ্মই—
স্বীকার করিয়ে তারা ছাড়ছে;
শামুকেরা জেব্রার প্রেমে হয় জেরবার,
ইড়া এসে পিঙ্গলা নাড়ছে।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়—
গরজনে মাধুরীর ধুম কি!—
ছন্দের নিক্কণ, চারু বাণী চিক্কণ,
লগুড়েতে বড় বেশি চুমকি।

মিছে এই প্রাণপণ সেতারের টানটোন,
চলবে না বোলচাল তবলার,
লাঠি চাই সোঁটা চাই, সরু নয় মোটা চাই,
চামড়ার শিল্পীরা 'কব্লার'।

বোঝে না অনুপ্রাস, কেবল তনু-ত্রাস
মানে তারা, জানে রীতি বস্তর;
বাকি সব নস্যাৎ করিবে অকস্মাৎ—
তানবিক দানবিক দস্তর।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়—
মনে হয় হবে মধুবৃষ্টি,
কিন্তু তা দেখে হায়, বর্ষাতি দেবে গায়—
আধুনিক কাব্যের কৃষ্টি।

"বনফুল"

বন্ধনী

জীবন—এবং ইহাদেরও।

প্রাগৈতিহাসিক নয়, উত্তর-ঐতিহাসিক। ইতিহাসের প্রথম পর্বে ইহারা হয়তো বা অন্ধকারের নিভৃত অন্তরালেই লুকাইয়া ছিল, কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সকলের চোখের সামনে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়াছে। মহানগরীর উদ্ধত ঐশ্বর্য এবং উৎসবের বাহিরে ইহাদের জীবন সভ্যতার দেহে একটা রক্তাক্ত ক্ষতের মত জাগিয়া আছে, চাহিয়া দেখিলেও ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় শিহরিয়া উঠিতে হয়, এবং সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ইহাদেরও সংসার আছে। ঠিক স্বাভাবিক সম্পর্কের দিক হইতে সে সংসার গড়িয়া তোলা নয়, স্নেহ-প্রীতির কথা সেখানে ভাবিতে গেলেও ভুল হইবে। ইহারা ব্যবসায়ের অংশীদার, কাহাকে ছাড়িয়া কাহারও চলে না। মধ্যে মধ্যে লাভের ভাগ লইয়া বিরোধ চলে, অশ্লীল ভাষার গালাগালি মাত্রা ছাড়াইয়া পর্দায় পর্দায় উঠিতে থাকে, হঠাৎ মনে হয়, এ ভাঙন বুঝিবা কখনও আর জোড়া লাগিবে না। কিন্তু আশ্চর্য, দশ মিনিট পরেই সে কথা আর কাহারও মনে থাকে না, জীবনধারণের একমাত্র প্রশ্নটাই আনুষঙ্গিকগুলিকে অনেককাল আগে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে।

সংখ্যায় তিনজন। একজনের বাড়ি ছাপরা, একজনের বালিয়া এবং একজনের গোরখপুর; সুতরাং সম্মিলনটা বিচিত্রই বলিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে আবার জব্বু দলপতি। কি একটা দুর্ঘটনায় একটা হাত এবং একটা পা তাহার কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, বয়সও তাহার

বেশি। সুতরাং পরিশ্রমের ভারটা প্রধানত তাহারই উপর পড়িয়াছে, এবং সেহেতু রেট তাহার দশ আনা। রামরতিয়ার বয়স যদিও ত্রিশ পার হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে কুৎসিত রোগে তাহার সর্বাঙ্গ চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে; সমস্ত মুখ শ্বেতকুষ্ঠের এলোমেলো দাগ লাগিয়া সাদায়-কালোয় বিচিত্র হইয়া আছে, দগদগে খানিকটা ঘা হইয়া একটা চোখ প্রায় গলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। তাহাকে দেখিলে লোকের সহজেই করুণার উদ্রেক হয়, তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কান্নার সুরে সে গানও গাহিতে পারে ভালই। সুতরাং তাহার প্রাপ্য চার আনা। আর কিষণ, যেহেতু তাহাকে না হইলে দলটা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাত-সাফাই করিয়া বিড়ি-টিড়ি আনিতে সে পটু, সেইজন্য তাহাকে এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। বাকি দুই আনা সেইই পায়।

সুতরাং সুসম্পূর্ণ একটি সংসার।

ভিক্ষার ব্যবসায়ে আজকাল আর সুবিধা হয় না। ভিক্ষুকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে দাতার চারগুণ, নাকী কান্নায় আজকাল আর লোকের মন ভুলিবার নয়। অথচ, দয়া থাক বা না থাক, বৈচিত্র্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রত্যেকের আছেই এবং সেই বৈচিত্র্যের সুযোগই ইহারা গ্রহণ করিয়াছে।

জব্বু সদর-রাস্তার উপর দিয়া একটা রোলারের মত গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, মাইলের পর মাইল এইভাবে পথে পথে গড়াইতে তাহার অসুবিধা হয় না। লোকটার শরীরের গাঁথনি অস্বাভাবিক শক্তই বলিতে হইবে। পথের উপর জমিয়া থাকা রাস্তা-ধোওয়া ময়লা কালো জল, পানের পিক অথবা নানা আবর্জনায় তাহার বুক পিঠ পেট ভরিয়া উঠে, কাঁকরের টুকরায় গা হাত পা ছড়িয়া রক্ত পড়ে। তবু

এসবে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। রামরতিয়া এবং কিষণ তখন দুই দিকের বাড়িগুলির দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া ভিক্ষার ভঙ্গিতে গান গায়। কি গায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু গাহিবার অর্থ বোঝা যায়। দোতলা-তেতলার বারান্দায় মেয়েদের চোখ ছলছল করিয়া আসে, এক আধটা পয়সা ইহাদের দিকে ছিটকাইয়া পড়ে।

সমস্ত বেলাটা এইভাবে পথে পথে ঘুরিয়া দুপুরবেলায় কোন একটা পার্কের ধারে অথবা গাছের ছায়ায় ইহারা বিশ্রাম করিতে বসে। কিষণ কোথা হইতে পচা পাঁউরুটির কয়েকটা টুকরা সংগ্রহ করিয়া আনে, জব্বুকে তুলিয়া বসাইয়া রামরতিয়া সযত্নে তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়। অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অর্থাৎ রকম বদলাইয়াছে শুধু; কিন্তু এ সময়ে সে সস্নেহ পরিচর্যা দেখিলে কে বলিবে, ইহাদের এই সংসারটা স্বাভাবিক নয়, গড়িয়া তোলা মাত্র!

জব্বু পরম পরিতোষ সহকারে রুটি চিবায়, পরিতৃপ্তিতে তাহার চোখ রোমন্থনরত গরুর ন্যায় বুজিয়া আসে। এত বেলায় কলের জল পাওয়া যাইবে না, এনামেলের বাটি ভরিয়া পথের পাশের হাইড্রাণ্ট হইতে উছলাইয়া ওঠা ময়লা গঙ্গাজল কিষণ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আনে। এই ফাঁকে রামরতিয়া সামনের ডাস্টবিনটা একবার খুঁজিয়া আসে।

রুটি চিবাইতে চিবাইতে জব্বু হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠে। রামরতিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, কি রে, সব রুটিগুলোই আমাকে দিলি না তো? রেখেছিস তোর জন্যে?

ডাস্টবিন খোঁজা হইতে মুখ না তুলিয়াই রামরতিয়া জবাব দেয়, না রেখেই তোকে দিতে গেলুম আর কি। তুই খা না।

জব্বু হাসে। হাসিটাকে তাহার সস্নেহ অথবা সপ্রেম দুইই বলা চলিতে পারে। কিন্তু হাসিলে কি অস্বাভাবিক কুৎসিতই না দেখায়

লোকটাকে! মুখ ভরিয়া যথেচ্ছ বাড়িয়া ওঠা লালাভ দাড়ির গুচ্ছে জট ধরিয়াছে, মাথার কাদা-মাটি মাখা পাকানো চুলের রাশ কপালের উপর পড়িয়াছে। কোটরগত হলদে চোখ আর ময়লা লাল দাঁতগুলি একসঙ্গে সেই হাসিতে এমন বিচিত্রভাবে ঝকমক করিয়া উঠে যে, বীভৎসতার সে দৃশ্য-সমন্বয় কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

জব্বু হাসিয়া বলে, সত্যি রামরতিয়া, তুই বড্ড পিয়ার করিস আমাকে। তুই না থাকলে আমার কি দশা হ'ত!

রামরতিয়া চোখ তোলে। শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্নে বিচিত্র চিতাবাঘের মত তাহার মুখখানা ব্যঙ্গে আরও বিচিত্র হইয়া উঠে, তাহার গলিয়া যাওয়া রক্তাক্ত কোটরের মধ্যে নির্জীব চোখটাও যেন কৌতুকে নাচিতে থাকে।

বলে—যা বলে, তাহার শ্লীলতা বাঁচাইয়া ভদ্র অনুবাদ করিবার উপায় নাই। মোটামুটি ভাবার্থ এই: ভাগের বেলায় তো চার আনা, আবার রস কেন এত!

অন্য সময় হইলে হয়তো ঝগড়াই বাধিয়া বসিত, কিন্তু পেট ভরা থাকায় জব্বুর মনটা এখন বিলক্ষণ ঠাণ্ডা। হা-হা করিয়া বেখাপ্পাভাবে একটা অট্টহাসি হাসে। পথের পাশে ঘুমন্ত একটা কুণ্ডলী পাকানো রোঁয়াহীন কুকুর সে হাসিতে আঁতকাইয়া উঠে, ডাস্টবিনের আশপাশ হইতে তিন চারিটা কাক কা-কা করিয়া উড়িয়া যায়।

কেন রাগ করছিস পিয়ারী? সত্যি; আমি তোকে ভারী খাপসুরত দেখি, বাস্তবিক।

পিয়ারী সংক্ষেপে উত্তর দেয়, ই—ল্লি!

ওপাশে বসিয়া কিষণ বিড়ি টানে। জব্বু মিনতি করিয়া বলে, এই, বিড়ি দে না একটা।

দেখিতে বাচ্চা হইলে কি হয়, ধানী লঙ্কায় ঝাঁজ প্রচুর।

কিষণ প্রথমটা উত্তর দেয় না, যেন শুনিতেই পায় নাই।

দে না একটা বিড়ি।

কিষণ চিড়বিড় করিয়া উঠে, বিড়ি অত সস্তা নয়, পয়সা দিবি?

জব্বু মুখটা ছুঁচালো করিয়া বলে, ওঃ, একটা তো বিড়ি, তার জন্যে আবার পয়সা? এক পয়সায় এক বাণ্ডিল গোলাপী বিড়ি পাওয়া যায়, তা জানিস?

তাই কেনগে না, যা।—নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে উত্তর আসে।

মিনতিটা করুণ হইতে করুণতর হয়, নাঃ, কেন দিক করছিস? একটা গোটা না দিস, যেটা খাচ্ছিস, ওটাই দে না হয়। দুটো টান দোব শুধু।

কিষণ এতক্ষণে বিড়িটা বাড়াইয়া দেয় বটে, কিন্তু নীরবে নয়। বলে, কাল যে বড় তামাক খাচ্ছিলি, তখন চাইলুম না এক ছিলিম? দিয়েছিলি?

আসছে দিন দোব—মাইরি। দেখিস।

বাংলা দেশে এতদিন কাটাইয়া জব্বু বাঙালীর মত দিব্যি গালিতে শিখিয়াছে। বিড়িটায় একটা জোর টান দিয়া আগের কথাটারই জের টানিয়া বলে, না দিই তো, তখন—

সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে বেলাও অস্তে নামিতে থাকে পার্কে পাম-গাছের ছায়াগুলি পশ্চিম হইতে সংকুচিত হইয়া একেবারে তলায় আসিয়া ঘন হয়, তারপর আস্তে আস্তে বিপরীত দিকে প্রসারিত হইয়া যায়। রোদের সাদা রঙ সোনালী হইয়া আসে, পাইপের জলে রাস্তা ধোওয়া চলে, কর্পোরেশনের লরি আসিয়া ডাস্টবিনটা পরিষ্কার করিয়া

লইয়া যায়। তাড়া খাইয়া চারপাশে অসংখ্য নীল রঙের বড় বড় মাছি ভনভন করিয়া উড়ে, আঁষ্টে দুর্গন্ধ চারপাশে ছড়াইয়া পড়ে, পিচের রাস্তায় জলের ছোঁয়াচ লাগিয়া ধূলার একটা নিশ্বাসরোধী রেণুমিশ্রিত গন্ধ উঠিয়া আসে।

তখন আবার ইহাদের পথে নামিবার পালা। জব্বু রাস্তার উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতে থাকে, কিষণ আর রামরতিয়া কান্নার সুরে সুরে গান গাহিয়া লোকের করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করে। দোতলা-তেতলার বারান্দায় মেয়েরা তো আছেনই, ড্যাল্‌হাউসি স্কোয়ার বা ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে এই সময় যাঁহারা বাদুড়ের মত ট্রাম-বাসের পা-দানিতে ঝুলিতে ঝুলিতে ঘরে ফিরিয়া আসেন, ইহাদের এই অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনা ও প্রার্থনার বহর দেখিয়া তাঁহাদের সকলেই যে চোখ ফিরাইয়া লন, এমন বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে।

তারপর বিকালের আলো ম্লান হইয়া যায়—ধূসর ধূমল সন্ধ্যায় ইলেক্‌ট্রিক আলোয় সমুজ্জ্বল মহানগরীর আকাশে সাদা খানিকটা কুয়াশা যেন বিষবাষ্পের মত জমিয়া থাকে। সমস্ত দিনের ভিক্ষাবৃত্তি শেষ করিয়া এই তিনটি প্রাণী তখন ঘরে ফিরিয়া আসে।

ঘর, তা এও একরকমের ঘর বইকি। ধর্মতলার আলোক-সজ্জা পার হইয়া গড়ের মাঠের পাশে পাশে দক্ষিণে একটু আগাইয়া যাও, দেখিবে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘাসের উপর এই ধরনের কত স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক সংসার গড়িয়া উঠিয়াছে। এইখানেই ইহাদের সাংসারিক জীবন, কাম-জীবন, জন্মমৃত্যুর বংশানুক্রমিক ইতিহাস। এই গাছ, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় অর্ধস্বচ্ছ এই কালো ছায়া আর নীচের

হলুদবর্ণ মরা ঘাসের আস্তরণ, ইহারই পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহাদের জীবনের সেই মহাকাব্য বছরের পর বছর ধরিয়া রচিত হইয়া চলিয়াছে। গাছের পাতা হইতে চোয়াইয়া চোয়াইয়া বর্ষায় টিপটিপ করিয়া জল পড়ে। পাণ্ডুর চাঁদ মধ্যে মধ্যে বিবর্ণ আঙুলে ইহাদের স্পর্শ করিয়া যায়। অরণ্যে যখন বসন্ত আসে, তখন বাতাসে শুধু শুকনো গাছের পাতা ইহাদের গায়ে মুখে আসিয়া উড়িয়া পড়ে।

রাত্রি এখানেও আসে—আলোর পাশে পাশে অন্ধকার রাত্রি। এতক্ষণে ইহাদের হাঁড়ি চাপিবে। কিষণ কোথা হইতে শুকনো ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া আনে, বকুলগাছের ডালে ঝুলানো কালো হাঁড়িটা নামাইয়া রামরতিয়া রান্না চাপাইয়া দেয়। আগুনের লাল আভায় তাহার বিকৃত কুৎসিত মুখ রাঙা হইয়া উঠে, কপালের উপরের রুক্ষ চুলগুলি কাঁপিতে থাকে। জলন্ত পাতা আর শুকনো লকড়ি হইতে পটপট করিয়া শব্দ হয়, ঘাসের মধ্য হইতে নানাজাতীয় পোকা আগুনের দিকে উড়িয়া আসে, ফুটন্ত ভাত হইতে উত্তপ্ত ফেনের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়।

এতক্ষণে পয়সাগুলি বাহির করিয়া জব্বু হিসাব করিতে বসে। কিষণ পাশে বসিয়া ওত পাতিয়া চাহিয়া থাকে। ভাগের দিক হইতে কোনমতে এতটুকু কম না হয়, সেদিকে তাহার কড়া নজর।

আর, ঠিক এই পয়সা ভাগ করার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ইহাদের শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তি দানা বাঁধিয়া উঠে।

জব্বু গনিতে থাকে, এক আনা—দু আনা—

কিষণ খপ করিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরে, দেখি, দেখি, কি লুকোলি ওখানে?

জব্বু জোর করিয়াই হাত ছিনাইয়া লয়, নাঃ, কই লুকোলাম?

নাঃ, লুকোস নি! বিল্লির মত আমার চোখ আন্ধারসে ভি জলে, আর দিনের-বেলায় আমাকে ফাঁকি দিবি বেটা বুড্ঢা!

বুড়া বলিলে জব্বু ক্ষেপিয়া যায়, বয়স সম্বন্ধে লোকটার দুর্বলতা আছে। তাহা ছাড়া অভিযোগটাও গুরুতর, একরকম তেলে-বেগুনেই সে জলিয়া উঠে।

দেখ, ঝুটা বলবি তো ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

ইস, ভয় দেখাচ্ছে! তুইই তো ঝুটা বলছিস, চোট্টা কোথাকার!

তারপরেই হাতাহাতির উপক্রম।

জব্বুর একটা হাত নাই, একখানা পায়েরও তাহার অভাব। তবুও কিষণ তাহার কাছে থাকিতে সাহস পায় না, একটা ভাঙা বালতি হাতের পাশেই পড়িয়া আছে যে। অতএব দূর হইতে সে ভারী দেখিয়া একখণ্ড ইট তুলিয়া লয়।

কিন্তু ব্যাপারটা আর বাড়িবার আগেই রামরতিয়া মাঝখানে আসিয়া পড়ে। কটু কণ্ঠে বলে, তোরা যদি এমনই মারামারি করবি তো দোব ভাতের হাঁড়ি ভেঙে, ছাই খেয়ে থাকবি রাত্তিরে।

রামরতিয়ার শাসন ইহারা দুইজনেই মানে, বিশেষত ছাই খাইয়া রাত কাটানোটা কাহারও পক্ষেই প্রীতিকর নয়। অতএব পরস্পরের আত্মীয়স্বজনের সহিত খানিকটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তখনকার মত দুই প্রতিপক্ষ শান্ত হইয়া আসে। পয়সার হিসাব রামরতিয়াই করে।

কিষণ উগ্র স্বরে বলে, কাল থেকে তোর সঙ্গ না ছাড়ি তো কি বলেছি! একা একা যদি গোলদীঘির ওখানে বাবুদের কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাই, তা হ'লে কত রোজগার করতে পারি, জানিস? তুই মর

বেটা গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তা পালিশ ক'রে—তোর মত জোচ্চোরের সঙ্গে আমার এই শেষ।

জব্বু বলে, যা না, থাকতে বলে কে তোকে?

যাবই তো, দেখিস। কালই না চ'লে যাই তো আমি—

একটা অশ্লীল শপথ করিয়া সে কথাটা শেষ করে।

উনুন হইতে ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া ফেন গালিতে গালিতে রামরতিয়া বলে, নাঃ, তোদের নিয়ে আর থাকা গেল না। একটা গাঁজাখোর, আর একটা গুণ্ডা—কোন্ দিন দুটোই খুনোখুনি ক'রে মরবি। তার চাইতে কালই আমি চ'লে যাব মুন্নীলালের সঙ্গে, তার পয়সা আছে, তোদের মত সে ছোটলোকও নয়।

মুন্নীলালের নামে জব্বু অকারণেই রুক্ষ হইয়া উঠে, সে শয়তানের সঙ্গে তোর যে আজকাল ভারী আশনাই দেখতে পাই।

আশনাই থাকবে না তো কি থাকবে? তোর মত বুড়ো উল্লুর চাইতে সে অনেক ভাল, তা জানিস?

জব্বু কিছু বলিতে পারে না, আহত একটা পশুর মত খানিকটা হিংস্র গর্জন করে শুধু। কিষণ হি-হি করিয়া হাসে, ব্যাপারটাকে সেইই সব চাইতে বেশি করিয়া উপভোগ করে।

ইহার পর মনে হইতে পারে যে, পরের দিনই বুঝিবা ইহাদের এই সংসারটা ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাগ হইয়া গেল। তাহা কিন্তু নয়। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে জলের রেখার মত এই সাময়িক বিরোধ মিলাইয়া আসিল, কোনখানে এতটুকু চিহ্ন রাখিল না পর্যন্ত। লাল নীল আলো জ্বালাইয়া ভোরের অস্পষ্ট অন্ধকারে যখন কালীঘাটের ফার্স্ট কার ট্রাম-

লাইনের জালের মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল এবং আশপাশের বড় বড় আলোগুলা সব দপদপ করিয়া নিবিতে শুরু করিল, তখন ঘুম ভাঙিল ইহাদের। বিগত দিনের বিরোধের স্মৃতি মনের মধ্যে বহন করিয়া নয়, তাহার একটি ক্ষুদ্রতম বিন্দুচিহ্ন রাখিয়াও নয়। তারপরেই আবার পথ, মানুষের করুণার দুয়ারে দুয়ারে সকাতর আবেদনের পালা। প্রাত্যহিকের পুনরাবৃত্তি।

অথচ, বিরোধ বাধিবেই—জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে এটাও ইহাদের অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তবু সেদিন খানিকটা বাড়াবাড়িই হইয়া গেল। এমন কি রামরতিয়ার মধ্যস্থতা অবধি অবস্থাটাকে সামলাইতে পারে নাই।

কিষণ কহিল, হর রোজ জোচ্চুরি! আজ একটা এস্পার ওস্পার ক'রে ছাড়ব।

জব্বু গর্জিয়া বলিল, কি এস্পার ওস্পার করবি তুই! দেখেছিস ভাঙা বালতি? এক ঘায়ে খুন হয়ে যাবি।

ইস, খুন করনেওয়ালাই এসেছে রে! তবু যদি হুলো না হতিস! বেশি বকবক করিস নি বাবুয়া, অনর্থক মারা পড়বি শেষকালে।

বাক্যব্যয় বিলক্ষণ হইয়া গিয়াছিল, জব্বুর মেজাজ ঠিক স্বাভাবিক অবস্থাতেও ছিল না। সে আর দ্বিধা না করিয়া ভাঙা বালতিটা তুলিয়া লইয়া কিষণের মাথা বরাবর ছুঁড়িয়া মারিল।

কিষণ চালাক, মাথা নীচু করিয়া সে আক্রমণটা বাঁচাইল এবং রামরতিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া তাহাকে ঠেকাইবার আগেই সে একখানা থান ইট তুলিয়া নির্ঘাত লক্ষ্যে জব্বুর দিকে নিক্ষেপ করিল।

বাপ—রে।

তার স্বরেস্বর্গীয় পিতৃদেবকে আহ্বান করিয়া জব্বু চিত হইয়া পড়িয়া

গেল। জটা বাঁধা চুলের মধ্য হইতে তখন ঝরঝর করিয়া রক্ত নামিয়া আসিয়া কপাল-গাল চোখ-মুখ বাহিয়া মাটিতে পড়িতেছে।

খুন—খুন।

চীৎকারে কলরবে দেখিতে দেখিতে জায়গাটা ভরিয়া উঠিল। তারপরেই ভিড় ঠেলিয়া পুলিসের আবির্ভাব। কিষণ গেল থানায় এবং জব্বুকে পাঠানো হইল হাসপাতালে। এতগুলি সমস্যার সমাধান হইতে দশটি মিনিট সময় লাগিল মাত্র।

কোথা হইতে এ যে কি ঘটিয়া গেল, এতদিনের গড়িয়া উঠা সংসারটা একটা অতি ভঙ্গুর বুদ্বুদের মত চোখের নিমেষে ভাঙিয়া পড়িল। প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে সংসারটাকে ইহারা জোড়াতাড়া দিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল, একটা দমকা বাতাসেই তাহা তাসের ঘরের মত কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহার আর ঠিক-ঠিকানাই রহিল না। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে, ইহারা যেন এজন্য এতটুকুও প্রস্তুত হইতে পারে নাই। রামরতিয়া বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া চাহিয়াই রহিল এবং তারপর ভিড় যখন হালকা হইয়া গেল, তখন কি ভাবিয়া ডাক ছাড়িয়া সুরু করিল কাঁদিতে।

সে কান্নার না আছে কোন সুসঙ্গত কারণ, না আছে সুসমঞ্জস কোন অর্থ। ইহাদের সঙ্গে তাহার সত্যকারের সম্বন্ধই বা কতটুকু! অথচ তাহার কান্নার বহর দেখিয়া এ কথা অত্যন্ত অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে, সে বুঝি সত্যসত্যই মস্ত একটা ঘা খাইয়াছে।

কিন্তু মুন্দীলাল এখনও আছে। জিনিসপত্রগুলি হাতের কাছে যা পাইল, গুছাইয়া লইয়া রামরতিয়া ধর্মতলা স্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইল। যাইতে হইবে অনেক দূর, মার্কাস স্কোয়ার এখান হইতে সোজা পথ নয়।

দুই সপ্তাহ পরে জেল হইতে বাহির হইয়া কিষণ অন্যমনস্কের মত চলিতে লাগিল। এখন সে একা—অনায়াসে গোলদীঘির আশেপাশে ঘুরিয়া বাবুদের কাছ হইতে পয়সা আদায় করিতে পারে, বড়বাজারের পকেটমারের দলে ভিড়িলেও রোজগার একেবারে মন্দ হয় না। জেল-জীবনের এই সামান্য অভিজ্ঞতাতেই সে বাহিরের একটা বিরাট ব্যাপক জগতের সন্ধান পাইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীতে হাত-পাওয়ালা বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তিটা যে নিছক বিড়ম্বনা এবং হাতের নিখুঁত কসরৎই করিয়া খাইবার পক্ষে প্রশস্ততম উপায়, সে সম্বন্ধে তাহার মনে আর এতটুকুও সংশয় নাই।

কিন্তু নানা কথার ভিড় ঠেলিয়া হঠাৎ জব্বুর মুখখানা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। খোঁড়া অক্ষম লোকটাকে ওভাবে না মারিলেই ভাল হইত বোধ হয়। ওই তো রোগা হ্যাংলা চেহারা, অতবড় একটা থান ইটের ঘা খাইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে! কিন্তু কিষণের দোষ নাই। সহজে মারিতে চাহেও নাই—হাজার হোক দোষগুণে লোকটা একেবারে খারাপ ছিল না; দুই একটা পয়সা সরাইবার বদ অভ্যাস থাকিলেও তাহার সঙ্গে ব্যবহার তো ভালই করিত। কিন্তু কি দুর্বুদ্ধিতে যে সে বালতিটা ছুঁড়িয়া মারিল, তাহাতেই তো মাথা বেঠিক হইয়া গেল কিষণের। না হইলে সত্যসত্যই ওই পঙ্গু লোকটাকে মারিবে বলিয়া সে কখনও ভাবিয়াছিল কি?

অন্যমনস্কের মত চলিতে চলিতে কিষণের হঠাৎ খেয়াল হইল, সে ধর্মতলা পার হইয়া ট্রাম-লাইনের পাশে পাশে দক্ষিণে আগাইয়া চলিয়াছে, এবং সম্পূর্ণভাবে যখন সচেতন হইয়া উঠিল, তখন দেখিতে পাইল, সে কখন একেবারে তাহাদের নির্দিষ্ট সেই বকুলগাছটার তলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আরও বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিল, সেই গাছটার গুঁড়িতে তেমনই ভাবে ঠেসান দিয়া জব্বু বসিয়া আছে, এবং রামরতিয়া একটা ভাঙা কলাই করা বাটি হইতে তাহাকে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাওয়াইতেছে। দেখিয়াই বোঝা গেল, জব্বু সোজা হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এবং মাথার ঘা এখনও ভাল করিয়া সারে নাই। বিবর্ণ চোখ মুখ আরও বিবর্ণ, হলদে চোখ দুইটাকে আরও হলদে দেখাইতেছে। মাথায় তাহার এখনও জালি কাপড়ের ময়লা একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা,—দুই পাশে খানিকটা করিয়া গোলাপী তুলা বাহির হইয়া আছে।

কিষণকে দেখিয়া জব্বুর মুখ একটা অদ্ভুত আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মাথার ব্যাণ্ডেজটাকে সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার কারণটাও যেন এই মুহূর্তে তাহার মনে নাই।

কহিল, হাজত থেকে কবে বেরোলি? আজকেই? আয়—আয়।

রামরতিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার কুষ্ঠের চিহ্নে চিহ্নিত কুৎসিত মুখ আর গলিয়া-পড়া চোখটাও যেন তাহারই সঙ্গে হাসিতেছে; বলিল, তুই এলি জেল থেকে আর আমি ঘুরে এলাম কাশীজী হয়ে। মুন্দীলাল নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তোদের ফেলে থাকতে পারলুম না, তাই চ'লে এসেছি। এই দেখ কিষণ, তোর জন্যে বাবা বিশ্বনাথের পরসাদ রেখে দিয়েছি।

কিষণ বসিয়া পড়িল। কহিল, বিশ্বনাথের পরসাদ পরে হবে, কিছু খাবার থাকে তো তাই দে এখন। ভারী ক্ষিদে পেয়েছে।

আবার তিনজনে আসিয়া একসঙ্গে মিলিল। সেই রাজপথের উপর দিয়া রোলারের মত গড়াইয়া গড়াইয়া চলা, কান্নার সুরে গান গাহিয়া পুরবাসীর কৃপা প্রার্থনা। সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

প্রয়োজনের দিক হিসাব করিয়াই যাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, প্রয়োজনে ঘা পড়িলেই কি তাহাকে তত সহজে ভাঙিয়া ফেলা যায়? অস্বাভাবিক কখন যে সকলের দৃষ্টির অগোচরে স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধান কে রাখিয়াছিল?

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দাড়ি ও সাহিত্য

সাহিত্য-পত্রিকায় সাহিত্যের কথা বলাই শোভন। কিন্তু তাহা এড়াইয়া, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বর্ত্তমান সাহিত্য ও যুদ্ধ প্রভৃতি বহু জটিল বিষয়কে পাশ কাটাইয়া, দাড়ির কথা কিছু বলিব।

প্রথমেই জানিয়া রাখুন যে, দাড়ি দুই প্রকার, যাহা কামানো যায় না—অর্থাৎ ক্ষুরে কাটে না বলিয়া নহে, সমাজবিশেষ বা ধর্ম্মবিশেষের লিখিত বা অলিখিত অনুজ্ঞায় কামানো চলে না; এবং যাহা অক্লেশে নির্ম্মূল করিতে দ্বিধা বা বাধা নাই এবং করা না করা সম্পূর্ণ মালিকের ইচ্ছাধীন। শেষোক্ত দাড়ির কথাই হইতেছে।

Persius নামক রোমীয় Stoicই প্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শ্মশ্রু-উদ্গমের সহিতই বিজ্ঞতার আবির্ভাব হয়। শেক্স্পীয়ার সেই মত পোষণ করিতেন: "He that hath a beard is more than a youth and he that hath none is less than a man." ফুলার বলিতেন যে, দাড়ির সহিত মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহার ছবি দেখি নাই, সুতরাং দাড়ি ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

ডারুউইনের নর-বানর-তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে সৃষ্টির প্রথম নর-নারী আদম ও হবা। এ কাহিনী বাবা-আদমের সময় হইতেই সকলে শুনিয়া আসিতেছেন বোধ হয়। ভ্যাটিকানে রক্ষিত একটি অতি প্রাচীন সমাধি-প্রস্তর ও অন্যান্য বহু প্রাচীন স্তম্ভে খোদিত লিপি হইতে কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ববিদ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আদম দাড়িসহই সৃষ্ট হইয়াছিলেন—বেশ ঘন নিবিড় দাড়ি।

তাহার পর সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে দাড়ির প্রতিলোমে ও অনুলোমে বহু বিপর্য্যয় ও সৌভাগ্যের বন্যা যথাক্রমে বহিয়া গিয়াছে। সে কাহিনী অতি দীর্ঘ।

কেমন করিয়া স্পেনের মাকুন্দ রাজা পঞ্চম ফিলিপের অনুকরণে দাড়ি কামানো সে দেশে ফ্যাশন হইয়াছিল; অথবা কি ভাবে ফ্রান্সের অধিপতি প্রথম ফ্রান্সিস চিবুকের ক্ষতাঙ্ক গোপন করিবার জন্য দাড়ি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া ফরাসী দেশে দাড়ি রাখার প্রচলন হইয়াছিল; এবং কেনই বা ফরাসী রাজাদের শ্মশ্রুর তিনটি লোম কোন সনন্দের বা রাজাজ্ঞা-পত্রের গালামোহরের নীচে থাকিলে সে সনন্দের প্রত্যেকটি সর্ত্ত বিশেষভাবে পূর্ণ হইত; এলিজাবেথের রাজত্বকালে দুই সপ্তাহের উর্দ্ধ-বয়স্ক দাড়ির উপর বাৎসরিক চল্লিশ পেনি ট্যাক্স বসিলেও সে ট্যাক্স আদায় করা কেন সম্ভব হয় নাই—এসব ইতিহাসের কথা, দাড়ির কথা নহে।

দাড়ির কথায় হয়তো একটা কৌতূহল আপনাদের মনে স্বতই উঁকি দিতে পারে, কাহার দাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ছিল এবং তাহা কত দীর্ঘ ছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, Hans Stainingger নামক এক ব্যক্তি ৯ ফুট লম্বা দাড়ি থাকার জন্য উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

দাড়ি ইচড়েই পাকে। কেশ অপেক্ষা দাড়ি প্রায় বিশ বৎসরের ছোট হইলেও, দাড়িই আগে পাকিয়া যায়। E. Blyth নামক প্রাণীতত্ত্ববিদ মাত্র একটি বৃদ্ধ বানরের দাড়ি পাকিতে দেখিয়াছিলেন—তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি বানরের পাকা দাড়ি দেখেন নাই।

শ্মশ্রুমুখী কেহ দেখিয়াছেন কি না জানি না। শ্মশ্রুমুখী হইতেছেন শ্মশ্রুযুক্তা নারী। Elizabethgrad-এর নৃতত্ত্ববিদ Dr. S. Weinberg তাঁহার নৃতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তকের চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে

২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, তিনি কনস্টান্টিনোপ্‌ল নগরের পেরা স্ট্রীট নামক রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে ১৪৩৯টি নারীমুখ অবলোকন করিলেন, তাহার মধ্যে ১৪৯টিই শ্মশ্রুমুখী দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ শতকরা দশজন। বোধ হয় Weinberg সাহেবের "সর্পে রজ্জুভ্রম" হইয়াছিল—আলখাল্লা-পরিহিত বহু পুরুষকে নারী মনে করিয়া তিনি ভুল করিয়া থাকিবেন।

তাহার পর দাড়ি কি অবস্থায় রাখা হয় (যত্নে অযত্নে, অথবা যত্নযুক্ত অযত্নে) তদনুসারে দাড়ির শ্রেণীভেদ করিয়া একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; হয়তো সম্পূর্ণ হয় নাই। সচরাচর দশ আকারের দাড়ি দৃষ্ট হয়। যথা :—

১। নিবিড়—(Bushy) ঘন, ভ্রমরকৃষ্ণ, সমগ্র-মুখমণ্ডল-আবৃত-করা কড়া দাড়ি। আদমের ছিল এবং জেলের কয়েদীর মধ্যেও দেখা যায়। সাধু দৃষ্টান্ত ডারউইন।

২। প্রবহমান (Flowing)—বাতাস বহিলে যাহার ডগা ফুরফুর করিয়া নড়ে। দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই—এরূপ দাড়ি অনেকে দেখিয়াছেন। সাধু দৃষ্টান্ত ডিকেন্স, হুইট্‌ম্যান, পো।

৩। সযত্নে ছাঁটা (Clipped)—বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সাধু দৃষ্টান্ত শেক্‌স্পীয়ার।

৪। Awn-like—Awn জিনিসটা কি, তাহা আগে বলি—যবশীর্ষের উর্দ্ধে যে কয়েকটি সূত্রবৎ দীর্ঘ কর্কশ পদার্থ থাকে, তাহাকেই awn বলে—অর্থাৎ চিবুকের নীচে কয়েকগাছা আছে কি নাই, এই ভাব। অর্থাৎ খনার ভাষায় "এক পা-ও না বেরোও বাপা।" সাধু দৃষ্টান্ত বিরল।

৫। Spade—অর্থাৎ বেশ জাঁকালো চাপ-দাড়ি। সাধু দৃষ্টান্ত রবার্ট ব্রিজেস।

৬। Imperial—অধরের নিম্নে যে "নূর" থাকে। ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু মহাশয়ের অনুকরণে আমরা ইকনমিক্স ক্লাসের কয়েকটি ছাত্র ইহা রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। But all imitations are vile—বলা বাহুল্য, নকল আসলের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই। অতীতের মাত্র দুইটি বিখ্যাত ব্যক্তির এইরূপ দাড়ি ছিল—গী দ্য মোপাসাঁ ও ডেকার্টে।

৭। ছুঁচালো—প্রান্ত সূচীমূলবৎ; গণ্ডদেশ ছাঁটা। সাধু দৃষ্টান্ত প্রথম চার্লস, চিত্রকর ভ্যান্‌ডাইক অথবা ডি. এচ. লরেন্স।

৮। গুম্ফমুণ্ডিত শ্মশ্রু (Reaped upper lip)—চট্টগ্রামের পল্লীতে বহু দেখা যায়। সাধু দৃষ্টান্ত—পুশ্‌কিন ও অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন।

৯। Beardlet বা ছোট দাড়ি—মাকুন্দ নহে, কিন্তু দুই গণ্ডের প্রায় সমস্তখানিই কামাইয়া অথবা ডবল zero clip মারিয়া চিবুকের নীচে দাড়ির একটু আভাস মাত্র রাখা। সাধু দৃষ্টান্ত—Cervantes, Chekov, V-de-Lisle Adam.

১০। জুলপি-দাড়ি—side-whiskers—দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল—কবি মাইকেল ইহা রাখিতেন। প্রতীচ্য-উদাহরণ ম্যাথু আর্নল্ড ও Oliver Wendell Holmes (যাঁহাকে the Autocrat, the Professor and the Poet of the Breakfast Table বলা হয়।)

ফুলারের মতাবলম্বী একটি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকায় কিছুদিন পূর্ব্বে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এই মন্তব্য ছিল :—

"Beards, as noumena, as adornments that exist only in the thought and have not emerged into the world of matter, have not yet contributed much to literature, history or law."

এই উক্তি যে কতদূর ভিত্তিহীন, তাহার প্রমাণ—বিভিন্ন দেশের প্রায় প্রত্যেক মনীষীরই দাড়ি ছিল। বাহুল্য-ভয়ে শুধু সাহিত্যিকদেরই কথা বলিব।

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করি—Alcaeus, Euripides, Sophocles, Homer, Virgil, Juvenal। হয়তো বলিবেন যে, সে সময়ে দাড়ি কামানো প্রচলিত ছিল না, কিম্বা ক্ষুর আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা যথার্থ নহে—জুলিয়াস সীজারের ছবি দেখিবেন।

তাহার পর ধরুন—John Wyclif, Chaucer, Ariosto, Cervantes, Edmund Spenser (Herbert Spencer-এরও দাড়ি ছিল), Ballantyne, Shakespeare ও তৎসহ, Dowden, Victor Hugo, Browning, Whitman, Kingsley, Oliver Wendell, Holmes, Hall Caine, Poe, Robert Bridges, Mathew Arnold, Swinburne, Carlyle, Anthony Trollope, Poushkin, Ruskin, Ainsworth, Blackmore, Montaigne (বিখ্যাত ফরাসী Essayist), Longfellow, Tolstoy, Dickens, Turgenev, Ibsen। আধুনিক যুগের Conrad, Anatole France, Chekov এবং অতি-আধুনিক যুগের Pirandello, D. H. Lawrence, G. B. S., Richard Hughes, V-de-Lisle Adams, Ezra Pound প্রভৃতি স্বনামখ্যাত সাহিত্যিকগণের দাড়ি ছিল ও আছে।

ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলে চলিবে না।

অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিতেছি—আজ পর্য্যন্ত Congress President যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের বারোজনের দাড়ি ছিল :—

W. C. Bonnerji, George Yule, B. N. Basu, Pherozeshah Mehta, Dadabhai Naoroji, Alfred Webb, Sir Surendra Nath Banerji, Sir William Wedderburn, A. M. Bose, A. C. Majumder, Badruddin Tyabji ও Abul Kalam Ajad। আমাদের সাহিত্যেও দাড়ির প্রভাব কম নহে; মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, (সাহিত্য-প্রতিভা প্রায় নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্র দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছিলেন,) রাজনারায়ণ বসু, কবি সত্যেন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং ধর্ম্ম-সাহিত্যের অলৌকিক সাহিত্যিকত্রয় রামকৃষ্ণ, নানক ও কবীর।

এই সাহিত্যিক-তালিকা দুইটির একটিও সম্পূর্ণ নহে। প্রায় সর্ব্ব দেশেই দাড়ি ও সুসাহিত্যের অবস্থিতি চিরকাল যুগপৎ ছিল এবং এখনও আছে—অধুনাপ্রচলিত বহু প্রকারের ক্ষুর অথবা ব্লেড দাড়ির মহিমা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। যে সকল খ্যাত সাহিত্যিক দাড়ি রাখেন নাই বা রাখেন না, তাঁহাদের সংখ্যা ক্ষুদ্র বলিয়া তাঁহারা ব্যতিক্রমের পর্য্যায়ে পড়িতে পারেন মাত্র।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়

[আমরা জানি, লেখকের দাড়ি নাই; সুতরাং তিনি স্বজাতিবিরোধী। নির্দাড়িদের মধ্যে স্বজাতিপ্রেমিক যদি কেহ থাকেন, দাড়ির মহতী কীর্ত্তি ভূমিসাৎ করিয়া দাড়িহীনতার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। আত্মপ্রশংসা-দোষের ভয়ে আমরা পারিলাম না।—স. শ. চি.]

সরল-রেখা

স্থান—কলিকাতা। সময়—বিংশ শতাব্দী

সকাল, সরল-নাট্য-মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে দুই এক জন কর্ম্মচারীর হাঁকডাক ও ছাড়া ছাড়া কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছে, জমাদার ও মেথরানীরা উঠান পরিষ্কার করিতেছে। বক্স-অফিসের সম্মুখে লোক জমিতেছে, তাহাদের কোলাহল। থিয়েটারের মালিক গদাই দত্ত বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, সঙ্গে কর্ম্মচারী সুরেন বিশ্বাস ও তারক চন্দ।

পোষ্টার-কণ্ট্রাক্টার তিনকড়ি হাজরা উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করিল

তিনকড়ি। ইম্‌পসিব্‌ল সার্‌, ভেরী ভেরী ইম্‌পসিব্‌ল। পোস্টারের কাজ ছেড়ে গুণ্ডামি না ধরলে আর চলবে না দেখছি। মগের মুলুক পেয়ে গেছে শালারা। আর আপনারাও হয়েছেন সব ভাল মানুষ। দু নম্বর মামলা ঠুকে দিলে—

গদাই। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়েই চলেছ যে তিনকড়ি, ব্যাপারটা কি খোলসা ক'রে বল; আমারাও একটু বুঝে দেখি।

তিনকড়ি। আরে মশাই, কাল সমস্ত রাত্তির লোক লাগিয়ে 'মিসর-কুমারী'র পোস্টার মারালুম, ভাবলুম টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি একসঙ্গে অ্যায়সা চমক লাগিয়ে দোব—সব পণ্ড ক'রে দিলে বেটারা।

গদাই। আরে ম'লো যা, কি হয়েছে বল না?

তিনকড়ি। সর্ব্বনাশ হয়েছে সার্‌, শালারা তক্কে তক্কে ছিল, "মিসর"-টুকু বাদ দিয়ে "কুমারী"র ওপর "বলিদান" মেরে ছেড়ে দিয়েছে, এখন দেখুক লোকে "মিসর বলিদান", দেখুক। ছিঃ, ছিঃ।

গদাই। কারা মেরেছে?

তিনকড়ি। আবার কারা? হাবুল মিত্তিরের চর শালারা। রেখা-থিয়েটারের "বলিদান" প্লের পোস্টার দিয়ে আমাদের জ্যান্ত বলিদান দিয়েছে। হাতের কাছে পেতাম দুটো-একটাকে—

গদাই। তাই তো এরা ভারী জ্বালালে দেখছি। এখন উপায়?

কার্ত্তিক মল্লিক। চলুন সার্, রায় বাহাদুরকে ব'লে একটা বিহিত এখুনি ক'রে আসা যাক।

গদাই। আরে বাবা, পুলিসের খপ্পর মানে তো সে বিশবাঁও জল। তা ছাড়া আসামী করবে কাকে?

তিনকড়ি। ওসব পুলিস-টুলিসের কাজ নয় সার্, সিঁড়ি-লেই-ওলা দু একটাকে ক'ষে মার লাগাতে হবে, তবেই ঢিট হবে বেটারা।

গদাই। (হতাশ ভাবে) যা হয় কর বাবু তোমরা, কিন্তু কালকের 'মিসরকুমারী'র কি হবে?

তিনকড়ি। সে না হয় আর এক দফা আজ রাত্রে মেরে দিচ্ছি সার্, কিন্তু বার বার এমন হ'লে কোম্পানি চলবে কি ক'রে? পয়সা লাগে দফায় দফায়, এমনিতে হয় না।

গদাই। তাই তো। [একটু থামিয়া] সুরেন, রেখা-থিয়েটারে ফোন ক'রে জানতে বল, মিত্তির এসেছে কি না! এসে থাকলে খবর দেবে, আমি কথা বলব।

সুরেন। যে আজ্ঞে। [চলিয়া গেল]

গদাই। না, বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে মিত্তির। শেষে কি মারপিট করতে হবে তিনকড়ি?

তারক। ও প্যাঁচের মধ্যে যাবেন না সার্, বলছি তো রায় বাহাদুরকে ব'লে—তিনি আবার আমার পিসশাশুড়ীর সাক্ষাৎ নন্দাই হন কি না।

তিনকড়ি। তুমি থামো তারক, তোমার পিসশাশুড়ীর নন্দাই আমাদের স্বর্গে তুলবেন কি না।

সুরেন। কনেক্‌শন পাওয়া গেছে সার্।

গদাই। বেশ চল। [টেলিফোনের কাছে গেলেন] হ্যালো মিত্তির, আমি গদাই। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়, বুঝলে। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ো না। [ও পক্ষের কথা হইতেছে] চটব না, মগের মুল্লুক পেয়েছ না কি? [ও পক্ষের কথা] থাক থাক, ইয়ার্কি করতে হবে না। তোমার ইয়ার্কি আমি সুদে আসলে শোধ দোব। নালিশ করব। হ্যাঁ, নালিশ করব রায় বাহাদুরকে ব'লে। [ও পক্ষের কথা] চোপরও হারামজাদ, আমিও দেখতে জানি। [রাগে গরগর করিতে করিতে টেলিফোন নামাইলেন) এই যে সরল, সকালবেলায় সেজে গুজে কোথায় চলেছ বাবা? পরীক্ষার তো আর দেরি নেই।

সরল। সে আমি ঠিক তৈরি হচ্ছি বাবা।

গদাই। তা, চলেছ কোথায়?

সরল। একটু রেখাদের বাড়ি যেতে হবে।

গদাই। রেখা? হাবুল মিত্তিরের মেয়ে রেখা! সেখানে কেন?

সরল। আজ্ঞে, নর্থ-বেঙ্গল ফ্লাড রিলিফের জন্যে আমাদের পোস্ট-গ্রাজুয়েট অ্যাসোশিয়েশন একটা চ্যারিটি পার্‌ফর্মেন্স দিচ্ছে। আমার বাঁশীর সঙ্গে রেখার একটা নাচ আছে কি না, তালিম দিয়ে নিতে হবে দু একবার।

গদাই। [চটিয়া] খবরদার, ও হারামজাদার বাড়িতে কখ্‌খনো যেতে পাবে না। ও আমাকে ইন্‌সাল্ট করেছে।

সরল। কিন্তু—

গদাই। কিন্তু-টিন্তু নয়, দিস ইজ় মাই অর্ডার, অ্যাণ্ড ইউ শ্যাল হ্যাভ টু ওবে ইট। যাও, ওপরে যাও।

সরল। বেশ, আমি তা হ'লে সেক্রেটারিকে খবরটা দিয়ে আসি। গাড়িটা নিয়ে যাব বাবা?

গদাই। তা যাও, কিন্তু নেবুবাগানের রাস্তা মাড়াবে না ব'লে দিচ্ছি। খবরদার।

দৃশ্যান্তর

ইন্‌ষ্টিটিউট হল, সরল দত্ত প্রবেশ করিল, কোণের ঘরে হল্লা হইতেছিল, সেখানে পৌঁছিতেই উপস্থিত সকলেই কলরব করিয়া উঠিল

সরল। [থিয়েটারী ভঙ্গিতে সেক্রেটারির সম্মুখে গিয়া] মহারাজ, ক্ষমা কর অক্ষম দাসেরে, এই লহ তরবারি উষ্ণীষ আমার, যুদ্ধে যেতে পারিব না, পিতার আদেশ।

সেক্রেটারি। পিতার আদেশ? বার্ত্তা কহ বিবরিয়া। নে নে, ইয়ার্কি রাখ, তোর কথা শুনে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এই ইলেভেন্‌থ আওয়ারে তুই পেছ্‌পা হ'লে তো সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তা ছাড়া রেখা মিত্তিরকে তুমি ছাড়া নাচাবে কে বাবা?

বিপিন। এবং রেখা মিত্তির না নাচলে অডিটোরিয়াম ফাঁক। মেয়ের পপুলারিটির খবর পেলে বাপ কি আর ওই থার্ডরেট অ্যাক্‌ট্রেস রাজুবালাকে নিয়ে অত হৈ-চৈ করত! হিয়ার ইগ্‌নোরেন্স ইজ় ব্লিস!

সরল। শাট আপ, সবতাতেই ফচকিমি করিস নি বিপনে, "পরিস্থিতি"র গুরুত্ব অনুভব করতে শেখ। বুঝলে শিশিরদা, গোল বেধেছে ঐ

নাচুনে মেয়েকে নিয়ে। বাবা কোনও কারণে রেখার বাবা মিঃ মিত্রের ওপর খাপ্পা হয়েছেন। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, নট টু ক্রস নেবুতলা বার। এখন বোঝ।

সেক্রেটারি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

বিপিন। ব্যাপার আবার কি হবে? নিশ্চয়ই প্রফেশন্যাল জেলাসি। কিন্তু ওই তুচ্ছ কারণে আমরা বেইজ্জৎ হতে পারি না।

সরল। অর্থাৎ আমি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করব! ইউ ডোন্‌ট নো মাই ফাদার।

সেক্রেটারি। তা হ'লে উপায়?

সরল। উপায় ঠাওরাতেই তো এলাম তোমার কাছে শিশিরদা, পাকা মাথা তোমার।

সেক্রেটারি। দুত্তোর পাকা মাথা, তোদের মত কচি আর কাঁচাদের পাল্লায় প'ড়ে মগজে কিছু কি আর আছে? [একটু চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, গোটাকত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, খোলসা ক'রে বল। প্রেম গজিয়েছে তোদের?

সরল। ধ্যেৎ!

সেক্রেটারি। ধ্যেৎ-ফ্যেৎ নয়, এগিয়েছিস কদ্দূর? তুই যা বলবি, রেখা তাতে রাজি হবে কি না, অর্থাৎ তোর জন্যে বাপের রাগও রিস্ক করবে কি না?

সরল। মেয়েমানুষকে যতটা বিশ্বাস করা যায়, ততটুকু বিশ্বাস ক'রেও বলতে পারি, তা করবে বোধ হয়।

সেক্রেটারি। বোধ হয় নয়, বল, করবে।

সরল। করবে। কিন্তু তাতে সিচুয়েশন সেভ্‌ড হচ্ছে কি ক'রে?

সেক্রেটারি। থাম না বাবা, বোড়ের চালগুলো ভেবে নিই একটু।

কিস্তিমাত করতে হবে তো? হ্যাঁ, দেখ, ব্রেন-কংকাশন কাকে বলে জানিস? কোনও রকমে মাথায় একটা গুরু আঘাত লাগলে মানুষের মস্তিষ্কভাগে একটা বিপর্যয় ওলট-পালট ঘটতে পারে; সে তখন এলোমেলো কাজ করবে, ভুল বকবে, হাউ হাউ ক'রে কাঁদবে; ডাক্তাররা বলবে, তার জীবন সঙ্কটাপন্ন। অভিনয়টা একটু কঠিন, কিন্তু তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে। পারবি?

সরল। দেখ শিশিরদা, আমার নাম সরল, তোমার ও প্যাঁচালো কথা আমি বুঝতে পারছি না, খুলে বল।

সেক্রেটারি। বলছি। মোটর-অ্যাক্সিডেণ্টে তোর ব্রেন-কংকাশন হবে, প্রথম মেডিক্যাল এড আমরা দোব, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তোকে বাড়ি পৌঁছে দোব, সেখানে তোর জ্বর হবে, তুই কাঁদবি, চেঁচাবি, ভুল বকবি আর মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাতে চাইবি, বাঁশী বাজাতে বাজাতে কেঁদে উঠবি—

সরল। বুঝেছি। কেঁদে উঠব—রেখা কই, রেখা নাচছে না! তুমি এই সুযোগে রিহার্সালটাও দিইয়ে নিতে চাও—এই তো! ছি ছি! সে আমি ম'রে গেলেও পারব না। তা ছাড়া রেখা—

সেক্রেটারি। সে ভার তো আমরা নিয়েছি চাঁদ। রেখা তোর চাইতে ভাল অভিনয় করে—এ বিশ্বাস আমার বরাবরই আছে, এবার তার প্রমাণ হবে।

সরল। তোমাদের যা খুশি কর শিশিরদা, কিন্তু দেখ শেষ পর্য্যন্ত আমি না ফ্যাসাদে পড়ি। বাবার অনেক টাকা, ডিস্‌ইন্‌হেরিটেড হ'লে সইতে পারব না। হ্যাঁ, ভাল কথা, রেখা আমাদের বাড়ি যাবে কি ক'রে? তার বাবাও পাঠাবেন না, আমার বাবাও—

সেক্রেটারি। ওরে হাঁদা, সেইখানেই তো তোর অভিনয়ের কেরামতি।

এমন অভিনয় করবি যে, তোর প্রাণসংশয় ভেবে তোর বাবাই হাবুল মিত্তিরের হাতে পায়ে ধ'রে রেখাকে তোদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন। তোরই হাতে এখন সব।

সরল। বুঝলাম, কিন্তু জ্বরটা?

সেক্রেটারি। বেঁচে থাক আমাদের গার্লিক সাহেব, রসুনের মাহাত্ম্য তো এখনও বোঝ নি! সে ঠিক হয়ে যাবে 'খন। আমি যাই, রেখাকে তালিম দিয়ে আসি। তার পরেই অ্যাক্সিডেণ্ট। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

রেখা পিয়ানো বাজাইয়া গুন গুন স্বরে গান করিতেছিল, সেক্রেটারি শিশিরবাবু প্রবেশ করিলেন

রেখা। এই যে শিশিরবাবু, এই সকালবেলায় কি মনে ক'রে?

শিশির। তোমার সঙ্গে একটু গোপন পরামর্শ আছে বোন। ব্যাপার কিছু শুনেছ?

রেখা। শুনেছি, ললিতা ফোন করেছিল। এখন কি করতে চান?

শিশির। উপায় এক তোমার হাতে আছে। সরল মোটর-অ্যাক্সিডেণ্টে ঘায়েল হয়ে মরণাপন্ন হবে, ভুল বকবে এবং আমাদের ঘুষ-খাওয়া ডাক্তারের পরামর্শে দত্ত-বাড়িতে সরল-রেখার বাঁশী ও নাচের রিহার্সাল। এ ছাড়া তো কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।

রেখা। না না না, এ বড্ড চীপ মেথড আপনারা নিচ্ছেন। আমার লজ্জা করবে, হয়তো হেসেই ফেলব।

শিশির। তুমি ওফেলিয়ার পার্ট করেছ, তুমি হেসে ফেলবে? আই ওনট বিলিভ দ্যাট।

রেখা। তার চাইতে আমাকে বাদ দিন না আপনারা। যুথি আমার চাইতে ভালই করবে।

শিশির। ইম্‌পসিব্‌ল, সে হয় না রেখা। সরলকে তো জান। নাম সরল হইলে কি হবে, চীজটি সোজা নয়।

রেখা। দেখুন শিশিরবাবু, কোনও রকমে ধরা প'ড়ে গেলে সে বড্ড কেলেঙ্কারি হবে, মা-বাবার কাছে মুখ দেখাতে পারব না, হয়তো আত্মহত্যাই ক'রে বসব।

শিশির। কিচ্ছু প্রয়োজন হবে না বোন, ইউ ডোন্‌ট নো পুওর বেঙ্গলী ফাদার্স; তাঁদের চোখ কখনই খুলবে না। যাকগে, আমি চললুম, তলব পড়লে তুমি ইতস্তত ক'র না।

প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

ইন্‌ষ্টিটিউটের বারান্দা, পাশের ঘরে কোলাহল

শিশির। বাপ্‌স, তোদের জন্যে বুড়ো বয়সে জানটা বেরিয়ে যাবার দাখিল হয়েছে। এই বিপর্যয় লাস নিয়ে ঠনঠনে আর নেবুতলা করা কি পোষায়! এই বিপ্‌নে, শোন, সব রেডি তো? ডাক্তার এসেছে?

বিপিন। সে সব ঠিক হয়ে গেছে শিশিরদা, ব্যাণ্ডেজ পর্য্যন্ত বাঁধা হয়েছে, সরলকে যা মানিয়েছে, চমৎকার! সরল-রেখা একেবারে প্যারাবোলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিশির। ফাজলামি রাখ। ওদিকটা আমি ঠিক ক'রে এনেছি, এদিকে তোরা না গোল বাধিয়ে বসিস।

বিপিন। একটা কথা শিশিরদা, স্ট্রীট-অ্যাক্সিডেণ্ট হ'লে গাড়ির নম্বর চাই, পুলিস চাই, মেডিক্যাল কলেজে আউটডোর এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে এণ্ট্রি চাই।

শিশির। সে সব কিছুই চাই না রে বাবা, গাড়িতে ধাক্কা দিয়েছে, গাড়ি পালিয়েছে, পাশেই ক্যাপ্টেন বক্সির ডিস্পেন্সারি। আমরা খবর পেয়ে সেখানে নিয়ে গেছি—বাস্‌, এইটুকুই যথেষ্ট। বক্সি আবার ওদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের অন্তরঙ্গ ইয়ার—হি উইল ডু দি রেস্ট। নাউ টু অ্যাক্‌শন। সরলকে একটু চিয়ার আপ ক'রে ফোন করিগে চল।

বিপিন। চল।

দরজার পথে ভিতরে প্রবেশ

দৃশ্যান্তর

শিশির। ক্যাবাৎ, বাওবা! দেখ বাবা, সোজা প্লটটিকে বাঁকা ক'রে ব'স না, বিড়ি-ফিড়ি যা টানবার প্রাণভরে টেনে নে। কদিন তো আবার অব্‌জার্‌ভেশনে থাকতে হবে।

সরল। তা তো বুঝলাম শিশিরদা, কিন্তু আমাদের বাড়ির ডাক্তার নরেন বোস যখন ব্যাণ্ডেজ খুলতে চাইবে, তখন?

শিশির। খুলুক না, ফেটেছে বা কেটে গেছে এ কি কেউ বলছে, ধাক্কা লেগে ফুলে উঠেছিল, কংকাশন অব দি ব্রেন। ক্যাপ্টন বক্সিও তো পয়সা খরচ ক'রে বিলেত থেকে ডাক্তারি শিখে এসেছে! হি নোজ

হিজ বিজনেস। শুয়ে পড় সরল, এই তোরা ভিড় ক'রে দাঁড়া, টেব্‌ল-ফ্যানটা ঠিক জায়গায় রাখ। সুধীর, তুই যা বক্সিকে খবর দে। আমি ফোন করতে চললাম।

প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

সরলের মা। কই বাবা, বাছা আমার কোথায়? সক্কালবেলায় তুমি ভদ্রলোককে মিছিমিছি হারামজাদা বললে, এর ফল কখনও ভাল হয়? আর ড্রাইভারই বা তাকে রেখে গাড়ি নিয়ে চ'লে গেল কি ব'লে?

গদাই দত্ত। ভাগ্য গিন্নী, ভাগ্য। নইলে পোস্টারের ওপর কে মারল পোস্টার, আর আমি গেলাম ক্ষেপে! কই বাবা, কোন্ দিকে?

বিপিন। আসুন এই দিকে।

দৃশ্যান্তর

সরলের মা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] বাবা সরল, একবার কথা বল বাবা। এই যে আমরা এসেছি।

শিশির। তোরা সব যা তো এখান থেকে। এই যে, ক্যাপ্টেন বক্সিও এসেছেন! ইনিই মিঃ দত্ত, সরলের বাবা।

বক্সি। নমস্কার।

দত্ত। নমস্কার।

সরলের মা। বাবা, আজ আমার লজ্জা-সরম কিছুই নেই। বাছা আমার বাঁচবে তো?

বক্সি! বাঁচবে বইকি মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। যান না, ওর কাছে গিয়ে বসুন।

সরলের মা। বাবা সরল!

সরল। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চ'লে
যাব! হায় রে অর্পণা, তাই যেতে হবে।
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর,
তবে যেতে পাব!

সরলের মা। [শিশিরকে লক্ষ্য করিয়া] ও কি বলছে বাবা, ভুল বকছে?

গদাই দত্ত। [চোখে রুমাল দিয়া] ভুল নয় গিন্নী, ছেলে আমার 'বিসর্জ্জন' আওড়াচ্ছে। নরেন, একবার দেখ তো ভাল ক'রে।

ডাঃ নরেন বোস। আপনারা একটু আলোটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ান না, আসুন ক্যাপ্টেন বক্সি।

সরল। থাক ও সকল কথা!
দেখ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত,—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ!

শিশির। [জনান্তিকে] মার্ভেলাস, দেখছিস বিপ্‌নে, কি গলা!

বিপিন। যা বলেছ শিশিরদা, তবু 'বিসর্জ্জনে' ওর পার্ট ছিল রঘুবীরের, জয়সিংহের নয়।

সরল। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক
দেবী! অপর্ণা—
না না অপর্ণা নয়, রেখা। [আর্ত্ত কণ্ঠে] রেখা! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল]

গদাই দত্ত। রেখা!

সরলের মা। আহা, দেখ দেখ, বাছা আমার মূর্চ্ছো গেল বুঝি। রেখাদের বাড়ি যেতে বারণ করেছিলে তাই—

গদাই দত্ত। নরেন, ওকে রিমুভ করা চলবে তো? আর দেরি ক'র না তা হ'লে।

নরেন বোস। খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে, ক্যাপ্টেন বক্সি আর শিশিরবাবু বরং আমাদের সঙ্গে চলুন।

গদাই দত্ত। তা হ'লে তো ভালই হয়। [রোগীকে ধরাধরি করিয়া, "হুঁশিয়ার, সাবধান, এদিক চেপে, ডাইনে" ইত্যাদি টুকরা টুকরা বাক্যসহ সকলের প্রস্থান]

দৃশ্যান্তর

সরল-নাট্য-মন্দিরের উপরে গদাই দত্তের বাড়ি। গদাই দত্ত ও ডাক্তার বোস বারান্দায় দাঁড়াইয়া

গদাই। কি রকম বুঝছ, নরেন?

নরেন। ব্রেনে কিছু রক্ত কোয়াগুলেট করেছে বোধ হচ্ছে, পার্‌ফেক্ট রেস্ট দরকার। ওর হুইম্‌স অনুসারে চললে ভাল হয়। "রেখা রেখা" ব'লে চেঁচিয়ে উঠছে। রেখা কে বলতে পারেন?

গদাই। [গম্ভীরভাবে] আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বোঝা শক্ত বাবা। হাবুল মিত্তিরের মেয়ে রেখার কথা আজ সকালে বলছিল বটে, সেই হবে।

নরেন। তাকে আনানো যায় না?

গদাই। অসম্ভব, হাবুলকে আজ সকালেই কুচ্ছিত গালিগালাজ করেছি, সে মেয়েকে আসতে দেবে না।

নরেন। এই দুঃসময়ে—

সরলের মা। ওগো, আমি সুহাসের হাতে পায়ে ধ'রে তার মেয়েকে নিয়ে আসছি, ও এলে যদি আমার ছেলে বাঁচে—

নরেন। অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই মা, মিঃ দত্ত মানী লোক, তাঁর দিকটাও তো দেখতে হবে। এমনিতে চেষ্টা ক'রে দেখি। চলুন, রোগীর ঘরে যাই।

দৃশ্যান্তর

সরল। ডুবে গেল, ডুবে গেল, সব ডুবে গেল। রেলওয়ে এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টে মানুষ গরু কুকুর শ্যাল সব একাকার হয়ে গেল, ধর ধর, ওই যে ঘরের চালায় লোক ভেসে যাচ্ছে। শিশিরদা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ, দেখতে পাচ্ছ না?

শিশির। এই যে ধরছি ভাই।

সরল। শিশিরদা, রেখা নাচবে না, আমার বাঁশীও বাজবে না—টাকা দেবে কে?

শিশির। রেখা নাচবে বইকি ভাই, খুব নাচবে।

সরল। নাচবে? সত্যি বলছ? তা হ'লে আমার বাঁশীটা দাও—উঃ, গেল গেল, তারে আটকে গেল একপাল গরু। কি স্রোত! হুড়-হুড় ক'রে চলেছে—

নরেন বোস। রেখাকে আনতে কেউ গেছে নাকি?

গদাই দত্ত। হ্যাঁ, সরলের মা গেছেন। এমন অক্‌ওয়ার্ড সিচুয়েশনে জীবনে কখনও পড়ি নি। ছি ছি! যাই, আমি নীচে যাই, দেখি, 'মিসরকুমারী'র হাঙ্গামাটা যদি বন্ধ করতে পারি। তোমরা এখন যেও না বাবা।

শিশির। কোন ভয় নেই, আমরা আছি। ওই যে, গাড়ির আওয়াজ হ'ল, ওঁরা বোধ হয় এলেন।

দৃশ্যান্তর

সরলের মা ও রেখা কথা বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন

সরলের মা। আমি জানি মা, আমাদের এই দুঃখের সময় তোমাকে টেনে আনা অন্যায় হচ্ছে, তবু মায়ের মন। থেকে থেকেই কেবল তোমার কথা বলছে কিনা।

রেখা। আমাকে নিয়ে রিহার্সাল দেবার কথা ছিল। বোধ হয় যখন কথাটা ভাবছিলেন, সেই সময়েই অ্যাক্সিডেণ্ট হয়, সেইজন্যেই—

সরলের মা। আমার তো মা, ভয়ে হাত পা আসছে না, তোমরা আমার বাছাকে বাঁচিয়ে দাও মা।

গদাই দত্ত। [সিঁড়িতে] এসেছ মা, যাও, খালি তোমার কথাই বলছে

দৃশ্যান্তর

শিশির। সরল, এই যে ভাই, রেখা এসেছে।

সরল। এসেছে, এসেছে? [উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে করিতে] কই, আমার বাঁশী?

ক্যাপ্টেন বক্সি। থাক থাক, জোর ক'রে শুইয়ে রাখবার দরকার নেই, পেছনে বালিশগুলো দিন, ব'সেই থাকুক না একটু।

রেখা। সরলবাবু, আমাকে চিনতে পারছেন?

সরল। হা-হা, তোমাকে চিনি না? চিনি চিনি—

As I am a lofty princess, so my father is
A lofty king, accomplished in all kingly subtleties,
Holding in his strong right hand world-kingdom's balances
He has quarrelled with his neighbours, he has scourged his foes—

তুমি অপর্ণা। না না, তুমি রেখা, আমি বাঁশী বাজাব, তুমি নাচবে আর গাইবে, তবে তো নিরাশ্রয়রা আশ্রয় পাবে। তুমি গাইবে রেখা?

রেখা। গাইব বইকি, আপনি বাঁশী বাজান।

শিশির। এই যে বাঁশী।

সরল। উঃ, এত জল কোত্থেকে এল, এত জল!

বাঁশী বাজাইতে লাগিল

নরেন বোস। চলুন ক্যাপ্টেন বক্সি, চলুন শিশিরবাবু, আমরা বারান্দায় গিয়ে একটু চা খাই। [সরলের মায়ের কাছে গিয়া] কিছু জল-খাবারের ব্যবস্থা করুন আপনি।

সরলের মা। হ্যাঁ, যাই বাবা। [সরল ও রেখা ছাড়া সকলের প্রস্থান]

রেখা। ছি ছি ছি, আপনি কি?

সরল। কিছু না, অত্যন্ত সরল, সহজ। উচিত ছিল তোমাকে নিয়ে ইলোপ করা, কিন্তু ততটা সাহসী নই।

রেখা। এ তো হ'ল, এর পরে এই গোলকধাঁধা থেকে বের হবেন কি ক'রে?

সরল। সে রাস্তা যিনি আমাকে সংসারে এনেছেন, তিনিই তৈরি করবেন। যাকে তুমি চেন না রেখা, তোমার ভাগ্য ভাল।

রেখা। ছি ছি, সেই মায়ের সঙ্গে আপনি জোচ্চুরি করছেন! আমি কিছুতেই রাজি হতাম না, যদি না—

সরল। যদি না আমাকে ভালবাসতে? এই তো? একটু কাছে স'রে এস না রেখা। ভুয়ো পার্‌ফর্ম্যান্সের রিহার্সাল তো হ'ল, এবারে আসল পার্‌ফর্ম্যান্সেরও একটু তালিম দিয়ে নেওয়া যাক।

রেখা। না না, ওই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে আপনার মার। বাঁশী বাজান আপনি।

সরল বাঁশী বাজাইতে লাগিল এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল

সরল। মা মা, ঐ যে জল নেমে যাচ্ছে, টিকিট বিক্রি করতে হবে, আমি যাব।

সরলের মা। এই যে বাবা, আমি এসেছি। তোমাকে টিকিট বিক্রি করতে হবে না বাবা, আমি টাকা দোব।

সরলের চীৎকারে সকলে ভিতরে আসিয়াছিলেন। শিশির ক্যাপ্টেন বক্সিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল

শিশির। এটি মন্দ বলেন নি উনি, ফ্লাড রিলিফের জন্যে সরল-নাট্য-মন্দির আর রেখা-থিয়েটার একটা কম্‌বাইন্‌ড চ্যারিটি পার্‌ফর্ম্যান্স দিলেই তো পারে। পোস্টারে সরল-রেখা থিয়েটারের চ্যারিটি অভিনয়, মন্দ দেখাবে না।

সরলের মা। বেশ বলেছ বাবা, আমি কর্ত্তাকে বলছি গিয়ে। তোমরা যেও না, তোমাদের খাবার এল ব'লে।

শিশির। পাগল হয়েছেন, না খেয়ে আমরা যাই! চল হে বক্সি, বাইরে যাই আমরা, সরল-রেখাকে আন্‌ডিস্‌টারব্‌ড থাকতে দাও।

ক্যাপ্টেন বক্সি। চল।

সকলের প্রস্থান

বাঁশী বাজিতে লাগিল

এক রাত্রি

গ্রাম হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে জনহীন প্রান্তরে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যে দেবস্থলটি মনোরম। দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, বহু বর্ষ পূর্ব্বে নদীর সিকতা-ভূমির উর্ব্বরতায় জঙ্গলটির জন্ম হইয়াছিল। এখন নদীটি প্রায় আধ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন-শিমুল-বন্যজামগাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডগুলি জনতার মত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীচে নানা প্রকারের লতা আর গুল্মে সমাচ্ছন্ন। এই ঘন বন-সন্নিবেশের মধ্যে—প্রায় কেন্দ্রস্থলে পরিচ্ছন্ন খানিকটা—বিঘা দুয়েক জমির উপর প্রাচীন একটি মন্দির। মন্দিরটির রঙ কালো কঠিন, দেখিয়া মনে হয়, যেন অখণ্ড একটা ছোট পাহাড় হইতে খোদাই করিয়া গড়া। বিগত হইয়া যাওয়া শতাব্দীর অন্ধকারের ছায়া দিন দিন ঘন গাঢ় হইয়া উঠিতেছে যেন। মন্দিরের সম্মুখে জীর্ণ একটি নাটমন্দির। এমনই কালো, তবে অখণ্ড বলিয়া মনে হয় না। খিলানে খিলানে ফাট ধরিয়াছে। নাটমন্দিরের দুই পাশে দুইখানি মাটির ঘর। একখানি ভোগ-মন্দির অপরখানি সাধক-সন্ন্যাসী কেহ আসিলে থাকিতে দেওয়া হয়। তান্ত্রিক সাধনার বহুবিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। এককালে নাকি নরবলি হইত; এখন পশুবলি হয়—ছাগল, ভেড়া, মহিষ; এক এক বিশিষ্ট পর্ব্বে শতাধিক পশুর রক্তে নাটমন্দিরের চত্বর ভাসিয়া যায় এবং দেবীমন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে পশুমুণ্ডের স্তূপ গড়িয়া উঠে। মন্দিরের ডান দিকে ভৈরবতলা—প্রাচীন একটি শিমুলগাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বাঁ দিকে সিন্দুরলিপ্ত কতকগুলা নরকঙ্কাল। রাত্রে দেবী নাকি মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈরবের সহিত ঐ নরকঙ্কাল লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া

থাকেন। নিত্য প্রভাতে দেখা যায়, নরকঙ্কালগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; পুরোহিত নিত্য সেগুলিকে গুছাইয়া রাখে। দেবীর খলখল হাসিতে, ভৈরবের হুমহুম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দধ্বনিতে আশপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া উঠে, গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থরথর করিয়া কাঁপে। রাত্রে এ দেবস্থলে কেহ বড় থাকে না। প্রাচীনকাল হইতে ভূমি-বৃত্তিভোগী পুরোহিত সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া সন্ধ্যারতি শেষ করিয়াই গ্রামে আপন গৃহে চলিয়া যায়। তাহার পর হইতেই আরম্ভ হয় দেবলীলা। কখনও কখনও দুই-দশজন অসমসাহসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দুই-একজন ছাড়া কেহ থাকিতে পারে নাই। বাকি সকলে অর্দ্ধরাত্রেই পলাইয়া গিয়াছে, দুই একজন পাগল পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন সন্ন্যাসী আসে প্রত্যহই, কিন্তু দিনে প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামে বা স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

পুরোহিত কন্যার মত আদর করিয়া দেবীকে বলেন, ভয়ঙ্করী আমার ক্ষ্যাপা মেয়ে।

সেদিন শ্রাবণসন্ধ্যায় আকাশ-জোড়া ঘন মেঘ; কিন্তু বর্ষণ ছিল না। গুমট গরমে দেবস্থলের বনসমারোহের মধ্যে নিথর স্তব্ধতা থম-থম করিতেছিল। নীচে লতাগুল্মের অন্তরালে গুমটক্লিষ্ট সরীসৃপের সঞ্চরণ আজ ইহার মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত সন্ধ্যারতি শেষ করিলেন। অন্য দিন বরং দুই-চারিজন ভক্তিমান গ্রামবাসী আরতির সময় আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ আর কেহ আসে নাই; কেবল ঢাক লইয়া আসিয়াছিল চাকরান-জমিভোগী ঢাকীটা।

আর ছিল দুইজন আগন্তুক সন্ন্যাসী। একজন আসিয়াছে সকালে, একজন দ্বিপ্রহরে, দেবীর ভোগের পূর্ব্বেই; ওবেলায় এইখানেই প্রসাদ পাইয়াছে। পুরোহিত ভাবিয়াছিলেন, অপরাহ্ণেই চলিয়া যাইবে। তিনি এ দেবস্থলের ভয়ঙ্করত্বের কথা সবই বলিয়াছেন। কিন্তু আরতি শেষ করিয়া পুরোহিত দেখিলেন, জোয়ান সন্ন্যাসীটি আপনার জিনিস-পত্র গুছাইতেছে; কিন্তু প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এখনও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অদ্ভুত ঘুম লোকটার, ঢাকের বাজনাতেও ঘুম ভাঙিল না। কিন্তু পুরোহিত কাছে আসিয়া দেখিলেন, লোকটা ঘুমায় নাই, চুপ করিয়া চোখ মেলিয়া শুইয়া আছে। পুরোহিত ডাকিল, বাবাজী! ওহে গোঁসাই!

লোকটা উঠিয়া বসিয়া আমড়ার আঁটির মত চোখ দুইটা মেলিয়া বোকার মত বলিল, আঁ?

তুমি যাবে না নাকি? এত কথা বললাম তোমাকে—

লোকটা অত্যন্ত কৌতুকে হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিটা কিন্তু রূঢ় নয়, বিনীত এবং নির্ব্বোধ। হাসিয়া সে বলিল, বেশ থাকব বাবা এইখানে।—বলিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। তিনটি দ্রুত হেঁ শব্দে এক টুকরা বিনীত নির্ব্বোধ হাসি।

পুরোহিত বলিলেন, এই দেখ, এ মহা ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে ওসব পাকামি ক'র না।

সবিনয়ে অকারণে অর্থহীনভাবে হাসিয়া লোকটা বলিল, আজ্ঞে, বেশ থাকব বাবা। 'কালী কালী' ব'লে কাটিয়ে দোব—হেঁ-হেঁ-হেঁ। সেই নির্ব্বোধ দ্রুত হাসি।

পুরোহিত এবার নীরবে একবার লোকটার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিলেন। মাথায় কাঁচাপাকা একমাথা বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ দাঁড়ি-

গোঁফ, স্থূল সরল দৃষ্টিভরা বড় বড় দুইটা চোখ, দন্তহীন তোবড়ানো মুখ। লোকটার উপর মায়া হয় না, দয়া হয়। অতিথিশালার দাওয়ার উপরেই একটা ধুনি জ্বলিতেছিল—লোকটা ধুনিতে কাঠ ফেলিয়া দিয়া গাঁজা টিপিতে বসিল। পুরোহিত তাহাকে তখনও দেখিতেছিলেন; সন্ন্যাসী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পুরোহিতের সহসা মনে হইল, লোকটি বোধ হয় গুপ্ত সাধক। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত উত্তাপও যেন তিনি অনুভব করিলেন। বলিলেন, তা হ'লে বাবা, আপনি—

হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া লোকটি বলিল, হ্যাঁ বাবা, যান আপনি, বেশ থাকব আমি।

অপর সন্ন্যাসীটি এতক্ষণ জিনিসপত্র বগলে করিয়াও নীরবে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। সেও এবার জিনিসপত্র নামাইয়া বলিল, তা হ'লে আমিও থাকি বাবা এইখানেই।

লোকটি ভরা জোয়ান, একচাপ কালো রুক্ষ দাঁড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, মাথায় তৈলহীন চুলগুলি লম্বা, কিন্তু বেশ বিন্যস্ত। পরনে গেরুয়া বহির্ব্বাস, গায়ে একখানা গেরুয়া চাদর।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বলিল, কেন বাবা, বেশ তো থাকতে গাঁয়ে! এবার আর সে হাসিল না। কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর সুপরিস্ফুট। কিন্তু পুরোহিত বলিলেন, থাকুন বাবা, উনিও থাকুন; একা না বোকা। তা উনি না হয় ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ায় থাকবেন।

জোয়ান সন্ন্যাসী বিনাবাক্যব্যয়ে নাটমন্দিরের ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর গিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসিল। পুরোহিত আর অপেক্ষা করিল না; আলোটি হাতে করিয়া সঙ্কীর্ণ বনপথের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

* * *

আলোটা চলিয়া যাইতেই দেবস্থল মুহূর্ত্তে ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। সে অন্ধকার যেন পৃথিবীর দিবারাত্রির অন্ধকার নয়, কুটিল, নিথর, গম্ভীর। সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল, তারপর ফুঁ দিয়া ধুনিটা জ্বালাইয়া তুলিল। শূলবিদ্ধ অন্ধকারের বুকের উচ্ছ্বসিত রক্তধারার মত আলোকশিখা জ্বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। হাসিয়া সে ছোট কল্কেতে হাতের গাঁজাটুকু সাজিয়া আগুন চড়াইল। আপন মনেই বলিল, গেরামে গিয়ে ফেসাদে পড়ি আর কি! হাজার কৈফিয়ৎ। তার চেয়ে বাবা অরণ্য ভাল। দশ বছর অরণ্যে অরণ্যে কেটে গেল বাবা, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহাদেবের প্রসাদ পাব বাবা?—জোয়ান সন্ন্যাসীটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিল, ধুনির আলোতে অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত দেখাইতেছে তাহাকে।

প্রসাদ পাব বাবা?

হেঁ-হেঁ-হেঁ। ব'স বাবা, ব'স। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সজোরে দম দিয়া কল্কেটি বাড়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে দমটা ছাড়িয়া সে প্রশ্ন করিল, কোথা আশ্রম বাবাজীর?

আশ্রম?—তরুণ সন্ন্যাসী হাসিল। তারপর বলিল, দুনিয়াময়ই আশ্রম বাবা; যেদিন যেখানে থাকি, সেইখানেই আশ্রম।

হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমারও তাই বাবা। প্রৌঢ় আবার সেই হাসি হাসিল, হেঁ হেঁ হেঁ। কল্কেতে আবার দম দিয়া সে নীরবে কল্কেটি বাড়াইয়া দিল। তরুণ সন্ন্যাসী দম দিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল, আর নাই। দুইজনেই কিছুক্ষণ ভোম হইয়া বসিয়া রহিল।

লঘু দ্রুত পদশব্দ—তাহার পরই খটখট শব্দে দুই তিনটা নরকপাল স্তূপচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়িল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। সচকিত

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘাড় উঁচু করিয়া চাহিল। আবার লঘু পদশব্দ, আবার দুইটা নরকপাল গড়াইয়া পড়িল।

প্রৌঢ় বলিল, শেয়াল। মড়ার মাথার ওপর দিয়ে বেটাদের পথ। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসীও হাসিল, সেও দেখিয়াছে। প্রৌঢ় বলিল, জমল না। আর একটু হোক, কি বল? সে গাঁজা বাহির করিয়া বসিল।

তরুণ সন্ন্যাসী একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। প্রৌঢ়ই বলিল, কে কে আছে বাবা, তোমার বাড়িতে?

কেউ না। মা ছিল, ম'রে যেতেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

কোথা বাড়ি ছিল?

বাড়ি?

হ্যাঁ, বাড়ি।

সে শুনে আর কি করবে?

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রাত কাটানো নিয়ে কথা বাবা।

তরুণ তবু চুপ করিয়া রহিল, কল্কেতে গাঁজা সাজিতে সাজিতে প্রৌঢ় বলিল, আমি সন্ন্যাসী সেই ছেলেবেলা থেকে। অঘোরপন্থীরা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

কল্কেতে আগুন চড়াইতে চড়াইতে বলিল, অঘোরপন্থীরা মড়ার মাংস খায় চিমটেতে ক'রে ধ'রে চিতার আগুনে ঝলসিয়ে,—বেশ লাগে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। সে হাসিয়া উঠিল। তারপর সে গাঁজায় দম দিল। পালা করিয়া গাঁজার কল্কে হাতে হাতে ফিরিতে আরম্ভ করিল। গাঁজার কল্কে উপুড় করিয়া দিয়া তরুণ বলিল, কঙ্কালী মহাপীঠে এক সাধু ছিল, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি; সে খেত।

কঙ্কালীতলা? বীরভূম জেলা?

হ্যাঁ। গিয়েছ সেখানে? কোপাইয়ের ওপরে মহাশ্মশান।

হেঁ-হেঁ-হেঁ। প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল। নবগ্রামের রামবাবুকে জানতে? অ্যাই দশাশয়ী পুরুষ; এই একগুলি আফিম খেত। 'পাট-ভাণ্ডার' প'ড়ে থাকত কাছারির সিমেণ্ট-করা দাওয়াতে। 'প্রুক-প্রুক' গড়গড়ার নলে আর মুখে। তামাক ফুরুলেই হাঁক—লাল—রূ-প! সঙ্গে সঙ্গে কল্কে হাজির—হো-জোর! প্রৌঢ় নিজেই হাত বাড়াইয়া যেন কল্কে আগাইয়া দিল।

তরুণ সন্ন্যাসীর নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছিল; চোখ দুইটি অতি কষ্টে বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, রূপলাল?

প্রৌঢ় বলিল, হ্যাঁ, রূপলাল, সেই ইয়া দুটো বড় বড় দাঁত! এই বড় বড় চোখ! 'বক্তিতা' করত! বলত, "করকে বলি রে—কর, তুই হরিমন্দির পরিষ্কার কর—কর আমার সে কর্ম্ম দুষ্কর মনে ক'রে তস্কর-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। একবার সবাই হরি হরি বল।" সে হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল গমকে গমকে। হেঁ-হেঁ-হে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। প্রৌঢ় আবার বলিল, নারদের বক্তিতে! বাবু শুনতে খুব ভালবাসতেন। বাবু খুব ভালবাসতেন রূপলালকে। আদর ক'রে বলতেন, লালরূপ।

অকস্মাৎ কাহার ক্রুদ্ধ নিশ্বাসের শব্দে দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। কে? ঘাড় উঁচু করিয়া দুইজনেই নাটমন্দিরের দিকে চাহিল। প্রৌঢ় জলন্ত কাঠটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শালা!—তরুণ সন্ন্যাসী চিমটা লইয়া উঠিল। একটা সাপ, আলো ও মানুষ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তরুণের হাত ধরিয়া বসাইল। মরুক বেটা, তুমি ব'স।

তরুণ বসিয়া এবার প্রশ্ন করিল, রূপলালকে তুমি চিনতে? এতক্ষণে তাহার প্রশ্নটা সম্বন্ধে খেয়াল হইয়াছে।

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রামবাবুর কাছে আমি যেতাম যে, হরদম যেতাম। ঠাকুর-বাড়িতে থাকতাম। রূপলাল আমার কাছে থাকত। এই এতটুকু বেলা থেকে রূপলাল বাবুদের বাড়িতে থাকত। রামবাবুর কাকার কাছে শিখেছিল গাঁজা খেতে। লোকে তাঁকে বলত, ছোটকত্তা। ছোটকত্তা গাঁজা খেতেন—ইয়া রূপোর কল্কে, আর সকাল থেকে গাঁজা ভিজানো থাকত গোলাপজলে। আতর দিয়ে সেই গাঁজা টিপে, চন্দনকাঠের কাটনিতে কেটে, সেজে দাঁত-বাঁকা বাঁড়ুজ্জে হাতে ক'রে ধরত, ছোটকত্তা মুখ লাগিয়ে টানতেন। রূপলাল তখন ছোকরা। ছোটকত্তা ডেকে বলতেন, লে বেটা, পেসাদ লে। এক টান টেনেই রূপলাল তিন দিন প'ড়ে ছিল নেশার ঘোরে। সে আবার সকৌতুকে নির্ব্বোধের মত হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। যেন মনশ্চক্ষে সে দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া সহসা সে গদ্গদ হইয়া উঠিল, বলিল, মহাশয় লোক ছিলেন ছোটকত্তাবাবু। তিনিই ছিলেন বাবুদের মেনেজার। তাঁর হাতেই ছিল সব। রূপলালের দুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন তিনি রোজ এক পো ক'রে, ঠাকুরদের পেসাদী দুধ। তারপর আরম্ভ করলে দুধ চুরি ক'রে খেতে। চাষবাড়ি থেকে—

তরুণ সন্ন্যাসী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমি কি জান হে বাপু?

প্রৌঢ় এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল, জানি জানি, সব জানি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনবার পথে পো-পো ক'রে মেরে দিত আধ সের তিন পো। তারপর ঝরনার জল মিশিয়ে—। হা-হা করিয়া হাসিয়া সে আবার গড়াইয়া পড়িল। অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া বলিল, ধরেছিলাম

আমি একদিন রূপলালকে। তা রূপলাল কি করবে বল? ছোট-কত্তাবাবুর বরাদ্দ বাবুরা সব বন্ধ ক'রে দিলে। তখন আবার গাঁজার ওপর আফিম মদ দুই ধরেছে রূপলাল। রামবাবু ধরিয়েছিলেন আফিম, রামবাবুর ছেলে ধরিয়েছিল মদ। তা একটুকু দুধ না হ'লে—

বাধা দিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, দুধ চুরি ক'রে খাক, রূপলাল ভাল লোক ছিল।

প্রৌঢ় বলিল, শুধু দুধ? রূপলাল ঘোড়ার দানাও চুরি করত। তা বাবুদের বউরা কিছু বলত না, বলত নিক, দু চার মুঠো ছোলাই তো!

তরুণ কঠিন হাসি হাসিয়া বলিল, বলবে কি? বলি, বলবে কি বউয়েরা? বউরা বলতে গেলে, বউদের কীর্ত্তিও যে রূপলাল ব'লে ব'লে দেবে শাসাত। বউরা যে দোকান থেকে সন্দেশ আনিয়ে খেত গুরগুর ক'রে!

প্রৌঢ় কিন্তু হাসিতেছিল। সে হাসি তাহার অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল, তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে চোখ পড়িতেই প্রৌঢ় দেখিল, চোখ তাহার ঝকমক করিয়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল, কি?

খপ করিয়া প্রৌঢ়ের হাত ধরিয়া যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি এত সব জানলে কি ক'রে?

প্রৌঢ়ের দৃষ্টি ভয়াবহ হইয়া উঠিল, বলিল, জানিস আমি কে?

কে?

হেঁ-হেঁ-হেঁ। অঘোরপন্থী। আমি মড়ার মাংস খাই। আমার বয়স কত জানিস?

কত?

দেড়শো বছর। আমি কর্ত্তাবাবুকে দেখেছি, তখনও আমি এমনই। এখনও আমি এমনই। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বসিয়া রহিল। আপনার চামড়ার বালিশটি টানিয়া লইয়া তাহার উপর আরাম করিয়া বসিয়া প্রৌঢ় আবার হাসিতে আরম্ভ করিল, আমি সব জানি। কোথা কি হচ্ছে, তুই কি ভাবছিস, সব আমি জানতে পারি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনা ছাড়িয়ে দিলে রূপলাল দুধ খেত কি ক'রে জানিস? দুধের কড়াতে সরের ভেতর লম্বা একটা খড়ের নল পুরে দিত হেঁ-হেঁ-হেঁ। বাস্, কে ধরবে ধরুক।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, ছাই জান তুমি।

হেঁ-হেঁ-হেঁ। ছাই জানি আমি? তবে বলব, রূপলালের চাকরি কি ক'রে গেল? শুনবি? রসগোল্লা চুষে রস খেয়ে জলে চুবিয়ে নিয়ে এসেছিল; তাতেই তো চাকরি গেল রূপলালের। সব জানি আমি।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, তারপরে?

তারপর আবার কি? রূপলাল পালিয়ে গেল।

ছাই জান তুমি। খুঁটিতে বেঁধে জুতোপেটা করেছিল তাকে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড। রূপলালকে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিল আর এক পার্টি জুতো সেখানে রেখেছিল। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকেই ডেকে বলে, মার এক জুতো। তাহার চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। এ লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সেই নির্ব্বোধ হাসি হাসিয়া বলিল, রূপলাল মারের দাম তুলে নিয়েছিল, তিনটে ঘড়ি ভেঙে দিয়েছিল ঢুই ঢাই ক'রে।

যুবক বলিল, বাবুরা বলে, একটা সোনার চেন—

মাইনে দিলে না কেনে, তাই মায় সুদ উসুল ক'রে দিলে রূপলাল। হেঁ-হেঁ-হেঁ।—বলিয়া সে খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া যুবক সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বলিল, লে, তৈরি কর।

দুইজনেই স্তব্ধ; এতক্ষণে অরণ্যের রহস্যময় শব্দ রূপ তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির ঝিল্লি, ছোট পেঁচার কুঁক-কুঁক শব্দ, বড় পেঁচার কর্কশ ধ্বনি, বাচ্চাগুলার অস্ফুট ভাষা—ঠিক শিসের শব্দ, কলহরত শৃগালের ডাক, সরীসৃপের বুকে হাঁটার পত্রমর্ম্মর-শব্দ, দ্রুত-ধাবমান চতুষ্পদের পদধ্বনি, সকলের উপরে সুদীর্ঘ গাছ-গুলির মাথার উপর পুরাতন শোকের বিলাপধ্বনির মত শকুনের ডাক, রবহীন মূকের হাসির মত বাদুড়ের পাখার শব্দসমন্বয়ে স্থানটি তন্ত্রোক্ত মায়াপুরীর মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। গাঁজা টানিয়া প্রৌঢ় হাসিল, সেই হাসি—হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলে, এখানে দানাদত্যি নাচে, ভৈরবনাথ ত্রিশূল হাতে ঘুরে বেড়ায়, মা কালী মড়ার মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। মিছে কথা—সব মিছে কথা।

যুবক সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, উঁহু, ভূত মিছে নয়। জেল-খানায় ফাঁসির আসামী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে—। অকস্মাৎ সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বাপ রে! থরথর করিয়া সে কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় তাহাকে ধরিয়া হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। ভয় লাগছে? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া যুবক বলিল, খু-ব করুণ সুরে উঁ-উঁ ক'রে কাঁদে। ফোঁস-ফোঁস ক'রে ফোঁপায়। ঠিক রাত্রি দুপুর থেকে রাত চারটে পর্য্যন্ত।

কাঁদে? ফোঁপায়?

হ্যাঁ। উঃ, সে যে কি দুঃখ তার! যুবক আবার শিহরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় এবার ঝুলি-ঝাপটা হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া বলিল, তোর পাত্তর আছে? নিয়ে আয়। নিজে একটা নারিকেলের খোলা বাহির করিল।

যুবক ধুনি হইতে একটা জলন্ত কাঠ লইয়া ওদিকে অগ্রসর হইল, বলিল, সে শালা আবার কোথা আছে—

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, দূ-র বেটা। বাসুকীর ফণার ওপরে থেকে সাপকে ভয়? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পাত্র আনিয়া রাখিতেই প্রৌঢ় খানিকটা মদ তাহাতে ঢালিয়া দিল, নিজের পাত্র তুলিয়া লইল।

যুবক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সাধন-ভজন করবে না? নিবেদন করবে না?

ধে-ৎ! নিবেদন! নিবেদন ক'রে কি হবে রে? খেয়ে লে। পেটে গেলেই কাজ করবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যুবক বলিল, রামবাবু থাকলে কিন্তু রূপলালের এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। ভারী ভালবাসত, রামবাবু কখনও রূপলাল বলত না, বলত—লালরূপ। রূপলালও বাবুকে ভারী ভক্তি করত। বাবুর দুধে সে কখনও মুখ দিত না। বাবু ডাকত—লাল—রূ-প! না, হোজোর! জোড়হাত ক'রে রূপলাল দাঁড়াত। বাবুর অসুখ হ'লে লালরূপকে না হ'লে চলত না। অহরহ লালরূপকে চাই, টেপ বেটা, পা টেপ। সমস্ত রাত ব'সে ব'সে বাতাস করত। ঝুড়ি ঝুড়ি ময়লা, মেথরের মত রূপলাল ফেলত। বাবু বলত, তুই বেটা, আমার ছেলে ছিলি রে আর জন্মে।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জানি রে জানি, একটুকুন অসুখ হ'লেই বাবুর পেট খারাপ হ'ত যে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। গিন্নীরা সব প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোত, ছেলেরা ঘুমোত। রূপলাল সারারাত জেগে ব'সে থাকত। বাবুর টাকাকড়ি, বোতাম, ঘড়ি সবসুদ্ধ জামা বাবু রূপলালের হাতে দিত; একটি আধলা কখনও যায় নাই। ওই দুধ মিষ্টি, ওতেই ছিল রূপলালের

যত লোভ। লোভের জিনিস কিনা! হেঁ-হেঁ-হেঁ। আর বাবুদের বাড়িতে একজনা ঝি ছিল, জানতে তাকে? কামিনী, কামিনী তার নাম। সেই রূপলালের ছিল সব। রূপলালই তাকে বাবুদের বাড়িতে এনেছিল। একটি ছেলে ছিল কামিনীর। ভারী সোন্দর ছেলে—

কাত্তিক?

হ্যাঁ, কাত্তিক।

যুবক বলিল হ্যাঁ, সেই কাত্তিককে সে দিত কিনা দুধ সন্দেশ। লুকিয়ে লুকিয়ে দিত তাকে। কাত্তিক রামবাবুর লাতিকে কোলে নিয়ে থাকত। বাবুদের থিয়েটারে সে রাধা সাজত। প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া বলিল, আমরা সব খেলা করতাম কাত্তিকের সঙ্গে। ভারী ভাব ছিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জান, কাত্তিক যখন ছোট ছিল, তখন রূপলাল তাকে আদর করত। কামিনী কাজ করত, রূপলাল তাকে ঘুম পাড়াত। তা কাত্তিক আবার বলত, বাবা, তোমাকে আদর করি! রূপলাল বলত, কর কেনে। কাত্তিক বলত, তোর চোখে খুঁচে দি!—বলিয়া প্রৌঢ় গমকে গমকে হাসিতে লাগিল। সে আবার নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া সঙ্গীর পাত্রও পূর্ণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ শৃগালের সমবেত উচ্চধ্বনিতে, পেঁচার দীর্ঘ কর্কশ রবে বনভূমি মুখর চকিত হইয়া উঠিল, বাসায় বাসায় পাখীর পক্ষবিধুনন ও দলে দলে উড়ন্ত বাদুড়ের পাখার শব্দে নিশীথিনী যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। আকাশ হইতে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রৌঢ় বলিল, জুতো খেয়ে রূপলালের ভারী লজ্জা হয়েছিল, তাই কামিনীর সঙ্গে, কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতেও পারে নাই। পালিয়ে গিয়েছিল। তা নইলে—

যুবক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাত্তিক ভারী কেঁদেছিল কিন্তু। খু—ব কেঁদেছিল।

প্রৌঢ় বলিল, তার পরেও রূপলাল একদিন গিয়েছিল, লুকিয়ে কামিনী-কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতে। তা ভাবলে, দেখলে তো তারা সঙ্গ ছাড়বে না। রূপলালের কিই বা ছিল যে, তাদের খাওয়াত বল? তাতেই আর—

রূঢ় স্বরে যুবক বলিল, রূপলালও যা খেত, তারাও তাই খেত। না হয় উপোস ক'রেই থাকত। কাত্তিক তো বাঁচত তা হ'লে!

কাত্তিক ম'রে গিয়েছে?

যুবক চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বাবুর লাতি যে রূপলালকে দেখে 'রূপলাল রূপলাল' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। রূপলাল ছুটে পালাল। ধরলে তো ছাড়ত না বেটা বাবুরা, ধ'রে পুলিসে দিত চুরির জন্যে। খানিক দূর গিয়ে রূপলাল দেখলে, ছেলেটা নাই। তার পরেই দেখলে, ছেলেটা পুকুরের জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। রূপলাল ছুটে যাচ্ছিল তুলতে, কিন্তু দারোয়ানটা তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সে কোথা কাছেই ছিল। পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে রূপলাল পালিয়ে গেল, দেশ দেশান্তর কত জায়গা ঘুরে চ'লে গেল হিমালয়। আর দেখা হয় নি আমার সঙ্গে।

যুবক বলিল, দারোয়ান কেনে তুলবে? ছেলে ম'রে ভেসে উঠেছিল। কাত্তিক খোকাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়াতে একটা ছুঁড়ী ঝিয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করা করছিল।

প্রৌঢ় দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল, ভাগ বেটা, তুই কিছুই জানিস না। কাত্তিক খুব ভাল ছেলে।

যুবক হাসিল, তুমি জান না, এখন শোন, মেয়েটা চ'লে গেলে কাত্তিক এসে খোকাকে খুঁজে না পেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। বিকেলে ছেলে ভেসে উঠল জলে। গায়ে একখানিও গয়না নাই। লোকে বললে, কাত্তিকই জলে ডুবিয়ে মেরেছে গয়নার লোভে। পুলিস ধ'রে নিয়ে গেল কাত্তিককে। কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। কথা শেষ করিয়া সে মদের বোতলটি টানিয়া লইল।

প্রৌঢ় বাঘের মত ঝাঁপ দিয়া বোতলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আছাড় মারিয়া সেটাকে চূর্ণ করিয়া দিল। উগ্র সুরার গন্ধ ধুনির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বায়ুস্তর ভারী করিয়া তুলিল। যুবক অবাক হইয়া গিয়াছিল। প্রৌঢ় উঠিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল, শালা, মদ খেতে এসেছ, গাঁজা খেতে এসেছ? নিকালো শালা। বেরোও বলছি।

যুবক অকারণে অতর্কিতে মার খাইয়া ভীষণ ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ় তখন চিমটা লইয়া উঠিয়াছে। যুবক আর সাহস করিল না, নাটমন্দিরের বিষনিশ্বাস স্মরণ করিয়াও সে অন্ধকারে অন্ধকারে ভোগমন্দিরের দাওয়ায় গিয়া বসিল।

দুইজনেই স্তব্ধ। ধুনির অগ্নিশিখা নিবিয়া গিয়াছে, আর ফুঁ দেওয়া হয় নাই। জলন্ত অঙ্গারের উপর ভস্মের আবরণ পড়িয়াছে। নিরন্ধ্র অন্ধকার। মৃদু ধারায় বর্ষণ এখন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর অবিরাম ধ্বনি—রাত্রির চরণের নূপুরধ্বনির মত বাজিতেছে, রাত্রি চলিতেছে। কেবল একটা পেঁচার অস্পষ্ট অথচ উচ্চ স্যাঁ—স—স্যাঁ—স শব্দ গুপ্ত অস্ত্রের মত রাত্রির অন্ধকার চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রৌঢ় আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। আকাশ নাই, মেঘের অস্তিত্বও দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু অন্ধকার।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত বহিয়া চলিয়াছিল, অরণ্যের বহু এবং বিচিত্র ধ্বনি তেমনই ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। তৃতীয় প্রহর-শেষে আবার একবার ধ্বনি উচ্চ হইয়া উঠিল; কিছুক্ষণ পরেই ডাকিয়া উঠিল পাখী। ঘন

মসীলিপ্ত আকাশেও আলোর দীপ্তি দেখা দিয়াছে। অরণ্যের মায়াপুর স্তব্ধ হইয়া আসিল ; চারিদিক বেশ দেখা যায়।

যুবক সন্ন্যাসী দেখিল, প্রৌঢ়ের মুখে চোখে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, লোকটা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, যেন আর কখনও কথা বলিবে না।

যুবক আপনার জিনিসপত্র গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে একবার দাঁড়াইল, বলিল, যাবে না ?

প্রৌঢ় স্তব্ধ হইয়া যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল ; কোনও উত্তর না পাইয়া যুবক পথে পা বাড়াইল। সহসা প্রৌঢ় ধরা গলায় ডাকিল, শোন।

কি ?

কামিনীর খবর জান ? কামিনী ?

কাত্তিকের মা ?

হ্যাঁ।

সে—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবক বলিল, ছেলের ফাঁসির হুকুম শুনে সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

প্রৌঢ় অঘোরপন্থী দীর্ঘায়ু সাধু বোধ হয় সংবাদটা জানিত, কারণ সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল বিমূঢ়ের মত বার কয়েক সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বোধ হয় জানাইল, হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, মনে ছিল না, মনে পড়িয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, মা বেটা দুজনের ফাঁসি হয়ে গেল! আবার সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। রূপলালেরও ফাঁসি হবে।

যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি খানিকটা ক্ষ্যাপাও বট। কাত্তিকের ফাঁসি কেনে হবে ? জজ কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল, কিন্তু অল্প বয়েস ব'লে লাটসাহেব ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ফাঁসি হয় নাই ?

না।

যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রৌঢ় সেই নির্ব্বোধ বিনীত হাসি হাসিল ; তারপর সাদরে আহ্বান

জানাইয়া বলিল, ব'স, গাঁজা খাও। হেঁ-হেঁ-হেঁ। পেভাতী ভাতি শুতি, পেভাতে পেভাতী, ভাতের পর ভাতি, শোবার সময় শুতি ; হেঁ-হেঁ-হেঁ। পেভাতীটা হয়ে যাক।

যুবক বসিল। গাঁজা তৈয়ারি করিয়া নিজে টানিয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল, খাও। কষিয়া টান মারিয়া যুবক দম ধরিয়া বসিল। কল্কেটি হাতে লইয়া প্রৌঢ় বলিল, দ্বীপান্তর সে কোথা বটে ?

চোখ বিস্ফারিত করিয়া যুবক বলিল, আ—ন্দা—মান। সমুদ্দুরের ভেতর দ্বীপ। জাহাজে ক'রে যেতে হয়।

হ্যাঁ ?

হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কল্কেতে টান দিল। যুবক এবার বলিল, আচ্ছা, রূপলাল হিমালয়ে আছে বলছিলে! তা—

প্রৌঢ় ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, কোন গুহাতে-মুহাতে থাকে, কে জানে! হাজার হাজার গুহা তো সেখানে।

যুবক কল্কেতে আবার টান মারিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল। আর নাই। ঝুলির মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া প্রৌঢ় উঠিল, সঙ্গে যুবকও উঠিল।

বিদায়সম্ভাষণব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া যুবক বলিল, আচ্ছা।

প্রৌঢ়ও সেই নির্ব্বোধ হাসি হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। আচ্ছা।

দুইজনে দুই বিপরীত মুখে পথ ধরিল। যুবক উত্তর মুখে—উত্তর দিকে হিমালয়, প্রকাণ্ড পাহাড়, তাহাতে হাজার হাজার গুহা। দেড় শো বছর বয়সের অঘোরপন্থী বলিয়াছে, হাজার হাজার গুহা সেখানে।

প্রৌঢ় চলিল, দক্ষিণ মুখে—দক্ষিণ দিকে নাকি সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ আন্দামান। কূলে পৌছিতে পারিলে দাঁড়াইয়া হয়তো দেখা যাইবে। নয়তো নৌকা-টৌকাও তো যায় আসে।

কিন্তু সে কত দূর ? বিপদ তো পথে! এমনই জনমানবহীন জঙ্গল, ভূত-প্রেতের পুরী, ভয়াবহ নির্জ্জনতা তো সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না!

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

"শার্দ্দূল" অঙ্কিত

অ্যাক্‌সিডেন্টাল আর্ট

ক্যাবলা হাসিতেছে

আর্টে পঞ্চকন্যা

১। তন্বী ২। সুবচনী ৩। সুহাসিনী ৪। সুনয়নী ৫। জননী

পূজার চিঠি

পত্র

আসে পূজা—
দশভুজা
এবারেও ;
দুইভুজে
তাঁরে পূজে
এবারেও।
আশা করি,
প্রাণ ভরি
এবারেও
পাব তাই,
যাহা পাই
ফি বারেই।
তুমি কি
আসিবে ভাই
এবারেও ?

ভাগলপুর "বনফুল"

জবাব

এল পূজা এবারে
পড়িতেছি পেপারে—
কথাটা সত্যি নাকি ভাই রে ?
এদিকের আকাশে—
বাজারে কি বাতাসে
কোনো পাত্তাই তার নাই রে।

ওদিকের পুকুরে
কালো জলটুকুরে
কমল কি নির্ম্মল করল ?
রোদ হ'ল সোনালী ?
খাল বিল প্রণালী
কুমুদ ও কহ্লারে ভরল ?

শহরে ও পাড়াগাঁয়
মেয়েদের সারা গায়
নতুন কাপড়-জামা চড়ল ?

ছোট ছেলে-মেয়ে সব
জুড়ে দিল উৎসব—
বোধনের ঢাকে কাঠি পড়ল ?

মন করে ছটফট—
চ'লে যাই ঝটপট
কাজের শিকল বেড়ি ভাঙিয়া ;
যত করি যাই যাই,
ট্যাঁক বলে—নাই নাই !
ট্যাঁকের চক্ষু উঠে রাঙিয়া।

এদিকে শুনছি নাকি
পরিয়া পোষাক খাকী
শিগগিরি আসছেন শ্যামা মা
সমুদ্র-পার হতে
চাপিয়া বিমান-রথে
বাজাইয়া ডঙ্কা ও দামামা।

ব্ল্যাক-আউট ক'রে তাই
বসিয়া আছি রে ভাই,
আঁধার-সাগরে খাই চোবানি ;
মনে মনে ডাকি—ওমা,
মাথায় ফেলো না বোমা,
আর যা কর তা কর ভবানী।

সুতরাং ভাই রে
আশা কিছু নাই রে
ঘরপানে ফিরিবার এবারে,
বরং অকস্মাৎ
গুরু শোক-সংবাদ
পাইলে পাইতে পার পেপারে।

বোম্বাই "চন্দ্রহাস"

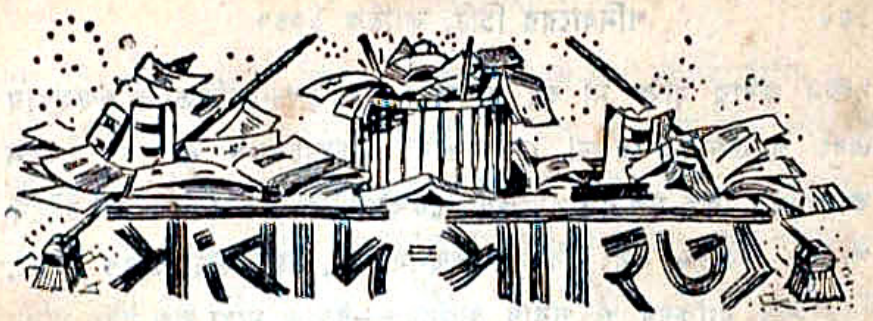

মাসিক 'শনিবারের চিঠি' ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। অর্থাৎ যে যুগে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, সেই যুগ সমাপ্ত হইল। এই উক্তি শুধু গাণিতিক হিসাবেই সত্য নয় ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ব্বাপর গতিপ্রকৃতি বিচার করিলেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 'শনিবারের চিঠি'র সূত্রপাতকালে সে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল, বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাহা অনেকখানি শান্ত ও সংহত হইয়াছে ; গল্প ও উপন্যাস বিভাগে সত্যকার বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী শিল্পীর আবির্ভাবে সাহিত্যরসিকগণের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের তিরোভাবে আমাদিগকে যে নিতান্ত পঙ্গু হইয়া পড়িতে হইবে না, এ বিষয়েও অনেকে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

* * *

কাব্যের ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন প্রবল। অতি-অর্ব্বাচীন তরুণেরা এবং শিং-ভাঙা তরুণম্মন্য প্রবীণেরা যে অসভ্য ব্যবহার সুরু করিয়াছেন, তাহাতে ইতিমধ্যেই বীণাপাণির "ত্রাহি ত্রাহি" আর্ত্তনাদ মর্ম্মভেদী হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে স্বৈরাচার বৃদ্ধি পাওয়াতে রসিকের চিত্ত বিকল হইয়াছে। শাশ্বত শিল্পসুষমা ও চিরন্তন রসরূপকে বস্তাপচা পুরাতন বলিয়া বাতিল করিয়া এক শ্রেণীর কিম্ভূতকিমাকার শব্দ ও পংক্তি গ্রন্থনকে কবিতার নামে চালাইবার প্রাণান্তকর প্রয়াস দল-বিশেষের মধ্যে দেখা যাইতেছে। কাব্যে ছন্দ ও মিলের প্রাধান্যকে

বর্জ্জন করার যুক্তি না হয় বুঝিলাম ; অতিশয়-লালিত্য ও শব্দঝঙ্কার এবং গা-এলাইয়া-দেওয়া পেলবতার বিরুদ্ধাচরণও না হয় সমর্থন করিলাম ; কিন্তু মূল বস্তু রসকেই একেবারে বর্জ্জন করার কি অর্থ হইতে পারে ? বিচিত্র এবং বিসদৃশ শব্দসমাবেশ, উদ্ভট উন্মাদসুলভ উপমা, বিজাতীয় ব্যাকরণ ও পুরাণ অনুসরণ—ইহার মধ্যে সুস্থ সবল মনের কোনই পরিচয় নাই ; পথভ্রান্ত বিকৃত মনোবৃত্তিরই নিদর্শন মিলিতেছে। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা সত্যকার কাব্যরসসৃষ্টির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই বীভৎস "মান্নার জাতে" এক পাশে চলিয়া শুচিতা রক্ষা করিতে ব্যস্ত অথবা গৃহকোণে ভয়ে স্তব্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই প্রবীণেরাই এই তাণ্ডবে অধিক মাতামাতি করিয়া অপেক্ষাকৃত তরুণদের সহজ বুদ্ধি আবিল করিয়া তুলিয়াছেন।

* * *

ইহার একমাত্র প্রতিকার, সত্যকার সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্ভবে ; সত্যকার রস-বিচারের প্রবর্ত্তনে। কাহার কি মূল্য, বৈজ্ঞানিক বিচারের দ্বারা তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। এ যুগে শুধু আপ্তবাক্যের দ্বারা কোনও কিছুকে নস্যাৎ করা সম্ভব নয়। সুখের বিষয়, এ দিকে দুই-একজন চিন্তাশীল সহৃদয় লেখক ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন এবং সাহিত্যরস-বিচারের একটা বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিও ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। উপন্যাস-গল্পের ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি ইঁহাদের চেষ্টায় অনেকখানি পরিষ্কৃত ও ইষ্টানিষ্টবিবেচনাগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যমার্গেও এরূপ ঘটিলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিতান্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক থাকিবে না।

* * *

গত যুগে অর্থাৎ বিগত বারো বৎসরের মধ্যে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির ঐতিহ্য ও সামাজিক জীবনের ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ কার্য্যে আশ্চর্য্য রকম অগ্রসর হইয়াছি ; ইহাও খুব আশার কথা। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকজন অধ্যবসায়ী পুরুষের ব্যক্তিগত উদ্যম প্রশংসনীয়। বাংলা অভিধান, কোষগ্রন্থ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র, কয়েকটি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশের দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক ইতিহাসও এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত হইতেছে। এ দিক দিয়া আমরা যে বিশ্ব-সাহিত্যের পংক্তিভোজনে জাতে উঠিতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

সমাজ এবং রাষ্ট্রের কথা বলিব না, আমরা সে বিষয়ে অধিকারী নহি। সাহিত্য ব্যাপারে ইহাই বলিতে পারি যে, উপকরণ-সংগ্রহ অর্থাৎ মজুরির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সত্যকার শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন রাজমিস্ত্রীর আবির্ভাব ঘটিলে অতঃপর তাজমহল নির্ম্মাণ অসম্ভব হইবে না। মোটের উপর, গত যুগ আমাদের পক্ষে ভালই গিয়াছে। নূতনতর প্রত্যাশা লইয়া 'শনিবারের চিঠি' ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ যুগান্তরে প্রবেশ করিল।

—

একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় যেখানে যত কবিতা লেখা হইয়াছে, প্রথমে তাহার বাছাই হয় ; এই বাছাই-করা কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠতম একটি স্ট্যাঞ্জা বাছাই করিয়া তাহার লেখককে পুরস্কৃত করার কথা ছিল। মোট ৩৫ জন কবির ১০৮টি আধুনিক কবিতা প্রথম নির্ব্বাচনে পাসমার্কা

পায়; ৮০ হইতে ২০ বৎসর বয়সের কবিরা এই বাছাইয়ে স্থান পাইয়াছেন। দ্বিতীয় নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত স্ট্যাঞ্জা কয়েকটি পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি সে বিষয়ে আমাদেরও মতামত চাওয়া হইয়াছে। আমরা আমাদের পাঠকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। পক্ষপাতিত্ব-ভয়ে কবিদের নাম দেওয়া হয় নাই, নির্ব্বাচনকারীকেই বলিয়া দিতে হইবে, শ্রেষ্ঠ স্ট্যাঞ্জাটি কাহার রচনা।

১। মিসেস্ পিথেক্যান থ্রোপাস ইরেক্টাস (অব জাভা) থেকে
আজকের এমি, অ্যানি, সীতা, গীতা;
নারী সব মেয়েলীতে ভরা,
ব্যক্তিত্বের পাত্তা নেই মোটে।
পিথাগোরাস, প্লেটো, সুইফ্‌ট, ওয়েগ্‌নার—ক্রিশ্চিয়ানিটি
এবং ইবসেন, বৃথাই কাঁদলেন

২। আকাশ ছোঁয়া বিরাট Studio
হাজার power-এর punch light
Microphone
Camera
তার সাম্‌নে ধুতী আর শাড়ী-পরা
মাংসের automobile.

৩। ধরো দাস্তের ইস্পাতী দৃষ্টি, ধ্যানের ইরাণী
নীল গম্বুজ, রবীন্দ্রনাথের "প্রাণগঙ্গা" কবিতা;
সোভিয়েট কল্পনা, পাশ করে জলপানি,
মোগলবাগান, হিন্দুকুশ, টেলিভিশন, প্রসন্ন মধ্যবিত্ত ঘর,
চাঁপাগাছ, মিকি মাউস;

৪। হও স্ত্রী, হও স্ত্রীলোক—দয়ার শ্বেত দেবী নয়,
নয় ছন্দের সুষমায় ঢালা মহিলা!
অনেক দেখেছি তোমার দয়া-শ্বেত ভালোবাসার লীলা—
আর নয়!

৫। স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম।
—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।

৬। কে বুঝেছে সব নয়?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায়;—তাই ভেঙে ধ্বংসে গেল অমোঘ সমিতি;—
অযীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া?

জবাব পাঠাইতে হইবে সোজা কলিকাতার "কবিতা-ভবনে"।

—

আশ্বিনের 'প্রবাসী'র "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগে (পৃ. ৭৮৭) শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী ও সীতা দেবী প্রণীত দুইখানি উপন্যাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক-পরিচয়ের আদর্শ এইরূপই হওয়া উচিত। কোন্ লেখার জন্য কোন্ পত্রিকার কাটতি বাড়িয়াছিল, কোন্ উপন্যাস পড়িয়া কোন্ দেশের রাণীর 'মাথাধরা' সারিয়াছিল, ইহা জানিবার জন্যই তো পাঠকের আগ্রহ! দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের কন্যা নই, হইলে, আমাদের যে প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের এক আত্মীয়া তিন মিনিটে হাঁসের মাংস সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার সংবাদও 'প্রবাসী'-পাঠকেরা পাইতেন! 'ক' শুধু কৃষ্ণপ্রেমই জাগ্রত করে না, ওই পুঁটলিসম্বল ত্রিকোণাকার অক্ষরটি ভেদ করিয়া পিতৃস্নেহও উপচিয়া উঠিতে পারে!

—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র পাক্ষিক (=সাম্প্রদায়িক!) 'তত্ত্ব-কৌমুদী'পত্রের ৬৩ ভাগ ১০ম সংখ্যায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—১। বিংশ শতাব্দীর গবেষণা—এস. সি. সেন, ও ২। রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন—যোগানন্দ দাস। এই দুইটি প্রবন্ধেই আমরা উল্লিখিত হইয়াছি। সুতরাং জবাবদিহি আবশ্যক

হইয়াছে। স্থানাভাবে বিস্তারিত "গবেষণা" সম্ভব নয়। প্রবন্ধ-লেখকদের দুই একটি যুক্তির কথাই বলিব।

ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িকতা লইয়া আমাদের কারবার নয়, আমরা সাহিত্য-ব্যবসায়ী। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া কাহার কি দান, তাহা নির্ণয় করাই আমাদের কাজ। লেখকদের রচনার নিদর্শন যাহা আজও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, মূলত তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিচার করিতে বাধ্য, সমসাময়িক সাক্ষ্যও মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়। মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের রচনার তুলনামূলক বিচার করিয়াই দেখাইয়াছি যে, বাংলা গদ্যের জনকত্বের দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের অধিক, প্রধান যুক্তি এই যে, মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের অগ্রজ—রাম-মোহনের প্রথম বাংলা-রচনার ১৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি বাংলা গদ্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচনাও রামমোহনের অপেক্ষা অধিক শিল্পগুণসম্পন্ন ছিল। আমরা যথাসাধ্য যুক্তি দিয়াছি। যাঁহারা ইহা মানিবেন না, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ভিন্নমত পোষণ করিতে পারেন।

"জনকত্ব" ব্যাপারে ভবানীচরণ মোটেই রামমোহনের প্রতিপক্ষ নন, কারণ তিনি পরবর্ত্তী সাধক। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে'র বীজরূপ। ভবানীচরণ মদ খাইতেন কি না, যবনীগমন করিতেন কি না, জাল উইল করিয়া আত্মীয়দের ঠকাইয়াছিলেন কি না, জুয়াচুরি করিতেন কি না, বদ-জোবান ব্যবহার করিতেন কি না, এসব খবর আমাদের বিচারে আসে না। অবশ্য তিনি পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইতেন কি না, তাহা

নিশ্চয়ই বিচার্য্য। রামমোহন সম্বন্ধেও এই অপবাদ আছে, ভবানীচরণ সম্বন্ধেও কেহ এই নিন্দা রটাইতে পারেন; কিন্তু আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছি যে, 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি গ্রন্থ ভবানীচরণেরই রচনা। সেই রচনাগুলি বর্ত্তমান আছে; তিনি সক্ষম, কি অক্ষম ছিলেন, তাহার প্রমাণ এগুলির মধ্যেই আছে। আমাদের সাফাই নিষ্প্রয়োজন।

মূল দ্বন্দ্ব সাহিত্যবিচার লইয়া, সাম্প্রদায়িকতার স্থান ইহাতে নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে এ বিষয়ে মাত্রাজ্ঞানহীন আলোচনা হইতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্ম হিন্দুতে কোনও বিরোধ নাই। খোঁচাইয়া এ বিরোধ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আর একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

* * *

ধর্ম্ম-সমাজের কাগজে কি-জাতীয় ধর্ম্মাচরণ হইতেছে, এস. সি. সেনের প্রবন্ধেই তাহার সন্ধান আছে। ঐতিহাসিক গবেষণা উপকরণ-সংগ্রহের উপর নির্ভর করে, সকল উপকরণ একেবারেই সংগৃহীত হয় না, নূতন উপকরণ পাইলে প্রত্যেক ঐতিহাসিকই তাঁহার পূর্ব্বমত বদলাইয়া থাকেন। মেজর বামনদাস বসুর (*Education in India Under E. I. Co.*, পৃ. ৩৮) একটি ভ্রান্ত মত অনুসরণ করিয়া ১৯৩৪ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভুল করিয়াছিলেন (সার্ এডওয়ার্ড হাউড ঈস্ট ও রামমোহনের পরিচয় সম্পর্কে), ১৯৩৫ সালের জুন মাসে (১৩৪২, আষাঢ়—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-৯৮) ব্রজেন্দ্রবাবু স্বয়ং সকল তথ্য প্রদর্শন করিয়া সে ভুল সংশোধন করিয়াছেন। হঠাৎ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যদি তাঁহাকে সেই পুরাতন ভুল লইয়া গালিগালাজ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি বলিব? লেখক ভালই জানেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়াছেন, তথাপি তিনি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহা চাপিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে এই চালাকি এস. সি. সেন করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'র আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?

* * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানাভাবে সকল চালাকি ধরাইতে পারিব না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই লেখকের সততার প্রমাণ দিলাম। অপর প্রবন্ধটি

সম্বন্ধেও একই কথা। এই প্রবন্ধে যোগানন্দ দাস দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যার প্রকাশকমাত্র ছিলেন, অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু মিথ্যা করিয়া তাঁহাকে সম্পাদক ও পরিচালক বলিয়াছেন। "প্রকাশ" শব্দের অর্থ লইয়া গোল বাধিয়াছে। যোগানন্দবাবু অনেক উদ্ধৃতি ও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান 'সমাচার দর্পণে'র (২৩ মার্চ ১৮২২) উদ্ধৃতিটি। সেটি এই—

ইস্তাহার—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সম্বিবেচক মহাশয়দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকা নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন.....

যোগানন্দবাবুর মতে স্বয়ং ভবানীচরণ এই ইস্তাহারে যখন নিজেকে "প্রকাশ"ক মাত্র বলিয়াছেন, তখন ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে সম্পাদক আখ্যা দিয়া out-Heroding Herod-পাপে পতিত হইয়াছেন। যোগানন্দবাবু নিজে উত্তেজিত না হইয়া যদি ধীরভাবে বিচার করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, পরের পংক্তিতেই তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্র "প্রকাশ" করার কথাই বলিয়াছেন, অথচ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ও পরিচালকও ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র যে-কোনও সংখ্যার শিরোনামায় ('বাংলা সাময়িক-পত্র'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৩এ মুদ্রিত ব্লক দ্রষ্টব্য) দেখা যাইবে সংস্কৃত শ্লোকে "...ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা" এইরূপ ছাপা আছে। একই ইস্তাহারের এক "প্রকাশে"র অর্থ যদি সম্পাদন ও পরিচালন হয়, অন্য "প্রকাশে"র অর্থ তাহাই অনুমান করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই অপরাধ করেন নাই। আসলে ভবানীচরণই যে 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। যোগানন্দবাবু বিরুদ্ধ পক্ষের কথাই অংশতঃ দেখাইয়াছেন। ইহাতে সত্যের মর্য্যাদা বজায় থাকে নাই।

* * *

আর একটি "ছোট্ট" সংবাদ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের সহিত যুক্ত করিয়া ভবানীচরণকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা লেখক করিয়াছেন; গুড়গুড়ে

"গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনার" ওস্তাদ ছিলেন, সুতরাং ভবানীচরণও সংসর্গে অপাংক্তেয় হইলেন। যোগানন্দ দাস সম্ভবতঃ জানেন না, এই গুড়গুড়েই রামমোহন রায়ের দক্ষিণহস্ত ছিলেন এবং সতীর বিরুদ্ধে রাজসরকারের নিকট দরবারে রামমোহনের পক্ষে ইনিই বক্তা হইয়াছিলেন। যোগানন্দবাবুর যুক্তি মানিতে হইলে শিষ্যের জঘন্যতা ও অশ্লীলতার জন্য রামমোহন কতখানি দায়ী, তাহাও বিচার্য্য।

ভবানীচরণ 'বেদান্তগ্রন্থ' লেখেন নাই, রামমোহনও 'নববাবু বিলাস' রচনা করেন নাই। দুই জনকে সামনা-সামনি দাঁড় করাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উত্তেজিত হইতেছেন কেন?

কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সম্মুখে গতবারের মত এবারেও তাঁত-শিল্পের প্রদর্শনী হইতেছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত প্রভৃতি যাঁহারা এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুর্দ্দিনে সত্যকার দেশের কাজ করিতেছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লওয়ার দিন আর নাই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করিয়া আমাদের ঘরণীদের প্রসাধন-বুদ্ধি জাগ্রত ও শিল্পবুদ্ধি সূক্ষ্মতর হইয়াছে। দেশের শিল্পীরা এই বুদ্ধিজাত কামনা চরিতার্থ করিতে না পারিলে গোল্লায় যাইবেন। যাঁহারা বিদেশী ও মিলের কাপড়ের কারবার করেন, তাঁহারা এই কামনার উপরেই কারবার করিয়া থাকেন। এই তাঁত-শিল্প-প্রদর্শনীতে আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সূক্ষ্মতায় এবং সৌন্দর্য্যে দেশের তাঁত-শিল্পও আর পিছাইয়া নাই। চমৎকৃত হইয়াছি। হাজার বক্তৃতায় যে কাজ না হইত, একটি প্রদর্শনীতেই সে কাজ হইবে। সহৃদয় দেশপ্রেমিকগণকে সগৃহিণী, অভাবে সভগিনী একবার এই প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিতে বলিতেছি।

শিল্প-বিভাগ

বন্যা—শিল্পী দ্বিজেশ্চন্দ্র ধর ('ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৪৭) কলিকাতার কালীতলায় কারণে এবং অকারণে জল জমিলে যে দৃশ্য হয়, তাহাকেই

বন্যা নাম দিয়া শিল্পী চরিতার্থ হইয়াছেন। বন্যা ছবিটির মধ্যস্থল ঠিক করিয়া মাথার দিক হইতে তলা পর্য্যন্ত একটি শাণিত ক্ষুর টানিয়া দিলে দুইটি নূতন ছবির জন্ম হয়। বামেরটির তখন নামকরণ হইবে সাথী, এবং পরেরটি—খোকা যুধিষ্ঠির অথবা ঘরমুখো। পরের দুইটি নাম বেমানান হইলে ডেঁপো রাখাল-বালক বলা যাইতে পারে। ডেঁপোর ছবিতে বোলপুরের কলমের গাছ দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু ফল ধরে নাই।

* * *

কংশ কারাগার—শিল্পী হেমেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ('ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৪৭) রাজার কারাগারে অনেক কিছু ঘটিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ still-born হইয়াছিলেন কি না জানা নাই—ভক্তরা এ বিষয় আলোকপাত করিলে সত্য ঘটনাটি জানা যাইবে। Black artএর প্রভাবে পড়িয়া প্রদীপটি শূন্যে ঝুলিতেছে—এমং অবস্থায় মহাপ্রভু দর্শনে দৃষ্টিভ্রমও হইতে পারে।

* * *

ভাদ্রশ্রী—শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৭) ভাদ্রশ্রী নামে প্রকাশিত ছবিটির original আমরা দেবীপ্রসাদের চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি। নকল আসলকে অকারণ প্রাণ ভরিয়া শাস্তি দিয়াছে। টোন ভ্যালু ও পার্‌প্‌ল(purple)এর উপর যে কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছে, তাহা ছাপাখানার প্রাপ্য, দেবীপ্রসাদের নয়।

শার্দ্দূল

আগামী সংখ্যা হইতে
বনফুলের
অভিনব উপন্যাস
রাত্রি
বাহির হইবে

পুস্তক-পরিচয়

মহাভারতম্—মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্। মূল, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ এবং পাঠান্তর সংগ্রহ ও নীলকণ্ঠকৃত টীকা সহ। ৪১ নং দেব লেন, কলিকাতা—মহাভারত কার্য্যালয় হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। স্ত্রীপর্ব্বের প্রথম খণ্ড পর্য্যন্ত মোট ১০৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা।

পুস্তক-পরিচয় লিখিতে বসিয়া মূল মহাভারতের প্রশংসা করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ এই মহাভারত, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এই একখানি মহাকাব্য আয়ত্ত করিতে পারিলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার ও রসভাণ্ডার আয়ত্তের মধ্যে আসে।

মহাভারতের অনেক সংস্করণ হইয়াছে এবং হইতেছে। বর্ত্তমান সংস্করণের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইল, যাহার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত। ১। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে বড় বড় বাংলা হরফে মুদ্রিত। ২। প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠের টীকা ইহাতে সম্পূর্ণ দেওয়া হইতেছে। ৩। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের স্বকৃত টীকা ইহার বৈশিষ্ট্য। ৪। পাঠান্তর দেওয়াতে পণ্ডিত পাঠকদেরও বিশেষ সুবিধা হইতেছে। ৫। মূলকে যথাযথ অনুসরণ করিয়া বঙ্গানুবাদ দেওয়াতে ইহার সাহায্যে মূলের রসগ্রহণ সহজ হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে সহৃদয় বাঙালী সমাজের কাছে আমাদের একটি বিশেষ নিবেদন এই যে, সম্পাদক সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়া শুধু বাংলা দেশের মুখ চাহিয়া এই ব্যয়বহুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নাগরী হরফে ছাপাইলে সমস্ত ভারতবর্ষ, শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পৃথিবী এই

গ্রন্থের খরিদ্দার হইত; ব্যবসায়ের দিক দিয়া তাঁহার প্রচুর সুবিধাই হইত। কিন্তু বাংলা দেশ নাগরী হরফে বিশেষ অভ্যস্ত নয়। যাঁহাদের জন্য তিনি এই ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার দিকে চাহিবেন ইহাই স্বাভাবিক। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া তিনি একক এই সাধনা করিয়া চলিয়াছেন, কোনও দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির সাহায্যে তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন নাই, এরূপ অবস্থায় বাঙালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাঁহাকে এই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য সাহায্য করা। মাসিক এক টাকা ব্যয় করিয়া এক এক খণ্ড মহাভারত সংগ্রহ করিবার লোকের অভাব বাংলা দেশে হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি না। এই মহাভারত সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙালীদেরই একটি মহতী কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাভাবে এমন একটি সৎকর্ম্ম মাঝপথে খণ্ডিত হইলে বাংলা দেশের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না।

ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মূল্য দেড় টাকা।

বিশ্বকবির আজকালকার ছড়াছবির মধ্যে যাঁহারা ছেলেখেলার আভাস পাইয়া থাকেন, তাঁহার আধুনিকতম শিল্পসৃষ্টি 'ছেলেবেলা' পড়িয়া তাঁহারা বিস্ময়-বোধ করিবেন। 'ছেলেবেলা' ছেলেখেলা নয়—পরিণত মনের প্রবলতম অধ্যবসায়ের ফল এই কাহিনী। ইহার অপূর্ব্ব ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী লেখককে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে—তাহা ছেলে-ভুলানো ছড়া অথবা গল্পের ভাষা নয়—ছেলেদের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্পবুদ্ধি লইয়া কোনও বালক যদি তাহার জীবনের কাহিনী রচনা করে, স্বভাবত সে এই ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বর্ণনার উপযোগী এই ভাষার সৃষ্টি যে কি কঠিন কাজ, সাহিত্যিক মাত্রেই 'ছেলেবেলা' পড়িতে পড়িতে তাহা অনুভব করিবেন। রবীন্দ্রনাথের ৮০তম বর্ষের জীবন 'ছেলেবেলা'য় সার্থক হইল।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য দেড় টাকা।

কোনও অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টি হাতে লইয়া যদি জানিতে পারি, তাহার স্রষ্টা আর ইহজগতে নাই, তাহা হইলে ইহা ভাবিয়া দুঃখ হয় যে, অনুরূপ শিল্পসৃষ্টি আর

আমরা উপভোগ করিতে পাইব না। 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' পড়িয়া আমরা সেই বেদনা অনুভব করিলাম। আধুনিক ভূগোল, ইতিহাস ও পলিটিক্সের এমন অপরূপ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ যে বাংলা ভাষায় সম্ভব, এই বইখানি না পড়িলে কেহ তাহা বিশ্বাসই করিবেন না। স্বর্গীয় গ্রন্থকার বইটিকে "এ-কেলে কথকতা" বলিয়াছেন। কথকতা সার্থক হইয়াছে। 'কুরুপাণ্ডবে' লেখকের এক পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই পুস্তকে সম্পূর্ণ অন্য পরিচয় মিলিল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু যে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতি, তাহা অনুভব করিলাম।

সাহিত্য-কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা, মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা দেশে সমালোচনা-বস্তুটিকে সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক মর্য্যাদা দিয়াছেন মোহিতলাল মজুমদার। পৃথিবীর সমালোচনা-সাহিত্যেও তাঁহার নিজস্ব দান আছে। এই গ্রন্থের নিত্য ও সাহিত্য, সাহিত্যে অশ্লীলতা, ও সাহিত্যের ষ্টাইল প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সকল সাহিত্য-রসিকই তাহা স্বীকার করিবেন। যাঁহারা ভারতীয় এস্‌থেটিক্‌স্‌কেই রস-বিচারের চূড়ান্ত রায় বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন অথবা যাঁহারা ইউরোপীয় পদ্ধতিকেই চরম মর্য্যাদা দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা 'সাহিত্য-কথা' পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের "চরমে"র পরেও শেষ কথা আছে। মোহিতলাল অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে উভয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়া আরও অগ্রসর হইয়াছেন। সাহিত্যরস-বিচার লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, 'সাহিত্য-কথা' তাঁহাদের নিত্যসঙ্গী হইবার দাবি রাখে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা। মূল্য দেওয়া নাই।

বর্ত্তমান বৎসরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এটি বৃহত্তম কীর্ত্তি। ডক্টর সুকুমার সেন ভাষাজননীর নিকট তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিমতম কাল হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কাল অবধি বাংলা কাব্যধারার ইতিহাস উদ্ধৃতি ও প্রমাণ সহযোগে যেরূপ বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কেহই তাহা দিতে পারেন নাই। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ, সুকুমারবাবু নিজে কেবল সংগ্রহকর্ত্তাই নন,

আবিষ্কর্ত্তাও বটেন। তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ে অনেক অজ্ঞাত তথ্য নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল আবিষ্কারের পরিচয় এই ইতিহাসে আছে। সুকুমারবাবুর এই গ্রন্থের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনা অনেক সহজ হইবে।

মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদ্রার্স, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা ভাষায় এটি একটি সম্পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ, ভারতের নবজাগরণের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) পর হইতে ইংরেজী শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে আসিয়া ধীরে ধীরে এদেশীয় জনগণের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিল, যোগেশবাবু তাহার পূর্ব্বাপর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। তিনি এই জাগরণের ইতিহাসকে আধুনিকতম বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন অর্থাৎ ইহা একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস। যাঁহারা যোগেশবাবুকে জানেন এবং গবেষণাক্ষেত্রে তাঁহার বহুবিধ দানের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারাই বিশ্বাস করিবেন, তিনি সর্ব্বত্রই মূল উপাদান লইয়া কাজ করিয়াছেন, পরের মুখে ঝাল খান নাই। এই ইতিহাস-খানির ইহাই সর্ব্বপ্রধান গুণ। বইটি সুলিখিত এবং সুচিত্রিত। দেশের সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র দরদ আছে, তাঁহারা এই বইটি সংগ্রহ করিলে উপকৃত হইবেন।

শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ, প্রথম খণ্ড—বিনয় ঘোষ। অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পরিধি যে এযুগে বিস্তৃততর হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহার প্রমাণ আছে। লেখক বিনয় ঘোষ চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টি ইতিমধ্যেই আকর্ষণ করিয়াছেন। বয়সে তরুণ হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, অধিকন্তু তাঁহার

বাচনভঙ্গী চমৎকার। এই সব কটি গুণ মিলিয়া আলোচ্য বইখানি উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই বইখানি যাঁহারা মন দিয়া পড়িবেন, তাঁহারা লেখককে এক নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান যুগের বাংলা দেশের সমাজ-ব্যবস্থার পটভূমি হইতে তিনি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচার করিয়াছেন। ইহাতে শিল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণ, সত্য ও বাস্তব, কাব্য, উপন্যাস, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও সমাজ প্রভৃতি আলোচনা আছে। প্রত্যেকটি আলোচনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সকল সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে। আমরা সাগ্রহে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

পৃথিবীর ইতিহাস—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলা ভাষায় এরূপ একটি সহজবোধ্য শিশুপাঠ্য পৃথিবীর ইতিহাসের অভাব ছিল। সুলেখক গজেন্দ্রবাবু এই কাজ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইলেন। অল্প পরিসরের মধ্যে মোটামুটি প্রায় সব খবরই এই পুস্তকে আছে। বর্ণনায় গল্পবলার ভঙ্গি ব্যবহৃত হওয়াতে ছেলেরা সহজেই খবরগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। পুস্তকটির ছাপাই বাঁধাই চমৎকার। পূজায় ছেলেমেয়েদের উপহারের পক্ষে যোগ্য বই।

দর্শন পরিচয়—শ্রীগোপালচন্দ্র সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আমাদের সৌভাগ্য যে আজকাল এরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ভারতীয় দর্শনসমূহের এমন সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই; শুধু পরিচয়ই নয়, কতকগুলি বহুখ্যাত তত্ত্বের বিবৃতি ও বিশ্লেষণও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে যাঁহাদের

এই আলোচনা করিবার সুবিধা নাই অথচ ব্যাপারখানা কি, জানিবার বাসনা আছে, তাঁহাদের জন্যই এই পুস্তক। সম্পাদকদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইতে হয়, আমরা গোপালবাবুর 'দর্শন পরিচয়' পড়িয়া সত্যই উপকৃত হইয়াছি। পণ্ডিত জনে গোপালবাবুর পাণ্ডিত্য দেখিয়া খুশি হইবেন।

খাদ্য পরিচয়—শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস। ট্রপিক্যাল ডায়েট রিসার্চ সোসাইটি, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

স্বাস্থ্যকামী জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পুস্তক ইহা। লেখক স্বয়ং তাঁহার সহযোগীদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণে আমাদের শরীরপুষ্টির উপাদানের পরিমাণ সেগুলিতে যেমন যেমন আবিষ্কার করিয়াছেন, এই পুস্তক তাহারই তালিকা। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যেকটি তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক নির্ভরযোগ্য। তালিকা-ব্যবহারের প্রণালীও সহজ। ইহাকে সহজতর করিবার জন্য লেখক গোড়ায় খাদ্যতত্ত্বের মূল কথাগুলি আলোচনা করিয়াছেন। এই অংশ পাঠ করিলে আমাদিগকে নিতান্ত আনাড়ির মত তালিকা হাতড়াইতে হইবে না।

উল-শিল্প, প্রথম ভাগ—শ্রীমতী মীরা দেবী। কমলা পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শীতকালে উলের পোষাক পরধান করি, কিন্তু উল-শিল্প সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নাই—লজ্জার সহিত ইহা স্বীকার করিতেছি। পাঠকেরা বলিবেন, এই শিল্প সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহাদের কাহাকেও এই পুস্তক সমালোচনার্থ দিলে পারিতে! পারিতাম না। গৃহিণী উলের কাজ করিয়া থাকেন। তিনি বইটি হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত নন। বলেন, অনেক দরকারী কথা ও প্যাটার্নের খবর ইহাতে আছে; ভারী কাজে লাগে। সুতরাং যাঁহারা উল-শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষানবিস, এই বইটি যে তাঁহাদের কাজে লাগিবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ—শ্রীকমলা দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দাম দেওয়া নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই "মনোগ্রাফ"গুলি মনোজ্ঞ হইতেছে। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে লেখিকা বাংলা দেশের দুইজন কীর্ত্তিমান পুরুষ সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুন্সিয়ানা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার তথ্যসংগ্রহ মোটামুটি ভাল, ভাষা সুখপাঠ্য। অনেক স্থানে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

প্রেম-রেখা—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম আছে। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার সেই খ্যাতি বৃদ্ধি করিবে। নাগপুরের প্রসিদ্ধ বাঙালী কর্ম্মী ও জননায়ক স্বর্গীয় বিপিনকৃষ্ণ বসুর জীবনীটি তিনি যে পদ্ধতিতে লিখিয়াছেন, তাহা নূতন এবং হৃদয়গ্রাহী। ডিরোজিওর উপর কবিতাটিও সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেকটি রচনাতেই সহৃদয়তা ও শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১ম খণ্ড,
২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড—শ্রীঅনিলবরণ রায় ৸০, ১৵০, ১৵০

Songs From the Soul	"	১।০
India's Mission in the World	"	৸০
Mother India	"	॥০
শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ	"	।০

উপরোক্ত পুস্তকগুলি আমরা কলিকাতার গীতাপ্রচার কার্য্যালয় হইতে পাইয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ ও বিশেষ করিয়া অনিলবরণের ভাবধারা বুঝিবার পক্ষে এগুলি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। যাঁহারা আত্মিক ব্যাপারের কারবারী, তাঁহারা এই

পুস্তকগুলি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। বর্ত্তমান ভারতীয় চিন্তাজগতে অনিল-বরণের বিশিষ্ট দান আছে। তাহার কিছু আভাস এই সকল পুস্তকে আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তিন খণ্ড বহুমূল্য। অরবিন্দের গীতা অবলম্বনে এরূপ বিস্তৃত টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত একখানি বাংলা গীতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালী গীতা-পাঠকেরা উপকৃত হইবেন। স্থানাভাবে বিস্তৃততর পরিচয় না দিতে পারিয়া আমরা লজ্জিত হইতেছি।

Surendranath Banerjea—Joges C. Bose। স্কুল সাপ্লাই কোং, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

বাংলা দেশের আধুনিক উগ্র প্রগতিবাদী রাষ্ট্রীয় ভাবধারার মধ্যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কিঞ্চিৎ ধীর স্থির চিন্তাসহ মতবাদ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়া লেখক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পড়িলে মনে হয়, বাংলা দেশ হইতে রাষ্ট্রীয় বিবেচনাবুদ্ধি এখনও তিরোহিত হয় নাই; বর্ষার গৈরিক প্লাবন নামিয়া গেলে এই স্বচ্ছ জলই আবার দেখা দিবে। অবাঙালী সমাজে বাঙালীর প্রতিষ্ঠাহীনতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর এই বইটি পড়িয়া দেখা উচিত।

Tissue Remedies—B. N. Mitra। ২১-বি মোহনলাল মিত্র স্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য দশ টাকা। ১৫৬৮ পৃষ্ঠা।

শুস্লার-প্রবর্ত্তিত বায়োকেমিক চিকিৎসা ক্রমশ জনপ্রিয় হইতেছে এবং আমাদের বিশ্বাস একদিন ইহার অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত বি. এন. মিত্র চিকিৎসকদের জন্য এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যে কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, সেদিন তাহা স্বীকৃত হইবে। এরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অনন্য-সাধারণ। ইহাতে বায়োকেমিক চিকিৎসার মূল সূত্র এবং যাবতীয় রোগে প্রধান

প্রধান চিকিৎসকদের ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"I find that his facts are carefully compiled from the best authoritative sources and that these are systematically arranged." রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন অভিজ্ঞ বায়োকেমিক চিকিৎসক।

তুহুঁ মম জীবন—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। বান্ধব পুস্তকালয়। ১৭ শিবপুর রোড, হাওড়া। মূল্য দুই টাকা।

অবস্থাবিশেষে মানুষ জীবনের জল ঘোলাইয়া তুলিতে বাধ্য হয়, কিন্তু এই ঘোলাটে অবস্থা চিরদিন বজায় থাকে না। ময়লা থিতাইয়া নীচে বসিয়া গেলেই আবার স্বচ্ছ জল টলটল করিয়া উঠে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর লেখক এই আবিলতাকেই স্বাভাবিক জ্ঞান করিয়া নানা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিতেছেন। 'তুহুঁ মম জীবন' উপন্যাসখানি তাহারই "প্রটেষ্ট" স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। লেখক রসিক এবং সহৃদয়—উপন্যাসখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা আনন্দ পাইয়াছি, পাঠকেরাও আনন্দ পাইবেন।

সুধার প্রেম—শ্রীঅমলা দেবী। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

অতি সাধারণ মামুলি গল্প যে শক্তিশালী শিল্পীর হাতে পড়িলে কি অপরূপ শিল্পসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে, 'সুধার প্রেম' উপন্যাসটি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। লেখিকা যেন মানব-জীবনের রহস্য-গভীরতার তলদেশে বাস করেন, মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া সেই গভীরতার যে ব্যঙ্গোজ্জ্বল পরিচয় দিয়া যান, তাহাতেই আমরা মুগ্ধ হই।

টাকার কথা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন, তৃতীয় সংস্করণ। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা। দেড় টাকা।

প্রথম সংস্করণের পরিচয় দিয়াছিলাম। তৃতীয় সংস্করণে পুস্তকটির অনেক

উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান টানাটানির যুগে 'টাকার কথা'য় সকলেই উৎসাহ দেখাইবেন।

ক্ষণিকা—শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তফী। ২৬ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা। ২০টি সনেটের সমষ্টি। সুলিখিত।

* * *

গিরিকা—মাসিক পত্র, শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ সম্পাদিত।

শিলং-প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকাখানির প্রচার কামনা করি।

আগমনী—বার্ষিকী, বার্নপুর আগমনী সাহিত্য-চক্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উদ্যোক্তাগণের সাহিত্য-প্রীতি প্রশংসনীয়।

ডোয়ার্কিনের সঙ্গীতযন্ত্র

"উৎকৃষ্টতর মালমসলা" ও "উন্নততর প্রস্তুতপ্রণালী" ইহার দরুণই ডোয়ার্কিনের যন্ত্রের এত সুনাম ও আধিপত্য। অপর যন্ত্রের সহিত ইহাদের তুলনা হয় না। গুণ ও স্থায়িত্ব বিবেচনা করিলে দামও এমন কিছু বেশী নয়।

Sonora Harmonium, ডবল প্যারিস রীড, ৩ অক্টেভ, ৫ স্টপ, বাক্স সহ মূল্য ৪০৲, প্যাকিং কুলী ॥০।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

Dwarkin & Son Ltd 11, Esplanade, Calcutta.

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ [২য় সংখ্যা

শ্রীমধুসূদন

'মেঘনাদবধ কাব্য'-পাঠ—কল্পনা ও কবিশক্তি (২)

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নায়ক ইন্দ্রজিৎ ও নায়িকা প্রমীলা—কাব্যের সাধারণ লক্ষণ অনুসারে ইহাই মানিতে হয়; কিন্তু সেজন্য, রাবণকে যে কারণে এ কাব্যের মূল আশ্রয় বলিয়াছি, তাহাতে বাধে না—সে কথা পরে বলিব। মেঘনাদ-বধই যখন এ কাব্যের প্রধান ঘটনা ও বর্ণনীয় বিষয়, তখন সেই ঘটনাটিকে অতি উজ্জ্বল ও গভীর বর্ণে পাঠকের চিত্তে প্রতিফলিত করিবার জন্য মেঘনাদ ও প্রমীলাকে যুগ্মতারকারূপে আমাদের দৃষ্টি-দিগন্তে সর্ব্বাপেক্ষা রশ্মিমান করিয়া তোলা কবির একটি প্রধান কর্ম্ম। এই কারণে মেঘনাদই এ কাব্যের মণিমালার মধ্যমণি—তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে বিস্ময় শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগ্য করিয়া তুলিতে কবি ত্রুটি করেন নাই। মেঘনাদচরিত্র সম্বন্ধে কবির ব্যক্তিগত মনোভাব তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে একাধিক স্থানে

প্রকাশ পাইয়াছে—সে সম্বন্ধে, এবং সেই সূত্রে মধুসূদনের কবি-চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে, এইখানে কিছু বলিব। এই সকল পত্রে আমরা কবি-মানুষটিকে যেমন পাই, কবিমানসের তেমন পরিচয় পাই না। নিজের ব্যক্তিগত রুচি বা সজ্ঞান অভিপ্রায় সম্বন্ধে এই সকল পত্রে তিনি যে আশা আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে কাব্যগত গূঢ়তর কবি-প্রবৃত্তির বরং বিপরীত; যেন দিব্য-আবেশের অবস্থায় লেখনীমুখে যাহা সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সজ্ঞান চেতনা কবির নাই—মনের উপরিতলে একটা প্রবল উন্মাদনা, বালকোচিত স্ফূর্ত্তি ও আত্মপ্রসাদ তাঁহার উৎসাহ রক্ষা করিতেছে, তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। কবি-প্রতিভার প্রকৃতিবিশেষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি আধুনিক আত্ম-সচেতন গীতিকবির প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতি-আধুনিক তথা-কথিত কবিসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার যে দূরতম জ্ঞাতি-সম্পর্কও নাই, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। এই সময়ে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন [রাজনারায়ণ তাঁহাকে একখানি জাতিগৌরব-মূলক মহাকাব্য (national epic) লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন]—

The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of Poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit.

—ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মধুসূদন এক্ষণে আর কাব্যের নানা ছাঁচ ও আদর্শ লইয়া নিজ কবিশক্তির অনুশীলন করিতে উৎসুক নহেন—রোমাণ্টিক কমেডি ও রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি লিখিবার, অথবা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কল্পনার পক্ষমুক্ত করিবার আগ্রহ আর

তেমন নাই; এইজন্য national epic-এর মত এক ধরনের আদর্শ-কাব্য রচনা করিয়া কেবলমাত্র একটা সাহিত্যিক কীর্ত্তি স্থাপন করিতে তিনি আর উৎসুক নহেন। "I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit"—এই সামান্য উক্তিটির মধ্যে তাঁহার নিজেরও অজ্ঞাত এক অভিনব প্রেরণার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর্ষ রামায়ণে ইন্দ্রজিতের চরিত্রে তিনি যে পৌরুষ-বীর্য্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে করিয়াছি; তাহারই বীজ তাঁহায় মগ্নচৈতন্যে উপ্ত থাকিয়া এতদিনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এমন আত্মশক্তিমান নির্ভীক পৌরুষের সাক্ষাৎ তিনি বোধ হয় আর কোথায়ও পান নাই, এবং ঘটনাক্রমে পাইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব আত্মস্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন; বাহিরের সর্ব্বসংস্কার ভেদ করিয়া এই চরিত্রের গৌরব তাঁহার অন্তরতম আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রেরণামূলে যে আত্মস্ফূর্ত্তির আবেগ আছে, এইখানেই তাহার জন্ম। ইহার তুলনায়, কোন একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক আদর্শে কাব্যরচনার আগ্রহ মন্দ হইবারই কথা।

কিন্তু, এই আত্মানুরূপ পৌরুষ-বীর্য্যের গৌরব-গাথাই নয়—তাহার নিষ্ফল পরিণাম, মেঘনাদের হত্যাজনিত পরাজয়ের কাহিনীই—মর্ম্মান্তিক বিষাদ ও হতাশার সুরে গাহিবার জন্য—to celebrate "the death"—কবি অধীর হইয়াছেন। এইখানেই এক ধরনের রোমাণ্টিক কবি-প্রবৃত্তির পরিচয় রহিয়াছে। যাহা মহৎ তাহা অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর-রূপে সকলের উর্দ্ধে বিরাজ করিবে, সকলকে জয় করিবে—এই কামনাই এপিকের বীর-গাথার গীত-ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। কিন্তু আর এক প্রকৃতির কবি-ভাব জগৎব্যাপারে এমন সুবিধি বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে না, বোধ হয় কামনাও করে না। যাহা

শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সর্ব্বগুণের আধার, তাহার বিনাশ ও ব্যর্থতাই সে প্রকৃতির পক্ষে পরম রমণীয়, তাহাই অধিকতর সত্য। যাহাকে আমরা কাব্যের অপর প্রবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতে পুরুষ যেন আপন শক্তি ও বুদ্ধির গৌরবে আত্মতৃপ্ত, নিজেরই মনোগত সংস্কারের ন্যায়নীতি ও ধর্ম্মবিধানের দ্বারা জগৎকে শাসিত ও সুব্যবস্থিত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত; সেখানে প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিরোধে, পুরুষ আপনাকে জয়ী মনে করিয়া সুখী। জীবনের কোন কিছুই কার্য্যকারণ-সঙ্গতির বহির্ভূত নয় বলিয়া সেখানে আলো-আঁধারের রহস্য নাই, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া কিছুতেই বিস্ময়বিমূঢ়তার কারণ নাই। কিন্তু যাহাকে আমরা রোমাণ্টিক কল্পনা বলিয়া থাকি, তাহাতে বাস্তব-অভিজ্ঞতার মূল্য কম—প্রকাশ অপেক্ষা অপ্রকাশের মাহাত্ম্যই অধিক। এজন্য সাক্ষাৎ জগৎব্যাপারে নিয়ম অপেক্ষা অনিয়ম, পূর্ণতা-অপেক্ষা অপূর্ণতা, সার্থকতা অপেক্ষা ব্যর্থতা, এবং চিন্তনীয় অপেক্ষা অচিন্তনীয়ের প্রভাবই স্বীকার করিতে হইবে—তাহাতেই কবিচিত্তের মুক্তি ও কাব্যের লোকোত্তর-চমৎকার ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, একটিতে—পুরুষ জীবনে যেমন, কবিও তেমনই কল্পনায়, প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে দৃঢ়ভাবে আত্মসংবরণ করিবার প্রয়াসী; অপরটিতে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চায় না, কোনরূপ হিসাববুদ্ধির বশে আত্মসংকোচ বা আত্মসংবরণ করিয়া শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে চায় না—আত্মস্ফূর্ত্তির প্রবল আবেগে বাসনা-কামনার চূড়ান্ত পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে চায়; তাহাকে সংযত করিয়া পরিমিত সুখভোগ অপেক্ষা, প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে আপনার অন্তর মথিত করিয়া, এক পরম চরিতার্থতা লাভ করে। ইহাই রোমাণ্টিক কবি-প্রবৃত্তির একটি অতি সহজ ও সাধারণ ভঙ্গি; ইহা ঠিক আত্মভাবপ্রাধান্য নয়—বিদ্রোহ বা

আত্মঘোষণার ভাব। এই প্রবৃত্তিই সূক্ষ্মতর হইয়া গীতিকাব্যের আত্মভাবপ্রাধান্যে পরিণত হয়; সেখানে কবি আত্মসর্ব্বস্ব—সকল দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। এজন্য সে কল্পনা কাহিনী বা নাটকের কল্পনা নয়। সে কল্পনা এই অর্থে আরও রোমাণ্টিক যে, তাহা আপনার বাহিরে আর কিছুকেই স্বীকার করে না—তাহাতে কোন ব্যক্তির পৃথক ব্যক্তিত্ব নাই, সে-জগতে কবির স্বকর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না—চরিত্র বা ঘটনা কিছুরই বস্তুগত (objective) পৃথক মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, মধুসূদনের কল্পনা এ ধরনের রোমাণ্টিক কল্পনা নয়—তাঁহার কবি-প্রবৃত্তি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত। মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই এ প্রবৃত্তির পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণের মেঘনাদ-চরিত্রে তিনি সেই ভাববীজের পূর্ণবিকাশক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং মেঘনাদের মৃত্যু, অর্থাৎ আপন হৃদ্‌গত আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—জগতের সঙ্কীর্ণ স্থান-কালের ব্যবস্থায়, দুর্জ্ঞেয় অন্ধ নিয়তির আঘাতে তাহার বিনাশ—তাঁহার রোমাণ্টিক কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাই কবি এমন উৎসাহের সহিত লিখিতেছেন—"I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit."

তথাপি, এই পত্রগুলির সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—অর্থাৎ এগুলির মধ্যে কবির নিজ কবিমানসের গূঢ়তর প্রেরণার সজ্ঞান পরিচয় নাই। এক দিকে যখন এই কাব্যের অভিনব কবি-প্রবৃত্তির কথা চিন্তা করি, তখন আর এক দিকে মেঘনাদের সম্বন্ধে একখানি পত্রে বন্ধুকে এইরূপ প্রশ্ন ও মন্তব্য করিতে দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইতে হয়।—

Let me hear what favour the glorious son of Ravan finds in your eyes. He was a noble fellow, and but for the scoundrel Bibhishan would have kicked the Monkey army into the sea.

—এ যেন মেঘনাদবধ-যাত্রা শুনিয়া কোনও গ্রাম্য যুবক বা স্কুলের ছাত্র উচ্ছ্বসিত আবেগে মন্তব্য করিতেছে। অতএব, কবির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া কাব্যসৃষ্টির প্রতিভা ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সেই পুরাতন বিস্ময় নূতন করিয়া জাগে। কাব্যসৃষ্টির আবেশ-কালে যে মানুষ দিব্য-চেতনার অধিকারী, সেই আবেশ যখন আর থাকে না, তখন সেই মানুষও আর সে-মানুষ নয়—যে 'বোধি' কাব্যসৃষ্টি করে, তাহা যেমন 'বুদ্ধি' নয়, তেমনই বুদ্ধি ও বোধি পরস্পরের সহায়ও নয়। ইহাও কবি-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—এ ধরনের প্রতিভায় সৃষ্টি ও সমালোচনা একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে না। এ যেন একই জীবনে জন্ম-পরিবর্ত্তন—এক জন্মের কথা আর এক জন্মে মনে থাকে না। কাব্যের মধ্যে কবিচিত্তের যে অবাধ স্ফূর্ত্তি—কবির মুখের যে হাসি বিস্ফারিত হইয়া আছে—কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি তাহার কারণ বলিতে পারিবেন না। আমাদের আর এক কবি অশোক-তরুকে দেখিয়া তাহার অজস্র পুষ্পরাশির 'লালে-লাল' হাসির কারণ তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তরু তাহা বলিতে পারে না, তাই কবি একটি চমৎকার ভাব-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—

—হায়, এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু, জীব, প্রাণী।
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী।

মধুসূদনের মত কবির অবস্থাও তেমনই। আজ আমরা তাঁহার কাব্য লইয়া যে বিচার বিশ্লেষণ করিতেছি, তাহার লেশমাত্র কবির মনে কখনও উদয় হয় নাই।

২

মেঘনাদ যে কেন, কি হিসাবে এই কাব্যের নায়ক, তাহা বুঝিলাম—মেঘনাদ ও তাহার মৃত্যু এ কাব্যের আর সকল ঘটনা ও চরিত্র হইতে পৃথক প্রাধান্য লাভ করিবার কারণ আছে। কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রের সংজ্ঞা বাদ দিলেও, আমরা নায়ক অর্থে সেই চরিত্রই বুঝি, যাহার doing ও suffering সমগ্র কাব্যখানির ভিত্তি বা মূল প্রতিপাদ্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এ কাব্যে মেঘনাদ-চরিত্র ও তাহার দারুণ দুর্ভাগ্য প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, সে চরিত্র doing বা suffering কোনটাতেই একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া নাই—তাহার কোন বিশিষ্ট কীর্ত্তি অপেক্ষা, নিদারুণ অক্ষমতাই আমাদিগকে সমধিক বিচলিত করে। মেঘনাদ এ কাব্যের ভিত্তি বা ধারণ-স্তম্ভ নয়, কাব্যের ঘটনাক্ষেত্রের অতি অল্পই সে অধিকার করিয়া আছে—যদিও সেইটুকুর মধ্যেই কবি তাহাকে আদর্শ নায়কের সর্ব্বগুণে গুণান্বিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। অপর দিকে, এ কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাবণের ভাগ্যই একটি অবিচ্ছিন্ন ডোর-রূপে অনুস্যূত হইয়া আছে। মেঘাবৃত অন্ধকার আকাশের বুকে বলাকা যেমন অতিশয় লক্ষণীয় হইয়াও সেই আকাশের মসীবর্ণকেই গাঢ়তর করিয়া তোলে, এ কাব্যের সাক্ষাৎ নায়ক মেঘনাদও তেমনই, তাহার পশ্চাতে রাবণভাগ্যের বিস্তৃত পটভূমিকে গাঢ়তর বর্ণবৈভব দান করিয়াছে; রাবণের বিশাল বক্ষের ক্ষতস্থল-রূপে মেঘনাদ ও তদ্‌সম্পর্কিত যত-কিছু উজ্জ্বল লোহিতরাগ ধারণ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে এ কাব্যের যে রোমাণ্টিক প্রবৃত্তির কথা—কবির আত্মভাবপ্রবণতার কথা বলিয়াছি, তাহা দ্বারাই রাবণ ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে নায়ক-

পদবীর এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইতে পারে। কাব্যে যাহা ঘটিয়াছে, কবি-মানসের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার অনুরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইবে। মেঘনাদ কবির কামনাগত আদর্শ, সে চরিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, নির্দ্দোষ; তাহার কল্পনায় কোন বাধা নাই, কবি-কামনার মোক্ষধামে তাহার অবস্থিতি। কিন্তু বাস্তব বিধি-নিয়তির সংঘাতে এ স্বপ্ন টিকিবে না—জীবনে তাহা সফল হইবার নয়; এ কল্পনার সঙ্গে এই দুঃখ—সেই নিষ্ফলতার হাহাকার ও নৈরাশ্যের অন্ধকারই—রোমাণ্টিক কাব্য-পিপাসার পক্ষে বড় মধুর, বড় উপাদেয়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই দুঃখের হেতু হইয়াছে মেঘনাদ—মেঘনাদই কবির সেই আশুবিধ্বংসী দুরূহ কামনার মানস-বিগ্রহ। কিন্তু মেঘনাদ তো সেই দুঃখের বিষয়, তাহার আশ্রয় হইবে কে? ভিতরে কবির নিজের প্রাণই সেই আশ্রয়—বাহিরে রাবণ তাহার প্রতিকৃতি। এইজন্য মেঘনাদই এ কাব্যের সর্ব্বস্ব হইতে পারে নাই, কবির এই আত্মভাব-প্রতিষ্ঠার জন্য রাবণের বিশাল ছায়া মেঘনাদকে আবৃত ও অতিক্রম করিয়া আছে। এই রোমাণ্টিক লিরিক আবেগ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এপিক-অভিপ্রায়কে দ্বিধাযুক্ত করিয়াছে, এবং মেঘনাদকে নায়ক করিতে গিয়াও, কবির স্বকীয় প্রাণের আকৃতি, তাহাকেই শাস্তি ভোগ না করাইয়া, রাবণকে করাইয়াছে—doing ও suffering-এর যত কিছু ভার রাবণই বহন করিতেছে। এই রহস্যই এ কাব্যের সবচেয়ে বড় রহস্য। খাঁটি এপিক বা ক্ল্যাসিক্যাল, অথবা খাঁটি রোমাণ্টিক হইলে, আমরা রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ একজনকেই নায়করূপে পাইতাম; কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ ও রোমাণ্টিক মনোবৃত্তি এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে এই নায়ক-দ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে। সজ্ঞানে কবি মেঘনাদকেই নায়ক করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জ্ঞানে রাবণই তাঁহার সমগ্র কল্পনাকে অধিকার করিয়া তাহার

কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছে। যেন রাবণ-রূপ আকাশে নানাবর্ণের নিত্য-বিকাশের মধ্যে মেঘনাদ একটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা—মুহূর্ত্তে ঝলসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল; সে ঘটনা ঐ আকাশকে চমকিত করিয়া, তাহার সকল শোভা সকল আলো ম্লান করিয়া, যে স্তব্ধ-গম্ভীর অন্ধকারে তাহাকে ঢাকিয়া দিল, আমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহার দিকেই চাহিয়া রহিলাম; যখন মেঘনাদ নাই, আর কেহ নাই, তখনও রাবণ আছে; এই রাবণেই কাব্যের আরম্ভ ও তাহাতেই কাব্যের শেষ। তা ছাড়া, রাবণই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জয়-পরাজয় কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির ফল-ভাগী; শত্রুর সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ সেই করিতেছে; এ কাব্যের পরিণামও রাবণের পরিণাম, ইন্দ্রজিৎ সেই পরিণামকে দারুণতর করিয়াছে মাত্র। অতএব কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় যাহাই হউক, এবং মেঘনাদের জীবন যতই সুন্দর ও মৃত্যু যতই করুণ হউক—এ কাব্যে সে সকলই উপলক্ষ্য হইয়া আছে, লক্ষ্য—রাবণ-চরিত্র ও রাবণ-ভাগ্য। তথাপি ইন্দ্রজিৎকে এই অর্থে নায়ক বলা যাইতে পারে যে, তাহাকে লইয়াই এ কাব্যের প্রধান ঘটনা, এবং কবি এই চরিত্র ও নায়িকা প্রমীলার সহযোগে, জীবনের যে একটি উজ্জ্বল-মধুর ভাব-লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, পদ্মের শতদলবেষ্টিত মধুস্থলীর মত তা ই কাব্যের বিশিষ্ট রস-নিকেতন হইয়া আছে।

এক্ষণে এই মেঘনাদ-চরিত্রে মধুসূদনের নিজস্ব কবিত্ব কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই দেখিব। রাবণ ও মেঘনাদ, একই কল্পনার দুই দিক; রাবণ যাহা হইতে পারিত—সংশয়হীন জীবনের আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল, সতেজ ও সুস্থ যৌবনধনে ধনী, সকল কর্ম্মফল-ভোগ হইতে মুক্ত যে আদর্শ-জীবন কবি-কল্পনায় সকল পুরুষের পক্ষে সম্ভব, পুত্র মেঘনাদের জীবনে রাবণের সেই সম্ভব-জীবনের বীজ যেন

পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু রাবণের জীবনীশক্তি ও সে শক্তির স্ফুরণ মেঘনাদের অপেক্ষা অনেক অধিক—অধিক বলিয়াই রাবণ পাপী, মেঘনাদ অপাপবিদ্ধ। চন্দ্রকলায় কলঙ্ক নাই, পূর্ণতর না হইলে চন্দ্রকলায় কলঙ্ক প্রকাশ পায় না। মেঘনাদের যৌবন এমনই নবীন যে, তাহাতে জীবনের বসন্ত-ঋতু ছাড়া আর কোন ঋতুর প্রভাব নাই, তাহাতে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের শুচিতা ও সৌন্দর্য্যই আছে; সে বৃক্ষে ফল নাই, কেবল ফুলই আছে। মানব-জীবনপুষ্পের এই যৌবন-বিকাশকেই কবি মেঘনাদ-চরিত্রে মূর্ত্তি দিয়াছেন। রাবণে যাহার প্রৌঢ় পরিণাম, মেঘনাদে তাহার সদ্য-তরুণ নবোদ্ভিন্ন রূপ; এই দুইই একই মনুষ্য-জীবনের অখণ্ডনীয় নিয়তি। ইন্দ্রজিৎ নিজে নিষ্পাপ,—সরস-সতেজ, উন্নত-সুঠাম একটি নবপুষ্পিত পুন্নাগ-তরুর মত; তথাপি যেন কোন অবোধ বালকের কুঠারাঘাতে সেই তরু ছিন্নমূল হইয়া ভূতলশায়ী হইল—ইহাই বিধি। পিতা রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিতের প্রাক্তন; আবার ইন্দ্রজিৎ যেন স্বকর্ম্মফলভুক্ রাবণেরই শাস্তির কারণ; ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ইন্দ্রজিতের কর্ম্মফলভোগ নহে, "মরে পুত্র জনকের পাপে"। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ একই চরিত্রের দুই রূপ নহে—একই মানব-নিয়তির দুই দশা। এই অর্থে ঐ দুই চরিত্রকে পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই মেঘনাদ—কবির 'favourite Indrajit'—রামায়ণের মেঘনাদের বীর্য্যাঙ্কুর হইতে কবির মনে জন্মলাভ করিলেও, ইহা মধুসূদনেরই কবিচিত্ত-ফুলবন-মধুর নির্য্যাস। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এইখানেই তাঁহার কবিকল্পনার ক্ল্যাসিক্যাল প্রবৃত্তি পূর্ণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। এ চরিত্র নিদাঘ-দিবার মত দীপ্ত ও নির্ম্মল, কোনখানে মেঘ বা কুয়াশার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশ্ন-সংশয় নাই,

নৈরাশ্য নাই; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথায়ও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্য রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, মধুসূদনের মেঘনাদে অপর সকল মহৎ গুণের সমবায়ে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—মায়ের দুলাল, পিতার নয়ন-মণি, পত্নীর কণ্ঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদ, সলিল-অগ্নি-মরুতের সন্নিপাতে মেদুর মেঘকান্তির মত নয়নমনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান হইয়াছে—তাহার নিরতিশয় ভয়শূন্যতা; শক্তি-মদমত্ততা নয়—অসীম বাহুবল ও হৃদয়বলের অমোঘতায় বিশ্বাসই ইহার কারণ। আরও কারণ, মেঘনাদ ক্রূরতা বা কপটতায় বিশ্বাস করে না, জগৎকে সে আত্মবৎ বীরধর্ম্মী মনে করে—হিংস্র ব্যাঘ্র বা সর্পের ভয় সে করে না। রাবণের মনে বিধি নামক যে দুর্জ্ঞেয় বিরুদ্ধ শক্তির চেতনা জন্মিয়াছে, তাহার মনে সে চেতনাও নাই। মনের সারল্য ও প্রাণের এই নির্ভীকতাই তাহার কর্ত্তব্যকেও সরল করিয়াছে। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কাহার পাপে কে ফলভোগ করিবে—এ সকল ভাবনা তাহার নাই। অতি সহজ সুস্থ হৃদয়বৃত্তির বশে সে ভালবাসে, ভক্তি করে, যুদ্ধ করে; তাহার ধর্ম্ম বিচার-বিতর্কের ধর্ম্ম নয়, তাহা স্বাভাবিক প্রাণধর্ম্ম—পৌরুষের ধর্ম্ম। মেঘনাদের মনে যেমন কোন অস্বাভাবিকতা নাই, তেমনই, লক্ষ্মণের মত—স্বপ্ন, দৈব, বা অতিপ্রাকৃতের কোন বালাই তাহার কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হইয়া নাই, সে সম্বন্ধে কবির কল্পনার এই সাবধানতা উল্লেখযোগ্য। এ চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যসংস্কারই জয়ী হইয়াছে।

৩

মেঘনাদ-চরিত্র সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বাকি যাহা কিছু—কাব্যপাঠকালে পাঠকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমি কেবল এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের কবিশক্তির দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে লক্ষ্মণের কথা কিছু বলিয়া লইতে হইবে।

লক্ষ্মণ-চরিত্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ও তথা মধুসূদনের কবি-মনোভাবের একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। খুব মন দিয়া কাব্যখানি পাঠ করিলে, এ অভিযোগ একেবারে দূর করিতে না পারিলেও কতকটা লঘু করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণ রামায়ণের একটি অসাধারণ জীবন্ত ও বীর্য্যবান চরিত্র; এ চরিত্রে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ খুব প্রকট। মধুসূদন লক্ষ্মণের সে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা যে করিয়াছেন, লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার কবিহৃদয়ের সহানুভূতিও অল্প নহে—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এ কাব্যে আছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে, রামের প্রধান ভরসা, শক্তি ও সহায়-স্বরূপ—তিনি লক্ষ্মণকেই অপর পক্ষের নায়করূপে বরণ করিয়াছেন, রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে বহুগুণ শক্তি সাহস ও বীরত্বে মণ্ডিত করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ধর্ম্মভীরু নয়—বরং ধর্ম্মবলদৃপ্ত; দেবতাদের আনুকূল্য তাহার নিকটে দয়া বা অনুগ্রহ নয়, সে যেন তাহাদেরই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। লক্ষ্মণের দেবভক্তি ন্যায়নিষ্ঠারই নামান্তর; সে একমাত্র এই ন্যায়ধর্ম্মের বিশ্বাসেই বলীয়ান—ইন্দ্রজিৎ যেমন একমাত্র বীরধর্ম্মের সেবক; অন্যায়ের দণ্ডবিধান করিয়া এই ন্যায়ধর্ম্মের উদ্ধার করিতে সে দৃঢ়পণ ও একাগ্রমনা। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে সর্ব্বত্র লক্ষ্মণকে এই বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছেন; সে চরিত্রের যেন মূলমন্ত্র এই—

Because right is right, to follow right
Were wisdom in the scorn of consequence.

এই লক্ষ্মণ এ কাব্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'সৌমিত্রি কেশরী' ও 'দেবাকৃতি রথী' প্রভৃতি নিত্য-বিশেষণে কবিকর্ত্তৃক ভূষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-চরিত্রের এই বিশিষ্ট গৌরব যেমন মূল রামায়ণেই কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এজন্য লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার একটি সহজ সহানুভূতি আছে, তেমনই লক্ষ্মণের এই গৌরবরক্ষা তাঁহার এই কাব্যের জন্যও প্রয়োজন হইয়াছিল। যে মেঘনাদকে বধ করিবে, তাহাকে সাধারণ বীর হইলে চলিবে না; নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল সমকক্ষ নয়, কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর না হইলে নায়কের গৌরববৃদ্ধি হয় না—এ নীতি বা রীতি অতিশয় সাধারণ কবিকেও মানিতে হয়। কিন্তু এই গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া—বিশেষত, আর্ষ রামায়ণবর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, মধুসূদন বড় বিপদে পড়িয়াছেন। এক দিকে এই শ্রদ্ধা ও লক্ষ্মণের গৌরবরক্ষার প্রয়োজন, অপর দিকে তাঁহার কল্পনার মুখ্য অভিপ্রায়-সাধন, এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই—বরং এই creative necessityর বশে তিনি যে নিরুপায় হইয়াই লক্ষ্মণকে এমন কলঙ্কের ভাগী করিয়াছেন, যাহা তাঁহারই কল্পিত চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী—সে বিষয়ে কবিও পূর্ণ সজ্ঞান; তাহার প্রমাণ—ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিবার সময়ে লক্ষ্মণের মুখে যে বীরদর্পের আস্ফালন ও আত্মসমর্থনের বাণী আমরা শুনি, তাহার মত দুর্ব্বল রচনা এ কাব্যের আর কোথায়ও নাই। যে creative necessityর কথা বলিয়াছি, তাহা এইরূপ। ইন্দ্রজিতের নিধন লক্ষ্মণের হাতেই হইতে হইবে, অথচ ইন্দ্রজিৎ অজেয়—একরূপ অমর বলিলেই হয়। স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না। সেই ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্মণ মারিবে কেমন করিয়া? বাল্মীকির

রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জ্জয় হইলেও অজেয় নয়; নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ নামক একরূপ যাদু বা মায়াঘটিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই সে বারবার অজেয় হইয়া উঠে। মধুসূদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়; সে তাহার নিজশক্তিতেই দুর্জ্জয়—নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ করিতে তাহার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু সে কেবল পিতামাতার আদেশ ও কুলধর্ম্মবিধির অনুরোধে। নিজ ইষ্টদেবতার বর ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ইন্দ্রজিতের মত বীরের পক্ষে সুন্দর ও শোভন। অতএব এই ইন্দ্রজিৎকে যে বধ করিবে, তাহার কেবল অসাধারণ বীর-যোদ্ধা হইলেই চলিবে না, কারণ সম্মুখযুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার বধসাধন অসম্ভব। কবি মেঘনাদ সম্বন্ধে যদি এই ধারণা শেষ পর্য্যন্ত বজায় না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার কল্পনারই অঙ্গহানি হয়। অতএব লক্ষ্মণকে কাপুরুষের মত কাজ করিতেই হইবে।

কিন্তু লক্ষ্মণের এই কাপুরুষতা যে আমাদের মনে এত অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তাহার আরও কারণ আছে। আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াই তাহার প্রতি লক্ষ্মণের এই আচরণে এত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির চক্ষে মেঘনাদ একটা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস মাত্র, সে যেন 'দেবদৈত্যনরত্রাস' একটা কালান্তক পুরুষ—কালিদাসের ভাষায় 'উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ'। স্বর্গে ইন্দ্র মায়াদেবীকে বলিতেছে—

> না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
> মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়াজাল পাতি,
> কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে
> রাবণি!

রামও বিভীষণকে বলিতেছেন—

> ভেবে দেখ মনে, শূর, কালসর্প তেজে
> তবাগ্রজ, বিষদন্ত তার মহাবলী
> ইন্দ্রজিৎ।

স্বয়ং বিভীষণও তাহাকে 'কালফণী দুরন্ত দংশক' 'কানন-বৈরী ঘোর দাবানল' প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়া থাকে। অতএব এই মেঘনাদকে যে-কোন উপায়ে হত্যা করিতে লজ্জাবোধ না করা কোন মনুষ্য-বীরের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাই লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদের মুখে রথিকুল-প্রথার উল্লেখ শুনিয়া বলে—

> জন্ম রক্ষঃকুলে
> তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
> তোর সঙ্গে?

তখন লক্ষ্মণের মুখে সে কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়।

মেঘনাদের এই হত্যা-ব্যাপারটিকে দুরূহ ও দুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি-কল্পনা সর্ব্বাধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছে—কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে ষষ্ঠ সর্গ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কবির ভাবনা সমান অব্যাহত আছে। ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার জন্য নয়—হত্যা করিবার জন্যও, দেব অস্ত্র চাই; লঙ্কার পুরপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অদৃশ্যভাবে রাবণের পুরীতে ও মেঘনাদের যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিবার জন্যই নয়—হত্যাকালে মেঘনাদকে মোহিনী মায়ায় অবশ ও বিমূঢ় করিবার জন্য এবং লক্ষ্মণকে অদৃশ্য মায়া-কবচে সুরক্ষিত করিবার জন্যও, শক্তীশ্বরী মায়ার সাক্ষাৎ সহায়তা চাই; এবং সর্ব্বশেষে, হত্যাকারী হইবার জন্যও লক্ষ্মণের মত 'দেবাকৃতি রথী'কে চাই, এবং সেই মহারথী 'তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী' হইলেই চলিবে না, তাহাকে তাহার চরিত্রের শুচিতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অটলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে—চণ্ডীর দেউলে পূজা দিয়া লক্ষ্মণকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। শেষোক্ত ঘটনাটির উদ্ভাবনায় কবি যেন লক্ষ্মণ-চরিত্রে কলঙ্ক-লেপনের পূর্ব্বে, তাহার চরিত্র-বল ও হৃদয়-বলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন

সৃষ্টি করিয়া, আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই দেউলে প্রবেশ করিয়া দেবীর আরাধনা যে কত বিঘ্নসঙ্কুল, এবং দেবীর সশরীরে আবির্ভাব ও বরদান যে সাধকের কতখানি শক্তিসাপেক্ষ, তাহাই বর্ণনা করিয়া কবি অবশেষে এটুকুও যোগ করিয়াছেন—

"শুভক্ষণে গর্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!" কহিলা আকাশে
আকাশসম্ভবা বাণী। "তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!"

লক্ষ্মণের এই কীর্ত্তি যেন মেঘনাদকে হত্যা করার অপকীর্ত্তিকে কতকটা সহনীয় করিবে! লক্ষ্মণকে লইয়া কবি যে বিপদে পড়িয়াছেন, তার প্রমাণের অভাব নাই।

তথাপি লক্ষ্মণের প্রতি কবি যদি কোথাও স্পষ্ট অবিচার করিয়া থাকেন, তবে সে একটিমাত্র স্থানে—যেখানে ইন্দ্রজিৎকে কপট যুদ্ধে আহ্বান করিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছে—

আনায় মাঝারে বধে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে……
……মারি অরি পারি যে কৌশলে।

ইন্দ্রজিৎকে এমনভাবে হত্যা করিতে লক্ষ্মণের সঙ্কোচ না হওয়ার যে কারণ থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—লক্ষ্মণ নিজেও সে কথা বলিয়াছে। কিন্তু 'দেবাকৃতি রথী' 'সৌমিত্রী কেশরী'র মুখে এই কথাগুলি দিয়া কবিও তাহাকে প্রায় হত্যা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ এখানে এমন নীতির আস্ফালন করিতেছে, যাহা কোনও ক্ষত্রিয়-বীরের মুখে কোন অবস্থাতেই শোভা পায় না। "মারি অরি পারি যে কৌশলে"—এ কথা তো কেবল মেঘনাদকে হত্যা করার কথা নয়। ঠিক এমনই কথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "গান্ধারীর আবেদন" কবিতায় দুর্য্যোধনের মুখে দিয়াছেন, যথা—

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্র সনে নখদন্তে নহিক সমান
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়?

এ কথা দুর্য্যোধনের মুখেই শোভা পায়, কিন্তু লক্ষ্মণ তো দুর্য্যোধন নয়। আমার মনে হয়, ঐ দৃশ্যের ঐ অবস্থানে লক্ষ্মণের মুখে ঐ একটিমাত্র কথায় কবি তাহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তেমন অবিচার আর কিছুতেই হয় নাই।

লক্ষ্মণের প্রতি কবির এই অবিচার যে কারণে হউক বা যেমনই হউক, এই চরিত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহাই যে কবিকে বিপদে ফেলিয়াছে, সে কথা বলিয়াছি। রামের অতিরিক্ত ভ্রাতৃপ্রেমের যে দৌর্ব্বল্য, তাহাও লক্ষ্মণের গুণেই অনেকটা মার্জ্জনীয় হইয়াছে। এই লক্ষ্মণের প্রতি কবির মনোভাব সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলিব। ভ্রাতৃপ্রেমবশে লক্ষ্মণের আত্ম-ত্যাগ—"জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে" তাহার এই দুঃখবরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন, ইন্দ্রজিৎভক্ত কবির হৃদয়ও যে স্পর্শ করিয়াছে, এমন কি, তাহার সঙ্গে কবির যে সমপ্রাণতা ঘটিয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। ইন্দ্রের আদেশে, স্বর্গ হইতে স্বপ্নদেবী সুমিত্রার বেশে লক্ষ্মণের শিয়রে আসিয়া বসিলেন। লক্ষ্মণ স্বপ্নে শুনিলেন, তাঁহার মা যেন স্নেহব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে বলিতেছেন, চণ্ডীর দেউলে আরাধনা ও দেবীর বরলাভ না করিয়া তিনি যেন ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না যান। তারপর—

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে,
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি!" কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র,—"দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা-দুখানি,
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?"

আমার মনে হয়, এই পংক্তি কয়টিতে ('দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা-দুখানি' ইত্যাদি) মধুসূদনের নিজেরই জীবনের একটি গভীর ব্যথা, কাব্যের প্রয়োজনকে, অতিক্রম করিয়া, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলি লক্ষ্মণের মুখে সময়োপযোগী হইলেও, সেই কথার মধ্য দিয়া, কবির নিজেরই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। গৃহত্যাগ করিবার পর গোপনে মায়ের সঙ্গে তাঁহার কয়েকবার দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার পরেই দেশত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গেলে মায়ের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হয় নাই—মাও বেশিদিন বাঁচিয়া ছিলেন না। এ আক্ষেপ মধুসূদনের জীবনে কখনও ঘুচে নাই। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি-গুলি পড়িবার সময়ে কবির অশ্রুসিক্ত চক্ষু যেন স্পষ্ট দেখিতে পাই, তাই কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক করুণরস এই ব্যক্তিহৃদয়-সংস্পর্শে আরও করুণ হইয়া উঠে। লক্ষ্মণের মত, কবিও মায়ের আকুল অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বহুদূরে নির্ব্বান্ধব প্রবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন—মায়ের প্রাণে দুঃখ দিয়াছিলেন। স্বপ্নে সেই মাকে তিনিও হয়তো দেখিতে

পাইতেন; কিন্তু লক্ষ্মণের সহিত সুমিত্রার আবার দেখা হইয়াছিল, কবির আর মাতৃদর্শন ঘটে নাই। তাই লক্ষ্মণের মুখে—

আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?

—কবির নিজেরই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি বলিয়া মনে হয়। নিজ জননীকে স্মরণ করিয়া কবির এই দীর্ঘশ্বাস এ কাব্যে অন্যত্র আরও কয়েকটি পংক্তিতে শুনিতে পাই—

হায় রে, মায়ের প্রাণ! প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!

৪

লক্ষ্মণের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি যে কারণেই হউক, কবি-হৃদয়ের গভীরতর উল্লাস ও কল্পনার গূঢ়তর জাগরণ ঘটিয়াছে—ইন্দ্রজিতের কাহিনী-রচনায়। এই চরিত্রের প্রতি যে সহানুভূতি, তাহারই প্রভাবে মধুসূদনের কবিশক্তি সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে এমন ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের রসাবেশ আছে, যাহাতে মনে হয়, কবির কাব্যতরণী এতক্ষণে পূর্ণস্রোতে ভাসিয়াছে। ইন্দ্রজিতের প্রতি কবি-আত্মার সেই আত্মিক মমতার ফলেই, তাহার কাহিনীতে, বিদ্যুদ্দীপ্ত অশ্রুমেঘের এমন নীলাঞ্জনশোভা ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চম সর্গে, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করার শেষ আয়োজন সমাপ্ত করিয়া, দেবীর বর ও আশীর্ব্বাদ লাভের পর যখন চণ্ডীর দেউল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন রাত্রি প্রায়

শেষ হইয়াছে—পাখী ডাকিয়া উঠিল। সেই পাখীর ডাকে ইন্দ্রজিতেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।—

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।

এই একই পাখীর ডাক, একই প্রভাত—এক দিকে দেব-মানবের নৃশংসতা, এবং অপর দিকে মনুষ্যহৃদয়ের মাধুরী ও দম্পতী-প্রেমের অসন্দিগ্ধ সারল্যকে যুক্ত করিয়া—এ কাব্যের ট্র্যাজেডিকে নিমেষে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। একই মুহূর্ত্তে এক দিকে ব্যাধের অলক্ষ্য সায়ক শাণিত ও অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে সেই সায়কের লক্ষ্য যে কপোত-দম্পতী, তাহারা আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় নিশ্চিন্ত সুখে কলকূজন করিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে নানা বিভীষিকার মধ্যে কবি যেমন হত্যার শেষ আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তেমনই, উষার নিষ্কলুষ আলোকে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রেম স্নেহ ও ভক্তির অপার্থিব শোভা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তখন, মেঘনাদ প্রমীলার ঘুমন্ত আঁখি-পল্লব চুম্বন করিয়া, তাহার হাতখানি হাতে ধরিয়া, কানের কাছে মৃদু গুঞ্জন করিতেছে—

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা, তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর!

মানবজীবনের যে মাধুরীর প্রতি কবির প্রাণগত আকর্ষণ, তাহারই রসাবেশে তিনি মেঘনাদের মৃত্যুদিনের প্রভাতটিকে এমন কোমল-করুণ, প্রসন্ন উষালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন—সূর্য্যের প্রখর আলোককে যেন বহুক্ষণ প্রকাশ হইতে দেন নাই। তাই, মেঘনাদ

যখন প্রমীলাকে জাগাইতেছে, তখনও যেমন—'এতক্ষণে পোহাইল তিমির-শর্ব্বরী', তেমনই, রাণী মন্দোদরীর প্রাসাদে গিয়া মেঘনাদ যখন অনেক আশ্বাস ও সান্ত্বনার পর মায়ের নিকটে বিদায় লইতেছে, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, তখনও মেঘনাদ বলিতেছে—

ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী।

তার পরেও যখন প্রমীলাকে মায়ের কাছে রাখিয়া—

শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে যজ্ঞশালামুখে।

তখনও কাননের পুষ্পতরুমূলে স্খলিত পুষ্পরাশির আস্তরণে উষার শুভ্রজ্যোতি বিকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বশেষে যখন প্রমীলা কোনরূপে পলাইয়া ইন্দ্রজিৎকে অর্দ্ধপথে আসিয়া ধরিল, তখনও মেঘনাদের মুখে শুনি—

অনুমতি দেহ, রূপবতি,
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমাকে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর-গমনে,—

এতক্ষণে রজনী সত্যই প্রভাত হইল। কিন্তু এ প্রভাত লঙ্কার পক্ষে কালমেঘে আবৃত, রামের শিবিরেই সত্যকার প্রভাত হইতেছে। সেখানে লক্ষ্মণ রামকে বলিতেছে—

দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কালমেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু!

এই প্রভাত ও তাহার পূর্ব্বরাত্রি—চণ্ডীর দেউলে লক্ষ্মণের সেই অভিযান-রাত্রি, এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বল্পক্ষণস্থায়ী উষাকে কবি যেন পুরূরবার উর্ব্বশীর মত ধরিয়া, মানবজীবন-মাধুরী উপভোগ করিয়াছেন। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে, এই জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি—যৌবনের যে মহিমা, ও হৃদয়ের যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির নাম ইন্দ্রজিৎ, তাহারই হত্যা-কাহিনী—বর্ণনা করিতে কবির কল্পনা অশ্রুসাগরে বাড়বাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সেই হত্যা যে ভাবে ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কবির কল্পনা প্রথম হইতেই সকল ঘটন ও অঘটনের মধ্য দিয়া একাগ্র ও অভ্রান্ত ভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। দেব-মায়া, দেব-মানবের ষড়যন্ত্র, লক্ষ্মণের মত বীরের বীরধর্ম্মচ্যুতি—এ সকলই এই দৃশ্যে সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে; এই দৃশ্যের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিবার জন্য, ইহার মর্ম্মগত ট্র্যাজেডিকে চকিত বজ্রদীপ্তি দান করিবার জন্য, পূর্ব্বাপর সকল আয়োজন যথাযথ হইয়াছে। রুদ্ধদ্বার যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণের আকস্মিক আবির্ভাবে, মেঘনাদের হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হইল, কবি প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদের মত বীরের হৃদয়ে এই যে ভীতির সঞ্চার, ইহাই এ চরিত্রের চরম দুর্গতি, ইহাতেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত।—

যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধ-ফণা ফণীবরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক—চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

এখানে কবির কল্পনা মেঘনাদের মৃত্যুর যেন স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছে। তারপর, ক্রমে ক্রমে, এ দৃশ্যের যে গাঢ় হইতে গাঢ়তর বর্ণ-বিবর্ত্তন, তাহাতেও যে কল্পনা এতটুকু সত্যভ্রষ্ট হয় নাই। মেঘনাদের সেই নিরস্ত্র অসহায় অবস্থাকে কবি যে ভাবে আমাদের অনুভূতিতে, আঘাতের পর আঘাতে তীব্রতম করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাও কল্পনার দৃঢ়তা ও অব্যর্থতার নিদর্শন। কেবলমাত্র অসীম বাহুবল ও ততোধিক তেজস্বিতার বলে সে অবস্থাতেও ইন্দ্রজিৎ যাহাকে ক্ষুদ্র কীটের মত দলিত নিষ্পেষিত করিতে পারিত, দৈবী মায়ায় ও বিভীষণের প্রতিবন্ধকতায় সে তাহার কিছুই করিতে পারিল না। তাহার নিক্ষিপ্ত কোষার অতর্কিত আঘাতে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ, যখন পুনরায় চেতন পাইয়া তাহাকে ক্রমাগত শরবিদ্ধ করিতে লাগিল, তখন রক্তাক্ত কলেবরে—

অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে।...
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
করপদ্ম-সঞ্চালনে!

সেইক্ষণে, ইন্দ্রজিতের মত বীরের সেই নিশ্চল নিরুপায় মূর্ত্তি—অসীম শক্তি সত্ত্বেও তাহার সেই সর্ব্বশক্তিহত অবস্থা, এ ট্র্যাজেডির পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থার সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তও কবির কল্পনাবেশে কি অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে! মেঘনাদ তখন চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—

মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে,
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুল রথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী—
নিষ্ফল, হায় রে, মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে, কিম্বা সিংহ আনায়-মাঝারে!

এই কয়টি পংক্তি পড়িবার সময়ে যেমন চমকিত হই, তেমনই সেই চমকসৃষ্টি কবির একটা কৌশলমাত্র বলিয়া মনে হয় না। ইহাই যেন ঘটিতে বাধ্য ; কাব্যের গভীরতম রস-সত্য ও জীবনের বাস্তব সত্য এখানে মিলিয়াছে। ইহাকেই উৎকৃষ্ট স্টাইল বলে, মেঘনাদের হত্যাবর্ণনায় মধুসূদনের কল্পনা যথাস্থানে আপন গৌরব রক্ষা করিয়াছে। এই কাহিনীতে কবি মেঘনাদকে 'দেবদৈত্যনরত্রাস' এক অতি-মানুষ বীর-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন ; তথাপি তাহার প্রাণ যেমন মানুষের প্রাণ, তেমনই সেই প্রাণ ত্যাগ করিবার সময়ে সে মানুষের মতই মৃত্যুর ভয়ঙ্করত্ব উপলব্ধি করে। আমরা এই দৃশ্যে, প্রথমে মেঘনাদের ভয় ও পরে তাহার অক্ষম অসহায় মূর্ত্তি দেখিয়াছি ; কিন্তু তখনও, আমরা মেঘনাদের অমানুষী শক্তি ও অতি-উদ্ধত পৌরুষের কথা বিস্মৃত হই না। এতক্ষণে, মেঘনাদের সকল মহিমার অন্তরালে তাহার জীবধর্ম্মের দুর্ব্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়া—সাধারণ মর্ত্ত্য-নিয়তির বশে তাহার সকল দম্ভের পরাভব দেখিয়া, অতিগভীর মানবীয় সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়। অতএব, আসন্ন মৃত্যুর মুখে মেঘনাদের এই যে বিভীষিকাদর্শন—চরিত্র, ঘটনা ও অবস্থানের পক্ষে ইহা অবশ্যম্ভাবী ; ইহা না হইলে কবির কল্পনা সত্যভ্রষ্ট হইত। বাস্তবের দিক দিয়াও

ইহা অতিশয় স্বাভাবিক। এ কাব্যের ভাবমণ্ডলের সঙ্গে এ জাতীয় বিভীষিকার সম্বন্ধ, যেমন সহজ, তেমনই বিস্ময়বিমূঢ়তা, ভয়, নিষ্ফল চেষ্টার অবসাদ, ও পরিশেষে রক্তক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতার ফলে, এ শুধুই 'মায়ার মায়ায়' নহে—মানুষ বলিয়াই, মেঘনাদের এই মস্তিষ্ক-বিকার অনিবার্য্য। এই বাস্তবকে বরণ করিয়াই মেঘনাদের জীবনের ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কবির কল্পনাও এই বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর রস-সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু-কাহিনীর শেষ কয় পংক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য।—

এতেক কহি, বিষাদে সুমতি,
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা বীর স্মরি প্রমীলারে—
চিরানন্দ। লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা দ্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

শেষ কয়টি চরণের যতি-মন্থর গতি, সংক্ষিপ্ত উপমা, ও চকিত পরিসমাপ্তিতে যে মৌন-গভীর ভাব-গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কবি যেন সর্ব্বশেষে মেঘনাদের মৃতদেহের উপরে এক দৃঢ়স্তম্ভ উন্নতচূড়া সমাধিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

৫

ইহাই মেঘনাদের মৃত্যু—"death of my favourite Indrajit"। তথাপি, কাহিনীর এই অংশে, ঘটনা অপেক্ষা বক্তৃতা ও বিতর্কের

পরিমাণ অধিক হইলেও, এবং কবির পক্ষে ভাবাতিরেকের বিপদ থাকা সত্ত্বেও, আশ্চর্য্য লিপিসংযমের পরিচয় আছে। ষষ্ঠ সর্গের কোথায়ও, বিশেষত এই দৃশ্যের বর্ণনায়, এতটুকু অতিরিক্ত কাব্য-বিলাস নাই; যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণের প্রবেশ হইতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্য্যন্ত, কবি যেন—to guide the whrilwind and ride the storm—তাঁহার লেখনীকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়াসনে বসিয়াছেন। এইখানে, শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিক কাব্যগুলির সহিত মধুসূদনের যে আবাল্য পরিচয়, ও তাহার ফলে, কাব্যের যে আদর্শ, ও রচনার যে রীতি তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা বড়ই কাজে লাগিয়াছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ কাব্যে মেঘনাদ-ঘটিত যাহা কিছু, তাহাতে কবিকল্পনার একটি যে সরলতা ও স্বচ্ছতা আছে, তাহাই কাব্যে ক্ল্যাসিক্যাল প্রবৃত্তির লক্ষণ। মেঘনাদের চরিত্র-চিত্রে বা জীবনের কাহিনী-বর্ণনায়, কবি যেমন কোথায়ও নিছক কাব্য-কলার অনুরোধে বাগ্‌বিস্তার করেন নাই—বরং মেঘনাদকে আমরা এ কাব্যে, কেবল এই পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গেই, বেশিক্ষণ ও বিশেষ করিয়া পাই—তেমনই, তাহার এই মৃত্যুর বর্ণনায় কবি একটি সুসংযত পারিপাট্য রক্ষা করিয়াছেন। কল্পনার এই গুণে, কাব্যের এই মুখ্য ঘটনাও বর্ণনার বাহুল্যদোষে দুষ্ট হয় নাই; ইহার তুলনায়, লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তিশেল-নিক্ষেপের কাহিনী এমনই ঘনঘটাময়ী যে, সেই যুদ্ধবর্ণনার সর্গ, অর্থাৎ সপ্তম সর্গই, সেকালের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে, এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সর্গ। ষষ্ঠ সর্গের এই হত্যাদৃশ্য, ঘটনার ঘনঘটায় চমকপ্রদ না হইলেও, অন্তর ও বাহিরের দ্রুত-পরিবর্ত্তমান ভাবচিত্রের মধ্য দিয়া অনিবার্য্য বেগে পূর্ণসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তথাপি এই দৃশ্য এ সর্গের প্রায় অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া আছে, যদিও এখানে ঘটনাকে দীর্ঘ করিবার কোন উপায়ই নাই;

কারণ, লক্ষ্মণ যে ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করার মত, একটি আঘাতেই এ ঘটনা শেষ হইবার কথা। এইজন্যই, কবি এই অতিসংকীর্ণ ঘটনাবস্তুকে যতখানি প্রসারিত করিয়াছেন, তাহাতে অবান্তর বিষয়-সন্নিবেশের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কবির কল্পনা একটি অতি সহজ কৌশলে সেই গুরুতর সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছে—ঘটনাটিকে দীর্ঘ করিতে গিয়া এতটুকু অবান্তর বা অতিবিস্তার-দোষ ঘটে নাই। বিভীষণের সহিত বাক্যবিনিময়ের যে অবকাশ, তাহাতেই ইন্দ্রজিতের আয়ুষ্কাল কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে, এবং এই অবকাশের সৃষ্টি হইয়াছে—লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের অতর্কিত প্রহারে কিছুকাল মূর্চ্ছাহত রাখিয়া। এই কথোপকথনের জন্য পাঠকের মনে কিছুমাত্র অধৈর্য্য ঘটে না, বরং তাহাতে যে নিদারুণ প্রতীক্ষার ভাব জাগে, তাহাতেই এ দৃশ্য আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। তারপর, ক্ষণ-স্তম্ভিত বজ্র যখন এই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঘটনার অবসান করিয়া দেয়, তখন পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। এদিক দিয়াও কবির কল্পনাচাতুর্য্য কম বিস্ময়কর নহে।

এই সময়ে বন্ধুকে লিখিত কবির একখানি পত্রে জানা যায় যে, এই সর্গ রচনাকালে কবি কয়েকদিন অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন; কিন্তু তখন তাঁহার মস্তিষ্কে মেঘনাদ পুরা ভর করিয়াছে, এ সর্গ শেষ করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়াছেন। কবি বন্ধুকে লিখিতেছেন—

A few hours after we parted I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him.

পত্রের এই পরিহাসোক্তির মধ্যেও কবির প্রবল হৃদয়াবেগ ব্যক্ত

হইয়াছে—'মেঘনাদ মরিয়াছে, তাহার অর্থ, ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিতে প্রায় ৭৫০ লাইন লাগিয়াছে। তাহাকে মারিতে আমি বড় কান্না কাঁদিয়াছি।' এই পত্রে, কাব্যরচনার অন্তরালে, কবিহৃদয়ের যে অবস্থার কথা আছে, তাহা সত্য। কিন্তু এই আবেগ কবিকেই পীড়িত করিয়াছে, কাব্যকে করে নাই—করিলে, এমন গাঢ়-শ্রী ও সুসংযত রচনা আমরা লাভ করিতাম না। কবির যাহা ক্লেশ তাহা প্রকৃতপক্ষে ক্লেশ নহে, এ আবেগের মূলে আছে সৃষ্টিপ্রেরণার পীড়া। যে ভাব-বস্তু তাঁহার অন্তরের মূলে বিদ্ধ হইয়া আছে, ইহা—তাহাকেই উৎপাটিত করিয়া, কাব্যের আকারে প্রকাশ করিয়া, সুস্থ হইবার প্রাণপণ চেষ্টা। এ সময়ে হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ারও বোধ হয় কারণ আছে; মধুসূদনের মত কবির পক্ষে, এইরূপ কাব্যরচনাকালে, ভাবাবস্থার ক্রমিক উত্তেজনায় এইরূপ একটা অসুস্থতা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—বিশেষত, যখন মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনাই তাঁহার কাব্যের স্ব-নির্দ্ধারিত উচ্চতম শিখর, এবং এক্ষণে সেই শিখর লঙ্ঘন করিবার দুরূহ সাধনায় তাঁহার কবি-মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধকাব্যের প্রসঙ্গে আমি মেঘনাদ-চরিত্র ও মেঘনাদবধ-সর্গের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলাম; সমগ্র কাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়; তথাপি আমি কাব্যের এই অংশের কল্পনা ও কাহিনীগত গুরুত্ব-বিবেচনায় ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, মধুসূদনের কবিশক্তির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলাম। এ প্রবন্ধের আরম্ভে আমি, মেঘনাদ-চরিত্র যে কোন্ অর্থে এ কাব্যের আদি-প্রেরণা বা ভাবোদ্দীপনার হেতু হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। গভীরতর অর্থে, এ কাব্যের নায়ক রাবণ, কিন্তু কাব্যের বহিরঙ্গ-বিচারে এবং আরও কতকগুলি কারণে, মেঘনাদও নায়কত্ব দাবি করিতেছে—এই নায়ক-

দ্বন্দ্বের কারণ, এবং ঐ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কেন যে কল্পনার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে আলোচনাও করিয়াছি। এ কাব্যের কল্পনায় কবিপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের কথাও বলিয়াছি। ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যের আদর্শই মধুসূদনের কবি-মানসে আধিপত্য করিয়াছিল—অথচ ব্যক্তি-জীবনের গূঢ়তর চেতনায় তিনি একজন রোমাণ্টিক। কবির সেই দুই প্রবৃত্তিই রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রে পাশাপাশি রহিয়াছে। রাবণের চরিত্রে কবির সেই আত্ম-প্রতিকৃতির আভাস আছে, যাহাকে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'Romantic self-representation' বা 'Imaginative self-identification' বলা যাইতে পারে। রাবণ যেন কবিরই নাভি-নালের উপরে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চেতনার তলদেশ হইতে যত কিছু উৎকণ্ঠা ইহাতে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। মেঘনাদ যেন সেই পদ্মের মধ্যশোভী কামনা-ভ্রমর; কিন্তু সেই বেদনা-কমলের বিষ-মধু তাহার সহ্য হইল না, তাই সে মরিয়া গেল। মেঘনাদ যেন কবিকল্পনার সহজ সুস্থ দিবালোক—প্রাণের স্বাস্থ্য ও মনের অকপট বিশ্বাসে সে জীবন সমুজ্জ্বল। রাবণ মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দিবা—তাহাতে প্রাণের স্বাস্থ্যহানি ও মনের বিশ্বাস-ভঙ্গই প্রকট। সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই রূপকের ছায়া স্পষ্ট ও ঘনীভূত হইয়া আছে; এবং ইহা হইতেই এ কাব্যে—কবিকল্পনার দ্বৈধ, সে কল্পনার সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান ক্রিয়া, কাব্যে ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমাণ্টিক প্রবৃত্তির যুগ্মধারা, এবং দ্বিনায়কত্বের আভাস—বুঝিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহার কোনটির জন্যই কাব্যের রূপ-সমগ্রতা বা কল্পনার মূলগত ঐক্যের বিঘ্ন ঘটে নাই। তাহার কারণ, এ কাব্যের কল্পনায় কবির সমগ্র সত্তা সাড়া দিয়াছে—ইহাই Imagination বা খাঁটি কবিশক্তির লক্ষণ; কারণ—"Imagination is an act of the whole being"। তাই উৎকৃষ্ট কবিকল্পনায় সকল বিরোধ, সকল জটিলতা—সমগ্রতার এক-রসে সমাহিত হইয়া কাব্যকে আরও গভীর ও রসাত্মক করিয়া তোলে। কবির সেই আত্ম-সত্তাই যে এ কাব্যের কল্পনা-বিস্তারে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া আছে, আশা করি এ আলোচনায় তাহার কিছু প্রমাণ দিতে পারিয়াছি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

কাল্‌চার

মীনা মজুমদার ওরফে টুনটুনি ঠিক যে আমাদের বাংলা দেশের মেয়ে নয়, তা তার কমলালেবুর মত গোল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ চাপা চেহারা দেখলেই মালুম হবে। আধা-জমিদার বংশের মেয়ে, তাও 'কালের যাত্রায় পরিবর্ত্তনের স্রোতে' এখন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার বলা চলে। প্রাক্তন আধা-জমিদারির আভিজাত্য আর বর্ত্তমানের মধ্যবিত্তের অসহায় কেন্দ্রচ্যুত জীবনের দোটানায় প'ড়ে মজুমদার-পরিবারের ছেলেমেয়ে কটিরও কোন নোঙর নেই। সংসারে এক বৃদ্ধা মা, তিনি দিন গুনছেন। কারণ তাঁর পুত্রকন্যারা সব আধুনিক 'কৃষ্টি'র উপাসক, সংসারের মধ্যে আলোক ঠিকরে এসেছে, অতএব তাঁর স্থান নেই। বড় কন্যা ক'ষে দিনকতক রাজনীতি ক'রে এক নাহুসনুহুস এইচ. এম. বি.-কে বিয়ে ক'রে শেষে তাকে চাকরি ক'রে পুষছে। মেজোটির মেজাজ খিটখিটে, বে-থা করে নি, মাকে কথায় কথায় বুকের বেদনার কথা জানিয়ে সাইকো-অ্যানালিসিস শুনিয়ে দেয়—ফ্রয়েড, ইউং, অ্যাড্‌লার। ছেলে হিমাংশু বিদ্বান হ'লেও বুদ্ধিমান নয়, মাথার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে সংস্কৃতির সমস্যা দিনরাত চরকির মত ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপর আমাদের মীনা মজুমদার, হালে বি. এ পাস করেছে, শোনা যায় নাকি উগ্র সোশ্যালিষ্ট, এককালে ছাত্র ফেডারেশন করেছিল, সম্প্রতি মার্ক্স-লেনিন পড়ছে। ***

বহু বছর রাজবন্দী থেকে বিমলেন্দু মুক্তি পেয়ে কলকাতায় ফিরল। বিমলেন্দুর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, সুতরাং কোথাও অভ্যর্থনার জন্যও দরজা খোলা নেই। মজুমদার-পরিবারের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মেলামেশার ফলে যে আত্মীয়তাটুকু হয়েছিল, তা এতদিনের বিচ্ছেদের পর এখনও টিকে আছে কি না, বিমলেন্দু জানে না। তবু কোথাও গেলে ওখানেই যেতে হয়, অন্তত হিমাংশু আর তার মার জন্য তো নিশ্চয়ই। বিমলেন্দু সন্ধান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত একদিন গিয়ে হাজির হ'ল। অভ্যর্থনা ভালই হ'ল, খুব আন্তরিকতার সঙ্গে,—আত্মীয়তা নষ্ট হয় নি।

হিমাংশুর মা বললেন, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। মীনা আর হিমাংশু প্রায়ই তোমার কথা বলত। দেশে তো হিমাংশুর আর তোমার বন্ধুত্বের অনেক গল্প র'টে গেছে। সকলে বলে, তোমাদের মত নাকি এ রকম বন্ধুত্ব কেউ দেখে নি। মীনা তো তোমার কাছে পড়বে ব'লেই পাগল। প্রায়ই বলে—বিমলদা ফিরলে ইংরেজী শেখা যাবে, ভাল ভাল বই পড়া যাবে। এবার ওকে একটু পড়াও।

মীনা বলিল, শুধু শুধু বিমলদা আমাকে পড়াবে কেন শুনি? বিমলেন্দু চেয়ে দেখলে, মীনা তার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে, যদিও প্রশ্নটা মাকে করা হয়েছে।

মা বললেন, তোকে পড়াবে তার আবার শুধু শুধু কি?

বিমলেন্দু বললে, আজকালকার মেয়ে মা, তার ওপর শিক্ষিতা, কারও বাধিত হতে চায় না।

মীনা বললে, বাধিত হওয়ার প্রশ্ন নয়—একেবার এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

মা বললেন, সেটা কি?

মীনা বললে, শোষণ—শোষণ, তুমি বুঝবে না মা, একেবারে কাল্‌চার নেই, শুধু 'মনু' জেনে রইলে, মার্ক্স তো পড় নি? বিমলদা মেহনৎ করবেন, মজুরি পাবেন না কেন?

বেশ তো, চায়ের সঙ্গে রোজ খাবার খাইয়ে দিস।—ব'লে মা হেসে চ'লে গেলেন। ***

বিমলেন্দু পড়াতে আসে রোজ, বেড়াতেও আসে। এক পাঁজা ডায়ালেক্‌টিক্সের বই নিয়ে এসে রোজ মীনাকে বক্তৃতা দিয়ে যায়। সোশ্যালিজ্‌ম হ'লে মেয়েরা কি রকম স্বাধীনতা পাবে, জীবনের পরিধি কতখানি প্রসারিত হবে, এই সব। মীনা চুপ ক'রে শোনে, মাঝে মাঝে বলে, সোভিয়েট রুশিয়ায় যেতে ইচ্ছে করে বিমলদা।

যাবার দরকার হবে না, এখানেই হবে।—ব'লে বিমলেন্দু উঠে চ'লে যায়। **

মীনা। শ্রীহট্টের পই মনে আছে আপনার বিমলদা?

বিমলেন্দু। ভুলে গেছি।

মীনা। জেলার ছড়া, ভুলে গেছেন?—

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই।
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই।
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই।

—বলুন তো কি?

বিমলেন্দু। জানি না।

মীনা। বাইরে বারান্দায় আসুন, বলছি।

বিমলেন্দু একটু ইতস্তত ক'রে উঠে গেল। বারান্দায় রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে মীনা বললে, ঐ যে—চাঁদ—আকাশ আর তারা।

বিমলেন্দু হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মীনাও। ***

মীনা মাষ্টারি পেয়ে বীরভূম চ'লে গিয়েছে। বাংলা দেশে পাসিওনারিয়া,

মাদাম চিয়াংকাইসেক বা রোজা লুক্সেমবুর্গের মত মেয়েও যে থাকতে পারে—এ কথা বিমলেন্দু বন্ধুদের কাছে অকারণে জানায়। বন্ধুরা বিদ্রূপ ক'রে বলে, থাকলেও, পাতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে নেই। ***

বিমলেন্দু মীনাকে চিঠি লিখলে, আমার জীবনের সব কথাই তুমি জান। নূতন জীবনের যে পরিচয় পেয়েছ, কেমন লাগে? কাল্‌চারই জীবনের বড় কথা। যদি নূতন জীবন ভাল লাগে, তা হ'লে আমি কি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি? প্রয়োজন মনে কর কি? জানালে সুখী হব। সত্যকে গোপন রাখলে দুজনেরই ক্ষতি। ***

কয়েকদিন পরে মজুমদার-বাড়িতে বিমলেন্দুর ডাক পড়ল। বিমলেন্দু গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে, মীনা আর হিমাংশু ব'সে রয়েছে। ঘরে ঢুকতেই মীনা খট খট ক'রে বেরিয়ে গেল বিমলেন্দুর দিকে কটমট ক'রে চেয়ে।

বিমলেন্দু। আমাকে ডেকেছিলে?

হিমাংশু। হ্যাঁ।

বিমলেন্দুর লেখা চিঠিখানা বার ক'রে ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ চিঠি তোমার?

বিমলেন্দু। (নার্ভাস হয়ে) হয়েছে কি?

হিমাংশু। আমি তোমাকে কাল্‌চার্ড ব'লে জানতুম—এখন দেখছি, তুমি ভদ্রতাও শেখ নি। মীনা বীরভূম থেকে এসেছে, সে রাগে কাঁপছিল। তুমি জান, আমার সিষ্টার কি ক্লাসের মেয়ে!

বিমলেন্দু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে "আচ্ছা" ব'লে বেরিয়ে গেল। **

দু বছর পরের কথা। পূজার ছুটি। রাত্রি এগারোটার সময় বহু সাহেব মেমসাহেবের ভিড়ের মধ্যে মীনা ডাভ্‌টেল্‌ড হয়ে বেরুল 'ক্যাসানোভা' থেকে হরিদাস শেঠের সঙ্গে। হরিদাস শেঠের বয়স যে বছর পঁয়ত্রিশ, তা তার পালোয়ানী চেহারা দেখে বোঝা যায় না—ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের বিখ্যাত শেয়ারের দালাল—নাম আছে। আর মীনা মজুমদার এখন ইস্কুল-ইন্সপেক্ট্রেস—ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক ঘষা, গালে বৃত্তাকার লাল রঙ, হাতে দামী ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে সাত ইঞ্চি হীল-তোলা জুতো।

ক্যাসানোভা—ককটেল, আর 'কাল্‌চারে' যে ফিউজন হয়েছে মীনা মজুমদারের মধ্যে, বিমলেন্দুর তা দেখার সৌভাগ্য হয় নি। দুর্ভাগ্যবশত বিমলেন্দু তখন রাজনৈতিক কারণে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে।

শ্রীবিনয় ঘোষ

অরণ্যে

স্থান বাংলা দেশ, কাল বর্ত্তমান, বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টা। বনের মধ্যে একটি ভাঙা বাড়ি। বাড়িটি পাকা, কিন্তু বহুদিনের অব্যবহারে অত্যন্ত জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই বাড়িতে একটিমাত্র বাসোপযোগী ঘর; দেওয়ালের চটা উঠিয়া গিয়াছে, মেঝে অসমতল, উপরে একটা বরগা এক দিক খুলিয়া গিয়া বিপজ্জনকভাবে ঝুলিয়া আছে। ঘরের দুইটি জানালার কবাটের কব্জা ঢিলা হইয়া গিয়া আপনা-আপনি খুলিয়া আছে—তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্রোজ্জ্বল বৃক্ষ-সমাকীর্ণ বহিঃপ্রকৃতি ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর নিসর্গচিত্রের মত দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি নড়বড়ে টেবিল ও চারি পাশে চারিখানি কাঠের জীর্ণ চেয়ার। ঘরের কোণে তিনটি মাঝারি আয়তনের ষ্টীল ট্রাঙ্ক উপরা-উপরি করিয়া রাখা আছে। একটা কাঠের কবাট-যুক্ত দেওয়াল-আলমারি ঈষৎ খোলা অবস্থায় ভিতরে রক্ষিত অনেকগুলি টেনিস-বলের মত জিনিস কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতেছে। একটা বিছানা দেওয়ালের কাছে গুটানো রহিয়াছে। টেবিলের উপর সিগারেটের টিন ও দেশলাইয়ের বাক্স।

দুইটি চেয়ারে দুইজন লোক বসিয়া আছে। প্রথম ব্যক্তি একটি প্রাচীন গলিতপ্রায় ইংরেজী সংবাদ-পত্র মুখের সম্মুখে ধরিয়া পাঠ করিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি চেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলের উপর সন্তর্পণে পা তুলিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে ও একটি গানের কলি গুঞ্জন করিতেছে। তাহার বয়স তেইশ চব্বিশ, অল্প পাতলা গোঁফ আছে, মুখখানি চমৎকার ধারালো, বড় বড় স্বপ্নাতুর চোখ, মাথার চুল দীর্ঘ ও ঈষৎ কোঁকড়ানো। তাহাকে দেখিয়া কবিপ্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

যুবক অলসভাবে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গুঞ্জন করিতেছিল,—

'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।'

কিছুক্ষণ কাটিবার পর প্রথম ব্যক্তি সংবাদ-পত্র নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিল, তখন তাহার মুখ দেখা গেল। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ;

মুখখানা ভারী, কিন্তু মাংসল নয়—গোঁফদাড়ি কামানো। চিবুক অত্যন্ত চওড়া, ভ্রূর উপরের অস্থি উঁচু—ভ্রূ প্রায় কেশহীন। নাক মোটা, অথচ অস্থিময়। চোখ ছোট ও তীক্ষ্ণ। হাঁ বড়। রং লালচে গৌরবর্ণ। পিরানে ঢাকা দেহের ঊর্দ্ধভাগ যতটা দেখা যাই তছে—চওড়া ও মজবুত।

সিগারেটের টিন হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া লোকটি ঊর্দ্ধদিকে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, সংস্কারের কৈঙ্কর্য্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বন্ধন।

দ্বিতীয় লোকটি গান থামাইয়া স্বপ্নভরা চোখ তুলিল, বলিল, নিশ্চয়। সংস্কারের কৈঙ্কর্য্য কাকে বলে?

প্রথম। এটা ভাল, ওটা মন্দ—এই সংস্কার। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া চাই, তবেই সত্যিকার মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয়। [একটু চিন্তা করিয়া] বুঝলুম। কিন্তু আমরা যে মুক্তির পথে চলেছি, সেটা তবে কি?

প্রথম। সেটা ছোট মুক্তি—কতকগুলো অনাবশ্যক দুঃখ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইগুলো ঘাড় থেকে নামাতে চাই।

দ্বিতীয়। কিন্তু তা নামাবার দরকার কি? একেবারে আসল খাঁটি মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

প্রথম। তা হয় না। পায়ে কাঁটা বিঁধে থাকলে দৌড়ুতে পারবে না। আগে কাঁটা টেনে বার কর, তারপর শরীর ধাতস্থ হ'লে খাঁটি মুক্তির পেছনে দৌড় দিও।

দ্বিতীয়। তা হ'লে, যতদিন কাঁটা না বেরুচ্ছে, ততদিন ভাল-মন্দর জ্ঞান অর্থাৎ সংস্কার-কৈঙ্কর্য্য রাখতে হবে?

প্রথম। সংস্কারের কিঙ্কর হবার দরকার নেই—লৌকিকভাবে তাকে মেনে চললেই যথেষ্ট। যেমন আমি নিকটিনের কিঙ্কর নই, তবু সিগারেট খাচ্ছি।

দ্বিতীয়। [সহাস্যে টেবিল হইতে পা নামাইল। সন্তর্পণে একটা সিগারেট ধরাইল] আমি কিন্তু ভাল লাগে ব'লেই সিগারেট খাই।

প্রথম। কাজেই সিগারেট না পেলে তোমার কষ্ট হবে।

দ্বিতীয়। তা তো হবেই—হয়ও। কিন্তু কষ্ট সহ্য করি। বিরহী যেমন প্রিয়ার বিরহ সহ্য করে, তেমনই ভাবে হাহুতাশ করতে করতে সহ্য করি।

প্রথম। এই বিরহের ক্লেশ তোমার থাকত না, যদি মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে মনে পোষণ না করতে।

দ্বিতীয়। হায় হায় দাদা, মিলনের আশাটাই যদি ছেড়ে দিই, তা হ'লে বাঁচব কিসের জোরে? দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যদি না নামে, বক্ষের দরজায় তা হ'লে বন্ধুর রথ থামবে কেন? বিচ্ছেদ-বেদনার পূর্ণ পাত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করা যে হবে না।

প্রথম। করবার দরকার হবে না ভাই। বিচ্ছেদের বেদনাই যদি না থাকে, মিলনের আগ্রহও সেইসঙ্গে উঠে যাবে।

দ্বিতীয়। [মাথা নাড়িয়া] আমি তা চাই না,—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নহে, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

প্রথম। অর্থাৎ তুমি বৈষ্ণব হতে চাও—ন্যাড়ানেড়ীর দল।

দ্বিতীয়। না দাদা, বৈষ্ণব হতে চাই না—আমি মুসলমানই থাকতে চাই। কিন্তু তারও ওপরে আমি বাঙালী—বাঙালীর ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম। বাঙালী মুক্ত হতে চায় না দাদা, বাঙালী সুখী হতে চায়।

প্রথম। তাইতেই তো সর্ব্বনাশ হয়েছে।

দ্বিতীয়। হোক সর্ব্বনাশ। সুখী হবার একান্ত চেষ্টাতেই একদিন বাঙালী এ সর্ব্বনাশকে কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার উপদেশ শুনে সে যদি কেবল উপনিষদের ভূমাকে কামড়ে প'ড়ে থাকে, তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত তাকে ভূমার বদলে ভূমিকেই কামড়ে প'ড়ে থাকতে হবে।

প্রথম। তোমার কথা যে একেবারে মানি না, তা নয়। তবে ভয় হয়, পাছে অতি ছোট সুখ পেয়েই মন তৃপ্ত হয়ে থাকে, আরও বড় জিনিসের প্রতি আগ্রহ ক'মে যায়।

দ্বিতীয়। কমবে না, সে ভয় নেই দাদা। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব—এ লোভ দিন দিন বেড়েই চলবে।

প্রথম। কিন্তু সেটাও তো ভাল নয়।

দ্বিতীয়। সে কথা তখন ব'ল, যখন অপর্যাপ্ত সুখের নেশায় বুঁদ হয়ে আমরা প্রকৃত সুখ কি, তা ভুলে যাব। এখনও তার সময় হয় নি। এখন —[সুরে] প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

এই সময় ভেজানো দরজা ঠেলিয়া একটি মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। পরিধানে আটপৌরে কালাপেড়ে শাড়ি ও শেমিজ, পা খালি। মেয়েটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, ঈষৎ কৃশ। বয়স উনিশ কিম্বা কুড়ি। চোখ দুইটি হরিণের মত আকর্ণবিশ্রান্ত। মাথার ঘন চুল এত কোঁকড়া যে, কবরী-বন্ধ অবস্থাতেও মাথার উপর আঁকাবাঁকাভাবে ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে। দেহ নিরাভরণ, কেবল গলায় একটি সরু সোনার হার আছে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা শক্তি সমাহিত আছে যে, দেখিলেই তাহাকে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়।

গান শেষ হইলে সে বলিল, দেবদা, চা খাবে? রান্না নামতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরি আছে। জামালদা, তুমি খাবে?

জামাল। [চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল] দাদা, এমন অপূর্ব্ব কথা কখনও শুনেছ? কণাদিদি, এ কি শোনালে? গায়ে যে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! [সুরে] কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—

দেবব্রত। জামাল, তুমি একটা আস্ত পাগল। শান্ত হয়ে ব'স, পাগলামি ক'র না।

জামাল। পাগলামি করব না? আলবৎ করব। এতেও যদি পাগলামি না করি, তা হ'লে করব কিসে? আমার গন্ধর্ব্ব-নৃত্য নাচতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একলা তো ঠিক হবে না, দাদাকেও অনুরোধ করা বৃথা। অতএব কণাদিদি, তুমি এস।

কণা। আমি এখন নাচতে পারব না, আমার অনেক কাজ।

জামাল। অ্যাঁ! নাচের চেয়ে কাজ বড় হ'ল? বেশ, তাই হোক, তা হ'লে নাচব না। কিন্তু দিদি, তোমার সংসারে চা আছে, এ খবর আগে দাও নি কেন?

কণা। আগে দিলে কি এত ফুর্ত্তি হ'ত?

জামাল। [মহা উল্লাসে] ঠিক। দাদা! বেদান্ত-দাদা! তোমার বেদান্ত এবার রসাতলে গেল। কণাদিদি কি বললে, তা শুনতে পেলে? শুনতে পেলেও বুঝতে পারলে? যদি না বুঝে থাক, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দেবব্রত। জামাল, তুমি একটা—

জামাল। পাগল। ও প্রসঙ্গ একবার হয়ে গেছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমি জানতে চাই, তুমি কণাদিদির কথার গূঢ় মর্ম্মবাণী বুঝতে পেরেছ কি না?

দেবব্রত। পেরেছি। তুমি এখন ক্ষান্ত হও, নয়তো এই দণ্ডে এ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হও।

কণা এতক্ষণ স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সে এবার জোরে হাসিয়া উঠিল।

কণা। জামালদার মনের ভাব তো পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, উনি চা খাবেন। আর তুমি দেবদা? খাবে নাকি?

দেবব্রত। খাব, দিও এক পেয়ালা। কিন্তু জামাল, তুমি ওকে 'কণা' ব'লে ডেকো না, অগ্নি ব'লে ডেকো।

জামাল। [শান্ত হইয়া বসিল] ওকে আমার কণাদিদি বলতেই ভাল লাগে।

দেবব্রত। কিন্তু ওর নাম অগ্নি। ও আমাদের আগুন, সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা। ওকে কণা বললে ওর মহিমা খাটো করা হয়।

জামাল। যে আগুন আমাদের বুকের মধ্যে আছে, ও তারই ফুলকি, তাই ওকে কণা বলি। তা ছাড়া ওর নাম শুধু অগ্নি নয়, অগ্নিকণা। অন্যকে ও পুড়িয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ও অন্ধকার রাত্রে আগুনের ফুলকির মত, শুধু আনন্দের দেবতা, দাহনের নয়।

দেবব্রত। দেখ জামাল, তোমার প্রাণটা বড় বেশি ভাবপ্রবণ। ওটা এ পথে ভাল নয়। ভাবপ্রবণতা কাজের ক্ষতি করে।

জামাল। কে বললে ক্ষতি করে? আমার প্রাণে যদি ভাবের উন্মাদনা না থাকত, একটা idea যদি আমাকে পাগল ক'রে না দিত,

তা হ'লে আমি সংসারী হতুম দাদা, এ পথে আসতুম না। কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা। এখন কথা হচ্ছে, শ্রীমতী অগ্নিকণা দেবী দিদি-ঠাকুরাণীকে 'কণা' বলা যেতে পারে কি না? দাদা বলছেন, বলা উচিত নয়। কণা, তুমি কি বল?

কণা। [ভাবিয়া] আচ্ছা, তুমি একবার আমাকে অগ্নি ব'লে ডাক তো জামালদা।

জামাল। [গাম্ভীর্য্য-বিকৃত কণ্ঠে] অগ্নি!

অগ্নি। উঁহু, মোটেই ভাল শুনতে হ'ল না। তোমার মুখে 'কণা'ই মিষ্টি শোনায়। দেবদার মুখে যেমন অগ্নি মানায়, তোমার মুখে তেমনই কণা।

জামাল। বাস্। শুনলে তো? রফা হয়ে গেল। এখন তুমি অগ্নি ব'লে ডাক, আমি কণা ব'লে ডাকি। দুজনে মিলে পুরো পিতৃদত্ত নামটি পাওয়া যাবে।

দেবব্রত। অগ্নিকণা কি ওর পিতৃদত্ত নাম?

জামাল। তবে?

দেবব্রত। ওর পিতৃদত্ত নাম জানি না; ও কখনও বলে নি। বোধ হয় আমাদের দলের কেউ জানে না।

অগ্নি। একজন জানে।

প্রস্থান করিল

দেবব্রত ও জামাল কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দুইজনেই নীরবে সিগারেট ধরাইল। প্রায় পাঁচ মিনিট কোন কথা হইল না।

জামাল। [দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া] দাদা, এখানে তো তিন দিন হয়ে গেল। আর কতদিন?

দেবব্রত। আজ রাত্রি বারোটার সময় পরেশ আর ভবতোষ আসবে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি জিম্মা ক'রে দিয়ে তারপর আমাদের ছুটি। থাকতে ইচ্ছে করলে থাকতে পার, কিন্তু না থাকলেও ক্ষতি নেই।

জামাল। পরেশ আর ভবতোষ আজ রাত্রে আসবে। কিন্তু তারা

অতগুলো রিভল্‌বার আর বোমা নিয়ে যেতে পারবে? ভারী তো কম নয়, প্রায় দু মণ।

দেবব্রত। পারবে। কারণ তারা চাষা সেজে বলদ সঙ্গে ক'রে আসবে।

জামাল। ও। [কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া] তা হ'লে কাল সকালে আমি বেরিয়ে পড়ি। কুমিল্লার কাজটা তো আমারই ওপর পড়েছে। আগে থাকতে গিয়ে জায়গাটা দেখে শুনে রাখা যাক।

দেবব্রত। বেশ, যাও। অগ্নিও তোমার সঙ্গে যাক। তোমাদের এখনও কেউ চেনে না, সন্দেহও করে না, সুতরাং নিরাপদে যেতে পারবে। আমি আর অখিল আপাতত এইখানেই রইলুম; অন্তত যতদিন না আমার ভাল ক'রে দাড়ি গজায়, ততদিন থাকতেই হবে। আমি একেবারে মার্কামারা, দেখলেই ধরবে।

জামাল। তা বেশ, তোমরা থাক। এ জায়গাটার ওরা বোধ হয় এখনও সন্ধান পায় নি।

দেবব্রত। তাই তো মনে হয়। [ঈষৎ উৎকণ্ঠিতভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া] আজ অখিলের ফিরতে বড় দেরি হচ্ছে।

জামাল। হ্যাঁ। বোধ হয় বেচারা গাঁয়ে মাছ পায় নি, তাই একেবারে মাছ ধরিয়ে নিয়ে আসছে। আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছিল, যেমন ক'রে হোক মাছ নিয়ে তবে ফিরবে। কণাও বোধ হয় মাছের অপেক্ষায় রান্না চড়াতে দেরি করছে।

দেবব্রত। তাই হবে বোধ হয়।

জামাল। আচ্ছা দাদা, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?

দেবব্রত। কি?

জামাল। অখিল আর কণার মাঝখানে কেমন একটা দূরত্ব আছে, ওরা ভাল ক'রে মেশে না। কণা আমাদের সকলকে 'দাদা' বলে, কিন্তু অখিলকে অখিলবাবু বলে।

দেবব্রত। হুঁ। অখিল বড় আত্মসমাহিত গম্ভীর, কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে মেশবার তার ইচ্ছেও নেই, ক্ষমতাও নেই; ও শুধু নিজের

কাজে ডুবে থাকতে চায়। তা ছাড়া মেয়েমানুষ সম্বন্ধে ওর মনে একটা সঙ্কোচ আছে, তাদের ঠিক আপন ক'রে নিতে পারে না।

জামাল। তা হতে পারে। কিন্তু কণা তাকে দূরে দূরে রাখে কেন?

দেবব্রত। অগ্নি কাউকে দূরে রাখে না, কাছেও টানে না। ও হচ্ছে আগুন, ওর প্রভা শুধু আমাদের পথ দেখাবার জন্যে।

জামাল। না দাদা, অগ্নি শুধু পথ দেখায় না, পথে চলবার প্রেরণাও আনে। আমার এক এক সময় মনে হয়, ও আমাদের এই মুক্তি-সাধনার বীজমন্ত্র, স্নেহে তরল অথচ কর্ত্তব্যে কঠিন, সেবায় নারী কিন্তু বুদ্ধিতে পুরুষ, সত্যের মতন নির্লিপ্ত আবার সৌন্দর্য্যের মত মোহময়ী। যে আদর্শ এই আনন্দময় মৃত্যুর পথে আমাদের বার করেছে, অগ্নি হচ্ছে তার প্রতিমা।

দেবব্রত। তোমার কবিত্ব বাদ দিলে যা থাকে, অগ্নি তাই বটে।

জামাল। কিন্তু তবু অখিলের সম্পর্কে ওকে দেখলে কেমন খটকা লাগে। মনে হয়, যেন অগ্নির সহজ ক্রিয়া কাচের চিমনিতে ঢাকা প'ড়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

দেবব্রত। ও তোমার বোঝবার ভুল। আসলে অখিল সর্ব্বদা নিজের প্রাণের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে, তাই অমন মনে হয়। কিন্তু দরকারের সময় ওদের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকবে না জেনো।

জামাল। সে আমি জানি। কিন্তু তবু অখিলের জন্যে দুঃখ হয়। এত একাগ্র, এত তন্ময় যে আশেপাশে তাকাবার ওর যেন সময় নেই—এমন আশ্চর্য্য জীবনটাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে পেলে না।

দেবব্রত। জীবন উপভোগ করবার প্রণালী সকলের এক নয় জামাল।

জামাল। তাই হবে বোধ হয়। নইলে আজ আমরা চারটি প্রাণী এই জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ো বাড়িতে ব'সে লাল চালের ভাত আর আলুনি তরকারি খাচ্ছি কেন?

দুটি কলাই-করা সাদা বাটিতে চা লইয়া অগ্নি প্রবেশ করিল।

টেবিলে রাখিতেই জামাল একটা বাটি টানিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিয়া মুখ চোখাইল।

জামাল। আঃ, কণা তুমি হচ্ছ স্বর্গের সাকী; আজ যা খাওয়ালে, এ চা নয়, খাঁটি নির্জ্জলা অমৃত—যা সাগর মন্থন ক'রে উঠেছিল। দাদার নিরাকার পরব্রহ্মের অবস্থা। চিনি ও চিটাতে সমজ্ঞান; কাজেই ওঁর কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশা ক'র না। উনি হয়তো বলবেন, চিনি কম হয়েছে, কিম্বা একেবারেই বাদ পড়েছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? অমৃতে চিনি মেশালে কি বেশি সুস্বাদু হয়?

অগ্নি। জামালদা, এইজন্যেই তোমাকে খাইয়ে এত সুখ হয়। চিনি ছিল না তাই দিতে পারি নি—দুধও টিনের। দেবদা, চা খারাপ হয়েছে? [দেবব্রত এমনভাবে ঘাড় নাড়িল, যাহার অর্থ হাঁ না—দুই হইতে পারে] দাঁড়াও, আমার চা-ও নিয়ে আসি। ভাত চড়িয়ে দিয়েছি, এখনও ফুটতে দেরি আছে।

প্রস্থান করিল

দেবব্রত। অখিলের আজ বড় দেরি হচ্ছে!

জামাল। ও কিছু নয়—মাছ। যখন প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে, তখন না নিয়ে ফিরবে না।

অগ্নি চায়ের বাটি লইয়া প্রবেশ করিল ও একটা চেয়ারে বসিল।

অগ্নি। দেবদা, আজ রাত্রে তো ওরা এসে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাবে—তারপর?

দেবব্রত। তারপর তোমাকে নিয়ে জামাল বেরিয়ে পড়বে, আমি আর অখিল আপাতত এখানেই থাকব।

অগ্নি। তোমাদের অন্য কোনও কাজ আছে নাকি?

দেবব্রত। না, দাড়ি গজানে ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

অগ্নি। জামালদা তো কুমিল্লায় যাবে। আর আমি?

দেবব্রত। তুমিও।

অগ্নি। আমার কাজ?

দেবব্রত। উপস্থিত চুপ ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। যথাসময় খবর পাবে।

অগ্নি। বেশ। [চিন্তা করিল] আপাততঃ মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি নিতে পারি ?

দেবব্রত। তা পার। কিন্তু দরকার হ'লেই যাতে ছেড়ে আসতে পার, সে পথ খোলা রেখো।

অগ্নি। বেশ। আর কোনও হুকুম আছে ?

দেবব্রত। না।

একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামবর্ণ, মুখে গোঁফ ও অযত্ন-বর্দ্ধিত খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল রুক্ষ ও ঝাঁকড়া ; ইতরশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয়, চেহারা দেখিয়া বয়স অনুমান করা কঠিন, পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে যেটা খুশি হইতে পারে। ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত ; হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়, নগ্ন পদ। মলিন গামছার এক প্রান্তে বাঁধা সওদা কাঁধ হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, তারপর চেয়ারে আসিয়া বসিল। জামালের বাটিতে তখনও আধ বাটি চা ছিল। নিঃশব্দে তুলিয়া লইয়া পান করিল। তারপর সিগারেট ধরাইল।

তিনজনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দেবব্রত। অখিল, পুলিস সন্ধান পেয়েছে ?

অখিল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। জামাল শিস দিবার মত মুখভঙ্গি করিল। অগ্নি নিষ্পলক নেত্রে অখিলের পানে তাকাইয়া রহিল। দেবব্রতের চোয়ালের হাড় শক্ত হইয়া উঠিল।

দেবব্রত। কখন আসছে ?

অখিল। তারা গাঁ থেকে বেরিয়েছে দেখে এসেছি। খুব সাবধানে আসছে, তাই এসে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।

দেবব্রত। দিশী পুলিস ?

অখিল। জন কুড়ি আর্মড পুলিস, আর সঙ্গে গ্রিফিথ।

দেবব্রত। গ্রিফিথ ?

অখিল। হ্যাঁ, গ্রিফিথ।

কিছুকাল সকলে নীরব।

জামাল। [উঠিয়া] এমন সুযোগ আর হবে না। দাদা, আজ দ্বিতীয় বালেশ্বরের যুদ্ধ দেখিয়া দেওয়া যাক। কি বল অখিল ? কি বল কণা ? [দেওয়াল-আলমারি হইতে রিভল্‌বার লইয়া টোটা ভরিতে লাগিল]

অগ্নি। আমারও তাই মত। কিন্তু অখিলবাবুর কি মনে হয় ?

অখিল উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

দেবব্রত। পালাবার এখনও সময় আছে, কিন্তু পালালে চলবে না, তা হ'লে সমস্ত বোমা রিভল্‌বার পুলিসের হাতে পড়বে। এগুলো নিয়ে পালানোও সম্ভব নয়। তা ছাড়া পরেশ আর ভবতোষ আজ রাত্রে আসবে। তারা তো খবর জানে না ; আর খবর দেবার সময়ও নেই।

সকলে চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল। জামাল রিভল্‌বারে টোটা ভরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দেবব্রত। [সহসা মুখ তুলিয়া] এক উপায় আছে। জামাল, এদিকে এস, মন দিয়ে শোন।

জামাল আসিয়া বসিল।

দেবব্রত। জামাল, তুমি মুসলমান, অগ্নিকেও কেউ চেনে না। তোমরা দুজনে এখানে থাক, আমি আর অখিল আড়াল হই।

জামাল। ঠিক বুঝলুম না দাদা, আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল।

দেবব্রত সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল। চারিটি মাথা কিছুক্ষণ একত্র হইয়া রহিল। শেষে দেবব্রত চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল।

দেবব্রত। কি বল ? এ ছাড়া অস্ত্রগুলো বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই।

অগ্নি ও অখিলের মুহূর্ত্তের জন্য চোখোচোখি হইল। তারপর দুইজনেই ঘাড় নাড়িয়া দেবব্রতের প্রস্তাবে সায় দিল।

জামাল। [বাঁকিয়া বসিয়া] আমি পারব না।

দেবব্রত। [বিস্ফারিত নেত্রে] পারবে না ?

জামাল। না। আমি কণাকে 'দিদি' বলেছি।

দেবব্রত। ছিঃ জামাল ! ওসব কুসংস্কারের কি এই সময় ?

জামাল। আমি পারব না।

দেবব্রত। জামাল, তুমি আমার হুকুম অমান্য করছ?

জামাল। [হস্তস্থিত রিভল্‌বার দেবব্রতের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া] তার শাস্তি নিতে আমি তৈরি আছি।

দেবব্রত। [রিভল্‌বার তুলিয়া লইয়া] হুকুম মানবে না?

জামাল। না, পারব না। অগ্নি আমার দিদি, আমার বোন। ওর গায়ে আমি ওভাবে হাত দিতে পারব না।

দেবব্রত। বেশ, তবে তৈরি হও।

জামাল। [হাসিয়া] আমি তৈরিই আছি দাদা।

দেবব্রত। [রিভল্‌বার ফেলিয়া দিয়া] Fool! গাধা! আহাম্মক! অভিনয় করতে পারবে না?

জামাল। কেন? তুমি কিম্বা অখিল অভিনয় কর না।

দেবব্রত। আমাদের যে মানাবে না। গ্রিফিথ পাকা ওস্তাদ, একবার দেখেই ধ'রে ফেলবে।

জামাল। তোমাকে ধরতে পারে, কিন্তু অখিলকে পারবে না। আমাদের মধ্যে মুসলমানের মত চেহারা যদি কারও থাকে তো সে অখিলের।

দেবব্রত অখিলের দিকে চাহিল। অখিল নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল।

জামাল। ঐ দাড়ি কামিয়ে যদি থুতনির কাছে একটু নূর রেখে দাও, কার সাধ্য বলে যে, অখিলের নাম জামালুদ্দিন মিঞা নয়।

দেবব্রত। অখিল, আর সময় নেই। কি বল?

অখিল। [অগ্নির দিকে ফিরিয়া] কি বল?

অগ্নি। [হাসিয়া উঠিয়া] কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না। আমার ভয়ে ঘর ছাড়লে, তবু নিস্তার নেই। কি আর করবে বল?

অখিল। [দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে] আমি রাজি।

জামাল। [উৎসুকভাবে] ব্যাপারটা কি বল তো? কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে।

অখিল। [ঈষৎ হাসিয়া] এক কথায় বলা যাবে না। যদি বেঁচে

থাকি, আজ রাত্তিরে বলব। এখন চটপট স'রে পড়, তারা এতক্ষণ এসে পড়ল।

অগ্নি। তোমাদের আজ খাওয়া হ'ল না জামালদা।

জামাল। তা না হোক। অখিল, আমার বাক্সে লুঙ্গি আছে, ক্ষুর আয়না চিরুনি সব পাবে। আচ্ছা, চললুম, রাত্রে আবার দেখা হবে। চল দাদা।

দেবব্রত। একটা কথা মনে রেখো অখিল, গ্রিফিথ ভয়ানক খড়িবাজ, আর সে বাংলা জানে।

উভয়ে প্রস্থান করিল

অখিল ক্ষুর ইত্যাদি বাহির করিয়া দাড়ি কামাইতে বসিল। অগ্নি দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া অস্ত্রগুলা সাবধানে তাকের পিছনে সরাইয়া রাখিয়া, তারপর একটা মশারি তাহার উপর চাপা দিল। চেয়ারগুলা ও টেবিল এক পাশে সরাইয়া দিয়া মেঝেয় বিছানা পাতিল। ঘরটাকে গুছাইয়া রান্নাঘর অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অখিল ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করিয়া লুঙ্গি ও গোলাপী রঙের গেঞ্জি পরিয়াছে, মাথা তৈলসিক্ত করিয়া চুল আঁচড়াইতেছে।

অখিল। কেমন দেখাচ্ছে?

অগ্নি। বেশ। [মুখ টিপিয়া হাসিয়া] আমাকে ফেলে পালিয়ে আসার ফল পেলে তো?

অখিল। পেলুম।

অগ্নি। কেন পালিয়েছিলে, বল তো? ভেবেছিলে, আমি তোমায় বাধা দোব?

অখিল। তখন তো তোমাকে এমন ক'রে চিনি নি।

অগ্নি। এখন চিনেছ?

অখিল। চিনেছি।

অগ্নি। এখন কেমন মনে হচ্ছে?

অখিল। মনে হচ্ছে, পালিয়ে এসে ভালই করেছিলুম।

অগ্নি। [কাছে আসিয়া] কেন বল দেখি?

অখিল। [অগ্নিকে জড়াইয়া লইয়া] তা না হ'লে তোমাকে যে এমন ক'রে পেতুম না রাণী!

অগ্নি। [কণ্ঠলগ্না] আমিও যে তোমাকে এমন ক'রে পাব, তা কে জানত? সব আশা ছেড়ে দিয়েই তো বেরিয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ এইভাবে দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল।

অখিল। [সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উৎকর্ণভাবে] ওরা এসে পড়েছে—এস।

শয্যার উপর অগ্নি শয়ন করিল; অখিল তাহার পাশে কাত হইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া শুইয়া মৃদু স্বরে কথা কহিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে তাহার অধর চক্ষু চুম্বন করিতে লাগিল। অগ্নিও থাকিয়া থাকিয়া তাহার গলা ধরিয়া টানিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিতে লাগিল।

অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া একজন মিলিটারী বেশধারী সাহেব প্রবেশ করিল, তাহার হাতে রিভল্‌বার। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া কড়া স্বরে বলিয়া উঠিল, Hands up—both of you. You're under arrest.

অখিল ও অগ্নি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা, আমি কোথা যাব? এ যে সায়েব!

অখিল। [ভয়কম্পিত স্বরে] তাই তো দেখছি। Who—who are you?

গ্রিফিথ। You put your hands up first, or my gun might go off. [অখিল দুই হাত তুলিল] Ask your companion to do the same.

অখিল। হাত তোল—সায়েব বলছে। [অগ্নি হাত তুলিল]

গ্রিফিথ। That's good. হুকুম সিং!

জনৈক জমাদার প্রবেশ করিল।

গ্রিফিথ। Handcuff লাগাও। [হুকুম সিং হাতকড়া লাগাইল] Now search the man. মরদকা অঙ্গা-ঝাড়ি করো। [হুকুম সিং তাহাই করিল] Nothing there? All right!

অগ্নি। ওগো, কি হবে? আমাদের কি বেঁধে নিয়ে যাবে?

অখিল। কি জানি, হয়তো তোমার বাবা পুলিসে খবর দিয়েছেন।

গ্রিফিথ। [চেয়ারে বসিয়া] Now come and sit down here in front of me. [দুইজনে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসিল] That's right. Now tell me who you are.

অগ্নি। ওগো, সায়েব কি বলছে? আমাদের মেরে ফেলবে না তো? আমার যে বড্ড ভয় করছে। [কাঁদিতে লাগিল]

গ্রিফিথ। Ask your friend to be quiet.

অখিল। কণা, চুপ কর, সায়েব রাগ করছে।

গ্রিফিথ। What's your name?

অগ্নি। ওগো নাম জিজ্ঞাসা করছে নাকি? দোহাই তোমার, নিজের নাম ব'ল না।

অখিল। [অধর লেহন করিয়া] My name is—is অনিলকুমার রায়।

গ্রিফিথ। [মাথা নাড়িয়া] It's no use, young man, come out with the real one. And let me tell you, I know Bengalee. আমি বাংলা জানি।

অগ্নি। ওমা, কি হবে—সায়েব বাংলা জানে! [মাথায় কাপড় টানিবার চেষ্টা করিল। অখিল মূঢ়বৎ বসিয়া রহিল।]

গ্রিফিথ। এবার আসল নামটি বল তো দেখি।

অখিল। সায়েব, আমার আসল নাম মহম্মদ জামালুদ্দিন।

গ্রিফিথ। জামালুদ্দিন! Who is this young lady then?

অখিল। [থতমত] উনি—উনি আমার স্ত্রী।

গ্রিফিথ। মিথ্যে ব'ল না—She is a Hindu girl. [অগ্নিকে] তোমার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

অগ্নি। [লজ্জাবদ্ধ কণ্ঠে] সায়েব, আমি ওর সঙ্গে—ওর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

গ্রিফিথ। [শিস দিয়া] I see! I see! কোথায় তোমার ঘর?

অগ্নি। সায়েব, আমায় মেরে ফেল, কেটে ফেল, কিন্তু ও কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারব না। নিজে যা করবার করেছি, বাবার মুখে কালি লাগাতে পারব না।

গ্রিফিথ। [অখিলকে] তোমার বাড়ি কোথায় ?

অখিল। চব্বিশ পরগণায়। এর বেশি বলতে পারব না।

গ্রিফিথ। এই জঙ্গলের মধ্যে তোমরা কি করছ ?

অখিল। লুকিয়ে আছি—তোমাদের ভয়ে।

গ্রিফিথ। [হাসিতে লাগিল] Well, you are a nice pair of lovers ! হুকুম সিং, handcuff খোল দেও।

হুকুম সিং হাতকড়া খুলিয়া দিল।

অগ্নি। সায়েব, আমাদের ছেড়ে দিলে ? আমাদের ধ'রে নিয়ে যাবে না ?

গ্রিফিথ। I was after bigger game. তোমাদের মত চুনোপুঁটির খোঁজে তো আমি আসি নি। আমি খবর পেয়েছিলাম, একদল বিপ্লবী—terrorist এখানে লুকিয়ে আছে।

অখিল। [সভয়ে] বিপ্লবী ! সাহেব, আমরা তার কিছু জানি না। আজ তিন দিন হ'ল, আমরা এখানে আছি। আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি, এই আমার অপরাধ। বিপ্লবীদের আমি কিছু জানি না।

গ্রিফিথ। It seems I was misinformed—ভুল খবর পেয়েছিলাম। But in any case, আমি তোমাদের জিনিসপত্র তল্লাস ক'রে দেখতে চাই।

অগ্নি। দেখ সায়েব, দেখ, আমাদের বাক্স-প্যাটরা যেখানে যা আছে সব দেখ। আমরা নিরপরাধ।

গ্রিফিথ। Very good. হুকুম সিং, তোম লোগ সবকোই মিলকে দুসরা দুসরা ঘর খানাতল্লাস করো [হুকুম সিং প্রস্থান করিল] Now let us see what you have got here. [উঠিল]

অখিল। [অগ্নির নিকট হইতে চাবি লইয়া] এই নাও সায়েব চাবি।

গ্রিফিথ সতর্ক চক্ষে ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার ঘরটা প্রদক্ষিণ করিল। দেওয়াল-আলমারির কবাট খুলিয়া দেখিল, একটি মশারি গুটানো রহিয়াছে।

গ্রিফিথ। What's this ? A mosquito net ?

অখিল। Yes sir. This jungle is very full of mosquitoes.

অগ্নি। সায়েব, চা খাবেন ?

গ্রিফিথ। চা—tea ? No, Thank you. This is not my time for tea. দরকার নেই।

অগ্নি। না সায়েব, এক পেয়ালা খেতেই হবে, তোমার নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। আমি এখুনি তৈরি ক'রে এনে দিচ্ছি।

গ্রিফিথ। [ইতস্তত করিয়া] Well, if it is no trouble to you young lady, দাও এক পেয়ালা।

অগ্নি। [কৃতজ্ঞভাবে] আচ্ছা সায়েব, এখুনি আনছি। আপনি আমাদের ওপর এত দয়া করলেন, এটুকুও যদি আপনার জন্যে না করি, তা হ'লে মনে বড় দুঃখ হবে।

প্রস্থান করিল

গ্রিফিথ। [কতকটা নিজ মনে] A pretty siren ! just the sort that finds home dull and dreary. [বাক্স খুলিয়া দেখিতে লাগিল। সর্ব্বশেষের বাক্স হইতে একটি বোতল তুলিয়া লইয়া] Bless me ! What's this ?

অখিল। [সাগ্রহে] মদ সায়েব, খাবে ?

গ্রিফিথ। By all that's—, but why didn't you tell me ? This is the real stuff—whisky !

অখিল। একদম ভুলে গিয়েছিলুম সায়েব, তোমার তাড়া খেয়ে কিচ্ছু মনে ছিল না। খাবে ?

গ্রিফিথ। Sure we shall take a sip together, though it's not the time. Tell the young lady she needn't make tea. This will do. Bring three glasses.

অখিল। Very well সায়েব। কাচের গেলাস তো নেই, বাটি আনছি।

প্রস্থান করিল

গ্রিফিথ। [চাবির গোছা-সংলগ্ন কর্কস্ক্রু দিয়া বোতল খুলিতে খুলিতে] They seem to be all right. Just an ordinary case of elopement. But still,—there is something wrong somewhere. What is it? [চিন্তা করিয়া] Well, I shall test the girl. If she takes the whisky and can stand it, I shall know what to think. A good Hindu girl will never stand whisky.

তিনটি বাটি লইয়া অগ্নি ও অখিলের প্রবেশ। গ্রিফিথ প্রত্যেক বাটিতে একটু করিয়া মদ ঢালিল।

গ্রিফিথ। [অগ্নিকে] I suppose you are used to it? অভ্যাস আছে তো?

অগ্নি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

No soda I believe? Well, it doesn't matter. I prefer it raw. Here's to you! [পান করিল]

অখিল। To you. [অগ্নি ও অখিল পান করিল]

গ্রিফিথ। [অগ্নিকে] How do you like it? কেমন মনে হচ্ছে?

অগ্নি। চমৎকার সায়েব। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

গ্রিফিথ। Good Lord! নাচতে ইচ্ছে করছে! But there's no time for that, I'm afraid. [সহাস্যে মাথা নাড়িল]

হুকুম সিং প্রবেশ করিল।

হুকুম সিং। হুজুর, কঁহি কুছ নহি মিলা।

গ্রিফিথ। Oh well, never mind. I didn't expect you would find anything. হুকুম সিং, বিলকুল ঝুঁট খবর মিলা। অব লোট চলো।

হুকুম সিং। হুজুর!

গ্রিফিথ। Well, so long. Wish you both a very good time.

অখিল। Thank you sir.

অগ্নি। সায়েব, যাচ্ছেন? [জোড়হাত করিয়া] সায়েব, আমাদের প্রাণের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের ধ'রে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তবু দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। আপনাকে আর কি বলব—থ্যা—থ্যাঙ্ক্ ইউ।

গ্রিফিথ। Don't thank me young lady, rather thank your own luck that I am after bigger game. [টুপি তুলিয়া] Good bye! But look here. You must clear out of this place as quickly as you can. [আঙুল তুলিয়া] If ever I come back and find you here still, I shall surely send you up. Good day!

অখিল। Good day.

গ্রিফিথ দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

গ্রিফিথ। [অর্দ্ধস্ফুট স্বরে] Lord! Four chairs! [ফিরিয়া] By the way, there is none else with you?

অখিল। না সায়েব, কেবল আমরা দুজন।

গ্রিফিথ। No servant or anything of the sort?

অখিল। না সায়েব।

গ্রিফিথ। All right! ta ta. [প্রস্থান করিল]

অগ্নি ও অখিল শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে হুকুম সিঙের গলা শুনা গেল—'ফর্ম ফোর্‌স' 'রাইট টার্ন', 'কুইক মার্চ' জুতার মশমশ শব্দ ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল।

অগ্নি। [কম্পিত কণ্ঠে হাসিয়া] ওগো, আমায় একবার ধর। মাথাটা ঘুরছে।

অখিল। মাথা ঘুরছে? [অগ্নিকে জড়াইয়া ধরিল]

অগ্নি। [বুকে মাথা রাখিল] মদ গিলেছি, মনে নেই?

পটক্ষেপ

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেই ঘর। গভীর রাত্রি। টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। দেবব্রত, জামাল ও অগ্নি তিনটি চেয়ারে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

অখিল প্রবেশ করিয়া বসিল।

দেবব্রত। পরেশ ভবতোষ চ'লে গেল?

অখিল। হ্যাঁ। তাদের বনের ধার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলুম।

দেবব্রত। যাক, এখন নিশ্চিন্দি। [সিগারেট ধরাইল]

জামাল। যাক। কণাদিদি, এবার আসল কথাটা হোক। এতদিন ফাঁকি দিয়েছ, এখন গল্পটা বল।

অগ্নি। কোন্ গল্প?

জামাল। তোমার আর অখিলের গল্প।

অগ্নি। [অখিলের দিকে ফিরিয়া] তুমি বল।

অখিল। বলবার বিশেষ কিছু নেই। কণা আমার বউ। তবে পুরোপুরি নয়—আধখানা।

জামাল। হেঁয়ালি রাখ—সব কথা খুলে বল।

অখিল। এক শহরেই আমাদের বাড়ি। যখন ইস্কুলে পড়তুম, তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল।

জামাল। অর্থাৎ তখন থেকেই ভালবাসা জন্মেছিল।

অখিল। ভালবাসা! কি জানি! যে জন্যে লোকে ভালবাসে—রূপ—তা ওর কস্মিনকালেও ছিল না।

অগ্নি। আর তুমি বুঝি নবকার্ত্তিক ছিলে?

অখিল। না। চেহারায় দুজনেই পরস্পরকে টেক্কা দিতুম, এখনও দিচ্ছি। কিন্তু তা নয়; ওকে ভালবাসতুম কি না বলতে পারি না, তবে ওর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। আর মনে মনে ওকে একটু ভয় করতুম।

জামাল। আর কণাদিদি, তুমি?

অগ্নি। অমন নীরস লোককে কেউ ভালবাসতে পারে? তুমিই বল।

জামাল। তা পারে না, তবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে—যেমন তুমি বেরিয়েছ। তারপর?

অখিল। ক্রমে দুজনে বড় হলুম। আমার মন দুদিকে টানতে লাগল—এক দিকে কণা আর এক দিকে দেশ, ভাল কথা, ওর নাম অগ্নি নয়, ওর সত্যিকারের নাম কনক। যাক, তারপর—অর্থাৎ একদিন—ভাববার সময় পেলুম না—আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। যেন নেশার ঘোরে বিয়ে ক'রে ফেললুম। যেদিন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম, সেদিন চোখ থেকে হঠাৎ ঠুলি খ'সে পড়ল। বুঝলুম, যে বাড়িতে কণা আছে, সে বাড়িতে থেকে আমি অন্য কিছু পারব না, আমার মনের সে জোর নেই। ওর মনের পরিচয় তখনও পাই নি; শুধু ওর একটুখানি হাসি দেখে ওর ভালবাসার ইসারা পেয়েছিলুম—তাই ভয় আরও বেড়ে গেল। কণা, মনে আছে?

অগ্নি। হুঁ।

অখিল। তখনও কুশণ্ডিকা হয় নি। সেই অবস্থাতেই ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চম্পট দিলুম। পিছু ফিরে তাকালুম না, পিছু ফিরলে আর ফিরতে পারতুম না। তারপর দু বছর কেটে গেল। শেষে একদিন হঠাৎ বরিশালের মীটিঙে কণার দেখা পেলুম। ও তখন আমাদের মধুচক্রের মক্ষিরাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকে সবই তোমরা জান।

জামাল। হুঁ। কণাদিদি, এবার তোমার তরফটা শুনি।

অগ্নি। আমার তরফে শোনবার কিছুই নেই। বড় হয়ে অবধি ওঁর সঙ্গে দেখা বড় একটা হ'ত না, যদিও এক পাড়াতেই বাড়ি, কখনও কদাচিৎ দেখা হ'লে উনিও কথা কইতেন না, আমিও না। কিন্তু তবু, ওঁর মনের গতি কোন্ দিকে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কি ক'রে বুঝেছিলুম জানি না, বোধ হয় ভালবাসার যিনি ভগবান তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নিজেকে ওঁর উপযুক্ত ক'রে তৈরি করতে লাগলুম,

ভাবলুম, দুজনে মিলে কাজ করব। তারপর বিয়ে হতে না হতেই উনি নিরুদ্দেশ হলেন।

পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর অন্ধকার যখন হাল্কা হ'ল, তখন ভাবলুম, তাতেই বা ক্ষতি কি? উনি যে পথে গিয়েছেন, আমিও তো স্বাধীনভাবে সেই পথে যেতে পারি।

মন ঠিক করতে কিছুদিন গেল। তারপর আমিও একদিন কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। জামালের চোখ আনন্দের স্বপ্নে আচ্ছন্ন, অগ্নি নিজের মনের অতলে তলাইয়া গিয়াছে, দেবব্রত পাহাড়ের মত নিশ্চল, অখিল অন্যমনস্কভাবে বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে।

জামাল। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আজ আমাদের কণাদিদির ফুলশয্যা। দাদা, আমরা এখানে কেন? চল, বনে বনে ঘুরে বেড়াইগে।

দেবব্রত। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] ঠিক কথা। অখিল, অগ্নি, এতদিন আমি তোমাদের মোড়ল নেতা কর্ত্তা গুরু, যা বল, ছিলুম—মনে ভাবতুম, মোড়ল হওয়ার অধিকার আমার আছে। আজ সে পদবী আমি ত্যাগ করলুম—তোমরা দুজনে আজ থেকে আমাদের গুরু হ'লে। এখন কি করব হুকুম কর।

অখিল ও অগ্নি দেবব্রতকে প্রণাম করিল।

অখিল। দাদা, আপাতত আমাদের বিয়েটা সম্পূর্ণ ক'রে দাও।

দেবব্রত। সে কি?

অখিল। কুশণ্ডিকা হয় নি যে।

দেবব্রত। পাগল! কুশণ্ডিকায় তোমাদের দরকার নেই। তোমাদের বিয়ে—সত্যিকারের বিয়ে—অনেক আগে হয়ে গেছে।

অখিল। তা হোক দাদা, তবু তুমি বিয়ে দাও। তুমি পণ্ডিত মানুষ, তোমার মুখ থেকে দুটো সংস্কৃত শ্লোক শুনলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। জানি, তুমি বলবে—অন্ধ সংস্কারের কৈঙ্কর্য্য। কিন্তু আজ দুপুর থেকে প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। কণার শরীরটাকে নিয়ে যে ভাবে—,

না দাদা, তুমি যা হোক দুটো মন্ত্র আউড়ে দাও—অগ্নি-দেবতা তো সামনেই রয়েছেন।

লণ্ঠনের দিকে ইঙ্গিত করিল

দেবব্রত। বেশ, তোমাদের যখন ইচ্ছে, তখন তাই হোক। কিন্তু কুশণ্ডিকার মন্ত্র তো জানি না। শুধু আধখানা শ্লোক মনে আছে,—তাও নবেল প'ড়ে শেখা। আচ্ছা, তাতেই হবে। অগ্নি, তুমি অখিলের হাত ধর, ওর মুখের দিকে চেয়ে বল—ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

অগ্নি। ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

দেবব্রত। অখিল, তুমি বল।

অখিল। ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তমনুচিত্তস্তেঽস্তু।

দেবব্রত। বাস্, হয়ে গেল। আমার মন্তরের পুঁজি ফুরিয়েছে।

জামাল। এবার সিঁদুর। এই সময় কপালে সিঁদুর দিতে হয় না?

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।

দেবব্রত। সিঁদুর তো নেই।

জামাল। দাদা, শুনেছি সেকালে যবনের আঙুল কেটে রাজারাণীর কপালে রাজটীকা পরানো হ'ত। সিঁদুর যখন নেই, তখন সেই ব্যবস্থাই হোক। যবন তো উপস্থিত আছে। [ছুরি দিয়া আঙুল কাটিয়া অগ্নির কপালে রক্তের ফোঁটা দিল। অগ্নি জামালের পদধূলি লইল]

জামাল। [আঙুল চুষিতে চুষিতে] যাক, শুভকর্ম্ম শেষ। অখিল, Congratulations! কণা, চিরায়ুষ্মতী হও। দাদা, চল এবার আমরা অন্তর্হিত হই।

অখিল। সত্যিই যাবে?

অগ্নি জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

জামাল। আলবৎ যাব। দাদা, আর দেরি নয়, বরকনে কি রকম অধীর হয়ে পড়েছে, দেখছ তো? বর যদি বা মুখ ফুটে বললেন, সত্যিই যাবে?—কনের মুখে কথাটি নেই। [প্রস্থানোদ্যত] শুধু একটা জিনিসের অভাব বোধ হচ্ছে—এই সময় রোশনচৌকি থাকত!

বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। জানালার বাহিরের অন্ধকার হইতে গ্রিফিথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

গ্রিফিথ। Hands up, young lady. Don't move, I have you covered.

অগ্নি ধীরে ধীরে হাত তুলিল। ঘরের মধ্যে মিনিট খানেক অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর অখিল মৃদু কণ্ঠে হাসিল।

অখিল। জামাল, রোশনচৌকি খুঁজছিলে না? বাজন্দারেরা এসে পড়েছে। একেবারে গোরার ব্যাণ্ড।

দেবব্রত। যাক, এই ভাল। আমাদের কাজ হয়ে গেছে, এখন মরলেও ক্ষতি নেই। [আলমারির ভিতর হইতে রিভল্‌বার লইয়া অখিল ও জামালকে দিল]

গ্রিফিথ। [বাহির হইতে] Do you surrender?

দেবব্রত। [গর্জ্জন করিয়া] No, damn you!

অখিল। দাদা, আমাদের দোষ। গ্রিফিথ যে বুঝতে পেরেছে, তা আমরা ধরতে পারি নি।

দেবব্রত। কিছু আসে যায় না অখিল। একদিন তো মরতেই হবে, আজ হ'লেই বা ক্ষতি কি?

গ্রিফিথ। [বাহির হইতে] Listen you! We have surrounded you, you can't escape. If you don't surrender, we shall kill you all and I shall begin with the lady.

জামাল। No, you won't. তা কি হয় সায়েব? কণা, আমি তোমার সামনে গিয়া দাঁড়াচ্ছি, তুমি স'রে যেও। [জামাল পাশ হইতে বিদ্যুদ্বেগে কণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; কণা সরিয়া গেল। বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। বুকে গুলি খাইয়া জামাল জানালার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল]

জামাল। [উচ্চহাস্য করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে] A miss Griffith! Now take and that and that and that—[গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে জামালের মৃতদেহ মাটিতে এলাইয়া পড়িল]

দেবব্রত। জামাল তো গেল। অখিল, এবার আমাদের পালা।

তখন দুই জানালা দিয়া ঘরে ধারার ন্যায় গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। দেবব্রত ও অখিল জানালার নীচে লুকাইয়া বাহিরে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। অগ্নি টোটা সরবরাহ করিতে লাগিল।

দেবব্রত প্রথম পড়িল।

দেবব্রত। অগ্নি, যাই—

অগ্নি। এস দাদা—[দেবব্রতের মৃত্যু]

অখিল। কণা, আমিও—[চিত হইয়া পড়িল]

অগ্নি। [তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া] চললে? চললে? একটু অপেক্ষা করতে পারবে না? একসঙ্গে যেতুম।

অখিল। কণা—এস—[মৃত্যু]

কণা উঠিয়া দাঁড়াইল। অখিলের হাত হইতে রিভল্‌বার লইয়া নিজের খোঁপার মধ্যে গুঁজিয়া দিল]

কণা। [উচ্চ কণ্ঠে] I Surrender. আমি ধরা দিচ্ছি।

গ্রিফিথ। [বাহির হইতে] What about the others?

কণা। তারা কেউ বেঁচে নেই।

গ্রিফিথ। Good! Throw down your gun. বন্দুক ফেলে দাও।

কণা। আমার বন্দুক নেই—টোটাও ফুরিয়ে গেছে।

গ্রিফিথ। Good! [বন্দুক হস্তে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া] All the same, you put your hands up. That's right. So you were four after all. You played me a pretty trick this morning, young lady. But I saw through it all right. Now I suppose you are coming quietly with me?

কণা। On the contrary Griffith, it is you who are coming quietly with me.

গ্রিফিথ। Eh! What do you mean—coming quietly with you?

কণা। গ্রিফিথ! শুধু আমরাই যাব—তুমি যাবে না?

কণা চুলের ভিতর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে রিভল্‌বার বাহির করিল। দুইজনে একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়িল। গ্রিফিথ পড়িল।

কণা টলিতে টলিতে অখিলের বুকের উপর গিয়া পড়িল। অখিলের গলা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিতেই তাহারও প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-প্রশস্তি

মনোহর, তুমি মনোহর,
মোহন মৃত্যুর রূপে জীবলোকে সেজেছ সুন্দর।
করেছি তোমারি পূজা সৃষ্টির অরুণ-উষা হ'তে,
ত্যজি জীর্ণ দেহ-বাস ভাসিয়া ভাসিয়া কালস্রোতে
শত লক্ষ বিবর্ত্তন ভেদি
ল'য়ে মৃত্যুশীল প্রাণ ল'য়ে "আমি" ঊর্দ্ধ অভ্রভেদী
আজ আসি যেথা ঠেকিলাম—
মৃত্যুর দেবতা তুমি, জীবন-দেবতা তাই, তোমারেই জানাই প্রণাম।
তুমি মন্বন্তর দেব, তুমি যুগান্তর,
রূঢ়-বিভীষিকা-রূপে মনোহর, তুমি মনোহর।

"স্বপ্ন ও সত্য"

"সত্য যেথায় স্বপ্ন এবং স্বপ্ন যেথায় সত্য,
শৈবলিনী, আমরা এস সেই দেশেতে যাই।"
করুণ চোখে তরুণ কবি অরুণ কিশোর দত্ত
বিয়ের রাতে প্রিয়ার কানে কইল ধীরে তাই।
"এক বোঁটাতে আমরা সেথায় ফুটব দুটি ফুল,
কূল হারিয়ে ভাসব মোরা অকূল দরিয়ায়;
ভুল বুঝো না আমার গানের সুর যদি হয় ভুল,
মন নিও আর মন দিও গো চাঁদের জোছনায়।"
শৈবলিনীর মনের বীণা মনেই শুধু বাজে;
দুই চোখে তার লক্ষ যুগের স্বপ্ন যেন রাজে।
"সীমার মাঝে অসীম যেথায় বাজায় এসে বাঁশী,
কালের সনে মহাকালের রয় না ব্যবধান,
আমরা সেথায় মিশিয়ে দেব অশ্রু এবং হাসি,
পরম ক্ষণের সেই তো হবে চরম অবদান।"

হঠাৎ কেন শৈবলিনী ফুঁপিয়ে ওঠে কেঁদে?
দুই নয়নের স্বপ্ন কেন অশ্রু হয়ে ঝরে?
ভাবুক কবি শুধান তারে বাহুর ডোরে বেঁধে,
"হঠাৎ কেন শৈবলিনী কাঁদছ এমন ক'রে?"
শৈবলিনী চোখ মুছে কয় মুখটি ক'রে কালো,
"কাঁচা তিলের তেল শুনেছি মাথার পক্ষে ভাল।"

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

অতি-আধুনিক

বিসর্পিত রেখায় নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নদীর পরপার ঘনবন-সমাচ্ছন্ন, এপারে রুক্ষ পর্ব্বতমালা। একটি গুহামুখ দেখা যাইতেছে। পরপারবর্ত্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টি-দুর্ভেদ্য। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একটি বিরাট পাইথন একটি বিরাট বৃক্ষশাখা হইতে স্থিরভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে শিকারের প্রত্যাশায়। অরণ্যের ওপার হইতে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। তীক্ষ্ণনখচঞ্চু মাছরাঙা একটা জলের উপর ছোঁ মারিয়া মারিয়া উড়িতেছে।

নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তরে অরুণ, অশোক, বীরেন, চঞ্চল, নিমাই, নগেন, নটবর, কার্ত্তিক একটি অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উবু হইয়া বসিয়া আছে। সকলেই উলঙ্গ, সকলেই কর্কশ-রোম, সকলেই শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত, সকলেরই শিরে অযত্নবিন্যস্ত কেশভার, কাহারও কপিশ, কাহারও পিঙ্গল, কাহারও কৃষ্ণবর্ণ। অদূরে ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতেছে। নরেশও অগ্নিকুণ্ডের নিকট নাই, সেও নদীর ধারে ধারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে।

নিপু, কানু, চম্পা, টুকু, বুদি প্রভৃতি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা ইতস্তত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কানুর হস্তে একখণ্ড ভাঙা মৌচাক, তাহা হইতে মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার ভিতরে কীটাকৃতি মৌমাছি-শাবকেরা কিলবিল করিতেছে। কানু নির্ব্বিকার চিত্তে সবসুদ্ধ কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতেছে, চম্পা লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আছে। বুদির হাতে একটা জীবন্ত শামুক, সে সেটাকে একটা পাথরে ঠুকিয়া

ঠুকিয়া ভাঙিতেছে, আহত শামুকটার লালা-পিচ্ছিল সর্ব্বাঙ্গ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রতিবাদ করিতেছে। তাহার কিন্তু নিস্তার নাই। বুদির মুষ্টি কঠোর, দন্ত তীক্ষ্ণ। নিপু একটা পলাতক কীটের গর্ত্ত-সমীপে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। রুগ্ন টুকু নাকী স্বরে কাঁদিতেছে।

আরও কিছু দূরে রেবা, নিভা, মায়া, বেলা, শেফালি, মালবিকা, ক্ষমা, স্নেহলতা, মাধবী প্রভৃতি নানা বয়সের নারীগণ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত। মালবিকা রেবার নিকট মাথা পাতিয়া বসিয়া আছে, রেবা উকুন বাছিতেছে। ক্ষমা কণ্ঠলগ্ন শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে। মায়া আহারে ব্যস্ত, তাহার হাতে কন্দ জাতীয় কি যেন একটা আহার্য্য। নিভা কিছু করিতেছে না, সে অদূরে অবস্থিত পুরুষ-মণ্ডলীর দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার ভ্রূ, অধরোষ্ঠ, স্তনযুগল মাঝে মাঝে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। বেলা, শেফালি, স্নেহলতা, মাধবী কতকগুলি কাঁচা চামড়া হইতে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মাংস কুরিয়া কুরিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ইহারাও সকলেই উলঙ্গ। ইহাদের নিকটও একটি অগ্নি-কুণ্ড জ্বলিতেছে।

আর একটু দূরে বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আর একটি ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ডকে ঘষিয়া ঘষিয়া তীক্ষ্ণতর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বৈদ্যনাথও উলঙ্গ।

নিকটে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ।

চারিদিকে চামড়া।

অনতিদূরে একটা মৃত ভল্লুক পচিতেছে।

একটি অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ইন্দুরও পুড়িতেছে।

২

বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ প্রস্তর ঘষিতেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। চাহনি লালসাময়। মায়া বৈদ্যনাথেরই কন্যা বটে, কিন্তু নবোদ্ভিন্নযৌবনা। তাহার অনাবৃত শরীরে যৌবন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ভ্রাতা নটবরও মাঝে মাঝে ভগ্নী মায়াকে দেখিতেছে। তাহারও দৃষ্টিতে ক্ষুধা।

রুগ্ন টুকু একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথের মুখমণ্ডল সহসা কঠিন হইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে আবার পাথর ঘষিতে লাগিল।

অরুণ সহসা মুখ তুলিয়া নিভার দিকে চাহিল।

নিভা হাসিল। শ্বা-দন্তগুলি চকমক করিয়া উঠিল।

নটবরের চোখে নিষ্করুণ দৃষ্টি।

নদীতীরে সঞ্চরমাণ অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক পুত্র নরেশ চর্ম্মোপরি অবনমিতা জননী শেফালির নগ্ন দেহটার পানে চাহিয়া ঈষৎ বিচলিত হইল। শেফালি প্রৌঢ়া। বৃদ্ধা স্নেহলতার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সে আপন মনে কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহার চামড়াটা প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিল। পলিতকেশিনী স্নেহলতা।

চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বৃহৎ শকুনি মৃত ভল্লুকটার নিকটে উপবেশন করিয়াই উড়িয়া গেল। নগেন তাহাকে তাড়াইয়া ভালুকটাকে টানিয়া নিকটে আনিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ, অশোক, কার্ত্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল। ওপারে ঘন বনান্তরাল হইতে দ্বি-খড়্গ-সমন্বিত রোমশ একটা গণ্ডার ভীষণদর্শন মুণ্ডটা বাহির করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।

সকলেই চীৎকার করিতে করিতে এক এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল।

৩

খানিকক্ষণ পরে।

গণ্ডার অন্তর্হিত হইয়াছে। উত্তেজনা-অবসানে সকলেই পুনরায় স্ব স্ব স্থানে বসিয়াছে। বৈদ্যনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘর্ষিত প্রস্তরের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতেছে। না, এখনও ঠিক মনোমত হয় নাই। আবার সে ঘষিতে সুরু করিল। একটা ভোঁতা স্থান কিছুতেই তীক্ষ্ণ হইতেছে না। ঘষিতে ঘষিতে সে মুখ তুলিয়া আর একবার মায়ার দিকে চাহিল। কন্দচর্ব্বণনিরতা মায়াও চাহিল। নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা মায়া, মুখে মৃদু হাসি।

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্বাসের গতি-বেগ বাড়িয়া গিয়াছে। না, আর নয়। অনেকদিন সহ্য করিয়াছে সে। ওই বৃদ্ধটার আধিপত্য আর সহ্য করা যায় না। তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা কষ্ট ক্ষোভ তর্জ্জন করিয়া উঠিল। তর্জ্জন-শব্দে মায়া ফিরিয়া চাহিল, দন্তবিকাশ করিয়া অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করিল। তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া নটবর তাহাকে ধরিল। দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিল। মায়া ফোঁস করিয়া উঠিল—ছদ্ম কোপে। অর্দ্ধভুক্ত কন্দটা মাটিতে পড়িয়া গেল। এক ঝটকায় নিজকে মুক্ত করিয়া মায়া কন্দটা আবার তুলিয়া লইল। তাহার ভ্রূভঙ্গি, তাহার মুচকি হাসি, তাহার আহ্বানময় প্রত্যাখ্যান অপরূপ! নটবর পাগল হইয়া উঠিল। নটবর—সহসা

কঠিন প্রস্তরাঘাতে সচকিত হইয়া নটবর ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘূর্ণিত-লোচন, হিংস্র-দংষ্ট্রা। নটবর ছুটিয়া গিয়া বৈদ্যনাথকে আক্রমণ করিল। পিতা-পুত্রে ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বৈদ্যনাথ যুবক নটবরকে বিধ্বস্ত করিতে পারিল না। নটবরের দেহে অসুরের শক্তি। সে বৈদ্যনাথকে ভূশায়ী করিয়া মায়াকে তাড়া করিল। মায়া ছুটিল, নটবরও ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে উভয়ে পর্ব্বত-গুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কেহ বিশেষ বিচলিত হইল না।

প্রৌঢ়া জননী শেফালির নগ্নমূর্ত্তি যুবক পুত্র নরেশকে বিচলিত করিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকতর উত্তেজনাজনক আর একটা ঘটনা ঘটিল। স্বচ্ছ নদীজলে একটা মৎস্য দেখিতে পাইয়া নরেশ জলে নামিয়া পড়িল, ডুব-সাঁতার কাটিয়া মাছটাকে ধরিতে হইবে। প্রকাণ্ড মাছ।

ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কতকগুলি কচ্ছপের ডিম আবিষ্কার করিয়াছিল, সেগুলি আহরণ করিয়া অগ্নিকুণ্ড-সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল এবং মনোনিবেশ সহকারে সেগুলি আহার করিতে লাগিল। অশোক কয়েকটি কাড়িয়া লইল। একটু কলহ হইল। ধীরেন অগ্নিকুণ্ডে দহমান মূষিকগুলিকে আর একবার উলটাইয়া দিল।

অরুণ ও নিভার আর একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। স্নেহলতা একটি চামড়া শেষ করিয়া আর একটি সুরু করিল।

সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল। বিধ্বস্ত বৈদ্যনাথ অথবা গুহান্তরালে অন্তর্হিত মায়া-নটবরকে লইয়া কেহই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। রুগ্ন টুকুর একটানা কান্নাতেও এতটুকু ছেদ পড়িল না।

৩

একটু পরে বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া নটবর এখনও নিরুদ্দিষ্ট।

চতুর্দ্দিকে কোন শব্দ নাই।

কেবল টুকুটা কাঁদিতেছে। একটানা কান্না।

বৈদ্যনাথের দেহের সমস্ত পেশী আবার শক্ত হইয়া উঠিল। সে সহসা ছুটিয়া গিয়া টুকুকে তুলিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া কঠিন পাথরটার উপর সজোরে আছাড় মারিল। টুকুর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, রক্তাক্ত মস্তিষ্কটা ছ্যাতরাইয়া পাথরটার চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। মৃতদেহটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বৈদ্যনাথ হাঁপাইতে লাগিল। ইহাতেও বিশেষ কেহ বিচলিত হইল না।

টুকুর মা থাকিলে হয়তো হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে সে মারা গিয়াছে।

নিমাই উঠিয়া গিয়া টুকুর মৃতদেহটা আনিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডে গুঁজিয়া দিল। এতখানি মাংস নষ্ট করিয়া কি হইবে!

অরুণ উঠিয়া নিভার কাছে গেল।

সিক্তদেহ নরেশ নদী হইতে উঠিল। মাছটা ধরিয়াছে, প্রকাণ্ড মাছ। তীরে উঠিয়াই সে মাছটাকে এক আছাড় দিল, তাহার পর তুলিয়া তাহার টুঁটিটা কামড়াইয়া ধরিল। মাছটা তবু ছটফট করিতেছে। নরেশ মাছটা খাইতে খাইতে একবার শেফালির দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার কাছে গিয়া বসিল। একেবারে গা ঘেঁষিয়া বসিল।

নদীর পরপারবর্ত্তী অরণ্যে কলরব উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল।

শেফালি নরেশের দিকে চাহিয়া হাসিল।

বাড়াবাড়ি ঠেকিতেছে?

ঠেকিবারই কথা। নামগুলা মুছিয়া দিয়া সময়টাকে আর একটু পিছাইয়া দিন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। নদী-পরপারবর্ত্তী বনে যে কলরব-কোলাহল উঠিতেছে, তাহা আর কিছু নয়, আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষেরা বন্য ম্যামথ শিকার করিতেছে।

কাল-চক্র ঘুরিতেছে।

"বনফুল"

চূড়ান্ত

"দুত্তোর" ব'লে দেশ [illegible] গান্ধী
হরিজন-খুঞ্চিপুঞ্চি রাখিলেন বান্ধি,
মহাদেব আসি তারে কহিলেন কান্দি—
হে প্রভু, আমার গতি বাতলাও।
ব্যাস বাল্মীকি হোম্ কালিদাস দান্তে
কি হয় যে শেষাশেষি এয়েছিল জানতে;
শেক্সপীয়র বলে, রক্ত নি রানতে
কাঁচা তেলে বড়ি কেন সাঁতলাও?
লিখেছি অনেক লেখা হতভাগা মর্ত্ত্যে,
কখনো প্রেমসে দাদা, কভু নানা শর্ত্তে,
সবি তো হয়েছে শেষ বিস্মৃতি-গর্ত্তে;
তালপুকুরের তাল নাই রে—
শুধু নামটুকু তাই থাই করে ধৌত,
মারিছে পাবলিশার্স কমিশন-চৌথ,
ক্রমশ লেখক মোরা হইতেছি ফৌত,
না লিখলে ব'য়ে গেল ভাই রে।

বাঙালীর প্রতিষ্ঠান

প্রায় বাইশ তেইশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। আমরা তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজে পড়ি। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কয়েকজনের হেদুয়া পুষ্করিণীতে একটি সাঁতারের ক্লাব স্থাপন করিবার বাসনা হইল। তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে হেদুয়ায় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা দল বাঁধিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াট সাহেবের কাছে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। তিনি খুব খুশি হইলেন এবং পরদিন এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ওয়াট সাহেব তখন আমাদের বাইবেল পড়াইতেন, কিন্তু ক্লাসে এক বাইবেল ছাড়া অন্য প্রায় সব রকম আলোচনাই হইত, ছাত্রদের ব্যায়ামশালায় যোগদান করা কর্ত্তব্য, কি করিলে স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্রগণ কলেজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, ইত্যাদি। ওয়াট সাহেবের কথাবার্ত্তার মধ্যে কোনও দিন তাঁহাকে বলিতে শুনি নাই, "তোমরা আমার ছাত্র, আমার মুখ উজ্জ্বল করিবে।" তিনি সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে শুনাইতেন, "তোমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র, স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্রের পক্ষে এইরূপ করা উচিত, এইরূপ করা উচিত নয়, ইত্যাদি।"

যাহাই হউক, পরদিবস বাইবেল ক্লাসে আসিয়া প্রথমেই তিনি সাঁতারের ক্লাবের বিষয় উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের উৎসাহ দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তার নিকট হইতে ক্লাবের নিয়মাবলী সমস্ত জানিয়া

আসিয়াছেন। মাত্র চার আনা পয়সা দিয়া প্রত্যেকে সভ্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন আরও আট আনা দিয়া ব্যাজ কিনিতে হইবে এবং সুইমিং কষ্টিউমে তাহা আঁটিয়া লইতে হইবে। বাস্, তাহা হইলেই হইল। আমরা তো অবাক। কোথায় নিজেদের একটি ক্লাব হইবে, তাহাতে কেহ সেক্রেটারি, কেহ ট্রেজারার হইব, তা নয়, একেবারে অন্য একটি ক্লাবের মধ্যে ওয়াট সাহেব আমাদের তলাইয়া যাইবার ব্যবস্থা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছেন! আমরা তখন ভাঙা ইংরেজীতে যতখানি বলা চলে, ততখানি জোরের সঙ্গে আমাদের স্বতন্ত্র ক্লাব গড়িবার বাসনা জ্ঞাপন করিলাম। ওয়াট সাহেব মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনিলেন। তাহার পর তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিলেন, যাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওয়াট সাহেব বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আজ যাহা বলিতেছি, তাহা ইংরেজ হইয়া তোমাদের দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছি, এরূপ ভাবিও না। তোমাদের শিক্ষকরূপেই একটি বিষয় নিবেদন করিব। বাংলা দেশে একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যাহা ইংলণ্ডে বা স্কট্‌ল্যাণ্ডে সচরাচর দেখা যায় না। সেখানে আমরা কোনও প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহাকে আরও বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা করি। নিজেদের প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদলবলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দখল করিয়া বসি। কিন্তু একটির পাশে আর একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িবার কল্পনাও করি না।

"তোমাদের মধ্যে অন্যরূপ দেখিতেছি। ইহা ভাল নয়। সামাজিক শক্তির পক্ষে ইহাতে অনিষ্ট হয়। আজ যদি হেদুয়া সরোবরে তোমরা অপর একটি ক্লাব গঠন কর, তবে হেদুয়ার জলকে দুই দিন পরে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে, এ পক্ষের লোক অপর পক্ষের এলাকায় সাঁতার কাটিলে

মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব তোমাদিগকে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যরূপে সাঁতার কাটিতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।"

অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া আমরা দমিয়া গেলাম, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য কে সহজে বিসর্জ্জন দিতে চায়? অবশেষে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ ওয়াট সাহেবের সুপারিশে আমাদের ব্যাজে ক্লাবের নাম ছাড়া আমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র, ইহার নির্দ্দেশক S. C. C. চিহ্নও থাকিবে, এইরূপ শর্ত্তে রাজি হইয়া গেলেন। আমরাও সেই হইতে অখণ্ড হেদুয়া সরোবরে সাঁতার কাটিয়া বাঁচিলাম।

ব্যাপারটি যে সময়ে ঘটিয়াছিল, তখন সমাজের বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইবার বয়স নয়। মাথা আমরা অবশ্য ঘামাইতাম, কিন্তু ফল কিছুই ফলিত না। কেন না, সমাজের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও ছিল না, বাঙালীর সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমা ততোধিক পরিমিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে সমাজের নানাবিধ সংঘাতের মধ্যে পড়িয়া, রাষ্ট্রনৈতিক কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠান এবং বাঙালীর প্রতিষ্ঠান চালাইবার কতকগুলি অভ্যাসের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বীরভূম জেলায় মুচী, হাড়ী ও ডোমেদের দ্বারা অধ্যুষিত একটি পল্লীর মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আমাদের মীটিং হইত এবং মীটিং ভিন্নও সভা করিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন রামায়ণ-পাঠ অথবা সময়বিশেষে ভাদুর গানের পালাও বসিত। এই সকল অধিবেশনে একটি বিচিত্র ব্যাপার আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। কলিকাতা শহরে কোনও মীটিঙে দেখিয়াছি, যাঁহার বক্তৃতা ভাল লাগে না, তিনি সচরাচর বিনা বাক্যব্যয়ে মীটিং ছাড়িয়া উঠিয়া যান। মীটিং

যেন হাবড়া স্টেশন, দরকারে লোকে সেখানে আসে, কাজ ফুরাইলেই চলিয়া যায়। হাবড়া স্টেশনের দাবি তো কাহারও উপর নাই। কেবল দুই চারি জন সজ্জনকে লক্ষ্য করিয়াছি, যাঁহারা যাইবার পূর্ব্বে সভাপতির নিকট অনুমতি লইয়া তবে বাহির হইয়া যান। ইংরেজগণের এক আধটি মীটিঙে গিয়াছি, সেখানে সকলেই ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। হয়তো ইংলণ্ড দেশে সভার তাহাই নিয়ম। কলিকাতায় অধিকাংশ শ্রোতা সেরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন।

কিন্তু হাড়ী এবং ডোমেদের সভায় বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি—সভা হয়তো বসিয়া গিয়াছে, তখন কেহ আসিলে প্রথমে সমগ্র সভাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, তাহার পর সভাস্থ হয়। সভার একটি স্বতন্ত্র সত্তাকে তাহারা স্বীকার করে এবং সেখানে নিজেও বসিলে নিজেকে সভারই অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করে, স্বীয় পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যায়। ইহা এক বিচিত্র নিয়ম। অথচ ইহাও বুঝি যে, সভাকে, সমাজকে, সমগ্রকে যদি আমরা ক্ষুদ্রের সমষ্টিমাত্র না ভাবিয়া তাহা অপেক্ষা মহত্তর স্থান দিই, তবেই মানুষের সামাজিক জীবন দৃঢ় হয়, সমাজ আমাদিগকে পোষণ করে।

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার এই ধারণাই হইয়াছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সমাজকে এক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের আসন দেওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তি তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিত, সমাজও ব্যক্তিকে পোষণ করিত, রক্ষা করিত। অশিক্ষিত-সমাজের মধ্যে সমাজের প্রতি সেই আনুগত্যের ভাব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে তাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইংরেজদের সমাজ জীবন্ত, বৃদ্ধিশীল, সেখানেও ঐ আনুগত্যের লক্ষণটি বর্ত্তমান। দুর্ভাগা কলিকাতা শহরের শিক্ষিত বাঙালীই যেন পুরাতন ভারতের

আনুগত্যটুকু হারাইয়াছে, উপরন্তু ইংরেজের মত নূতন কোনও সামাজিক বোধও লাভ করিতে পারে নাই।

ইহার কারণ কি? আর সামাজিক বোধ এবং আনুগত্য যদি জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তবে তাহা লাভ করিবার উপায়ই বা কি?

বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার মত। কিছু ভাবিবার চেষ্টাও করিয়াছি, তবে ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদি অপরে বর্ত্তমান প্রবন্ধ পড়িয়া এই বিষয়ে চিন্তিত হইয়া উঠেন এবং আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী জাতির দুরবস্থা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। দেশে তখন অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, সকলের ধন এবং মান বিপন্ন। সমাজের কোনও ক্ষমতা নাই, রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আগে সমাজ যেমন ব্যক্তির নিকটে আনুগত্য দাবি করিত, তেমনই রাষ্ট্র তাহাকে রক্ষা করিত, প্রত্যেকে স্বীয় জাতীয় বৃত্তির দ্বারা অন্নসংস্থান করিতে না পারিলে সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতিগণের নিকটে অভিযোগ করিতে পারিত এবং তাহারাও এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রশক্তিবিহীন সমাজ জীর্ণ হইয়া পড়িল। মানুষকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহার আর রহিল না, সে কেবল মানুষের নিকট আনুগত্য করিতে লাগিল।

এই জীর্ণ সমাজ শুচিবায়ুগ্রস্তের মত—বহিরঙ্গে শুচিতা বজায় রাখিয়া নিজের পরাধীনতার গ্লানিকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রঘুনন্দনের আমল হইতেই আভ্যন্তরিক শুচিতার দ্বারা অন্তরের গ্লানি মোচনের চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা আজ নিষ্প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর নরনারী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিল, আরও সহজভাবে প্রকৃতির দিকে, মানব-সমাজের দিকে, ধর্ম্মব্যবস্থার দিকে চাহিয়া দেখিতে শিখিল। ফলে শিক্ষিত বাঙালী অত্যল্প কালের মধ্যেই আবিষ্কার করিল যে, হিন্দু-সমাজ শুধু শাসন করিতে চায়, পোষণ করিতে পারে না। যাহার পোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার আনুগত্যের দাবিকে কেহই স্বীকার করে না। ফলে গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া আমরা নানা দিক হইতে হিন্দু-সমাজের শাসন-বিভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ দেখিতে পাই।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শিক্ষিত বাঙালীর ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল এবং ফলত হিন্দু-সমাজের বন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে ইংরেজের প্রতি রাগ করিয়া বাঙালী এক নব-হিন্দুধর্ম্মের জয়গান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাঙালীও ইংরেজী বইয়ে শেখা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুরোহিত ছিলেন, তিনি ইংরেজীর পরিবর্ত্তে বেদান্তের মারফৎ নূতন স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় মানও রক্ষা পাইল, অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও প্রচারিত হইল। স্বামীজীও কিন্তু সমাজের জীর্ণ কলেবরকে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতের দ্বারা খান খান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার অত্যল্পকালব্যাপী চেষ্টায় নূতন সমাজ গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু পুরাতন সমাজ তাঁহার নির্ম্মম আঘাতে আমূল প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস হইতে আমরা শিক্ষিত বাঙালীর মনকে খানিক বুঝিতে পারি। সমাজের প্রতি আনুগত্যের কথা বলিলেই তাহার মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। পুরাতনকে ভাঙিতে

হইলে এরূপ ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আজ যাহা প্রয়োজন, কাল তাহা তো অনাবশ্যক হইতেও পারে।

আমার মনে হয়, বাঙালীর আজ সেই যুগ আসিয়াছে। পুরাতন সম্পূর্ণ না ভাঙিলেও অনেকখানি ভাঙিয়া গিয়াছে। ভাঙার কাজ প্রায় শেষই হইয়াছে। কিন্তু যদি বাঙালীকে বাঁচিতে হয়, তবে তো শুধু স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির দ্বারাই সে বাঁচিবে না, তাহাকে নূতন সমাজ বাঁধিতে হইবে, সে সমাজ আজিকার জগতে যেন তাহাকে জীবন দান করিতে পারে। এবং সেই সমাজের প্রতি তাহাকে আবার একটি একনিষ্ঠ আনুগত্যের ভাব নির্ম্মাণ করিতে হইবে। মনে হয়, আজ সেই মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, এবং সেইজন্যই শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সামাজিক বোধের অভাবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে পীড়ার উদয় হইতেছে। সভায় বাঙালীর অসামাজিক আচরণ, শহরে পথে, ট্রামে, বাসে পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিদারুণ অবহেলার ভাব, সমিতির মধ্যে দায়িত্ববোধের একান্ত অভাব, কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকমের ঔদাসীন্য সেইজন্যই বোধ হয় আমাদিগকে আজ এত পীড়া দিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে, আজ নূতন করিয়া বাঁচিবার দিন আসিয়াছে। এমন অবস্থায় আমাদের প্রতি প্রতিষ্ঠানকে, প্রত্যেক সঙ্ঘকে জাতীয় জীবনের পোষণ-কার্য্যের জন্য নূতন শক্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এমন অবস্থায় যদি সমাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপরিসর পথে পরিচালিত করিতে হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আজ যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমরা ভোগ করিতেছি, তাহার দ্বারা আমাদের চারিদিকের মানুষ কতটুকুই বা লাভবান হইতেছে, সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গাছে কিই বা এমন ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার সৌরভ নষ্ট হইলে সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা বাঙালীর সভায়, সমিতিতে, শিক্ষাগারে বসিয়া বহু সময়ে মনে হইয়াছে। হয়তো আমার মত অপরেও শিক্ষিত বাঙালীর অসামাজিকতা দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে ইহার মূল কারণ এবং তাহা নিরাকরণের উপায়ের সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেকের মনেই যদি নূতনতর সমাজগঠনের বাসনা সঞ্জাত হয়, তবে অদূরভবিষ্যতে বাঙালীর জীবনে যে তাহার সুফল ফলিবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের কারণ নাই।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সিজার ও আলেক্‌জাণ্ডার

(স্বর্গে বা নরকে) দেখা অকস্মাৎ একদিন
সিজারে ও আলেক্‌জাণ্ডারে,
রোমান কহিল গ্রীকে, বাজাইয়া ভায়োলিন—
আয় তোরে ক'রে দি ঠাণ্ডা রে।
দুইজনে বসে ঠাণ্ডা হতে,
নিম্নে মর্ত্ত্যভূমে দেখে পিপীলিকা-সৈন্য-সারি
চলিয়াছে অন্তহীন স্রোতে।
চমকিয়া উঠে দুইজনে,
বলিল রোমের প্রভু, প্যালেষ্টাইনে কবে
জানি না ইহুদী প্রজা আবার যে জন্ম লবে!
সেকেন্দার কহিল, স্বপনে
দেখেছি যীশুর মাংস খাইয়াছে ভক্তদল
বাকি নাই একটু ভাণ্ডারে।
গলা-ধরাধরি ক'রে কাঁদে উচ্চে সুতরাং
সিজারে ও আলেক্‌জাণ্ডারে।

জনৈক বাঙালী কবির প্রতি জনৈক ইংরেজী কবিতা

চরণ-যুগলে ধরি হে কবি, মিনতি করি,
আমারে ক'র না অনুবাদ;
ইংরেজী জানে না যারা, কেমনে বুঝিবে তারা,
আমাতে রয়েছে কিবা স্বাদ?
দাড়িতে তেঁতুল গুড় মাখি আর কতদূর
আম্রের সুস্বাদ যাবে জানা?
গিলিয়া কলের জল, কেহ কি পায় সে ফল,
পায় যা শ্যাম্পেন হ'লে টানা?
কিপ্‌লিং বলেছে ভাল— সাদা সাদা, কালো কালো,
এ দুয়ে কভু না মিশ খায়;
আমার বিদেশী মূর্ত্তি কেমনে পাইবে ফূর্ত্তি
তোমাদের স্বদেশী খাঁচায়?
আমার অনেক বন্ধু কান্দিয়া হৈয়াছে অন্ধ
তোমাদেরি তর্জ্জমা-তাড়নে;
আমারো সে দশা পাছে হয়—সেই ভয় আছে,
মিনতি জানাই সে কারণে।
'তার্জ্জমিক' নাম নিতে কেন সাধ হৈল চিতে,
মৌলিক কবিতা লেখা যদি
সহজ সলিল-বৎ? যত কবি তত মত,
সুবিধার নাহিক অবধি।

ধরিয়া করিয়া দিল্ চালাইবে গোঁজামিল,
অর্থাভাবে বলিবে 'মিষ্টিক';
যদি কেহ অর্থ চায়, সগর্ব্বে বলিবে তায়,
বেরসিক, 'ইনার্‌টিষ্টিক';
না থাকিলে মিল ছন্দ. কিছু না হইবে মন্দ,
গদ্য তো চলেই ছদ্মনামে;
হানিয়া সোৎসাহ দৃষ্টি ক'র না ব্যাঘাত সৃষ্টি
আমার এ পরম আরামে।
মোরে যদি দাও শান্তি, তোমারো সুবিধা নাস্তি,
পূরিবে না কবিযশোসাধ;
হে কবি, শুনিয়া শেখ, মৌলিক কবিতা লেখ,
আমারে ক'র না অনুবাদ।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ছাতা

জীবনে একান্ত ছিল ভদ্রলোক ছাতাগতপ্রাণ,
সন্ধ্যায় সকালে তারে দেখিতাম ছাতাটি বগলে
ক্লান্তপদে চলিয়াছে—পরিচিত ছাতাটি নিশান,
একান্ত আগ্রহ তার আনে সবে সেই ছত্রতলে।
ঝড় বৃষ্টি বাদলেতে খররৌদ্রদগ্ধ রাজপথে
যেথা যত অসহায়, ছাতা যেন সবারি আশ্রয়—
চলেছে অসংখ্য পান্থ অসংখ্যবিস্তার গলিপথে,
একছত্রতলে আসা সকলের সম্ভব যে নয়—
এ কথা ভাবে নি সে যে; ছিল নিত্য উদ্বেজিত-প্রাণ,
শত্রুমিত্র সকলের জোগাইত হাসির খোরাক;
অকস্মাৎ ছাতা ফেলি যেদিন করিল অন্তর্দ্ধান,
সবে করে হায় হায়, বাখানিয়া তার দীর্ঘ নাক।
অনাদৃত ছাতাখানি প'ড়ে থাকে বারান্দার তাকে,
ম্যুনিকের নিলামেতে দয়াবান যদি কেহ ডাকে।

জীববিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ

ডারুইন সাহেবের মতবাদের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর—এ কথা ডারুইন কোথাও বলেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই যে, বিবর্ত্তনের ফলে একই আদিম প্রাণীর একটি শাখা ক্রমাগত রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে, অপর একটি শাখার পরিবর্ত্তন অতটা ঝটিতি না হওয়ার ফলে তাহারা বৃক্ষশাখাতেই রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর নহে; কিন্তু মানুষ ও বানর উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একই প্রাণী। এখন যদি কোনক্রমে মানুষের আদিম পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ পাওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে বানরেরও পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ মিলিবে। আমার বর্ত্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ইহাই।

এতখানি গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ কেহ কেহ আমার বহু যত্নে, বহু কষ্টে, বহু আয়াসে, বহু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের বিবরণকে গল্প বলিয়া ভুল করিতে পারেন। তাঁহাদের শুধু এইটুকু জানাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গুরুতর বিষয় লইয়া যাঁহারা 'স্যাটায়ার' রচনা করিয়া সস্তায় নাম কিনিতে চান, আমি তাঁহাদের দলে নই। আমার উদ্দেশ্য, গল্পের মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য জনসাধারণকে উপহার দেওয়া।

আমার সমস্ত গবেষণা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত। ডারুইন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নিও-ডারুইনিয়ানগণ বহু পরীক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে আমি চুরি

করি নাই। এ সম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা জুলিয়ান হাক্সলি প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন।

যে ঘটনার কথা লিখিতেছি, তাহার অব্যবহিত পরে আমি সুবৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। মোটামুটি মানুষের মতই মনে হইয়াছে। কিন্তু খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কয়েকটি জিনিস ধরা পড়িয়াছে। মনে হইয়াছে, কান দুইটা একটু লম্বা, জুতাজোড়ার মধ্যে যেন পাজোড়া ঢলঢলে হইয়াছে; পিছনে দেখা যায় না, কাজেই ল্যাজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি নাই।

এসব কথাকে কেহ যেন অকারণ আত্মগঞ্জনা বলিয়া ভুল করিবেন না। আমার বিশ্বাস, আমার প্রত্যেকটি পাঠক (পাঠিকা নহে) সম্বন্ধে উপরোক্ত রূপবর্ণনা প্রযোজ্য। তাঁহারা যদি 'অনেস্ট' হন, নিজেরাই স্বীকার করিবেন।

আমার রাত্রে শুইতে প্রায়ই বারোটা সাড়ে বারোটা বাজিয়া যায়। সেদিন একটু বেশি দেরি হইয়াছিল, প্রায় একটা।

চোখ দুইটিতে নিদ্রাদেবী খালি তাঁহার মায়াঞ্জন লাগাইবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময়—

"বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!"

নারীকণ্ঠের আর্তস্বর! ঘুম যদি আসিয়াও থাকে, পরমুহূর্ত্তে তাহার আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। এক লম্ফে বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আর কোন সাড়াশব্দ নাই।

সহসা আবার—"বাঁচাও!"

(আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, কয়েকজন সবজান্তা পাঠক তাঁহাদের মোজলীয় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছেন। অর্থাৎ লেখকের নির্লজ্জ 'প্লেজিয়ারিজ্‌ম' তাঁহারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। অত চট করিয়া নয়, দাদারা, আর একটু পরে।)

মুশকিল হইতেছে এই যে, রাত্রিবেলায় আমার পক্ষে শব্দ শুনিয়া দিকনির্ণয় করা কঠিন। শব্দটা সামনে হইতে, না পিছন হইতে, দক্ষিণ হইতে, না বাম হইতে, উপর হইতে, না নীচে হইতে, ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কি হইতেছে? কোন পশুচরিত্র পুরুষ তাহার সাধ্বী পত্নীকে হত্যা করিতেছে? উঁহু, তাহা হইলে চীৎকার এক বারেই শেষ হইত; মধ্যে মধ্যে থামিয়া আবার আরম্ভ হইত না। ঐঃ, ঐ আবার! "বাঁচাও!"

অস্থির হইয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম। থিয়েটারের রিহার্সাল নিশ্চয় নহে, তাহাতে আরও গোটাকয়েক গলার স্বর শুনিতে পাওয়া সম্ভব। খুনও নয়। তবে ঠ্যাঙানি হইতে পারে। পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক সারা সপ্তাহ চুপচাপ ভদ্রলোকের মত থাকিয়া শনিবার গভীর রজনীতে কি যেন খাইয়া একটা বোতলে করিয়া কি যেন বগলে চাপিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করেন। তাহার একটু পরেই গুটিকয়েক শিশুর সভয় চীৎকার এবং একটি প্রহৃত রমণীর চাপা কান্নায় এক করুণ রাগিণীর সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আজ, মানে কাল, শনিবার নহে। (বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, তাই কাল বলিলাম।)

আমার শয়নগৃহের জানালার ঠিক বিপরীত দিকে একটি বৃহদাকার বাড়ির জানালা দেখা যায়। অনেক দিন একটি তরুণ দম্পতিকে ঐ জানালা দিয়া কলহরত দেখিয়াছি। সেই মেয়েটিই নয় তো?

সম্ভব নয়। কারণ মেয়েটির বয়স অল্প হইলেও বেশ জাঁকালো দেখিতে, এবং গায়েও জোর আছে বলিয়া মনে হয়। স্বামীটি ছোটখাটো। সেই মেয়েটি যে মার খাইয়া চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত হইবে, তাহা মনে হয় না। তাহা ছাড়া, তাহাদের ঝগড়া করিতেই শুনিয়াছি, মারামারি করিতে দেখি নাই।

তবে? আমি দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি, নীচে একটি ফ্ল্যাট, উপরে আর একটি। নীচে উপস্থিত স্ত্রীলোকের অনুপস্থিতি; উপরের ভদ্রলোককে যতদূর জানি, বউ ঠ্যাঙানোর দলে তাঁহাকে কিছুতেই ফেলা চলে না।

ওঃ, এইবার বুঝিয়াছি, কেহ রোগযন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে আর কাহারও গলা শোনা যাইতেছে না কেন? বাড়িতে কি অন্য কেহ নাই? থাকিলে বলা উচিত ছিল, আহা, কি কষ্ট হচ্ছে বল তো? মাথা টিপে দোব? বাতাস করব? একটু আইস-ব্যাগ দোব? একটু চুপ কর, এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু কাহারও তো সাড়া নাই! অবশ্য মনে হইতেছে, কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া কথা বলিতেছে, কিন্তু সেটা যে ওই বাড়িরই, তাহা নাও হইতে পারে। হইলেও শোনাইতেছে যেন জনকয়েক ষড়যন্ত্রকারী একটি অসহায়া রমণীকে হাত পা বাঁধিয়া গরম লোহার ছ্যাঁকা দিতেছে, আর—

ভাবিয়া ভাবিয়া কূল পাইলাম না। আমি একটা সুস্থ সবলদেহ পুরুষমানুষ স্বকর্ণে একটি তরুণীর কাতর ক্রন্দন শুনিতেছি, অথচ নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ক্ষোভে, লজ্জায়, অপরিসীম বেদনায় আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

কি করা উচিত? চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কে চেঁচাচ্ছ? ভয় নাই, আমি আছি এখানে, এখুনি যাচ্ছি? সম্ভব নয়। এ পাড়ার লোকে রাত্রিকালে নিদ্রার ব্যাঘাতকে পরম আপত্তির চোখে দেখিয়া থাকে।

অনেকটা সময় অন্তর করুণ চীৎকারধ্বনি আসিতেছে। কিসের বেদনা? রোগযন্ত্রণা? নারীহরণ? পত্নীপ্রহার? কোথায় চীৎকার? উপরে? নীচে? দক্ষিণে? বামে? কে বলিয়া দিবে?

রাত্রি দুইটা বাজিল। তিনটা বাজিল। রাত চারটের সময় নিরুপায়-ভাবে আবার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। কখন ঘুমাইলাম, মনে নাই। ঘুম ভাঙিল বউদির ঝাঁকানিতে, বেলা নাকি আটটা বাজিয়াছে।

ঘুম ভাঙিয়া মনে হইল, কি যেন একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। একটু চেষ্টা করিতেই সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িল। ব্যাকুলভাবে বউদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল রাতে কোন চীৎকার শুনতে পেয়েছিলে?

বউদি বিস্ফারিত লোচনে বলিলেন, কি রকম?

বলিলাম, সেইটেই তো বুঝিয়ে বলা শক্ত। কখনও মনে হ'ল, একটি মেয়েকে কে যেন খুব ঠ্যাঙাচ্ছে। আবার মনে হ'ল, কে যেন থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছে। তারপরে আবার ভাবলাম, কারু যেন অসুখ করেছে, হাই ফিভার অ্যাণ্ড ডিলিরিয়াম। কিন্তু আর কারও বিশেষ সাড়াশব্দ পেলাম না। জান নাকি কিছু?

বউদি কিছু না বলিয়া হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইয়া ফেলিলেন। অনেক কষ্টে সুস্থ হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, আমার মুখের দিকে কি দেখছ? যা বলছি, তার জবাব দাও না।

বউদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দেখছি তোমার কান দুটো কতটা লম্বা।

রাগিয়া বলিলাম, তার মানে?

বউদি হাসি ও কাসি একসঙ্গে মিশাইয়া বলিলেন, ওপরের ইন্দু-দিদির আজ ভোরে একটি খোকা হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোনও সুস্থ পুরুষ উপরিলিখিত অবস্থায় পড়িলে ঠিক আমার মতই বোকা বনিতেন, এবং পরিশেষে দর্পণে নিজেকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে বুঝিতেন, আমার নিম্নলিখিত মতবাদ সত্য কি না।

অপিচ, মানুষ যে এককালে কান নাড়াইতে পারিত (কেহ কেহ এখনও পারে), তাহা অনেকেই জানেন। লাঙুলটা খসিয়া গিয়াছে; কিন্তু ছিল যে, তাহার প্রমাণ আছে। এখনও কেহ কেহ জুতার মধ্যে ক্ষুর লুকাইয়া রাখেন কি না কে জানে! (পরশুরামের নজির আছে।)

অতএব আমার মতে যে আদিমতম প্রাণী হইতে মানুষের (ও বন-মানুষের) উৎপত্তি, তাহার বড় বড় দুইটা লম্বা কান ছিল। উদরদেশ ছিল কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, এবং দুই পায়ের পরিবর্ত্তে চারিখানি ক্ষুরসম্বলিত পা ছিল। মশা, মাছি ও অন্যান্য বনজ কীটপতঙ্গ বিতাড়িত করিবার জন্য লাঙ্গুলের অগ্রভাগে একগুচ্ছ লোম ছিল, এবং সিংহগর্জ্জনের অনুকরণে যে রাগিণী আলাপ করিত, তাহা শ্রোতার পক্ষে মোটেই শ্রুতিসুখকর হইত না।

প্রশ্ন উঠিবে, মতবাদটি তো শুধু পুরুষমানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তাই যদি হয়, তাহা হইলে মেয়েদের বেলায় কি হইবে? নর ও নারী তো আর সৃষ্টির বিবর্ত্তনে বিভিন্ন শাখায় উৎপন্ন হইতে পারে না।

মোটেই না। নারীজাতি বিবর্ত্তনের দিক দিয়া পুরুষের চেয়ে বেশি অগ্রসর হইয়াছে। বাইবেল খুলিয়া দেখুন, ইভের সৃষ্টি আদমের পরে।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

রাত্রি

"বনফুল"-প্রণীত এই উপন্যাস পাটনা প্রভাতী-সঙ্ঘের মুখপত্র 'প্রভাতী'তে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। "রাত্রি" 'প্রভাতী'তে বেমানান। সুতরাং আমরা বাংলা দেশে এই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের স্বত্ব সংগ্রহ করিয়াছি। বিহারে 'প্রভাতী'তে এবং বাংলা দেশে 'শনিবারের চিঠি'তে "রাত্রি" একসঙ্গে ঘনীভূত হইতেছে—এই আশ্বাসে যাঁহারা সান্ত্বনা মানিবেন না, "রাত্রি" প্রভাত হইলে তাঁহাদিগকে আমাদের উপর চটিতে অনুরোধ করিতেছি। এই দ্বিতীয় মুদ্রণের অনুমতি দানের জন্য আমরা গ্রন্থকার "বনফুল" ও 'প্রভাতী'র সম্পাদক শ্রীমান মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।—স. শ. চি.]

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

রাত্রির কথা লিখতে বসেছি।

এখন কিন্তু বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহর, রোদের তাতে প্রকৃতি পুড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, সকাল থেকে ক্রমাগত আত্মসম্বরণ ক'রে ক'রে প্রকৃতি যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর পারছে না, অন্তরের পুঞ্জীভূত উত্তাপ চতুর্দ্দিক চৌচির ক'রে দিয়ে এইবার ফেটে বেরোয় বুঝি। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্ঠুর উত্তাপ। একটা তৃষ্ণার্ত্ত কাক অশ্বত্থগাছের ডালে হাঁ ক'রে ব'সে আছে, গলার কাছটা কাঁপছে তার। বুড়ো অশ্বত্থগাছটার সর্ব্বাঙ্গে কচি পাতার সমারোহ, নীরবে একটা সবুজ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে যেন। ঠাকুর-বাড়ির গেটটার পাশে সারি সারি গোটা তিনেক কলসী নিয়ে কইলু ব'সে আছে, ফতুয়া-পরা ন্যাড়া-মাথা কইলু, কলসী থেকে জল নিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদের বিনামূল্যে দান করছে দৈনিক চার আনা

মজুরির পরিবর্তে। কার পুণ্য হচ্ছে, কে জানে! অদূরে বুড়ো মুচীটাও ব'সে আছে আশপাশে নানা জাতীয় ছিন্ন পাদুকা ও পাদুকা-সংস্কারের সরঞ্জাম নিয়ে। বুড়োর লক্ষ্য পথিকদের পায়ের ওপর, মাঝে মাঝে নিজের দিকে কারও কারও দৃষ্টিও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে সে—"জুতি ঠো হুজুর!" কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না; এই রোদে দাঁড়িয়ে জুতো সারাবে কে! বুড়ো কিন্তু নিরস্ত হচ্ছে না, সুযোগ পেলেই অনুরোধ করছে। তার মানসপটে মুখে-বসন্তর-দাগ জাঁদরেল মুচিনীটার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে বোধ হয়, বিকেলে সে আসবে, পাই-পয়সার হিসেব নেবে এবং উপার্জ্জন কম হ'লে কারণে অকারণে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করবে। আর্ত্তনাদ করতে করতে একটা মোটর ছুটে চ'লে গেল, ধুলো উড়ল। তার পেছনে একটা জীর্ণ টমটম, ঘোড়াটা জীর্ণতর, চারজন মোটা লোককে আর যেন বেচারা টানতে পারছে না, গাড়োয়ান ঘন ঘন চাবুক চালাচ্ছে। ঘন ঘন হর্ন দিতে দিতে আর একটা মোটর বেরিয়ে গেল, আবার একরাশ ধুলো উড়ল। "ঠাণ্ডা মালাই-বরো-ফ"—ভীষণদর্শন একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে, তার পিছনে একজন কুলী, তার মাথায় লাল শালু দিয়ে মোড়া মালাই-বরফের হাঁড়ি। পিচের রাস্তা গরম হয়ে নরম হয়ে এসেছে। কুলিটার পায়ের চামড়া শক্ত, ফাটা-ফাটা, হয়তো গরম লাগছে না। ঠাণ্ডা মালাই-বরফ ব'য়ে বেড়াবার জন্যে ক পয়সা পাবে ও কে জানে! অশ্বত্থ গাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ব'সে রাত্রির কথা লিখছি, মনে ক'রে ক'রে ভেবে ভেবে লিখছি। এই দারুণ দ্বিপ্রহরের পটভূমিকায় নিবিড় রাত্রির স্মৃতি অস্পষ্ট, রহস্যময়।

খট-খট-খট-খট-খট-খট।

মদগর্ব্বিত পদবিক্ষেপে একদল পুলিস-বাহিনী রাস্তা প্রকম্পিত ক'রে চ'লে গেল। ওদের খাকী সাজ আর লাল পাগড়ি আশ্চর্য্য রকম মানিয়েছে উদ্ধত দ্বিপ্রহরের নিদারুণ এই—

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে। ওই পুলিস-বাহিনীর একটি পুলিসকে চিনতে পেরে আমারওহাসি পাচ্ছে। কালই আভূমি নত হয়ে ও সেলাম করছিল ট্যাস-ফিরিঙ্গী এক গার্ড-সাহেবকে আকবরনগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আমি দেখেছিলাম। খট-খট-খট-খট-খট-খট—মদগর্ব্বিত পদধ্বনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। বুড়ো মুচীটা সভয়ে চেয়ে রইল, জলসত্র-পরিচালক কইলু একজন তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের আঁজলায় জল ঢালতে ঢালতে অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতেই ঢেলে দিলে খানিকটা জল।

এই বিক্ষেপ-বিক্ষোভ-উত্তাপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ব'সেই লিখতে হচ্ছে রাত্রির কথা। তিমিরময়ী নক্ষত্রখচিত রাত্রি। নক্ষত্র অগণিত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদও উঠেছিল মধ্যরাত্রে। ঝড়ও উঠেছিল। আমি সবটা দেখি নি, দেখলেও হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। না, আমি সবটা দেখি নি, দেখতে পারি নি; অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম, দেখলাম, প্রভাত হয়েছে।

২

জীবনের যে অনিবার্য্য ঘটনাগুলিকে অপছন্দ করি আমি, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিরই সহায়তায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেদিন। সেদিন কি বার ছিল, কি মাস ছিল, কি

তিথি ছিল, কিছুই মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে, দগদগে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের ডোরা-কাটা শতরঞ্চিটা প্ল্যাটফর্মে পেতে তার ওপর বেকুবের মত ব'সে ছিলাম আমি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অস্বস্তি আরও প্রবল হয়ে উঠল, যখন একজন কুলী এসে মাথার ওপর একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। অস্পষ্ট আর কিছু রইল না। শতরঞ্চি শতকণ্ঠে আত্মপ্রচার করতে লাগল, আমার প্রকাণ্ড কালো তোরঙ্গটার ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আমার নামটা অগোচর রইল না আর কারও।

স্ত্রী-বিহীন পুরুষকে চাকরের ওপর নির্ভর করতে হয়—সে-ই সখা, সচিব, গৃহিণী সব—বিশেষত আমার মত কাছা-খোলা লোককে, যার নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নেই। সেই চাকর যদি আবার আমার গোকুলচন্দ্রের মত যুগপৎ রসবোধ-লেশহীন, কর্ম্মঠ, বিশ্বাসী এবং স্নেহশীল হয়, তা হ'লে এই রঙচঙে শতরঞ্চির ওপর বেকুবের মত ব'সে অস্বস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ট্রেন ছাড়বার মিনিট দশেক আগে হন্তদন্ত গোকুল এই শতরঞ্চিটা কিনে স্টেশনে দিয়ে গেল আমাকে, সকাতরে অনুরোধ ক'রে গেল, বিছানাটা যেন না খুলি, এই শতরঞ্চিটা পেতেই যেন চালিয়ে দিই ভ্রমণকালীন শোওয়া-বসাটা। গোকুল জানে, বিছানায় টুকিটাকি নানা রকম জিনিস আছে, খুললেই একটা না একটা হারিয়ে যাবে। গোকুলকে অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু ভগবান গোকুলকে আর একটু যদি, রসিক নয়, কম বেরসিক ক'রে সৃষ্টি করতেন, কি ক্ষতি হ'ত তাতে তাঁর! আশ্চর্য্য কাণ্ড, পয়সা দিয়ে শতরঞ্চিবেশী এই প্রলাপটা কিনে নিয়ে এসেছে ও সজ্ঞানে, স্বচ্ছন্দে! কিছুদিন পূর্ব্বে এই বেখাপ্পা রকম বড় কালো রঙের তোরঙ্গটাও এই গোকুলই

কিনেছিল, সাদা রঙ দিয়ে নাম গোকুলই লিখিয়েছে। শুধু তোরঙ্গে নয়—আমার সমস্ত জিনিসে, বাসন-কোসন, জামা-কাপড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি, লুঙ্গি, সমস্ত জিনিসে আমার নাম লেখা এবং সমস্তই আমার হিতৈষী গোকুলের কীর্ত্তি। গোকুল আমাকে নিয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। আমি যেন সমস্ত জিনিস হারিয়ে ফেলতে উদ্যত, নাম-টাম লিখে গোকুল কোনক্রমে সামলে-সুমলে রেখেছে সব যেন।

ওয়েটিং-রুমের পাশে অন্ধকার এক কোণে রঙিন শতরঞ্চিটার ওপর চুপ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলাম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে মজবুত ক'রে বাঁধা বিছানার বাণ্ডিলটায় হেলান দিয়ে। অদূরে একটা এঞ্জিন শব্দ করছিল—শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌। চোখ বুজে শুয়ে একটা গল্পের প্লট ভাবছিলাম। অতিশয় সংস্কৃত ভাষায় ভাবছিলাম। একটু নমুনা দিই।

…চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। অরণ্যসমাকুল উপত্যকার সমস্ত সৌন্দর্য্য অমাবস্যার অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায়। নির্ম্মেঘ আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ছায়াপথ প্রসারিত। সুবিশাল বৃশ্চিকরাশি বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত চিরন্তন প্রশ্নের রহস্য লইয়া অন্ধকার শূন্যে জ্বলিতেছে। দূরসন্নিবদ্ধ দেবদারুশীর্ষে অনুরাধা, তাহার ঈষৎ নিম্নে জ্যেষ্ঠা এবং শূলপাণি-পর্ব্বতের অগ্রভাগে মূলা নক্ষত্র দেদীপ্যমান। নক্ষত্রের মৃদু আলোকে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ, ঘনসন্নিবদ্ধ বনশ্রেণী পর্ব্বতগাত্রে পুঞ্জীভূত মেঘবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শূলপাণি ও পার্ব্বতীর মধ্যস্থিত বনসমাচ্ছন্ন এই উপত্যকায় বৌদ্ধ কাপালিক রক্তভিক্ষু সঙ্ঘোপনে বাস করেন। উপত্যকা শ্বাপদসঙ্কুল, গভীর নিবিড় রাত্রেও নীরব নহে। নিকটে দূরে বন্য পশুর সাবধান-সঞ্চরণ-শব্দ, অজগর-নিষ্পিষ্ট অসহায় পশুর অবরুদ্ধ আর্ত্তনাদের মত একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বনি, জটিল শাখাপ্রশাখাময় বৃক্ষশীর্ষে নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন…

ঘর্ঘর ক'রে একটা শব্দ হ'ল, চোখ খুলে দেখলাম, ঠিক মাথার ওপরে যে বাতিটা টাঙানো ছিল, একটা কুলী হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা নাবাচ্ছে। একটু পরেই আলো জ্ব'লে উঠল এবং আমাকে কেন্দ্র ক'রে গোকুলের কীর্ত্তি সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। রঙিন শতরঞ্চি, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উঠে বসলাম এবং টাইম-টেব্‌লটা নিয়ে আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতাটার ওপর অকারণে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। ওতেই নিমগ্ন হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং—স্টেশনের ভেতরে ঘণ্টা বাজল। কে একজন আপ-ডাউন ভাষায় আর এক স্টেশনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। কথা শেষ হয়ে গেল। এঞ্জিনের সোঁ সোঁ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন জানি না, আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতা থেকে চোখ তুলে হঠাৎ আমি ডান দিকে ফিরে চাইলাম, মনে হ'ল, কে যেন আমায় ঘাড় ধ'রে ফিরিয়ে দিলে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে কালো কুচকুচে এক জোড়া চোখ আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। আর কিছু নয়, কেবল এক জোড়া চোখ।

রাত্রি।

আমার রঙিন শতরঞ্চি এবং নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে লজ্জিত হয়ে ওঠবার পূর্ব্বেই, বেশ মনে পড়ছে, বংশী এসে ঢুকল ওয়েটিং-রুমে এক ঠোঙা খাবার এবং এক কুঁজো জল নিয়ে। তারপর কয়েক মিনিট কি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এইটুকু শুধু মনে আছে, এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল এবং আমি সহসা আবার প্রাণপণে সেই অন্ধকার উপত্যকায়

নিশাচার পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অনুসরণ ক'রে সেই বৌদ্ধ কাপালিকের অলৌকিক কাহিনীটা গ'ড়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

আপনিই কি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার?—প্রশ্ন করলে বংশী, কিন্তু ঈষদুন্মুক্ত দরজার অন্তরালে শাড়ির টকটকে লাল পাড়ের ঝলক চোখে পড়ল। বুঝলাম, বংশী প্রশ্নকারক নয়, প্রশ্নবাহক।

কি রকম যেন বেকায়দায় প'ড়ে গেলাম।

ঘনশ্যাম নামটা এ যুগের সভ্যসমাজে অচল, যে রগরগে শতরঞ্চিটার ওপর ব'সে আছি, সেটা অচল, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা অচল এবং সর্ব্বাপেক্ষা অচল আমার ব্রণ-লাঞ্ছিত-মুখ-সর্ব্বস্ব এই রোগা লম্বা চেহারাটা। বাইরের এই জিনিসগুলোর সঙ্গে আমার অন্তর্লোকের সুন্দর সাহিত্য-সাধনাকে বিজড়িত করতে বরাবরই আমি একটু সঙ্কুচিত হই। তবু সম্ভবত 'বিখ্যাত' শব্দটার মোহে অভিভূত হয়ে বংশীকে সত্য কথাই বললাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি ডাক্তারি করতে করতে কি ক'রে লেখেন এত?

বুঝলাম, এ প্রশ্নটি বংশীর মস্তিষ্ক থেকে স্বতঃ উৎসারিত হ'ল। একটু মুচকি হাসলাম। আমার মুচকি হাসির অন্তরালে কি পরিমাণ উষ্মা নিহিত ছিল, তা দেখতে পেলে বংশী একটু বিব্রত হ'ত। অনেকেই এ প্রশ্ন করে। কিন্তু কি মূর্খের মত প্রশ্ন! এ যেন অনেকটা 'আপনি ডাক্তারি করতে করতে নিশ্বাস নেন কি ক'রে' জাতীয় প্রশ্ন। অনেকেই দেখেছি আলাপ সুরু করেন প্রশ্ন দিয়ে। দুচারটে সাধারণ প্রশ্নের পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রকম ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন বর্ষিত হতে থাকে। 'মাসে কত টাকা উপায় করেন'—এ প্রশ্ন তো অনেকের মুখেই শুনেছি। 'প্র্যাক্‌টিস কেমন হচ্ছে', 'লেখা থেকে দুপয়সা হচ্ছে কি না'—এতবার

এত লোকের কাছে শুনেছি যে, গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এক জাতীয় সাহিত্যিক প্রষ্টা আছেন, তাঁদের প্রশ্নগুলো বেশ জটিল ধরনের। 'ছোটগল্প কি ক'রে লিখতে হয়', 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাৎ কোথায়', 'সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কবি কি না', 'বাংলা সাহিত্যে কোন্ কবি ব্রাউনিঙের মত', 'জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবিই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কি না'—দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়।

বংশী শতরঞ্চিতে উপবেশন ক'রে তৃতীয় প্রশ্নটা করলে এবং আত্মপ্রকাশ করলে। 'আচ্ছা, আজকাল চারদিকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' খুব শুনি, লোকটা কে বলুন তো?'

আমি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, ডিটেক্‌টিভ।

শিস দেবার ভঙ্গিতে মুখটা কুঁচকে বিস্মিত বংশী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ভেতর থেকে ডাক এল।

বংশীদা, শুনুন।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে—যেন আকাশের ওপার থেকে—কথাগুলো ভেসে এল। রাত্রির সম্পর্কে বরাবরই, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত, আমার এই দূরত্ব-বোধক অনুভূতিটা ঘোচে নি।

উঠে চ'লে গেল বংশী।

আমি ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছু একটা করবার জন্যই সম্ভবত স্টেশনের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। ঘড়ি চলছে না। সংস্কৃত ভাষায় গল্পের যে প্লটটা ভাবছিলাম, সেটাই আবার ভাববার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে আবার ঠেস দিয়ে শুলাম বিছানার বাণ্ডিলটায়। শূলপাণি এবং পার্ব্বতী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকার সে ছবিটা আর কিন্তু মনের মধ্যে তেমন ভাবে জীবন্ত হয়ে

উঠল না। বংশী মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, আর সেই কালো কুচকুচে চোখ দুটো, সেই লালপাড়ের ঝলকানি। তখন ভাবি নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওই শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার উপত্যকার সঙ্গে কালো কুচকুচে চোখ দুটো, লালপাড়ের ঝলকানি আর বংশীর অতি নিবিড় যোগ ছিল। না থাকলে ঠিক সেই সময় রক্তভিক্ষু নামে একটি কাপালিকের কথা আমার মনে হবে কেন? সেই অন্ধকার উপত্যকায় শূলপাণি-পর্ব্বতের গুহায় রক্তভিক্ষু নামে যে বৌদ্ধ কাপালিককে আমি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করেছিলাম, সে যদিও আর কোন দিন আমার লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করবে না, সে যদিও হারিয়ে গেল, তবু কিন্তু ঠিক সেই সময় সে আমার কল্পনাতেই বা মূর্ত্ত হয়েছিল কেন, যদি না—

স্বর্ণেন্দু ব'লে কাউকে চেনেন আপনি?

চোখ খুলে উঠে বসলাম।

বংশী আবার এসেছে।

স্বর্ণেন্দু?

হ্যাঁ, স্বর্ণেন্দু রায়, স্কটিশে আপনার সঙ্গে—

আর বলতে হ'ল না, যবনিকা উঠে গেল; চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্ণেন্দুর মুখখানা। কালো রোগা লাজুক স্বর্ণেন্দু। 'সোনার চাঁদ' ব'লে রাগাতাম তাকে আমরা।

খুব চিনি। কেউ হয় নাকি স্বর্ণেন্দু আপনার?

আমার পিসতুতো দাদা।

ও।

সোনাদা এসে পড়বেন এখুনি দিল্লী এক্সপ্রেসে। আমরা সবাই মধুপুর যাচ্ছি—

বেড়াতে?

না, চেঞ্জে। পিসেমশায়ের অসুখ।

কি হয়েছে?—ডাক্তারী কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না।

পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাতের শ্লীল অশ্লীল নানা রকম কারণ মাথার মধ্যে ভিড় ক'রে এল। আশ্চর্য্য আমাদের মন।

কতদিন থেকে?

এক বছর হবে। কথা পর্য্যন্ত বলতে পারেন না একেবারে।

কোথায় রয়েছেন তিনি, ওয়েটিং-রুমে?

হ্যাঁ, আসুন না, দেখবেন?

খুব সম্ভবত একজন লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যেই, (ইংরেজীতে যাকে বলে 'কাঁধ-ঘসাঘসি') বংশী আমাকে ভেতরে যেতে বললে।

না থাক, হয়তো ঘুমুচ্ছেন এখন।

ঘুমুবেন কি, ঘুমই হয় না তাঁর, দিনরাত জেগে আছেন।

অবচেতন নয়, সচেতন মনেরই প্রত্যক্ষলোকে কালো কুচকুচে চোখ দুটো নির্নিমেষে চেয়ে ছিল। আকর্ষণ করছিল, বিকর্ষণও করছিল। স্বর্ণেন্দুর কে হয় ও? হয়তো দু মিনিট কেটেছিল, হয়তো দু ঘণ্টা, ঘড়ির দিক থেকে ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন। এইটুকু শুধু মনে আছে, অনেকক্ষণ লেগেছিল কুণ্ঠাটা কাটতে—বেশ কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। চোখের দৃষ্টিতে সাজপোষাকবর্জ্জিত আসল মানুষটিকে চেনা যায়, মনের গহনলোকে সঙ্গোপনে যে মানুষটি বাস করে তাকে, সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত আসল সত্তাটিকে। সাজে পোষাকে আলাপে ব্যবহারে সভ্যজগতের সব মানুষই প্রায় এক ছাঁদের। চোখের দৃষ্টিই মানুষের অন্তর্নিহিত

বিশিষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে এখনও। চোখের দৃষ্টিই মুখশ্রীর প্রাণ। অদ্ভুত ওই কালো চোখ দুটি! বিশিষ্ট! হয়তো ওর সঙ্গে জীবনে কখনও পরিচয় ঘটত না। আমার বর্ণবহুল শতরঞ্জি, ডাক্তার ঘনশ্যাম রায়-নামলেখা তোরঙ্গ, ডাক্তারি-সাহিত্যিকতার আপাত-অদ্ভুতত্ব নিয়ে আলোচনা—অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমি অপছন্দ করি, সেই জিনিসগুলিরই আকস্মিক সমন্বয় না ঘটলে সেদিন, কিম্বা কোন দিনই হয়তো, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত না আমার। তার কথাগুলো, প্রায় বছর দুয়েক আগে শোনা কথাগুলো, মনে পড়ছে আমার।

আপনার ওই শতরঞ্জিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল আমার, তারপর দেখলাম নাম-লেখা তোরঙ্গটা। নামটা দেখেই মনে পড়ল, দাদার এই নামেরই তো একজন ডাক্তার লেখক বন্ধু আছেন। বংশীদাকে বললাম—

আশ্চর্য্য রকম ছোকরা এই বংশী, অর্থাৎ আশ্চর্য্য রকম লোক-ঠকানো চেহারা ওর। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, চালাক-চতুর বেশ। চেহারাতে এমন একটা লালিত্য আছে অর্থাৎ সেই ধরনের লালিত্য আছে, যা আজকালকার মেয়েদের পছন্দ। বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক নয়, বেশ রোগা-রোগা, পাঞ্জাবি-পরলে-বেশ-মানায়-গোছ চেহারা। মুখে যে হাসিটা সর্ব্বদাই চিকমিক করছে, আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ সেটা বুদ্ধির দীপ্তি ব'লে ভুল হবার সম্ভাবনা। প্রতি কথাতেই সমঝদার-মার্কা হাসি। সেই হাসির অন্তঃসারশূন্যতা কিন্তু নিমেষে বোঝা যায় চোখ দুটোর পানে চাইলে। সর্ব্বদা চঞ্চল চোখ দুটোর দৃষ্টি ছটফট করছে—যেন নিজেকে ঢাকবার জন্যে, ধরা পড়ার ভয়ে, কিন্তু পারছে না। নির্ব্বোধ, ভীরু, লোলুপ, চঞ্চল দৃষ্টি।

আসুন না, দেখবেন? আবার অনুরোধ করলে বংশী।

চলুন।

ক্রমশ

"বনফুল"

মনঃসমীক্ষণ

স্বপ্ন

[মনঃসমীক্ষকেরা দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলির যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। মৌখিকভাবে এবং পত্রের দ্বারা অনেকে তাঁহাদের নিজেদের জীবনের কতকগুলি বিশেষ ভুল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে, প্রায় সকল প্রশ্নের মূলেই একই ধরনের সমস্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভুলের মধ্য দিয়া যে ইচ্ছা বা ভাব প্রকাশ হয়, তাহা যে মনের সংজ্ঞান স্তরেই থাকে, এরূপ ধারণা করা ভ্রমাত্মক। এইরূপ ভুল ধারণা প্রশ্নকারীদের অনেকেই পোষণ করিয়াছেন। সংজ্ঞান স্তরে মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলেও, তদ্‌বিপরীত ভাব যে অনেক সময় নির্জ্ঞান স্তরে থাকিতে পারে এবং নানাবিধ আচার-ব্যবহারের ও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া যে সেই ভাবগুলি প্রকাশ হইতে পারে, মনঃসমীক্ষকেরা এই কথাই বলেন। মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) করিলে এই অবরুদ্ধ ও অপ্রকাশ্য ইচ্ছা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।]

সাধারণ ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নির্জ্ঞান মনের কার্য্যধারা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম। আমাদের জীবনে জীবনের আর একটি আপাততুচ্ছ সাধারণ ঘটনার বিষয়ে চর্চ্চা করিলে নির্জ্ঞান মনের আরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা যে সমস্ত স্বপ্ন দেখি, তাহাদের যথাযথ ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের সহিতও নির্জ্ঞান মনের যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। কিন্তু স্বপ্নদর্শন এমন একটা সাধারণ ব্যাপার যে, ইহার যে আবার কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বা বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, তাহা অনেকেই হয়তো কল্পনাই করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, স্বপ্নে প্রায়শই এমন কতকগুলি

অসম্ভব এবং উদ্ভট ঘটনার (সোনার পাহাড়, মানুষের চার পা, সাপের কথা কওয়া প্রভৃতি) সমাবেশ দেখা যায় যে, স্বপ্নালোচনা হইতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে মনে করা বাতুলতারই নামান্তর। স্বপ্ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কিরূপেই বা সম্ভব? কারণ স্বপ্ন তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মনেই থাকে না। অন্যের নিকট বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তটি যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই হউক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক, পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করে, তাহা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং এইরূপ নিছক সারশূন্য বস্তুর মূল্যই বা কি হইতে পারে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া মন সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই বা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে?

এ কথা স্বীকার করিতে অবশ্য কোন দ্বিধা নাই যে, আমরা স্বপ্নকে সাধারণত তুচ্ছ এবং নিরর্থক বলিয়াই মনে করি। কিন্তু অনেক স্থলে যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, ইহাও কি সত্য নয়? ধরুন, যদি কেহ স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুটি, যিনি সম্প্রতি বিদেশে চাকুরি করিতে গিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া মরণাপন্ন অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছেন, বন্ধুটির সম্বন্ধে এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার পর ঘুম ভাঙিয়া গেলে তাঁহার মন কি কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হইবে না এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্বপ্নটিকে অলীক বা নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রবৃত্তি কি তাঁহার হইবে? আবার দেখুন, স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন, প্রায় সব দেশেই, বহুকাল হইতে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য যাহাই হউক, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, স্বপ্নকে একেবারে নিরর্থক বলিয়া কেহই মনে করেন না। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, সাপের স্বপ্ন দেখিলে সন্তানের জন্ম হয়, দুঃস্বপ্ন কাহাকেও বলিতে নাই, ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু স্বপ্নে

বাপ মা তাহাকে আদর করিতেছে দেখিয়া হাসে এবং বাড়ি পুড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে, প্রভৃতি প্রবাদগুলি স্বপ্ন সম্বন্ধে কি মনোভাবের ইঙ্গিত করে? কথিত আছে যে, পুরাকালে প্রত্যেক রাজসভায় সভাপণ্ডিত, বিদূষক, সঙ্গীতাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারীও থাকিতেন। আলেকজাণ্ডার বিজয়াভিযানে বাহির হইয়া যখন টায়ার (Tyre) শহর অবরোধ করিলেন, টায়ারবাসীরা বহুদিন যাবৎ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাইয়াছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী বাধার ফলে, আলেকজাণ্ডার যখন অবরোধ আর চালাইবেন কি না ইতস্তত করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি পরী বিজয়োল্লাসে নৃত্য করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারীদের ডাকাইয়া স্বপ্নটির অর্থ নিরূপণ করিতে বলিলেন। তাহারা একবাক্যে বলিল, স্বপ্ন তাঁহার জয়েরই সূচনা করিতেছে। ইহা শুনিয়া পরদিন আলেকজাণ্ডার বিপুল-বেগে শত্রুদের আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদের পরাস্ত করিয়া টায়ার শহর জয় করিয়া লইলেন। আমাদের দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বপ্নকে অনেক সময় অতি উচ্চ আসন দেওয়া হয়। অনেক মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপনের মূলে স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বপ্নাদ্য মাদুলি ও ঔষধে আমাদের দেশে জনসাধারণের যে অগাধ বিশ্বাস আছে, তাহার প্রমাণ পদস্থ ব্যক্তির প্রশংসাপত্রসম্বলিত বিজ্ঞাপনের বহুলপ্রচার।

কেহ কেহ মনে করেন, স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বপ্নে কোন ব্যক্তির মৃত্যুদৃশ্য দেখা গেল এবং পরে জানা গেল, বাস্তবিকই সেই ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটিয়াছে—এইরূপ ঘটনার কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। বার ও তিথি ভেদে স্বপ্নের ফলাফল যে বিভিন্ন হইতে পারে, অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন অতীত জীবনের, এমন

কি পূর্ব্বজন্মেরও, কোন কোন ঘটনাবলীর কথা স্বপ্ন হইতে জানিতে পারা যায়, এইরূপ ধারণাও কেহ কেহ পোষণ করিয়া থাকেন।

স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এক দিকে স্বপ্নকে যেমন অসার ও অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়, অন্য দিকে তেমনই স্বপ্নকে অর্থপূর্ণ ও সারবান ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইবার বাসনাও দেখা যায়। আদিম যুগে স্বপ্নকে একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়াই মনে করা হইত। আধুনিক সভ্যযুগে স্বপ্নের প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপ না করিলেও, ইহা যে একেবারেই আজগুবি ব্যাপার—এ কথা মানিয়া লইতে সাধারণের যেন বাধা বোধ হয়। স্বপ্ন সম্বন্ধে সব দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদগুলি ইহার প্রমাণ। আপনাদের মনে, বিশেষত আপনাদের মধ্যে যাঁহারা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে হয়তো এই সংশয় জাগিবে যে, এই বাধা বোধ হয় বলিয়াই কি ধরিয়া লইতে হইবে, স্বপ্ন একটি অর্থপূর্ণ বিশেষ ঘটনা! ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথমত, যখন দেখিতেছি যে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে বেশির ভাগ লোকে স্বপ্নটি অর্থপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তখন ইহার মূলে যে কিছু সত্য থাকিতে পারে, তাহা ধরিয়া লইয়া স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা বোধ হয় অবৈজ্ঞানিক এবং অসমীচীন হইবে না। বিধিমত গবেষণার ফলে যদি সাধারণের স্বপ্ন সম্বন্ধে এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটে, তাহা হইলে তখন এই ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিব না। কোপার্নিকাস (Copernicus) যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেই এই মত পোষণ করিতেন যে, পৃথিবী অচল, এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ

করে। জনসাধারণের এই মতের বিরুদ্ধে কোপার্‌নিকাস যখন তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেন, তখন সকলেই নাকি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল এবং তাঁহার মতবাদকে বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, গবেষণার ফলে কোপার্‌নিকাসের অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই মত মানিয়া লইতে আজ আমাদের কাহারও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। সেইরূপ, আলোচনার ফলে স্বপ্ন নিরর্থক বলিয়াই যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই তথ্য মানিয়া লইতে আমরা কিছুমাত্র আপত্তি করিব না। দ্বিতীয়ত, ভুলভ্রান্তি আলোচনার সময় বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকের নিকট কোন ঘটনাই তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্বপ্ন একটি মানসিক ঘটনা, সুতরাং তাহা যত তুচ্ছই হউক, তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বৈজ্ঞানিকের অবশ্যকর্ত্তব্য। এই আলোচনাকে বাতুলতার পর্য্যায়ভুক্ত করিলে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। বৈজ্ঞানিকেরাও যে স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই, তাহা নহে। আমরা এইবার সেই আলোচনার কথাই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্বপ্নের প্রকৃতি এবং গুণাবলী সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। বাস্তবিক, স্বপ্ন কত রকমের হইতে পারে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহাদের মধ্যে এমন দুই একটি গুণ নিশ্চয়ই আছে, যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এগুলিকে স্বপ্ন বলি অর্থাৎ বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী হইতে পৃথকভাবে দেখি। দেখা যাউক, সেই বিশেষ লক্ষণগুলি কি হইতে পারে।

প্রথমেই বলা যাইতে পারে স্বপ্নের সহিত নিদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের

কথা। স্বপ্ন যে রকমের হউক না কেন, নিদ্রিত অবস্থায় মনোজীবনের একটি কার্য্যবিশেষ। জাগ্রত অবস্থার মানসিক কার্য্যাবলীর সহিত ইহার যে কোন সাদৃশ্যই নাই তাহা নহে, কিন্তু বিভিন্নতাও যথেষ্ট আছে। অনেক সময় স্বপ্ন দেখিয়া আমাদের ঘুম ভাঙিয়া যায়। স্বপ্নকে সেইজন্য জাগ্রত এবং নিদ্রিত এই দুইটির মাঝামাঝি একটি অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। তারপর দেখুন, আমরা কথায় বলি, স্বপ্ন দেখি; স্বপ্ন শুনি—এ কথা কখনও বলি না। ইহা হইতে স্বপ্নের আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়াই কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় মানসিক কার্য্য প্রধানত দর্শনেন্দ্রিয়ের উপরেই নির্ভর করে। ভাব, চিন্তা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও স্বপ্নে যে ব্যাপারগুলি ঘটে, সেগুলি মূলত দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্বপ্ন দেখা ঠিক নির্ব্বাক চলচ্চিত্র দেখার ন্যায়। নির্ব্বাক চলচ্চিত্রে যেরূপ একটির পর একটি ঘটনা পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত হয়, আর আমরা কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলি উপভোগ করি, সেইরূপ স্বপ্নেও মনের পর্দ্দার উপর বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়া যায়, আমরা সেগুলি দর্শন করি। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি তখন ঘটনা-তাৎপর্য্য গ্রহণ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

এই দুইটি ভিন্ন, সকল স্বপ্নে সমভাবে প্রযোজ্য এমন আর কোন বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা যায় না। স্বপ্নাবলীর মধ্যে বৈষম্য কত প্রকারের হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। কোন কোন স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী, তাহার বিষয়বস্তুতে হয়তো একটি মাত্র চিন্তা বা ঘটনাংশ প্রকাশ পায়। আবার অনেক স্বপ্নে ইহার ঠিক বিপরীতও হয়। সে-গুলিতে বহু ঘটনা বা চিন্তা প্রভৃতির সমাবেশে যেন একটি সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হইয়া যায়, কাজেই সে স্বপ্নগুলি দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। অনেক

সময় স্বপ্নের ঘটনাবলী এমন স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয় যে, ঘুম ভাঙিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণের জন্য ঘটনাগুলি বাস্তব বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্বপ্নের ঘটনাসমূহ এত অস্বচ্ছ ও আবছা ভাবে দেখা যায় যে, বিশেষ চেষ্টা সহকারে স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে করিতে হয়। স্বপ্নে যে প্রায়শই আজগুবি ও অসম্ভব ঘটনাবলী দেখা যায়—এ কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু বেশির ভাগ স্বপ্নের উপাদান ঐ ধরনের হইলেও এমন ঘটনাও স্বপ্নে দেখা যায়, যাহার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে এবং যাহা বাস্তব জীবনে ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। হাত পা ছুঁড়িয়া অনেক উঁচুতে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছি এবং আড্ডায় বসিয়া রাজেনের সহিত ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব উত্তেজিতভাবে আলোচনা করিতেছি—এই দুইটি স্বপ্নই দেখিয়াছি। বাস্তব জীবনে ঘটার সম্ভাবনার দিক হইতে প্রথম স্বপ্নটি যে আজগুবি—এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ভুলিয়া যান বলিয়াই অনেকের ধারণা যে, তাঁহারা কখনও স্বপ্ন দেখেন না। স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া যাই—এ কথা অবশ্য ঠিক, কিন্তু সব স্বপ্ন যে আমরা সমানভাবে ভুলিয়া যাই, তাহা নহে। কোন স্বপ্ন নিদ্রা-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভুলিয়া যাই, কোন স্বপ্নের সবটাই বা কিয়দংশ হয়তো কিছুকাল মনে থাকে, আবার কোন স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে বহুদিবস যাবৎ, এমন কি কুড়ি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত, মনে থাকিতে পারে। চেষ্টা করিলে আপনিও হয়তো এই মুহূর্ত্তে বহুদিন পূর্ব্বের কোন একটি স্বপ্নের কথা মনে করিতে পারেন। আপনাদের এমন অভিজ্ঞতাও হয়তো আছে যে, নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্ন-বৃত্তান্তটা যে সম্পূর্ণ অলীক, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সত্ত্বেও, স্বপ্নের দরুন একটি বিচলিত ভাব সারাদিনই অনুভব করিয়াছেন। আবার এমন স্বপ্নও দেখিয়াছেন যে, বিচলিত ভাব দূরে থাকুক, স্বপ্নটি আপনাদের মনে কোন রেখাপাতই করিল না।

বিভিন্ন স্বপ্নাবলীর মধ্যে কোথায় ঐক্য আছে দেখিলাম, এবং কি কি বিষয়ে অনৈক্য হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিলাম।

'শক্ত কলসের গল্প' বাল্যকালে আপনারা নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। গল্পটি মোটামুটি এইরূপ। এক দরিদ্র ছাতুওয়ালা কল্পনা করিতে লাগিল, ছাতু বিক্রয়ের দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া মানে, সম্মানে রাজার সমকক্ষ হইয়াছে এবং সেই দেশের রাজার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। একদিন রাজকন্যা তাহার কথার অমান্য করায় সে রাগান্বিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার বাস্তব পদক্ষেপণের দ্বারা কলসীটি ভাঙিয়া চুরমার হইল এবং তাহার কল্পনাসূত্র সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এইরূপ মানসিক ঘটনা অনেকের জীবনেই, বিশেষত তাহাদের যৌবনের প্রারম্ভেই, ঘটিয়া থাকে। আমরা সাধারণত ইহাকে দিবাস্বপ্ন বলি। আকৃতি ও বিষয়-বস্তু ভেদে দিবাস্বপ্ন নানা রকমের হইয়া থাকে। সব দিবাস্বপ্নের নায়কই দ্রষ্টা নিজে। দিবাস্বপ্নের বিষয়গুলিও স্বপ্নের ন্যায় দীর্ঘ বা ক্ষণস্থায়ী, একটি বা বহু ঘটনা সম্বলিত, সম্ভব বা অসম্ভব প্রভৃতি হইতে পারে। সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কি দিবাস্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে স্বপ্নের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়? তাহা করিলে কিন্তু যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ স্বপ্নের প্রধান লক্ষণ হইতেছে যে, উহা নিদ্রিত অবস্থার মানসিক কার্য্য। দিবাস্বপ্ন জাগ্রত অবস্থাতেই ঘটে। উপরন্তু যখন কোন ব্যক্তি দিবাস্বপ্ন দেখেন, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি যে কল্পনা করিতেছেন, এই জ্ঞান তাঁহার মনে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় সেই জ্ঞান থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে দিবাস্বপ্ন স্বপ্ন নহে, নিছক কল্পনা মাত্র। কিন্তু সব কল্পনাকে তো 'দিবাস্বপ্ন' আখ্যা দেওয়া হয় না, কেবল এই ধরনের কল্পনাকেই বা দেওয়া হয় কেন? ইহার কি কোন কারণ নাই? স্বপ্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলে, হয়তো সেই কারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

পালিশ ও ভোঁতা

(নক্ত-বৈঠকের একটি অধিবেশন)

সেদিন চায়ের আসরে ললিতাকে লইয়া দারুণ আলোচনা চলিয়াছিল। চোয়ালের অন্তিম প্রান্তে স্যাণ্ডউইচের অবশিষ্ট অংশটা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া মিস ডাট বলিলেন, তোমরা ওকে 'জেম' 'ডার্লিং' যাই বল না কেন, আমার মতে শি ইজ রিজিড্‌লি অব্‌ষ্টিনেট।

মিস বোনার্জি রসাল তর্কে যোগ দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু আন্তরিক টানটা তখন ঝুঁকিয়াছিল তেপায়ায় রক্ষিত রোল্‌ড-পাফের দিকে। খাদ্য ও তর্কের টানা-পোড়েনে দেখা গেল, মাংসবহুল হাতটা প্লেটের চারিধারে দম-দেওয়া যন্ত্রের মত চরিয়া বেড়াইতেছে। ইতিমধ্যে পক্ষপাতিত্বের আতিশয্যে প্লেট যে খালি হইয়া গিয়াছিল, সেদিকে লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। শিকারী হাতটা প্লেটের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শূন্য প্লেটে মোটা মোটা আঙুলগুলি কাঁকড়ার দাঁড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া গৃহকর্ত্রী অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। বিলাতী পিষ্টক সামনে না পাইয়া কতকগুলি স্বদেশী রসাল মালপোয়া তাহাতে রাখিয়া দিলেন। প্লেট ভরাট হইয়া উঠিল ঈস্ট ও ওয়েস্টের অপূর্ব্ব মিলনে।

এই চিত্তাকর্ষক 'মিস' শব্দটির সহায়তায় বোনার্জি দীর্ঘকাল বয়সকে আড়াল দিয়া আসিতেছেন। কানাঘুষায় শোনা যায়, ভ্রূ-উৎপাটন হইতে আরম্ভ করিয়া কানের পাশে চুলের বিঁড়ার সাহায্যে বাহ্যিক আকৃতি এমন ভাবেই খাড়া করিয়া তুলিতেন যে, ফ্যাশানের উৎকট ঝাঁঝে বহুবার নাকি তরুণের দল ফাঁকিতে পড়িয়াছিল।

তর্ক এখন ঠিক জমাট বাঁধিতে পারে নাই দুইটি প্রাণীর অভাবে। তাঁহারা সদ্যবিলাতপ্রত্যাগত মিস ডস ও তাঁহার নবনির্ব্বাচিত সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ফিয়াঁসে।

'ডস' শব্দটির উৎপত্তি দাস হইতে। বিলাতগমনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত পদবীর সংস্কৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও তিনি ডস থাকিয়া গিয়াছেন।

ফিয়াঁসে বিলাতে আইন পরীক্ষা দিতে গিয়া নৃত্যকলাবিদ হইয়া ফিরিয়াছিলেন। ক্লনরব ফক্সট্রট, ওয়াল্‌ৎস, ল্যাম্বেথ ওয়াক, এমন কি জ্যাজ পদচালনে খাঁটি ওস্তাদের সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। এখানকার সাহেবরা উক্ত খ্যাতি মানিয়া লইয়াছিলেন কি না জানিবার উপায় ছিল না, কারণ তাঁহাদের কৌলীন্যপ্রথা অত্যন্ত কড়া। নিজেদের সমাজের বাহিরে তাঁহারা পারতপক্ষে মিশিতে চান না। যাহা হউক, ফিয়াঁসের পারদর্শিতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া লাভ নাই। বল-নৃত্যে প্রতি অঙ্গ তরে প্রতি অঙ্গ কাঁদাইয়া তিনি ফিয়াঁসের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

নৃত্যের অছিলায় জনতার মাঝে পরস্ত্রীকে জাপটাইয়া ধরাটা প্রাচীন-পন্থীরা অনেক সময় মনে মনে সমর্থন করিলেও প্রকাশ্যে সন্দেহজনক ব্যাপার মনে করিতেন, ইহা অবশ্য ভিন্নসমাজভুক্তদের মতামত। পাশ্চাত্যপন্থীরা ঠিক এই কারণে গোঁড়াদের জেলাস বলিতে ছাড়েন না।

ফিয়াঁসের পিতা নিতান্তই কালা বাঙালী সাহেব। লোহার কারবারে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন, ফলে ছাদ ফুটা হইয়া স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল—এখন তিনি রাজকোষের গভর্নর। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ও বল-নৃত্যের সুবর্ণযোগে গভর্নর-সুত সামান্য চেষ্টাতেই ফিয়াঁসের পদে অভিষিক্ত হইতে সমর্থ হন। ইহা মিস ডসের তৃতীয় বার পাকা-দেখার ইতিহাস।

মিস ডাট ললিতা সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, মিস ললিতা একজন ধুতি-পরা বাবুকে লইয়া আসিয়াছেন। খবরটা উৎকট নোংরা গন্ধের ঝাঁঝযুক্ত মনে হইল। মিসেস রায় বিপন্না হইয়াই বলিলেন, এখন উপায়?

মিস ডাট বলিলেন, উপায় আর কি আছে, এখন চেষ্টা ক'রে ভদ্র হও, আমি তো ব'লেই ছিলাম—শি টেক্‌স দি ল ইন হার ওন হ্যাণ্ড্‌স। এই লোকটা নিশ্চয় সেই বয়-ফ্রেণ্ড। ফ্লার্টিং একটা ফাইন আর্ট, তাই ব'লে ঐ লোকটার সঙ্গে! ধুতি-পরা প্রিমিটিভ বাঙালী জমিদার,

এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, মিস ললিতা একজন ধুতি-পরা বাবুকে লইয়া আসিয়াছেন

হোম এডুকেশন নেই, স্টুপিড্‌লি ডাল, এটা একেবারে বাড়াবাড়ি ইফ নট অ্যাব্‌সার্ড।

ললিতার বয়-ফ্রেণ্ডের কথা শুনিয়া মিস বোনার্জি উসখুস করিতেছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, ললিতা কখনও গোলমেলে জিনিস বাছে না। এই কারণেই মিস বোনার্জি ললিতাকে বিশেষ করিতেন। বয়-ফ্রেণ্ড দেখিবার আগ্রহে তাঁহার মালপোয়া খাওয়া বন্ধ হইল। প্লেটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আঁতকাইয়া উঠিলেন। ওমা, এ যে মালপো! ছি, একটা ফিঙ্গার-বোল দিতে বল।

ফিঙ্গার-বোল আবার নিষ্ঠাবান চায়ের আসরে আসা নিষিদ্ধ। এত বড় অনাচারের কথা মিস বোনার্জি উচ্চারণ করিলেন কেমন করিয়া, তাহা ভাবাও মিসেস রায়ের পক্ষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সব দিক তাড়াতাড়ি সামলাইতে গিয়া মিসেস রায় বলিয়া ফেলিলেন, তা হোক, তবু দাও মিস বোনার্জি আপত্তি জানাইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, ললিতা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়াই বলিতেছে, হিয়ার আই অ্যাম, বড্ড দেরি হয়ে গেল—আই অ্যাম ফ্রাইটফুলি সরি; মিট মাই ফ্রেণ্ড—মিস্টার মিস্টার—কার্স মাই মেমারি—ও ইয়েস, পেয়েছি, মিস্টার ডেবেন্দ্র—আই হোপ আই অ্যাম করেক্ট।

মিস ডাট বলিলেন, বন্ধুর নাম ভোলাটা এই কি তোমার প্রথম কাজ?

দেবেন্দ্রকে দেখিয়া মিস বোনার্জি তাঁহার পেটেণ্ট শাড়ির সুতাটি বাম হস্তে টান মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়াদের পানের বটুয়ার মত কাপড়ের ভাঁজগুলি যথাযথভাবে স্তরে স্তরে পড়িয়া গেল। কাপড়টি আসলে ফরাসী ফ্যাশানে তৈয়ারি, খাস ইংরেজ দরজী সেলাই করিয়া দিয়াছে। সাহেবরা জানে, কোন্‌খানে কি রকম খাঁজ পড়িলে ফিগারের আকর্ষণ-শক্তি প্রখর হইয়া উঠে। গঠনের গোলমেলে রেখা চাপিয়া মারিতে হইলে সাহেবী শাড়ি পরা ছাড়া উপায় নাই। মিস বোনার্জি এ যুক্তি মানিতেন।

"প্রস্তুত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অন্তর দুলিয়া উঠিল। পুলক যেন ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

পুরুষের যৌবন সবে তখন স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নবাগত গুম্ফের রেখা যেন সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে হালকা রঙ দিয়া আঁকা। নিটোল গোলাপখাস আমের মত গণ্ড, কোথাও মন-দমানো খাঁজ পড়ে নাই, গৌরবর্ণের উত্তাপ পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি ভেদ করিয়া ছাই-চাপা আগুনের মত বাহির হইয়া আসিতেছে, দীর্ঘ ঋজু দেহ। আভিজাত্যের পরশ যেন সর্ব্ব শরীর ঘিরিয়া আছে। ধূলিলুণ্ঠিত কোঁচানো কাপড়ের শেষাংশ ফুলের পাপড়ির মত মাটিতে বিছানো। বোনার্জি সব কিছুর ভিতরই বৈশিষ্ট্য দেখিলেন।

বিরাট তাকিয়া জোর করিয়া ছোট্ট চেয়ারে ঠাসিয়া দিলে যে অবস্থা হয়, মিস বোনার্জি সেই ভাবে বসিয়া ছিলেন। মাংসের বাহুল্য যেখানে ফাঁক পাইয়াছে, সেইখানেই নির্ব্বিঘ্নে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিশেষ চেষ্টার পর কোন প্রকারে ডাচ বার্গোমাস্টার চেয়ার হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বাগ্রে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। গৃহকর্ত্রী যথারীতি শিষ্টাচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই 'হাউ ডু ইউ ডু' কথাটা শোনা গেল বোনার্জির মুখ হইতে; সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ফানুসের আকারে প্রায় ফাঁপা হাতটা কথাকলি নাচের অনুকরণে ঝুলাইয়া করমর্দ্দন করিলেন। তাঁহার আগ্রহ শুধু একটু ছোঁওয়া লাগানোর জন্য, রসাল হাতটা তখন যে পূর্ব্বাবস্থায় ছিল, তাহা স্মরণ করিবার সময় ছিল না। দেহ মন তখন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, সব দিক খেয়াল রাখা তখন সম্ভব নয়। রসের সংস্পর্শে ভদ্রলোকের হাতও রসাল হইয়া উঠিল। বোনার্জির খর্ব্বাকৃতি দেবেন্দ্রের সামনে তখন বামনাকার ধারণ করিয়াছিল, তথাপি ললিতার মত গ্রীবা ঈষৎ পাশ ফিরাইয়া লীলায়িত ভঙ্গি আনিবার চেষ্টা করিলেন। গ্রীবা বঙ্কিম ভাব ধারণ করিল কি না ঠিক নজরে পড়িল না, তবে গলার নীচে একরাশ গলকম্বল স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। উচ্চারণে দরদ ঢালিয়া বলিলেন, আপনার কথা ললিতার কাছে প্রায় শুনি, আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম, কিন্তু ও এমন জেলাস যে—

ললিতা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, ডার্লিং, ইউ ডোণ্ট মীন ইট, ইউ নো আমি অ্যাবাভ ইওর ওরিয়েণ্টাল জেলাসি। তাহার

পর তুলি দিয়া আঁকা কৃত্রিম ভ্রূ এমন একটি স্থানে ঠেলিয়া তুলিল, যাহার ইঙ্গিত বোনার্জির নিকট গোপন থাকিল না। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি দেবেন্দ্রকে পাশে বসাইলেন।

আমি অ্যাবাভ ইওর ওরিয়েণ্টাল জেলাসি

প্রায় তরল মাংসপিণ্ডের অত্যন্ত ঘনীভূত চাপে দেবেন্দ্র অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সাক্ষী রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই ধরনের বেপরোয়া

আলাপ জীবনে কখনও সে অভ্যাস করে নাই। যতই দেবেন্দ্র একটা ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টা করে, ততই বোনার্জি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আরও নিকটে আসে। দেবেন্দ্র ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে ডান হাত রসসিক্ত হওয়ায় তাহার ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে। ফোড়া ফাটার পর ডাক্তারী প্রথায় হাতটি আলাদা না রাখিয়া উপায় ছিল না।

বোনার্জি এতক্ষণ কেবল সাইকলজির ভাইটাল সঙ্গমের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কোন প্রকারে একটা ডিনারের নিমন্ত্রণে রাজি করাইতে পারিলেই রাত্রে পাশাপাশি বসিয়া সিনেমা দেখা রোধ করে কে? এবং সেখানে মাথা ধরাইতে পারিলে দেবেন্দ্রের স্কন্ধ তো আছেই।

দেবেন্দ্রের দুরবস্থা সকলের পক্ষে বেশ কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। বোনার্জির অধ্যবসায়কে কেহ দমাইতে পারে নাই। সুতরাং ঘটনা গাঢ় হইবার অপেক্ষায় সকলে উন্মুখ হইয়া রহিলেন।

তিনি অনর্গল একতরফা কথা বলিয়া চলিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার কথা আধ-আধ হইয়া আসিতে লাগিল। জিহ্বার সাহায্যে প্রতিনিয়ত ওষ্ঠে হাই লাইট ফেলিয়া প্রত্যেকটি শব্দ রসাল করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই শুভ মুহূর্তটির জন্য মিস ডাট ওত পাতিয়া ছিলেন। উচ্চ হাসিতে সকলকে সজাগ করিয়া বলিলেন, নাউ লিলি ইজ ইন্‌স্‌পায়ার্ড (লিলি ওরফে বোনার্জি), তাহার পর দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, পুওর মিঃ দেবেন্দ্র; লিলি ডার্লিং, আর এগিও না—

বাধা পড়িল। বেয়ারা জানাইয়া গেল, মিস ডস ও তাঁহার ফিয়াঁসে আসিতেছেন।

পর্দা সরাইতেই চোখে চোখে ইঙ্গিত হইয়া গেল, লিলি ইজ বিজি। লিলি যখন বিজনেস করে, তখন বাধা দিতে কেহ সাহস পায় না।

লিলি তখন দেবেন্দ্রের হাতটা নিজের জানুর উপর রাখিয়া নানা ভাবে সামুদ্রিক গবেষণায় ব্যস্ত। আঙুলের ডগা ও তালুর মধ্যস্থল টিপিয়া টিপিয়া অতীত সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা যে বলেন নাই, তাহা

শনিবারের চিঠি

নয়; তবে দেবেন্দ্র কিছু উত্তর দেয় নাই। হাতের তালুর সহিত উপর-হস্তের শিরারও নাকি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং পাঞ্জাবির হাতা গুটাইয়া উপর-হস্তের অনুভূতিও প্রয়োজন হইয়াছিল। মালপোয়ার রস তখন শুকাইয়া শিরীষের আঠার মত চটচটে হইয়া গিয়াছে। দুই হস্তের টিপুনি ও তৎসহ রসের আঠা দেবেন্দ্রকে কি ভাবে অভিভূত করিতেছিল, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়।

মিস ডসের প্রথমটা কোঁচা দেখিয়া নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ দুলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোঁচার মালিক ফ্যাশানের দুর্দান্ত প্রতাপকেও অবহেলায় পরাস্ত করিল। তিনি রস-মাখা হাতটার পাশে চেয়ার টানিয়া বসিলেন। তাহার পর হাঁটু দুইটাকে একত্রিত করিয়া সসার রাখিলেন। দেবেন্দ্রের ভীত দৃষ্টি হইতে মনে হইল, চায়ের কাপটা পড়ে বুঝিবা। দুই চুমুক খাইয়াই ডস চায়ের কাপটা পাশের বাঁটকুল টেবিলে রাখিয়া দিলেন, তাহার পর চেয়ার টানিয়া রস-মাখা হাতটার পাশে বসিলেন।

তাঁহার প্রসাধনে বিঁড়ার বালাই ছিল না। শহরের বিশেষ অঞ্চলের মাইরি-ছেলেদের অনুকরণে পিছন দিককার চুল একেবারে ক্ষৌরকার্য্য করা হইয়াছে। এই কায়দায় কেশ-বিন্যাসকে নাকি শিঙ্গল বলে।

পাশে বসিয়াই বলিলেন, হাউ ইন্টারেস্টিং! লেট মি একজামিন দি আদার পাম। হাতটার যেন কোন স্বত্বাধিকারী নাই। তালু পরীক্ষা করিতে গিয়া রসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। অনুপযুক্ত পাত্র হইলে হয়তো কোন অছিলায় হাত ধুইবার গোপন ঘরটির সন্ধান লইতেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আঠা মনের সহিতও একটি জমাট সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছিল। ত্রুটি নগণ্য—এ দিকটায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হস্তরেখার গভীর অর্থ বাহির করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইলেন।

ভাগাড়ে গরু পড়িলে শকুনি অথবা শৃগাল যে ভাবে মাংস ছিঁড়িয়া খায়, মানুষ-গৃধিনী সেই ভাবে জীবন্ত নরমাংস লইয়া টানাটানি লাগাইয়াছে। এক দিকে লিলি, অপর দিকে ডস। ক্ষুধার্ত্তের মাঝে খাদ্য পড়িয়াছে। সমভাগের প্রশ্ন উঠিবার ফাঁক নাই; যে যতটা পারে, নিজের অংশে বেশি লইবার চেষ্টা করিতেছে।

দেবেন্দ্র কাতর ও কৃপার্থী হইয়া ললিতার দিকে তাকাইল, যদি সে উদ্ধার করে। ললিতা তখন ডসের ফিয়াঁসে সহ একটি নিরিবিল কোণ লইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কেমন একটা মাখামাখি ভাব।

ললিতা কখনও তো দেবেন্দ্রের সহিত এত গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায় নাই; দেবেন্দ্র জানিত, তাহার প্রকৃতি শান্ত ও ধীর, এরূপ তো ইতিপূর্ব্বে সে দেখে নাই। দেশী বিশেষ্যের গুণকীর্ত্তন করিতে অযথা বিলাতী বিশেষণের শ্রাদ্ধক্রিয়াও ললিতার মুখে কেমন বেমানান লাগিতেছিল; দেবেন্দ্র ললিতা সম্বন্ধে আর ভাবিতে পারিল না।

ডসের ফিয়াঁসে হস্তস্থ টেনিস-র‍্যাকেটটি ঘরের ভিতর হঠাৎ চরকি-বাজির মত ঘুরাইতেই দেবেন্দ্রের দৃষ্টি তাঁহার পোশাকের দিকে আকৃষ্ট হইল। অদ্ভুত বেশ। কাঠবিড়ালীর চামড়ার মত ডোরা-কাটা বিচিত্র রঙের কোট, নিম্ন অঙ্গে সাদা ফ্ল্যানেলের পাৎলুন, শ্রীচরণের পাদুকার রঙ আরও সাদা—বিধবা যেন বিলাসে বাহির হইয়াছে,—চড়কের সময় উপযুক্ত দলে ঢুকিয়া পড়িলে সঙ বলিয়া ভ্রম হয়।

অকারণে ললিতা হাসিতে হাসিতে ফিয়াঁসের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। হাসির কি উগ্র প্রকাশ! তাহার পর ভদ্রলোকের মাথাটায় এমন ভাবেই ঝাঁকুনি দিল যে, চুলের পারিপাট্য একেবারে তছনছ হইয়া গেল। ললিতার দেহে ভার ছিল—ফিয়াঁসে টাল সামলাইতে না পারিয়া পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ললিতা থামে নাই, সেও একটি চেয়ার টানিয়া পাশে বসিল, তাহার পর চুলকেলি দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়াইয়া দিল। ভদ্রলোক যতই চুল যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে, ততই ললিতা তাহা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

দেবেন্দ্রের অনভ্যস্ত মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সে দেখিতেছিল, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে ঘরোয়া ভাব কিছুমাত্র নাই, যেন সকলে ভিড় করিয়া বাগান-বাড়িতে স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়াছে। যেখানে নির্লজ্জ আচরণের জন্য কেহ কাহাকেও দায়ী করে না, ব্যভিচারই সেখানে একমাত্র কৌতুকের বস্তু।

চা শেষ হইতেই বেয়ারা সিগার ও সিগারেট লইয়া আসিল। ভ্যানিটি কেস হইতে একটি কারুকার্য্যখচিত হস্তীদন্তের লম্বা চোঙা

বাহির করিয়া ডস তাহাতে ততোধিক লম্বা সিগারেট সংযোজিত করিলেন। দেবেন্দ্র অবাক হইয়া দেখিতেছিল। বিস্মিত ভাব কাটিবার পূর্ব্বেই ডস পুরুষের উপযুক্ত একটি সিগারেট দেবেন্দ্রের হাতে গুঁজিয়া দিলেন। দেবেন্দ্র জীবনে কখনও ধূমপান করে নাই। প্রথমটা প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন চালের দীক্ষা তাহাকে নিরস্ত করিল। মিস ডস চোঙা মুখে লাগাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন দেবেন্দ্র তাঁহার মুখাগ্নি করিয়া দিবে বলিয়া, সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরুষের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু দেবেন্দ্র নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। অগত্যা মহিলা নিজেই নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। দেবেন্দ্রের বিচিত্র আচরণে ডস কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিলেন, অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন, ও, আপনি সিগারেট খান না বুঝি? হাউ স্ট্রেঞ্জ!

ডস যে ভাবে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে লিলির মন দমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন, উনি যখন খান না, তখন প্রেস করা উচিত নয়। লিলির ভাষায় দরদের উচ্ছ্বাস ডসকে আশঙ্কান্বিত করিয়া তুলিল। সামান্য অসতর্কতায় জিতের দিকটা সন্দেহজনক হইয়া পড়িতে পারে। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাহার পর কাপড় সংযত করিয়া বসিলেন।

দেবেন্দ্রের মত আনাড়ীকে জখম করিবার মত অস্ত্র তাঁহার ছিল। শাড়ির নূতন ভাঁজ যেন পুরাতন অস্ত্রকে শাণিত করিয়া দিল। ক্রেপ-ডি-সিনের রেশম তখন দেহের মারাত্মক গঠনগুলিকে নিবিড়ভাবে ঘিরিয়াছে। উত্তেজক রেখাগুলি অস্পষ্টতা এড়াইয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বক্ষের গুপ্ত বক্রাকার গখুরার মত ফণা বিস্তার করিয়া দংশনোন্মুখ হইয়া আছে।

লিলি বুঝিল, ব্যাপার সুবিধার নয়, ডসের সঙ্কল্প আজ অত্যন্ত দৃঢ়। তাহার পর মনকে স্তোক দিল, দেবেন্দ্র এমনই কি অপরূপ! অত হ্যাংলামি তাহার পোষায় না। 'এক্সকিউজ মি' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। গমনকালীন তাহার দীর্ঘনিশ্বাস উভয়েই শুনিয়াছিল, কেহই তাহাতে বিচলিত হয় নাই।

লিলি এমনটি করিবে, কেহ ভাবিতে পারেন নাই। ডালকুত্তা লেলাইয়া দিয়া ধাবমান শিকার দেখিয়া হিংস্রপ্রকৃতি দর্শকের দল যে আনন্দ পায়, নিমন্ত্রিতদের ভিতর অনেকেই ঘটনাগুলি সেই ভাবে উপভোগ করিতেছিলেন। লিলি রণে ভঙ্গ দেওয়ায় অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া শহরকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর তীব্র ঝলক পর্দা অতিক্রম করিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। ড্রইং-রুমের প্রতি কোণে দেওয়াল-ছিটকাইয়া আলো আসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুষ্ট আবছায়ার আবশ্যকতা দেবেন্দ্র তেমন সুবিধার বোধ করিতেছিল না। জানালার দিকে সরিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই অনুভব করিল, তাহার হাত আবদ্ধ। ডস তালুর তলায় অদ্ভুত টিপুনি দিয়া যেন অনুরোধ জানাইতেছেন, অত আলো ভাল নয়। তর্জ্জনীর মৃদু সংঘর্ষণে হয়তো কোন সঙ্কেত ছিল, দেবেন্দ্র তাহা বুঝিল না।

অপর দিকে ললিতার চুলকেলি ডস তেমন সহজভাবে লইতে পারিতেছিলেন না। তথাপি সামাজিক রীতি মানিতে হইলে, উহা অগ্রাহ্য না করিয়াও উপায় নাই, কারণ সভ্যতার যে স্তরটি তাহার অধিকারভুক্ত, সেখানে সন্দেহের স্থান নাই, অন্তরের বেদনাকে অকারণ চাপিয়া নিজের সান্ত্বনা সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রিয়ের পরকীয়া প্রেমালাপ প্রত্যক্ষ দর্শনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়, তাহা বৃশ্চিকদংশন অপেক্ষা কম নয়। ডস অন্তর্দ্দাহে ভস্মীভূত হইতেছিলেন, কিন্তু বাহিরে তাহার উত্তাপ ছিল না।

হরিজনদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে কলতলায় সন্দেহঘটিত ব্যাপারে যে কলহের সূচনা হইয়া থাকে, তাহারই মার্জ্জিত ও মেকানাইজ্‌ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ড্রইং-রুমের সজ্জিত কামরায়। এখানে সব কিছুই সায়ান্টিফিক।

তখন চায়ের পালা শেষ হইয়াছে, সুরার পালা সুরু। বেয়ারা চক্রযুক্ত চলমান পীঠিকায় মদের সরঞ্জাম লইয়া ঘরে ঢুকিল। পানীয়

ও পাত্রগুলির আকার বিচিত্র। নির্দ্দিষ্ট পাত্রে উপযুক্ত সুরা ব্যবহার না করিলে নাকি তাহার জাতিগত স্বাদ নষ্ট হয়।

ডস নিজের জন্য শেরি লইয়া দেবেন্দ্রের জন্য বেয়ারাকে হুইস্কি ঢালিতে বলিলেন।

মদ ঢালায় কতকটা সামরিক প্রথা মানা হয়—মার্চের মত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত থামিতে না বলা হয়, ততক্ষণ মদ ঢালিয়া যাওয়া নিয়ম। বেয়ারা ঢালিতে ঢালিতে দুই বার দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইল, পাত্র তখন পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

ডস আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সে হোয়েন? দেবেন্দ্র ইহার অর্থ বুঝিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। ডস হাসিয়া ফেলিলেন, হাসির পিছনে কৃপা লুক্কায়িত ছিল। তাহার পর প্রশংসার খোলস চাপাইয়া বলিলেন, হাউ ইনোসেণ্ট ইউ আর! প্লীজ অ্যাড মোর সোডা। দেবেন্দ্র অকারণ হাসির অর্থ বুঝিল না এবং কেনই বা সোডা বেশি করিয়া লইতে হইবে, তাহার কারণও খুঁজিয়া পাইল না। ডস ইতিমধ্যে নিজের পাত্র উর্দ্ধে উঠাইয়া বলিলেন, টু ইওর হেল্‌থ।

আরতির প্রথায় মদ্যপাত্র ধরায় দেবেন্দ্র অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকেও স্বাস্থ্য পান করিবার জন্য গেলাস উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে, তাহা সে জানিত না।

একটা কিছু ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া মাথা নীচু করিয়া হস্তস্থ সিগারেটটি ঘুরাইতে লাগিল। যুবতীর জড়িত ভাষায় সুরার প্রভাব না থাকিলেও তাহার অবর্ণনীয় সম্মোহিনী শক্তি দেবেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছিল। ডস হঠাৎ একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকিয়া কি ভাবে সিগারেট ধরাইতে হয় দেখাইয়া দিলেন। মাংসচূড়ার স্পর্শে বৈদ্যুতিক ঝাঁকুনি ছিল—দেবেন্দ্র হৃৎকম্পনের সহিত উত্তেজনার নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিল। সরিয়া বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু নড়িল না।

সুরার তীব্র গন্ধ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তানকে প্রলুব্ধ করে নাই, তথাপি উহা হাতেই রাখিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ধূম উদ্গীরণ করিতে গিয়া বহুবার কাসিয়া ফেলিয়াছে। সে একটা দৃশ্য হইয়াছিল—দর্শকের দল

সার্কাসে ক্লাউনের খেলা দেখিয়া যে আনন্দ পান, সেই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়াছিলেন অব্যবসায়ীর ধূমপানের চেষ্টায়। ডস বলিলেন, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ড্রিঙ্ক? দেবেন্দ্র লক্ষ্য করিল, গেলাস তাহার হাতেই রহিয়া গিয়াছে।

দেবেন্দ্র বুঝিয়াছিল, এ সমাজে তাহার স্থান নাই, অথচ বাহির হইবার পথও বন্ধ, কারণ সভা ভঙ্গ না হইলে ললিতা উঠিবে না। ললিতা তাহারই গাড়িতে আসিয়াছে এবং বাড়ি পৌছাইয়া দিবার ভার তাহারই উপর। ধূমপানের ঘটনা স্মরণ হওয়ায় দেবেন্দ্রের আত্মাভিমান খর্ব্ব হইতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, এখন তাহার অনভিজ্ঞতা আড়াল না দিলে চলে। সুরার কথা উঠিতেই সে এক নিশ্বাসে প্রায় সবটা শেষ করিয়া ফেলিল। শরবতের মত সুরার ব্যবহার সব সমাজে চলন নাই। দেবেন্দ্রের কীর্ত্তি দেখিয়া ডস স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, শূন্য গেলাস দেখিয়া বেয়ারাকে আবার চলমান টেবিলটি লইয়া আসিতে বলিলেন।

দেবেন্দ্র পেগ-স্ট্যাণ্ডে গেলাস রাখিয়া একবার বুকে হাত দিল।

সুরার দাহক্রিয়া সুরু হইয়াছে। অনলের তরলাকৃতি তখন স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। অল্প সময়ের ভিতরই অগ্নি-শিখার তাপ বাহিরে আসিয়া পড়িল। কর্ণ ও গণ্ড তখন তপ্ত লৌহের মত রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু আরক্ত। পাতলা ঠোঁট দুইটির নিরীহ ধনুকাকার রেখা অস্বাভাবিকভাবে দৃঢ় ও সরল রেখায় পরিণত হইতেছিল। সে ঝড় উঠিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা, যে কোন সময় প্রবল আলোড়নে নীতিস্তম্ভগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

চরিত্রের যে দিকটা সে এযাবৎকাল পূজা করিয়া আসিয়াছে, সুরার কশাঘাতে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে লজ্জা ও সঙ্কোচের পর্দ্দা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রের মন এখন এমন একটি ধাপে নামিয়া পড়িয়াছে, যাহা সহজ অবস্থায় ভাবা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

গেলাস পুনরায় পূর্ণ হইয়াছিল, দেবেন্দ্র পাত্রটি নিতান্ত অবহেলার সহিত ধরিল; সুরা তাহাকে গ্রাস করিতে চায়; গন্ধে তাহার আপত্তি নাই। গেলাস ধরিতে গিয়া হাতের চঞ্চলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল—

ইহা লক্ষ্য করিয়া ডস সর্ব্বদেহ দিয়া দেবেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিলেন। বিশেষ প্রথায় অনুরোধ উভয়ের দেহকে গাঢ়ভাবে সন্নিহিত করিয়া ফেলিল। ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তন দেবেন্দ্রের মনকে এমন একটি স্তরে লইয়া ফেলিয়াছিল, যেখানে সে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কথাও মাঝে মাঝে জড়াইয়া আসিতেছিল এবং যাহা বলিতে চায়, তাহা বলা হইতেছিল না—অবান্তর আলোচনায় সচেতন হইয়া উঠিলেও, তাহা ক্ষণিকের জন্য।

দেবেন্দ্র অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পাত্রটি পূর্ব্ববৎ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

যে ভীরু লালসা নীতির আজ্ঞা চিরকাল বিনা দ্বিরুক্তিতে পালন করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা সুরার প্রলেপে তেজীয়ান—প্রতি অঙ্গে ডসের স্পর্শ দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। লিলির অনুকরণে দেবেন্দ্র ডসের নিটোল বাহুতে হস্তরেখা দেখিতে পাইল। দৃষ্টিতে তাহার স্পর্শানুভূতি ছিল। ডস বলিলেন, হাউ ইন্টারেস্টিং! ইউ এ পামিস্ট? দেবেন্দ্র উত্তর করিল, না। ইওর আর্ম—ইট হ্যাজ চার্মিং কণ্টুর্স। আই শুড সে, দে আর ডিলিশাস!

দেবেন্দ্রের ইংরেজী উচ্চারণ এখন খাস সাহেবী ধরনের হইয়া গিয়াছে।

ডস বলিলেন, ইউ হ্যাভ ভেরি কারেক্ট আক্সেন্ট। বীন টু লণ্ডন?

দেবেন্দ্র বিদেশী ভাষায় জানাইয়া দিল, সে বিলাতে যায় নাই এবং তাহার উচ্চারণের জন্য দায়ী তাহার সাহেব প্রাইভেট টিউটার। কথা বলিতে বলিতে কখন নিজের অজ্ঞাতে বাহুটি তাহার প্রশস্ত বক্ষের উপর আনিয়া ফেলিয়াছিল। ঘটনাটি ঘটিল অপরের দৃষ্টির আড়ালে—আলো-আঁধারি ও দেবেন্দ্রের ঝুঁকিয়া থাকার জন্য।

এতটা গড়াইবে ডস অনুমান করিতে পারেন নাই, হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই দেবেন্দ্র আরও ঝুঁকিয়া দেহের দ্বারা নিবেদন জানাইল, তা হয় না। ডস উপলব্ধি করিলেন, ব্যাপারটি রসিকতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ আগে দেবেন্দ্র যে কারণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, এখন সেই কারণই ভীতিপ্রদ।

পুরুষের দৈহিক শক্তি অবহেলা করিবার উপায় নাই, অথচ অন্য নিমন্ত্রিতেরা দেখিলেই বা কি বলিবে? ডস আর একবার নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া বেশ রুক্ষ স্বরেই বলিলেন, ব্রুট!

দেবেন্দ্র খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, আই উড টেক ইট অ্যাজ এ কম্‌প্লিমেণ্ট।—বলিয়া ডসের দিকে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তাকাইয়া রহিল। নিতান্ত অসহায়ার মত কাতর মিনতিপূর্ণ ভাষা উচ্চারিত হইল, ডার্লিং, লক্ষ্মীটি, দেখছেন না, ললিতা আমাদের আড়-চোখে কি রকম ওয়াচ করছে?

দেবেন্দ্র জোর দিয়াই উচ্চারণ করিল, লেট হার ওয়াচ উইথ দি সাইট অব এ ভাল্‌চার। ব্রুট্‌স নেভার স্টিক টু ওয়ান ফিমেল, জাস্ট অ্যাজ ভাল্‌চার্‌স নেভার ডিস্ট্রিবিউট দেয়ার শেয়ার্স অব প্রে ফ্রীলি।

স্বল্পভাষী বাচাল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ কি—ডস জানিতেন। তিনি অত্যন্ত জড়সড় হইয়া পড়িলেন। দৈব দুর্ঘটনা অথবা কোনও রসিকের অদম্য কৌতূহল হেতু ঘরের বাতি হঠাৎ নিবিয়া গেল। গৃহকর্ত্রী 'বয়, বাত্তি! বয়, বাত্তি!' বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্ধকারের ভিতর ললিতার অস্পষ্ট হাসি ও তৎসহ জড়িত ভাষায়, 'ও ডার্লিং, লীভ মি অ্যালোন' অকস্মাৎ দেবেন্দ্রের কর্ণকুহরে কুঠারের মত আঘাত করিল।

দেবেন্দ্রের মন তখন বারুদপূর্ণ কামানের মত হইয়া ছিল, কুঠারের কঠোর আঘাতে তাহার বিস্ফোরণ ঘটিল।

মিস্ত্রী আসিয়া ঘরটি পুনরায় আলোকিত করিয়া দিয়াছে।

দেবেন্দ্র তখন একা। দুই হস্তে দৃঢ়ভাবে মুখ ঢাকিয়া নিজের অধোগতির কথা ভাবিতেছে। চারিত্রিক আদর্শের উদাহরণ হইতে এখন সে বিচ্যুত, কলঙ্কের ছাপ তখন তাহার ওষ্ঠে সুস্পষ্ট আকার লইয়া রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের ঘটনা। পালিশের উদ্ভাবক যে সূত্রটি ধরাইয়া দিল, ভোঁতা তাহারই নব রূপ আবিষ্কারে সারাটা জীবন ঘুরিয়াছে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের জাতীয় জীবন-সঙ্কট

ফরাসী-ভাষাভাষী একজন বেলজিয়ান রোমান কাথলিক ফাদারকে কিছুকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনায় সামান্য সাহায্য করিয়াছিলাম; তিনি তখন মাত্র দুই বৎসর এ দেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যেই আমাদের ভাষা আশ্চর্য্য রকম আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষায় এরূপ প্রতিভা কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার পর বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি কাসিয়াঙে সেণ্ট মেরী'জ্ কলেজে শিক্ষা-ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে স্বহস্তে একটি স্বরচিত পত্র লিখিয়াছিলেন। বাংলা দেশের সমস্যা একজন নিরপেক্ষ বৈদেশিক ব্যক্তির নিকট কি ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহা জানিতে পারিলে আমাদের উপকার হইতে পারে বিবেচনায় উক্ত পত্রটি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি।

'শনিবারের চিঠি' পাইয়া অত্যন্ত খুশি হইলাম। আশ্বিন সংখ্যার প্রবন্ধটী "জাতীয় জীবন-সঙ্কট" আমার বিশেষ ভাবে ভাল লাগিল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের যে অবস্থা আজকাল বাংলার প্রায় সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা অনেকটা লোপ পাইয়া আসিতেছে—ফরাসীর মতন বাঙ্গালীও সব ক্ষেত্রে চরমপন্থী না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই ধর্ম্মের উপর যখন আস্থা ও শ্রদ্ধা আর থাকে না, ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই বাঙ্গালী চেষ্টাবান হইবেই হইবে! বাঙ্গালী যে ইংরেজের মত মাঝমাঝি পথের লোক নহে। ইংরেজের সেই মনের আবেগ ও ভাবপরায়ণতা নাই—ইংরেজের মনে ধর্ম্ম-বিশ্বাস নষ্ট হইলেও তাহার আচরণে ধর্ম্ম-বিরোধ বড় একটা দেখা যাইবে না। স্বার্থপর হইতে পারে, ক্ষুদ্রমনা ও বিলাসী হইতে পারে, কিন্তু ভালর দিকে যেমন বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখায় না, তেমনিও মন্দর দিকে দেখায় না। ফরাসী যদি একবারে সাধুত্ব লাভ না করে, তবে মাঝখানে না থাকিয়া সব কিছু উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মের শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়া যাইবে। আপনি কি এই কথা শুনিয়া খুবই রাগ করিলেন? মনে হয় যে, বাঙ্গালী ফরাসীর সমান অ-নে-ক ভাবেই। স্বভাবতঃ আমি ফরাসীদের খুবই ভালবাসি, ইংরেজদের সেই 'অত্যন্তং সর্ব্বং গর্হিতম্' ভাবটা আমার আদৌ ভাল লাগে না। কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে চিন্তাও আছে—বাঙ্গালী ফরাসীর মত মাঝারি রকমের কিছু ধরিয়া সন্তুষ্ট হইবে না—মহান আদর্শের জন্য সাধনা করিবে কিংবা যাহা কিছু মহান সবই

আক্রমণ করিয়া আপনাকে নাশ করিতেও পারে। আজকাল ইংরেজী কাগজে ফ্র্যান্সের সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা যাইতেছে। ইংরেজ কখনও ফরাসীকে বুঝিতে পারিবে না। সব ইংরেজ প্রায় একই ছাঁচে ঢালা কিন্তু ফরাসীদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী বর্ত্তমান। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ও যাঁহারা ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল, সেই দুইটি শ্রেণী। এই ভীষণ যুদ্ধের পূর্ব্বকালে দ্বিতীয় শ্রেণীটা প্রবল ও প্রধান হইয়া ফ্র্যান্সের এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। মাফ করুন, আমি এই সব কথা কেন লিখিয়া ফেলিলাম।...

আপনাদের দুর্গাপূজার সময় আসন্ন। এই সময়ে আপনাদের সমাজে বন্ধু যেমন বন্ধুকে প্রীতি ও শুভকামনা জানাইয়া থাকে, তেমনি আমিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাইতে চাহিতেছি। দুর্গা দেবীর উপাসক নই—তা হইলেও এই সামাজিক পর্ব্বে জাতি ও সংস্কারের বেড়া অতিক্রম করিয়া আমরা সকলে পরস্পর মিলিতে পারি। আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। তাই ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন মিলে, তেমনি কি আমরা মিলিতে পারিব না? আপনাদের সহিত আমিও বাংলার সত্যকার উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। তিনিই বাংলাকে মহান ও আনন্দিত করিয়া তুলিবেন।...

তিন বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালীর মন ও বাঙ্গালা সমাজ ঠিক বুঝিয়াছি, সেই দাবি আমি করি না। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী আপন দেশ ও আপন দেশবাসীর মত আমার প্রিয় হইয়াছে, এইমাত্র বলিতে পারি।

আমাদের কোনও কোনও পাঠক পত্রটিকে অবান্তর মনে করিতে পারেন। তাঁহারা একটু অবহিত হইয়া পড়িলেই বুঝিবেন, লেখক যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার অনেকখানিই ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে, ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই। ইংরেজ-চরিত্রের উল্লেখ করিয়া ও ফরাসীদের সহিত বাঙালীর তুলনা করিয়া তিনি যাহা বলিতেছেন, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সে সম্বন্ধে অবহিত হইলে কল্যাণ হইবে। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। শুনিতে পাই, 'আজাদ'-সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন—ঘড়ির পেণ্ডুলামের এক প্রান্ত। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে অবাধে হিন্দু-বধ যজ্ঞ চলিতেছে। এই পৈশাচিকতা নিবারণকল্পে রাষ্ট্রপতি আজাদ সেখানে গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত 'আজাদে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য যে কোনও সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করিবার মত! আজাদ বলিতেছেন—

"মওলানা আজাদ করাচীতে গিয়াছেন সিন্ধুদেশের অশান্তি দূর করিতে! সেই প্রবচনটি মনে পড়িতেছে 'হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেক বলে কত জল?' অবশেষে

মওলানা আজাদ কিনা সিন্ধুর অশান্তি দূর করিবেন—যে মওলানাকে ভারতীয় মুছলমান এক কানাকড়ির বিশ্বাসও করে না।...সিন্ধুর মুছলমানরা কোন্ দুঃখে তাঁহার কথা শুনিতে যাইবে? এ দুরাশাই বা তাঁর কী করিয়া হইল?"

সিন্ধুর এই সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতা আকরাম খাঁ সাহেবের চিন্তার বিষয়ই নয়, রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদের সদিচ্ছারূপ স্পর্দ্ধায় তিনি বিচলিত হইয়াছেন! পেণ্ডুলামের আর এক প্রান্ত! বাংলা দেশের রাষ্ট্রে সাহিত্যে ও সমাজে এই ক্রান্তিবাদ প্রত্যহ চরমভাবে দেখা দিতেছে। এই অতি-ভাবালুতাকে পত্রলেখক নিন্দা করেন নাই; কিন্তু বিপরীতের দিকে, ধ্বংসের দিকে আমাদের প্রবণতা দৃষ্টে তিনি শঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ আছে কি না, নেতারা বিবেচনা করিবেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা যুদ্ধের মাঝখানে ফ্রান্সকে যেখানে লইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু ঠিক বুঝিয়া দেখিয়াছি কি?

সিঁড়ির প্রথম ধাপের অপরাধ

সিঁড়ির প্রথম ধাপের অপরাধ, সে প্রথম ধাপ—দ্বিতীয় ধাপ নয়; পিতামহের অপরাধ, তিনি পিতার পিতা—আমার পিতা নন। সম্প্রতি বাংলা-সাহিত্যের কয়েক জন পণ্ডিত সমালোচক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম ধাপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতসমাজকে কেবল প্রথম ধাপ হওয়ার অপরাধেই নিন্দা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বক্তা শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ইঁহাদের অন্যতম। এই মনোমোহিনী মনোবৃত্তির সাইকলজিক্যাল কারণ—চিকিৎসকের অনুসন্ধানের বিষয়; আমরা কয়েকটি উপসর্গের পরিচয় দিতেছি।

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'প্রবাসী' এবং কার্ত্তিকের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় এই পণ্ডিতের বাংলা গদ্য-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাতেই লেখকের "নিরপেক্ষ" মনোবৃত্তি লক্ষ্যণীয়!

খুব বেশি দিন হয় নি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তেমন সুস্পষ্ট নয় এবং এ হেন অস্পষ্টতার ফলে এই সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব আরোপিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির উপর। কেউ কেউ বলেন যে উইলিয়ম কেরীই এই সাহিত্যের জনক, আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের

নামও কেউ কেউ এই সঙ্গে জুড়ে দেন ; কেউ বা বলেন রামমোহন রায়ই এই সাহিত্যের শৈশবে পিতার কাজ করেছেন ; আর অন্যদের মত হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সত্যিকারের স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে যাঁরা টেকচাঁদ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই সকল দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মগোপন ক'রে আছে। উপস্থিত প্রবন্ধে তাকে আবিষ্কার করার আংশিক চেষ্টা করা যাবে। বাংলা গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে রামমোহন রায়ের প্রভাব কতখানি তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

অর্থাৎ ঘোষ মহাশয় বিচার করিতে বসিয়াই রামমোহন রায়ের ব্রিফ লইয়াছেন! "নিরপেক্ষ" গবেষণার এ পদ্ধতি অভিনব বটে।

ঘোষ মহাশয়ের মতে "ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা" (১৪ খানি পুস্তক) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ রামমোহন রায়ের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও এগুলির "প্রচার ও জনপ্রিয়তা" ছিল না—এগুলির প্রভাবে বাংলা গদ্য প্রভাবান্বিত হয় নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি তিনটি —(১) উক্ত গ্রন্থমালার অধিকাংশই অনুবাদ এবং গল্প, (২) এগুলির ভাষা দুরূহ ও অপরিচিত, এবং (৩) এগুলির মূল্য অত্যন্ত অধিক হওয়াতে সাধারণের সংগ্রহের অধীন ছিল না। পক্ষান্তরে রামমোহন সরস ও সহজবোধ্য বেদান্ত বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তক লেখাতে ও বিনামূল্যে সেগুলি বিতরণ করাতে দেশে সাড়া পড়িয়া যায়। দুধ বেচিবার কালে কোনও গয়লাও এই ধরণের মিথ্যার আশ্রয় লয় না। মনোমোহন ঘোষের গোড়ার ভুল এই হইয়াছে যে, তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধির আদর্শে সেকালের পাঠক-সম্প্রদায়ের বোধশক্তির বিচার করিতেছেন। ভাষার আদর্শ যে এই দেড় শত বৎসরে অনেক বদলাইয়াছে, সে হিসাব করেন নাই। আজ তাঁহার কাছে যাহা দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতেছে, সে যুগের পড়ুয়ার কাছে তাহা দুর্ব্বোধ্য ঠেকিত না। সেকালের দলিল খত ইত্যাদি নিশ্চয়ই সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হইত, কিন্তু আজিকার দিনে আমরা কি সহজে সেগুলির মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারি? এই গেল

মতবাদের দিক দিয়া; তাঁহার অন্যান্য উক্তি যে মিথ্যা, লণ্ডের ক্যাটালগ খুলিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। "ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা"র প্রচার ও প্রভাব আজ আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। এক রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'-এরই যে কত সংস্করণ হইয়াছিল বলা কঠিন। অধিকাংশ বই-ই হাজারে হাজারে প্রচারিত হইয়াছে এবং দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বাংলা দেশের ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি, যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা দেন, সেখানেও মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও অন্যান্য ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার নির্ব্বাচিত অংশ দীর্ঘকাল পঠিত হইয়াছে। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' শুধু পাঠ্যই ছিল না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র একটি সংস্করণও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলির যত সংস্করণ ও প্রচার হইয়াছে, বিনামূল্যে বিতরণ সত্ত্বেও রামমোহনের কোনও গ্রন্থের তত প্রচার হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে রামমোহনের যে প্রচার হইয়াছে, তাহা সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে—এই প্রচারের পিছনে ভক্তের ভক্তি ছিল; সাধারণের প্রীতি ছিল না।

স্থানাভাবে এই সংখ্যায় ঘোষ-গবেষণার সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। ভাষা ব্যাপারে তিনি যে-সকল দৃষ্টান্ত তুলিয়া রামমোহনের ভাষার অধিকতর সরসতা দেখাইতে চাহিয়াছেন, সে বিষয়ে আশা করি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নজিরই যথেষ্ট হইবে। চৌধুরী মহাশয়ের মতে মৃত্যুঞ্জয়ই আধুনিক চলিত ভাষার প্রথম প্রবর্ত্তক, রামমোহন নন।

ঘোষ মহাশয় অনেক লেখাপড়া করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি পাকিতে যে দেরি হইতেছে, সম্ভবতঃ তাহার জন্য তিনি নিজে দায়ী নন।

—

সংবাদ-সাহিত্য

জোয়ান বাংলার প্রতীক "বাপের বেটা" অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের দৌলতে আমরা অনেক নয়া নয়া মজার সন্ধান হামেশাই পাইয়া থাকি। এবার পূজায় তিনি আর একটি নয়া মজা ছাড়িয়াছেন। কবিতা-সম্বলিত এক গোছা প্রচারপত্র আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এগুলিতে বিনয় সরকার কি ও কে এবং তিনি কত কত ভাষায় কত কত লাইন গদ্য ও পদ্য লিখিয়াছেন, নমুনাসহ তাহার ফিরিস্তি আছে। বাপের বেটাই বটে! ফিরিস্তি পড়িতেই আমাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, তুলনায় দিলীপকুমারের 'অনামী', 'সূর্য্যমুখী' ও 'দোলা'র সম্মিলিত ওজনকে মনে হইতেছে ভ্রূণ—গোববার ঝোপে টান মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। গোবরা বলিলাম, সরকার মহাশয় ঐদিকেই থাকেন বলিয়া; আর যে পরিমাণ তিনি লিখিয়াছেন ঝোপ তো দূরস্থান, ও অঞ্চল এতদিনে জঙ্গলে পরিণত হওয়ার কথা।

* * *

যাক, এই প্রচারপত্রে "বাঙালী"-শীর্ষক একটি কবিতা দেখিতেছি; ১৪-৯-১৯১৬ তারিখে তোকিও, জাপানে লেখা। "একদা যাহার বিজয় সেনানী," "মানুষ আমরা নহি তো মেষ" অথবা "বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি"—ইহার কাছে কোনটাই টিকিবে না। "সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করাল"ও gone! শুনুন—

বাদামী রঙের বেঁটে লোকের ঘাড়
খাড়া রাখে যেথায় ভূমণ্ডলের ঐ নগাধিরাজ,
গর্জ্জে ধরার ভীষণতম সাগর
যার পদতলে শিখাতে ভাঙাচুরার কাজ,—
কাল বৈশাখীর প্রলয়-নাচন বছর-বছর
পল্লী-শহরের উড়ায় ঘরবাড়ি যেথায়
জলে ভরা পাহাড়-ঘেরা আর গ্রীষ্ম-বর্ষায়
ভিজা-পোড়া জঙ্‌লা বাঙ্‌লা দেশ সেথায়।
মোলায়েম কল্পনায় দুর্ব্বলের সম

স্বপ্নে মাতে না যারা অতীত-ভবিষ্যের,
দারিদ্র্য যাদের সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন
শিক্ষার স্বাস্থ্যের আর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের,
পরাজয়ে ডর নাই যাদের, আশা নাই বুঝে'
তবুও কর্ত্তব্য করে দিবায়-নিশায়,
ভারতের প্রাণ এশিয়ার মান ছড়ায় যারা
আলাস্কা, তুর্কী, আফ্রিকা, ফ্রান্স, চীন, আর্জ্জেন্টিনায়
বিশ্বের জ্ঞান হজম করা, আর বাড়িয়ে দেওয়া
বিশ্বশক্তি যারা বুঝে আসল জীবন
আধ্‌পেটা-খাওয়া ডান্‌পিটে সেই বাঙালী
মোরা জন্মেছি কর্‌তে অসাধ্য সাধন।

গোপালদা বলিলেন, লে হালুয়া! আমরা আদা কুচাইতে ও ছোলা ভিজাইতে বলিলাম।

আরও আছে। কিন্তু একসঙ্গে এত মজা ছাড়িব না। যুদ্ধের বাজার, ভবিষ্যতের জন্য খোরাক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি।

* * *

মজা বলিতে মনে পড়িল, বিনয়বাবুর কোনও চ্যালা আশ্বিনের 'আর্থিক উন্নতি'তে বিনয়কুমার-প্রণীত একটি ইকোয়েশন ছাড়িয়াছেন—একেবারে অভিনব এবং অপূর্ব্ব। বঙ্কিম-শতবার্ষিকী বৎসরে বঙ্কিম সম্বন্ধে হাজারো প্রবন্ধ, কবিতা এবং কোন্ না শতাধিক বই বাহির হইয়াছে, কিন্তু কেহই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরূপ ধরিতে পারেন নাই। সরকার মহাশয় এক অঙ্কে বাজিমাৎ করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র এখন জল!

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস এম. এ., গবেষক—বঙ্গীয়-ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ লিখিতেছেন—

কঁৎ শেষ জীবনে আর একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ইহাতে তিনি একটি নবধর্ম্ম প্রচার করেন। এই নবধর্ম্ম হইতেছে মানব-সেবা। মানবতার উন্নতির জন্য মানুষের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য প্রত্যেক লোককেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করা প্রয়োজন। এই নব রীতির প্রচার ব্যতীত তাঁহার এই গ্রন্থের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বাঙ্গালী সমাজ-শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র এই কঁৎ পড়িয়াই মানুষ। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মতে

কঁৎ × গীতা = বঙ্কিমচন্দ্র

কঁৎ × গীতা = বঙ্কিমচন্দ্র! এই অঙ্কের একটি "করোলারি" বা স্বতঃসিদ্ধ দাঁড়াইতেছে এই (গোপালদার মতে)—

ফ্রয়েড ÷ ডব্লু. সি. রায় — বিনয়কুমার সরকার

কিন্তু এ স্বতঃসিদ্ধ আমরা মানিব না। আগামী বারে কবি বিনয় সরকারের "দিগ্‌বিজয়ের বেদ-বাইবেল-কোরাণ" শুনিলে গোপালদারও মত বদলাইবে, ততদিন সকলকে অপেক্ষা করিতে বলি।

—

আমাদের নরেনদা চিরকালই বড্ড সিরিয়াস, যখন যাহা করেন মহাভারতীয়-প্রস্থে সিরিয়াস্‌লি করেন। তাঁহার কবিতা ও উপন্যাস লেখার ইতিহাস আমরা জানি, "নিখিল-প্রবাহে"র ধাক্কা কম খাই নাই; সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ইতিহাস রূপ গোবর্দ্ধন 'ভারতবর্ষ' নিতান্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই ধারণ করিতে পারিয়াছে; এখন তিনি এক হাতে পাঠশালা এবং অন্য হাতে আমাদের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের ধারণ করিয়া যে কাণ্ড করিতেছেন, তাহাতে ওমরখৈয়াম ও কালিদাস একসঙ্গে লজ্জা পাইবেন! কিন্তু এসবও বাহ্য—নরেনদা আসলে ডাক্তারি পড়িতেছেন। কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষে' শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখিত "স্যার জিজিভাই ওয়াডিয়া" দ্রষ্টব্য। ডাক্তারি পড়িতেছেন বটে, কিন্তু এখনও সব উপসর্গ রোগ ও ঔষধের নাম ঠিকমত রপ্ত হয় নাই। আমাদের এক ডাক্তার-বন্ধু নরেনদার উপকারার্থ একটি তালিকা পাঠাইয়াছেন। আমরা তালিকাটি পড়িয়া দেখিলাম। ডাক্তারি শেখানো যায়, কিন্তু ইংরেজী ও উচ্চারণ শিখাইবে কে? একটু দেরি হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

নরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন ডায়োগ্‌নেসিস—Diagnosis (উচ্চারণ অভিধানে দ্রষ্টব্য)
নিয়োরটিক—Neurotic „
গায়নাকোলজিষ্ট—Gynecologist „
সীজেলীয়ান সেক্সান—Cæsarean section „
পেরিনীয়া র‍্যপচার—Rupture of the perineum „
পেশ্যাণ্ট—Patient „
টিংচার ওপিয়েট—Tincture of opium অথবা „
Tincture opii „

* * *

কিন্তু নরেনদার বিদ্যার এখানেই শেষ নয়, হবি-কাষ্ঠাসন এখনও বাকি আছে; তিনি লিখিয়াছেন—

"থিরাপিউটিক্স ইন রিলেশান টু সাইকো এ্যানালিটিক্স"

...আমি তাঁর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নই। 'ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেকসে'র কাঁটা বিঁধে গেল বুকে...

থেরাপিউটিকাল জার্নাল

ব্যাপার কি? নরেনদা কি নূতন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতেছেন? Analytics বলিতে আমরা Aristotle-এর Logic-এর বইই বুঝিয়া থাকে—সাইকো-অ্যানালিসিস কথাটা শুনিয়া থাকি বটে। "সাইকো এ্যানালিটিক্স" নরেনদার নূতন আবিষ্কার। নরেনদার অভিধানে ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স ও সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সের কোনও ভেদ নাই; আমরা Therapeutic জার্নাল জানি, নরেনদা সম্ভবত একটি থেরাপিউটিকাল জার্নাল বাহির করিবার চেষ্টায় আছেন! থাকুন।

* * *

এছাড়াও ন্যুশিয়া, ইউরীন, স্টুল, সোয়াব, ইরিটেশান, ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি, মায় ইন্‌স্যানিটি পর্য্যন্ত আছে। অত্যল্পকালে নরেনদা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। একটি ভ্রমণকাহিনীতে খবর পাইয়াছি, নরেনদা চিত্রকূটে হাঁপানির ঔষধ আনিতে গিয়াছিলেন; এতখানি ডাক্তারী বিদ্যা কি সেই সূত্রে প্রাপ্ত? "স্যার জিজিভাই ওয়াডিয়া"র সূত্রপাত কিন্তু সাংঘাতিক—"A sick wife is the worst curse of a man."

And man's a man for a' that!

বালীগঞ্জে বাস করিলেই বটতলা বালীগঞ্জ হয় না।

—

আমরা কুক্ষণে শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়ের ধাপ্পায় পড়িয়া গত সংখ্যার 'চিঠি'তে "দাড়ি ও সাহিত্য" বাহির করিয়াছিলাম। সেই স্বজাতিদ্রোহী ভদ্রলোক আমাদিগকে "জ্বালাময় পরিস্থিতি"র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই নির্দাড়ি মাহাত্ম্যসূচক বিস্তৃত এগারোটি প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে; ফিরিস্তি দেখিয়া প্রত্যহ প্রাতে দাড়ি কামাইতে কামাইতে আমরাই তাজ্জব বনিয়া যাইতেছি। কোন্ কোন্‌গুলির ব্যবহার করিব

এখনও স্থির করিতে পারি নাই। ভাবিতেছি, নির্ব্বাচন-ব্যাপারে কোনও দাড়ি-ওয়ালা সম্পাদকের শরণাপন্ন হইব। এরূপ হইলে আমাদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের কারণ ঘটিবে না।

—

নোবেল শুধু ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াই পৃথিবীতে অঘটন ঘটান নাই। তাঁহার নামের সহিত যুক্ত পুরস্কার লইয়া এই ভারতবর্ষেই মাঝে মাঝে যে সকল বিস্ফোরণ হইতেছে, ডিনামাইট-বিস্ফোরণ তাহার তুলনায় কিছুই নয়। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙালী অধ্যাপক সঞ্জীব চৌধুরী সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন—এই সংবাদে যে আলোড়ন হইয়াছিল, তাহার জের মিটিতে না মিটিতেই হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক রাজিউদ্দীন বিজ্ঞানে নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন—এই বিচিত্র সংবাদ ঘোষিত হইয়া গেল। সংবাদ-পত্রে তাহার প্রতিবাদও দেখিয়াছি, কিন্তু আমাদের সনাতন 'ভারতবর্ষে'র কার্ত্তিক সংখ্যার ৬৯৭ পৃষ্ঠায় এই তথ্যটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া গেল—

ভারতের তৃতীয় নোবেল-ল্যারিয়েট অধ্যাপক রাজি-উদ্দীন শিক্ষিত সমাজে অপরিচিত নহেন—সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান ইতিপূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় বিদ্বান সমাজে সম্মানিত হইয়া এখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইলেন।

চমৎকার! 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক মহাশয় কত জানেন! এমন রাজিউদ্দীনের নামটাও আমরা শুনি নাই—ছি! ছি!

—

'কাব্য-জিজ্ঞাসা'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের অতি-আধুনিক সাহিত্যিক মহলে খ্যাতি আছে; কাব্য-ব্যাপারে তাঁহার মতামত উক্ত সমাজেও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তিনি সম্প্রতি 'কবিতা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় "আধুনিক বাংলা কবিতা" সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। আমাদের পাঠকদের গোচরার্থ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—অত্যন্ত প্রকট অনুপ্রাসে কবির আসক্তি অসাধারণ।...ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক শব্দ ব্যয়ে অল্প কথা বলায় সুধীন্দ্রনাথের আনন্দ। তেমনি আনন্দ অপ্রচলিত গালভরা শব্দ অভিধান থেকে নিয়ে বা নিজে গড়ে একত্র জমা করতে, যাতে পাঠকেরা বেশ একটু দিশেহারা হয়। "অধরার অহেতু আকুতি"..."ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার..." "...প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্ম্মোকে" "...অস্থাবর প্রমোদের শব অনুর্ব্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব..." এর সব কথার অর্থ বা সার্থকতা বুঝেছি এমন গর্ব্ব নেই, আর কবি ছাড়া অন্য কারও কাছে সব কথার অর্থ ও সার্থকতা আছে তাও স্বীকার করছিনে। তবে ভাষা ব্যবহারে "নির্বাহুল্য" যদি আধুনিকতার একটি লক্ষণ হয় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সে বন্ধন থেকে আশ্চর্য্যরকমে মুক্ত। কি সে ভাব এই ভাষা যার প্রকাশের স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক উপায়!...

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় উপকরণ অনেক,—"অভিধান", "অন্বীক্ষা", "রসশাস্ত্র", "গভীর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা" "স্বভাবজ সমাজবিমুখতা", "যদিদং কিঞ্চ সর্বং" সবেতে দারুণ বিতৃষ্ণার ভঙ্গী,—কিন্তু এ সব মিশে কবিতা কাব্য হয়ে ওঠে নি। হামানদিস্তায় চূর্ণ হয়েছে অনেক জিনিষ কিন্তু যে উত্তাপে সব গলে রক্তবর্ণ মকরধ্বজ দানা বাঁধে তার অভাবে কজ্জলীই রয়ে গেছে।

* * *

বিষ্ণু সম্বন্ধে এমন অ্যানালিসিস ব্রহ্মাও করিতে পারিতেন না; অতুলবাবু লিখিতেছেন—

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের মনে এ উত্তাপের অস্তিত্বে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্যাসানের ঠাণ্ডা বাতাসে সে তাপ উবে যাচ্ছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন "আধুনিকত্বের" সর্ব্ব-লক্ষণযুক্ত কবিতা ছাড়া তিনি লিখবেন না। পাছে সমস্ত কবিতাটার আবছায়া গোছ ছাড়া একটা স্পষ্ট অর্থই দাঁড়িয়ে যায় সেই ভয়ে কবিতার এক অংশ থেকে অন্য অংশকে খাপছাড়া করেই তাঁর মনে শান্তি নেই, প্রতি শ্লোকের এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের যথাসম্ভব অসংলগ্ন অসঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলেছেন।

"ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বর ধর্ম বৃথা, ওরে নষ্টনীড়।"

রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার চরণ বা চরণাংশ আচমকা এনে ফেলা এ অসঙ্গতি রক্ষার একটা প্রধান উপায়।

"... ... ...
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।"
"হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেব দেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে' গেছে রজনী-গন্ধা বনে।"

উদ্দেশ্য যা-ই হোক শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। এ অসংলগ্নের আনন্দ বিষ্ণু দের একচেটে নয়।

গুপ্ত মহাশয় সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সমর সেন হইতেও এই "ইয়ার্কি"র দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে বলিতেছেন—

সমাজ সংসারের সব জায়গায় খাপছাড়া অসঙ্গতি ও অর্থহীনতা, কাব্যে তার প্রতিরূপ

ফোটাবার যদি এই পন্থা হয় তবে দু একটা কবিতাই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ প্রতি কবিতায় এর আমদানী প্রত্যেক কবিতাকে করে Waste Landএর reductio ad absurdum। সেটা Waste Landএর কাব্য হয় না, হয় কাব্যের Waste Land।

* * *

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত নূতন প্রকাশিত কবিতার ত্রৈমাসিক 'নিরুক্তে' রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্টতর ভাষায় এই ধরণের আধুনিকতা-ব্যাধির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্ব্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যে এই মারীর সংক্রামকতা এখনকার বাতাসকে অধিকার করেছে সুতরাং বাহির থেকে কোনো প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। রুগ্ন সাহিত্য হয় আপনিই আপনার সাংঘাতিকতাকে নিঃশেষিত করে দেবে, নয় তো বিদেশি সাহিত্যের পালে যখন হাওয়া দেবে উল্টো দিকে তখন দেখাদেখি এরাও সেই দিকে পালের মুখ ফেরাবে।

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী, তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন এই বলিয়া—

মানুষ ফ্যাশনের তাড়ায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যঙ্গ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" প্রকাশ করিয়া সমগ্র বাংলাভাষা-ভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। মাত্র চার আনা মূল্যে বাংলা সাহিত্যের কীর্ত্তিমান সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তির নির্ভর-যোগ্য পরিচয় পাইয়া আমাদের দীর্ঘকালের অনেক অভাব মিটিতেছে। ইতিমধ্যেই শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রবাবু বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই চরিতমালায় প্রকাশ করিয়াছেন। ভবানীচরণ বাংলা-গদ্যে সর্ব্বপ্রথম মৌলিক রসরচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তি বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ্য।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৭ [৩য় সংখ্যা

শ্রীমধুসূদন

'মেঘনাদবধ কাব্য'-পাঠ—কল্পনা ও কবিশক্তি (৩)

১

এইবার আমরা এ কাব্যের কল্পনা ও কবিশক্তির আর এক দিক লক্ষ্য করিব; কবিমানসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, দেব-দেবী ও মনুষ্যবীরের কাহিনী রচনার যে আগ্রহ—তাহারই সঙ্গে, কবিপ্রাণের অতিশয় পরিচিত ঘনিষ্ঠ বস্তুর রসরূপকে এই ঘনঘটাময়ী কাব্য-প্রদর্শনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবার যে সফল প্রয়াস—তাহার কথা বলিব, অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নারীচরিত্রগুলির প্রতি আমাদের বিস্ময়-দৃষ্টির কারণ আলোচনা করিব। এবার আমাদিগকে ভুলিতে হইবে যে, আমরা এক পৌরাণিক-আখ্যানঘটিত মহাকাব্য পড়িতেছি—উত্তাল সাগর-তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে জলকল্লোল অথবা ঝটিকার ভেরী-রব শুনিতেছি। সত্যকার কবিদৃষ্টির মূলে বাস্তবের রসপ্রেরণা

থাকিবেই—যদি সে প্রতিভা সৃষ্টি-প্রতিভা হয়; তাই, অতি উর্দ্ধগ কল্পনার সার্ব্বভৌমিকতার মধ্যেও, কবির স্বকীয় ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা, জাতি ও জন্মগত ভাব-সংস্কার লুপ্ত হয় না; তাহা হইলে কবির সৃষ্টি-কর্ম্ম অমূলক হইয়া থাকে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কল্পনায় কবি যেন আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; যেন তিনি কল্পনার সত্য ছাড়া আর কোন সত্য মানিবেন না—রামায়ণের কাহিনীকে আপনার কবিপ্রবৃত্তির বশে আনিবার জন্য তিনি যেন কোন সংস্কারকে মনে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন; যেন একমাত্র কাব্যের অধিকারকেই বিস্তৃত করিবার জন্য, তিনি এক প্রশস্ত পটভূমিকার উপরে, রাজা ও রাজ-ঐশ্বর্য্য, বীরধর্ম্ম ও বীরকীর্ত্তি, বিপুল উদ্যম ও দারুণ ব্যর্থতার মহনীয় চিত্র অঙ্কিত করিবার উৎসাহে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সে কল্পনারও অন্তস্তলে—পার্ব্বত্য মহারণ্যের দিগন্তপ্রসারী শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে জলজ কুসুম-শোভার মত—বাস্তবজীবনের সরস সহজ সুষমার প্রতি অনুরাগ উঁকি দিয়াছে; রাবণের স্বর্ণলঙ্কার মণিমাণিক্য-কঠিন আস্তরণ ভেদ করিয়া বঙ্গমৃত্তিকার সরস শ্যামল কুঞ্জবিতান স্বচ্ছন্দে ও সহাস্যে আপনার কোমল তনু-লতিকা উচ্ছ্রিত করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার দুরারোহিণী কল্পনাকেও এই মৃত্তিকার মোহ ত্যাগ করাইতে পারেন নাই, বরং তাহাকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে যেন নারীমাত্রেই বঙ্গনারী—শিশুর চক্ষে যেমন সকল নারীই তাহার মা, তেমনই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যেখানেই নারীর সাক্ষাৎ পাই, সেখানেই দেখি, কবির কল্পনা, চরিত্র-চিত্রণে বা রূপ-বর্ণনে, তাহার নিজের ঘরের প্রতিমা-গুলিকে ছাড়িয়া এক পাও বাহিরে অগ্রসর হইবে না—সে জন্য সময়ে সময়ে আমাদেরও লজ্জা হয়। লঙ্কার পুরনারীদের বর্ণনায়, কবি

বাংলা দেশেরও বাহিরে যাইতে রাজি নহেন—যদিও তিনি বহুকাল দক্ষিণ-ভারতে বাস করিয়াছিলেন—নহিলে, তাহাদেরও কক্ষে কলস দেখিবেন কেন?—

রাক্ষসবধূ মৃগাক্ষীগঞ্জিনী
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
স্বর্ণ কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি!

সরমাও সীতাকে সিঁদুর পরাইবার আগে যাহা বলিতেছে, তাহা ভারতের আর কোন দেশের এক সধবা আর এক সধবাকে নিশ্চয় বলে না—

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর, করিলে আজ্ঞা সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ!

—'এয়ো তুমি'—রাক্ষসবধূ সরমার কথাই বটে। সীতাও একেবারে খাঁটি বঙ্গবধূ, পূর্ব্বকথা বলিবার সময়ে এক স্থানে সরমাকে বলিতেছেন—

আবরি বদন আমি ঘোমটায় সখি,
করপুটে কহিনু,...

—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু বাহিরের এই রূপ, বেশবাস ও আচারের বর্ণনাতেই নয়, এ কাব্যের যে কয়টি প্রধান নারী-চরিত্র—এমন কি, এ কাব্যের নায়িকা বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, চরিত্রের মাধুর্য্যে ও মহিমায় খাঁটি বঙ্গনারী। মধুসূদন মাতৃভাষায় কাব্য লিখিতে বসিয়া যেন তাঁহার নিজের মাতৃজাতিরও বন্দনা করিয়াছেন; বস্তুত, এ কাব্যে যে মানবতার নিগূঢ় প্রেরণা অপর সকল বাসনাকে পরাভূত করিয়াছে, তাহারও একটা কারণ ইহাই বলিয়া মনে হয়। তাই

হোমারের বীর-গাথা ও মিল্‌টনের অমর্ত্ত্য গীতরাগ তাঁহাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিলেও তিনি সে প্রলোভন দমন করিয়াছিলেন; এবং এই জন্যই সর্ব্ববিধ বিজাতীয় ভাব ও আলঙ্কারিকতা সত্ত্বেও, 'মেঘনাদবধ কাব্য' খাঁটি বাংলা কাব্য হইয়াছে; ভাবে যেমন বীররসকে ছাপাইয়া করুণরসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ভাষাতেও তেমনই সুগম্ভীর সংস্কৃত সাধু শব্দকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, যেখানে সেখানে খাঁটি মাতৃভাষার অসংস্কৃত বুলি তাহাদের পাশে আসিয়া বসিয়াছে—অতিশয় গম্ভীর বাক্যধ্বনির নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে কবির প্রাণ যেন স্বস্তি পাইতেছে না। কল্পনার উত্তুঙ্গ নির্জ্জন শিখর হইতে নামিয়া তিনি যেন নিম্ন-ভূমির শষ্পশ্যামল তটিনীতটে—যেখানে হৃদয়-যমুনার তল-তল ছল-ছল বারিরাশিতে নরনারীর গাহন, সন্তরণ ও নিমজ্জন-লীলা চলিতেছে—সেইখানে বিচরণ করিতেই উৎসুক। কবি নিজেই তাঁহার পত্রাবলীর এক স্থানে লিখিতেছেন—

He who is beautiful tender and pathetic with a dash of sublimity is sure to float down the stream of time in triumph.

সেই সঙ্গে মিল্‌টনের মহাকাব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

He is full of lofty thoughts, but has little or nothing that can be called amiable. * * * His is the deep roar of the lion in the silent solitude of the forest.

এই কথাগুলিতেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাব্যপ্রকৃতির সঠিক পরিচয় আছে। Beautiful, tender and pathetic—এইগুলিই আসল; কেবল, তাহার সহিত sublimity বা ভাবগাম্ভীর্য্য চাই; প্রথম কয়টিতেই মূল রস, শেষেরটি তাহাদিগকে উজ্জ্বল করিবার উপায় মাত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাহিনীর ঘনঘটা ও বর্ণনার বিপুল আয়োজন, যেন মেঘচুম্বী পর্ব্বতমালার মত, ভাবের একটি করুণ কোমল স্বচ্ছ সুন্দর

কমল-হ্রদকে বেষ্টন করিয়া আছে। এ কাব্যে যাহা কিছু beautiful tender and pathetic, তাহার আলম্বন হইয়াছে এই নারী-চরিত্রগুলি—সেই মীলিত ও মুদিত কমলদলের শোভা ও সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কবির' কল্পনা-মধুকরী স্বচ্ছন্দে ও পূর্ণতানে গুঞ্জন করিয়াছে। আমরা অতঃপর এই গুঞ্জনের গীতি-কৌশল একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

২

এ কাব্যের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে সীতা ও প্রমীলাই প্রধান, এবং সাধারণতঃ এই দুইটিই কবির কবিশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এরূপ ধারণা যথার্থ বটে; কিন্তু, রসনা-রস বিচারে আমরা যেমন প্রচুর-মশলা-সুগন্ধি ঘৃতপক্ক মূল্যবান ভোজ্য এবং পায়স-পিষ্টককেই পাকশিল্পের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করি, এবং অতি সহজেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহারই সঙ্গে অপর যে দুই চারিটি অতি সুলভ তুচ্ছদর্শন বস্তুও থাকে, তাহার প্রতি তেমন মনোযোগ করি না; অথচ সেই সুলভ ও স্বল্প উপকরণে প্রস্তুত ব্যঞ্জনের মৃদু ও বিশিষ্ট স্বাদই যে প্রকৃত পাকনৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহা বুঝিবার অবকাশ প্রায়ই হয় না;—তেমনই, কল্পনার উচ্চতা ও বিষয়-বস্তুর অসাধারণত্বে মুগ্ধ আমাদের মন, সূক্ষ্মতর সৃষ্টিকে সুলভ ও সাধারণ ভাবিয়া তাহার তেমন আদর করে না। 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতেই আমি তাহার প্রমাণ দিব। সে কাব্যের সীতা ও প্রমীলা, এই দুই মহত্তর সৃষ্টির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমি দুইটি ক্ষুদ্রতর সৃষ্টি—রাবণের দুই মহিষী, চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরীর—চরিত্র-চিত্রণে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দিব।

চিত্রাঙ্গদাকে আমরা কাব্যে একবার মাত্র দেখিতে পাই, সেই একবারের যে দেখা তাহাতেই চিত্রাঙ্গদার সেই মূর্ত্তি আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপ্তির মত আমাদের নেত্রপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। রাবণের বিরাট রাজসভা মধ্যে পুত্রশোকাতুরা রোরুদ্যমানা বীরবাহু-জননী সখীগণ সঙ্গে প্রবেশ করিল। সেই অবস্থাতেও কবি তাহার যে রূপলাবণ্যের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝি, সে রাবণের মহিষী হইলেও এখনও বিগত-যৌবনা নহে।—

আলুথালু হায় এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!.....

এই চিত্রাঙ্গদা রাবণের একাধিক মহিষীর একজন, এবং রাবণের সহিত তাহার বয়সের ব্যবধানও অল্প নহে। বহুপত্নীক স্বামীর প্রতি এরূপ পত্নীর যেরূপ মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি। আজ রাবণের মত পুরুষের সম্মুখে এই অতিশয় অসমবয়সী স্নেহানুগ্রহধন্যা নারীর সেই অভ্যস্ত আচরণও বিচলিত হইয়াছে। স্বামী নয়—পুত্রই ছিল যাহার একমাত্র আপন বস্তু, আজ সেই পুত্রের বিয়োগে তাহার অন্তর ও বাহিরের সকল আব্রু যেন খসিয়া গিয়াছে। পুত্রশোকে অধীর হইলেও রাবণ সিংহাসনে রাজমহিমায় আসীন, সেই সিংহাসনের তলে দীন প্রজার মত দাঁড়াইয়া চিত্রাঙ্গদার এই যে অভিযোগ—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি

পাখী। কহ, কোথা রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্রধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর, কহ কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?

—তাহাতে চিত্রাঙ্গদার শুধুই শোক নয়, তাহার সমগ্র জীবন—স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক, তাহার অসহায় একক অবস্থার দুঃখ, মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। রাবণের বিশাল পুরীতে এই অবহেলিতা নারীর একটি মাত্র সম্বল ছিল—তাহার সেই পুত্র। রাবণের সুখ-দুঃখ তাহার সুখ-দুঃখ নয়—পুত্রের মৃত্যুতে তাহার যাহা হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর সহিত ব্যবধান কিছুমাত্র ঘুচে নাই। তাই, রাবণ যখন বলিয়া উঠে—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!

তখনও সে স্বামীকে সমদুঃখে দুঃখী মনে করে না, বরং ইহাই ভাবিয়া আরও অধীর হয় যে, শতপুত্র যাহার—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক সে বুঝিবে কেমন করিয়া? সে সত্যকার রাজমহিষী নয়—রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল সে বোঝে না, রাবণের ভাবনার অংশভাগিনী সে নয়; তাই দেশরক্ষার্থে বীরপুত্র প্রাণ দিয়াছে, এ সান্ত্বনা তাহার সান্ত্বনা নয়। নিজের পুত্রহানির মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে, রাবণের উপস্থিত বিপদ তাহাকে কিছুমাত্র ব্যাকুল করে না; রাবণের শোকেও তাহার সহানুভূতি নাই। যাহার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, সেই রাবণের কোনও সান্ত্বনা-বাক্যে সে আশ্বস্ত হইবে না; রাবণের পাপকেই সে বড় করিয়া দেখিতেছে। বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে বুক পাতিয়া লইবার মত ধীরতা, কিম্বা তাহার

আঘাতে পাপীর যে যন্ত্রণা, তাহা নিজেরও বক্ষে অনুভব করিবার মত প্রেম—কোনটাই তাহার নাই। তাই শোকে মুহ্যমানা বিবশা রাবণ-বধূর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে যেন বিধাতার রোষানলকেই প্রদীপ্ত হইতে দেখি; যখন তাহার মুখে এই জ্বালাময় বাক্যস্রোত বহির্গত হয়—

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজতপ্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশ-রিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশির, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলে আপনি।

—তখন জীবনের একটা মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরতা, এবং নারী-পুরুষঘটিত সংসার-নাট্যের একটি নিদারুণ পরিহাস-রস যেমন আমাদিগকে অভিভূত করে, তেমনই এই একটি মাত্র দৃশ্যের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে, একটি নারীর জীবন ও চরিত্র অতি গভীর রেখায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে; রাজগৃহবন্দিনী রূপসী চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমান, স্বামীস্নেহবঞ্চিতা

পুত্রহারা রমণীর নৈরাশ্যপীড়িত তেজস্বিনী-মূর্ত্তি—তাহার সেই অশ্রু-প্লাবিত করুণ সুন্দর চক্ষে আহত নারী-হৃদয়ের বহ্নিবিভাস—আমাদের মানসপটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

৩

এই চরিত্রের পাশে মন্দোদরীকে দাঁড় করাইলে, উভয় চরিত্র, মর্ম্মরশিল্পীর মূর্ত্তি-রচনার মত, আকারে আয়তনে ও ডৌলে বিলক্ষণ ও সুপরিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। মন্দোদরী রাবণের জ্যেষ্ঠা মহিষী, পাটরাণী; সে তাহার সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মসাধন ভার্য্যা। মন্দোদরী শুধুই পুত্রের জননী নয়, রাবণের গৃহিণী; সমস্ত রাক্ষসপুরী ও রাক্ষস-পরিবারের কল্যাণ-চিন্তা, রাজ্যের শুভাশুভ, স্বামীর সম্পদ-বিপদের ভাবনা তাহাকে ভর্ত্রিণীযোগ্য গুরুভার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। রাবণ যেমন লঙ্কেশ্বর, সেও তেমনই লঙ্কেশ্বরী। মন্দোদরীর মূর্ত্তিও পূর্ণ মাতৃত্বের মূর্ত্তি, তাহার বাৎসল্য সহজ শান্ত ও আত্মতৃপ্ত। পুত্রের কল্যাণ-কামনায় শিবের আরাধনা করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—এই অবস্থায় মন্দোদরীর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, এবং মেঘনাদ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মাতৃপদ বন্দনা করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছে, ইহাই তাহার উপলক্ষ্য। পুত্র ও পুত্রবধূর শিরশ্চুম্বন করিয়া সে যখন তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিল, মন্দোদরীর তখনকার সেই রূপ কবি কেবল একটিমাত্র উপমায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার রূপের আর কোন বর্ণনা কবি করেন নাই। সে কেমন রূপ?—

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী,
তারাকিরীটিনী-নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষসকুল-ঈশ্বরী!

—এ উপমার আলঙ্কারিক মৌলিকতা যেমনই হউক, এ চিত্রে তাহার যে ধ্বনিব্যঞ্জনা ঘটিয়াছে, মাতৃত্বের যে বিশাল গম্ভীর মহনীয়তা—সেই স্নেহের যে উদার মধুর রহস্যময়তা ইহাতে সূচিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এই উপমার এমন সার্থক প্রয়োগ আর কোথায়ও হইতে পারিত না। চিত্রাঙ্গদা শোকার্ত্ত জননী হইলেও তাহার রূপে নায়িকার লক্ষণ আছে। এ রূপ 'তারাকিরীটিনীনিশিসদৃশী'—কালিদাসের 'স্ফুট-চন্দ্রতারকা বিভাবরী' নয়; কারণ, ইহার যৌবন—ইহার চন্দ্র ও জ্যোৎস্না—এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধূতে বর্ত্তিয়াছে। মন্দোদরীর এখন সেই বয়স, যে বয়সে জননীরূপিণী নারী কেবল মাতৃত্বের সুখে ও গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত—যেন তাহার পাইবার আর কিছুই নাই, এখন কেবল দিবার পালা আসিয়াছে, স্বামীর নিকটেও আর কোন স্বার্থের দাবি নাই। এই মন্দোদরী-চরিত্রে কবি সেকালের খাঁটি বাঙালী-মায়ের ছবি আঁকিয়াছেন—একেবারে বাঙালীর মা। স্নেহের নির্ব্বুদ্ধিতায়, বয়স্ক পুত্রের বুদ্ধি ও শক্তির উপরে নিরতিশয় শ্রদ্ধায়, তাহার দুঃসাহসের জন্য একই কালে গর্ব্ববোধ ও আশঙ্কায়, পুত্রের বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়া জগৎশুদ্ধ সকলের উপর দোষারোপে, এবং ব্রত-উপবাস দ্বারা সেই বিপদ কাটাইবার জন্য আহারনিদ্রাত্যাগে—এ চরিত্র মধুসূদনের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। মন্দোদরী মেঘনাদকে বলিতেছে—

দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর, কালসর্প সম
দয়াশূন্য বিভীষণ! * * *
* * কুক্ষণে, বাছা, নিকষা-শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি।
* * * হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পনখা মায়ের উদরে?

—'এ কনক-লঙ্কা মোর'—এখানে মন্দোদরীর মুখে এই একটি কথা 'মোর' সমগ্র লঙ্কাপুরীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ—শুধুই কর্ত্তৃত্বের নয়, তাহার মমত্বের অধিকার—ব্যক্ত করিয়াছে; এমন কথা চিত্রাঙ্গদার মুখে কখনও আসিত না। চিত্রাঙ্গদার মাতৃস্নেহও এমন অবুঝ নয়, সে প্রখরবুদ্ধিমতী; অথবা, সে স্বামীস্নেহে এত অন্ধ নয় যে, লঙ্কার সর্ব্বনাশের জন্য রাবণ ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করিবে। একজন সংসারকে বুকে জড়াইয়া এবং আপনাকেও সেই সংসারে বিলাইয়া দিয়া, স্নেহ ও প্রেমের দাবি ছাড়া আর কিছুই জানে না। আর এক জনের আত্মসচেতনতা এখনও অটুট; বিবেক ও বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যে, সে চরিত্র আপনাকে হারায় না—প্রেম বা স্নেহের আত্মবিগলিত অবস্থার গদ্গদ-ভাষ বা প্রলাপবাণী তাহার পক্ষে অসম্ভব। এমন মাকে ভয় পাওয়ানো বা আশ্বস্ত করা দুইই সহজ, তাই মায়ের প্রাণ যখন আসন্ন পুত্রবিয়োগ-ঘটনা যেন অজ্ঞাতে জানিয়াই অধীর হইয়াছে—মেঘনাদ যাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—

কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ মা আমারে?

এবং মন্দোদরী তাহার আর কোন কারণ দেখাইতে না পারিয়া বলিতেছে—

মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগপাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি পারি না বুঝিতে।

—তখন মেঘনাদ তাহার ভয় দূর করিতে না পারিয়া শেষে বড় বুদ্ধি করিয়া বলিল—

বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেবদৈত্য নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল?

মেঘনাদ জানে—'রাবণি ইন্দ্রজিৎ' এবং 'মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়, রথী যত মাতুল'—এক সঙ্গে এই দুই বাক্য এ ক্ষেত্রে কত অমোঘ। পতিগতপ্রাণা নারীর পক্ষে পতিকুলমর্য্যাদা পিতৃকুলমর্য্যাদার চেয়ে অধিক; আবার, পিতার নিকটে কন্যার বীরপুত্রবতী হওয়ার গর্ব্বও কম নয়। তা ছাড়া, 'রাবণি ইন্দ্রজিতে'র প্রতি কটাক্ষ করিবে তাহার পিতৃকুল! মন্দোদরীর মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব এই দুইয়েরই সম্পূর্ণ চিত্র এখানে কত সংক্ষেপে অঙ্কিত হইয়াছে! কিন্তু এই দৃশ্যের সর্ব্বশেষে কবি মন্দোদরীর মুখে যে কথাটি দিয়াছেন, তাহাতেই এই মাতৃচরিত্রের—মাতৃহৃদয়ের—চিত্র যেন শেষ রেখায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুত্র যখন যাইবেই, তখন—

কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;—
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব
ও বিধুবদন হেরি এ পোড়া পরাণ।
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"

—কবি এখানে পুত্রস্নেহাতুরা জননীর মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সর্গে মন্দোদরীর এই মাতৃত্বের সহিত পত্নীত্বের যে অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও বর্ণনা নাই, বক্তৃতা নাই। পুত্র

মেঘনাদের মৃত্যুতে তাহার যে শোক, তাহা স্বামী রাবণের শোকের সহিত মিলিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে। সে শোক চিত্রাঙ্গদার শোকের মত একার শোক নয়, তাই তাহা একেবারে সান্ত্বনাতীত নহে; এবং তাহাতে কাহারও প্রতি অভিযোগের মর্ম্মদাহ নাই বলিয়া তাহা নির্ব্বাক। যখন শোকে অধীর হইয়া "রণমদে মত্ত সাজে রক্ষকুলপতি", তখন "সভাতলে উতরিলা রাণী মন্দোদরী * * * রাজপদে পড়িলা মহিষী"। মন্দোদরী আর কিছুই করিল না—এ যেন সেই দারুণ শোকে হৃদয়ের আশ্রয় প্রার্থনা। তার পরেও আর কিছুই নয়; রাবণের মুখে তাহার হৃদয়বিদারক মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া রাণী যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন, সখীরা ধরাধরি করিয়া দেবীকে অবরোধে লইয়া গেল। প্রথম সর্গের চিত্রাঙ্গদা ও রাবণ-সংবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে পুত্রই যেন পতি-পত্নীর মিলিত হৃদয়বৃন্তের ফুল, সে ফুল বৃন্তচ্যুত হইলে কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? অথবা, পুত্রশোকের বজ্রালোকে দম্পতি যেন আজ আর এক বার নূতন করিয়া, আরও গভীর স্নেহে, পরস্পরের মুখাবলোকন করিল—দুর্য্যোগ-ঝটিকার দারুণ উচ্ছ্বাসে দুই হৃদয়-স্রোত উতল তলদেশ পর্য্যন্ত যুক্ত হইয়া অকূলপ্রসারী মোহানার সৃষ্টি করিল। চিত্রাঙ্গদা এত বড় ভাগ্যবতী নয়—সে কিছুই পায় নাই, যাহা পাইয়াছিল তাহাও হারাইয়াছে; মন্দোদরী সকলই পাইয়াছিল, এবং হারাইয়াও যেন সব হারায় না। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের কল্পনাকাশে ঝড়-ঝঞ্ঝার যে ঘনঘোর সমারোহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে, নিম্নে ধরণীতলে আমাদের অতি সন্নিকটে—গৃহস্থের গৃহ-বাতায়নে যে দুই একটি দীপশিখাকে অনির্ব্বাণ রাখিয়াছেন, তাহার দিকে চাহিয়া আমাদের দৃষ্টিপিপাসা কম চরিতার্থ হয় না। সীতা ও প্রমীলার পার্শ্বে এই দুইটি নারীচরিত্র নিতান্ত অপ্রধান বলিয়া মনে হইলেও

কবি-কল্পনার সমগ্রতার পরিচয় ইহাতেই আছে। কবির সৃষ্টি যে জগৎ, তাহার মূলে আছে এক দৃষ্টি—একটি বীজ হইতেই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ-বিকাশ হইয়া থাকে। এই কাব্যের বিকাশমুখে চিত্রাঙ্গদা এবং প্রায় শেষে মন্দোদরীর আবির্ভাব ; কিন্তু কবির দৃষ্টি এমনই সম্পূর্ণ যে, এ দুই চরিত্র, তাহাদের ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে, যেন সেই বীজের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল—কবির দৃষ্টি যখনই যাহার উপরে পড়িয়াছে, তখনই সে স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যসৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, সম্মুখ হইতে পিছনে, এবং পিছন হইতে সম্মুখে, যেমন করিয়াই আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি না কেন, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কাব্যের সর্ব্বাঙ্গের যেমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তেমনই প্রত্যেক অঙ্গও আপনার বৈশিষ্ট্যে ও বৈলক্ষণ্যে অপর অঙ্গগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। বড় কাব্যে ও ছোট কাব্যে প্রভেদ এই যে, ছোট কাব্যে বা কবিতায় উপকরণ-বাহুল্যের অভাবে, বিচিত্র ও জটিলকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না ; সেখানে বিষয়-বস্তু অতিশয় সামান্য ও সরল—জীবনের বহিঃপ্রকাশের যে বিস্তৃতি এবং জগতের স্থান-কাল-পাত্রভেদের যে অশেষ দ্বন্দ্ব, তাহার প্রতিরূপ সে কবিতায় নাই ; সেখানে শেষ পর্য্যন্ত—বস্তু নয়—ভাবই প্রধান। এ জন্য যে-শক্তি—বৈচিত্র্য, বিরোধ ও বিভেদের মধ্যেই একটি রসরূপের স্থাপনা করে, সেই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় তাহাতে নাই। যাঁহারা সকল কাব্যকেই—রূপ নয়, কেবল রসের নিকষে যাচাই করিয়া থাকেন, তাঁহারা কাব্যের লিরিক-নির্য্যাসটুকুতেই পরিতৃপ্ত, এপিক বা কাহিনী-কাব্যের পৃথক মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না। বিশেষ অপেক্ষা নির্ব্বিশেষের প্রতিই তাঁহাদের পক্ষপাত, এ জন্য কাব্য-বিচারে, কবির বিশেষ-সৃষ্টির যে ক্ষমতা, তাঁহাদের রস-পিপাসা তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণে উৎসুক নহে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত কাহিনী-কাব্যে এই শক্তিই উৎকৃষ্ট

সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন, তাই আমি প্রথমেই এ কাব্যের এই দুইটি অপ্রধান নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিচাতুর্য্যের আলোচনা করিলাম।

৪

চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী মধুসূদনের যে-কল্পনার সৃষ্টি, তাহাকে objective বা বস্তুনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যাহা প্রত্যক্ষ-পরিচিত, যাহার আদর্শ ও ভাব-রূপ স্থির, যাহা ব্যক্তির বাসনা কামনায় রঞ্জিত নহে ; সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে যাহার রস-রহস্য সর্ব্বজন-হৃদয়বেদ্য, যাহার প্রকাশে ও বিকাশে, মানুষের স্বাধীন কল্পনার বিরোধী এক নিত্যস্বীকৃত নিয়তি-লীলা প্রকটিত হইতেছে, এবং তাহাই মানুষের হাসি-কান্নার—তাহার বাস্তব হৃদয়ানুভূতির কারণরূপে, কাব্যে একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য সঞ্চার করে—কবিচিত্তের সেই ক্ল্যাসিকাল প্রবৃত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; এই দুই চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন তাহারই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রমীলা ও সীতা যে-কল্পনার সৃষ্টি তাহাতে কবির নিজ স্বাধীন প্রবৃত্তির ক্রিয়া রহিয়াছে—এই দুইটিতে কবির মানস-আদর্শ দুই রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দুইয়েরই মূল উপাদান সেই এক বস্তু—যাহা কাব্যে ও জীবনে মানুষের প্রবলতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রাণধর্ম্মরূপে পূজিত হইয়া থাকে। মধুসূদন সেই প্রেমকে, এই দুইটি চরিত্রের কল্পনায়, আপন কবিহৃদয়ের সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন ; তাই এখানে কবির কবি-প্রবৃত্তি অন্যরূপ—একটিতে প্রেমের রতি এবং অপরটিতে তাহারই আরতি রোমান্টিক লিরিক আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তথাপি প্রমীলার সৃষ্টিই নবসৃষ্টি, ইহার মধ্যে কবির প্রাণের অভিনব উৎকণ্ঠা একটি দুরূহ সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। সীতার আদর্শ নূতন নহে, সেখানে কবি পুরাতনকেই,

নূতন মন্ত্রে আবাহন করিয়া নবতন কিরণ-কিরীট পরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রমীলায় তিনি পুরাতনকেই গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ভাঙিয়া, তাহার সেই চূর্ণ-মুষ্টি হইতেই আপনার মনের মানসী গড়িয়া লইয়াছেন। এ কাজ সহজ নহে—দেশী ও বিলাতী দাম্পত্যের দুই বিভিন্ন আদর্শকে, তিনি যেন এক আশ্চর্য্য রাসায়নিক যাদুশক্তিতে একাধারে মিলাইয়াছেন। প্রমীলার চরিত্রে স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকার সঙ্গে বাঙালী কুলবধূ, এবং ভারতীয় আদর্শের শক্তিরূপা নারীর সঙ্গে অভারতীয় বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তির এই যে সংযোজন, ইহারই প্রতিভা সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে-প্রতিভা য়ুরোপীয় ভাববস্তুকে দেশীয় বিগ্রহরূপে এমন রূপান্তরিত করিয়াছিল, এখানেও সেই প্রতিভার কীর্ত্তিকুশলতা লক্ষ্য করা যায়। এমনই করিয়া সে যুগে কবিপ্রতিভার এই আত্মসাৎ বা স্বীকরণ-শক্তির গুণে আমাদের সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদনের দুঃসাহস বিস্ময়কর; দুই সম্পূর্ণ-বিরোধী সংস্কারকে তিনি এই চরিত্রে যুক্ত করিয়াছেন—সে বিরোধ এতই অসংশয় যে, কবির সৃষ্টিতে এইরূপ চাক্ষুষ জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া, আর কোন প্রকারে, তাহাকে মন হইতে দূর করা যায় না। ইহাই প্রতিভার যাদুশক্তি; অথবা হয়তো যাদুশক্তি নয়, ইহাই সত্য। আমাদের ধারণায় যাহা অবাস্তব, কবির কল্পনা তাহাকে শুধুই একটা বাস্তবের ভানমাত্র ধারণ করাইয়া দেয় না—বরং তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া আমাদের মিথ্যাকে তাহার স্বকীয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। নারীচরিত্র পুরুষের কাছে রহস্যময়, তাহার মধ্যে আমরা আমাদের ধারণাকে পদে পদে খণ্ডিত হইতে দেখিয়া মনে করি, সে বুঝি সকল নিয়মের বহির্ভূত; সে যে আমাদেরই আত্ম-সংস্কারের দোষ তাহা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি না। একই নারীর

পক্ষে বীরাঙ্গনা ও কুলবধূর আচরণ যে বিসদৃশ, এমন কি, অপ্রাকৃত—ইহাই আমাদের অভ্যস্ত ধারণা। সে ধারণা আমাদের বুদ্ধি অনুসারে যুক্তিযুক্তও বটে; কিন্তু এ কাব্যের প্রমীলা-চরিত্র—তাহার সকল আচরণে সকল অবস্থায়—এমনই স্বাভাবিক ও জীবন্ত যে, আমাদের সে ধারণাও অন্ততঃ সাময়িকভাবে নিরস্ত হইয়া থাকে। তার একমাত্র কারণ, কবি আমাদিগকে, কোন অবস্থাতেই তাহার নারীত্বকে বিস্মৃত হইবার অবকাশ দেন নাই। প্রমীলার বীর-ভূষণ ও নারী-ভূষণ যতই বিপরীত হউক, মূলে একের সহিত অপরের বৈসাদৃশ্য নাই—কবি তাহা কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। অশ্বপৃষ্ঠে রণসজ্জায় সজ্জিত তাহার যে-রূপ বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে।
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরীবন্ধনে,
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে, মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!

সেই রূপের সঙ্গে—যখন সে

ত্যজিলা বীরভূষণে; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি,
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।

—তখনকার সেই রূপের কিছুমাত্র বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না।

আবার, একদা যে প্রমীলাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম—

"পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি'
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?...

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি!"

তাহারই সম্বন্ধে যখন অন্যত্র পড়ি—

"হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী—
"ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।"

—তখন চমৎকৃতই হই, বিস্মিত হই না। ইহার কারণ কি? কারণ, প্রমীলা বীরাঙ্গনাও নয়, লজ্জাশীলা কুলবধূও নয়—সে পতিগতপ্রাণা প্রেমিকা নারী। সেই একই প্রেমের দায়ে সে কখনও বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ; নতুবা, তাহার আসল রূপ একই। সে রূপের আভাস কবি চকিতে একবার দিয়াছেন। রজনী-প্রভাতে ইন্দ্রজিৎ যখন বড় আদরে, মধুর মৃদুভাষে, তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল, তখন—

চমকি রামা উঠিলা সত্বরে—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর স্বরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী
সরমে।

—এ আচরণ কুলবধূর পক্ষেও যেমন, বীরাঙ্গনার পক্ষেও তেমনই স্বাভাবিক। এমনই করিয়া সর্ব্বত্র প্রমীলার ভিতরকার এই নারী-রূপকে এক মুহূর্ত্তের জন্য আচ্ছন্ন হইতে না দিয়া, কবি এই চরিত্রে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা একান্ত বিরোধী, সেই আদিরস ও বীররসকে একাধারে মিলাইয়াও রসাভাস বা অসঙ্গতি-দোষ নিবারণ করিয়াছেন।

তথাপি প্রমীলা-চরিত্রে কবি নারীর প্রেমকে এক নূতন আদর্শে উদ্বোধন করিয়াছেন—সেই আদর্শকেই বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা এ

চরিত্র-সৃষ্টির রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। প্রমীলার নারীত্বে কবি প্রেমকেই একাধিপত্য দিয়াছেন; সে বিষয়ে আর এক কবির নজীর আছে, যথা—

Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence.

কবি এই তত্ত্বটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই তাঁহার নায়িকার একমাত্র ধর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই তত্ত্বের সহিত তিনি তাঁহার নিজের কামনাগত আদর্শকেও যুক্ত করিয়াছেন, কারণ, কেবলমাত্র ঐ তত্ত্বটিই তাঁহার কাছে সত্য নয়—প্রেম কেবল নারী-জীবনের সর্ব্বস্বই নয়, তাহা নারীকে দুর্জ্জয় শক্তির অধিকারিণীও করে; এবং সে শক্তি কেবল আত্মদমন বা অসীম ধৈর্য্যের শক্তি নয়, সে শক্তি তাহার কামনা-বাসনাকে মুক্ত করিয়া দেয়; সে প্রেম কোন বাধা মানে না, সে আপনার মধ্যে আপন বাসনাকে রুদ্ধ করিয়া একটা আত্মিক আনন্দেই চরিতার্থ হয় না। প্রমীলা যেন আর এক বাংলা কাব্যের নায়িকার মতই বলিতে পারিত—

এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চিরমর্ম্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে-রমণী নহি;
আমার কামনা কভু নিষ্ফল না হবে!

—কিন্তু সে ভিন্ন অর্থে; কারণ, তাহার প্রেম এমন আত্মনিষ্ঠ, আত্মসচেতন নয় বলিয়া—মধুসূদনের আদর্শ, খাঁটি নারী-প্রেমের আদর্শ বলিয়া—তাঁহার আদর্শ-নারী পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় এমন করিয়া আত্মশক্তির ঘোষণা করে না; তাহার প্রেম আত্মদানের আকাঙ্ক্ষায় অধীর—সেই কামনার মুখেই সে কোন বাধা মানে না।

মধুসূদন নারী-প্রেমের সেই কামনা-বলিষ্ঠ আদর্শকেই বরণ করিয়াছেন—সে প্রেমের সেই রাজসিক মহিমার ধ্যান করিয়াছেন, যদিও সেই প্রেম—

Oft to agony distrest,
And though his favourite seat be feeble woman's breast.

প্রেমের 'calm pleasures, majestic pains' তাঁহাকে ততটা মুগ্ধ করে না—যতটা করে সেই প্রেমে বাসনার প্রখরতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একালের শ্রেষ্ঠ কবির আর একটি কবিতা মনে পড়িতেছে, তাহাতেও প্রেমকে যে-রূপে কবি উদ্বোধন করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করিলে, মধুসূদনের এই আদর্শ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়, পুষ্প-ধনু,
রুদ্র-অগ্নি হ'তে লহ জ্বলদচ্চি তনু।
* * *
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ-সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

—এ প্রেমও দুর্ব্বলতাকে পরিহার করার প্রেম, ইহাও কামনার দীপ্যমান দাহে—ভোগে-ত্যাগে, মিলনে-বিরহে—রুদ্রের উপাসক। এ কবিতার পরের পংক্তিগুলির প্রায় প্রত্যেকটি, লঙ্কাপ্রবেশের দুঃসাহসিক অভিযানে উদ্যত, যোদ্ধবেশিনী প্রমীলার মুখে কিছুমাত্র অপ্রযুক্ত হয় না—

সঙ্কটবন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমির-তোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষ-গম্ভীর।

যাক দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্ব্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

—গীতিকবিতার এই আবেগই মহাকাব্যের নায়িকা-চরিত্রে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাতেও প্রেমের সেই আর-এক রূপ নাই যাহাকে স্মরণ করিয়া কবির ভাষাতেই বলা যাইতে পারে—

* * the Gods approve
The depth, and not the tumult, of the soul;

—সে প্রেম সাত্ত্বিক, এ প্রেম রাজসিক। তাই বলিয়া, এ প্রেম কেবল আদিরসের প্রেম নয়; মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা-কাব্যে' সেই আদি-রসের প্রেম লইয়া কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সে প্রেম কাব্যরসের প্রেম—জীবনের প্রেম নয়; তাহারই ভস্ম-অপমান-শয্যা হইতে আর এক কবি পুষ্পধনুকে জাগাইয়া 'বীরের তনুতে তনু লইতে' আহ্বান করিয়াছেন। ইহারই বশে প্রমীলা বীরাঙ্গনা সাজিয়াছে। প্রমীলার বিরহ দুঃসহ বলিয়াই সুন্দর, এবং সেই দুঃসহতাই মিলনকে প্রখর করিয়াছে। অতএব যুদ্ধযাত্রার বীরবেশিনী প্রমীলা ও সহমরণ-যাত্রার বধূবেশিনী প্রমীলায় কোন পার্থক্য নাই। প্রখর মিলনের এই তত্ত্ব কবির কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়াছে বলিয়াই, প্রমীলা-চরিত্রে বাহ্যতঃ অসঙ্গতি থাকিলেও, ভিতরে সৃষ্টি-সত্যের সঙ্গতি রহিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, ওই প্রখর মিলনের অর্থই এ কাব্যের প্রমীলাঘটিত কাহিনীর আদ্যোপান্ত অর্থবান করিয়াছে। এ প্রেম বড় অধীর, বড় অসহিষ্ণু—ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদও সহ্য করিবে না। মেঘনাদের প্রেয়সীর পক্ষে প্রেমের এই প্রচণ্ডতা যেমন শোভন হইয়াছে, তেমনই, প্রাচীন কাব্যের আদিরস—সেই মদন—যে রুদ্রের নয়নবহ্নি সহ্য করিতে

পারে না, তাহাকে ভস্ম না করিয়া—এইরূপ বহ্নিদীপ্ত করিয়া তোলা—নব্য বাংলা কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা এই কবির প্রেরণাকে সার্থক করিয়াছে। তাঁহার এই নূতন প্রেমের কল্পনাকে উদ্দেশ করিয়া বলা যাইতে পারে—

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি'।

—কারণ, সে কল্পনারও বন্ধু ছিল য়ুরোপীয় কাব্য, এবং তাহাতে দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণির বজ্র-ঘোষণাও ছিল।

কিন্তু কবি এই প্রেমকে, নারীর এমন প্রকৃতিগত করিয়া দেখিয়াছেন যে, খাঁটি বাঙালী ঘরের বধূও রাক্ষস-বধূ প্রমীলার রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রমীলা যখন বলে—

লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে! * * *
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি', জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে; যা থাকে কপালে।

—তখনও সে যাহা, আবার যখন স্বামীর অনুগমন করিয়া মৃত্যুর দুর্গমতর পথে যাত্রা করিবার কালে সে বলে—

—লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।...
কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে। যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু গো আজি তাঁর সাথে;

—তখনও সে সেই একই নারী। অতএব, মধুসূদন্ এ চরিত্রের আদর্শ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন—কোন্ বিদেশী বা স্বদেশী কাব্যের, অথবা দেশের অতীত বা সমসাময়িক ইতিহাসের—কোন্ নারী-চরিত্র তাঁহার কল্পনার সহায় হইয়াছিল, সে বিচার নিতান্তই গৌণ। কারণ, প্রমীলার বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি এ চিত্রের আধখানা মাত্র—সেই আধখানাকে পৃথক করিয়া দেখিলে, এ চরিত্রের কিছুই দেখা হয় না; বাকি আধখানা যখন যোগ করিয়া দেখি, তখন সে এমন একটি চরিত্র যাহা কোন কাব্যে বা ইতিহাসে নাই। তাই সেরূপ আলোচনা শুধু বৃথা নয়, তাহা ভ্রমাত্মক; তাহাতে প্রমাণ হয় যে, রসসৃষ্টির যে মূল রহস্য, কাব্য সমালোচনায় তাহারই সন্ধান লওয়া হয় না। প্রমীলার চরিত্রে কবি আমাদের দেশের মূক দাম্পত্য-প্রেমকে যে মুখরতা দান করিয়াছেন, এবং তাহারই যে দুঃসাহস, তাহাতেই নবযুগের নব্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছে; এই মুখরতাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যে দাম্পত্য-প্রেমকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—সে মুখরতাও অল্প নহে, যদিও উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ কল্পনায় তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে-প্রেমে আমাদের দেশের সেকালের সীমন্তিনীরা স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন তাহাও কম প্রখর—কম উদ্বেল ছিল না; তাহাতে depth অপেক্ষা tumult of the soul-ই অধিক থাকিত; কেবল, শাস্ত্রসংস্কার ও লোকাচারের কঠিন গুণ্ঠনে আবৃত থাকায় সে মুখের—সে চোখের দীপ্তি তেমন ধরা পড়িত না।

৫

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনাবস্তুর সঙ্গে সীতা-চরিত্রের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই ; যে কল্পনা এ কাব্যের আখ্যান গড়িয়াছে ও তাহার উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে—সীতা-চরিত্র যেন সে কল্পনার বাহিরে। এ জন্য কবি যেন সীতা-চরিত্র অঙ্কনে একটি স্বতন্ত্র তুলিকা ব্যবহার করিয়াছেন—সে যেন তাঁহার বিশ্রাম-মুহূর্ত্তের স্বপ্ন-রচনা! পুরীর মধ্যে ও পুর-প্রাচীরের বাহিরে সমবেত অগণিত বীরবাহিনীর তূর্য্য ও পটহ-নিনাদ হইতে দূরে, স্নিগ্ধ শীতল পল্লব-ঘন প্রচ্ছায় কাননতলে বসিয়া, কবি যেন কিয়ৎকালের জন্য একখানি বাঁশি লইয়া প্রাণের নিভৃত রাগিণী আলাপ করিয়াছেন—নিদাঘ-দিবার দীপ্ত দ্বিপ্রহর যাপনের পর, গোধূলি-সন্ধ্যার একটিমাত্র তারার পানে চাহিয়া, জননান্তর-সৌহৃদ-স্মৃতির মত, আর এক পিপাসা অনুভব করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সমগ্র চতুর্থ সর্গটি আর সকল হইতে পৃথক ; সে যেন তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যস্থলে একটি স্তব্ধ শ্যামল প্রবাল-দ্বীপ—মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটি গীতি-কবিতা। কবি নিজেও এ-কাব্যের সহিত এরূপ শাখা-কাহিনীর (episode) সঙ্গতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি ইহার জন্য একটু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।—

I think I have constructed the Poem on the most rigid principles, and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it?

কৈফিয়ৎ দিবার কথাই বটে। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের কল্পনায় আমরা কবিমানসের যে পরিচয় পাই—সে কাব্যের নায়ক-নায়িকা যে

আদর্শে গঠিত, তাহা যখন স্মরণ করি, তখন কবির এই স্বধর্ম্ম-চ্যুতির জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারি। কবি তাহার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারিয়া, শেষে বলিয়া উঠেন—'But would you willingly part with it?' কিন্তু, সত্যই কাব্যের রচনা-কৌশলের দিক দিয়া কৈফিয়ৎ দিবার কোন প্রয়োজন নাই—রীতিমত মহাকাব্যের গঠনে এইরূপ শাখা-কাহিনীর স্থান আছে ; সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এইরূপ। মূল কাহিনীর প্রসাধন-স্বরূপ—তাহার বৈচিত্র্যবিধানের জন্য—শাখা-কাহিনী থাকাই আবশ্যক ; তাহাতে দীর্ঘ একটানা আখ্যানের ক্লান্তি-বিনোদন হইয়া থাকে ; পাঠকের চিত্ত প্রসঙ্গান্তরে আকৃষ্ট হইয়া, শেষে নবীভূত কৌতূহলে মূল কাহিনীতে ফিরিয়া আসে। কেবল, ইহাই দেখিতে হইবে যে, এরূপ প্রসঙ্গ যেন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, অথবা মূল কাহিনী অপেক্ষা দীর্ঘ বা অধিকতর চমকপ্রদ না হয়। সীতার কাহিনীতে এ অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে—শুধুই বিষয়ের বৈচিত্র্যে নহে ; কবি এই শাখা-কাহিনীর সুযোগে মূল কাহিনীর পূর্ব্ব-পর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকের গোচর করিয়াছেন—সীতার হরণ-কাহিনী ও তাহার উদ্ধারের কাহিনী সুকৌশলে ইহার মধ্যে বলিয়া লইয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন, তিনি যে ভাবে ও যে সুরে, এই খণ্ড-কাহিনী রচনা করিয়াছেন—নূতন ছন্দের সর্ব্বভাব-বহন-ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ, তাহাও একটা বড় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। যে ছন্দে প্রমীলা ও মেঘনাদের মূর্ত্তি গঠন করা যায়, সেই ছন্দেই যে সীতার মত একটি লিরিক-প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে—সে দৃষ্টান্ত কম মূল্যবান নহে। তাই নিছক কাব্য-কলার দিক দিয়া এ সর্গ আগন্তুক বা অবান্তর নয়।

কিন্তু কবি-মানসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সীতা-চরিত্র তাহার পক্ষে অভাবনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। মনে হয়, এ যেন কবির

নিজেরও অজ্ঞাত কোন সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীর আকস্মিক ঝঙ্কার—ইহা যেন কোন্ দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার কাণে বাজিতেছে, ইহাকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারা যায় না! তাই এই সুরের প্রতিমাকে অশোক-কাননে বসাইয়া, নিজে সরমা সাজিয়া, কবি ইহার ললাটে সিন্দুর দিয়া পদধূলি লইয়াছেন। বিস্ময়ের কথাই বটে—মেঘনাদবধ কাব্যের কবির মানসে সরস্বতীর এ-রূপ কেমন করিয়া ধরা দিল! এ যেন—

কপোলে সুধাংশু-ভাস,
অধরে অরুণ-হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু—প্রভাতের তারা জলে।

ইহাকে দেখিয়া সেই আর এক কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

এস মা করুণা-রাণী
ও বিধুবদন খানি
হেরি' হেরি' আঁখি ভরি' হেরি গো আবার।
শুনে সে উদার কথা,
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!

—বিহারীলালের সেই প্রভাতের শুকতারাই এ কাব্যের সীতা; এখানে সে গোধূলি-ললাটের তারারত্ন হইয়া জলিতেছে। এ সরস্বতীও তেমনই 'করুণা-মেয়ে'; কেবল, বিষাদের অস্ত-কিরণে সেই তরল মুকুতা-বিম্ব সুবর্ণের দীপ-বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। বিহারীলাল যাহার ধ্যান করিতে বাল্মীকিকে স্মরণ করিয়াছেন, মধুসূদন তাহার চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন যে-সর্গে তাহার আরম্ভে তিনিও বাল্মীকি-বন্দনা করিয়াছেন। এ যেন একটি পূজা-গৃহ, এখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কবিকে কায়মনোবাক্যে শুচি হইতে হইবে; তাই সে বন্দনা কেবল একটা মঙ্গলাচরণ নয়—কবির একান্ত ব্যক্তিগত ও আন্তরিক স্তুতি—

নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,

তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।

'তব অনুগামী দাস'—কবি ঠিকই বলিয়াছেন, সীতাচরিত-রচনায় তিনি আপন পথের পথিক নহেন; যে পথে বাল্মীকি ও বাল্মীকির অনুগামী রামায়ণ-কথা-কোবিদগণ গিয়াছেন, এখানে তিনিও সেই পথে চলিয়াছেন। কিন্তু সে পথে চলিবার পাথেয় তাঁহার আছে কিনা সন্দেহ—সে তীর্থে যাইবার মত অন্তরের ধন-বল কোথায়? তাই তিনি চলিয়াছেন—"রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে"। যেন তিনি জানেন যে, তাঁহার মত কবির পক্ষে সীতাচরিত-কীর্ত্তন—বিষয়মদমত্ত গৃহীর তীর্থদর্শনের মত। কিন্তু এ অভিলাষ তাঁহার কেন হইল? সে প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, মধুসূদন, পুরুষের পৌরুষ ও মানুষের মনুষ্যত্ব-গৌরব সম্বন্ধে যে-ভাবের ভাবুক হউন—মাতৃস্তন্যরসের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই; আমাদের ঘরের সেই নারীমূর্ত্তি, সেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী-কন্যা, সেই আত্মমুগ্ধা, পরগতপ্রাণা, স্বার্থে দুর্ব্বলা, ত্যাগে মহাবীর্য্যবতী মানবী-রূপিণী দেবীর মহিমা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই। এজন্য প্রমীলা-চরিত্রও সেই নারীরই এক নূতন সংস্করণ হইয়াছে মাত্র—নারীচরিত্রের কল্পনায় তাঁহাকে সকল আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই নারীই তাঁহার সেই নবযুগের বিদ্রোহী কবিচিত্তকে—তাঁহার কল্পনার বিপরীতমুখী আবর্ত্তকে—একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুর শাসনে রাখিয়া, এ কাব্যকে খাঁটি বাংলা কাব্য করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মন যত উর্দ্ধে, এবং যত দূরেই বিচরণ করুক—আমাদের গৃহ-সংসারের যজ্ঞবেদিকায়, নিত্যসেবার হোমানল জ্বালিয়া, যে নারী-ঋত্বিক দুই করপুটে নিজের তনু-মনঃপ্রাণ আহুতি দিয়া থাকে, কবির হৃদয় বার বার ফিরিয়া আসিয়া তাহারই

চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। বাঙ্গালী কবির অন্তরের সেই অবশ আকর্ষণের ফলে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সীতাচরিত-গাথা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। কবির জাগ্রত চেতনায় এ কাব্যের পক্ষে যে কাহিনী অবান্তর বলিয়া মনে হইয়াছে, অন্তরের গভীরতর প্রেরণার বশে সে কাহিনীকে তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

তথাপি সীতা মধুসূদনের মানস-দুহিতা নয়—সে দাবি প্রমীলার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ কথাও বলিয়াছি যে, নারীপ্রেমের যে দুই মূর্ত্তি কবি এ কাব্যের বহিরঙ্গনে ও অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার একটিতে আছে—কবিচিত্তের রতি, অপরটিতে আছে আরতি। প্রমীলাই তাঁহার মানসী; মধুসূদন, পাশ্চাত্য জীবনে ও কাব্যে, প্রেমের যে প্রোজ্জ্বল দাহন-দীপ্তি দেখিয়া নিজের জীবনেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাকেই, কাব্যে কল্পনার উচ্চ-আদর্শে মণ্ডিত করিয়া তিনি প্রমীলা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ চরিত্রে—সাত্ত্বিক আত্মস্থতা নয়, আধ্যাত্মিক অমৃতও নয়—আধিভৌতিক দেহ-চেতনার বিক্ষোভ, হৃদয়বৃত্তির প্রবল আক্ষেপ, এবং তাহার মহনীয় পরিণাম যে মৃত্যু, তাহাই তাঁহার রোমান্টিক কবি-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত কবিতায় যে আছে—'যাহা মরণীয় যাক ম'রে', সে মরণীয় অর্থে বাসনা-কামনার বিক্ষোভ নয়—সেই কামনা-বাসনার মধ্যেই যাহা কিছু দুর্ব্বল, তাহাই মরণীয়। মধুসূদনও তাঁহার আদর্শ-নায়িকার মধ্যে কামের সেই দুর্ব্বলতার ভস্ম নয়—তাহার রুদ্র বহ্নিশিখাই দেখিতে চান। প্রমীলার প্রেমে কবি যেমন দেখিয়াছেন মিলনকে—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার কাহিনী প্রখর-মিলনের কাহিনী, তেমনই সীতার প্রেমে কবি দেখিয়াছেন—প্রশান্ত বিরহকে। সীতার আদর্শ প্রমীলার ঠিক বিপরীত; ইহাতে নাটক বা মহাকাব্যের

স্বর্গমর্ত্ত্যগ্রাসী, অথচ আত্মঘাতী, প্রেমের বিজয়-গৌরব নাই। এ প্রেম মৃত্যুতেই মহনীয় নয়—ইহা আত্মার তপশ্চরণ; ধ্যানে ও স্বপ্নে, সংযমে ও ধৈর্য্যে, ইহার বিচ্ছেদ সুসহ বলিয়াই মহিমময়—'দুঃসহ-সুন্দর' নয়। যে প্রেম মহাশ্বেতার মত, প্রিয়তমের মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া, বিরহ-রজনীর যুগান্ত যাপন করে, অন্তরে ভাব-সম্মিলনের অমৃত-নিষেকে ভাবী মিলনের আশাকে সঞ্জীবিত রাখে—অশোককাননে সেই সাত্ত্বিক প্রেমের লিরিক-মূর্চ্ছনা শরীরী হইয়া, নিয়মক্ষামমুখী একবেণীধরা বিরহিণীর বেশে, বিরহকে তারাকুন্তলা তমস্বিনীর মত জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। এ প্রেমের বেদনাও যেমন—'majestic pains,' ইহার সুখও তেমনই—'calm pleasures'। ইহার বেদনাও যেমন গভীর, স্তব্ধ, উদার; সুখও তেমনই সহজ শান্ত, সরল। সীতার মুখে আমরা প্রিয়-মিলনের যে সুখস্মৃতি-কাহিনী শুনিতে পাই, তাহা প্রখর মিলনের মত নয়; সে সুখে উন্মাদনা নাই, প্রাণের পরিতৃপ্তি আছে।—

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে। কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্রকথা

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে,
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও এ বিজন বনে
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর বাণী!

কিন্তু সীতা চরিত্রে কবি যে-প্রেমের ধ্যান করিয়াছেন তাহা শুধুই দাম্পত্য প্রেম নয়—সেইখানেই তাহার শেষ নয়। ইহা সেই প্রেম যাহা নরনারীর যুগল-হৃদয়ে জন্ম লাভ করিয়া শেষে করুণা বা মৈত্রীর মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করে। বিহারীলালের সারদা-প্রেমে আমরা যে-প্রীতির সাধনায় বিশ্বাত্মীয়তা-বোধের আভাস পাই, মধুসূদনের সীতা-চরিত্রে আমরা সেই করুণাকেই প্রেমের পরিণতিরূপে দেখিতে পাই। সীতাও যেন মূর্ত্তিমতী করুণা—সেই করুণার মূলে আছে এই পতি-প্রেম। মনে হয়, ইহাই স্বাভাবিক; যে-প্রেম ব্যক্তির সমগ্র সত্তায় পুষ্পিত হইয়া উঠে, তাহা বিশ্বাত্মীয়তায় পর্য্যবসিত না হইয়া পারে না; যাহাতে আত্মার আনন্দ, তাহার অনুকম্পার সীমা নাই। বিহারীলাল ঘুমন্ত প্রেয়সীর মুখপানে চাহিয়া ভাবঘোরে গাহিয়াছেন—

বিমল আননে তোর
জাগিছে মুরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দুটি যেন ধ্যানে নিমগন।

—প্রেয়সীর মুখে কবি নিজ-মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন, ইহাও এক প্রকার মিষ্টিক অনুভূতির কথা। এই আত্মপর-ভেদ ঘুচিয়া যাওয়া যে অবস্থায় সম্ভব হয়, তাহাতেই এমন কথা বলা আশ্চর্য্য নয় যে—

তোমার পবিত্র কায়া
প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই!
ভালবাসি নারী-নরে,

ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

সীতার ভালবাসাও এই ভালবাসা, কেবল বিরহের অন্ধকারে চাঁদের কিরণ এক্ষণে ঢাকা পড়িয়াছে। 'ভালবাসি নারী-নরে, ভালবাসি চরাচরে' এ কথা সীতার পক্ষে আরও সত্য। সীতা কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, এমন কি, মহাশত্রুরও নয়। তাহার নিজ হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় দুঃখ তাহাকে সংসারের উপরে বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট করে নাই; সকল দুঃখীর দুঃখ সে আপনার দুঃখ দিয়া বুঝিয়াছে—পরকে দুঃখ দিয়া সে নিজের সুখ চায় না। তাহারই উপরে পাপাচরণ করিয়া যাহারা সেই পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছে, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের সেই পাপের জন্যও সে আপনাকেই দায়ী করে। যে ইন্দ্রজিৎ না মরিলে সীতার উদ্ধার নাই, সেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া, সরমা যখন তাহাকে এ সংবাদও শুনাইল—

দৈত্যবালা প্রমীলাসুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা—
প্রমীলাসুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি।

তখন—

ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতা-রূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল-আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজ-সিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!"

—এই যে 'মূর্ত্তিমতী "দয়া', ইহারও আদি মূর্ত্তি প্রেম; ইহাকেই বলে প্রেমের রূপান্তর। নারীর সকল সাধনাই প্রেমে আরম্ভ; ইহা পুরুষের অধ্যাত্ম-সাধনা নহে। করুণা বা মৈত্রীর সাধনায় পুরুষের পন্থা অন্যরূপ—সেখানে জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, বৈরাগ্য আছে; এখানে আছে কেবলমাত্র হৃদয়।

মধুসূদন তাঁহার কাব্যে পুরুষের পৌরুষের সঙ্গে নারীর নারীত্বকেও তাহার শ্রেষ্ঠ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইহাতে প্রমাণ হয়, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কল্পনায় কবির সমগ্র কবি-সত্তা সাড়া দিয়াছে। এই কাহিনীর অনতিপ্রসর পটভূমিকার মধ্যেই কবির অতিক্ষিপ্র তূলিকা, জীবনের বর্ণভাণ্ড হইতে অনেকগুলি রং লইয়া, তাহাদের সন্নিবেশে চিত্রের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। সীতা চরিত্র এ কাব্যের কাহিনী-অংশের বহির্ভাগে থাকিয়াও কবির কল্পনাকে কতখানি সার্থক করিয়াছে,

সে ধারণা কবিরও ছিল না; প্রেমের যে আদর্শ তাঁহাকে সজ্ঞানে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নির্জ্ঞানে তাহার বিপরীতই যে তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে—তাঁহার কল্পনা যখন রণবাদ্যমুখরিত নারীসেনার শোভাযাত্রায় নিশীথ-আকাশে মশাল জ্বালাইয়া প্রেমের গৌরব কীর্ত্তন করিতে ব্যাপৃত ছিল, তখন প্রাণের গভীরতর নিশীথে, সেই কল্পনাই যে, তুলসীর মূলে সেই প্রেমের সুবর্ণ-দেউটি জ্বালাইতে অধীর হইয়াছে, তাহা কবিরও অগোচর ছিল। বাংলার এই কবি-শিশুর দুরন্ত হৃদয়, এমনই করিয়া সেই দুরন্তপনার মধ্যেই, নিজের জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কাব্যবস্তু যেমনই হউক—বিজাতীয় আদর্শের সঞ্জীবনী প্রেরণা তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যতই সহায়তা করুক, কবি যে তৎসত্ত্বেও তাঁহার কবিতাকে কুলত্যাগিনী হইতে দেন নাই, ইহাই মধুসূদনের কবিশক্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন; এবং এইজন্যই সেকালের শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই এ কাব্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সীতা

স্বর্ণ-দীপ্তি-স্তিমিত কৃশাণু
হসন্তিকে হাসিছে মধুর,
নির্ম্মল সুনীল নভোতলে
সবিনয়ে জাগে জ্যোৎস্নাভাস,
পূর্ণেন্দু তুষার-কান্তি
নহে দূর নেপথ্য-বিহারী,
ভাবাবিষ্ট প্রফুল্ল অনিল
অমিয়ার্ত্ত হতেছে ক্রমশঃ,
শিলা-সেতু অতীত কাহিনী,
রামপুর নহে সুদুর্গম,

নষ্ট-প্রায় লক্ষ গণ-কীট,
পীন-দর্প হয়েছে লুণ্ঠিত;
ইন্দ্র দেন শম্ভুরে সান্ত্বনা
ইন্দ্রজিত-হেরম্ব নিহত,
বদ্ধ-কটি হনুমন্ত-বীর,
বিভীষণ দত্ত-বুদ্ধি-বল;
রাম-যুদ্ধ হবেই সফল
মর্কটের ওঠে জয়োল্লাস
তবু কেন দুখে গুমরাই
অশোক কাননে কাঁদে সীতা।

সাম্প্রতিক কবিতার সাফাই

প্রথমেই কোন একজন অখ্যাত কবির বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়িতেছে—

"All work and no play
Made Jack a dull boy."

অনেকেই—এমন কি স্বয়ং কবিও—হয়তো লক্ষ্য করেন নাই যে, কাব্যের উৎপত্তির গোড়ার কথাটুকু অতি প্রচ্ছন্নভাবে এই উক্তিটুকুরই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। শুধু বেচারা জ্যাক কেন, যে কোন মানুষই, সারাক্ষণ যদি কাজই করিত, তাহা হইলে dull না হইয়া তাহার উপায় থাকিত না। কর্ম্মসর্ব্বস্ব জীবনের মরুভূমিতে কাব্যোদ্যানের উদ্ভব অসম্ভব।

এ বিষয়ে কোন বাঙালী কবি লেখেন নাই, কাজেই ইংরেজী কবিতা হইতেই উদ্ধৃত করিতে হইল। Geoffrey Newton তাঁহার "Work and Poetry" নামক কবিতায় বলিতেছেন :

God at first the workman made,
Who worked and worked—did nothing more.
God saw and saw, and then He said :
'I fear this boy will make the shore
Of earth a desert. So I'll send
To earth an angelic lovely soul,
With music all his words to blend,
To infuse the part with a sense of the whole,
To give earth what it more than needs,
To save man from ever moving away,
From Me his Maker, to sow the seeds
Of endless Joy for endless day.'

So on earth did the Poet appear
His soul all afire with vision ;
To bridge the gulf of Far and Near
In a mystic sweep was all his mission.

• • •

The workman works on day and night
Ah ! what comes out of his endless work ?
The Poet sings with his lute to light
The eternal lamp in the eternal dark.

Newton নিজে উগ্ররকমের কল্পনা-বিলাসী কবি। কাজেই কর্ম্ম এবং কর্ম্মীর প্রতি হয়তো তিনি কিছুটা অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু সেই অবিচারটুকুকে বিচার বলিয়া না মানিলেও কবি মোটামুটি যে সত্যটি খাড়া করিতে চাহিয়াছেন, সেটার সঙ্গে মত মেলানো খুব কঠিন নয়।

কর্ম্মী এবং কবি—দুইজনে জীবনকে আলাদা চোখে দেখেন ; কারণ দুইজনেই এক চোখে দেখিলে দুইজনের মধ্যে কোন তফাত থাকিত না। তাহা ছাড়া কর্ম্মী কবির চোখে জীবনকে দেখিতে সুরু করিলে কর্ম্মের পক্ষে সেটা যত বড় ট্র্যাজেডি, কবি কর্ম্মীর চোখে জীবনকে দেখিতে সুরু করিলে কাব্যের পক্ষেও সেটা তত বড়ই ট্র্যাজেডি।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, কর্ম্মময় যুগে শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয় নাই। কারণ, কর্ম্মময় আবহাওয়া কাব্য রচনার অনুকূল নহে, এবং সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই হইবে যে, এ ক্ষেত্রে বীজ, জমি ও ফসলের যে সম্বন্ধ—স্রষ্টা, আবহাওয়া ও সৃষ্টিরও অনেকটা সেই রকমেরই সম্বন্ধ। ইংরেজী সাহিত্য-জগতের রোমান্টিক যুগের কবি শেলী বর্ত্তমান যুগে জন্মিলে আর যাই হোন শেলী হইতে পারিতেন না। এমন কি, আমার মনে হয়, Shakespeare Elizabethan যুগে

না জন্মিলে আমরা Shakespeareকে পাইতাম না। কারণ মানুষ যেমন যুগ সৃষ্টি করে, যুগও তেমনই মানুষ সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে Oscar Nicholson বলিতেছেন—

The modern age is characterised by three things—work, work and work. A modern epic—if we use the word 'epic' in the true sense of the term—is therefore a ridiculous, even ludicrous, contradiction in terms. We cannot sanely expect a modern Homer or a modern Virgil. And it would be perilously akin to folly to expect a 20th century Milton. The English poem that can claim to be the nearest approach to the epic is undoubtedly Milton's 'Paradise Lost.' And we all know that this great poem was written by the great poet when he was by blindness cut off from the work-a-day world, when he was obsessed by none of the three characteristic obsessions of the modern age—work, work and work.

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান যুগ কর্ম্মপ্রধান বলিয়াই বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্য সৃষ্টি সম্ভব নহে।

De Quincey তাঁহার English Mail Coach-এ বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানে আমরা গতির বেগ বাড়াইতেছি বটে, কিন্তু গতির রোমান্স হারাইতেছি।" কথাটি অতি সত্য—অহিফেন-বিলাসীর প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।

আমাদের জীবন তুফান-মেলের মত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অধীর বেগে; যে ধীরতা কাব্য-সৃষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, আমাদের জীবনে তাহার একান্তই অভাব। প্রাচীন চিত্রলিপি হইতে আক্ষরিক লিপি এবং আক্ষরিক লিপি হইতে শব্দলিপি (বা stenography) যে ভাবে এবং যে কারণে আসিয়াছে, অনুরূপ ভাবে এবং অনুরূপ কারণেই ক্রমে মহাকাব্যের স্থান দখল করিয়াছে কাব্য, এবং কাব্যের স্থান দখল করিয়াছে খণ্ড-কবিতা বা কবিতা-খণ্ড।

কিন্তু সেজন্য দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিবার কোন কারণ নাই। কারণ আমরা যাহা হারাইয়াছি তাহা যেমন হারাইয়াছি, যাহা পাইয়াছি তাহাও তেমনই পাইয়াছি; সুতরাং হারানোর দুঃখে পাওয়ার আনন্দ ভুলিলে অন্যায় হইবে।

অতি-আধুনিক কবিতার দিকে তাকাইলে দেখা যায়, এ যুগটা নেহাৎই ছোট কবিতার যুগ, এবং কবিতারও আজকাল ডেফিনিশন বদলাইয়াছে। এ যুগের অনেক কবিতাকেই কবিতা বলিয়া চেনা দুষ্কর—বিজ্ঞ লোক পরিচয় করাইয়া না দিলে। ইহারা যখন কবিতা নাম ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন মনে হয়, যেন বুকে ব্যাজ লাগাইয়া ইহারা ছদ্মবেশে সাহিত্য-জগতে বিচরণ করিতেছে।

মানুষ আজকাল ক্রমশ উদার হইতেছে, ভেদাভেদ ভুলিয়া যাইতেছে। এই ক্রমশ-উদারতা, এই ক্রমশ-ভেদাভেদজ্ঞান-লোপ যে সাহিত্য-জগতেও প্রবেশ করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কেন না, যুগধর্ম্মের প্রভাব হইতে সাহিত্য কিছুতেই মুক্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং কবিতার আকাশ যে রেখায় আসিয়া গদ্য-সমুদ্রে মিশিয়াছে, সে রেখাটি কুয়াশায় ঝাপসা বলিয়া আমরা যেন বিস্ময় বোধ না করি। যাঁরা authorityতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে এবারে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, স্বয়ং বিশ্বকবিও কবিতা-জগতে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রভাব মানিয়া লইয়াছেন।

এককালে সাহিত্যের গণ্ডি ছিল ছোট। সাহিত্য-সৃষ্টির ভার ছিল অল্প লোকের হাতে, এবং সাহিত্যের প্রচারও তেমন ব্যাপক ছিল না। অর্থাৎ জিনিসটা তখন ঠিক জনসাধারণী হইয়া উঠে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষুধা প্রায় সার্ব্বজনীন। সাহিত্য-জগৎ ভিড় ও ঠেলাঠেলিতে ওকালতি-জগৎকে হার মানাইয়াছে। ওকালতিতে

নামিতে হইলে অন্তত আইন-পাসটা করিতে হয়, কিন্তু সাহিত্যিক হইতে হইলে ওসব পাসটাসের কোন বালাই নাই। সাহিত্য-সৃষ্টির দুইটি বিভাগের মধ্যে কবিতা-বিভাগটা গদ্য-বিভাগের চেয়ে সোজা, এই ধারণাটাই চলতি; ইহার অন্যতম কারণ হয়তো এই যে, কবিতায় যেমন মিষ্টিসিজ্‌ম চালানো যায়, গদ্যে তেমন চলে না। অর্থাৎ একটু কাব্য করিয়া বলিতে গেলে গদ্য লোকটা অত্যন্ত কড়া, হিসাবী এবং গোঁজামিল-বিরোধী; কিন্তু কবিতা লোকটা নেহাৎ ভালমানুষ। তাই সৃষ্টি-ক্ষুধার্ত্তদের দৃষ্টি প্রধানতই পড়ে কবিতার উপর। এমন কি অনেকের ধারণা, আমাদের সোনার বাংলার শতকরা নিরানব্বইটি সোনার ছেলেই গোঁফের রেখা দেখা দিবার পর হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত কবিতা-চর্চ্চা অথবা তাহার চেষ্টা করে। এই ব্যাপক কবিতা-চর্চ্চার সাক্ষাৎ প্রমাণ বা পরিচয় যে আমরা ব্যাপকভাবে পাই না, তাহার একমাত্র কারণ কাগজ এবং ছাপার দর এখনও জলের দরের সমতুল্য হয় নাই। এই কারণেই অসংখ্য কবিতা-কুসুম আমাদের চোখের আড়ালে ফুটিয়া চোখের আড়ালেই ঝরিয়া যায়। ইহা আমাদের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, এ আলোচনা এখানে অবান্তর।

যাহাই হোক, বার্ত্তমানিক কবিতা-সমুদ্রের জল বার্ত্তমানিক সাময়িক-পত্রিকাদির গ্লাস হইতেই আমাদের আস্বাদন করিতে হইবে। প্রাণী-জগতের survival of the fittest-এর মত কবিতা-জগতে publication of the fittest থিওরি যদি আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে প্রকাশিত কবিতা হইতেই বার্ত্তমানিক কবিতার বিচার করিতে হইবে।

বাংলা কবিতা ইতিপূর্ব্বে কখনও বিদেশী কবিতা দ্বারা এতদূর প্রভাবান্বিত হয় নাই। অতি-আধুনিক বাংলা কবিতায় অতি-

আধুনিক ইংরেজী কবিতার এমন বিকৃত প্রভাব দেখা যায় যে, মনে হয়, এর চেয়ে অনুবাদও বরং ভাল হইত।

কিন্তু এইরূপ বিকৃত প্রভাবের জন্য দুঃখে কাঁদিবার কোন কারণ নাই, কারণ ব্যাপক প্রভাবের যুগে বিকৃত প্রভাব দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নহে। এবং আমাদের দেশী কবিতায় বিদেশী কবিতার প্রভাব আছে বলিয়া লজ্জিত হইবারও কারণ নাই। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফরাসী, ইতালীয়ান এবং জার্ম্মান ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু সেজন্য ইংরেজী সাহিত্য লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া থাকিতেছে না। বরং বিদেশী সাহিত্যের যাহা ভাল জিনিস, তাহা নিজেদের সাহিত্যে গ্রহণ করিয়া হজম করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। বদহজম অনেক হইবে, ঘোলকেও হয়তো অনেক সময় দুধ বলিয়া ভুল হইবে। তা হোক।

আগেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান যুগ কর্ম্মপ্রধান। কর্ম্মপ্রধান বলিয়াই এ যুগে journalism-এর সৃষ্টি হইয়াছে। Journalism এবং সাহিত্যের মাঝখানে সীমারেখা টানা রীতিমত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Robert Lynd-এর কথা মানিয়া লইলে—"Literature that does not last is journalism; journalism that lasts becomes literature." কোন রচনা সময়ের ধোপে না টিকিলে তাহা জার্নালিজ্‌ম এবং টিকিলে সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়িবে।

বার্ত্তমানিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিতেছে—ইহাকে সত্যিকারের সাহিত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় কি না। শাশ্বত সাহিত্য রচনা করিতে পারিতেছে না বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচকগণ খড়্গহস্ত —অর্থাৎ তীক্ষ্ণ-কলম-হস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, শাশ্বত সাহিত্য কোমর বাঁধিয়া, প্ল্যান করিয়া বা

দল বাঁধিয়া সৃষ্টি করা যায় না। শাশ্বত সাহিত্য সময়মত নিজের গরজেই আত্মপ্রকাশ করে—ইহার প্রকাশ মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। ইংরেজ কবি শেলী বলিতেছেন—

Poetry is not like reasoning, a power to be exerted according to the determination of the will. A man cannot say 'I will compose poetry'. The greatest poet even cannot say it.

কাজেই বার্ত্তমানিক তরুণ কবিরা শাশ্বত কবিতা সৃষ্টি করিতে না পারার জন্য তাহাদিগকে বাতিল করিয়া দেওয়া অত্যন্ত অসমালোচকীয় ব্যাপার হইবে।

তাহা ছাড়া এ সম্বন্ধে ভাবিবার আর একটি দিক আছে। চিরদিন বাঁচিলে যেমন বাঁচিয়া থাকা এক বিড়ম্বনা হইত, সৃষ্ট সাহিত্যমাত্রেই শাশ্বত সাহিত্য হইলে তেমনই শাশ্বত সাহিত্যের কোন অর্থ থাকিত না। স্বর্গীয় ধনপতি পাগলা বলিত, "দুনিয়ায় রাবিশ মাল না থাকলে মাইরি পয়সার মালের পাত্তাই পাওয়া যেত না।" শুনিয়া এককালে হাসিয়াছি, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি, হাসা উচিত হয় নাই। যেদিন হইতে ধনপতির কথাটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, সেদিন হইতেই বুঝিয়াছি, অতি-আধুনিক বা বার্ত্তমানিক কবিতারও প্রয়োজন আছে, সার্থকতা আছে। এ ক্ষেত্রে Howard Winterton-এর চমৎকার উক্তিটি মনে পড়িতেছে—

"Out of pieces come masterpieces as even out of evil cometh good. Pea-cocks will come when they will come. Meanwhile let us smile for the cocks we have, and not pine for the pea we haven't."

(Winterton—Pieces and Masterpieces)

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ধনসাম্যবাদ

ধনসাম্যবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সম্প্রতি বাছা বাছা কয়েকজন সমাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তির বই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। কারণ অবশ্যই আছে। বিলাতী সওদাগরী অফিসের সামান্য বেতনের কেরানী আমি; আমি হঠাৎ ধনসাম্যবাদ লইয়া এতটা ক্ষেপিয়া উঠিলাম কেন, এ কথা অবশ্য অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে, আমার নাকি পলিটিক্স অর্থাৎ রাজনীতিতে বরাবরই একটা ঝোঁক আছে। কলেজে পড়িবার সময় পলিটিক্স লইয়া সরবে অযৌক্তিক তর্ক করাই নাকি আমার বিশেষত্ব ছিল, এবং তাহাতে বেশ একটু নামও কিনিয়াছিলাম। কলেজ ছাড়িয়াও সে অভ্যাস যায় নাই। ফুটবল খেলা, সিনেমা ও পলিটিক্সের আলোচনা করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আড্ডা দিয়াই জীবনের মূল্যবান তিনটি বৎসর নষ্ট করিয়াছি। তৎপরে শ্বশুর মহাশয়ের তদ্বিরে এই চাকুরিটি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। চাকুরিতে ঢুকিয়া আমায় পূর্ব্বজীবনের বহু অভ্যাসই ছাড়িতে হইয়াছিল। অযথা আড্ডা দেওয়া, সরবে তর্ক করা, রাত করিয়া বাড়ি ফেরা ইত্যাদি সবই আমায় ছাড়িতে হইয়াছিল। যাক, উহাদের সহিত রাজনীতি আলোচনাও ছাড়িয়াছিলাম। অতএব এবার আসল কথাটা বলাই প্রয়োজন। শনিবার সকাল সকাল অফিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছি। ধর্ম্মতলা-শ্যামবাজার যে ট্রাম যায়, আমি তাহারই একজন মাসিক টিকিটের দৈনিক যাত্রী। বউবাজারের মোড় পার হইয়া ট্রাম প্রায় মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় দেখিলাম, একদল লোক, সাধারণ দিন মজুর বলিয়াই মনে

হইল, প্রকাণ্ড একটা লাল ঝাণ্ডা লইয়া হল্লা করিতে করিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সহিত নেতাগোছের দুই-চারজনকেও দেখিলাম। পশ্চাতে ও সম্মুখে দুইটি করিয়া চারটি পুলিস রহিয়াছে। নেতাদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, "দুনিয়ার মজুর—" অমনই বাকি সকলে সমস্বরে চেঁচাইতেছে, "এক হও!"

"আমরা ডাল ভাত চাই!" "বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক!" ইত্যাদি কয়েকটি স্লোগান লেখা পতাকাও তাহাদের সহিত রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার শীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। সমাজতন্ত্রবাদ, লেনিন, রাশিয়া, স্টালিন, বলশেভিজ্‌ম, শ্রমিক-রাজ ইত্যাদি কত কথাই মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল আমার এক বন্ধুর কথা। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, এইজন্যেই চাই সোশালিজ্‌ম। কারণ সেদিন বিকালে তিনি চির-অভ্যাসমতই একটু বিশেষভাবে সাজিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং রাস্তায় বাহির হইবামাত্র একখানি স্পর্দ্ধিত প্রাইভেট কার তাঁহার সাদা কাপড়ে জল-কাদার দাগ ছিটাইয়া যেন তাঁহার আর্থিক অবস্থাকেই অবজ্ঞা করিয়া গর্ব্বভরে সবেগে চলিয়া গিয়াছিল। যেন এই কথাই বন্ধুকে বলিয়া গেল যে, যাহার মোটর চড়িবার ক্ষমতা নাই, তাহার ওরূপ ফরসা কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইবারও অধিকার নাই। অফিসের বড়বাবুর কথাও মনে পড়িল, লোকটা হাঁদা এবং 'অয়েলিং' করিতে সিদ্ধহস্ত, সেইজন্য সাহেবদের অধিকতর প্রিয়। মোট কথা, নানারূপ উচ্চ চিন্তাধারা আমার মাথায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। চারিদিকেই অত্যাচার অবিচারের বন্যা বহিতেছে দেখিলাম। আর ট্রামে বসিয়া থাকা সম্ভবপর হইল না। নামিয়া পড়িয়া শোভাযাত্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। মনে হইল, সর্ব্বাগ্রে ওই যে লাল ঝাণ্ডা, যাহা সর্ব্বহারাদের

প্রতীক, উহা বহন করিয়া উন্নতমস্তকে স্ফীতবক্ষে আগাইয়া যাওয়াই আমার উচিত। কিন্তু সাহসে কুলাইল না। যাই হোক, শোভাযাত্রা মোড় ফিরিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে অগ্রসর হইল। আমিও পিছনে চলিতে লাগিলাম। শুনিলাম, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শ্রমিকনেতা কম্‌রেড পারলেকার বক্তৃতা দিবেন। পার্কে গিয়া দেখি, বিরাট ব্যাপার। অগণিত লোক জমা হইয়াছে ওই ক্ষুদ্র পার্কটিতে। চতুর্দ্দিকের রাস্তা দিয়া তখনও বহু শ্রমিক ও জনসাধারণ তথায় আসিতেছে।

বাড়ির বারান্দায়, ছাদে, গাছের উপরে কোথাও আর বাকি নাই; একেবারে ন স্থানং তিলধারণং। বক্তৃতামঞ্চ বাঁধা হইয়াছে ও তাহা কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত লাল শালুতে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মঞ্চের উপর সুদৃশ্য মাইক্রোফোন শোভা পাইতেছে। কোনমতে একটু জায়গা করিয়া যতটা সম্ভব মঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইলাম। ঠিক ৫টা বাজিয়া ৪৫ মিনিটের সময় কম্‌রেডের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বিরাট জনসমুদ্র তাঁহার জয়রবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, ইহাদের নেতৃত্বই সার্থক। জনতা একটু শান্ত হইলে উদ্বোধন-সঙ্গীত আরম্ভ হইল,—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। সেই গান অ্যাম্‌প্লি-ফায়ারের ভিতর দিয়া আসিয়া মস্তকের শিরায় শিরায় পশিয়া যেন আমার মধ্যে একটা উদ্দীপনার স্রোত বহাইয়া দিল। মনে হইল, জীবনটা বৃথাই কাটাইতেছি। ইহার চেয়ে শ্রমিক হওয়া অনেক ভাল ছিল। আর কিছু থাক না থাক, যখন তখন মীটিং করিবার ও শুনিবার স্বাধীনতাটুকু অন্তত থাকিত।

দুই-চারিজন ছোটখাটো নেতার বক্তৃতা হইবার পর আসল লোকের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাহা খবরের কাগজে আপনারাও পড়িয়াছেন। উঃ! কি জ্বালাময়ী সে ভাষা! অবশ্য হিন্দী। কংগ্রেস হইতে

সাম্রাজ্যবাদ কিছুই বাদ গেল না। সর্ব্বহারা-সমাজকে ঠকাইতে ইহারা সকলেই বিশেষরূপে অভ্যস্ত। অতএব পৃথিবীব্যাপী এক শ্রমিক-রাজ চাই; না হইলে অচিরাৎ ধ্বংস। প্রচুর হাততালি ও ততোধিক কলরবের মধ্যে মীটিং শেষ হইল। পার্ক হইতে বাহির হইয়া আমি দ্রুতবেগে বাড়ির দিকে চলিতে লাগিলাম। বেশ বুঝিলাম যে, রক্ত উষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সে সময় অফিসের বড়বাবুকে পাইলে বোধ হয় মার লাগাইতেও পশ্চাৎপদ হইতাম না। একটা ঘুষি নিশ্চয়ই ঠিক নাকের ডগাটায় লাগাইতাম। ইহাই হইল প্রকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। প্রকৃত ইতিহাস যাহাই হোক, আমাকে যেন নেশায় পাইয়া বসিল। ঠিক করিলাম, পাশের বাড়ির ছোকরাটির নিকট হইতে বই চাহিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিব। পাড়ায় সোশালিস্ট বলিয়া ছোকরার খ্যাতি আছে। পরদিন সকালেই তাহার বাড়িতে যাইয়া তাহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া আমার মহৎ সংকল্প জ্ঞাপন করিলাম। প্রথমে সে হাঁ-না কিছুই বলিল না, বরঞ্চ কেমন একটা অবিশ্বাসের ভাব তাহার মুখে প্রকটিত হইয়াছে দেখিলাম। কিন্তু আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে বই দিতে রাজি হইল। বলিল, আমি তো মশাই, কেরানী-বাবুদের এক আলাদা জীব ব'লেই জানতাম। যাই হোক, আপনার এদিকে ইণ্টারেস্ট আছে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। হায়রে! কেরানী-বাবুদের প্রতি করুণা কে না করে; অফিসের সাহেব হইতে বাড়িতে স্ত্রী পর্য্যন্ত; এমন কি, যাহারা বেকার বসিয়া থাকে তাহারাও! বেকার অবস্থায় আমি নিজেই করিয়াছি। তখন ভাবিতাম, কি একটা অঘটনই না ঘটাইব এ জগতে! যাক, প্রতিবাদ করিলাম না। খান-কয়েক বই লইয়া চলিয়া আসিলাম। গভীর মনোযোগ সহকারে আমার পড়া আরম্ভ হইল।

কিছুদিন বাদে অফিসে যাইয়া একটি মানিঅর্ডার পাইলাম। শ্বশুর মহাশয় পূজার তত্ত্ব উপলক্ষে পাঠাইয়াছেন। মনটা বেশ প্রফুল্ল হইল। সেদিন টিফিনের সময় গিরিশকে ডাকিয়া এক কাপ চা ও একটা সিগারেট খাওয়াইয়া দিলাম এবং মনের আনন্দে ঝাড়া আধ ঘণ্টা তাহাকে সোশালিজ্‌মের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনাইয়া দিলাম। সে বেচারী অবাক হইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রাধাদা, তুমি আবার পলিটিক্‌স চর্চ্চা কর নাকি? কিন্তু একটু সাবধান হয়ো দাদা; যা দিনকাল পড়েছে! গিরিশ আমার সহকর্ম্মী। এবার আমারও করুণা হইল—টিপিক্যাল কেরানী। নূতন আলোকের, নূতন সত্যের সন্ধান উহারা রাখে না। সমাজের খবর জানিতে চায় না। জানে কেবল অফিসটি এবং বাড়িটি। যাকগে, বড়বাবুকে ধরিয়া সেদিন একটু তাড়াতাড়ি ছুটি লইলাম। পুলকিত মনে অফিস হইতে বাহির হইলাম। অনেকদিন সিনেমা দেখা হয় নাই। উদ্দেশ্য মেট্রোতে মালিনকে দেখিয়া একেবারে বাড়ি ফেরা। চলিতে চলিতে অনেক চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হইতে লাগিল। অনেকদিন হইল, সুধীরা একটা 'সবিতা' শাড়ি কিনিয়া দিতে বলিয়াছিল, এবার তাহা দিতে হইবে। নিজেরও একজোড়া জুতার প্রয়োজন। খোকারও রঙিন সিল্কের পাঞ্জাবি দরকার। এবার সব হইবে। কোটের ভিতরের পকেটে হাত চালাইয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র মানিব্যাগটি ঠিকই আছে। কেবল একটু স্ফীতোদর মাত্র।

সিনেমা দেখিয়া বাড়ি ফিরিতেছি। মাঝে কলেজ স্ট্রীটে নামিয়া শাড়িটা কিনিয়া লইলেই চলিবে। আগামী রবিবার খোকার জুতা ও জামা কিনিয়া দিব। ট্রামে অতিরিক্ত ভিড়। এত লোক কোথায় ছিল, কে জানে? জায়গা নিমেষমাত্র খালি থাকিবার উপায়

নাই। উপরন্তু অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। সকলেরই বা একসঙ্গে যাইবার তাড়া কেন, কে বলিবে! বহুকষ্টে কোন-মতে স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইলাম। মনের আনন্দে ধূম উদ্গীরণ করিতেছি। ওয়েলিংটনের মোড় ফিরিতেই কণ্ডাক্টার আসিয়া উদয় হইল। মাসিক টিকিটের যাত্রীর উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য ও তাচ্ছিল্যতা সহকারে বাহিরের দিকে চাহিয়া টিকিট দেখাইবার জন্য কোটের ভিতরের পকেটে হাত দিলাম। হাত দিয়াই চক্ষুস্থির। আমার মানিব্যাগও নাই, মাসিক টিকিটও নাই। উভয়েই অদৃশ্য হইয়াছে। টিকিটটি ব্যাগেরই একটি গর্ভে থাকিয়া অভ্রাবরণের মধ্য দিয়া সামান্য আত্মপ্রকাশ করিত। মুখের যে ভাব তখন প্রকাশ পাইল, তাহা অবর্ণনীয়, কারণ নিজেরও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে একটা ভাব যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইলাম কণ্ডাক্টারের কথায়, কি হ'ল সার্, ও রকম ক'রে তাকাচ্ছেন কেন? কিছু না।—বলিয়া চট করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম। ট্রাম তখন বউবাজারের মোড়ের কাছাকাছি। মনে হইল, বুকটা খালি হইয়া গিয়াছে। কে যেন কতকগুলি পাঁজরা খুলিয়া লইয়াছে। কি যে হইল তাহা ভাবিতেই খানিকক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। অবশেষে বুঝিলাম যে, পিক্‌পকেট হইয়াছে। কিন্তু কখন হইয়াছে বা কি করিয়া হইল, তাহা বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। অতীব ক্ষুণ্ণমনে বাড়ির দিকে চলিলাম। হায় রে! এ যে ক্ষুধার্ত্তের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া। ক্ষণপূর্ব্বেই যে একটুখানি তৃপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অমন চট করিয়া নামিয়া পড়িবার জন্য কণ্ডাক্টারই বা কি ভাবিল! হয়তো মনে করিল যে, টিকিট ছিল না বলিয়াই কায়দা করিয়া নামিয়া

পড়িয়াছি; হয়তো বা আমাকেই চোর জুয়াচোর বা পকেটমার ভাবিয়াছে। আশেপাশের অন্যান্য যাত্রীরাই বা কি ভাবিতেছে! দুত্তোর, আর কোন চিন্তাই করিব না। বাধ্য হইয়া হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিব এবং কোনরূপ দুঃখ করিব না। যাহা ভাবিলাম, তাহা হইল না। একটার পর একটা চিন্তা আসিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, কেন সে আমার অর্থ অপহরণ করিল; প্রয়োজন হয়তো তাহার ছিল, কিন্তু আমারও তো প্রয়োজন ছিল ওই অর্থের। অতএব তাহার প্রয়োজন আমার প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক কি না, তাহারই মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না। যাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন আছে, তাহার সেইটুকু যদি সমাজের রিক্ত দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, তবে মানুষ এরূপ কুকার্য্য আর করিবে কি না? প্রশ্ন হইল, যে লোকটি আমার অর্থ-অপহরণরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছে, সে সত্যই উহা অভাবের তাড়নায় করিয়াছে, না স্বভাবের তাড়নায় করিয়াছে? যদি স্বভাবের তাড়নায় করিয়া থাকে, তবে তাহারও প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন আছে এবং তাহাও বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। শুনিয়াছি, অনেকে উহাদের মধ্যে রীতিমত ধনী লোকও আছে। কে জানে, এই লোকটি সেইরূপ একজন কি না! রাষ্ট্রের সহায়তায় পুলিসের দ্বারা এরূপ দুর্বৃত্তদিগকে শায়েস্তা করা যায় কি না, এক্ষণে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পুলিস নিশ্চয়ই অনুপযুক্ত, নচেৎ কলিকাতা শহরে এত পকেটমারের উপদ্রব হয় কেন? ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে একেবারে গোড়ায় গিয়া পৌছিলাম। কার্ল মার্কসের নিশ্চয়ই আমার মত বার্লিনের ট্রামে পিক্‌পকেট হইয়াছিল; না হইলে ওরূপ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা কোন মানুষের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারে—ইহা অবিশ্বাস্য।

বাড়িতে কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই। পূজার বাজার মনোমত হয় নাই। তবে এক বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হইয়াছি। বুকখোলা কোট বোতাম খুলিয়া পরা ছাড়িয়া দিয়াছি, গলাবন্ধ কোট বোতাম আঁটিয়া পরিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ দে

চলচ্চিত্র

কেশবধৃত—শরীরঃ

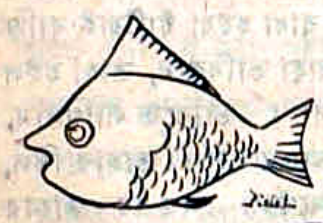

সুভাষ

জিন্না

গান্ধী

হক

খাজা

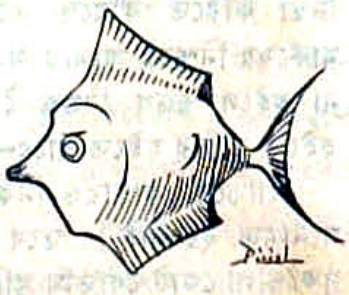

নেহরু

জয় জগদীশ হরে—

কনে

১

নিকুঞ্জবাবুকে পটলডাঙা অঞ্চলে সকলেই চেনে। কলিকাতায় তাঁহার পাঁচখানি বাড়ি। চারিখানি একেবারেই ভাড়া দেওয়া আছে। সবচেয়ে ছোট যেখানি, সেখানিরও অধিকাংশ ইট, কাঠ, টিন এবং চট, এই চারি প্রকারের পার্টিশন দ্বারা নানা ভাগে ভাগ করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশের তিনখানি ঘরে স্বয়ং, মাতৃহীনা একমাত্র পুত্র এবং একটি স্কন্ধারূঢ় ভাইপোকে লইয়া বাস করেন। পাড়ার লোক তাঁহাকে কৃপণ ইত্যাদি বলে, আবার শ্রদ্ধা-ভক্তিও করে।

পুত্রটি মাঝারি, অর্থাৎ সব বিষয়েই মাঝারি। আকারে মাঝারি, বর্ণে মাঝারি, বুদ্ধিতে মাঝারি, পড়াশুনায় মাঝারি, স্বাস্থ্যে মাঝারি। কিন্তু স্বভাবটির জন্য সে বাড়িতে এবং বাড়ির বাহিরে সকলেরই একান্ত আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে। ভাইপোটি কিন্তু খুব স্মার্ট। সমবয়সী হইলেও সে সর্বদাই তাহার জেঠতুতো ভাইটিকে নাবালক বলিয়াই মনে করে এবং সর্বদা সর্ববিষয়ে তাহাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। উভয়েরই মনটি ভাল। সুতরাং সমস্ত বিষয়েই ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন স্বভাব সত্ত্বেও উভয়ে উভয়কে অন্তরের সহিত ভালবাসে। এবার তাহারা দুইজনেই বি. এ. পাস করিয়াছে। পুত্রটি দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স পাইয়াছে, ভাইপো ডিস্‌টিংশনে পাস করিয়াছে।

নিকুঞ্জবাবুর ইচ্ছা, পুত্রের বিবাহ দিয়া বহুদিনের শূন্য গৃহ পূর্ণ করেন। ভাইপো বলেন, এখুনি বিয়ে কিসের? বি. এ. পাস ক'রে বিয়ে করা আজকাল উঠে গেছে। জেঠা মহাশয় বলেন, আমি

সেকেলে লোক, সেকেলে মতেই ছেলের বিয়ে দোব। ছেলে স্বয়ং কিছুই বলে না। তাহার মত মাঝারি ; বিয়ে হ'লে মন্দ কি ? না হয় তো ব'য়েই গেল।

ঘটক আনাগোনা করিতে লাগিল। ঘর পছন্দ হয় তো মেয়ে পছন্দ হয় না, মেয়ে পছন্দ হয় তো ঘর পছন্দ হয় না। জেঠামশায়ের হয়তো মত হয়, ভাইপো বাঁকিয়া বসেন। ভাইপোর যদি পছন্দ হয়, জেঠামশায় বলেন, ওসব মেয়ে আমার বাড়িতে মানাবে না। ছেলে সব শোনে, কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলে না।

একদিন ঠিক হইল, শ্যামপুকুরে একটি মেয়েকে দেখিতে যাইতে হইবে। ছেলে বলিল, তোমরাই আজ যাও, আমি যাব না। ভাইপো পাড়ার একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, চল, মেয়ে দেখে আসি। সঙ্গে একখানা নোটবুক নে। সব ডিটেল্‌স চটপট টুকে নিবি, বুঝলি ? আর শোন, একটা মাপবার ফিতেও নিস পকেটে।

বন্ধু বলিল, এই আমি আসছি কাপড়টা বদলে।

২

ওদিকে শ্যামপুকুরে একটি ছোট গলির মধ্যে, একখানি ছোট দোতলা বাড়ির নীচের তলায়, সামনের ঘরখানি একটু ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। গড়ে মাসে দুই তিন বার এরূপ করা হইয়া থাকে। কারণ, মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিতে তো আসিবেই। চারিখানি চেয়ারের মাঝে একটি কাপড়-ঢাকা টিপয়। পাশে একখানি তক্তাপোশ, তাহার উপর শতরঞ্জি এবং একখানি রঙিন সুজনি। দুইটি বিভিন্ন আকারের তাকিয়া—পরিষ্কার ওয়াড়-পরানো।

দেওয়ালের গায়ে যথারীতি কয়েকখানি ফোটো, কয়েকখানি বাঁধানো উলের কাজ, এবং একখানি ইংরেজী-বাংলা-মিশানো ক্যালেণ্ডার। ভিতরের দিকের দরজার পাশে, পর্দার নীচে একটি কালো কুকুর আধ ইঞ্চি জিব বাহির করিয়া ঝিমাইতেছে। কনের দাদা এবং পিসতুতো ভাই, কনের সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পিসতুতো ভাইটি একটি ছোট ফুলদানি আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আগন্তুকদের জন্য নানারূপ আহার্যের ব্যবস্থা করা হইত। দুই তিন রকম ফল, দুই এক রকম ঘরে তৈয়ারি ছানা বা ক্ষীরের খাবার, দুই এক রকম নোনতা খাবার, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, লুচি, হালুয়া, আলুর দম, মাছ বা তরকারির চপ, আর তাহার সঙ্গে চা, শরবৎ, সিগারেট প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, এই রেটে চলিলে শুধু জলখাবার যোগাইতেই কন্যাপক্ষকে ফতুর হইতে হইবে। অনেকবার এমনও হইল যে, সমস্ত আয়োজনের পর শোনা গেল, কোন একটা তুচ্ছ অজুহাতে, যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা কেহই আসিলেন না। সুতরাং এখন আর অতদূর বাড়াবাড়ি করা হয় না। উপস্থিতমত কিছু নোনতা আর মিষ্টি খাবার এবং চা, ইহারই ব্যবস্থা আছে। পরে উভয় পক্ষের আগ্রহের তারতম্য অনুসারে আদর-আপ্যায়নের মাত্রাও কম বেশি করা যাইতে পারিবে।

কনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। সে কিছুতেই সাজিতে চায় না। যাহা পরিয়া সে কলেজে যায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই পরিবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর শুধু শাড়িখানি বদলাইতে এবং কানে দুল পরিতে রাজি হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঠিক কলেজের পোশাকই আছে। নীচু-গোড়ালি স্ট্র্যাপ-দেওয়া জুতা, পুরা-হাতা অ্যান্টি-টন্‌সিল-কলার-ওয়ালা ব্লাউজ, আধ-এলো খোঁপা আর সরু কয়গাছি চুড়ি। অনেক বলিয়া কহিয়া

বউদির লকেট-হারগাছিও পরানো হইয়াছে। স্নো, পাউডার, রুজ, লিপস্টিক—কিছুই ব্যবহার করিতে রাজি করা গেল না। দেখিলেই অভিনেত্রী বলিয়া ভুল করিবার কোন আশঙ্কাই রহিল না।

৩

জেঠামহাশয়, ভাইপো এবং বন্ধু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। কনের দাদা এবং পিসতুতো ভাই দরজার কাছেই ছিলেন। তাঁহারা সবিনয় অভ্যর্থনা জানাইয়া আগন্তুকদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। যথারীতি কুশলপ্রশ্নাদির পর চা এবং জলখাবার আনা হইল। ভাইপো এবং বন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারগুলি নিঃশেষ করিলেন। জেঠামহাশয় অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর একটি সন্দেশের এক কোণ হইতে একটি টুকরা ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন।

চা-পান শেষ হইতেই ভাইপো বলিলেন, এবার তা হ'লে মেয়েটিকে—

জেঠামহাশয় বলিলেন, দেখুন, বেশি পাউডার-টাউডার মাখাবেন না। মানে—আমরা সেকেলে লোক কিনা—

কনের পিসতুতো ভাই 'আজ্ঞে, ওসব সেকেলেরাই বেশি মাখে' বলিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই বোনটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তক্তাপোশের উপরে একপাশে বসাইয়া দিলেন। মেয়েটি আগন্তুকদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোটা দুই তিন ছোট্ট নমস্কার করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

জেঠামহাশয় বলিলেন, তোমার নামটি কি মা?

মেয়েটি। বনলতা।

জেঠামহাশয়। বেশ নামটি, সেকেলেও নয়, আবার একেলেও নয়।

ভাইপো। কি পড়?

মে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

ভা। আই. এ. না আই. এস-সি.?

মে। আই. এস-সি.।

জে। একটু এদিকে এস তো মা। দেখি তোমার চুল।

পিসতুতো ভাই। (চুল খুলিয়া) এর চুল খাসা।

ভা। (বন্ধুর প্রতি) দেখি ফিতেটা। (ফিতা দিয়া চুল মাপিয়া) লেখ, চুল—চুয়াল্লিশ ইঞ্চি।

জে। আচ্ছা মা, দেখি তোমার পা দুখানি।

পি.-ভা। (পায়ের উপর হইতে শাড়ির পাড় সরাইয়া) এই দেখুন।

ভা। (ফিতা দিয়া মাপিয়া, বন্ধুর প্রতি) লেখ, পনরো ইঞ্চি।

বন্ধু। পনরো ইঞ্চি পা, বলিস কি?

জে। মা, তোমার মামাবাড়ি কি শিলিগুড়ি?

ভা। (বন্ধুর প্রতি) আরে ম'ল, পনরো বর্গ-ইঞ্চি—ছয়-বাই-আড়াই।

ব। তাই বল।

জে। আচ্ছা মা, তুমি রাঁধতে পার?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

জে। কি কি রাঁধতে পার, বল তো?

মে। সুক্ত, ভাজা, চচ্চড়ি, ঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, ডাল, মুড়িঘণ্ট, কালিয়া, টক, চাটনি, ফ্রাই, চপ, কাটলেট, পোলাও, কোর্মা, লুচি, হালুয়া, রুটি পরটা, খিচুড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, গজা, নিমকি, শিঙাড়া, সাবু, বার্লি, গ্ল্যাক্সো,—

জে। থাক, ওতেই হবে। (ভাইপোর প্রতি নিম্ন স্বরে) আমাদের বাজার-বরাদ্দ তো সাড়ে-সাত-আনা। (কনের প্রতি) আচ্ছা মা, তুমি স্তব-পাঠ করতে পার ?

মে। হ্যাঁ।

জে। একটু শোনাও তো।

মে। জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

জে। বেশ। আচ্ছা, বল তো, পূজো করতে কি কি লাগে ?

মে। কুশাসন, জল, গোবর, কোশা, কুশি, ফুল, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য, শঙ্খ, ঘণ্টা, প্রদীপ, পুঁথি, পুরুত, দক্ষিণা, চরণামৃত, সন্দেশ, দই—এই সব।

ভা। বেশ। আচ্ছা, বল তো, উপাসনা করতে কি কি লাগে ?

মে। ছাপা-চামড়ার স্যাণ্ডাল, ফরাসডাঙার ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, সোনার চশমা, কাঁচা-পাকা দাড়ি, টাক, এক শত জন ছাত্র এবং এক শত এক জন ছাত্রী।

ব। বেশ। আচ্ছা, তুমি শেলাই করতে পার ?

মে। হ্যাঁ। (পিসতুতো ভাইয়ের দিকে চাহিতেই তিনি বাড়ির ভিতর গিয়া একটি বড় বোঁচকা লইয়া আসিলেন)

পি.-ভা। এই দেখুন, এসব ওর হাতের জিনিস।

দেখা গেল, তাহার মধ্যে চটের উপর উলের কাজ-করা আসন, কার্পেটের উপর উল দিয়া লেখা কবিতা, ডি. এম. সি. সূতা দিয়া ফুল পাতা আঁকা রুমাল, এম্‌ব্রয়ডারি করা টেব্‌লক্লথ, সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, উলের মাফ্‌লার, উলের সোয়েটার, ছিটের ফ্রক, ইজের, লংক্লথের ফ্রিল দেওয়া বালিশের ওয়াড়, জানালার পর্দা প্রভৃতি রহিয়াছে।

এসব দেখিয়া জেঠামহাশয় তো অবাক। সবিস্ময় হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা মা, এতটুকু বয়সেই এত শেলাই শিখেছ ?

ভাইপো বলিয়া উঠিলেন, আজকালকার মেয়েরা ওসব শিখেই থাকে।

সেকেলে জেঠামহাশয় অগত্যা অধিক বিস্ময়-প্রকাশ ও প্রশংসা চাপিয়া গেলেন।

বন্ধু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। এবার বলিলেন, আচ্ছা, তুমি ছবি আঁকতে পার ?

জে। ছবি কি আর সবাই আঁকতে পারে ?

ব। আজকালকার মেয়েরা সব পারে।

জে। আচ্ছা মা, তুমি কি ছবি আঁকতে পার ?

মে। একটু একটু পারি। পেন্সিল আর জল-রঙ দিয়ে অনেক-গুলো ছবি এঁকেছি। এবার ভাবছি, অয়েল-পেন্টিং শিখব।

ভা। আচ্ছা, তোমার চিত্রকলার ভাবটা কি অবনীন্দ্রীয়, না নন্দলালীয় ?

মে। দুইই। আর তার সঙ্গে একটু হেমেন্দ্রীয় আর একটু টমাসীয় ভাবও আছে।

ভা। বেশ, বেশ। আচ্ছা, তুমি মাটির কিংবা প্ল্যাস্টারের মূর্তি গড়তে পার ?

মে। অল্প অল্প পারি। পাল মশায়ের কাছে প্রায় এক বৎসর শিক্ষানবিসী করেছি।

ব। আচ্ছা, তুমি কবিতা লেখ ?

মে। (একটু হাসিয়া) কখনও কখনও।

পিসতুতো ভাই এই সময় উঠিয়া গিয়া একখানি খাতা লইয়া আসিলেন। খাতাখানি কবিতায় ভরা। জেঠামহাশয় খাতাখানি লইয়া

খুলিয়াই বলিলেন, বাঃ, হাতের লেখা তো বেশ—মুক্তোর মত। বন্ধু মহাশয় জেঠামহাশয়ের হাত হইতে খাতাখানি লইয়া কয়েকটি পৃষ্ঠার উপর চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, কবিতাগুলি তো বেশ।

ভা। আচ্ছা, তোমার কাব্যভাবটা কি মাইকেলীয়, না রবীন্দ্রীয়—মানে—সেকালীয়, না একালীয়?

মে। লেখা দেখেই তো বুঝতে পারছেন।

ব। ঠিক ধরতে পারছি না। ভাষাটা প্রায় মাইকেলীয়, ভাবটা প্রায় রবীন্দ্রীয়, ছন্দটা রজনী-সেনীয়, আর আদর্শটা মনে হচ্ছে কুমুদ-মল্লিকীয়।

মে। তা হবে।

জে। তোমাদের ওসব কাব্য-কবিতার কথা এখন থাক। আচ্ছা মা, তুমি গান গাইতে পার?

মে। (ঘাড় হেলাইয়া) হ্যাঁ।

ভা। কি কি ধরনের গান গাইতে পার?

মে। সাধারণ সব রকমই একটু একটু পারি। যেমন, ক্ল্যাসিক্যাল, মডার্ন, রবীন্দ্রীয়, রামপ্রসাদী, হিন্দী, গজল, বৈঠকী, বোলপুরী, সভা-উদ্বোধনী, প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনী, চাঁদা-আদায়ী—

জে। বেশ, বেশ। আচ্ছা মা, তুমি কীর্তন গাইতে পার?

মে। হ্যাঁ। কীর্তন, সংকীর্তন, হরিসংকীর্তন, কালীকীর্তন এই সব।

ভা। (জেঠামহাশয়কে, নিম্ন স্বরে) একটা কীর্তন গাইতে বলুন না।

জে। আচ্ছা মা, একখানা কীর্তন আমাদের শোনাবে?

মেয়েটি পিসতুতো ভাইয়ের দিকে চাহিল। তিনি বলিলেন, একটা গান গেয়ে শুনিয়ে দাও।

এই কথা বলিয়া উঠিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে একটি হারমোনিয়ম আনিয়া মেয়েটির পাশে রাখিলেন। একটু থামিয়া, এদিক ওদিক একটু চাহিয়া মেয়েটি হারমোনিয়মে সুর দিল এবং একটু পরেই মিষ্ট স্বরে গাহিতে আরম্ভ করিল—

গান (সুর মনোহরসাঁই)

সুখের লাগিয়া কলেজে পশিনু
সকলি ব্যরথ ভেল।
হেদুয়া তড়াগে সিনান করিতে
সরদি লাগিয়া গেল॥
সখি, কি মোর করমে লেখি—
সহজ ভাবিয়া সায়েন্স লইনু
ভীষণ কঠিন দেখি॥
বেথুন ছাড়িয়া স্কটিশে আসিতে
পড়িনু পীরিতি-জালে।
না পেনু অনার্স না হইনু পাস
এই কি ছিল রে ভালে॥
যতন করিয়া পিছলি পড়িনু
মোটর-চাকার পাশে।
তবুও নিঠুর ফিরে না তাকাল
বিলেত পালাল শেষে॥
কত না আশায় দীরঘ দিবস
হোস্টেলে কাটিয়া গেল।
বুনিনু শুধুই স্বপনের জাল
সফল নাহিক ভেল॥

জে। বেশ, আচ্ছা মা, এগুলো কি তোমার নিজের কথা ?

মে। কি যে বলেন ! আমি কি কখনও স্কটিশে পড়েছি ?

জে। বাঁচালে মা, বাঁচালে।

ব। আচ্ছা, তুমি কি কি বাজনা বাজাতে পার ?

মে। হারমোনিয়ম, এস্রাজ, সেতার, বেহালা, বাঁশী, ক্লারিওনেট, জলতরঙ্গ, তবলা, সানাই, কাঁসি, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, পিয়ানো —এই সব।

জে। বেশ, মা, বেশ।

ভা। (জেঠামহাশয়কেই, নিম্ন স্বরে) নাচতে পারে কি না—একবার জিজ্ঞেস করুন না।

জে। আচ্ছা মা, তুমি নাচতে পার ?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

ব। (উৎসাহিত হইয়া) কি কি নাচ জান ?

মে। বল, ব্যালেট, বাঈ, রবীন্দ্রীয়, প্রাচ্য, গুজরাটী, গুরুসদয়ী, ব্রতচারী, সাঁওতালী, মণিপুরী, মৈথিলী, কথাকলি, দ্রাবিড়ী, সিংহলী, হরেন-ঘোষী, উদয়শঙ্করী, ফার্স্ট-এম্পায়ারী, কাঠি, পোয়ে, ছউ— এই সব।

নাচের তালিকা শুনিয়া জেঠামহাশয়ের চক্ষু তো কপালে উঠিয়াছে। বন্ধুও পরম বিস্মিত ও তৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ফার্স্ট-এম্পায়ারবিশারদ ভাইপোর ভাবটা এই—এ আর এমন আশ্চর্য্য কি ! তিনি নিম্ন স্বরে জেঠামহাশয়কে বলিলেন, জিজ্ঞেস করুন তো, বালিনীজ নাচ জানে কি না।

জেঠামহাশয় নিতান্ত অগত্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা জিজ্ঞেস করছে, তুমি বালিনীজ নাচ জান কি না।

মে। হ্যাঁ। বালিনীজ, জাভানীজ, সুমাত্রানীজ, সেলিবেশনীজ আর মালয়নীজ—এগুলো শেখা হয়ে গেছে। এখন গ্রেটার-ইণ্ডিয়ানীজ শিখছি।

ভা। বেশ, বেশ।

জে। (ভাইপো এবং বন্ধুর প্রতি) নাও, সবই তো শুনলে। আর কিছু তো নেই জিজ্ঞেস করবার ?

ভা। না, আর কি জিজ্ঞেস করব ? (মেয়েটির প্রতি) আচ্ছা, তুমি সাঁতার কাটতে পার ?

মে। পারি।

ব। আচ্ছা, তুমি সাইকেল চড়তে পার ?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

ব। লাঠি খেলতে পার ?

মে। ছোট লাঠি শিখেছি, বড় লাঠি এখনও শিখি নি।

ব। ছোরা ?

মে। অল্প অল্প পারি।

জে। নাও, এবার ওকে ছেড়ে দাও। সবই তো হ'ল।

ভা। (জেঠামহাশয়কে, নিম্ন স্বরে) জিজ্ঞেস করুন না, ঘোড়ায় চড়তে পারে কি না।

মে। (প্রশ্নটি শুনিয়া) দার্জিলিঙের ঘোড়ায় চড়েছি।

ভা। বেশ।

জে। আচ্ছা মা, এইবার এস।

মেয়েটি হাত তুলিয়া দুই তিনটি ছোট নমস্কার করিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং পিসতুতো ভাই তাহাকে ধরিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে পা বাড়াইলেন। এমন সময়ে ভাইপো বলিয়া উঠিলেন, দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না।

পিসতুতো ভাই। না না, মনে করবার কি আছে? কি জিজ্ঞেস করছেন?

ভা। আচ্ছা, তুমি সুপুরি কাটতে পার?

মেয়েটি 'পারি' বলিয়াই বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার পায়ের ধাক্কা খাইয়া দরজার নিকট কুকুরটি 'ঘেউ' করিয়া উঠিল।

ব। (পিসতুতো ভাইকে) দেখুন, একটা কথা, কিছু মনে করবেন না।

পি. ভা। না না, মনে করব কেন? বলুন।

ব। মেয়েটিকে আর একবার একটু আনতে হবে।

পি. ভা। কেন বলুন তো?

ব। দেখুন, নাকটা আর দাঁতগুলো ভাল ক'রে দেখা হয় নি।

পি. ভা। এতক্ষণ এখানে ব'সে ছিল, এত কথা বললে, গান করলে, তবু আপনাদের নাক আর দাঁত দেখা হ'ল না?

ব। দেখেছি, তবে—মানে, ভাল ক'রে দেখা হয় নি।

পি. ভা। আচ্ছা, নিয়ে আসছি।

পিসতুতো ভাই মহাশয় বাড়ির ভিতর গিয়া মেয়েটিকে আবার লইয়া আসিলেন।

ভা। (ফিতা লইয়া, নাক মাপিয়া) লেখ, ১·৬ ইঞ্চি।

ব। লিখেছি। (মেয়েটির প্রতি) আচ্ছা, একটু হাস তো। মেয়েটি হাসিল কি না বোঝা গেল না। তবে ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইতেই বন্ধু বলিলেন, যাক, ওতেই হবে। তারপরে নোটবুকে লিখিলেন, দাঁত ভাল।

পি. ভাই। আপনাদের কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে?

জে। না, আমাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।

পিসতুতো ভাই মহাশয় বোনটিকে লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

কনের দাদা বেশি কথা বলেন না। এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই। এবার সভয়ে এবং সসম্ভ্রমে জেঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটি কি আপনাদের পছন্দ হ'ল?

জেঠামহাশয় অতি উৎসাহে বলিতে যাইতেছিলেন, খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভাইপো বলিলেন, দেখুন, হঠাৎ তো মত দেওয়া যায় না। বাড়ি গিয়ে ভেবে চিন্তে দেখি, যদি আমাদের পছন্দ হয়, তা হ'লে একদিন মেয়েরা দেখতে আসবেন। মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েরাই ভাল বোঝে, বুঝলেন কি না। তারপর মেয়েদের যদি পছন্দ হয়, তখন ছেলে নিজে এসে দেখবে। আজ তো আর ভাল ক'রে দেখা হ'ল না, এটা একটা প্রিলিমিনারি দেখা, বুঝলেন কি না।

পিসতুতো ভাই বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া যথোচিত আপ্যায়ন দ্বারা অভ্যাগতদিগকে বিদায় দিলেন।

৪

মেয়েটি বাড়ির ভিতরে আসিয়াই হার, চুড়ি, জুতা, জামা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসতুতো বউদি কাছে আসিতেই তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল। পা দিয়া ধাক্কা দিয়া টুল, চেয়ার, মোড়া, যাহা সামনে পাইল, তাহাই দূরে ফেলিয়া দিল। দেওয়াল হইতে ছবি, ক্যালেণ্ডার, আয়না প্রভৃতি টানিয়া ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। ব্যাপার দেখিয়া বাড়ির সকলে ছুটিয়া আসিয়া ধরিতে গেলে চড়, লাথি, কিল প্রভৃতি দিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকলে

মিলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। পিসতুতো বউদি বলিলেন, কেন এমন হ'ল? ও তো কখনও এমন করে না। দাদা সভয়ে বলিলেন, হিষ্টিরিয়া না তো?

ইতিমধ্যে বনলতা খাটের একপাশে উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হ্যাঁ, হিষ্টিরিয়া। কেন হিষ্টিরিয়া হবে না? আমাকে তোমরা কি ভেবেছ? আমি কি হাঁস, না মুর্গি, না খরগোশ, না ঘোড়া? আমার নাক মাপবে, চুল মাপবে—এত বড় আস্পর্দ্ধা? শুধু তোমাদের অপমানের ভয়ে আমি চুপ ক'রে ছিলুম। ফের যদি এমন ইডিয়টের দল বাড়িতে ডেকে আন তো, আমি আত্মহত্যা করব। মনে থাকে যেন।

বনলতা বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। পিসতুতো বউদি কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বনলতার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখা গেল। বউদি আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিলেন।

৫

এদিকে জেঠামহাশয় বাড়ি ফিরিয়াই অপেক্ষামান আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া বৈঠক জমাইয়া বসিলেন। বলিলেন, খাসা মেয়ে। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না লক্ষ্মী লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ।

ভা। জেঠামশায়ের সবতাতেই একটা আ-দেখ্‌লে ভাব। আজকাল অমন মেয়ের অভাব কি? তবে হ্যাঁ—মেয়েটি ম-ন্‌-দ নয়—এ কথা বলা যেতে পারে।

ব। যাই বলুন, এ মেয়ে হাতছাড়া করা হবে না।

জে। ঠিক বলেছ, এমন মেয়ে কিন্তু আর পাওয়া যাবে না।

আত্মীয়। তা হ'লে এই অঘ্রাণেই, কি বল?

ভা। এত ব্যস্ত কি? আরও দু চারটে দেখা যাক, মেয়েরা দেখুন, ছেলে নিজে দেখুক, দেনা-পাওনার কথা হোক, তবে তো?

জে। অত-শতর মধ্যে আমি নেই। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, বাস্। ছেলের মত? ওর মত হবে, তা আমি লিখে দিচ্ছি। মোট কথা, এ মেয়ে হাতছাড়া করা হবে না। দেনা-পাওনা? সেজন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।

আত্মীয়। ভায়া যে দাতাকর্ণ হয়ে উঠলে?

জে। ঠাট্টা রাখ। এই অঘ্রাণেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, আপনারা তার উদ্যোগ করুন। আমি একটা দিন দেখে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসব।

৬

পাঠকবর্গকে বিশেষত পাঠিকাবর্গকে, একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। এমন একটা সর্ব্বগুণসম্পন্না মেয়েকে আই. সি. এসের সঙ্গে বিবাহ না দিয়া লেখক ইহাকে একটা মাত্র বি. এ. পাস বেকার ছেলের সঙ্গে একটা কালচারহীন পরিবারে বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া ইঁহারা হয়তো শকৃড হইবেন। কিন্তু লেখক নিরুপায়। প্রজাপতি মহাশয় তো পাঠকবর্গের খাস তালুকের প্রজা নন যে, তাঁহাদের মন যোগাইয়া চলিবেন! তা ছাড়া, কোন আই. সি. এস. বম্বে আসিয়া নামিলেই, ই. আই. আর. এবং বি. এন. আরের প্রত্যেক স্টেশনে এবং হাওড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত ধনী কন্যা-পিতৃগণের যে 'কিউ' রচিত হয়, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা বনলতার আত্মীয়স্বজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রজাপতির বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শকৃড হইলে

চলিবে না। আত্মীয়স্বজনের পরিচারিকাবৃত্তি, অনশনক্লিষ্ট মাস্টারিবৃত্তি, ধাত্রী ও অভিনেত্রীর বৃত্তি যাঁহাদের কাম্য নয়, তাঁহাদিগকে প্রজাপতির সহিত একটা সম্মানজনক আপোষ করিতেই হইবে।

৭

নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে বেশ একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভাড়াটিয়ারা সব একে একে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়িটা আমূল সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। নীচের দোকানঘর ভাঙিয়া গ্যারেজ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে একখানি চকচকে খুকী গাড়ি শোভা পাইতেছে। রেডিও লওয়া হইয়াছে।

বেকার পুত্রের বেকারত্ব ঘুচিয়াছে। নিকুঞ্জবাবু একটি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের মোটা শেয়ার পুত্রের নামে কিনিয়া তাহাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিয়া দিয়াছেন।

একদিন পুত্র বাড়ি আসিয়া দেখেন, বনলতা কাগজ পেন্সিল লইয়া একটা আঁক করিতেছে। পুত্র বলিলেন, কি হচ্ছে?

ডেসিম্যালের বিয়োগ করছি।

ডেসিম্যালের বিয়োগ?

হ্যাঁ।

মানে?

মানে, ১·৯ – ১·৬ – ·৩।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তোমার নাক মাইনাস আমার নাক—ইকোয়াল টু পয়েন্ট থ্রী।

আচ্ছা, দেখি ভেরিফাই ক'রে, উত্তর ঠিক হ'ল কি না।

যাও।

"ভাস্কর"

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩

আলোটা উসকে দাও, ঘনশ্যামবাবু এসেছেন।

আলোটা উজ্জ্বলতর হতেই অনিবার্য্যভাবে তাকেই প্রথমে দেখলাম, যদিও সে কোণের দিকে ব'সে ছিল। আলোটা উসকে দিলে চাকরটা।

বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। অক্ষমতা নয়। রঙচঙে কথার আতসবাজি ছুটিয়ে, শব্দের ঝঙ্কারে সকলকে দিশাহারা ক'রে দিয়ে পরিশেষে অবর্ণনীয়া ব'লে অক্ষমতা জ্ঞাপন করবার কৌশল আমার খুব আয়ত্ত আছে। এ ক্ষেত্রে সে কৌশল প্রয়োগ করতে বিরত হলাম, কারণ আমি কিছুই অতিরঞ্জিত করতে চাই না। ঔপন্যাসিকী কায়দায় বর্ণনা করতে বসলে অতিরঞ্জন অবশ্যম্ভাবী। অতি সংক্ষেপে কেবল কিছু বলছি, যদিও তাও, খুব সম্ভব, অতি না হ'লেও ঈষৎরঞ্জিত হয়ে যাবেই।

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কালো রঙ। এমন কালো সাধারণত দেখা যায় না। মিশ কালো, কুচকুচে কালো প্রভৃতি কালো-রঙ-প্রকাশক বিশেষণগুলি দিয়ে এ কালো রঙের বর্ণনা করা যাবে না। কারণ তার রঙে শুধু কালিমা নয়, কোমলতাও ছিল। মখমলের মত অদ্ভুত একটা কোমলতা—অতি পেলব, অতি মৃদু, অতি আশ্চর্য্য একটা শ্রী ওই কালো রঙের নিবিড়তায় আবিষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন। কুচকুচে কালো চোখ দুটো আরও অদ্ভুত—চঞ্চল নয়, নিষ্পলক। যখন যতটুকু দেখে, নির্নিমেষে দেখে, যার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে বিদ্ধ করছে তত

মনে হয় না, যত মনে হয় নিঃশেষ করছে—মনে হয়, তার অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমেই তাকে দেখে আমার এত কথা মনে হয় নি, এই বর্ণনাটুকু আমি আমার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্কলন ক'রে দিলাম। প্রথমেই তাকে দেখে আমার মনে যে ধারণা হয়েছিল, প্রথম দৃষ্টিতেই সে রকম ধারণা করতে পারে কেবল বাঙালী-সন্তান। যদিও সে একটিও কথা বলে নি, তবু সহসা আমার মনে হ'ল, মেয়েটা জ্যাঠা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্রিকোশাস'। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, তাকে বয়সের আন্দাজে বেশি বুদ্ধিমতী ব'লে মনে হয়েছিল। বয়সের আন্দাজে! তার বয়স কত—সে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কি? আঠারো কি আটাশ—সে প্রশ্নই তো মনে জাগে নি তখন। কার জাগে? অনেক দিন পরে বংশী যখন নিমোনিয়ার ঘোরে প্রলাপ বকছিল—তোমার বয়স কত তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি; মনে পড়ছে, এই প্রলাপের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল। বংশীর প্রলাপের চিকিৎসা অবশ্য করেছিলাম ডাক্তার আমি, কিন্তু কবি আমি সায় দিয়েছিলাম ওই প্রলাপের সঙ্গে। পুরুষের মনকে যে নারী প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তার নারীত্বের বেশি আর কিছু জানবার আগ্রহ থাকে না মনের। তার বয়স কত, তার ওজন কত—নিরতিশয় অবান্তর প্রসঙ্গ এসব; অনভিভূত মনের বস্তুতান্ত্রিক কৌতূহল। প্রথম দর্শনেই তাকে জ্যাঠা ব'লে কেন মনে হয়েছিল, তার সঙ্গত কারণ অবশ্য একটা ছিল। চলচ্চিত্রে যেমন একটা ছবিকে অবলুপ্ত ক'রে মুহূর্ত্তের মধ্যে আর একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাকে দেখে তেমনই তার নিষ্পলক চাহনিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিদ্রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই নির্নিমেষ নীরব চাহনিকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এই রকম শোনাবে—

তুমিও এলে! অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছ? একটু হাসি—তারপর—তোমাদের সব্বাইকে ভাল ক'রে চিনি আমি।

যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ সহকারে ঈষৎক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানটাকে অনাবশ্যক রকম বর্ম্মাবৃত ক'রে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বংশীকে বললাম, কই, স্বর্ণেন্দুর বাবা কোথায়? আমি তো কিছুই শুনি নি। এই অনুযোগটার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তা আমারও কানে বাজল। বংশী আলোটা এগিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম স্বর্ণেন্দুর বাবাকে। মেঝেতে বিছানা পাতা, তারই ওপর শুয়ে রয়েছেন তিনি, গলা পর্য্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা, মুখটুকু খোলা আছে শুধু। মুখের আধখানা মরা, আধখানা জীবন্ত। মরা অংশটা ভাবলেশহীন, চোখের পাতাটা যেন শ্রান্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে জল, ঠোঁটের কোণটা নেমে এসেছে, সমস্তটা মিলে কেমন যেন একটা আত্মসমর্পণের ভাব। বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞা-অনুযায়ী যদিও তা মরা নয়, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তা মৃত্যুর বাড়া; বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের বিকাশ নেই। জীবন্ত অংশটা কিন্তু অতিরিক্ত রকম জীবন্ত। চোখের দৃষ্টি প্রখর, অধরপ্রান্তে উদ্ধত অবজ্ঞা, রগের ওপর কুটিল গোটা দুই শিরা স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

অভ্যাসমত নাড়ীটা টিপে দেখলাম। ব্লাড-প্রেসার খুব বেশি ব'লে মনে হ'ল না। হার্টের খবর নেবার জন্যে সংস্কার-অনুযায়ী স্টেথোস্কোপের অভাব অনুভব করলাম; রগের শিরাগুলো দপদপ করছে কেন? বৈজ্ঞানিকভাবে ভাববার চেষ্টা করলাম একটু। রোগের ইতিহাস, রক্ত-পরীক্ষা—ডাক্তারী চিন্তা-পরম্পরাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে জীবন্ত চোখের দৃষ্টিটা যেন চীৎকার ক'রে উঠল, চোপ রও! জীবন্ত অধরপ্রান্ত উদ্ধত অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। মরা চোখটা, দেখলাম, মিনতি করছে; অবনমিত মৃত অধর নীরবে বলছে, ক্ষমা করুন। অদ্ভুত ঐকতান!

ঠিক এর পর আমি কি করেছিলাম, কি বলেছিলাম, এর পরও কি ক'রে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে ওয়েটিং-রুমের ঈজি চেয়ারে ব'সে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে তার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা সম্ভবপর হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। অস্পষ্টভাবে এইটুকু শুধু মনে আছে, ভদ্রতার হাসিটুকু মুখে ফুটিয়ে রেখে নমস্কার ক'রে আমি উঠে যাচ্ছিলাম—হ্যাঁ, সম্ভবত উঠে বাইরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঠিক যে কি কারণে আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম—হয়তো অকারণেই, হয়তো কাপড়টা আটকে গিয়েছিল চেয়ারটার হাতলে, ঠিক মনে নেই এখন। কিন্তু ফিরে তাকালাম ব'লেই ব্যাপারটা ঘটতে পারল। ঠিক পর পর ঘটনাগুলো মনে নেই। যে ছবিটা এই সূত্রে মনের মধ্যে ফুটে উঠছে সেটা এই—বংশী শশব্যস্ত হয়ে বার্নারটা ভাল ক'রে গরম হবার আগেই, জোরে জোরে কয়েকবার পাম্প ক'রে স্টোভে তেল উঠিয়ে ফেলেছিল—জলন্ত কেরোসিন তেলের হলদে আলোয় সহসা তার চরিত্রের একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে, অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। তেল উঠিয়ে ফেলে বংশী শশব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হ'ল না, কেবল ওষ্ঠের চাপে অধর যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল, চোখের কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-করুণা-দীপ্ত এক ঝলক দৃষ্টি যেন মূর্ত্ত হয়েই অবলুপ্ত হয়ে গেল, আর কিছু নয়। তারপর—ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই আমার—ছোট্ট দুটি কথা, সর তুমি। বংশী স'রে গেল, সে বসল গিয়ে স্টোভের কাছে। একটু পরেই স্টোভ-সাইলেন্সারের শতছিদ্রপথে মূর্ত্ত হয়ে উঠল আগুনের নীল-কমল-রূপান্তরিত কেরোসিন-শিখা। আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

এর পরেই যে ঘটনাটা মনে আছে, সেটা মর্ম্মান্তিক ব'লেই মনে আছে, এবং সেটা ঘটেছিল দ্বিতীয় পেয়ালা চা খেতে খেতে। এতবড় মর্ম্মান্তিক আঘাত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাব—অর্থাৎ ঈশপের একচক্ষু

হরিণের দুর্দ্দশা যে আমার কপালেও লেখা ছিল, তা কল্পনা করি নি। চায়ের পেয়ালাটা ছোট ছিল, অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল।

আর একটু নেবেন?

দিন।

প্রথম-পেয়ালা-পর্ব্বের হালকা কথাবার্ত্তায় আড়ষ্টতাটা ক'মে এসেছিল নিশ্চয়ই, যদিও প্রথম-পেয়ালা-পর্ব্বের সে হালকা কথাবার্ত্তাগুলো যে কি ছিল, তা মনে নেই। খুব সম্ভবত পক্ষাঘাত বিষয়েই দু-চারটে টুকরো আলোচনা, স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে দু-একটা কথা, বংশী অবনীশের উল্লেখ ক'রে বংশী-সুলভ রসিকতার চেষ্টাও করেছিল যেন,—অর্থাৎ সেই সব আলোচনা, যার কোন উদ্দেশ্য নেই, মাথামুণ্ড নেই, অর্থও সব সময়ে নেই, যার একমাত্র সার্থকতা অপরিচয়ের অথবা অতি-পরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য আড়ষ্টতাকে সুলঙ্ঘ্য ক'রে তোলা।

দ্বিতীয় বার আমার পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে, চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বললে, আপনি বিদেশী বই অনেক পড়েছেন, নয়?

কিছু কিছু পড়েছি।

আপনার লেখা পড়লে সেটা বোঝা যায়।

এটা নিন্দা না প্রশংসা, সেটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্ব্বেই চিনি মেশাতে মেশাতে এবং পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মৃদু কণ্ঠে সে আবার বললে, একটা জিনিস বুঝতে পারি না আমি, স্বীকার করেন না কেন আপনারা?

কি?

ইব্‌সেনের পিয়র গিন্‌ট থেকে আপনি আপনার নাটকে হুবহু খানিকটা নিয়েছেন, কীট্‌সের একটা বিখ্যাত কবিতার সঙ্গেও আপনার

একটা কবিতার আশ্চর্য্য রকম মিল আছে, কিন্তু আপনি ঋণ স্বীকার করেন নি কোথাও। আজকালকার অনেক লেখকই করেন না; আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এতবড় শক্তিশালী লেখকদের এ সামান্য দুর্ব্বলতা কেন!

আমার মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। বংশী বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক; কিন্তু "গ্রেট মেন" পর্য্যন্ত ব'লেই সে হেসে ফেললে এবং চলকে-পড়া চায়ের প্রবাহে "থিঙ্ক অ্যালাইক"টা ভেসে গেল।

গুলি খেয়ে একচক্ষু হরিণটা মারা গিয়েছিল।

আমারও মৃত্যু হ'ল।

নির্ব্বাক হয়ে রইলাম আমি।

আপনার লেখা কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে ফোনে যেন সে কথা বলছে। ভাল লাগে! নিহত হরিণটার মাংসও নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল সেই শিকারীর।

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

শুনলাম, আমি বলছি, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে, বুঝলেন কিনা, অনেক জিনিস—

ও, তাই নাকি?

ঠিক এর পরের মুহূর্ত্তেই আমার সমস্ত সত্তা আমার দৃষ্টিপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার আনমিত মুখের দক্ষিণ অংশটুকুতে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মখমল-কোমল কালো রঙের নিবিড় অন্ধকারে। কয়েকটি আবিষ্ট মুহূর্ত্ত।

তারপর যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, একটা

ওজুহাত পেয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটছি। প্ল্যাটফর্মে একটা সোরগোল উঠেছে, ট্রেন এসেছে একটা।

লোকে লোকারণ্য। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্' চীৎকারের উপলক্ষ খদ্দরপরিহিত মাল্যভূষিত ব্যক্তিটি ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামলেন। মক্কেলহীন এই উকিলটি সকলেরই পরিচিত। ডিমক্রাসি-যন্ত্রের নানা চাকায় নানা তৈল, যেখানে যেটির প্রয়োজন, নিপুণভাবে নিষেক করতে পারলে ভাগ্যচক্র যে উন্নতিপথে ঘর্ঘরশব্দে ছুটে চলবার যোগ্যতা লাভ করে, ইনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম প্রথম ইনি দেশসেবার খুচরো কারবার করতেন, এখন পাইকারী ব্যবসা খুলেছেন—বচন, বুদ্ধি আর খদ্দর এই মূলধন নিয়ে। ভিড় চ'লে গেল, ট্রেন চ'লে গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও, তাই নাকি?

কানের পাশে আবার গুঞ্জন ক'রে উঠল কথাগুলো। সহসা নিজেকে ওই মাল্যভূষিত চোরটার স্বগোত্র ব'লে মনে হ'ল। ব'সে পড়লাম। রঙিন শতরঞ্চিখানা প্রসারিতই ছিল, শিয়রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বিছানা, পাশে নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। চোখ বুজে বিছানাটায় ঠেস দিলাম, ভারী নিঃস্ব মনে হতে লাগল নিজেকে। চুরি ধরা পড়েছে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর কাছে! তখন কে জানত যে, চোরাই-মাল-সমেত ওকেও ধরা পড়তে হবে একদিন আমার কাছে! কিন্তু না, জিনিসটা ঠিক তা নয়, ও ধরা পড়ে নি, ধরা দিয়েছিল। আকাশ-পাতাল তফাত যে! আমি হয়তো সারারাত তেমনই ভাবেই ব'সে থাকতাম, যদি না টেলিগ্রাফ-পিওনটা এসে বংশীর খোঁজ করত। বংশীর নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। ওয়েটিং-রুমের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ডাকলাম বংশীকে।

বংশী বেরিয়ে এসে টেলিগ্রাম খুলে দেখলে, তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, জ্যোতির্ময়দা টেলিগ্রাম করেছেন—Missed train. Following in a taxi. Inform Ratri. Wait for me.

দরজার পাশে দেখলাম, রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

চুপ ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

৪

দিল্লী এক্সপ্রেসে যখন স্বর্ণেন্দু এল, তখন আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। বংশীর ডাকে উঠে ব'সে সামনে দেখলাম, একমাথা রুক্ষ চুল একমুখ রুক্ষ গোঁফ-দাড়ি, আধময়লা-জামাকাপড়-ক্যাম্বিসের-জুতো পরা এক ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কক্ষনও এ স্বর্ণেন্দু নয়। আমাদের সঙ্গে যে রোগা লাজুক ছেলেটি পড়ত, সে এই! আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, ঘনশ্যাম! আর কিছু বলতে পারলে না সে।

স্বর্ণেন্দু ঘণ্টা দুই ছিল বোধ হয়। কিন্তু এই দু ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই সে আমার কাছে ছিল। এসেই মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর বরাবর আমার কাছেই ছিল। শুনলাম, মাকে আনতে সে মথুরা গিয়েছিল, কিন্তু মা এলেন না। সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আর আসতেই চান না নাকি তিনি। একটু ম্লান হেসে স্বর্ণেন্দু বললে, আর মাঝে মাঝে ওই রকম ধর্মবাই চাগে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে স'রে পড়েন তিনি, আবার কিছুকাল পরে ফিরে আসেন, আবার চ'লে যান। বাবার পক্ষাঘাত হয়ে আরও সুবিধে হয়েছে তাঁর। আসল কথা কি জানিস? ওয়েটিং-রুমের দিকে চেয়ে

নিম্ন কণ্ঠে বললে, রাতুই আসল কারণ। ওর বিয়ে নিয়েই ভাই যত গোলমাল। মা একটু—মানে, আজকালকার স্বাধীন মত-টতগুলো পছন্দ করেন না। তাই বা বলি কি ক'রে! একটু থেমে, ছোট্ট একটু হেসে বললে, মানে, আমাদের সঙ্গে তর্কে না পেরে রাগারাগি ক'রে শেষকালে পালিয়ে যান।

কোথা যান?

কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, যখন যেখানে তাঁর গুরুদেব থাকেন। তাঁকে খবর দিলেই গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন।

একটু খটকা লাগল।

গুরুদেব গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন!

হ্যাঁ। মাকে তুই দেখিস নি কখনও, অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ মা। মাঝে মাঝে দেবতার ভর হয় তাঁর ওপর।

দেবতার ভর হয়!

না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ভারী অদ্ভুত কিন্তু।

মায়ের গল্প শেষ ক'রে স্বর্ণেন্দু নিজের বেকার জীবনের ইতিহাস সুরু করলে। কত রকম ভাবে চেষ্টা ক'রে সে কত রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তারই বর্ণনা। দু ঘণ্টা ধ'রে নানা ছন্দে একই কাহিনী শুনলাম। তার সব কথা মনে নেই; কিন্তু এটা বেশ মনে আছে, স্বর্ণেন্দুকে সেদিন যেন নূতনরূপে দেখলাম। লাজুক রোগা যে স্বর্ণেন্দু আমাদের সঙ্গে পড়ত, এ যেন সে নয়, এ যেন তার থেকেই উদ্ভূত অন্য আর একজন।

প্রায় বছর দশেক আগে একবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মামার বাড়ির চেহারা ছিল—তকতকে ঝকঝকে উঠোন, উঠোনের এক কোণে বাঁশের মাচায় কচি শসা ঝুলছে, দক্ষিণ দিকের মাটির দেওয়াল বেয়ে ঝিঙেলতা উঠেছে—তাতে অজস্র ঝিঙেফুল,

দাঁড়ে টিয়াপাখী চোখ পাকিয়ে হরিনাম শোনাচ্ছে সবাইকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মামীমা তাঁর নিজস্ব ছোট উনুনটার ধারে ব'সে কখনও পাটিসাপটা, কখনও সন্দেশ, কখনও ক্ষীরপুলি তৈরি করছেন। মামারা এখন শহরে, বাড়িতে কেউ নেই। মাস-দুয়েক আগে একটা কার্য্যোপলক্ষে আবার সেখানে গিয়েছিলাম আমি। বাড়িটার আর এক রকম চেহারা দেখে এলাম। উঠোনে একহাঁটু জঙ্গল—কচু, ঘেঁটু, মনসা, আপাং, শেয়ালকাঁটা, আরও কত রকম গাছ গজিয়ে ছেয়ে ফেলেছে উঠোনটাকে। গিরগিটি, ছাতারে পাখী নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রী যে নেই তা নয়, কিন্তু নতুন রকম শ্রী।

স্বর্ণেন্দুকে দেখে মামার বাড়ির ছবি দুটো চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল সেদিন। আগে যে কথাই বলত না, সে বাক্যবাগীশ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত ব'কে চলেছে—

বুঝলি ভাই, দরখাস্ত নিয়ে তো গেলাম লোকটার কাছে, সে আমাকে মুখে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিলে, বুঝলি ভাই, বললে, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. যখন তুমি, তখন তোমার আর ভাবনা কি, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, আমি প্রাণপণে রেকমেণ্ড করব তোমাকে। ও হরি, শেষকালে শুনলাম, সবাইকেই ওই কথা বলেছে লোকটা, আসলে ঘুষ না দিলে কিছু করবে না।

এমন অদ্ভুত একটা ছোট্ট হাসি হেসে স্বর্ণেন্দু আমার মুখের পানে চাইলে, যার অর্থ—সত্যি সত্যি ঘুষ দিয়ে তো আর চাকরি নেওয়া যায় না, সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল।

ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—

যে এঞ্জিনটা এতক্ষণ সোঁ সোঁ করছিল, সেটা মাল-গাড়ি শাণ্ট করছে। খানিকক্ষণ বোধ হয় ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই, আপ-ডাউন-

ভাষী বাবুটি কার্বন-পেপারের ওপর পেন্সিল পিষে চলেছেন। কুলীগুলো সার সার শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তারপর বুঝলি, চাকরির চেষ্টা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একটা দোকান করলাম। প্রথম-প্রথম বেশ চলল কিছুদিন, বাঙালীরা সব্বাই আমার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনতে লাগল, কিন্তু ক্যাপিটাল বেশি ছিল না, শেষ পর্য্যন্ত চালাতে পারলাম না, ভয়ানক কম্পিটিশন ভাই, বুঝলি?

আবার সেই ছোট্ট ধরনের হাসি হেসে ভয়ানক কম্পিটিশনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সে নিরস্ত হচ্ছিল, আমি বললাম, বাঙালীরা সবাই কিনতে লাগল, অথচ দোকান চলল না, তার মানে?

স্বর্ণেন্দু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, অর্থাৎ আসল কথাটা ব্যক্ত করতে তার নিজেরই যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ ক'রে সাবেক কালের লাজুক স্বর্ণেন্দু যেন ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

মানে, বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো, সবাই প্রায় ধারে কিনত, সব সময় সকলে ক্রেডিট-মেমোতে সইও করত না, আর ক্রেডিট-মেমোতে সই করলেও কি আর আমি নালিশ করতে পারতাম? অনেকে বাবার বন্ধু, অনেকে আমার বন্ধু, সবই প্রায় আপনা-আপনি, কিনতে এলে চক্ষুলজ্জার জন্যে 'না' বলতে পারতাম না, মানে, আমাদের বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো? একটু হেসে সে এমন ভাবে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলে, যেন সে সমস্ত বাঙালী জাতির হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

আমি ওর কথা শুনছিলাম না যে তা নয়, কিন্তু শোনার চেয়ে বেশি দেখছিলাম আমি ওকে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর ছোট ছোট হাসির

টুকরো, ওর রুক্ষ চুল দাড়ি গোঁফ, ওর আদর্শবাদ, ওর সত্যনিষ্ঠা, ওর অসহায় ভঙ্গি—সবটা মিশিয়ে নতুন ধরনের স্বর্ণেন্দু। এখন বুঝতে পারছি, বেকার-জীবনের শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ও হাসিমুখে টিকেছিল সত্যনিষ্ঠার জোরে। সম্ভবত একবার মাত্র মিথ্যে কথা ও জীবনে বলেছিল এবং বলবার পর আর বেঁচে থাকে নি।

ইন্সিওরেন্সের দালাল হয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, কিন্তু ও আমার পোষাল না ভাই, বড্ড বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা ছাড়া খোশামোদও করতে হয় ভয়ানক, কম্পানির খোশামোদ কর, পাব্লিকের খোশামোদ কর, ডাক্তারের খোশামোদ কর,—দেশের অধিকাংশ লোকেই রুগ্ন, তাদের সুস্থ ব'লে চালাতে হবে তো! তুই তো নিজে ডাক্তার, তোকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে হয় এই নিয়ে মাঝে মাঝে, বুঝতেই পারছিস।

আবার সেই অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হেসে, যার অর্থ—মিথ্যে কথা ব'লে ব'লে তো আর টাকা রোজগার করা যায় না, সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল। স্বর্ণেন্দু চুপ করলে।

একটার পর একটা অনেক কাহিনী শুনলাম, প্রত্যেক কাহিনীর শেষেই 'সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল'-ব্যঞ্জক হাসি।

তোদের চলছে কি ক'রে তা হ'লে?

অভদ্র এই প্রশ্নটা আমার জিব থেকে ছটকে বেরিয়ে পড়ল।

বাবার পেন্‌শন। বাবার মৃত্যু হ'লেই আমাদের মৃত্যু। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি তাই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে। কলকাতায় অবশ্য ছোটখাটো বাড়ি আছে আমাদের একটা, কিন্তু সেটা এমন জায়গায় যে, তার ভাড়াটেই জোটে না।

আবার হাসলে স্বর্ণেন্দু এবং আমার মনে যে অভদ্রতর প্রশ্নটা উঁকি দিচ্ছিল, অজ্ঞাতসারেই তার জবাবও দিয়ে দিলে।

ভাগ্যে অবনীশ কিছু টাকা দিয়েছে, আর জ্যোতির্ময়ের একটা বাড়ি আছে মধুপুরে, তাই বাবাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে পারছি, তা না হ'লে বাবার পেন্‌শনে এত সব কুলোয় কি!

অবনীশই বা কে, জ্যোতির্ময়ই বা কে?

দুজনেই আমার বন্ধু। অবনীশ বোম্বেতে বিজনেস করে, বেশ দু-পয়সা করেছে। জ্যোতির্ময় একজন আর্টিস্ট—

ও।

বংশী চা দিয়ে গেল। বংশী ঠিক চাকরের মত খাটছে, দেখলাম। বংশী চ'লে যেতে স্বর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, বংশী তোদের সঙ্গেই থাকে বুঝি বরাবর?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে। ওর বাপ মা কেউ নেই, আমার বাবাই মানুষ করেছেন, ওকে বি. এ. পাস করাবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছেন বাবা, কিন্তু কিছুতেই ও পাস করতে পারলে না।

বংশীর সম্বন্ধে এই অপ্রীতিকর উক্তিটা ক'রে স্বর্ণেন্দুর মনে বোধ হয় ঈষৎ ক্ষোভ হ'ল, একটু হেসে বললে, এক-একজনের পরীক্ষা পাস করবার 'ন্যাক' থাকে না, বংশী এদিকে বেশ ইয়ে আছে।

নীরবেই দুজনে চা-পান শেষ করলাম।

স্বর্ণেন্দু নিজের প্রসঙ্গ শেষ ক'রে আমাকে নিয়ে পড়ল, তুই কলকাতায় প্র্যাকটিস করিস কোন্‌খানটায়?

বেনেটোলায়।

বেনেটোলায় ধরণীবাবুকে চিনিস? বেনেটোলায় আমার দূর-সম্পর্কের একজন ভগ্নীপতিও থাকেন, নিখিল চৌধুরী, উকিল—

কাউকেই চিনি না আমি।

এবার গিয়ে আলাপ করিস।

ঠিকানা দিয়ে দিলে স্বর্ণেন্দু।

বেনেটোলায় কি ওঁদের নিজেদের বাড়ি ?

ধরণীবাবুর নিজের বাড়ি, নিখিলদা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, অনেক দিন ধ'রে আছেন ওই বাড়িতে, বেশ লোক।

আচ্ছা, এবার গিয়ে আলাপ করা যাবে।

নম্বর দুটো টুকে নিলাম।

চমৎকার লিখছিস আজকাল ভাই তুই কিন্তু। রাতু তো তোর লেখার ভয়ানক অ্যাড্‌মায়ারার।

লক্ষ্য করলাম, 'ভয়ানক' কথাটা ভয়ানকভাবে ব্যবহার করে স্বর্ণেন্দু। রাতু আমার লেখার ভয়ানক অ্যাড্‌মায়ারার শুনেই বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে ব'লে ফেললাম, ওঁর বিয়ের একটা কিছু ঠিক ক'রে ফেল এবার। আমিও চেষ্টায় থাকব। মেয়ের বিয়ে আজকাল একটা সমস্যা—

রাতুর বেলায় সমস্যা হ'ত না, মা যদি না অবুঝ হতেন। মায়ের মাথায় যে কি ঢুকেছে, তা বলতে পারি না। জ্যোতির্ময়, মানে, আমার আর্টিস্ট বন্ধুটি, ওকে এখুনি বিয়ে করতে রাজি, কিন্তু মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না, আর মায়ের মত না পেলে জ্যোতির্ময় বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। মায়ের পছন্দ অবনীশকে।

কেন ?

অবনীশ দু পয়সা রোজগারও করে, তা ছাড়া একটু ধার্মিক গোছের —মায়ের আরও পছন্দ সেইজন্যেই বোধ হয়।

অবনীশ রাজি নয় বুঝি ?

অবনীশ রাজি আছে ; আমরা, মানে, আমিই মত দিই নি।

কেন ?

ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি সত্ত্বেও লাজুক স্বর্ণেন্দু পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলে, তারপর তৎক্ষণাৎ ছোট্ট একটু হেসে সামলে নিলে লজ্জাটা। তারপর উকিলরা যেমন আসামীর পক্ষ নিয়ে বলে, তেমনই ভাবে বলতে লাগল, রাতু বেচারা মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে ব'লে কি তার নিজের পছন্দ অপছন্দ থাকতে নেই, নিজে সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না ব'লে সব জেনে শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না ? আমি জানি—

এইটেই স্বর্ণেন্দুর লজ্জার কারণ সম্ভবত, কিন্তু সেটা খুলে বললে না সেদিন। একটু থেমে শুধু বললে, অবনীশটা নিরামিষ খেয়ে, সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে আর বার বার টাকা পাঠিয়ে মাকে হাত করেছে, মা এক রকম কথাই দিয়েছেন তাকে। অথচ আসল কথাটা জেনে কি ক'রে আমি—

মুচকি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

একটু পরে আর একটু মুচকি হেসে বললে, এই যে রাত-দুপুরে জ্যোতির্ময় ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ছুটে আসছে—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেল স্বর্ণেন্দু, হঠাৎ খুব যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল, হঠাৎ যেন লাজুক স্বর্ণেন্দুকে আড়াল ক'রে আদর্শবাদী ভাবুক স্বর্ণেন্দু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ডিস্ট্যান্ট সিগ্নালের লাল আলোটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ সেই অদ্ভুত ছোট্ট হাসিটা হেসে কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল, থেমে গিয়ে অপ্রতিভ হ'ল একটু।

তোর মা জ্যোতির্ময়ের ওপর চটা কেন ?

ঠিক উলটো। ভয়ানক ভালবাসে মা ওকে, অবনীশের চেয়ে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নয় কিছুতেই।

কেন, গরিব বলে ?

জ্যোতির্ম্ময় খুব গরিব নয়, মধুপুরে বাড়ি আছে, কলকাতায় বাড়ি আছে, ছবি এঁকে রোজগারও করে কিছু, কিন্তু হ'লে কি হবে, ভয়ানক উড়নচণ্ডে বেপরোয়া খামখেয়ালী।

তোর সঙ্গে আলাপ হ'ল কি ক'রে ?

মা-ই ওকে আবিষ্কার করেন প্রথমে কাশীতে। মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি, ওর বাবা নাকি মায়ের গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় হবার পর ওর মা মারা যান, কিছুদিন পরে বাবাও। মায়ের গুরুদেবই জ্যোতির্ম্ময়কে মানুষ করেছেন। জ্যোতির্ম্ময়ের যে সম্পত্তি গুরুদেবের কাছে গচ্ছিত ছিল, সেসব জ্যোতির্ম্ময় বড় হবার পর জ্যোতির্ম্ময়কে দিয়েছেন তিনি।

ঢননং ঢননং ঢননং—

আমার ট্রেন এসে পড়ল, কুলীটা এসে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি শতরঞ্চি গুটিয়ে উঠে পড়লাম। চিঠি দিস মাঝে মাঝে।—কলরবের মাঝে স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজায় নীরবে রাত্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ পাখাটা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য গরম। একটা দমকা হাওয়ায় তপ্ত ধুলোগুলো ঘুরপাক খেয়ে উড়ছে। বুড়ো মুচী আর কইলু ইতর ভাষায় কলহ সুরু ক'রে দিয়েছে। লোম-ওঠা কুকুরটা ধুঁকছে রাস্তার একধারে ব'সে। একটা টমটমের সঙ্গে একটা সাইকেলের ধাক্কা লেগে গেল। ছিটকে পড়ল সাইকেলের ছোকরা, তারই দোষ, সে দুহাত ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরি করতে করতে যাচ্ছিল। টমটমওয়ালা ছুট দিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে। তাকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে কতকগুলো লোক ছুটল তাকে ধরতে। ঝগড়া ভুলে বুড়ো মুচী আর কইলুও ছুটল। কি অদ্ভুত আবেষ্টনী! আজ আর লিখব না। সুর কেটে গেছে। আর একদিন সুরু করা যাবে।

ক্রমশ

"বনফুল"

আধুনিক বাংলা কবিতা

এই নামে এক ধরনের ছাপা জিনিস আজকাল বাজারে বাহির হইতেছে। অক্ষরগুলা বাংলাই, কিন্তু কথাগুলা কোন্ ভাষার, তাহা বুঝিবার জো নাই। ছন্দ বা মিল না থাকাই নিয়ম, তবে কোন-খানে যদি থাকে, তাহা নিতান্তই গৌণভাবে। ভাব বা অর্থ সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, তা সে মানুষ যতই শিক্ষিত বা শব্দার্থবিদ হোক। এ কবিতা পড়িবার আগে 'আধুনিক' সংজ্ঞাটির সঙ্গে উত্তম-রূপে পরিচিত ও তাহার প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমান হওয়া দরকার, নহিলে ছন্দমিলহীন এবং ভাষার মাথামুণ্ডহীন এই খাঁটি শব্দব্রহ্মের বুদ্বুদগুলির যে পরিচয় সহজ মানুষের সহজ বুদ্ধিতে ধরা দেয়, তাহাই প্রকাশ পাইবে, এবং বাংলাদেশে বাতুলাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সমস্যাই গুরুতর হইয়া উঠিবে। এই জাতীয় কবিতার সবচেয়ে বড় গৌরব—ইহা আধুনিক। এই আধুনিকতা প্রশমন করিবার জন্য প্রাচীন বিষ্ণু তৈল ব্যবহার না করিয়া, তাহাকেই ভাল করিয়া জাহির করিবার জন্য, তন্নামধেয় আধুনিক কবির এবং তাঁহার সগোত্র কয়েকজনের জয়ঢক্কা বাজাইয়া একখানি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। কুব্জ ব্যক্তির চিত হইয়া শুইবার সাধ সাধই থাকিয়া যায়; এই আধুনিক কুব্জেরা কেবল সাধ করিয়াই

ক্ষান্ত নহেন, সেই অসাধ্য সাধকে সাধ্যায়ত্ত করিবার জন্য নিজেরাই একটি নৌকা সাজাইয়া কলিকাতার বর্ষাপ্লাবিত রাস্তার ঘোলা জলে তাহা ভাসাইয়াছেন, বালীগঞ্জ হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত অনেকেই ইহাতে অষ্টাবক্র অবস্থায় চিত হইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে স্ফূর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। দুইজন মহাপণ্ডিত কর্ণধার এই তরণীটিকে একযোগে চালাইবার জন্য হাল ধরিয়াছেন। সে পাণ্ডিত্যের সম্মুখে কাহারও দাঁড়াইবার জো নাই—সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ববাদ, কলাবিদ্যা এবং তৎসঙ্গে সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজীর মিলিত জারজ ভাষার আন্তর্জ্জাতিক বচন-বাণ—দুইটি ভূমিকার ভূমি-খনন-চাতুর্য্যে, সকল অভক্তির জড় মারিয়া দিয়াছে; তাহাতে পাঠকের চিত্ত এমন কর্ষিত হইয়া উঠে যে, অতঃপর গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেই, তথাকার মহা মহা কবিতার বজ্রবীজগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তরের অন্তরে ফুলপল্লবে বিকশিত হইয়া উঠে, মন-ভ্রমরা তাহাদের শোভায় আকুল এবং মধুপানে উদাস হইয়া যায়। এই পাণ্ডিত্যের ধমকে পাঠককে স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক—অর্থাৎ অতি জীর্ণ—বাংলা সাহিত্যের চিলে-কোঠায় যেখানে যত পেঁচা, বাদুড় ও চামচিকা বাসা করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি 'বার্ড অফ প্যারাডাইজ'—আধুনিকতার অতি-উর্দ্ধ অন্তরীক্ষ হইতে কতকগুলি অণ্ড কেমন করিয়া এই বাংলা সাহিত্যের পুরানো বাস্তুর কার্নিসে ফাটলে পড়িয়াছিল, তাহাই ফুটিয়া এই পংখীগুলির উদ্ভব হইয়াছে। এই সব অক্ষরস্তূপের মধ্যে এমন এক একটি ভাবের বোমা লুকানো আছে, যাহার বিস্ফোরণ-ক্রিয়া যাহার-তাহার সাধ্য নয় বটে, কিন্তু এই ভূমিকা দুইটির ডবল-পলিতা লাগাইলে এমন কাণ্ড হইতে পারে, যাহাতে পাঠকের মুণ্ড উড়িয়া যাইবে, এবং তারপর তাহার কবন্ধ এক বিচিত্র উপায়ে হাসিতে ভরিয়া উঠিবে। উপমার সাহায্যেই আমরা

যাহা বলিলাম, তাহা যে কত সত্য—যাঁহারা এই বই পড়িবেন, তাঁহারা তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিবেন, শুধু চর্ম্মের দ্বারাই রেহাই পাইবেন না।

* * *

পুস্তকখানিতে আর একটি সাধ মিটাইবার প্রয়াস আছে। শুধুই নিজেদের গৌরব প্রতিষ্ঠা নয়—যাহারা একালে কিছু কবিতা বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন—নিজেদের সেই অপূর্ব্ব কবিতার সঙ্গে—বাদুড় হইতে সদ্যোদ্ভিন্ন অণ্ডজদিগের সেই লালা ও বিষ্ঠার রাশির সঙ্গে—তাঁহাদেরও দুইটি বা একটি কবিতা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে যেন হইয়াছে এই আধুনিক কবিতার পাদপীঠ; সেগুলির উপর দাঁড়াইয়া—সেই পূজার পিঁড়ির উপরে অনাচার করিয়াই—মেধ্যের উপরে অমেধ্যের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা। তাহার অর্থ, বিশ বৎসরের মধ্যে এই 'কাল্‌কা যোগী'র দলই যা কিছু কবিতা লিখিয়াছে—আর যাহারা এই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'দের—এই অনাচারী অন্ত্যজদের—স্পর্শে অশুচি হইবার ভয়ে বরাবর দূরে সরিয়া আছে, তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিয়া তাহাদের জাত মারিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, সেই চণ্ডালদের তুলনায় বর্ণশ্রেষ্ঠরা কিছুই করে নাই—যাহা করিয়াছে তাহা 'আধুনিক' নয় বলিয়া কবিতা নয়—তাহারা বাংলা কবিতা লেখে নাই। কারণ 'বাংলা' বা 'কবিতা' এই দুইটা তো বড় লক্ষণ নয়—আসল লক্ষণ আধুনিকতা, অর্থাৎ ফেরঙ্গ-ব্যাধি ও উন্মাদরোগের সন্নিপাত।

* * *

'শনিবারের চিঠি'তে এ সকল কথা নূতন নয়—বলিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না; তথাপি যে কারণে এই নিতান্ত অনাবশ্যক কথাও বলিতে হইল, তাহা এই যে, বাংলা কবিতার যে দশা হইয়াছে, তাহাতে ক্রমে বাঙালীর কবিতা-জ্ঞানও লোপ পাইতেছে; কাজেই, বুঝুক না

বুঝুক, ঢক্কানিনাদ সহকারে যাহা প্রচারিত হয় (এবং এরূপ প্রচার বাড়িতেছে)—তাহাকেই সভয়ে—নব্য কুলচুর-সম্প্রদায়ে অবজ্ঞাত হইবার ভয়ে—স্বীকার করিবার প্রবৃত্তিও কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে। এইজন্য সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। যাহারা কুলচুরকামী তাহারা বন্ধু ও শিষ্যসেবক সহকারে দল বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুক, কিন্তু যাহারা এখনও সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ এবং যাহারা বাংলা ভাষায় কবিতা পড়িতেই ইচ্ছুক, তাহারা এ পুস্তক পয়সা দিয়া কিনিলে পশ্চাত্তাপ যে অনিবার্য্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিরাশ্রয় বাংলা কবিতা

এই আধুনিক কবিতার সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন যে আর নাই, তাহার একটু প্রমাণ এই সঙ্গে দিব। সম্প্রতি এই দলেরই দুইজন সাধু ব্যক্তি একখানি কবিতার ত্রৈমাসিক বাহির করিয়াছেন। ত্রৈমাসিকও নবকুলচুরী সাহিত্যের একটি ফ্যাশন—যদিও সে ফ্যাশন অনেকটা প্রাণের দায়েও বটে। উহাদের ঐ বস্তু বাজারে কাটে না, তাই মাসে মাসে অর্থদণ্ড দেওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনই, উৎকৃষ্ট বস্তুর মহার্ঘতার অজুহাতে, বৎসরে চারবার মাত্র ডালি সাজাইয়া অর্থদণ্ড যতদূর সম্ভব লঘু করার উপায় আছে। এ পত্রিকার অনুষ্ঠান-পত্রে ছিল—নিরাশ্রয় বাংলা কবিতার একটা আশ্রয় করিয়া দিবার মহৎ সংকল্পের কথা। কিন্তু বাংলা কবিতা নিরাশ্রয় হয় কেন? দেশে এতগুলা বড় বড় মাসিক ও ছোট বড় সাময়িক-পত্রিকা রহিয়াছে, তাহাতে অজস্র কবিতা থাকে—ভাল-মন্দের বিচারও থাকে না; সকল রকমের কবিতাই ছাপা হয়। তা ছাড়া, কবিতার বই তো অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে! তবে বাংলা কবিতা নিরাশ্রয় হইল কেমন করিয়া?

এককালে এই সকল পত্রিকাতেই অনেক ভাল কবিতা বাহির হইত, তাহা পড়িয়া কাব্যরসিক বাঙালী পাঠক তৃপ্ত হইত। আজকালকার কবিতা যদি ভাল না হয়, তবে কবিতা নিরাশ্রয় হইয়াছে বলা যায় না—বাংলা সাহিত্য কবিশূন্য হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা হইলে, এই যে নিরাশ্রয়তার দুঃখ—ইহা কিসের বা কাহাদের দুঃখ? সেই সকল কবিই কি নিরাশ্রয় হইয়াছেন, যাঁহাদের অপূর্ব্ব কবিতা বাংলা মাসিকের মত প্রশস্ততম আটচালাতেও স্থান পায় না? কেন পায় না? যাহারা ব্যবসা করিয়া খায়, তাহারা দ্রব্যের বাজার-মূল্য জানে—তাহারা দুধ মদ তাড়ি সবই বেচিয়া থাকে—সব জিনিসেরই খরিদদার আছে; কিন্তু এই নব্য কবি-মহাজনদের পদাবলী গাঁজা-গুলি-চরসকেও হার মানাইয়াছে, অতখানি নেশা যে পাগলা-গারদের বাহিরে কেহ করিতে রাজি নয়, তাহা এই সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও জানে; তাই, বোধ হয়, তাহাদের ব্যবসায়িক উদারতা ঐখানে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে 'বাংলা কবিতা'র এই নিরাশ্রয়তার সংবাদে বাঙালীর জন্য একটু আশা হয়, এখনও তাহারা বাবাকে বাবা ও মাকে মা বলিতে ভুল করে না; এবং ঐ 'বাংলা কবিতা' দেখিয়া 'বাবা রে! মা রে!' বলিয়া ভিরমি গিয়াও থাকে। বাংলা কবিতার যে প্রাণটুকুও ধুকধুক করিতেছিল, তাহাও যাহারা একেবারে গলা টিপিয়া শেষ করিয়াছে, তাহারাই আবার কোন্ লজ্জায়—বাঙালী তাহাদের কবিতা আদর করে না বলিয়া মরাকান্না কাঁদিতে চায়! কবিতাকে যাহারা খুন করিয়াছে, তাহারা কবিতাই বা লিখিবে কেমন করিয়া? Glamis hath murder'd sleep and therefore Cawdor shall sleep no more!" অবশ্য এই কাঁদুনিও যদি সত্যকার কাঁদুনি হয়।

* * *

কিন্তু তাহা যে সত্য নয়, তার প্রথম প্রমাণ—এই কবিতার ত্রৈমাসিকের নাম দেওয়া হইয়াছে 'নিরুক্ত'। নামটির ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় অর্থ যাহাই হউক, এখানে কিন্তু বড় মানাইয়াছে—বাঙালী-মানুষকে ঘাবড়াইয়া দিবার এমন নাম আর হইতে পারে না। কবিতার বইয়ের নাম 'নিরুক্ত'! অভিধানমতে ইহার অর্থ—যাহা নিশ্চয়রূপে উক্ত হইয়াছে, যাহা চরম সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার ফল। কবিতা তাহাই বটে! মীমাংসাই তো আগে—যুদ্ধং দেহি, ও তারপর জয়লাভ, ইহাই তো কবির কাজ! এমন না হইলে আধুনিক কবিতা হইবে কেন? ভাবে ভাষায় ছন্দে সুরে, কোনখানে সন্দেহের লেশমাত্র নাই, হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুইই এই কবিতার নিরুক্তি বা নিশ্চয়-উক্তির দাপে ফেরার হইয়া যায়, এ উক্তির সম্মুখে দাঁড়ায় কে! কথাটি কহিবার জো নাই—ভীষণ পাণ্ডিত্যের ছোরাছুরি বাহির করিয়া হাঁ করাইবে, এবং তাহার মধ্যে কবিতা পুরিয়া দিবে; তাহাতে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য—কোন রস না থাক, গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। অতএব এ হেন কবিতা যে "নিরুক্ত," তাহাতে সন্দেহ কি?

দ্বিতীয় প্রমাণ, ইহাদের সাধু সংকল্পের কথা রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করিয়াছিলেন—কিন্তু সে যে একটা ধাপ্পা মাত্র, প্রথম সংখ্যাতেই তার প্রমাণ প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ ইহাদিগকে লিখিয়াছিলেন—

...কিছুকাল থেকে ভাষায় বিকৃতি ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যে এই মারীর সংক্রামকতা এখানকার বাতাসকে অধিকার করেছে সুতরাং বাহির থেকে কোনো প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।...তোমাদের রচনায় তোমরা সাহিত্যের সুস্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকো। সেই দৃষ্টান্তের ফল যতটুকু হয় ততটুকুই ভালো। মানুষ ফ্যাশনের তাড়ায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যঙ্গ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই, সেই দিনের জন্য অপেক্ষা কর এবং অবিচলিত চিত্তে আপন কর্তব্য করতে নিযুক্ত থাক।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ও উপদেশের সরাসরি জবাব 'নিরুক্ত' নিরুক্তভাবেই দিয়াছে। আমরা তাহার কয়েকটি তুলিয়া দিলাম।

(১) সমাধির ঢের নিচে—নদীর নিকটে সব উঁচু উঁচু গাছের সিকড় গিয়ে নড়ে।
সেইখানে দার্শনিকদের দাঁত কাথ পান করে
পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরা মাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে;—
জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত ক'রে নেই নিজেদের;
কেননা ভূমিকা ঢের র'য়ে গেছে,—
বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে)—
সুশ্রী ময়ূরেরা কেন উটপাখি সৃষ্টি ক'রেছিল
টানা পোড়েনের সুরে—সূর্য্যের সপ্তকে।

(২) জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে
তামাসা চালাতে আছে পুনরায় সময় একাকী।
তবুও সে ভোরবেলা হরিয়াল পাখি
ধূসর চিতলমাছে—নির্ঝরের ফাঁসে
খেলা ক'রে কাকে দিয়েছিল তবে ফাঁকি?
বসন্তবউরী দুটো এই ব'লে হা-হা ক'রে হাসে।

(৩) তৃষিত বালির দেশ, চাতকের হাড়
দেখোতো সূর্য্যের নীচে জ্বলে
পাহাড়ে অদ্ভুত ছায়া। স্থবির আকাশ
চমকায় বুঝি পলে পলে।

(৪) সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিলো অত্যন্ত রঞ্জনে।
বিরহের অবরোধে হয়েছিলো মিলন স্বগত;
বাস্তববিবাগী আঁখি প্রেমাশ্রুর মায়াবী অঞ্জনে
আচম্বিতে সনির্ব্বন্ধ, অচিরাৎ স্বপ্নজাগরূক।
ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে-দিন—
অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক;

(৫) চম্‌কিয়ে ওঠে কবিতায়
ডাঁটা সুদ্ধ রাঙা পালঙ্‌ শাক
লাল ঘাসের পোকা, বেতের বেড়ায় বেগ্‌নি ফড়িং বোকা,
বালির ঝুড়ি-মাথে সুলিয়ানী
ধারালো সমুদ্রের দুরান্ত
কাজের ফাঁক
আল্‌সেমির চূড়ান্ত
গোরুর গাড়ির গেঙ্‌রানি—
ছন্দে বেঁধে লভি তায়।

লেখকদিগের নাম আর দিলাম না; সবাই যে একই হাসপাতালের পাশাপাশি বিছানা আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—বীরত্বের কারণও তাই। যাহারা কবিতাকে বাপের নাম ভুলাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা কি সহজে ভোলে? এ হেন বাংলা কবিতার সেই নিরাশ্রয়ের কথা শুনিয়া যাহার দুঃখ হয়, সে কি বাঙালী?

* * *

কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় হইয়াছে এই নষ্টচন্দ্রের নষ্টামিতে যোগ দিয়াছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এই সংখ্যায় যতগুলি আধুনিক-মার্কা 'কবিতা' আছে, তাহার মধ্যে—রূপে ও ভঙ্গিতে যেমনই হউক—ভাষায় ও ভাবে পরিচ্ছন্ন এবং প্রকাশনৈপুণ্যে প্রায় নিখুঁত হইয়াছে তাঁহারই কয়েকটি লিপিকা। এগুলি কাব্যের রসাল বৃক্ষের বা দ্রাক্ষালতার ফল না হইলেও, বনজাত বৈচিত্র্য বটে। আকারের মহিমা নাই, বর্ণ-গরিমা নাই, ভিতরে চুষিবার মত আঁটিও নাই; শাঁস অতি অল্প, রস দাঁতে কাটিতেই ফুরাইয়া যায়, এবং বিচিও কিছু আছে; তবু এক প্রকার স্বাদ ইহাদের আছে। বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে মনে যে একটি সহজ তৃপ্তির নেশা লাগে, সেই নেশার

পক্ষে এগুলি উপাদেয়। এবং এ রচনা বাংলাও বটে—সেই একটি কারণে বাংলা বাণীশিল্পে ইহাদের স্থান আছে। কিন্তু এগুলিও ভিড়িয়াছে এই নষ্টচন্দ্রের কলাচুরী-কীর্ত্তির দলে; শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ইহাকেই যদি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাংলা কবিতার জন্য নয়—তাঁহার জন্যই চিন্তিত হইতে হয়।

সাহিত্যের ঘোষ-যাত্রা

অতি-আধুনিকদের আধুনিকতা বাংলা কবিতার যে শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে, তাহাতে মহাজনেরা 'স্মেরমুখ' নয় একেবারে 'আহাম্মুখ' (যে মুখ দেখিলে 'আহা' বলিতে হয়) হইয়া গিয়াছেন। কবিতার তো এই হাল হইয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক বিদ্বানেরাও এই সাহিত্যের আলোচনায় যে সততা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন, তাহাও অন্ধকারে প'ড়ো বাড়ির বাদুড় ও পেঁচকদের উৎসব স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যায় তো এক একজন বৃহস্পতি—বিশেষত বাংলা সাহিত্যের বিদ্যায়। কিন্তু ঘটে যতই ছিদ্র থাক, এক একটি ঘাটে নামিয়া গুলতানি করিতে না পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা-মারা বিদ্যার সেই মার্কা যে জাহির করা হয় না! বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লইয়া কিছুকাল যাবৎ যে একটি ক্যাওট-ঘোঁট চলিতেছে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও কার্ম্মিক মাসিক-পত্রিকায় সেই মহাযুদ্ধে একে একে যে সকল মহারথীর আবির্ভাব হইতেছে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির যে রণকৌশল আমরা সঞ্জয়ের মত দূর হইতে দেখিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র—অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে মাঝে মাঝে জানাইয়াছি, তাহারই সম্পর্কে এবার 'শল্য হ'ল রথী'র কথা কিছু বলিব। সম্প্রতি 'প্রবাসী' পত্রিকায়, বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডক্টর

মনোমোহন ঘোষ সেই রামমোহনকেই রাজা করিয়া, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের রাজ্য ব্রাহ্মসমাজেরই যে পিতৃরাজ্য, তাহা প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এমন ইতিহাস-জ্ঞান এবং সাহিত্যের নাড়ীজ্ঞান আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। কিন্তু উপায় কি? প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃষোৎসর্গে যে পুঙ্গব 'দাগ'-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া মাঠে মাঠে স্বাধীন বিচরণের অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইবে কে? তারপর, সেই পবিত্র ধর্ম্মের পুঙ্গবটিকে যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুবিধামত, নিজের শস্য হাটে বহিবার জন্য গাড়িতে জুতিয়া দেয়, তাহা হইলে আজিকার দিনে এমন কে হিন্দু আছে, যে তাহার প্রতিবাদ করিবে? আমরা এই বিদ্বানটির কিছু পরিচয় এক সময়ে পাইয়াছিলাম—তখনও অবশ্য তিনি এতবড় বিদ্যা-পুঙ্গব হন নাই, কিন্তু তখনই তাঁহার ককুদ উন্নত হইয়াছে, এবং শৃঙ্গ অনেকখানি গজাইয়াছে। 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়'—সেই 'উঠন্তি মুলো' দেখিয়া তখনই তাহা চিনিয়াছিলাম, এবং দেশের যে দুর্ভাগ্য, তাহাতে ভয়ও হইয়াছিল—পুঙ্গব শেষে দিগ্‌গজ না হইয়া দাঁড়ায়। সে কাহিনী যদি কেহ সবিস্তারে জানিতে চান, তাহা হইলে ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে এই মহাপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, মেধা ও রসবোধের জাহাজী প্রমাণ পাইবেন। তখনই বিদ্যার ঝাঁজ এমন যে, কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! শব্দশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র গণ্ডুষে পান করার মত পাণ্ডিত্য, আর তাহারই সঙ্গে সে কি তর্ক ও বিচার-পটুতা! ঘোষের সেই নির্ঘোষে সেকালের নবদ্বীপের বড় বড় ভট্টাচার্য্যেরাও টিকি কাটিতে বাধ্য হইতেন—মনে হইবে, রবীন্দ্রনাথের 'জয় পরাজয়' গল্পের সেই পুণ্ডরীক সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছে! 'মন' ও 'অন্তঃকরণ' এই দুইটি শব্দ লইয়া ঘোষ-পণ্ডিতের সে কি কোষ-বাহ্য!

অলঙ্কারশাস্ত্র তো নিমেষে নস্যবৎ অদৃশ্য হইয়া গেল! আর বেচারী মল্লিনাথের সে কি নাকাল! আর সব ছাড়িয়া দিলেও, এই এক কসরতের অপূর্ব্বতায় সেদিন আমরা চোখে সরিষাফুল দেখিয়াছিলাম। ঘোষ মহাশয় যেহেতু সম্প্রতি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম-নিরূপণ করিতে বসিয়াছেন, এবং বাংলা গদ্যের সেই রসের পাক চাখিয়া চাখিয়া কারিগরদের পূর্ব্বপর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন,—আর একবার এই পত্রিকাতেই আর এক পণ্ডিতের একশো খানা উৎকৃষ্ট বাংলা গ্রন্থ ঠিক করিয়া দেওয়ার মত—সেইহেতু, আমরা তাঁহার সেবারকার সেই কীর্ত্তি হইতে, কেবল তাঁহার সাহিত্যরসবোধের মল্লিনাথমারী প্রতিভার প্রমাণটুকু এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব। এই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিবার প্রয়োজন যে কেন হইল, তাহা সকলেই পরে বুঝিতে পারিবেন।

* * *

১৩৪০ সনের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় "সাহিত্যে অশ্লীলতা" বিষয়ক একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক বাহির হইতেছিল, লেখকের নাম ছিল সত্যসুন্দর দাস। এই প্রবন্ধে অলঙ্কার, শব্দার্থ ও সাহিত্যরস ঘটিত নানা ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া ঘোষ মহাশয় একটি আলোচনা ঐ পত্রিকাতেই করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যিক, বৈয়াকরণিক, আলঙ্কারিক, ও প্রত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের বহর দেখিয়া আমরা হকচকিয়া গিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে ছিল—

"সেকালে নারীর প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে, নিঃসঙ্কোচে নারীরূপের স্থির প্রতিমা লইয়া নানা উপমার সৃষ্টি হইত যাহা নিতান্তই স্বাভাবিক তাহার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা-বোধ ছিল না। * * * * এ যুগে দেহ সম্বন্ধে কবিমানসের স্বাভাবিকতা আর নাই; প্রকাশ্যে তাহাকে অস্বীকার করিয়া

অপ্রকাশ্যে শতগুণ ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়। অশ্লীল বলিয়া আমরা যাহার নিন্দা করি, তাহা মনকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুধার্ত্ত করিয়া তোলে না, তাহা নিতান্তই বাস্তব, তাই অরুচিকর।...আধুনিক রুচির পক্ষে নিয়োদ্ধৃত শ্লোকাংশ নিশ্চয়ই অশ্লীল ?

"মধ্যে শ্যামঃ স্তনইব ভুবঃ শেষবিস্তার পাণ্ডুঃ"

(পর্ব্বতের শিখরে কুন্তলকলাপের মত মেঘ সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ উপান্তভাগ পরিণতফল আম্রবনের দ্বারা আচ্ছন্ন, অতএব পীতবর্ণ, যেন পর্ব্বত নয় পৃথিবীর স্তন, তাহার মধ্যস্থল শ্যাম ও বিস্তীর্ণ পার্শ্বদেশ পাণ্ডুবর্ণ।)

উপমাটির মধ্যে নগ্নতা আছে, নারীর এমন একটি অঙ্গের বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে যাহা চিরদিন সুরুচির বিঘ্নকারক, ইত্যাদি।

আমি যেটুকু উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে, এবং বিশেষত অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত উদ্ধারের পূর্ব্বেই যে মন্তব্য রহিয়াছে তাহা হইতে, কোনও বুদ্ধিমান পাঠকেরই বুঝিতে ভুল হইবে না, প্রাচীনের অশ্লীলতা সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব কি। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যাদিগ্‌গজ হইবার সাধনায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার বিদ্যা তো সহজ বিদ্যা নয়। তাই শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় এই স্থানটির সমালোচনা করিতে তাঁহার বিদ্যার কলসটি কিরূপ উপুড় করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেছি। তিনি লিখিলেন—

সৌন্দর্য্য-বিচারের সময় দেশকালপাত্র সম্বন্ধে খুব সচেতনতা চাই এবং যথাসম্ভব বস্তুসাপেক্ষ ভাবে সৌন্দর্য্যের বিচার করা প্রয়োজন।

সৌন্দর্য্যের সহিত দেশকালপাত্রের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—তাহার সেই বস্তুসাপেক্ষতার কথা, এমন গম্ভীর ও গভীর ভাবে বোধ হয় বেনেদেত্তো ক্রোচেও বলিতে পারেন নাই, আপনারা তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। তারপর—

তিনি (সত্যসুন্দর দাস) "মধ্যে শ্যামঃ স্তনইব ভুবঃ শেষবিস্তার পাণ্ডুঃ" এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সমালোচনার যোগ্য।

—অর্থাৎ, এইটুকুতে ঐ শ্লোকের সমগ্র ভাব প্রকাশ পায় না—ইহা একরূপ garbled quotation হইয়াছে। মনে হয়, সমালোচক মহাশয় নিজে সমগ্র শ্লোকটি পড়িয়া অশ্লীলতার কোন আভাস পান নাই। কিন্তু তিনি যে কেমন পড়িয়াছেন, তাহার প্রমাণ পরে দিব।

'পৃথিবীর বিরাট দেহের যে অসংবৃত অবস্থা ইহাতে সূচিত হইতেছে তাহা আরও অশ্লীল'—এখানে লেখকের মতকে বস্তুসাপেক্ষ বলিবার কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

—কি সাবধান অথচ সুগভীর উক্তি! তারপর স্থানকালপাত্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য এই প্রসঙ্গে হিন্দুর দেবীমূর্ত্তির স্তন—এবং কালিদাসের এই শ্লোকে বসুন্ধরার স্তনস্বরূপ পর্ব্বত যে বিরাট মাতৃত্বের মহনীয়তার আভাস দিতেছে, তাহা খাঁটি হিন্দুর মত, সেই গো-রূপী পৃথিবীর বৎসভাবে, ধ্যান করিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, স্থানকালপাত্রবিদ্ এই খুল্ল-পণ্ডিত, রঘুবংশে, সুদক্ষিণার গর্ভাবস্থার প্রসঙ্গে যে স্তনের বর্ণনা আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া রঘুবংশের সেই স্থান ও মেঘদূতের এই স্থানের যে স্থান-কাল-পাত্র সাদৃশ্য যোজনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোনও কাব্যের অধ্যাপক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। রঘুবংশের সেই শ্লোকটি উদ্ধার ও তাহার ব্যাখ্যার ঘটা দেখিয়া মনে হয়, ঘোষ মহাশয় সত্যই যেন কোন মফঃস্বলবাসীকে হাইকোর্ট দেখাইবার উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এখনও 'ধেনু' বলি নাই! Aesthetics হইল, স্থানকালপাত্রের বস্তুসাপেক্ষতা হইল, কাব্যবিচারে হিন্দুর দেবীমূর্ত্তি-ঘটিত ভক্তিরস ও তাহার আর্টের কথা হইল—কালিদাসীয় কাব্যের সাগরমন্থন করিয়া অতিদুষ্প্রাপ্য রত্ন উদ্ধার করা হইল—তথাপি এখনও একটি কাজ বাকি আছে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞানও যে কত

অগাধ, এবং তাহা না থাকিলে কালিদাসের কোন শ্লোক সম্যক বুঝিয়া উঠা যে দুষ্কর, তাহাই অব্যবসায়ীদিগকে সমঝাইয়া দিবার জন্য অতঃপর ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

গুপ্তযুগের বিবৃতস্তনী রাণীর প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে কালিদাস গুপ্তযুগের মানুষ, এবং স্তনের কুরুচিকরত্ব সেকালে অন্ততঃ ছিল না।

পাণ্ডিত্যের পরিচয় আপনারা পাইলেন; কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় কিছু পাইলেন কি? এ যেন সন্তকবলিত এবং অ-সম্যকজীর্ণ কতকগুলা পুঁথিবাক্য যে কোনও উপলক্ষ্যে উদ্গার করিয়া বিদ্যার সৌরভ বিস্তার করিবার অধীর আকাঙ্ক্ষা! যাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সত্যসুন্দর দাসের সেই আলোচনা, ঘোষ মহাশয় তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, সর্ব্বশেষে সেই কথাই তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন! সাফাইস্বরূপ এক স্থানে লিখিয়াছেন—

মেঘদূতের উদ্ধৃত শ্লোকাংশের উপর অশ্লীলতার আরোপ লেখক যে আধুনিক রুচিবাগীশদের জবানীতে করিয়াছেন তাহা তাঁহার লেখার ভাষা হইতে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

—অর্থাৎ প্রবন্ধের এতখানি পড়িয়াও (আমি যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার অর্থও ছাড়িয়া দিলাম) সে সন্দেহ নিরসন হয় নাই! কবি কম দুঃখে বলেন নাই—"অবোধ মোযের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্‌ব!" অথবা—'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার' ইহাকেই বলে!

* * *

কিন্তু আসল কথাটি এখনও বলি নাই—কাব্যের ব্যাখ্যায় তিনি যেরূপ মৌলিকতার পক্ষপাতী, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর। মেঘদূতের ঐ শ্লোকটি যে আদিরসাশ্রিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ এ

পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই—ওখানে কালিদাসের কল্পনায় পৃথিবী যে অশেষ ভূতধাত্রী বা অন্যবিধ ধাত্রী নয়, সামান্যা নায়িকা মাত্র, তাহা ঐ শ্লোকের স্থান-কাল-পাত্রই সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ শ্লোকেই আছে যে, মেঘ সেই স্তনসদৃশ গিরিশিখরে উপবেশন করিলে, তাহার শিখর-চুচুক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অমর মিথুনের, অর্থাৎ আকাশচারী কামী-যুগলের, সস্পৃহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই শ্লোকের টীকার শেষে মল্লিনাথ লিখিতেছেন—যথা পথি ক্লান্তঃ কশ্চিৎ কামী কামিনীনাং কুচকলসে বিশ্রান্তঃ সন্ স্বপিতি তদ্বৎ, ইত্যাদি। তিনিও এখানে মেঘকে বৎসরূপে নয়, কামীরূপেই বুঝিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা এ শ্লোকের আদিরস উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমাদের একজন আধুনিক পণ্ডিত অমর-মিথুনদের কথায় লিখিয়াছেন—'স্তন সাদৃশ্যাৎ বিমোহিতানি অমরযুগলানি ইত্থম্ভূতং ত্বাং সস্পৃহমালোকয়িষ্যন্তে'।

কিন্তু তাহাতেও ঘোষ মহাশয় হটিবার পাত্র নহেন—মৌলিক গবেষণাই তখন তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য। তাই কামানের মুখে দাঁড়াইয়াও অবিচলিত নিষ্ঠা ও নির্লজ্জার সহিত তিনি লিখিলেন—

নানা দিক বিবেচনায় মনে হয় এস্থানে টীকাকার মহাশয় (মল্লিনাথ) কালিদাসের কাব্য হইতে দুর্ব্যাখ্যা বিষ ঝাড়িতে অসমর্থ হইয়াছেন।

তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম—তাঁহাকে ঝাড়াইবে কে? 'নানা দিক বিবেচনা'র নানা দিক যে কি, তাহা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

এ হেন পণ্ডিত বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণভূমিষ্ঠ হইলে কি ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া তখন একটু চিন্তাকুল হইয়াছিলাম!

* * *

তারপর একদা 'প্রবাসী' পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ পাইলাম, সেই

ঘোষ মহাশয় প্রাকৃত ভাষার কাব্য 'কর্পূরমঞ্জরী'র ক্ষৌরকার্য্য করিয়া, অর্থাৎ উহার পাঠসংস্কার করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি পাইয়াছেন। এ সংবাদে আমরা আশ্বস্তই হইয়াছিলাম। কারণ তিনি যে কাব্যরস শুষ্করস প্রভৃতির দায় হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি পাণ্ডিত্যের—অর্থাৎ ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের—কঠিন বস্তুসার ভূমিতে হল-চালনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের ভয় দূর হইয়াছিল; বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথের সেই বৈয়াকরণের কথা—

কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করে'
প'ড়ে গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে'—
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।

—স্মরণ করিলেই আমাদের হৃদ্‌কম্প হয়। কিন্তু সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষা এবং সেই সাহিত্যের ভারী ও নিরেট অলঙ্কারের ব্যবসায় বজায় রাখিয়াই—কবিরাজির সঙ্গে অ্যালোপ্যাথির মত—বাংলা সাহিত্যের কারবারও ইঁহারা ছাড়িবেন না। সাহিত্যরসবোধ ও সাহিত্যের বিচার-বুদ্ধির যে পরিচয় ঘোষ মহাশয় একদা দিয়াছিলেন, তাহাতে কর্পূরমঞ্জরীর কর্পূরশোধন যে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্ম, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে, আমরাও এই কবিরাজী পাণ্ডিত্যের পুরস্কারে পুলকিত হইয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁহার এই অধিকার প্রতিষ্ঠা হইল কোন্ বিদ্যার বলে? তিনি কি মনে করেন, এ সাহিত্য এখনও বেওয়ারিশ হইয়া আছে? বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করিবার কি তিনি উপযুক্ত? বাংলা গদ্য অথবা গদ্য-সাহিত্যের রসরূপের বিবর্ত্তন-ধারা বুঝিবার মত শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁহার আছে? সাহিত্যরসবোধ পরের কথা, ইংরেজীতে যাহাকে sense of proportion বলে, সেই

মাত্রাজ্ঞান, এবং sense of humour বা সহজ রসবোধ যে তাঁহার নাই, বরং তাহার পরিবর্ত্তে অতি উগ্র পণ্ডিতম্মন্যতার ব্যাধি যে তাঁহার আছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ উপরি-উদ্ধৃত কাহিনীতে পাওয়া যাইবে। সত্যানুসন্ধিৎসুর যে বিনয়, তাহাও তাঁহার নাই। ইহার উপর, ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান লইয়াই যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সাহিত্যজ্ঞান যে কিরূপ হাস্যকর হইয়া থাকে—তাঁহাদের সাহিত্যবিচারের ফল যে পদ্মবনে মত্ত হস্তী প্রবেশের মতই, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। অতএব এ হেন পণ্ডিতের, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হইতে বাল্য-কৈশোর-যৌবনের জীবনবৃত্ত রচনা যে কিরূপ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও উপাদেয় হইবে, তাহা 'প্রবাসী'র প্রবন্ধগুলিতে দিন দিন নিঃসংশয় হইয়া উঠিতেছে। সেগুলির আলোচনা আমরা উপস্থিত করিব না। এবার আমরা কেবল এই ঘোষযাত্রা-পর্ব্বাধ্যায়ের ঘোষ-পাণ্ডিত্যের একটু ভূমিকা মাত্র করিলাম, ইহা হইতেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় ঐ জাতীয় সাম্প্রদায়িক আলোচনার মূল্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে, কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

ব্ল্যাক-আউট

যুদ্ধের নামে অদ্ভুত রস কলকাতায়,
কেরানীকুলের বিরাট প্রাসাদ লালদীঘিতে—
মন্ত্রী এবং কেরানীরা মেলে পেটভাতায়
স্বর্গে উঠিছে মর্ত্ত্যে নামিছে উপুড় চিতে!
সারাদিন ধ'রে খেলা চলিতেছে গোলকধাম,
সহসা একদা লড়াই-মন্ত্রী বলেন হেঁকে,
শুন হে কেরানী, কোটালে কহিয়া কর এ কাম—
এ পাকি-শহর দাও বিলকুল আঁধারে ঢেকে।
থানায় থানায় বিলি হয়ে গেল হুকুম-নামা,
আলো নিবে গেল মুমূর্ষু বেড়ে হাসপাতালে;
কোথায় বিমান? বুদ্ধিমানেরা ধরিছে ধামা,
গাঁট ও পকেট কাটে যারা হাত দিতেছে গালে।
ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষের ফেরে টাউট,
ব্ল্যাক-আউট নয়, খেলোয়াড় সব বেবাক-আউট!

বিধান

নবগ্রামের ভটচাজ্জিদের আর কিছু না থাক, পাণ্ডিত্যের খ্যাতিটা খুব ছিল। তাঁরা ছিলেন সাতপুরুষে পণ্ডিত, একটা ছোট পরিবারের মধ্যে এতগুলি তর্কালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, তর্করত্ন, স্মৃতিতীর্থ, ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধিধারী পণ্ডিতের ভিড় শুধু নবগ্রামে কেন, সারা বাংলা দেশেই বোধ হয় দুর্লভ। দু পুরুষ আগেও এঁদের পরিবার ছিল একান্নবর্ত্তী, মহামহোপাধ্যায় কালিদাস স্মৃতিচূড়ামণির কাছে শাস্ত্রীয় বিধান নিতে তখন দেশদেশান্তর থেকে লোক আসত। শিষ্যদের ভক্তি ছিল, রাজা জমিদার এবং বড়লোকদের দানধ্যান ছিল, ভটচাজ্জিদের কখনও অন্নাভাব ঘটে নি। কিন্তু সম্প্রতি দিনকাল পড়েছে খারাপ। পরিবারে লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে, আয় সেই পরিমাণে দিন দিন কমেছে। ফলে বাড়ির অনেকেই বিদেশে চাকরি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন। কেউ বা ডাক্তারি ক'রে, কেউ বা ওকালতি ক'রে উদরান্নের সংস্থান করছেন। নবগ্রামের বাড়িতে সাতপুরুষের ভিটে আগলে প'ড়ে আছেন কেবল দুই ভাই, হরিদাস স্মৃতিরত্ন আর রামদাস তর্কালঙ্কার। হরিদাস পৈতৃক টোলটিতে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং পৈতৃক যজমানগুলির যে কটি অবশিষ্ট আছে, তাদের যজনযাজন করেন; আর রামদাস পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমিগুলির তদারক ক'রে সংসারের আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হ'লেও রামদাসের মতামত একটু বেশি আধুনিক ধরনের, সেইজন্য তাঁর সঙ্গে হরিদাসের মত তেমন মেলে না। কিন্তু মতের মিল না থাকলেও ভায়ে ভায়ে মনের মিল খুব। আর তা ছাড়া বাইরের লোক শাস্ত্রীয় বিধান চাইতে এলে হরিদাসই

যা করবার করেন, রামদাস কখনও দাদার কথার ওপর কথা কন না। ফলে দুই ভাই এখনও একান্নবর্ত্তী, নবগ্রামের বাড়িতে দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্তির সংসার। অবশ্য বিশেষ কারণে মাঝে মাঝে এই শান্তি যে ভঙ্গ না হ'ত, তা নয়। সেই রকম একটা ঘটনার কথাই আজ বলব।

সেদিন সকালবেলা হরিদাস স্নানাহ্নিক সেরে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যাচ্ছেন ছেলে পড়াতে, এমন সময় বারবাড়ির উঠোনের মাঝামাঝি বাগ্দীদের নিতাইচরণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল। নিতাইচরণের হাতে ছিল একটা প্রকাণ্ড রুইমাছ, আট দশ সেরের কম হবে না। সেটা পাশেই মাটিতে প'ড়ে ধড়ফড় করতে লাগল।

হরিদাস একটু পিছিয়ে গিয়ে হাত তুলে বললেন, হয়েছে, হয়েছে। তারপর, কি খবর বল দেখি নিতাই? হঠাৎ সকালবেলা মাছ হাতে ক'রে? হ'ল কি তোর?

নিতাই লজ্জিতভাবে চোখ নীচু ক'রে মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলে।

হরিদাস হেসে বললেন, আমার বেশি সময় নেই নিতাই, কি হয়েছে বল?

নিতাই এবার একটু হেসে বললে, আজ্ঞে, একটা বিধেন নিতে এসেছিনু দাঠাকুর।

হরিদাস বললেন, তোর আবার বিধেন কিসের রে? গরু ম'রে গেছে, না অশৌচ হয়েছে?

নিতাই বললে, আজ্ঞে না, আমার বউ ম'রে গেছে।

শুনে হরিদাস সত্যই দুঃখিত হলেন। চল্লিশ বছর বয়সে অনেক কষ্টে উপার্জ্জনের পয়সা ব্যয় ক'রে নিতাই বিয়ে করেছিল সাত বছরের

একটি মেয়েকে। মেয়েটি মহা দুরন্ত, এর বাড়ি পেয়ারা চুরি ক'রে, ওর বাড়ি কাসুন্দি চুরি ক'রে সে নিজেই কেবল মার খেয়ে মরত না, নিতাইকেও মাঝে মাঝে মার খাওয়াত। তা ছাড়া তার কান্নাকাটি আবদার বায়নার অন্ত ছিল না। দশ বৎসর ধ'রে তাকে লালনপালন ক'রে নিতাই অনেকটা মানুষ ক'রে তুলেছিল। আজকাল সে ভাত রাঁধতে শিখেছিল, ঘর নিকোতে শিখেছিল, বরকে দেখে চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারত না বা পরের মোষ গরু দেখলেই চ'ড়ে বসত না। কিছু দিন হ'ল সে নিতাইয়ের সঙ্গে মাছ ধরতেও যেত ক্ষ্যাপলা জাল নিয়ে; কিন্তু এত সুখ নিতাইয়ের সহ্য হ'ল না, যৌবনে পা দিয়েই মেয়েটি মারা গেছে।

হরিদাস উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কবে মারা গেল রে? কি হয়েছিল কি? সেদিনও দেখলুম ঢালিপুকুরে মাছ ধরছে, কি হ'ল আবার এর মধ্যে?

নিতাই চোখ দুটোতে একটু ছলছল ভাব এনে বললে, আজ্ঞে, মায়ের দয়া হয়েছিল। কিশোরগঞ্জে মেলা দেখতে গিয়ে জ্বর নিয়ে এল দাঠাকুর, সে জ্বর আর ভাল হ'লু নি। সর্ব্বাঙ্গে গুটি বেরুল, আর তেমনি কি যন্তন্না! ডাক্তার বদ্যি যে যা বললে তাই কর্নু, চার চার গণ্ডা ট্যাকা খরচ হয়ে গেল, কেউ কিছু করতে পারলে নে। আমার বরাত দাঠাকুর, আবার বুড়ো বয়েসে রেঁধে খাচ্ছি। সবাই মরে, আমারই কেবল মরণ নেই।

হরিদাস কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এর কম সময়ে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, মোহমুদ্গরের শ্লোক তাঁর মনে এলেও মুখে এল না। এদিকে টোলের ছাত্রেরা অপেক্ষা করছে, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবারও উপায় নেই। খানিক বাদে বললেন, তা হ'লে তোর বড় কষ্ট হয়েছে

বল? তা বিধান কিসের রে? কোন দোষ-টোষ পেয়েছিল? প্রায়শ্চিত্ত করাবি নাকি?

নিতাই চোখ মুছে ঢোক গিলে বললে, আজ্ঞে না, পেরাচ্চিত্তির নয় দাঠাকুর, একটা সাঙ্গা করবার কথা বলছিনু।

হরিদাসের মনটা মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্রদ্ধায় ভ'রে গেল। দুদিন হয় নি বউ মরেছে, এর মধ্যে সাঙ্গা করবার চিন্তা! কিন্তু তিনি বিবেচক ব্যক্তি, সংসারে অনেক রকম লোক নিয়েই তাঁকে কারবার করতে হয়। বুঝলেন, নিতাই পাকা সংসারী লোক, শোক ক'রে সময় নষ্ট করার চেয়ে ভবিষ্যতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলবার দিকে তার ঝোঁক বেশি থাকাই স্বাভাবিক। তিনি মুখে হাসি এনে বললেন, আবার সাঙ্গা করবি নাকি নিতাই? তা বেশ তো, তোদের তো বিধবা-বিয়ে চলে। পাত্রী ঠিক হয়েছে নাকি কোথাও?

নিতাই লজ্জিতভাবে বললে, আজ্ঞে, সেই কথাই তো বলছিনু দাঠাকুর। আপনি একটা বিধান দিলেই হয়।

হরিদাস বললেন, এবার যেন আর সাত বছরের খুকী বিয়ে করিস নি। তা কোথায় মেয়ে দেখলি?

নিতাই একবার কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণে মরিয়া হ'য়ে বললে, মেয়ে আর কোথায় খুঁজতে যাব দাঠাকুর! বয়েসও নেই, পয়সার জোরও নেই। তা ভাবছিনু, সোনার গাঁয়ে আমার শাশুড়ী রয়েছে। সেও তো একলা লোক, খাবার পরবারও বড় কষ্ট। তাই ভাবছিনু, তাকেই না হয়—

হরিদাস প্রথমটা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর চীৎকার ক'রে বললেন, ও মুখপোড়া, তোমার পেটে পেটে এই সব বুদ্ধি! তুমি

সেই শাশুড়ীকে দোকলা করতে চাও সাঙ্গা ক'রে? আর তারই বিধান নিতে এসেছ আমার কাছে? তাই এত মাছের ঘটা? দূর হ হতভাগা! দূর হ! তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। শাশুড়ী, মায়ের তুল্য। ছি, ছি! সকালবেলা অধর্ম্মের ভোগ! দূর হ, দূর হ!

দ্রুতবেগে খড়ম খটাখট করতে করতে হরিদাস চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উঠলেন। নিতাইচরণ হতবুদ্ধি হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল উঠোনের মধ্যে, তারপর বিষণ্ণ মুখে এক পা দু পা ক'রে ধীরে ধীরে সদর-দরজার দিকে চলল। হরিদাস চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন, মাছটা ফেলে যাচ্ছিস যে বড়? নিয়ে যা তোর মাছ।

নিতাই ফিরে এসে মাছটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির দক্ষিণে পুকুরের ধারে ছোট ভাই রামদাস ফুলবাগানের বেড়া মেরামত করছিলেন। বাঁখারির সঙ্গে বাঁখারি বেঁধে বাড়তি দড়িটা কাটারি দিয়ে কেটে ফেলবেন, এমন সময় সামনের রাস্তায় কার ছায়া পড়ল। চোখ তুলে দেখেন, নিতাইচরণ মুখখানি কাঁচুমাচু ক'রে একটা প্রকাণ্ড মাছ হাতে নিয়ে তাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। রামদাস পণ্ডিত হ'লেও তরিবৎ ক'রে খেতে জানতেন, ভাল মন্দ পাঁচ রকম খাওয়ার দিকে তাঁর একটু ঝোঁকও ছিল। নিতাই অমন মাছটা বাড়িতে এনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, এটা তাঁর সহ্য হ'ল না। ডেকে বললেন, কে রে? নিতাই নাকি? ও মাছ নিয়ে কোথা গেছলি?

নিতাই তাঁকে দেখতে পায় নি, অন্যমনস্কভাবে চ'লে যাচ্ছিল। হঠাৎ থতমত খেয়ে দুটো হাত সম্ভবমত কাছাকাছি এনে মাথাটা একটু নীচু ক'রে বললে, পেন্নাম হই দাঠাকুর। আপনি ভাল আছ?

কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক, ধর্ম্মে মতি হোক! আমি ভালই আছি। নিতাই, তুই কেমন আছিস তাই বল? ওদিকে গেছলি কোথায়?

নিতাই বললে, আপনাদের বাড়িই এসেছিনু গো, একটা বিধেন নিতে। তারপর একটু থেমে বললে, তা কিছু হ'লু নি। বড় দাদা-ঠাকুর মত দিলে নে।

রামদাস দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললেন, মত দিলে না! বলিস কি রে? তুই আমাদের বাপের বয়সী, তোকে ফিরিয়ে দিলে? দাদার বুদ্ধিশুদ্ধি দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তা কিসের বিধান রে? নিতাই একবার কথাটা পেড়ে বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছে, এবার আর সহজে কথা ভাঙতে চায় না। সে অপরাধীর মত মুখ ক'রে চুপ ক'রে রইল। রামদাস তাড়া দিয়ে বললেন, বল না, কিসের বিধান? তোর তো বউ ম'রে গেছে কদিন হ'ল শুনলুম। তা বামুন ভোজন করাবি নাকি শ্রাদ্ধের দিনে?

নিতাই ম্লান হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার কি আর সে কপাল হবে যে, আপনারা পায়ের ধুলো দেবে আমার বাড়ি?

রামদাস বললেন, তবে হ'ল কি তোর? বল না বাপু, অত লজ্জায় কাজ কি?

নিতাই বললে, আজ্ঞে, একটা সাঙ্গা করব বলছিনু।

রামদাস সোৎসাহে বললেন, এই কথা? তা তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? আমাদের হিঁদুর শাস্তরে যে ঘাটের মড়ার বিয়ে হয়, তোর তো এখনও বয়েস আছে। একটা কেন, তুই একশোটা সাঙ্গা করতে পারিস; কার সাধ্যি ঠেকায়? বড়দার গাধা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মাথা-খারাপ হয়ে গেছে। আমি বিধান দিচ্ছি, তুই কর সাঙ্গা।

নিতাই দ্বিধাভরে বললে, কিন্তু বড় দাদাঠাকুর তো বড় পণ্ডিত!

রামদাস বললেন, তুইও যেমন? বয়েসে বড় হ'লেই বুঝি বড় পণ্ডিত হয়? বড়দার চেয়ে আমার বিদ্যেটা কম কিসে? বড়দা হ'ল শুধু 'স্মৃতিরত্ন', আর আমি হলুম 'তর্কালঙ্কার'।

তুই তো একটা বুদ্ধিমান লোক, বয়েসও তো কম হ'ল না, তুই নিজেই বিবেচনা ক'রে বল না, উপাধিটা কার বড়? আমার, না বড়দার?

নিতাই অগত্যা বিবেচনা ক'রে বললে, আজ্ঞে, আপনারটাই তো বড়।

রামদাস বললেন, তবে? আমি কোন কথায় থাকি না ব'লে তাই, নিতান্ত দাদা হয়, তাই কিছু বলি না। তা ব'লে এই রকম যা ইচ্ছে তাই করবে? তুই একটা খাবার জিনিস আমাদের নাম ক'রে এনেছিস কত আশা ক'রে, বাড়ি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবি, এটা কি ভাল হয়? ভালবাসিস ব'লেই না এনেছিলি? দুপুরবেলা এই রকম শুকনো মুখ ক'রে মানুষ বাড়ি থেকে ফিরে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে না?

নিতাই সাহস পেয়ে বললে, আমিও তো তাই ভাবছিনু দাদাঠাকুর। বলি, বেরাস্তনের মুখের গরাসটা ফিরিয়ে নিয়ে যাব? তা একটু গণ্ডগোল ছেল কিনা, তাই বড় দাদাঠাকুর মত করলে নে।

রামদাস বললেন, গণ্ডগোল আবার কিসের? বিধবা বিয়ে তো তোদের চলিত আছে? একটি বড়সড় দেখে ভাল মেয়ে বিয়ে করগে যা। বড়দার আপত্তিটা হ'ল কিসের জন্যে?

নিতাই বললে, আজ্ঞে, আমার এক শাশুড়ী আছে। বয়েস আমার চেয়ে কম। একা মানুষ, খাবার পরবার বড়ই কষ্ট। ভাবছিনু, তাকে সাঙ্গা করলে কেমনটা হয়? তা বড় দাদাঠাকুর তো কথাটা কানেই তুললে নে, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

রামদাস বিলক্ষণ দ'মে গেলেন। বাগ্দীর ঘরেও এতটা প্রগতি তিনি বোধ হয় আশা করেন নি।

বিধান দিতে তাঁর মত উদার মতের লোকেরও কোথায় যেন একটু বাধছিল। কিন্তু চমৎকার জ্যান্ত মাছটা;—নিতাইয়ের মত জোয়ান লোকও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে মাছটাকে সামলাতে! বেশ ক'রে ঝাল দিয়ে রাঁধলে খেতে যা হবে—

রামদাস হেসে বললেন, শোন কথা! দাদার যেমন কাণ্ড! শাশুড়ী তো ঘরের লোক, স্ত্রীও যা, শাশুড়ী তা। মায়ে আর মেয়েতে কি তফাত আছে? কথায় বলে মায়ে ঝিয়ে। তা সত্যি তো বাপু, তোর ঘরে তৈরি লোক থাকতে তুই কোথায় বাইরে মেয়ে খুঁজতে যাবি? হ্যাঁ নিতাই, শাশুড়ী বুঝি তোকে খুব যত্ন করে?

নিতাই সমব্যথী পেয়ে গ'লে গিয়ে বললে, আজ্ঞে, তা করে। বসতে পিঁড়ে দেয়, বাড়ি গেলে তামাক সেজে দেয়।

রামদাস বললেন, আহা, বেশ বেশ! তার আর ছেলেপুলে নেই তো?

নিতাই বললে, আজ্ঞে, আর একটা মেয়ে আছে কেবল, পাঁচবছুরে। বউ যেদিন ম'রে গেল, সিদিন শাশুড়ী এসেছেল কিনা! আমি বড্ড কাঁদছিনু, তা শাশুড়ী বললে, বাবা, তুমি কেঁদু নি, আমি খেঁদীর সঙ্গে তোমার আবার বিয়ে দোব। তা দাদাঠাকুর, আমি আর রাজি হনু নি। বলি, এক মেয়ে তোমার যা কষ্ট দিয়ে গেছে, আর ও কচি মেয়ে বে করছি নে।

রামদাস হাসি চেপে বললেন, তার জন্যে চিন্তা কি নিতাই? ও এখন গোকুলে বাড়তে থাকুক না। মেয়ে ফুরোলে মা আছে, মা ফুরোলে মেয়ে আছে। তুই তো ভাগ্যবান ব্যক্তি।

নিতাই গদ্গদ হ'য়ে বললে, তা হ'লে আপনি মত দিচ্ছ ?

রামদাস বললেন, নিশ্চয়। তা হ্যাঁ নিতাই, তোর শাশুড়ীর নামটা কি বল দিকি ?

নিতাই সভয়ে বললে, কেন দাঠাকুর ? তারপর হেসে বললে, হাজার হোক, গুরুজন, নামটা ধরব ?

রামদাস বললেন, ও আমার ধর্ম্মপুত্তুর রে ! গুরুজনের নাম ধরবেন না, বিয়ে করবেন। বল, বল, দেখি আর কোন গণ্ডগোল আছে কি না ?

নিতাই বললে, সে তুমি ভেবু নি দাঠাকুর, আর কোন গণ্ডগোল নেই। তিন বচ্ছর বিধবা হয়েছে, তা একটা কথা কেউ তার নামে বলতে পারবে নে। একটু বেশি হাসে, তা ঐ ঐ পর্য্যন্তই।

রামদাস বললেন, আহা, বেশ বেশ। তা হ'লে তোর নাম বলতে আপত্তি কি ?

নিতাই বললে, নাম তার নেত্যকালী।

রামদাস উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। বাঃ বাঃ, চমৎকার ! নিতাইচরণ আর নিত্যকালী, এ তো রাজযোটক মিল হয়ে গেছে নিতাই ? কোন মুখ্যু বলে, বিয়ে হবে না ? আমি বিধান দিচ্ছি, তুই আজই বিয়ে করগে যা।

নিতাই তবু সন্দেহভরে বললে, তা হ'লে আপনি বলছ, কোন দোষ হবে নে ?

রামদাস অসহিষ্ণুভাবে বললেন, আলবাৎ হবে না। শাস্ত্রে বলেছে, অধিকন্তু ন দোষায়। অধিক কি ? না, বেশি। অর্থাৎ কিনা বেশি হ'লে কোন দোষ নেই। তা মেয়ের চেয়ে মা বেশি হ'ল না ? বয়েসেও বেশি, মান্যেও বেশি, যত্নও করবে বেশি, আবার বলছিস হাসেও বেশি। তা হ'লে দোষটা হ'ল কোথায় ? তুইই বল ?

আজ্ঞে তা তো সত্যি। নিতাই গদ্গদ হয়ে রামদাসের পায়ের কাছে মাছটি রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। বললে, তা হ'লে আমি আজ আসি দাদাঠাকুর। জ্ঞাতকুটুম্বদের জানাতে হবে, উয্যুগ করতেও দুদিন যাবে। তা আপনি যখন বলছ, তখন কেউ আর কথাটি কইবে নে।

রামদাস বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। কথায় বলে, শুভস্য শীঘ্রং। ফাগুন মাস আছে, দিনক্ষণ দেখতে হবে না, চটপট ক'রে ফেল কাজটা। সাঙ্গাতে তো আর তোদের পুরুত ডাকতে হবে না।

নিতাই চ'লে যাচ্ছিল। রামদাস বললেন, তা ভাই, মাছটা যখন দিলিই, তখন বাড়ির মধ্যে বউদিদির কাছে দিয়ে আয় না ! আমায় আর অসময়ে আঁশহাতটা করাবি কেন ? ব'লে দিস, পাড়ায় কাউকে কিছু দেয় তো দেবে, আর বাকি সবটা যদি আজ রাঁধবার দরকার না হয়, তা হ'লে ভেজে রেখে দেবে। কাল পর্য্যন্ত চলবে।

নিতাই বললে, আবার যাব ? বড়দাদাঠাকুর যদি রাগ করে ?

রামদাস হেসে বললেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুই শাশুড়ী বিয়ে করবি নিতাই ? সদর-দরজা দিয়ে যাবি কেন রে বোকা, খিড়কির দোর দিয়ে যা। বড়দাদাঠাকুর ছেলে পড়িয়ে ওঠবার আগেও মাছ পাঁচ ব্যাঞ্জন হয়ে ব'সে থাকবে। বড়দা টেরও পাবে না, কার মাছ, কোথা থেকে এল।

সাধারণত তাই হয়ে থাকে। হরিদাস খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চিরদিনই অনাসক্ত পুরুষ, প্রথম ভাগের সুবোধ বালকের মত 'যাহা পান, তাহাই খান', কি জিনিস, কোথা থেকে এল, তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামান না। কিন্তু সেদিন একটা জামবাটি ভর্ত্তি প্রকাণ্ড মাছের

মুড়োটা দেখে তাঁর মত লোকেরও ধ্যানভঙ্গ হ'ল। প্রশ্ন করলেন, মাছ কোথা থেকে এল?

রামদাস ভালমানুষের মত বললেন, নিতাই দিয়ে গেছে।

হরিদাস বললেন, আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলুম। কে নিলে?

রামদাস কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আমিই নিয়েছি। দেখলুম, লোকটা শুকনোমুখ ক'রে চ'লে যাচ্ছে। আশা ক'রে এনেছিল, শুনলুম, তুমি নাকি তাড়িয়ে দিয়েছ।

হরিদাস বললেন, তাই তুমি দয়া ক'রে মাছটি নিলে? তারপর রান্নাঘরের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, সাধে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম? ব্যাটা পাষণ্ড! দুদিন হ'ল ব্যাটার বউ মরেছে, এর মধ্যে কিনা শাশুড়ীকে বিয়ে করতে চায়? আবার তার বিধান নিতে এসেছে কিনা আমার কাছে? আস্পর্দ্ধার আর শেষ নেই!

বড়গিন্নী দুধের বাটি ডান হাতে ক'রে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, বাঁ হাতখানা গালে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, ওমা, কোথায় যাব! কি ঘেন্নার কথা মা!

রামদাস বললেন, তোমার যেমন কাণ্ড! বেচারীর বউ ম'রে গেছে, বুড়ো বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছে; তার দুঃখুটা তুমি দেখলে না। ধম্ম ধম্ম ক'রে নিজের পরকালটা তো খেয়েছ, ওর ওপর আর অত্যাচার কেন? রক্তে বাধে না, গোত্রে বাধে না; তৈরি বউ, চেনা ঘর, তোমার কথাতেই ছেড়ে দেবে?

হরিদাস বিস্মিত হয়ে বললেন, তা হ'লে তুমি মত দিয়েছ বল?

রামদাস বললেন, দিয়েছি বইকি। দেখলুম, দড়ি কলসী তৈরি, গলায় ঝুলিয়ে দিলে যদি একটা লোক শান্তিতে মরতে পারে, তা হ'লে সেটুকু উপকার আর করব না?

হরিদাস এবার ভয়ানক রেগে গেলেন, বললেন, তা বেশ করেছ, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। এখন নিজের পুণ্যের ফল নিজেই ভোগ কর, আমার পাতে কেন?—ব'লে মাছের মুড়োটা তুলে ধপ ক'রে রামদাসের পাতে ফেলে দিলেন।

রামদাস দুঃখিত হ'লেও বিচলিত হলেন না; তিনি জানতেন, দাদার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। হেসে বললেন, মন যখন হয়েছে, তখন বিয়ে সে করতই। মাঝ থেকে আমাদের পাওনাটা মারা যায় কেন? তা ছাড়া রান্না যখন হয়েই গেছে, তখন ফেলে দিয়ে তো কোনও লাভ নেই?

হরিদাস ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে ব'লে উঠলেন, তুমি চুপ কর, তোমার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। লেখাপড়া শিখে তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে একটা অকালকুষ্মাণ্ড তৈরি হয়েছ। তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়।

অগত্যা রামদাস আর মুখ তুললেন না বা দাদাকে কোন কথাই শোনালেন না। কেবল মনে মনে বললেন, তোমার বরাতে নেই। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলে, আমি কি করব? তিনি নীরবে বিষণ্ণবদনে একা একা সেই বিরাট রুইমাছের মুড়োটি তৃপ্তির সঙ্গে শেষ করলেন।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-ভুলে

রাজপথ। অদূরে ভৈরবী রাগিণীতে মৃদু ঐক্যতান বাজিতেছে। জনৈক দেশী ও জনৈক বিদেশী পথিক]

বিদেশী। পথ ভুলে যে কোথায় এসে পড়লুম, কিছু বুঝতে পারছি না। মশাই, এটা কোন্ রাজ্য বলতে পারেন ?

দেশী। বাঃ, পারব না কেন ? আমি এখানেই থাকি যে। এটা হচ্ছে মহারাজা সঙ্গীত-বিলাসীর রাজ্য। ঐ শুনুন, তাঁর রাজ-প্রাসাদে ঐক্যতান বাজছে—অহোরাত্র বাজে।

বিদেশী। সন্ধ্যাবেলায় ভৈরবী কেন ?

দেশী। প্রাসাদের ঐক্যতান-পরিচালক সঙ্গীতের একটি আস্ত সমুদ্র বললেই হয়। উনি একটি রাগিণী ধরলে সেটাকে তুলো না ধুনে ছাড়েন না। ভৈরবী ধরেছিলেন ভোরবেলায়, শেষ হতে হতে রাত দুপুর হবে। তখন হয়তো ধরবেন দরবারী কানাড়া; সেটা কাল দুপুরবেলার আগে শেষ হবে ব'লে তো মনে হয় না।

বিদেশী। মহারাজা বুঝি ভয়ানক সঙ্গীতামোদী ?

দেশী। ভয়ানক। আদেশ ঘোষণা করেছেন সারা রাজ্যে যে, সঙ্গীতকে সকলের উঁচুতে স্থান দিতে হবে। যা কিছু কর্কশ বা অপ্রিয়, তাকেই সঙ্গীত দিয়ে মধুর ক'রে মোলায়েম ক'রে তুলতে হবে। নইলে হবে কঠোর শাস্তি। ঐ দেখুন না, এক চানাচুরওয়ালা আসছে। এই তো গান ধরল ব'লে।

(চানাচুরওয়ালার গান)

চানাচুর চানাচুর !
চিবাইলে হায় দাঁতের সীমায় বাজে অসীমের সুর।
(কুরমুর কুরমুর)

মরম-বেদনা নিমেষে মিলায়
মেশে আঁখিজল হাসির লীলায়
প্রেমহীন হিয়া ওঠে আকুলিয়া প্রেম-রসে ভরপুর।
আসলে নকলে সূক্ষ্ম প্রভেদ সহজে বোঝা না যায় গো
আসল ভাবিয়া নকল খাইলে হবে যে বিষম দায় গো
তাই দীনহীন এল. মুখার্জি
সবিনয়ে আজি জানায় আরজি—
মোড়কের 'পরে নাম দেখে নিয়ে সন্দেহ ক'র দূর।

বিদেশী। বাঃ, ভারী মজার গান তো !

দেশী। এই লোকটাই আগে "চানাচুর চাই" "চানাচুর নেবেন মশাই" ব'লে বিশ্রীরকম চীৎকার ক'রে লোকের হাড্ডি কাঁপিয়ে তুলত। সেই চীৎকারের স্থূল ধাক্কার চাইতে এই গানটুকুর সূক্ষ্ম আবেদন কত বেশি মর্ম্মস্পর্শী, একবার ভেবে দেখুন তো !

বিদেশী। ভেবে দেখবার ফুরসৎ কোথায় ? তার আগেই যে মর্ম্ম স্পর্শ ক'রে ফেলে।

দেশী। ঐ দেখুন, কয়লার গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে একদল কয়লাওয়ালী।

বিদেশী। আশ্চর্য্য ! কয়লাওয়ালারা গেল কোথায় ?

দেশী। সব হ'টে গেছে। এই প্রগতির যুগে ওয়ালীদের সঙ্গে ওয়ালারা আর পেরে উঠছে না। শুনুন, এবারে গান ধরবে।

বিদেশী। কয়লা-ওয়ালীরাও গান গায় ?

দেশী। গায় বইকি। ওজনে প্রতি মণে অন্তত সের পাঁচেক ঠকায় কিনা। তাই গান গেয়ে এই অপ্রিয় ব্যাপারটাকে এমন মোলায়েম ক'রে দেয় যে, সেটা কেউ আর খেয়াল করে না। শুনুন।

(কয়লা-ওয়ালীদের গান)

কয়লা চাই গো বাবু, চাই বাবু কয়লা
আগুনের লাগলে ছোঁয়া
কিছুখন ছেড়ে ধোঁয়া

জ্ব'লে হয় গোলাপী রং, থাকে না আর ময়লা।
রং তার যদিও কালো
মনে তার উজল আলো
কালো গরুর দুধ কালো নয়, জানে সব গয়লা—
চাই গো বাবু কয়লা।
কয়লা না হ'লে বাবু হয় না তো রান্না
(শুনি) কয়লা থেকেই হয় হীরা আর
মানিক চুনি পান্না!
তবু হায়, ঘরে ঘরে
বিকিয়ে যাই সস্তা দরে,
রেখে দিন আদর ক'রে আজকে মাসের পয়লা—
চাই বাবু কয়লা!

দেশী। দেখলেন তো সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে কয়লাও কত রোমান্টিক হয়ে উঠেছে? যেন একটা বসন্তের আমেজ, দখিনা হাওয়ার মৃদু হিল্লোল—

বিদেশী। আপনাদের রাজ্যেই উঠে আসব ভাবছি। এখানে পাওনাদারও বোধ হয় গান গেয়ে টাকার তাগিদ দেয়?

দেশী। পাওনাদার-টার মশাই এ রাজ্যে পাত্তা পায় না।

বিদেশী। বলেন কি? তবে তো আসতেই হচ্ছে।

দেশী। আপনার দেখছি বরাত ভাল মশাই। ঐ দেখুন।

বিদেশী। মড়া নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে, আমার বরাত ভাল হ'ল কি রকম?

দেশী। প্রাণ-আঁতকানো পিলে-চমকানো "বল হরি হরিবোল" বাতিল ক'রে কি গান আমরা চালিয়েছি শুনুন। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

(শ্মশান-যাত্রীদলের গান)

হে চির-অচল, চল চল শুয়ে চির-যাত্রার খাটে
চির-যাত্রী হে, যাত্রা এবার নব নব পথে ঘাটে
চল ঘুমন্ত, চল ওহে ধীর,
চল হে অন্ধ, চল হে বধির,

পড়েছে মরণ-যবনিকা আজ তোমার জীবন-নাটে
মোরা গাহি গান মোরা তুলি তান উঁচুনীচু কত সুরে,
ঝরে ঝরঝর আঁখি নির্ঝর শোকে মন ওঠে পুরে,
চিরতরে আজ হারানু তোমায়,
হিয়া সদা তাই করে হায় হায়,
শুনি অনিবার মহাবেদনার বাঁশী বাজে মাঠে মাঠে।
মনোবনে আজ ওড়ে যে হাওয়ায় স্মৃতি-মহুয়ার রেণু
তোমারি শান্ত অন্তিমে আজ শুনি অসীমের বেণু,
শেষ ক'রে দিয়ে যত বেচাকেনা,
শুধে গেলে আজ দুনিয়ার দেনা,
জীবনের শেষে এলে মরণের মহা-মিলনের হাটে।

দেশী। "বল হরি হরিবোল" এর কাছে ঘেঁষতে পারে মশাই?

বিদেশী। একদম নয়। সত্যি, এ রকম মলম লাগালে মৃত্যুর খোঁচাটা অতটা অসহ্য মনে হয় না।

দেশী। সঙ্গীত যে মৃত্যুকে কত সহজ সরল ক'রে দেয়, তার প্রমাণ পেয়েছিলুম গেল বছর। আমার এক মামাতো বোনের প্রাণ ঠোঁটের ডগায় এসে আটকে গেছে, আর বেরতে পারে না। বেগতিক দেখে আমি ধরলুম গান। বাস্, আর দেখতে হ'ল না। বোনটি এক মিনিটের ভেতরই সাবাড়।

বিদেশী। বাঃ, সঙ্গীতের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য তো! কিন্তু আমার যেমন ক্ষিদে পেয়েছে, হাঁপিয়েও উঠেছি তেমনই। দয়া ক'রে যদি একটা হোটেল—

দেশী। কেন? আমার বাড়ি যেতে আপনার আপত্তিটা কিসের?

বিদেশী। ছি ছি, আপত্তি হবে কেন? বরং আগ্রহই আছে। কদ্দূর আপনার বাড়ি?

দেশী। বেশি দূর নয়। চলুন না। আহা, ঐ শুনুন তিনকড়ির বউ

কাঁদছে। চেঁচিয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদা বে-আইনি, তাই গান গেয়ে মিষ্টি ক'রে কাঁদছে।

(তিনকড়ির পত্নীর গান)

সে যে গেছে চ'লে ছিঁড়িয়া প্রেমের ডোর—:
নাই নাই আর নাই,
উদাসী পবন তাই বাতায়নে মোর
কাঁদিয়া ফিরে সদাই।
আমি কাঁদি আনমনে,
একা মোর বাতায়নে,
সজল নয়নে সুদূরের পানে চাই—
নাই নাই ওগো নাই সে যে আর নাই।

দেশী। শুনলেন তো কি করুণ? পাষাণের চোখ থেকেও ঝর ঝর ক'রে জল ঝরিয়ে দেয়। এর বদলে সেই পুরাতন পদ্ধতির "ওগো তুমি কোথায় গেলে গো!"—কি বিশ্রী হ'ত একবার ভাবুন তো!

বিদেশী। যা বলেছেন। গান গাওয়াও হ'ল, কান্নাও হ'ল। কিন্তু অনেকের তো গান দরকার হয়। এত গান লেখে কে?

দেশী। কবির কি আর আজকাল অভাব আছে মশাই? চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়ুন—কোন না কোন কবির মাথায় গিয়ে পড়বেই।

বিদেশী। ভাগ্যিস পথ হারিয়েছিলুম! আপনাদের দেশে এসে একটি অমূল্য রত্ন লাভ করলুম। যা কিছু অপ্রিয়, তাই গান দিয়ে মোলায়েম ক'রে নিতে হবে। চমৎকার আইডিয়া! আমাদের দেশেও যাতে এই নিয়ম চালু হয়, এ জন্য জোর আন্দোলন চালাতে হবে।

দেশী। বলেন কি? কেন?

বিদেশী। ধুলোর ধরণীতে স্বর্গ নামিয়ে আনতে হবে। আপিসের বড়-

বাবু যদি গান গেয়ে ধমকান, বাড়িওয়ালা যদি গান গেয়ে ভাড়ার তাগিদ দেয়, পাওনাদার যদি গান গেয়ে পাওনা আদায় করতে আসে, মুদী যদি গান গেয়ে—(আছাড়) উঃ, গেছি! গেছি! গেছি! স্কাউণ্ড্রেল কলার খোসা!

দেশী। ঐ শুনুন গাড়োয়ানের গান। (দূরে গান)

বিদেশী। মরছি ঠ্যাঙের ব্যথায়, আর আপনি বলছেন গান শুনতে! উঃ! হেঁটে যাওয়া আর চলবে না।

দেশী। বেশ। তা হ'লে গাড়োয়ানকেই ডাকি। ওহে গাড়োয়ান, থামাও।

গাড়োয়ান। (থামাইয়া) উঠে পড়ুন বাবু।

দেশী। (উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া) এইবার চালাও সোজা।

(চালাইতে চালাইতে গাড়োয়ানের গান)

চলে চলে চলে রে গাড়ি!
কখন ধীরে চলে, কখন তাড়াতাড়ি।
কখন বা নীরবে দাঁড়ায়,
বাবুরা কত যে আসে যায়,
আসা যাওয়া সার দেখি এই দুনিয়ায়,
মিছে তবু করি মারামারি।

বিদেশী। ওহে গাড়োয়ান!

দেশী। আহা, গাইতে দিন না মশাই।

(গাড়োয়ানের গান)

চলে চলে চলে রে গাড়ি!
চলে মোর গাড়ি যত খন
ঘোরে চাকা বন্ বন্ বন্
ঘুরে মরে দিনরাত দুনিয়া যেমন
ওঠা-নামা চলে জোর ভারী—
চলে রে গাড়ি।

বিদেশী। এই—এই—হুঁশিয়ার। উঃ! আর একটু হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'ত আর কি!

(গাড়োয়ানের গান)

চলে গাড়ি দুপুরে রাতে
চলে সকাল বিকাল।
চলে গাড়ি, তারি সাথে চলে মহাকাল।
আর চলি আমি গাড়োয়ান
থাকে থাক যায় যাক প্রাণ
গাড়ি চলে ঘর্ ঘর্ আমি গাই গান
কাঁপায়ে দুপাশে ঘর বাড়ি।

[সহসা বিদেশীর চীৎকার "এই হঁশিয়ার! হঁশিয়ার!" কলিসনের আওয়াজ। পরে গাড়ি উলটাইয়া পড়ার শব্দ। বহু লোকের সম্মিলিত চীৎকার। অ্যাম্বুলেন্স! অ্যাম্বুলেন্স! চীৎকারের ফলে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আসিল। কয়েকজনকে বলিতে শোনা গেল "হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। শিগগির!"]

[হাসপাতালের ঘর। বিদেশী, ডাক্তার ও নার্স]

ডাক্তার। সিরিয়াস কেস! অপারেশনের সমস্ত রেডি নার্স?

নার্স। সমস্ত রেডি ডক্টর।

ডাক্তার। তা হ'লে করাতটা এগিয়ে দাও। পেশেণ্টের ডান পাটা কেটে ফেলতে হবে।

বিদেশী। না না।

ডাক্তার। শাট আপ, পায়ের চামড়া ছিঁড়ে বিষাক্ত হয়ে গেছে, তবু বলছে—না না।

বিদেশী। চামড়া তো বাঁ পায়েরও ছিঁড়েছে।

ডাক্তার। তা হ'লে দুটো পাই ছেঁটে ফেলব। সে জন্যে ভাবনা কি?

বিদেশী। কি সর্ব্বনাশ!

ডাক্তার। হ্যাণ্ড ইওর সর্ব্বনাশ। নার্স!

নার্স। ডক্টর।

ডাক্তার। দেখ তো, আর কোথাও চোট লেগেছে কি না!

বিদেশী। না না, আর কোথাও চোট লাগে নি ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার। হ্যাণ্ড ইওর ডাক্তার সাহেব। চোট লাগা না লাগার তুমি কি বুঝবে? লীভ ইট টু মি।

নার্স। হাত দুটোতেও চোট লেগেছে ডক্টর।

ডাক্তার। আই সী! তা হ'লে হাত দুটোও ছাঁটতে হবে।

বিদেশী। ওরে বাবা!

ডাক্তার। হ্যাণ্ড ইওর ওরে বাবা। নার্স!

নার্স। ডক্টর।

ডাক্তার। মাথাটাও তো ফেটে গেছে দেখছি।

নার্স। হ্যাঁ, ফুলেও উঠেছে।

ডাক্তার। তা হ'লে মাথাটাই তো আগে অ্যাম্পুটেট করা দরকার।

(বিদেশীর আর্ত্ত ক্রন্দন)

নার্স। ঘাড়েও নিশ্চয়ই চোট লেগেছে ডক্টর।

ডাক্তার। মাই গড! তা হ'লে কি রাখব, আর কি ছাঁটব—দ্যাট'স এ গ্রেট প্রব্লেম।

নার্স। আমি তো বলি একেবারে পুরোপুরিই ছেঁটে ফেলুন।

বিদেশী। (আর্ত্তকণ্ঠে) অ্যাঁ!

ডাক্তার। দ্যাট'স নট এ ব্যাড আইডিয়া। তা হ'লে সঙ্গীত-বিভাগে এখুনি ফোন ক'রে দাও একদল গাইয়ে পাঠিয়ে দিতে। ব্যাপারটাকে সঙ্গীত দিয়ে মোলায়েম ক'রে নিতে তো হবে!

নার্স। হ্যালো, সঙ্গীত বিভাগ! একদল গাইয়ে এখুনি দরকার।... হ্যাঁ, এখুনি।...সব রেডি...ইয়েস, অ্যাট ওয়ান্স...

কুইক মার্চ করিতে করিতে এক দল গায়কের প্রবেশ

ডাক্তার। এই যে তোমরা হাজির। এই পেশেণ্টকে একেবারে পুরোপুরি ছেঁটে বাদ দিতে হবে। গান ধর।

(কোরাস্ গান)

কেন আর মিথ্যা বিলম্ব কর?
(তুমি) মর হে মর হে জল্দি মর।
রুক্ষ এ বিশ্ব যে দুঃখে ঠাসা
হর্ষ নাহিক হেথা, নাহিক আশা
(হেথা) মূর্খ ছাড়া কেহ বাধে না বাসা,
(তাই) হে বুদ্ধিমান, তুমি সরিয়া পড়।
(কেন আর মিথ্যা...ইত্যাদি)
(কেন) জীবনের বন্ধনে বন্দী রহ?

তুমি মহাবীর, তুমি ভীরু তো নহ,
ভেদি এই বন্ধন দুর্ব্বিষহ
শুষ্ক কুসুম-সম ঝর হে ঝর।
(কেন আর মিথ্যা…ইত্যাদি)
ধরণীর হোটেলের ক্ষুদ্র সীমায়
তব প্রাণ কেন গো আলস্যে ঝিমায় ?
আহ্বান শোন সীমাহারা নীলিমায়
অসীমের পথ আজি ধর হে ধর।
(কেন আর মিথ্যা…ইত্যাদি)

বিদেশী। (চীৎকার করিয়া) না না, আমি মরব না, আমি মরব না, আমি মরব না। (নানা রকম জিনিস পড়া ও ভাঙ্গার শব্দ।)

—অকুব

হেঁয়ালি

রসরসিক 'শনিবারের চিঠি'
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
ভগবান বড় রসিক জানিয়া নিয়ো—
যত সন্ধানী, তত কৌতুকপ্রিয়।
উর্ব্বশী সাথে দণ্ডীর দেন বিয়া
সোনার লঙ্কা পোড়ান বানর দিয়া,
হিড়িম্বা সাথে জোটান আনিয়া ভীম,
পলতার সাথে থামকা মিশান নিম।
বুঝিতেই পার কত বড় তিনি গুণী
সৃষ্টি যাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার চামচিকা।
এ কথাটা নাই শুনেছি পুরাণে লিখা।
বিশ্বকর্ম্মা গড়িল যে দেবপুরী
চামচিকা তারে নোঙরা করেন ঘুরি।
হেঁয়ালিটা মোর কবিতাও হতে পারে
তোমারে পাঠানু লেখা ব'লে শনিবারে।

কপিঞ্জল

সংবাদ-সাহিত্য

খবরের কাগজগুলা যেন কি! ইহা লইয়া এত হৈ হৈ কেন? এত সাক্ষী, এত স্বাক্ষর—ইহার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? বেদের আমল হইতেই এই জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। সমাজের সুবৃহৎ উদর-গহ্বর প্রথম কয়েকটা বদহজমের উদ্গার তুলিয়া আপনার বিচিত্র জারকরসে সব কিছুকেই জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। পুরাণ কাহিনী ও ইতিহাসের বকযন্ত্রে পরিস্রুত হইয়া অনেক এঁটো ভাতই স্বরেন্নিত্যং হইয়া উঠিয়াছে। সেই চোলাই-করা সোমরস পান করিয়া দেবতারা নিমীলিতনেত্র হইয়াছেন, মানুষ হাঁটু গাড়িয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে। এই তমসা হইতে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হইবার অবকাশ সে যুগের সমাজ অকুণ্ঠ চিত্তে দিতে পারিত; কারণ, সে যুগে উৎসাহী নিজস্ব-প্রতিনিধি-সম্বলিত সংবাদপত্র ছিল না। এই মহাপ্রভুরা শাড়িতেই সন্তুষ্ট নন, খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া নিকারবুকার যুগ পর্য্যন্ত অনায়াসে ধাওয়া করিতেছেন; ফলে চারআনী আটআনী যুগের কথাও সমাজ ভুলিতে পারিতেছে না।

* * *

'সধবার একাদশী'র অটল-নিমেদত্তর কথোপকথন মনে পড়িতেছে—

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ?

অটল। বেটি তিনশ টাকা মাসয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাপ যে বিষয় করেছেন, অমন বিষয় আমার থাকলে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখতেম।

এ ক্ষেত্রে পিতা প্রচুর সুনাম রাখিয়া গিয়াছেন, পুত্র তাহা সাধ্যমত কাজে লাগাইতেছেন। আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিঞ্চিৎ চমক লাগাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ; তিনিও শেষ পর্য্যন্ত এতখানি সৎসাহস প্রকাশে আপত্তি জানাইয়াছেন। কলিকাতায় সমাজ বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং নবদম্পতি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে দাম্পত্য সুখ চর্চ্চা করিতে পারিবেন; শুধু খবরের কাগজগুলি একটু সামলাইয়া চলিলে হয়!

—

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সক্ষম পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। পুস্তক-প্রকাশ এবং গবেষণার এমন নিদারুণ সমারোহ আর কখনও দেখা যায় নাই। রায় বাহাদুরের রাজত্বকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নানা দিক হইতে নাড়া খাইয়া প্রায় অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে। এই বিভাগের চারি জন গবেষক অত্যল্পকালের মধ্যে গবেষণার পাহাড়-চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া লেক্‌চারারের পদ পাইয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার-বিভাগের সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ আছে। ইঁহারা কে কি করিয়াছেন, জনসাধারণকে তাহার বিন্দুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সকল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের প্ররোচনায় বাংলা বিভাগের কীর্ত্তি চাপিয়া রাখার চেষ্টাই চলিতেছে। এ বিষয়ে আমরা মূল কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

* * *

রায় বাহাদুর জানিতে না পারেন, আমাদের গোপালদা তাঁহার একলব্য শিষ্য; নিজের গবেষণাগারে রায় বাহাদুরের একটি মৃদঙ্গ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গত কয়েক বৎসর তাহারই নিকট নানাবিধ গবেষণাবিদ্যা আয়ত্ত করিতেছেন। নামডাকের প্রতি গোপালদা অত্যন্ত বীতস্পৃহ বলিয়া এখনও রায় বাহাদুরের জয়জয়কার পড়ে নাই। আমরা ইতি-মধ্যেই গোপালদার "শ্রীখোল"-সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যমূলক থিসিসটি পাঠ করিয়াছি। এটি যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি আকর্ষণে সক্ষম। সম্প্রতি তিনি "গোরোচনা" সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, এই থিসিসটি প্রস্তুত হইলেই গোপালদা একলব্যের মত তাঁহার গুরুকে কর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উপহার দিবেন। সংবাদপত্রে দিনটি বিজ্ঞাপিত হইবে।

—

পৌষের 'ভারতবর্ষে' শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "আচার্যিদের বউ" বাহির হইয়াছে। এমন স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বমূলক গল্প ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে আধুনিকা আচার্য্য-বধূ কেমন করিয়া ভাসিয়া গেল, সে এক বিচিত্র ইতিহাস। আমরা এই

কথা-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনটি রত্ন আহরণ করিয়াছি; স্মরণ করিয়া রাখিবার মত উক্তি এ যুগে বেশি লেখক রচনা করেন না! সুতরাং আমাদের এই আগ্রহ। আচার্য্যবধূর নাম মল্লিকা। শ্বশুরবাড়িতে মল্লিকা একদিন "তার কুমারীকালের মতো সুরুচিসম্পন্ন সজ্জায়" সজ্জিত হইয়াছে; তাহার কলেজের বন্ধু-বান্ধবীরা আসিয়াছে। তন্মধ্যে তিন-জন যুবক। লেখক বলিতেছেন—

তার দিকে তাকিয়ে তিনটি যুবকের ইহকাল ঝরঝরে হয়ে গেল।

দুই একজন লেখকের পরকাল ঝরঝরে হওয়ার খবর আমরা জানি, কিন্তু মল্লিকাকে দেখা মাত্রই যুবক তিনটির ইহকাল ঝরঝরে হওয়ায় কি বুঝায়, কবির সূক্ষ্ম অনুভূতি ও কবিরাজী বুদ্ধি না থাকিলে সাধারণের পক্ষে জানা অসম্ভব।

* * *

দ্বিতীয় রত্নটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। তিনি তাঁহার সেক্রেটারিদের মারফৎ ইদানীং যেরূপ বাড়াবাড়ি সুরু করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন ছিল! প্রবোধবাবু বলিতেছেন—

রবিঠাকুরের দু'লাইন ফিকে আশীর্ব্বাদ তাঁর সেক্রেটারীর মারফৎ ডাকে মল্লিকার হাতে এসে পৌঁচেছে।

গাঢ় আশীর্ব্বাদ দেখার সুযোগ যাঁহারা পাইয়াছেন, ফিকেতে তাঁহাদের আপত্তি হইবারই কথা। "ডাকযোগে" "সেক্রেটারীর মারফৎ" সত্যই অসহ্য।

* * *

নীতি আর দুর্নীতির সীমারেখা কেউ টানিতে পারে? তা ছাড়া ভালোবাসা যদি হয়ই, মেয়েদের সতীত্ব কি এতই ঠুন্‌কো?—উজ্জ্বলন্ত কটাক্ষে হরিমোহনের [স্বামীর] প্রাণের দিগন্তব্যাপী বিদ্যুদ্দাম ছুটিয়ে মল্লিকা চ'লে গেল।

এত অল্প কথায় এত বেশি কথা এ যুগে আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। এখানেই প্রবোধ সান্যালের কৃতিত্ব। আর উপমা? "প্রাণের দিগন্তব্যাপী বিদ্যুদ্দামে" বাংলা দেশের পাঠক মাত্রেই জর্জ্জরিত আছেন।

—

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে "ধূসরে"র ঠেলায় অনেকেই বিমূঢ় ও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীমান কালিগোপাল চক্রবর্ত্তী "ধূসর" নামীয়

একটি গল্পিকা আমাদের পাঠাইয়াছেন। আমরা নিম্নে সেটি মুদ্রিত করিলাম।

ধূসর

'ধূসর' কাব্যপত্রের সম্পাদক রামবাবু। পাচক লালুর বিদ্যার দৌড় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত হইলেও প্রভুর পত্রিকার কবিতা পড়িয়া সে মজাই অনুভব করিত। প্রভুর একটু প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া একদিন সে একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বসিল। অর্থাৎ খারাপ মশলার পরিবর্ত্তে ভাল মশলা আনাইবার কথাটা বাবুর মত কবিতা করিয়া এক টুকরা কাগজে লিখিয়া প্রভুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার টেবিলে রাখিয়া সশঙ্কিতে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। কাগজটা খুলিয়াই রামবাবুর পটলচেরা চোখ দুইটা বিস্ময়ে আলুচেরা হইয়া উঠিল। লালু কবিতা লিখিয়াছে!

মশলা

ধূসর বাটা মাছ
লঙ্কাযোগ হলেও ধূসর
ধূসর বরাত।
স্বাঙ্গাৎ ভজাটাই ধূসর ঠেকে
বাবু-মারা ধূসর নেশায়
ধূসর ঝাঁঝু মুদীর
মিতালীও ধূসর
আরও ধূসর মশলা।
ধূসর চাকরী
খালি ধূসর।

শাপে বর হইল। উচ্ছ্বসিত রামবাবু আনন্দের আতিশয্যে রন্ধনশালায় ছুটিয়া গিয়া লালুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, লালচাঁদ তুমি করেচ' কি? অপ্রস্তুত লালু প্রভুর মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সেইদিন হইতে তাহার আদর আরও বাড়িয়া গেল এবং পরবর্ত্তী সংখ্যা 'ধূসরে' "মশলা" কবিতাটি সম্পাদকের প্রশংসাসহ ছাপা হইল। প্রশংসাপত্রে উৎসাহিত করিয়া তিনি লিখিলেন, ধূসরের পটভূমিকায় ব্যঞ্জন-শিল্পীর অন্তর্জীবনের ট্র্যাজেডি ইতিপূর্ব্বে এমনভাবে আর কেহ ফুটাইতে পারেন নাই। কবির মাঝে আমরা অসামান্য প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত পাইতেছি।

—

শুধু 'ধূসর'ই নয়, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে আরও বহুবিধ সমস্যা

দেখা দিয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ রায় ("দাড়ি ও সাহিত্য" যশের) "বয়ঃসন্ধি" সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার লেখাই উদ্ধৃত করিতেছি—

আজকাল "বয়ঃসন্ধির" খুব ধুম পড়িয়াছে। গত দেড় মাসের মধ্যেই দুইটি বয়ঃসন্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে,—হয়তো আরও আছে, কিন্তু দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

বয়ঃসন্ধি বলিলে কি বুঝিবেন? "শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা", কিম্বা "পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ?" মোটেই তাহা নহে। খোকার বয়ঃসন্ধি হইতেছে আখ্যান-বিষয়। খোকার বয়ঃসন্ধি ফুটিয়া (ফাটিয়া?) উঠিতেছে তাহার মাতার সান্নিধ্যে।

গত ২০শে আশ্বিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস-সি, কর্ত্তৃক লিখিত "বয়ঃসন্ধি" নামক একটি গল্প বাহির হইয়াছে। নমুনা দেখুন—

"খোকার বয়স দশ বছর। খোকা বড় হইতেছে।"...এই খোকা একদিন "যাইতে যাইতে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, পুবের দিককার জানালার শিক ধরিয়া মা দাঁড়াইয়া আছেন। সকাল বেলায় স্নান করিয়াছেন, ভিজাচুলের রাশি পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন মা, নিশ্চল।...মায়ের এই আর একরকম মূর্ত্তি খোকা আরও অনেকবার দেখিয়াছে। দেখিয়াছে সকাল বেলায় বিছানায় (মায়ের ভাষায়) ঘাঁতি মারিয়া পড়িয়া থাকিবার সময়। সংসারে সহস্র কাজে চরকীপাক খাইতে খাইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়া ঐ রকম জানালার শিক ধরিয়া হঠাৎ তিনি থামিয়া গিয়াছেন। এক একদিন বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার (sic) হুঁস হয় নাই। কিন্তু হুঁস হইলেই আবার যে কে সেই।

মায়ের এই চুরি করিয়া দেখা আলুথালু রূপটি খোকার বড় ভাল লাগে। স্বপ্নে পাওয়া (sic) মাকে দেখিতে দেখিতে একটি সৌন্দর্য্যোপলব্ধি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে চায় কি?"

তারপর একদিন "দুপুরবেলা। হাত বাড়াইয়া তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিতে করিতে মা বলিলেন, সরে আয় না এদিকে।

খোকা কিন্তু সরিয়া আসিল না। শক্ত হইয়া একটু তফাতেই শুইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া মা নিজেই কাছে সরিয়া আসিলেন। দুই হাত দিয়া খোকাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহ অনুযোগ করিলেন—আমার কোলের মধ্যে শুতে তোর লজ্জা করে, খোকা?

খোকা এ কথায় ঘাড় গুঁজিয়া আরও শক্ত হইয়া রহিল, বলিল, যাঃ।...কিছুক্ষণ ছেলের মুখ পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন। নিজের অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার (sic) বক্ষ মথিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। খোকা বড় হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে। মা তন্দ্রাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। খোকা কিন্তু ঘুমায়

নাই। সে বাহিরের ঘরে যাইয়া ফরাসের উপরে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিল।...তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে মনটা হঠাৎ হু হু করিয়া ওঠে কেন? কি ভাবনায় হৃদয়ন্ত্রে পাক খাইয়া, কিসের ব্যথায় অস্ফুট ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিতে চায়?

কয়েক বছর পরের কথা।...(খোকার) শরীরের উপর দিয়া যেন একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কি যেন ওলটপালট হইয়া গেল। কে যেন কাহাকে যায়গা ছাড়িয়া দিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।...দুর্ব্বল শরীর ব্যাপিয়া চলে সেই নবীন আগন্তুকের নববোধন।"

'প্রবাসী'তেও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "বয়ঃসন্ধি" দেখিলাম! লেখক শ্রীতারাপদ রাহা।

"শ্রীমান সুকোমল বড় হইয়াছেন।"...সুকোমলের মা সুলতা "তাহার ছেলে, নিজের পেটের ছেলে, একমাত্র ছেলে"কে "জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইতে গেল। মাণিক (ওরফে সুকোমল) সন্ত্রস্ত হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, ছাড়ো ছাড়ো, দেখবে ওরা!... সুলতার বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগিল। ঘরে আসিয়া সে বলিল—হাঁ রে বাবলু, আমি আদর করতে গেলে তোর লজ্জা লাগে? মাণিক জামা ছাড়িতেছিল—জামার মাঝেই মুখখানা রাখিয়া বলিল—জানি নে যাও—...মাণিক দিগম্বর হইয়া বাপের বিছানায় অকাতরে ঘুমাইতেছে। বিমলকান্তি (সুকোমলের পিতা) তাকাইয়া দেখিয়া বলেন, হুঁ।...ও আবার আজকাল লাইট অফ না করলে শুতে চায় না। সুলতা বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া গিয়া ঘুমন্ত মাণিকের ললাটে চুমু খাইয়া বলে, বাবলু আমার,—আমার বাবলু বড় হয়েছে!"

ইহার কিছু দিন পর মাণিকের জন্মতিথি উৎসব। "সন্ধ্যাকালে যখন মাণিক বেড়াইয়া ফিরে তখনও বাহির হইতে কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু পাঞ্জাবী খুলিলেই সুলতা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

—ওমা!—কি কাণ্ড করেছিস, এই না কি তোর কাপড় পরা! মাগো!—আজ তোর তের বছর পূর্ণ হ'ল, চৌদ্দয় পড়লি তুই!

মাণিক লজ্জা পাইয়া বলে—দাও না মা, শীগগির প্যাণ্টটা এনে।

সুলতা প্যাণ্ট আনিয়া মাণিকের হাতে তুলিয়া দিয়া বলে—যাও ঘরে গিয়ে শীগগির পরে ফেল, লোকে দেখলে বলবে কি! কেবল আমি আদর করতে গেলে তখন উনি বড় হন।

তারপর পূজার সময় জল-পিপাসা পাইলে সে (মাণিক) একটা দোকানে পান খাইতে যায়। দোকানী জিজ্ঞাসা করে—শাদা?

—হাঁ শাদা।

দোকানী পানের সঙ্গে কালচে রঙের কি যেন মিশাইয়া দিল।"

বোধ হয় দোকানী চেনা। লেখককে পানের সঙ্গে সাদা রঙের কিছু দিয়া থাকিবে।

এই পর্য্যন্ত সংযতভাবে লিখিয়া বিহার-প্রবাসী লেখক যে বদজোবান ছাড়িয়াছেন, বাংলা দেশে তাহা ভরসা করিয়া ছাপিতে পারিলাম না। আর ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বা কি আছে? 'আনন্দবাজার'

আমাদিগকে জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেন, 'প্রবাসী' শেখান ধর্ম্ম। মাকে এমন "পরিস্থিতি"তে না ফেলিলে ধর্ম্ম ও জাতীয়তা রক্ষা পাইবে কেন?

—

পৌষের 'প্রবাসী'তে শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী কবিতায় "তিন[টি] প্রশ্ন" করিয়াছেন। প্রশ্ন তিনটিই সহজবোধ্য এবং পরিষ্কার।

—

শ্রীযুত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে গত শারদীয়া সংখ্যা 'ছায়াপথে' তাঁহার "বই হারাণো" প্রবন্ধের সহিত ১৩৪৬ সালের পৌষের 'বৈজয়ন্তী'তে "কলেজ বয়"-লিখিত "বই ফেরত" প্রবন্ধ মিলাইয়া পড়িতে অনুরোধ করি। মৌলিকীকরণের এমন আর্ট বাংলা দেশে আর কাহারও জানা নাই।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঝাড়গ্রাম তহবিলের সহায়তায় 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংবাদে বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন, নানা কারণে 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী'র প্রচলিত বাজার-সংস্করণগুলিতে পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। পাঠের দিক দিয়া পরিষদের সংস্করণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হইয়াছে। মধুসূদনের জীবিত-কালের প্রত্যেকটি সংস্করণ মিলাইয়া এই পাঠ প্রস্তুত করা হইতেছে। শব্দার্থ, টীকা, ভূমিকা ও পাঠভেদ যোগে এই সংস্করণের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধুসূদনের ছাত্রেরা এই সংস্করণ সংগ্রহ করিলে অনেক অসুবিধার হাত হইতে বাঁচিতে পারিবেন।

—

সাহিত্যিক বন্ধুরা অত্যধিক কিশোরী-প্রীতি দেখাইতে সুরু করিয়াছেন। বন্ধুবর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ঘাটশিলা-সংক্রান্ত পূর্ব্বকৃত ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া গত ১৭ই অগ্রহায়ণ "ষোড়শী"-বাবুর কন্যা রমা চট্টোপাধ্যায়কে বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন। বন্ধুবর "বনফুল" 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তাঁহার কৃষ্ণা ও শুক্লা 'চতুর্দ্দশী'কে এক করিয়া কাব্যগ্রন্থ 'চতুর্দ্দশী' প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বয়স

হইয়াছে, শক্ত সমর্থ জিতেন্দ্রিয় বন্ধুদের এরূপ আকস্মিক পতনে ক্রমশঃ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। বিশেষ কারণে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সংসাহস নাই।

* * *

ষোড়শীবাবুর কন্যা শুধু ষোড়শী নন, লেখিকাও; সুতরাং বিভূতিবাবুর প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু "বনফুলে"র সংসাহস আরও একডিগ্রী উপরে; তিনি "প্রিয়তমাসু"কে 'চতুর্দ্দশী' উপহার দিয়াছেন। কৃষ্ণা শুক্লা ভেদে চোদ্দ দুগুণে আটাশটি অষ্টাদশী সনেট যেন আটাশটি মারণাস্ত্র, বুলেট ও লাফিংগ্যাস একত্রে। বিষাদকরুণ এবং হাস্যোজ্জ্বল দুই জাতীয় কবিতার সমাবেশে উপহার হিসাবে এই কাব্যের সমাদর হওয়া উচিত।

—

রামমোহন রায় প্রতিমা-পূজার বিরোধী ছিলেন এবং 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন-পন্থী। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে দেখিলাম, মলাটের প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় এবং পেটের মাঝখানে দুর্গা-প্রতিমার ছবি জলজল করিতেছে, তখন এই কথাই স্মরণ হইল যে, বিশেষ কারণে রেলকর্ত্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার অপেক্ষাও থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের (সমবেতভাবে) খাতির করিতে বাধ্য হন। শূন্যদেবতা গণদেবতার কাছে চিরদিনই পরাস্ত।

—

ইদানীং 'প্রবাসী'র "কষ্টিপাথর" বিভাগ লক্ষ্য করিবার মত। বাংলা দেশে মণিমুক্তা শান্তিনিকেতনেই পয়দা হইয়া থাকে, অন্যত্র দুর্লভ। যে রাজহংসটিকে সাময়িক সাহিত্যের নীর চুষিয়া "কষ্টিপাথর"-ক্ষীর সংগ্রহ করিতে হয়, কোন্ দীঘিতে তাঁহার বাসা বা যাওয়া-আসা জানিতে ইচ্ছা হয়। ভক্তি ভাল, কিন্তু ভক্তির আতিশয্য সন্দেহজনক।

—

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৭ [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীমধুসূদন

'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ—কল্পনা ও কবিশক্তি (৪)

১

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবিকল্পনা ও কবিত্বশক্তির যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে এ পর্য্যন্ত সে কাব্যের কাহিনী বা কল্পনাবস্তুর, এবং তাহার অন্তরালে যে কবিমানস রহিয়াছে তাহার, ব্যাখ্যা করিয়াছি। এক্ষণে কাব্যের রচনাভঙ্গি ও কবিকল্পনার সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, অর্থাৎ আমারই এই আলোচনার মূল্য সম্বন্ধে, কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। আমি এই আলোচনায়, একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, মধুসূদনের কাব্যপ্রকৃতি 'আত্মসচেতন' নয়; তাহার প্রমাণ, তাঁহার এই কাব্যগত কল্পনা ও সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বহু সজ্ঞান উক্তির তুলনা করিলেই, নিঃসংশয় হইয়া উঠে; আমি সে দৃষ্টান্তও দিয়াছি। কাব্যসৃষ্টির মূলে নির্জ্ঞানের

প্রভাব যে অনেকখানি থাকে, তাহাও আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত; এ শক্তিকে প্রাচীনেরা দিব্যশক্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। বুদ্ধি ও বিদ্যার অতীত একপ্রকার 'বোধি'ই ইহার কারণ; এবং ইহা সাধারণ মনুষ্যধর্ম্মের অতীত বলিয়া, "নরত্বং দুর্লভং লোকে কবিত্বঞ্চ সুদুর্লভং"—এমন কথা তাঁহারা জোর করিয়াই বলিতেন। আবার, "কবিতা রস-মাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ"—এই উক্তির মধ্যেও একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। কবিরা যাহা রচনা করেন, তাহার সুগভীর রসরূপ বা নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্যক জ্ঞান না থাকিবারই কথা; কারণ, সে রস তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন—জাগ্রত চৈতন্যের অজ্ঞাতে, এক গভীরতর চিত্তবৃত্তির অতর্কিত প্ররোচনায়। অতএব সে সৃষ্টির রস-তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য এমন ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি সেই কাব্যের প্রেরণা-ঘটিত সাক্ষাৎ আবেশের প্রভাব হইতে মুক্ত, অথচ বাহির হইতে সেই কাব্যস্রষ্টা কবির অন্তরের আকূতিকে আবিষ্কার করিবার দৃষ্টি যাঁহার আছে, তাঁহাকেও এই অর্থে কবি বলিতে হইবে যে, অপরের কল্পনার শাখা-প্রশাখা হইতে মূল পর্য্যন্ত, তিনি আর এক জাতীয় কল্পনার বলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আর এক জাতীয়—এই অর্থে যে, এখানে সে কল্পনা মৌলিক সৃষ্টির কল্পনা নয়; সেই সৃষ্টিকে সম্যক হৃদয়গোচর করিবার রসদৃষ্টি মাত্র তাহাতে আছে। এ দৃষ্টিও সুলভ নয়। আমাদের আলঙ্কারিকের মতে "পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিবৎ রসসন্ততিম্"। রস-সন্ততি, অর্থাৎ, রসপ্রেরণাসম্ভূত যাহা, তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে যোগীর ন্যায় দৃষ্টি চাই; এবং সে দৃষ্টি, পুণ্যবান না হইলে, কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ ভাষা প্রাচীন, আধুনিক ভাষাতেও কথাটা একই, এবং সত্য। মধুসূদনের কাব্যের রসনির্ণয় করিতে এতখানি যোগ-দৃষ্টির প্রয়োজন অবশ্য আমার হয় নাই; সে শক্তিও আমার নাই, কিংবা

এ কাব্যের রস আস্বাদনে কোনরূপ 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'-বস্তুর নাম স্মরণ করিবার মত বিপদও আমার ঘটে নাই। তথাপি, আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে কবির কল্পনা ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণাকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে আমার নিজের কল্পনারও সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই কার্য্যে আমি কতটা সফল হইয়াছি, তাহার প্রমাণ হইবে—আমি কবিমানসে যে কাব্যবীজ আবিষ্কার করিয়াছি, কাব্যের সর্ব্বাঙ্গ-বিকাশে সর্ব্বত্র তাহার লক্ষণ-সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছি কি না; কাব্যে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত যদি কিছু বলিয়া থাকি, তবে তাহা কবির সেই মূল কল্পনা-পরিধির বহির্গত কি না! ব্যাখ্যা যদি মূলকে অতিক্রম করে, তবে তাহা অপব্যাখ্যা মাত্র; তাহা ব্যাখ্যাকারেরই গৌরব বৃদ্ধি করে—কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না। আবার, কবিতা, অন্তত এই জাতীয় কাব্য, বেদান্তসূত্রের মত এমন গূঢ়ার্থপূর্ণ স্বল্পাক্ষর রচনা নয় যে, তাহার ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া নানা মুনি নানা মৌলিক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচনা করিতে পারেন। তথাপি অতি সূক্ষ্ম তর্ক আশ্রয় করিলে এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, কোনও কাব্যের কাব্যগত যাহা, তাহা যে ভাবেই পুনরুক্ত হউক, সে আর ঠিক সেই কাব্যের মর্ম্ম নহে; কাব্যপাঠের ফল ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব রুচি, রসবোধ, কল্পনা-প্রকৃতি, ও সংস্কার অনুসারে পৃথক হইতে বাধ্য। অতএব কাব্যরসকে প্রত্যেক রসিক পাঠক আপনার মত করিয়া অপরোক্ষ করিবেন, কোনও ব্যাখ্যাকারের পরোক্ষতায় কাব্যের সেই রস ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। কিন্তু এতখানি সূক্ষ্ম বিচার মানিতে হইলে কাব্যের রসপ্রমাণ-কর্ম্ম সাহিত্য হইতেই খারিজ হইয়া যায়। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে, আধুনিক ভাষায় যাহাকে 'ক্রিটিক' বলে, রসপ্রমাতা নামে তাঁহার অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কাব্যের কাব্যগত রসবস্তুকে

অপরোক্ষ করিবার রসদৃষ্টি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই প্রমুখাৎ অপর সকলে কাব্যপরিচয় গ্রহণ করিবে—এমনই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই ; কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি—আধুনিক কাব্যবিচার কেবল রসবিচার নয়, কাব্যের বিশিষ্ট রূপবিচারই মুখ্য। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত কাব্যে, তাহার বস্তুবিস্তারের মধ্যেই কবির কল্পনাকে অনুসরণ করিয়া আমি তাহার—রস নয়—কাহিনীগত ভাববৈচিত্র্য, ও তাহার রূপ-সমগ্রতার যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাতে কবি-মন ও ক্রিটিক-মনের মনোভূমি এক না হইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এজন্য অনেকের মনে এমন সন্দেহ জাগিতে পারে যে, আমি হয়তো আমারই মনের আস্তরণ দিয়া মধুসূদনের কাব্যকে ঢাকিয়া, তাহার উপর আমারই কল্পনার কারিগরি করিয়াছি। সত্যই, কাব্য-পরিচয় ব্যপদেশে এমন রচনা অনেক দেখা গিয়াছে, যাহাতে মূল কবির কল্পনা অপেক্ষা লেখকের স্বকপোল-কল্পনার বাহাদুরিই অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ধরনের রচনা সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচকের উক্তি এইরূপ—

These are all fantastic embroideries, metaphors, easel pictures, which sometimes do honour to the artistic capacity of the eulogists, but have no connexion whatever with the direct impression of Corneille's tragedies. Spinoza would have said that they have as much connexion with them as the dog of Zoology with the dog-star.

আরও একজনের মতে, কাব্য-সমালোচনার সাধারণ দোষ তিনটি :—

(১) কোন কাব্যের সাধারণ লক্ষণ লইয়া ভাসা-ভাসা আলোচনা, তাহাতে সেই কাব্যের নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে না—অপর বহু কাব্যের সহিত তাহার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

(২) অত্যন্ত স্থূল লক্ষণ লইয়া বিচার—কাব্যের অন্তর্গত হৃদয়াবেগ-মূলক ভাবগুলিকেই মুখ্য করিয়া, তাহারই পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এবং তাহা দ্বারাই কাব্যের মূল্য নিরূপণ করা হয় ; যে বিশিষ্ট রূপে সেই ভাবাবেগ রূপ পাইয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া হয় না। (আমাদের দেশের সাহিত্য-সমালোচনায় সাধারণত এই দুই পদ্ধতিই প্রচলিত আছে।)

(৩) মূল কাব্যের উপরে কারুকার্য্য করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন কিছু গড়িয়া তোলা।

আমি এই তৃতীয় দোষটির কথাই বলিতেছিলাম, এবং এই সম্বন্ধেই আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কোনও কাব্যকে উপাদান-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নূতন কিছু রচনা করা সেই কাব্যের ব্যাখ্যা বা রসপরিচয় নয়। অন্যান্য বহু কাব্য হইতে কাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ স্থির করিয়া এবং তাহা হইতেই কয়েকটি সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সূত্র অনুসারে কাব্য বিচার করিলেও তাহাতে কাব্যবিশেষের পরিচয় দেওয়া হয় না। কবিচরিত, কবিমানস ও কাব্যগত কল্পনা, এই তিনটিকে মিলাইয়া, এবং কাব্যের অন্তর্ভূত সকল-উপাদানকে সকল দিক হইতে দেখিয়া, যতদূর সম্ভব, সেই কাব্যখানি ছাড়া আর কোনও কাব্যের প্রভাব মন হইতে দূরে রাখিয়া—যেন সেই কবি ও কাব্যের সহিত একাত্ম হইয়া, যদি তাহার বিশিষ্ট রূপটিকে হৃদয়গোচর করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয়, তবেই কাব্যপরিচয় সাধ্যমত যথার্থ হইতে পারে। এ কথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, সমালোচকের প্রকৃতিগত একটা সহজ সহানুভূতিও চাই ; তাঁহার নিজের কোনও বদ্ধ সংস্কার বা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকিলে চলিবে না। সেই কল্পনা-শক্তি তাঁহার চাই, যাহা দ্বারা তিনি আত্মভাবমুক্ত হইয়া অপরের ভাবে ভাবিত হইতে পারেন।

এইজন্য, যাঁহারা অতিশয় আত্মভাবপরায়ণ, বা কোনও তত্ত্ববিশেষের অভিমুখী যাঁহাদের মন, তাঁহারা যে কোনও কবি বা কাব্যের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই ; ইহার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যেই আছে। মধুসূদনের কাব্য-পরিচয় লিখিতে, আমি মধুসূদনের কবি-জীবন ও কবি-মানসকে যতদূর সম্ভব একালের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি ; সেই কালের প্রবৃত্তি ও সেই যুগসন্ধির সকল সমস্যা ও সঙ্কটকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, বাংলা সাহিত্যের সেই নবজন্মক্ষণের গ্রহসন্নিবেশ-ফল অবধারণ করিয়াছি ; এবং, সেই সঙ্গে মধুসূদনের কাব্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশ্লেষণ, ও নানা দিক হইতে তাহার ভাবমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, একই সঙ্গে কবি ও কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে, যাহা হইয়াছে তাহা যদি কবির নিজস্ব কল্পনার অতিরিক্ত বা বহির্ভূত কিছু হইয়া থাকে, তাহার বিচার করা আমার সাধ্য তো নহেই ; এবং আশঙ্কা হয়, একালের অপর কাহারও সাধ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে যে ব্যাধি ও বিভ্রান্তির যুগ এখন চলিতেছে, কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যে পণ্ডিতম্মন্য আত্মভাবসর্ব্বস্ব, দাম্ভিক মনোভাবের ডিমোক্র্যাসি প্রবল হইয়াছে—তাহার অবসানে যদি সত্যকার সাহিত্যবোধ ও রসদৃষ্টি কখনও ফিরিয়া আসে, তবেই সেই ভবিষ্যতের দিব্যতর দৃষ্টিসম্পন্ন ক্রিটিক আমার ভুল সংশোধন করিবেন।

২

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র গঠন সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

I think I have constructed the Poem on the most rigid principles, and even a French critic would not find fault with me.

ইহা যে অতিশয় সত্য, তাহা যে কোন সাহিত্যপণ্ডিত স্বীকার করিবেন। মহাকাব্য বা দীর্ঘ-কাহিনী কাব্যের যে গ্রন্থন-নৈপুণ্য—সর্ব্ব অঙ্গের বিন্যাস-পারিপাট্যে কাব্যের যে সংহতি-সুষমা—তাহা বোধ হয়, আমাদের সাহিত্যে এই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই প্রথম। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের তো কথাই নাই, পরবর্ত্তী মহাকাব্য—হেম ও নবীনের কাব্যগুলির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, কবিশিল্পীর এই শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কোথায়ও এমন সিদ্ধিলাভ করে নাই। এখানেও, মধুসূদনের শুধু প্রতিভাই নয়, সেকালের পক্ষে যাহা অনন্যসুলভ ছিল, সেই খাঁটি সাহিত্যিক শিক্ষা বা উৎকৃষ্ট কাল্‌চারের প্রমাণ পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যগুলি গভীর রসগ্রাহিতার সহিত পাঠ করার ফলে মধুসূদনের সেই শিক্ষা হইয়াছিল, যাহা এ দেশের মহাকাব্য বা কাহিনী-কাব্যের আদর্শ বা রীতি হইতে লাভ করা সম্ভব ছিল না। একটা বিষয়বস্তু, ঘটনা, বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আদি, মধ্য ও অন্ত যুক্ত কাহিনী রচনা—আমাদের দেশে এরূপ কাব্যের রীতি নয়। সে কাব্যের কাহিনীর দুই মুখ—আদি ও অন্ত খোলাই থাকে, গল্পের ধারা যেন বহিয়াই চলে, এবং তাহা যথাস্থানে সমাপ্ত হইলেই হইল। সে সমাপ্তির জন্য পূর্ব্বাপর সকল অংশের সমান প্রয়োজনীয়তা নাই ; কাহিনীর সেই পরিণাম অনুযায়ী অংশগুলির সামঞ্জস্য-জ্ঞান বা উপাদানের পরিমাণবোধ নাই। কাহিনীর কেন্দ্রটিকে ঘেরিয়া সকল উপাদান-উপকরণকে সুপরিমিত ও সুবিন্যস্ত করার যে শিল্প-চাতুর্য্য, সেদিকে আমাদের কবিদের—কি সংস্কৃতে কি ভাষায়—কোনও লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাকাব্যে বিষয়ের একটা গাম্ভীর্য্য ও বিস্তৃতি এবং নানা রসের অবতারণা করিবার জন্য বর্ণনার বহুল বৈচিত্র্য থাকিলেই হইল ; কাহিনীকে সর্ব্বপ্রকার অবান্তর বাহুল্যবর্জ্জিত করিয়া, তাহার

অবয়বগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পাঠকের চিত্তে একটি সুপরিস্ফুট রসরূপ জাগ্রত করা—আমাদের কাব্য-শিল্পের আদর্শ ছিল না; তাহার কারণ, আমাদের রসবোধ অনেকখানি বস্তুনিরপেক্ষ ছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এই য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের কেন্দ্র ও পরিধি গোড়া হইতে স্থির করিয়া নয়টি সর্গে তিনি পর পর যে বস্তুযোজনা করিয়াছেন; সামান্য আখ্যান-টুকুকে যেরূপ সাবধানতার সহিত বিস্তারিত করিয়াছেন; সর্গগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য ও যথাস্থান যেভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মূল কাহিনীর গতিধারা যেরূপ অব্যাহত রাখিয়াছেন—তাহাতে কাব্যখানি, গঠনে ও গাঢ়বন্ধতায়, প্রায় অনবদ্য হইয়াছে। কাহিনী-রচনায়, আমাদের সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্য-গুলিতে, এই গুণ আরও অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা এ তুলনাও ঠিক হইল না; এইরূপ তর-তম বিচার এ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত নয়; ইহাই বলিলে ঠিক হইবে যে, এ গুণ মধুসূদনের রচনাতেই সর্ব্ব-প্রথম পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সর্গগুলির নামের দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে, কবি কত সাবধানে কাব্যের অঙ্গযোজনা করিয়াছেন। এ কাব্যে শাখা-কাহিনী মাত্র একটি আছে—"অশোকবন" নামক সর্গে সেই সীতা-সরমা-সংবাদ কাব্যের কোন্ দিক পূর্ণ করিয়াছে, সে আলোচনা পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে করিয়াছি। অন্যগুলির প্রত্যেকটি মূল ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট—কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ ভাবে। তৃতীয় সর্গ "সমাগম" এবং সপ্তম সর্গ "প্রেতপুরী"—এই দুইটা সর্গের উদ্ভাবনায়, কবি তাঁহার কল্পনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। প্রথমটি ঘটনা হিসাবে গৌণ হইলেও, ওই একটিমাত্র সর্গে কবি এ কাব্যের নায়িকাকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সুযোগ লইয়াছেন। সে হিসাবে এ সর্গ

কাব্যের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। দ্বিতীয়টি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও, এ কাব্যের পরিকল্পনার বহির্ভূত নয়। তথাপি ইহার সংযোজনে নয়—রসের পাক-কৌশলেই—কিঞ্চিৎ দোষ আছে, সে কথা পরে বলিব। অপর সর্গগুলিতেই মূল আখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের একটিও অসংলগ্ন বা বাহুল্য-দোষদুষ্ট নয়। ইহাকেই বলে—"economy of means" বা উপকরণবাহুল্যের অভাব; ইহাই উৎকৃষ্ট স্টাইল, এবং ইহাতেই আছে সাহিত্যিক বিবেকবুদ্ধির পরিচয়। যাত্রীর নৌকা ও বোঝাই লইবার নৌকায় গঠনের যে পার্থক্য যে কারণে আছে, রসিকের হৃদয়গ্রাহী হইবার এবং অরসিকের জঠর পূর্ণ করিবার যে দুই প্রকার কাব্য—তাহাদেরও, গঠনে ও উপকরণ-সংগ্রহে, সেইরূপ পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে সে যুগের অপর মহাকাব্যগুলির তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেবল কল্পনার স্রোত বা উপকরণ-বাহুল্যই কাব্যের গৌরব নয়, এমন কি, ভাবের উচ্চতা বা বিষয়ের বিরাটত্বই কাব্যগত উৎকর্ষের প্রমাণ নয়; বিরাটই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক—কল্পনা যদি মেরুদণ্ডহীন হয় এবং উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী গঠন-নৈপুণ্য না থাকে, তাহা হইলে রচনার সেই শিথিল, অসংলগ্ন, মেদবহুল বপু সত্যকার রসরূপ ধারণ করিতে পারে না। যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এই গঠননৈপুণ্য লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কেবল নূতন ভাষা, নূতন ছন্দ ও নূতন কল্পনাভঙ্গি নয়—মধুসূদন, কাব্যরচনায় এই যে শিল্পীজনোচিত বিবেকবুদ্ধিকে মান্য করিয়াছিলেন—ইহাও বাংলা কাব্যে কাব্যকলার এক নূতন ও অত্যাবশ্যক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মত। ইহা প্রকৃত সৃষ্টিশক্তিরও একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। সে যুগের আর কোনও কবির—হেম, নবীন, বিহারীলাল, কাহারও—কবিত্ব যে পরিমাণেই থাকুক—এই শক্তি ছিল না।

কিন্তু এই গঠন-পারিপাট্য সত্ত্বেও এ কাব্যের কল্পনা সর্ব্বত্র নিশ্ছিদ্র ও নির্দ্দোষ নয়, এ প্রসঙ্গে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠকালে একটা কথা এই মনে হয় যে, কবির মূল প্রেরণা বা কল্পনা ভিতরে ও বাহিরে নানা বাধা ও বিরোধের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে; এবং সেই সংগ্রামে কবি জয়ী হইলেও, কাব্যের অঙ্গে তাহার আঘাত-চিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। এজন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্ত্তি হইলেও মনে হয়, তাঁহার কাব্য-সাধনা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। যে শক্তির পরিচয় ইহাতে আছে, এই সাধনায় আরও একটু অগ্রসর হইলে সে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ঘটিতে পারিত। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র পরে যেমন 'মেঘনাদবধ', তেমনই 'মেঘনাদবধে'র পরে আরও অন্তত একখানি এই ধরনের কাব্য মধুসূদনের লেখনী-অগ্রে অপেক্ষা করিয়াছিল; কবির খেয়াল কিন্তু ঐখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। 'মেঘনাদবধে'র ভাষা ও ছন্দসঙ্গীত শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন হইলেও তাহাতে যথেষ্ট অনভ্যাসের ত্রুটিও আছে। আবার, বিলাতী ও দেশী কাব্যরীতির সমন্বয়-সাধনে তিনি যতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাতেও স্বচ্ছন্দ কবিপ্রেরণার সঙ্গে সজ্ঞান অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ বহুস্থলে লক্ষ্য করা যায়। এই সজ্ঞান অভিপ্রায়ের ফলেই কোথাও বা জবরদস্তি এবং কোথাও বা অনাবশ্যক অধীনতা স্বীকারের দোষ এ কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে য়ুরোপীয় কাব্যভঙ্গির অতিরিক্ত আকর্ষণে কবির সহজ কল্পনাস্রোত তটমৃত্তিকা-স্তূপে আবিল হইয়াছে; অপর দিকে তৎকালের একমাত্র উপযুক্ত পাঠক-সমাজের, সেই সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া ভাষায় ও অলঙ্কার-বিন্যাসে পুরাতন রীতির আতিশয্য ঘটিয়াছে। আমি যে গঠন-পারিপাট্যের কথা বলিয়াছি—তাহারই শিল্পীজনসুলভ সংযম এই কাব্যের রসরূপ বজায় রাখিয়াছে;

ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বপ্রকার বাধা সত্ত্বেও, নানা ত্রুটি বিদ্যমানেও, কবির কল্পনাতরণী কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রতি ছত্রে অনুভব হয়—এ কবির দুঃসাহস কতখানি, এবং কেবলমাত্র প্রতিভার বলেই সেই দুঃসাহস কি অসাধ্যসাধন করিয়াছে! ইহাও মনে হয় যে, এ কাব্যের যত কিছু ত্রুটির কারণ—কবির শক্তির অভাব নয়, ধৈর্য্যের অভাব; নিজ শক্তির সহিত সেই শক্তির প্রয়োগক্ষেত্রের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কবি তাহাকে আক্রমণ করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছেন; জয় যে করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের প্রমাণ রহিয়াছে। এই বলপ্রয়োগের আরও কারণ আছে। এ কাব্যের মূল প্রেরণা যে খাঁটি কবি-প্রেরণা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তদানীন্তন অবস্থা ও মধুসূদনের বিশিষ্ট শিক্ষা-দীক্ষার কারণে—তাঁহার ব্যক্তিগত কাব্য-সংস্কার এবং জাগ্রত সাহিত্যিক বুদ্ধির বশে—সেই প্রেরণা কতকগুলি বহির্গত ধারণার দ্বারা পীড়িত হইয়াছে; তাঁহার সেই বিদ্রোহী রোমান্টিক কল্পনাও কতকগুলি বাঁধা রীতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে; তাহাতে এক দিকে যেমন ফল ভাল হইয়াছে, তেমনই আর এক দিকে কোন কোন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণাকে যেন জোর করিয়া সজ্ঞান অভিপ্রায়ের বশীভূত করা হইয়াছে। ইহাও একরূপ আত্মনিগ্রহ—কল্পনার স্বাভাবিক গতিকে ক্লিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র শক্তির পরিচয় দিবার জন্য, কোথাও বা তাহার মর্য্যাদাহানি, কোথাও বা তাহার স্ফূর্ত্তির হানি করা হইয়াছে। এইবার ইহারই দৃষ্টান্ত দিব।

৩

'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সর্গের নাম "অস্ত্রলাভ"। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণকে অমোঘ দিব্য অস্ত্রবলে বলীয়ান করিবার জন্য, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীগণকে এই সর্গে অবতীর্ণ করা হইয়াছে—মূল কাহিনীর ঘটনা-অংশের সহিত এ সর্গের সম্পর্ক এইটুকু মাত্র। এইরূপ কল্পনা সঙ্গত বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই অস্ত্রলাভের প্রয়োজন আর থাকে নাই, এজন্য, এই সর্গে কবির অভিপ্রায় স্পষ্টতই অন্যবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হোমারের মহাকাব্যের নজির ও তথা য়ুরোপীয় কাব্যশাস্ত্রের বিধান অনুসারে, কবি এখানে স্বর্গ ও দেবদেবীগণের বৃত্তান্ত তাঁহার মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছেন—এবং সেই সুযোগে বাংলা কাব্যে, দেবদেবীগণের সহিত মানব-সংসারের একটা নূতনতর সম্পর্কের যে চিত্র, তাহারই রস সঞ্চারিত করিয়া, কবি-কল্পনার নিরঙ্কুশতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। এখানে কবি, শুধুই কাব্যসৃষ্টি নয়, তাহারও অতিরিক্ত একটা প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন; তদানীন্তন বাংলা কাব্যের জড়তা মোচন এবং কবি-কল্পনার অধিকার বিস্তার করার একটা সংস্কারক-মনোভাব তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কবি সে কথা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণাও করিয়াছেন; পত্রে বন্ধুকে লিখিতেছেন—

I would sooner reform the poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

সেকালের বাংলা কাব্যের অবস্থা মনে করিলে, এ সর্গে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র ও পৃথিবী লইয়া যে নূতন কবিত্বময় বর্ণনার বহু সুযোগ মিলিয়াছে তাহাতে, ইহার যে কোন মূল্য নাই, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু ইহাও অনুভব করি যে, কেবল বর্ণনার জন্যই বর্ণনা চলিয়াছে, কবি যেন এখানে তাঁহার কবিশক্তি অপেক্ষা কাব্যবিদ্যার দ্বারাই তাঁহার কল্পনার পক্ষ সংস্কার করিতেছেন। হিন্দুপুরাণ ও লোক-সাহিত্যের দেবদেবী-লীলার দৃষ্টান্তে তিনি গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণের চরিতাদর্শ তাঁহার কাহিনীতেও প্রতিফলিত করিতে সাহস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনা গ্রীক ও হিন্দু পুরাণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, অর্থাৎ গ্রীককে হিন্দু করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে মধুসূদনের

কল্পনার পদস্খলনের আর একটা কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ, অর্থাৎ, আমাদের ক্লাসিক্যাল আদর্শের দেবদেবী-কথাকে, বাংলার গ্রাম্য-সাহিত্যের দেবদেবী-উপাখ্যানের সহিত মিলাইয়া লইলেই, গ্রীকপুরাণ-সম্মত দেবদেবী-চরিত্রকে সহজে বাংলার কাব্যভূমিতে রোপণ করা যাইবে। কিন্তু, ইহাতেই রসাভাস ঘটিয়াছে। গ্রীক ও সংস্কৃত দুই আদর্শ যেমন স্বতন্ত্র, প্রাচীন ভারতীয় ও খাঁটি বাংলা আদর্শও তেমনই স্বতন্ত্র। কালিদাসের কুমারসম্ভবের হরপার্ব্বতী, ও অন্যান্য দেবতা, খাঁটি হিন্দু-সংস্কৃতিপ্রসূত উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সৃষ্টি—তাহাদের মধ্যে যে মানবীয় গুণ আছে, তাহাতে হিন্দু-ভাবুকতার বৈশিষ্ট্য জাজ্জ্বল্যমান। গ্রীক দেবদেবীর উপাখ্যানে যে বিশিষ্ট কাব্য-সৌন্দর্য্য আছে, মধুসূদন সেই রসে তাঁহার নব্য কাব্য-কল্পনাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ঐ তিন আদর্শকেই মিলাইতে গিয়া কল্পনার সাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁহার মনোভাব পত্রাবলীর মধ্যে, এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

Though as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors.

এবং

It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own.

কিন্তু এ বিষয়ে কার্য্যত তিনি, হিন্দুপুরাণ নয়, গ্রীক পুরাণের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কল্পনার সৃষ্টিধর্ম্মসুলভ সমন্বয়-সাধন করিতে পারেন নাই। এ কাহিনী একেবারে গ্রীক হইবার প্রয়োজনও ছিল না—গ্রীক-কল্পনাভঙ্গিই যথেষ্ট হইত; হিন্দু দেব-দেবীদের লৌকিক চরিত-চিত্রে আমাদের সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সাহায্যে গ্রীক আদর্শের মহাকাব্যীয় আখ্যান রচনা করা দুরূহ হইত না। কিন্তু কবির কল্পনা এই লোক-সাহিত্যের ভূমিতে বিচরণ করিবে না—সংস্কৃত কাব্যপুরাণের ছাপ না থাকিলে সে কল্পনার ক্লাসিক-কৌলীন্য নষ্ট হয়; অথচ সেই খাঁটি বাংলা লৌকিক দেবদেবী-চরিতই গ্রীক-কল্পনার উপযোগী। আমাদের শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডীকেই

একটু মাজিয়া ঘষিয়া লইতে পারিলেই ভাল হইত ; তাহা না করিয়া তিনি সংস্কৃত কাব্যপুরাণকে এই উপপুরাণের সঙ্গে মিলাইতে গিয়া রসাভাস ঘটাইয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহার ধৈর্য্যের অভাব, এখনও তিনি তাঁহার কবিশক্তিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারেন নাই।

এমনই, আর একটি সর্গে, প্রায় একই কারণে, মধুসূদনের কল্পনা কেবলমাত্র বলশালিতার পরিচয় দিয়াছে, সৃষ্টির সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। অষ্টম সর্গে তিনি যে "প্রেতপুরী"র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কেতাবী কাব্যবিদ্যার পরিচয় যতটা আছে—নানা কবিচিত্তফুলবনমধু আহরণ করিবার পটুতা তাহাতে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে—কল্পনার স্ফূর্ত্তি তেমন ঘটে নাই। এ সর্গে বর্ণিত বিষয় কাব্যের মূল ঘটনার সঙ্গে অতি সামান্য সূত্রে যুক্ত হইয়া আছে। তথাপি, কাব্যরসের বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য কবি-কল্পনার এইরূপ স্বাধীন-বিচরণ বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে বিচরণ স্বচ্ছন্দ হয় নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়—কবির নিজস্ব প্রকৃতি যাহার অনুকূল নয়, তাহাকেই একটা দুরূহ অথচ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম মনে করিয়া, কবি যেন একটা কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার অমানুষিক উদ্যম করিয়াছেন। বিদেশী সাহিত্যের রূপ বাংলা ভাষায় ধরিয়া দিবার সফল চেষ্টা এই সর্গের অনেক স্থানে আছে—নব্য বাংলা ভাষার শক্তি-পরীক্ষা হিসাবে এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু মধুসূদনের প্রেতপুরী-বর্ণনা ঘনঘটায় যতটা চমকপ্রদ, রসপ্রেরণায় তাহা তেমনই নিষ্ফল হইয়াছে। পাশাপাশি খ্রীষ্টীয় নরক ও গ্রীক প্রেতপুরী, এবং তাহার সঙ্গে হিন্দু-পুরাণের ছিটা-ফোঁটা মিশাইয়া তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের চিত্তে একটা সমূলক কল্পনার আবেশ সৃষ্টি করে না। নরক-বর্ণনাও যেমন একটা কৃত্রিম বীভৎসরসের উদ্রেক মাত্র করে, তেমনই, গ্রীক 'ভূত-দেশ' বা ছায়াপুরীর অনুকরণে বর্ণিত বীরলোক অথবা পিতৃগণের পুণ্যলোক, পাঠকের মনে কিছুমাত্র সম্ভ্রম উদ্রেক করে না—সমস্তটাই বালকপাঠ্য রূপকথার মত হইয়াছে। নরক-বর্ণনায়, দান্তের কাব্য তাঁহার আদর্শ থাকা সত্ত্বেও, তিনি যে দান্তের নরক ও প্রায়শ্চিত্ত-নরকের সেই হৃদয়স্তম্ভনকারী, অপূর্ব্ব ত্রাস-সঞ্চারী কল্পনার কণামাত্র

আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ, তাঁহার কবি-প্রকৃতিই তাহার বিরোধী ; তাই একটা বহির্গত অভিপ্রায়সিদ্ধির তাড়নায়—কাব্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন কিছু সমাবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষায়—কেবল কাব্যকলাকুতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি এই সর্গে একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন—তিনি যে এ সর্গে, কাব্যরসের পরিবর্ত্তে একটা বিদ্যারসের সৃষ্টি করিয়াছেন, পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলি হইতে কতকগুলি চিত্র কোনরূপে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাতে একরূপ কাব্য-কসরতের গরিমাই আছে, তাহা স্বীকার করিয়া বন্ধুকে এই সর্গ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"There is an intellectual treat in store for you, my boy"। ইহার ঠিক পরের ছত্রটি বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। যথা—"I shall never again attempt anything in the heroic line"—একই নিশ্বাসে এ কথাও বলিবার যে কারণ, তাহার উল্লেখ আমি করিয়াছি। এই দুইটি সর্গ ভিন্ন এ কাব্যে মধুসূদনের কল্পনার শৈথিল্য আর কোথাও নাই। তথাপি এই সকল কারণে মনে হয়, প্রতিভার আকস্মিক জাগরণে—শক্তির প্রাবল্য ও প্রাচুর্য্যে—তিনি যেন অতিশয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, নিজ শক্তি-পরীক্ষার কৌতূহলই তখন কাব্য-প্রেরণাকেও বিচলিত করিতেছে। তাই এ কাব্য পাঠ করিবার সময়ে সেই শক্তির অসামান্যতায় যেমন বিস্মিত হই, তেমনই কাব্যসৃষ্টিতে সেই শক্তির সাধনা যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাও অনুভব করি।

৪

এই প্রসঙ্গে আমি এ কাব্যের পাশ্চাত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলিবার, তাহা এই আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বহুবার বলিয়াছি—পরে, 'মেঘনাদবধে'র কবি-ভাষা ও কবিত্ব-লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনাকালে আরও কিছু বলিবার অবকাশ হইবে। এক্ষণে, কবি তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছাঁচ ও তাহার কল্পনায় গ্রীক আদর্শ অনুসরণের যে

কথা নিজেই একাধিক বার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার একটি উক্তি এইরূপ—

I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write—as a Greek would have done.

'পদ্মাবতী' নাটকে তিনি যেমন গ্রীক উপাখ্যানকেও কাজে লাগাইয়াছেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সেরূপ কিছু করেন নাই, ইহা সত্য; এবং এই কাব্যের কল্পনাভঙ্গিতে তিনি যে কিছু কিছু গ্রীক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অপর একটি উক্তি—এই কাব্য যে three-fourth Greek, অর্থাৎ বারো-আনা গ্রীক—ইহা সত্য নহে। তাঁহার কবি-প্রকৃতিতে একটা healthy paganism বা চিন্তালেশহীন সুস্থ দেহাত্মবাদ ও আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত জীবন-রস-রসিকতা ছিল, তাহা খাঁটি ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী হইলেও বাঙালীত্বের ও স্বভাবকবিত্বের বিরোধী নয়। সেই জন্মগত প্রবৃত্তির বশে তিনি গ্রীককাব্যরসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সে আকর্ষণে, তাঁহার কবিচিত্ত হোমারের কাব্য-কল্পনা অথবা গ্রীক নাটকের ট্র্যাজেডি-ভাবনা, কোনটারই বশীভূত হয় নাই, তিনি হোমারের মত মহাকাব্য লিখিতে প্রয়াস পান নাই—'মেঘনাদবধে'র কাহিনীও সেরূপ কল্পনার উপযোগী নয়। মধুসূদন নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন—"Homer is nothing but battles"। আমিও 'মেঘনাদবধে'র কাহিনী ও তদন্তর্গত কল্পনার যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, এ কাব্যের প্রকৃতিতে বিদেশীর উপরে দেশীয় ভাবই জয়ী হইয়াছে। কেবল দেবদেবীগণের চরিত্রকল্পনা ও মনুষ্যঘটিত ব্যাপারে তাহাদের সাক্ষাৎ সহযোগিতা—এইটুকু বাদ দিলে, হোমারের মহাকাব্যের সহিত এ কাব্যের আর কোন সাক্ষাৎ সগোত্রতা নাই। হিন্দু পুরাণের উপরে গ্রীক পুরাণের ছাপ যাহা আছে, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; দেবতাদের রূপ কল্পনাতে বা তৎসম্পর্কিত বর্ণনায়, এবং বিশেষ করিয়া মনোগ্রাহ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে চিত্রিত করিবার ভঙ্গিতে, গ্রীক কল্পনার যে অনুসরণ কোথাও কোথাও আছে, তাহাও কাব্যকলার বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ; তাহাতে একটি নূতনতর রসের উদ্রেক হইলেও, সেজন্য সমগ্র কাব্যখানির প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য ঘটে নাই।

আর একটি বিষয়ে এই গ্রীক প্রভাব বিচার করিবার আছে। মধুসূদনের কাব্যে যে অদৃষ্টবাদের একটি প্রবল ভাবধারা প্রায় আদ্যোপান্ত রহিয়াছে দেখা যায়, তাহার নজীর সম্ভবত গ্রীক কাব্য হইতেই কবি লইয়াছিলেন; এবং ট্র্যাজেডি-কল্পনায় ইহার উপযোগিতা বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য কবিদের নিকটেই ঋণী। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, তাঁহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দু মনোভাবের ফল; এ অদৃষ্টবাদে খ্রীষ্টীয়ান পাপতত্ত্ব অথবা আদি গ্রীক-চিন্তার অহেতুক দৈবস্বেচ্ছাচার—এ দুইয়ের কোনটাই নাই। মধুসূদনের দেবদেবীগণও এই অদৃষ্টের শাসন মানে, ইহার উপরে তাহাদেরও কর্তৃত্ব নাই। এ অদৃষ্ট এতই দুর্জ্ঞেয় যে, শেষ পর্য্যন্ত ইহা হিন্দুরই কর্ম্মবাদে আসিয়া দাঁড়ায়; এখানেও মধুসূদনের মজ্জাগত হিন্দুসংস্কারই জয়ী হইয়াছে। আবার, অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনায় পাপ ও তাহার শাস্তির যে বর্ণনা আছে, তাহা গ্রীক-ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুর পৌরাণিক কল্পনা মিশিয়াছে, এবং অনুতাপ বা অনুশোচনার জ্বালাই সে শাস্তিকে ভীষণতর করিয়াছে। এরূপ কল্পনায় অদৃষ্টবাদ অপেক্ষা স্বকর্ম্মফলভোগের নীতিবাদই প্রধান হইয়া উঠে, এবং তাহাই এই সর্গে কাব্যের রসহানির কারণ হইয়াছে। অদৃষ্টবাদ ও এইরূপ নীতিবাদের মধ্যে, কোনরূপ সামঞ্জস্য করিতে হইলে যতখানি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, এবং তাহাকে কাব্যরসমণ্ডিত করিতে হইলে কল্পনার যে অধ্যাত্ম-গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আবশ্যক, মধুসূদনের কবিপ্রকৃতিতে তাহা ছিল না; তাই তাঁহার কাব্যে মূল অদৃষ্টবাদের বিরোধী ও বহির্ভূত এই তত্ত্ব নিতান্ত আগন্তুকের মতই কবির ভিন্নতর অভিপ্রায় সিদ্ধির প্রয়োজনে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি সহজাত হিন্দু-মনোভাবের ফলে এ কাব্যের অদৃষ্টবাদে গ্রীক-অদৃষ্টবাদ যতটুকু প্রশ্রয় পায় নাই ততটুকুতেই, এ কাব্যের কল্পনা আধুনিক বা রোমান্টিক ভাবাপন্ন হইয়াছে।

অতএব সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এ কাব্য যে বারো-আনা গ্রীক, মধুসূদনের এ দাবি স্বীকার করা যায় না; কেবল,—"I shall try to write as the Greek would have done"—এই উক্তির কথঞ্চিৎ সমর্থন করা চলে। এ কথারও অর্থ করিলে দেখা যাইবে,

কবির অভিপ্রায় শুধুই গ্রীক কবির কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ নয়; সেই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কাব্যের রূপ বা বাণী-রচনাতে—তাহার উপমা-অলঙ্কারেও—তিনি গ্রীক কাব্যরীতিকে আদর্শ করিবেন। গ্রীক ভাষার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই—সে কাব্যের বাণীরচনার বৈশিষ্ট্য ইংরেজ কবিদের কাব্যে যেখানে যতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহারই সামান্য জ্ঞান আমার সম্বল; অতএব এ প্রশ্নের সম্যক বিচার আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। মধুসূদনের ভাষায় যেখানে যেটুকু নবত্বের চিহ্ন আছে, তাহা প্রকাশভঙ্গিতে, এবং কোথাও কোথাও ভাবনা-ভঙ্গিতেও বটে। কিন্তু বাক্যগঠনে তিনি খাঁটি বাংলা ইডিয়ম ও সংস্কৃত শব্দ-যোজনারীতিই রক্ষা করিয়াছেন—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। বাক্যগঠনে যেটুকু বিদেশী প্রভাব তাহার প্রায় সবটুকুই ইংরেজী। ভাষার লালিত্য বা ছন্দমাধুর্য্য বিষয়ে তিনি ল্যাটিন কবি ভার্জিলের আদর্শে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা নিজেই বলিয়াছেন। তাছাড়া, এই কাব্যে এত বিভিন্ন কবি ও কাব্যের প্রভাব আছে যে, গ্রীক প্রভাবও সেই প্রভাবের একটা দিক মাত্র। তথাপি এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে, মধুসূদনের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে গ্রীক প্রকৃতির সগোত্রতা আছে—এ কথা আমি এ আলোচনায় বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি। য়ুরোপীয় ভাব-কল্পনার অনুকরণ ও অনুসরণ এ কাব্যে যতটুকু আছে তাহা আকৃতিগত; তাহার প্রকৃতিতে যে প্রভাব আছে তাহা গ্রীক নয়—আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব; এবং সে প্রভাব সত্ত্বেও এ কাব্য খাঁটি বাংলা কাব্য হইয়াছে—পাশ্চাত্য বা গ্রীক কাব্য হয় নাই।

মধুসূদনের সহজাত প্রতিভাকে পুষ্ট ও পরিণত করিয়াছিল নানা উৎকৃষ্ট দেশী ও বিলাতী কাব্যের গভীর ও দীর্ঘ অনুশীলন। মনে হয়, এ বিষয়েও তাঁহার সাক্ষাৎ আদর্শ মিল্‌টন। মিল্‌টন যেমন প্রাচীন য়ুরোপীয় ভাষায় ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং সেই বিদ্যাবত্তার ফলে তিনি তাঁহার প্রতিভাকে একটি অতি উচ্চ ও প্রশস্ত সারস্বত ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদনের শক্তি ও বিদ্যা তদপেক্ষা যতই ন্যূন হউক—তিনি তাঁহার সেই বিদ্যা-সাধনার

বলে বাংলা কাব্যে, যতদূর সম্ভব একটা উদার অথচ সুদৃঢ় চত্বর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মিল্‌টন প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের আত্মাটিকে পর্য্যন্ত যেমন করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার গ্রীক ল্যাটিন বা ইটালীয় কাব্য-সংস্কার যেমন খাঁটি ছিল, মধুসূদনের সেরূপ ছিল না; তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। প্রাচীন য়ুরোপীয় কাব্যের প্রভাব তাঁহার পক্ষে মাত্র সাহিত্যিক প্রভাবই ছিল—অর্থাৎ কাব্যরচনার রীতি ও আদর্শ তিনি অনেক পরিমাণে সেই সকল কবির নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই মূল কাব্য-সংস্কারকে তিনি আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই—অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র। গ্রীক প্রেতপুরীর কল্পনায় তিনি যে কবিভাবেও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন নাই তাহার একটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিব। ঐ সর্গে, পৃথিবীর তলদেশে যে "ভূতদেশ" কল্পিত হইয়াছে, সেখানে পৌঁছিয়া রাম যখন মায়াদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—লঙ্কার যুদ্ধে হত রাক্ষসবীরগণ ও সদ্যনিহত মেঘনাদকে সেখানে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না কেন, তখন মায়া তাঁহাকে বলিলেন—

অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি!
নগরবাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী
যতদিন প্রেত-ক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।

ইহাতে আমরাও বুঝিলাম যে, অন্ত্যেষ্টি শেষ হইলে মেঘনাদও এই ভূতলস্থ প্রেতলোকে বীরপল্লীতে আসিয়া বাস করিবেন। কিন্তু স্বর্গ সম্বন্ধে কবির নিজস্ব সংস্কার যে অন্যরূপ—এখানে তিনি হোমার ভার্জিলের অনুসরণ করিতেছেন মাত্র, তাহার প্রমাণ তিনি শেষ সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-বর্ণনায় দিয়াছেন। সেখানে অন্ত্যেষ্টি-শেষে বীর-দম্পতী যে লোকে গমন করিল, তাহা গ্রীক-প্রেতপুরী নয়—হিন্দুপুরাণের শিবলোক। কারণ,—

আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষস-দম্পতী।

এবং—

ইরম্মদবেগে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; স্বর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!

তারপর—

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;

অতএব, মায়াদেবী-কথিত "বিধির বিধি" আর সত্য রহিল না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে মধুসূদনের পক্ষে পাশ্চাত্য কাব্য-সংস্কারে পুরাপুরি দীক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়াই অসম্ভব। ইংরেজী কাব্যেও প্রথমে মিল্‌টন ও পরে ল্যাণ্ডর (W. S. Landor) যে ভাবে সেই ক্ল্যাসিক্যাল কাব্য-কল্পনাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারেন নাই। কবি কীট্‌সের Hellenism-ও তাঁহার রোমাণ্টিক কবিচিত্তের পরকলার মধ্য দিয়া ভিন্ন রঙে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার কবিতাও গ্রীক নহে। কিন্তু মিল্‌টনের কাব্যে যেমন এইরূপ সর্ব্বতোমুখী সাহিত্যিক সাধনার ফলে, হিব্রু, ল্যাটিন-গ্রীক, ইটালীয় ও ইংরাজী এই চারি কাব্য-ধাতুর মিশ্রণ হইয়াছে, মধুসূদনের কাব্যেও তেমনই সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ক্ল্যাসিক এবং বাংলা এই তিন কাব্য-ধাতুর মিলন ঘটিয়াছে এবং সে কাব্যের মূল ধাতু যে বাংলা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি ছিল রোমাণ্টিক, কিন্তু রচনাগত আদর্শ ছিল ক্ল্যাসিক্যাল; তাহার কারণ, সেই প্রকৃতির উপরে ঐ জাতীয় সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে একরূপ সংযম ও সুষমাবোধের শাসন আসিয়া পড়িয়াছিল। তৎসত্ত্বেও এই শাসন যে তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিতেছিল, তাহার আভাস এই কাব্যেই যেমন আছে, তেমনই, তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যেও, একাধিক উক্তিতে, সেই ক্লান্তি ও পীড়াবোধ ধরা পড়িয়াছে। একটি উক্তি ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি—"I shall never again attempt anything in the heroic line"। আরও একবার

লিখিয়াছেন—"I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after this"। "After this"-অর্থে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পর। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' যদি বারো-আনা গ্রীক হয়, তবে তাহার কত-আনা খাঁটি।

৫

এ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ যেমনই হউক, তাহাতে যে কুফল অপেক্ষা সুফলই অধিক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন এই পাশ্চাত্য প্রভাবের বশ্যতাস্বীকারে এক দিকে যেমন সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই অপর দিকে, সেই প্রভাবের জন্য দেশীয় রুচি-সংস্কারে আঘাত লাগার ভয়ও তাঁহার ছিল; সেই-জন্যই বোধ হয়, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি তাঁহার কাব্যের অলঙ্কার-প্রসাধনে এত অধিকমাত্রায় সংস্কৃতের মন রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকাব্যের সুবৃহৎ কলেবরে এই দুর্ব্বলতার চিহ্ন ততখানি দৃষ্টিকটু না হইলেও, সেগুলি না থাকিলেই এ কাব্য আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। মধুসূদন বার বার নিজেকে একজন বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেও, কাব্যরচনাকালে তিনি যে পাঠকমণ্ডলীকে মনশ্চক্ষে সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়াছিলেন, তাহাদের ভয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই; ইহাই সেই "conscience" যাহা—"does make cowards of us all", এবং যাহার জন্য "the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought"। সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না—এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুই জনেই তাঁহার সহিত একমত। এই পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে আছে—বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

We, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pandits, but whom I call barren rascals!

এই পণ্ডিতদিগকে খুশি করিতে হইলে, কোন বিষয়ে নূতনত্ব করা চলিবে না, কারণ, (আর একখানি পত্রে)—

As for the old school nothing is poetry to them which is not an echo of sanskrit—they have no notion of originality.

আবার—

As for the new school, the poor devils do not know Bengali enough to understand what they read [এখনকার নব্যসম্প্রদায় 'do not know Bengali enough to understand' how they write।]

—এ যেন "ডাঙায়-বাঘ, জলে কুমীর"। তথাপি জলের চেয়ে এই ডাঙার দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল—ঐ পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টির জন্য একটু বেশি করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারের মশলা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তাহার জন্য সদ্য ফল প্রাপ্তিও কিছু হইয়াছিল; কারণ 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পরে, তাহার ছন্দ লইয়া বড় বড় পণ্ডিতমহলে ধিক্কার-রব উঠিলেও, এই সময়ে লিখিত তাঁহার পত্রে ইহাও জানা যাইতেছে যে—

Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—হাঁ, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের রস-প্রেরণা এক জিনিস, আর সেই কাব্যের শাস্ত্রবিধির দাসত্ব সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সংস্কৃত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য যে বন্ধ্যা, এবং তাহাদের রসবোধ যে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহা বুঝিয়াও, সে যুগের সেই প্রথম বিদ্রোহী কবিকে সেই পণ্ডিত-মনোভাবের সঙ্গে সন্ধি করিতে হইয়াছিল; নহিলে, তাঁহার কাব্যের অর্থবোধ করিতে পারে এমন পাঠক-সমাজও মিলিত না। অতিশয় কৃত্রিম রীতির উপমা-অলঙ্কার তাঁহার মত কবির পক্ষে উপাদেয় না হইবারই কথা, এবং কাব্যে আদিরসের ছড়াছড়িও তাঁহার আদর্শসম্মত ছিল না; এ বিষয়ে তিনি তাঁহার বন্ধুকে আশ্বস্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

In the present work (মেঘনাদবধ কাব্য) you will see nothing in the shape of "erotic similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha".

—কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এমনও হইতে পারে যে, দেশী ও বিলাতী প্রাচীন কাব্যগুলির উপমা-বিলাস, এবং তাহার প্রয়োগে যে একটি রীতি-নিষ্ঠা তিনি সর্ব্বত্র

লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা তাঁহারও রুচির অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল,—বিশেষ করিয়া মহাকাব্য রচনায় ভাষার এইরূপ প্রসাধন অত্যাবশ্যক মনে করিয়া তিনি সেই শাস্ত্রশাসন মানিয়া লইয়াছিলেন। তথাপি এ বিষয়ে দেশীয় রুচিকে একটু অধিক প্রশ্রয় দিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব কল্পনার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের স্টাইল বজায় রাখিবার আগ্রহে তিনি যেমন প্রতিপদে বর্ণনার সাদৃশ্য যোজনা করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তেমনই সেকালের সেই পাঠকবর্গের চিত্তে অতি সহজে ভাবোদ্রেক করিবার আশায়, জোর করিয়া, অতিশয় সুলভ, এমন কি, অনেক স্থলে রসহানিকর, উপমাও তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, বাক্যার্থের নানা ভঙ্গিমাও দেখাইয়াছেন, তেমনই, যেখানে বাঙালী পাঠককে একটু মজাইবার বা কাঁদাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই সুবিধামত একটু বৃন্দাবনী আবীর-কুঙ্কুম ছিটাইয়া দিয়াছেন—এটুকু দুষ্টবুদ্ধি তাঁহার ছিল, তিনি জানিতেন, মাঝে মাঝে একটু ব্রজের ভাব না মিশাইলে তাঁহার কবিত্ব মাঠে মারা যাইবে। আজিও মধুসূদন যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লিখিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং তাহারই উল্লেখ করিয়া স্মৃতিসভার বক্তাগণ কীর্ত্তনাবেশে বিবশ বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাই, এই কাব্যেরও একটি অতিশয় সঙ্কটময় স্থানে উদ্ধার পাইবার আশায় কবি আর কোন উপমার শরণাপন্ন হইলেন না—মেঘনাদের মৃত্যু-বর্ণনাকে করুণ-রসের চূড়ান্ত করিবার জন্য লিখিলেন—

মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি
আঁধারি সে ব্রজপুর গেলা মধুপুরে।

—কারণ, তখন অক্রুর-সংবাদই বাঙালীর চোখে বন্যা আনিবার সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সেকালের tear gas। এমন দৃষ্টান্ত এ কাব্যে আরও আছে।

অতএব দেখা যাইবে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'রচনায় কবির নিজস্ব কল্পনা ও কবিভাব, নানা কারণে ও প্রয়োজনে, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত হইতে পারে

নাই। তথাপি, এত ত্রুটি সত্ত্বেও এ কাব্য বাংলা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়, কেবলমাত্র প্রতিভার যে শক্তি, তাহা আমাদের সাহিত্যে এমন আর কোথাও দেখা যায় নাই। এই শক্তির সাধনায় কবি যদি আর কিছুকালও নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে, 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' অপেক্ষা আরও সুসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতর কাব্য যে বাংলা ভাষার সম্পদ ও গৌরব বৃদ্ধি করিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। তাই ভাবিতে দুঃখ হয় যে, এতবড় একটা প্রতিভাও এক হিসাবে, "Inheritor of unfulfilled renown" হইয়া রহিল!

আর একটি বিষয়ে কিছু বলিয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। 'মেঘনাদবধে'র কবি কাব্যারম্ভে "মধুকরী কল্পনা"কে আবাহন করিয়া তাঁহার কাব্যরচনা-রীতির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাহারই ফলস্বরূপ গৌড়জনকে সুধাপান করাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছেন। সেই রীতিতে এইরূপ কাব্য সৃষ্টি করিয়া, মধুসূদন শুধু তাহাতেই সুধাপানের ব্যবস্থা করেন নাই—সে যুগের মৃতপ্রায় বাংলা কাব্যের পুনরুজ্জীবন-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে একেবারে নব্য রোমাণ্টিক কাব্যের আদর্শ—যে কারণেই হউক—গ্রহণ করেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে প্রাচীন মহাকবিগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে যুগের কাব্য-প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল; নতুবা অত্যধিক নবত্বের জন্য তেমন কাব্য-সৃষ্টি বিফল হইত। এই রীতির দ্বারাই যেমন বাংলা ভাষার বলাধান হইয়াছিল, তেমনই সাধু বাংলার ধ্বনি-প্রকৃতি হইতেই খাঁটি ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি হওয়ায় বাংলা কাব্যেরও নূতন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে ও নূতন সুরে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার ভাব, ভাষা, ছন্দের সেই অভিনবত্ব এইরূপ কাব্যের পূর্ব্বে দেখা দিলে, কেহ তাহা বুঝিত না—বাংলা কাব্যের সঙ্কট অবস্থা ঘুচিত না, সমস্যা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যদিও মধুসূদনের সেই আদর্শের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গণ্য করা যায়, তথাপি বাংলা ভাষায়, আধুনিক কাব্যরসের সহিত প্রথম পরিচয় সাধন করাইয়া দিয়া মধুসূদনই বাঙালী সমাজে যেটুকু

রসপ্রতিভা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ছন্দে ও ভাষায় যে খাঁটি কাব্যকলা, এবং উদার স্বাধীন কল্পনায় যে নূতনতর রসবোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহই এমনভাবে তাহা করেন নাই। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়, বাংলা কাব্যে আধুনিকতা অতঃপর যে পূর্ণ স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার আদি প্রবর্ত্তক মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ একেবারে ষোল আনা আধুনিক, বঙ্গসরস্বতীর অনবগুণ্ঠিত আধুনিক রূপ তাঁহার কাব্যে উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে—এ রূপ বাঙালী সহসা দেখিতে প্রস্তুত ছিল না, অনেক পরে দেখিয়াছে। মধুসূদন প্রাচীনকে যতদূর সম্ভব আধুনিকরূপে সাজাইয়াছিলেন, তাহাতেই আধুনিক কাব্যমন্ত্রে বাঙালীর প্রথম দীক্ষালাভ হইয়াছিল; এবং যাহারা মধুসূদনের কাব্যের সেই রসরূপ যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল তাহারাই, সেই কাল্‌চারের ফলে, রবীন্দ্রপ্রতিভার অভিনবত্বে অভিভূত হয় নাই, এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রথম সে প্রতিভা ও তাহার শক্তিকে বিশ্বাস করিয়াছিল। মধুসূদনের প্রধান কবি-ব্রত ছিল—পাশ্চাত্য ও ভারতীয় কাব্যসরস্বতীর মধ্যে মিলন সাধন করা, বাংলা ভাষায় ও বাঙালীর "বাসনা"য় কাব্যের সার্ব্বভৌমিক রূপটিকে ধরাইয়া দেওয়া। এই কার্য্যসাধনে বাধা ও ত্রুটীর কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে সাফল্যের পরিচয়ও ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে দিয়াছি। এই সাফল্যের আর একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নবম বা শেষ সর্গ। যে কল্পনায় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় কাব্যবস্তু এমনভাবে মিলিয়া একটি অখণ্ড রসরূপ ধারণ করিয়াছে; একই স্থান-কাল-পাত্রে অভারতীয় আদর্শের শ্মশান-যাত্রা ও একান্ত ভারতীয় সংস্কারের সহমরণ দৃশ্য এমন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে—সে কল্পনার মূলে আছে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তি। বিষাদের এ হেন শৌর্য্যরূপ—মহানিপাতের তামসিক অশৌচ-অবস্থায় এমন রাজসিকতার আড়ম্বর, আমাদের সংস্কারে ও সাহিত্যে ইহার মত অপরিচিত আর কিছুই নহে। তথাপি মধুসূদন তাহাকে কি সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন! পাশ্চাত্য কাব্যের সেই বিশিষ্ট বীররস যোদ্ধ-হৃদয়ে অবসাদের পরিবর্ত্তে গর্ব্ব সঞ্চার করিবার জন্য, মৃতবীরের শববাহী শোভাযাত্রার সেই যে শোক-গম্ভীর ঔদ্ধত্য-গাথা—মধুসূদন

তাহাতে এমন একটি সুর যোজনা করিয়াছেন যে, হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল অঙ্গ এবং বাঙালী কুলবধূর অনুমরণ দৃশ্যের নিখুঁত অনুলিপিও তাহার তালভঙ্গ করে নাই; তাহাতে বীরের বীর-অভিমান ও স্নেহ-দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ের বিয়োগবিধুরতা যেন ঐক্যতানে মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে একই অনলমুখে চিতাধূমের সঙ্গে বিবাহধূম মিলিয়া যে রাগিণীর সৃষ্টি করিল তাহাই অতঃপর সেই শ্মশানপ্রান্তবর্ত্তী সিন্ধুজলকে অকূল অশ্রুরাশির মত অনন্তকাল ধরিয়া তরঙ্গিত করিতে লাগিল। এই নবম সর্গে যেমন কাব্যেরও সমাপ্তি হইয়াছে, তেমনই, আমি যাহাকে মধুসূদনের বিশিষ্ট কবিশক্তি বলিয়াছি—বিভিন্ন কাব্যধাতুকে গলাইয়া একই ছাঁচে ঢালিবার সেই শক্তি এই শেষ সর্গেই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রসঙ্গ কথা

জামসেদপুর

এবার সাহিত্যের বড় জলসা জামসেদপুরে বড় জমিয়াছিল—অনুপ্রাস আপনি আসিয়া পড়িল; যদিও শীতও যেরূপ জমিয়াছে, তাহাতে আবহাওয়াটা অনুপ্রাসের অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশেরই অনুকূল। ইহাতেই বুঝিতেছি, আসরে উপস্থিত থাকিলে ফিরিয়া আসিয়া "কি ঠাউর জ্বালাম চাচা" বলিয়া হয়তো একটা গানই বাঁধিয়া ফেলিতাম। রাজ্যরত্ন, রাইবেঁশে ও রায়-হাকিম এই তিন মহাকুলীন চাকুরিয়ার মারফতে এবারে বঙ্গ-সরস্বতীকে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতিশয় যুগোচিত, অর্থাৎ আধুনিক বাঙালীর ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম সাধনার উপযোগী হইয়াছে। যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রতধারীর মত শুদ্ধচিত্তে সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বড় চাকরি করেন না বলিয়া যাঁহারা ছোটলোক, ধুতি পরেন বলিয়া নিতান্তই বাবু আদমী, এবং সেইজন্যই রেলে ষ্টীমারে ফার্স্ট বা সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী হইবার অনুপযুক্ত, তাঁহাদের কাহাকেও এত বড় একটা ধুমধামের বারোয়ারীতে সম্মানের আসন দিতে বাধিবারই কথা,

লোক হাসিবে যে! যে জাতির ভাষায় 'বড় মানুষ' অর্থে 'টাকার মানুষ', তাহার মজ্জাগত প্রবৃত্তি যাইবে কোথায়? পদ ও প্রতিপত্তি, উপাধি ও ধনখ্যাতিকে একালের বাঙালী যেমন পূজা করে, এমন বোধ করি পূর্ব্বে কোন কালে করিত না—করিলে, প্রায় হাজার বৎসরের পরাধীনতায় হিন্দু সমাজ আজও টিকিয়া থাকিত না। কিন্তু আজ সেই বাঙালী এমনই ধর্ম্মহীন হইয়াছে যে, সাহিত্যের নামেও যখন তাহারা সামাজিকতা করে, তখনও দুদিনের জন্যও, শ্ব-বৃত্তির গৌরব-ধ্বজা না তুলিয়া পারে না! বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে কি চেনাই চিনিয়াছিলেন! * * *

এবারকার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি ও মূল সভাপতি নির্ব্বাচনের সংবাদ আমরা অতি বিলম্বে পাইয়াছিলাম—পাইয়া বিলম্বের কারণ অনুমান করিয়াছিলাম। বহু সন্ধানের পর এমন রত্ন মিলিয়াছে, তাই এত বিলম্ব। মূল সভাপতি যিনি হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বাংলা সাহিত্যের কোন প্রকাশ্য সম্পর্কের কথা আমরা জানিতাম না; তিনি একজন অতি উচ্চপদস্থ ও বিদ্বান প্রবাসী বাঙালী, ইহাই জানিতাম। তাঁহার 'রাজ্যরত্ন' উপাধি দেখিয়াও বিস্মিত হই নাই—কি প্রবাসী, কি স্ববাসী বাঙালী সমাজের তিনি যে একটি অলঙ্কার ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সেবা অথবা সেই সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রেমের কোন পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। তাই ভাবিয়াছিলাম, এ হেন পদস্থ ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার বাসনা জামসেদপুরের যশস্বীদের কেন হইল? পরে ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলাম, সভাপতির আসনখানি ভিতরে ভিতরে রাইবেঁশে-নাচের নটবরের জন্যই বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—'রাজ্যরত্ন' মহাশয়ের সে সম্মান সহ্য হইল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি! অথবা ভাগ্যবানই বলিতে হইবে। তাঁহার অভিভাষণও শূন্যে ঝুলিতে লাগিল, কারণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে যিনি সেই মূল সভার উপপতিত্ব করিয়াছিলেন তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন, রাইবেঁশে কায়দায় সরস্বতীর উদ্দেশে একটা তাল ঠুকিয়া দিলেন। সাহিত্য-সভা জমিয়াছিল ভালই—সভায় বহু সারস্বতজন সমবেত হইয়াছিলেন; বহু মহা-মহা সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যিক দূর হইতে পত্র বা বাণীযোগে সভার

বায়ুমণ্ডলে তাড়িৎ সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল শ্রীনরেন্দ্র দেবও এইভাবে সভার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন; আমাদের গিরিজাদাদাকে কিন্তু দেখিলাম না। * * *

সাহিত্য-শাখার সভাপতি-নির্ব্বাচনই কিন্তু একেবারে টেক্কা-দেওয়ার মত হইয়াছে—রতনেই রতন চেনে! হায় দিলীপ রায়! হায় নরেন্দ্র দেব! হায় বিজয়লাল! হায় প্রবোধ সান্যাল! 'কি ছাঁ-ই বেড়ালে খেলে!' রায় হাকিমের চেয়ে তোমরাই বা কম কিসে? কিন্তু যাহাদের নজর উঁচু—আই. সি. এস.-এর নীচে যাহারা চাহিবে না, তাহাদের সমাজে কল্কে পাওয়া তো সহজ নয়। তাহারা পয়সা খরচ করিয়া যাত্রা শুনিবে—ভাল সংই চাই; কিন্তু শুধু আধুনিক মার্কা হইলেই চলিবে না, কোটপ্যাণ্ট-পরা বিলাতী ঢংটুকুও চাই। রায়-হাকিমের অভিভাষণের যে চুম্বকটুকু পত্রিকায় পড়িলাম, তাহাতে বড় সুখী হইয়াছি—ঠিক ওই জিনিস না হইলে জামসেদপুরের জামবাটীতে মানাইত না। যেমন বিয়ে তার তেমনই পুরুত। কবিরা চিরকালই নিরঙ্কুশ; এখনকার কবি বলিতে ঔপন্যাসিকও বটেন, অতএব আরও নিরঙ্কুশ; তার উপরে তিনি যদি হাকিম হন তবে অঙ্কুশের বাবাও তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না; তিনি যেখানেই যান দেখেন, চারিদিকে পেশকার ও আমলার দল বসিয়া রহিয়াছে—শ্রীমুখে যাহা বলিবেন তাহাই অমৃত। সাহিত্যের এমন ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা বিচার বোধ হয় আর কেহ করিতে পারিত না—এ অভিভাষণ যেমন মৌলিক, তেমনই কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে রচিত; বাংলা সাহিত্যের যে দ্বিতীয় শৈশব উপস্থিত হইহাছে, তাহাতে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। জয় জামসেদপুরকি জয়। থুড়ি, থ্রী চীয়ার্স ফর জামসেদপুর। * * *

কিন্তু রাজ্যরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাঠে-মারা-যাওয়া অভিভাষণটির সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। ইংরেজীতে লেখা বটে—সেজন্যে শুধুই লেখকের নয়, আমাদেরও লজ্জা পাইতে হয়। তথাপি এ যাবৎ প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিদের যত অভিভাষণ পাঠ হইয়াছে—এই অভিভাষণ তাহাদের সকলের মধ্যে পাণ্ডিত্যে, বৈদগ্ধ্যে ও চিন্তাশীলতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ অভিভাষণের যথার্থ মূল্য

বুঝিতে হইলে আমাদিগকে এক যুগ আগে ফিরিয়া যাইতে হইবে—যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্বান বাঙালীদিগকে মাতৃভাষার সেবায় আহ্বান করিয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করিয়াছিলেন। আজ বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা—বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায় যে মহামূর্খতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, বাংলা সাহিত্যিক বলিতে আজ যে শ্রেণীর পণ্ডিতদের কথা মনে হয়—তাহাতে এই অভিভাষণ পাঠ করিয়া বাংলা সাহিত্যের জন্য দুঃখ বোধ করিয়াছি। সাহিত্যের স্রষ্টারূপে না হইলেও সমঝদার ও বিচারক রূপেও এমন চিত্তপ্রকর্ষসম্পন্ন পণ্ডিত ও স্থিতধী ব্যক্তি দুইচারিজনকে যদি আমরা পাইতাম, তবে বাংলা সাহিত্যের এই অন্ধকারযুগে কিছু আলোর আশা করিতে পারিতাম। এই অভিভাষণে বক্তার শুধু পাণ্ডিত্য নয়, যে স্থিরদৃষ্টি ও দৃঢ়তা এবং যে বলিষ্ঠ মনস্বিতার পরিচয় রহিয়াছে, তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উনবিংশ শতাব্দীর সেই ভূদেব-রমেশ-বংশীয় বাঙালী বলিয়া মনে হয়। এ যুগের মর্কটদিগের মধ্যে এ চেহারা ক্রমশই বিরল হইয়া পড়িতেছে। অভিভাষণটির মধ্যে একটি স্থান আমাদের বড়ই কৌতুককর বোধ হইয়াছে—বক্তা যেরূপ বুদ্ধিমান, তাহাতে জবান সম্বন্ধে খুবই সাবধান হইবারই কথা। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে ওয়াকিবহাল আছেন, তার প্রমাণ তাঁহাকে দিতেই হইবে, নতুবা এই 'মান্নাদের জাত'-এ তাঁহার কথা কেহই শুনিবে না। তাই তিনি কবিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব ও সমালোচকশ্রেষ্ঠ আবু সয়ীদ-এর নাম লইয়া ভূতের ভয় কাটাইয়াছেন। আধুনিকতম বাঙালী সমাজে যেমন সিনেমা-অভিনেত্রীরাই সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর স্থান অধিকার করিয়াছেন, আধুনিকতম সাহিত্যেও তেমনই ইঁহারাই মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের স্থানে বিরাজ করিতেছেন; ইঁহাদের কুখ্যাতিই ইঁহাদিগকে সর্ব্বজনবরেণ্য করিয়াছে। এ সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে নর্দ্দমার কথাটাই যে বড় হইয়া উঠে! বাংলা সাহিত্যের এই প্রগতিই যে তাহার পরাগতি!

বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ

এবারকার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল—বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ

ও তাহা সর্ব্বজনমান্য করিবার উপায়। যাঁহারা এই সমস্যাটি এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক প্রবৃত্তির সঙ্গে রফা করিতে উৎসুক হইয়াছেন, অথবা তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত বলিয়া তাহাকে জাতে তুলিয়া লইতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। নতুবা, বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা সত্যকার সাহিত্যের দিক হইতে ভাবনার বিষয় হইলেও, বাংলা ভাষা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে সমস্যা সৃষ্টি করিবার মত গুরুত্বপূর্ণ এখনও হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত (রবীন্দ্রনাথের আধুনিক খেয়াল বা লীলা-বিলাসের ভাষা বাদ দিয়া) বাংলা গদ্যের যে ভাষা বিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার মজ্জা বা মেরুদণ্ড এখনও ভাঙে নাই এবং ভাঙিবার আবশ্যকতাও ঘটে নাই। আমাদের সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ এখনও লিখিত হইতেছে তাহার ভাষা, এবং এখনও যে সকল লেখক উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস লিখিতেছেন, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন—তাহার ব্যক্তিগত স্টাইল যেমনই হউক, তাহাও সেই আদি সাহিত্যিক ভাষা; সেই ভাষাই সর্ব্বজনবোধ্য এবং সকল সুস্থমস্তিষ্ক শিক্ষিত ব্যক্তির শিরোধার্য্য হইয়া আছে। আমাদের দেশে যে কয়খানি উচ্চশ্রেণীর বনিয়াদি সংবাদপত্র আছে, তাহাদেরও ভাষার আদর্শ এখনও টলে নাই, এবং সেই ভাষাতেই সর্ব্ববিধ সংবাদ, তথ্য ও তত্ত্ব, মন্তব্য ও সমালোচনা, এবং সংবাদ-জাতীয় যাবতীয় সাহিত্য সকলের ঘরে সরবরাহ করা চলিতেছে। অতএব হঠাৎ আধুনিক বাংলা ভাষার রূপ লইয়া এ সমস্যা উঠিল কোথা হইতে? কাহারা সেই রূপটিকে জাহির করিয়া তাহাকে সর্ব্বজনমান্য করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে? এবারকার এই সাহিত্যযজ্ঞে যে সকল দেবতাকে আবাহন করা হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, এ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ সেই মন্ত্রের ঋষি—যে মন্ত্রে সাহিত্যের আধুনিকতাকেই বরণ করা যাইতে পারে; এই আধুনিকতা আর কিছুই নয় ইঙ্গভাব বা প্রগতিপন্থা। যাহারা সাহিত্যের উৎকর্ষ বলিতে নূতন বুলির ভঙ্গিমা ও ফ্যাশনের মহিমাই বোঝে—ভাষার ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি, তাহার আভিধানিক বিশুদ্ধি এবং সংস্কৃতিমূলক সুষমা বুঝিবার মত শিক্ষা বা সাধনা যাহাদের

নাই; যাহারা কেবল অবসর-বিনোদনের জন্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর নাটক নভেল পড়ে, এবং সখের নাট্য-সম্প্রদায় গড়িয়া উচ্চাঙ্গের রসশিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকে—আজকাল এই ডিমোক্রেসির যুগে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য তাহারাই হইয়াছে সাহিত্যের অভিভাবক, রসগ্রাহী পাঠক ও বিচারক। এ ভাষা-সমস্যাও তাহাদেরই সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হইয়াছে, এবং এই হুজুগে তাহারাই একটু মোড়লি করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক বাংলা ভাষার রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইবার কারণ নিশ্চয় ইহাই যে, তাহারা হ্রস্বদীর্ঘ ও ণত্বষত্বহীন বানান এবং বীরবলী ঢঙের চুটকী-ভাষার বড়ই পক্ষপাতী। সাহিত্যিক বিদ্যা ও বাংলা ভাষার জ্ঞান, এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ রুচি ও রসবোধ যাহাদের আছে, তাহারা এমন সমস্যার কথা ভাবিতেই পারে না। তাহারা জানে যে, ভাষার যে রূপ-পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কাহারও খেয়াল-খুশিতে হয় না—সে বিবর্ত্তন জৈব বিবর্ত্তনের মত, তাহা কেহ নিরূপণ করিয়া দেয় না, আপনার ধাতুপ্রকৃতির মধ্যেই সেই বিবর্ত্তনের নিয়ম আছে। যুগে যুগে যুগন্ধর কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়—তাঁহাদের প্রতিভার বলে ভাষা তাহার genius বা মূল জাতি-স্বভাব বজায় রাখিয়াই নব নব ভাব ও চিন্তাভঙ্গিকে প্রকাশ করিবার মত অঙ্গধারণ করে; সে পরিবর্ত্তন জল হইতে মাটি জাগিয়া ওঠার মত—এমন ভাবে হয় যে, তাহা যখন সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহাকে আর মানিয়া লইবার প্রশ্নই ওঠে না, সে ইতিমধ্যেই আপন অস্তিত্বের দ্বারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে যদি কাহারও সমস্যা হয়, তবে তাহা জনসাধারণের সমস্যা নহে; নিজেরা প্রবুদ্ধ হইয়া জাতির আত্মাকে যাঁহারা প্রবুদ্ধ করেন, ইহা সেই কবি, ঋষি, মনীষী, ও বাণী-শিল্পীদিগের সমস্যা। সে সমস্যার সমাধানও করেন তাঁহারাই। জনগণের মনে যদি এরূপ সমস্যা জাগে তবে বুঝিতে হইবে, সাহিত্যের বড়ই দুঃসময় পড়িয়াছে—উৎকৃষ্ট লেখকের অভাব ততটা নয়, যতটা অভাব হইয়াছে সমঝদার পাঠকমণ্ডলীর। * * *

আমরা ইহাও জানি যে, 'আধুনিক বাংলা গদ্য' বলিয়া একটা ভাষার

বড় তারিফ ও গর্ব্ব আজকাল একটি তথাকথিত সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর গোষ্ঠগৃহে বড়ই সোরগোল সহকারে চলিতেছে। বেশি নয়, গুটি পাঁচ ছয় মহা ওস্তাদ মিলিয়া একটি নূতন ভাষা তৈয়ারি করিয়াছেন —গদ্যে ও পদ্যে তাহার জৌলুষ দেখিয়া বিলাতের সাহেবেরা সচকিত হইয়াছেন। এই ট্যাস-সাহিত্যিকেরা মাতৃভাষার প্রতি বিতৃষ্ণা, অথবা সে ভাষার সহিত সম্যক পরিচয়ের অভাবে—পিতৃভাষাকেই আদর্শ করিয়াছেন, এবং নিজেরা জাতি হারাইয়া পরের জাতি মারিবার জন্য নানা রকমের প্রোপাগাণ্ডা করিতেছেন—নূতন বাণীভবন করিয়া নিজেদের জয় নিজেরাই ঘোষণা করিবার জন্য পুস্তক প্রকাশিত করিতেছেন, মজলিসে-বৈঠকে বসিয়া, ইনি উঁহার এবং উনি ইঁহার, অসামান্য প্রতিভার তারিফ করিতেছেন; বাংলা দেশের মধ্যেই একটি বিলাতী কুঞ্জকানন বানাইয়া বিলাতী বাংলায় কলকূজন করিয়া চিত্তপ্রকর্ষ ও নিজ নিজ সাহিত্যিক কীর্ত্তির রোমহর্ষ অনুভব করিতেছেন। বাংলা গদ্যভাষার আধুনিক রূপ সম্বন্ধে যাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমরা একটি অমূল্য সংবাদ দিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম। অতি-আধুনিক সাহিত্যের একজন অবতারনামা লেখক কোন এক বৈঠকে ফতোয়া দিয়াছেন যে, আধুনিকতম স্টাইলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাংলা লেখক সেই ব্যক্তি, যাঁহার ভাষা এইরূপ—

সে-ফ্যাশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বুদ্ধদেব বসু উনিশ শতকের খেয়ালী সুরকে সাহস এবং কৃতিত্বের সংগে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অবশ্য বিশ শতকের রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ উনিশ শতকের ধুয়োমাত্র হতে পারে না, যদি হয় তা হ'লে বুঝতে হবে যে, কবির ইন্দ্রিয় অসার, তার মন অসংবেদনশীল। কবিতার প্রগতি সম্বন্ধে যতোই তর্ক উঠুক, তার পরিবর্ত্তন অবিসংবাদিত। বুদ্ধদেবের খেয়ালী মনও তাই মাঝে মাঝে বিংশ শতাব্দীর আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়, অমৃতস্য পুত্রদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তবে সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লব তার চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন করে অধিকার করেনি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দে-র চিত্তকে। Eternal verities নিয়ে ব্যস্ত থাকবার মতো মনঃসঙ্কলন এখনো তাঁর রয়েছে। বিশেষ করে, তিনি যে এখনো প্রেমের কবিতা লিখছেন এটা সৌভাগ্য বলেই গণ্য করি। বিষ্ণু দে-র সতর্কবাণী সত্ত্বেও যে "প্রেমে পতন ছাড়া কিছুই নেই," আশা করি আমরা এখনও প্রেমে পড়ে থাকি।

মহালেখকের এমন বাণী সত্ত্বেও ("আশা করি আমরা এখনও প্রেমে পড়ে থাকি") আমরা এ ভাষার প্রেমে পড়িতে পারিলাম না।

প্রশ্ন

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুক্‌রো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়

চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।
পষ্ট আলোর সৃষ্টি পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি?
কালস্রোতের তীরে ব'সে
কে দেয় আকাশ নিংড়ে,
এই যে কী সব লাফিয়ে আসে
এরা কি উচ্চিংড়ে?
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।

বাঁধনটাকেই অর্থ ব'লে
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।
ঐ তো হোথায় গাছ উঠেছে
ঐ যে পাখি ওড়ে,
মানুষ করে হানাহানি
এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে।
যুগান্ত যেই মেলবে কবল
ঢুকবে বিরাট ফাঁকে,
কোথাও কিছু র'বে কি না
প্রশ্ন করব কা'কে॥

২১ পৌষ, ১৩৪৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোভিয়েটে শনিবার

লেনিনগ্রাদ। মাঘ মাস। ধরণী শ্বেত বস্ত্র ধারণ করেছে। নদীর ধারের ছোট্ট কাঠের কুঁড়েঘর থেকে অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত শুভ্র তুষারের মুকুট পরেছে। পল্লবহীন বৃক্ষগুলোর শুধু অস্থিপঞ্জর দেখা যাচ্ছে। 'নীভা' নদীর বক্ষস্থল শীতে জ'মে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেই বরফের স্তর এত মোটা আর শক্ত যে, মানুষ তার ওপর দিয়ে হেঁটে নির্ভয়ে নদী পার হচ্ছে। ছোট ছেলের দল সারাদিন সেইখানে স্কেট করে। তাদের মাথার ওপর ঝ'রে-পড়া শুভ্র তুষারের কিরীট।

দশটা বাজলেও মনে হচ্ছে যেন বেলা বাড়ে নি। সেই সময়েই মিউজিয়মে আমার কাজ আরম্ভ হয়। ছুটি পাই চারটেয়। তখন সাঁঝের আঁধার আসে ঘনিয়ে। কাজের মধ্যে থাকলেও অবসর পেলেই জানলার বাইরে উঁকি দিই। চোখের সামনে নদীর ওপারে দেখা যায়—ঘোড়ায় চড়া প্রথম পিটারের বিশাল তাম্রমূর্ত্তি। ঘোড়া সামনের দুই পা তুলে হাওয়ায় যেন উড়তে থাকে, আর আমার মন তার চেয়েও বেশি বেগে, আরও দূরে, আরও উঁচুতে যায় উড়ে।

আজ পঞ্চম দিন। সোভিয়েটের সপ্তাহ থেকে রবি সোম মঙ্গল প্রভৃতি নামকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে সপ্তাহ হয় ছ দিনে। আমরা প্রথম, দ্বিতীয় দিন গুনতি ক'রে পাঁচ দিন কাজ করি, আর ষষ্ঠ দিন থাকে আমাদের ছুটি। তাই অন্য দেশের ভাষায় আমরা এখানকার পঞ্চম দিনের নাম দিতে পারি শনিবার। এই দিনটা হ'ল আমাদের উইক-এণ্ড, তাই আমরা এই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকি খুব

উৎসুক হয়ে। বিশেষ ক'রে, যুবক-যুবতীদের মনে এই পঞ্চম দিনের প্রভাত থেকে বাজতে থাকে একটা চাঞ্চল্যের সুর। যে সময় তুষার-বৃষ্টি হয় আর 'শীতের-খেলা'র সুবিধে থাকে, সে সময়ে এই পঞ্চম দিনের জন্যে আমরা খুবই ব্যগ্র থাকি।

গত কয়েক দিন ধ'রে রাত্রিবেলায় খুব তুষার পড়েছে। গত দুদিন দিনের বেলাতেও র'য়ে র'য়ে হয়ে যাচ্ছে ধোনা তুলোর মত তুষার-বৃষ্টি। চোখের সামনে পিটারের মূর্ত্তিটা দেখা যায় ঝাপসা ঝাপসা। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে—সূর্য্যের মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যাবার সময় সেখানে দেখা দিয়েছিল একটা অদ্ভুত চমক। সবই হয়ে গিয়েছিল সোনালী। সব জিনিসের ভেতর থেকে উঁকি মেরে ফেটে পড়ছিল প্রাণ। তার পেছনে ছিল জাগ্রত জীবনের সমুদ্র—যেখানে ওঠে আনন্দের ঢেউ, আর সৌন্দর্য্য করতে থাকে কল্লোল।

আমার বুক করতে লাগল লাফালাফি—সে আর না থাকতে পেরে সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে।

২

এস, চল যাই।—শুনলাম একটা কাকলি। সে আমার সঙ্গিনী—খেলার সাথী। গায়ে দিয়েছিল একটা রুশীয় ওভার-কোট—গলা ছিল বড় বড় 'ফারে' ঢাকা। ওর ভেতর জড়িয়ে ছিল সদ্য-ফোটা কুমুদের মত মুখখানি। চোখ দুটো খঞ্জনপাখীর মতই চঞ্চল। কোটটা ছিল গায়ে আঁট, তাই সেই মোটা কাপড়ের বন্ধন থেকে ওর সুগঠিত দেহ বিদ্রোহীর মত বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। শরীরের গঠন ছিল 'খেলোয়াড়ী' যুবতীর মডেলে তৈরি। সুস্থ চেহারা আর মাখনের মত স্নিগ্ধ হাসি, সকলকে যেন টিটকারি দিচ্ছিল।

চল।—ব'লে বেরিয়ে পড়লুম। কোন্ দিকে, কোথায়, কেন—এই সব ব্যর্থ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন আমাদের কোন দিনও থাকত না। আর সেদিন তো সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম বরফের ওপর লাফাবার স্কেট।

ফুটপাথে এসে আমরা হাতে হাত জড়িয়ে লাগলাম হাঁটতে। শিষ্টাচার ও সামাজিকতার দিক দিয়ে এর এত দরকার ছিল না, যতটা ছিল প্রয়োজনের দিক দিয়ে। বরফ এত বেশি পড়েছিল যে, তখনই ওকে পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল না; জ'মে শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পথ হয়েছিল পিচ্ছিল। দুজনে হাতে হাত দিয়ে নিলে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা যায় ক'মে; আর পড়লেও দুজনেই পড়ব, অর্থাৎ কারুর লজ্জা পাবার কারণ নেই।

আমরা সোজা রিংকের (স্কেট করবার জায়গা) রাস্তা নিলাম। ট্রামে গেলে পুল পার হয়ে যেতে হয়, তাতে বেশি মজাও ছিল না। আমরা 'নীভা'র গর্ব্বোৎফুল্ল বক্ষঃস্থল দ'লে খুব সহজেই পারে গিয়ে পৌছলাম।

রিংকের ফটকে আমাদের মত আরও অনেক জোড়া জড় হয়েছিল, যদি আমাদের দৃষ্টি আগে ওদের ওপর পড়ত তো আমরা বলতাম, "জ্‌দ্রাস্তই ওয়াল্যেয়া কোল্যেয়া জ্‌দ্রাস্তই" (বান্ধবী নমস্কার, নমস্কার বন্ধু)। ওদের নজর পড়লেও আগে নমস্কার করত আমার সঙ্গিনীকে, তারপর আমাকে। শেকহ্যাণ্ড করতাম তাদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে থাকত বেশি ঘনিষ্ঠতা। আর যাদের হৃদয়ের উত্তাপ হাত পর্য্যন্ত পৌছবার আশা করতাম, তাদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড হ'ত দস্তানা খুলে। তারপর বরফের কঠোরতা, কোমলতা বা স্নিগ্ধতার পরীক্ষা করতে করতে আর আবহাওয়ার গুণ গাইতে গাইতে আমরা পোশাক ছাড়বার

ঘরে ঢুকতাম। আমাদের সকলেরই থাকত বরফে নামবার তাড়া—তাই তাড়াতাড়ি স্কেট লাগাতে আরম্ভ করতাম।

আমি যদি আগে তৈরি হতাম, তবে আমাকে আটকে রাখবার জন্যে সঙ্গিনী ক'রে উঠত, উঃ উঃ। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলত, ফিতে বড় লাগে। আমার রুমালটা পাট ক'রে সেখানে লাগিয়ে দিতাম। তারপর সে আমার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠত। ওর একজন বন্ধু এসে আমাদের মুখে দিয়ে দিত লজেঞ্জেসের এক একটা টুকরো। সকলেই ব'লে উঠতাম, এক, দুই, তিন। এক লাফে পৌছে যেতাম বরফের ওপরে। পরিচিত অপরিচিত সকলকে টানতে টানতে আর ধাক্কা দিতে দিতে লাগতাম বরফের ওপর ছুটতে।

৩

ওপরে বিজলী বাতির চন্দ্রাতপ। ওর চমকে নীচের নিষ্কলঙ্ক বরফ আয়নার মতই হয়ে উঠেছে বিচ্ছুরিত। একবার সমস্ত রিংকটাকে ঘুরে দেখবার জন্যে আমরা খুব জোরে স্কেট দিলাম চালিয়ে—সঙ্গিনীকে নিয়ে আর সকলকে 'জ্‌দ্রাস্তই' (অভিনন্দন) জানাবার দরকার ছিল। যদি কোন সঙ্গিনী আমাদের তালে না চলতে পারে বা ধাক্কা খেয়ে মাটি চুম্বন করে, তা হ'লে আমাদের গতি দিই কমিয়ে, তাকে তুলে নিই। সে মুচকে হেসে বরফের টুকরোগুলো নিজেই ঝাড়তে থাকে; আর যে ধাক্কা দেয় তাকে দেওয়া হয় দণ্ড। তাকে আলিঙ্গন ক'রে আর ওর হাতে হাত জড়িয়ে সমস্ত রিংকটা ঘুরে আসতে হয়—এই দণ্ড।

অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী যদি চায় বিশ্রাম, তখন মনে পড়ে যে, তার

ক্ষিদে পেয়েছে। আমরা স্কেট প'রেই রিংকের একধারে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকি। আমাদের সামনে আসে দুধ-চিনি-বিহীন খাঁটি চা আর পনির-মাখা রুটির টুকরো। দলের মধ্যে যদি কারও 'লজেঞ্জেস' বেঁচে থাকে, তবে সে এক এক টুকরো আমাদের দেয়। সেই টুকরো মুখে রেখে আমরা চায়ে দিই অল্প অল্প চুমুক। এই অবকাশে আমার দৃষ্টি পড়ে সঙ্গিনীর চেহারার ওপর। ওর গাল করে টাটকা আপেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু ওর ঠোঁট তার চেয়েও বেশি লাল, তার তুলনা করি আমি কাটা তরমুজের সঙ্গে, আর সে যায় চ'টে। আমার হাত ধ'রে টেনে এনে রিংকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই সময় রিংকের এক ধার থেকে ভেসে আসে ব্যাণ্ডের সুর। আমাদের পা অজানতে তার তালেই চলতে থাকে। শুধু এই ভাবে রিংকে বেড়ানো আর ভাল লাগত না। ব্যাণ্ড-মাস্টারকে আমরা একটা নাচের সুর আরম্ভ করতে বলি। সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়ী দলের নৃত্য আরম্ভ হয়ে যায়।

কিন্তু এই নাচগুলো তো পুরনো হয়ে গেছে।—এক খেলোয়াড়ী সঙ্গিনী ব'লে ওঠে।

আর একজন ওকে সমর্থন ক'রে বলে, এ নাচে আমাদের আনন্দের সম্যক স্ফূর্তি হচ্ছে না।

আমাদের দলের নেতাও ব'লে উঠল, তা হ'লে চল, আর এক নতুন রকমের নাচ আরম্ভ করি।

সে কি রকম?

এক্ষুনি বলছি, না, দেখিয়ে দিচ্ছি।—বলতে বলতে সে ব্যাণ্ডওয়ালার কাছে যায়। ব্যাণ্ড মাজুরকা (এক রকম পুরানো ধাঁচের রুশীয় নৃত্য) আরম্ভ করে।

যখন এই নৃত্যটাও একঘেয়ে লাগে, তখন আমরা জীবন থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন নাচের উদ্ভাবনা করতে থাকি।

আজ আমরা প্রজাপতি, না, শিখী নৃত্য করব।—ব'লে ওঠে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ স্কেটার ইয়াস্কা এরমিলাই—এটা ব্যালেটের মত হবে, একটা গল্প থাকবে, তার প্রকাশ হবে বাক্যে নয়, ভাবে আর নৃত্যে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, তবে গল্পটা বল।

এক ছিল ময়ূর আর এক ছিল ময়ূরী।—ইয়াস্কা গল্প আরম্ভ করে আর সঙ্গে সঙ্গে নাচের ভঙ্গিমা দেখায়। ময়ূরের ছিল নৃত্যের অভিমান আর ময়ূরীর ছিল রূপের। দুজনেই পরস্পরের রূপে ও গুণে থাকত মুগ্ধ, সৌন্দর্য্যের দেব আমুরের, ওদের ভালবাসা দেখে বড় হিংসে হ'ত। সে স্থির করলে, যদি ময়ূরকে নৃত্যে পরাস্ত করতে পারে, তবে ময়ূরী তার দিকে হবে আকৃষ্ট। সে নৃত্যশিক্ষক মেঘের সঙ্গে করলে ষড়যন্ত্র, তারপর উদয় হ'ল ময়ূর-ময়ূরীর কাছে।

মেঘ ধারণ করলে এক সুনয়না নারীর রূপ। সে নিজের পাখা মেলে ময়ূরকে আকৃষ্ট করবার জন্যে সুরু করলে তার নৃত্য। ময়ূরীর কাছে যাতে লজ্জিত হতে না হয়, সেজন্যে ময়ূরও নিজের নাচ আরম্ভ করলে। তারপর ময়ূর আর মেঘের চলল নৃত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেউ রাজি নয় হার মানতে। এই নৃত্য চলল তিন দিন তিন রাত্রি ধ'রে। ময়ূর নৃত্যে হারাল সম্বিত। মেঘ একটু আঁধার সৃষ্টি ক'রে ওকে লোভ দেখিয়ে পেছনে হটতে লাগল। ময়ূরও সেই অন্ধকারে অনেক দূর চ'লে গেল মেঘের সঙ্গে। তারপর নামল আমুর ধনুক নিয়ে নৃত্য করতে। ময়ূরী হাতে নিলে ময়ূরের খ'সে-পড়া একটা পাখা, ব'লে উঠল, ময়ূর দূরে থাকলেও আমি তোমায় পরাস্ত করতে পারি। আরম্ভ

হ'ল আমুর আর ময়ূরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমুরও পিছু হটে ময়ূরীকে নিয়ে নিজের দেশে গিয়ে পৌছল।

যখন মেঘকে পরাস্ত ক'রে ময়ূর বাড়ি ফিরল, তখন ময়ূরীকে না দেখে ওর ভারী দুঃখ হ'ল। সে ব্যগ্র হয়ে বেরুল ময়ূরীকে খুঁজতে। সকল দেশের সকল রাস্তায় নিজের নৃত্য দেখিয়ে সে বেড়াতে লাগল, যাতে ময়ূরী ওকে দেখতে পেয়ে ওর কাছে চ'লে আসে। এমনই ক'রে সে গিয়ে পৌছল সবচেয়ে উত্তরে—আমুরের দেশে, যেখানে আমুর ময়ূরীকে রেখেছিল বন্দী ক'রে। আমুরের দেশে সকলেই পারত নাচতে। ময়ূরের নৃত্যের সঙ্গে সেখানে লাগল সকলের দ্বন্দ্ব। সাত দিন সাত রাত ধ'রে নৃত্য চলল। অবশেষে ময়ূরের হ'ল জয়। সে দেশের লোকেরা বাধ্য করলে আমুরকে তার নিজের ধনুক ময়ূরকে দিয়ে দিতে। সেই ধনুক ময়ূর নিজের ভ্রূতে নিলে লাগিয়ে। তারপর ময়ূর খুব গর্ব্বের সঙ্গে ময়ূরীকে নিয়ে নৃত্য করতে করতে আমাদের রিংকে এসে পৌছল।

ইয়াস্কা নিজের সঙ্গে খাপ খায় এমন একটি সুন্দরী সঙ্গিনীকে টেনে নিয়ে ময়ূর-নৃত্য সুরু ক'রে দিলে। সে নিজে হ'ল ময়ূর। আমাদের দল বিভক্ত হয়ে গেল, ময়ূর, ময়ূরী, মেঘ আর আমুরে। যারা খুব ভাল স্কেট করতে পারে না, তারা চারিদিকে গিয়ে হাততালি দিতে লাগল। যখন আমুরের দেশের নৃত্যের জায়গায় এসে পৌছানো গেল, তখন তারা হ'ল সেই দেশবাসী।

যখন ঘড়িতে 'একটা' বাজল, তখন আমাদের কারুর বিশ্বাসই হ'ল না। আমরা সকলে ভেবেছিলাম, ঘড়িই মিথ্যা বলছে। কিন্তু রিংকের ফটক বন্ধ হবার সময় হয়ে গিয়েছিল। স্থির হ'ল পরদিন স্কীয়েতে—ময়ূর-ময়ূরীর গল্পটা শেষ হবে।

৪

তখন সকাল পাঁচটা। সঙ্গীরা এসে আমায় জাগালে। এই সময় অর্দ্ধেক রাত্রির মতই বোধ হচ্ছিল। যে স্টেশন থেকে ফিন্‌ল্যাণ্ডের দিকে রেল যায়, আমরা সেই স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। 'স্কী' করতে ইচ্ছুক, এমন অনেকে সেখানে জড়ো হয়েছিল। মেয়েদের পোশাক গিয়েছিল পাল্টে। অধিকাংশের গায়ে ছিল স্পোর্ট-জ্যাকেট, যাতে ওদের বুকটা দেখাত একেবারে গোল। সবারই হাতে ছিল মাথা থেকে আর এক হাত উঁচু 'স্কী'। তার মাথাটা ছিল ছোট নৌকোর মত উঁচু আর তার আগাটা ছিল শুঁড়-তোলা নাগরার মতই। তার ছায়া পড়েছিল মেয়েদের দেহের ওপর। তাই ওদের চেহারাগুলো দেখাছিল লম্বা এবং সূচ্যাগ্র—বাস্তবিকই যুবকদের হৃদয় ভেদ করবার মত।

আমাদের ট্রেন পৌছল 'পোগ্রানিচ্‌নয়া'। ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে এই যুদ্ধের আগে রুশীয় সীমা এখানেই শেষ হ'ত। আমাদের ডান দিকে ছোট ছোট পাহাড়। তার মাথায় গায়ে চীরগাছের বন, দিগন্তে একটা রেখায় মিলিয়ে গিয়েছিল। স্টেশন থেকে নেমে আমরা চললাম ওই দিকেই। প্রথম পাহাড়ের মাথায় পৌছতে পৌছতেই সূর্য্য উঠে পড়ল। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা দুনিয়ার ছাদে এসে পৌছেছি। সদ্য-পড়া তুষারকণায় হাজার হাজার হীরের চমক, আমাদের দৃষ্টি সেখানে পরাভূত।

ওয়ান্যা ব'লে ওঠে, এখানেই ময়ূর-ময়ূরীর বাড়ি হবে।

আমরা সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

কাত্যা প্রস্তাব করে, আর ওই দূরে, উত্তরে, সবচেয়ে উঁচু যে পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে, ওই হ'ল আমুরের দেশ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটা গৃহীত হয়।

আমরা পায়ে স্কী বাঁধি, খেলা আরম্ভ হয়। যেখানে গাছপালা বেশি নেই, সেখানে দেখাই ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য। জানি না, আমার সঙ্গিনীর মন উড়ে চলেছে কোন্ দিকে! সে একবার 'উ' 'উ' ক'রে পায়ের স্কীকে পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে ছেড়ে দেয়। স্কী চলল খুব বেগে পাহাড়ের তলায় গ্রামের দিকে। আমার সঙ্গিনী তা দেখে আর হাততালি দিয়ে হাসে। সে ওটা আনবার জন্যে আমাকে সঙ্গে যেতে বলে। পায়ে স্কী নেই ব'লে ওর সঙ্গে মৃদুগতিতে যেতে আমার ভাল লাগে না।

তুমি একটা স্কী ঘাড়ে ক'রে পেছনে পেছনে এস, আমি আগে গিয়ে স্কী খুঁজি।—ব'লে তুষারের ওপরে দুই লাঠি দিয়ে ঠেলা দিয়ে আমি পড়ি পিছলে।—গাছ আর দূরের ঘরগুলোকে যেন উড়ে উড়ে আমার কাছে পৌছতে দেখি। গাছগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে আমাকে এপাশ ওপাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।

গাঁয়ের বাইরে এক চাষার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করি, এই, স্কীটা কোথায় বলতে পার? উত্তরে সে মুচকে হাসে। আমার ওর ওপর হয় সন্দেহ, বিরক্ত হয়ে বলি, তুই বাড়ির সব দুধ চুরি ক'রে খাস, তাই তো তোকে এত মোটা দেখাচ্ছে, আর বোধ হয় তোর গালের দু দিকে দুটো আপেল আছে, তাই উত্তর দিতে তোর মুখ খুলছে না।

একটু এগুলেই মেয়েটা একটা ঝোপে লুকানো স্কীটা দেখিয়ে দেয়।

স্কী নিয়ে গ্রামের মুখে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির পাশে প্রতীক্ষা করি আমার সঙ্গিনীর। বাড়ির ভেতর থেকে শুনতে পাওয়া যায় একটা রুশীয় সামোয়ারের (চা-তৈরি করার যন্ত্র) সাঁই সাঁই শব্দ।

আমার সঙ্গিনী আসতে না আসতে, সেই সুর পরিণত হয় ঝঙ্কারে। আমাদের বাধ্য হয়ে সামোয়ারের সঙ্গীতের সঙ্গে চা আর রুটি খেতে হয়। সেই চাষার বাড়ি থেকে সংগ্রহ ক'রে নিই কিছু রসদ, আর যাত্রা করি আমুরের দেশের দিকে। আমাদের সামনের রাস্তা দুধের মতই সাদা আর তেমনই স্নিগ্ধ। আমরা দুজনেই স্কী প'রে তীব্র গতিতে এগিয়ে

চলি। চড়াই এলে সঙ্গিনী হতে থাকে ক্লান্ত; আমি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ওর আসার প্রতীক্ষা করি। কখন বা ও চেঁচিয়ে ওঠে, আমি আবার পেছিয়ে এসে সঙ্গে ক'রে নিই। সে আমাকে পাঁচ ছ পায়ের বেশি এগোতে দেয় না। আরও বেশি ক্লান্ত হ'লে ও একটা ব্যবস্থা করলে। স্কীয়ের লাঠি দুটো একসঙ্গে ক'রে এক প্রান্ত দিলে আমাকে, অপর প্রান্ত ধরলে নিজে—আমাকে চলতে হ'ল ওকে টেনে নিয়ে। ঠাট্টা ক'রে লাঠি ঢিল ক'রে দিলে সে ব'লে উঠত, তা হ'লে ময়ূরী তোমার সঙ্গে যাবে না।

পাহাড়ের মাথায় উঠে আমরা শুভ্র তুষারের গদিতে ঠেসান দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে চীরগাছের সুগন্ধ খুব মিষ্টি লাগছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিথর। মুখে চুমকুড়ি দিতে দিতে আমরা উঠে পড়ি, এগিয়ে চলি আরও উত্তরে।

আমুরের দেশে পৌছতে বিকেল হয়ে যায়। সেখানে আর সকলে আগেই পৌছে গেছে। ময়ূরের সঙ্গে সে দেশের লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আরম্ভ হয়ে গেছে। ময়ূরের যখন জিত হয়, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আমরা গর্ব্বোৎফুল্ল হৃদয়ে স্টেশনে ফিরি নিজ নিজ ময়ূরীকে সঙ্গে নিয়ে।

লেনিনগ্রাদ ফিরতে রাত নটা বাজে। ফিন্‌ল্যাণ্ডগামী স্টেশনের সম্মুখে তওয়ারিশ লেনিনের বিজলী-ঝলকিত বক্তৃতার মূর্ত্তি দেখি। তাঁর কোট ও কলারের ওপরে তুষারের মোটা স্তর জ'মে গেছে; কিন্তু সেটা ঝাড়বার তাঁর সময় নেই। যখন মূর্ত্তিটার ওপর আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তখন মনে হয়, লেনিন আদেশ দিচ্ছেন—আসছে ছুটির দিন তোমরা আবার সেই আমুরের দেশে যেও।

আপনার আদেশ আমরা খুব ভালভাবেই পালন করব, তওয়ারিশ লেনিন।—বলতে বলতে আমরা বাড়ির দিকে এগোই। সঙ্গিনী নিজের বাড়ির সামনে এসে বলে—দ সুইদানিয়া—আচ্ছা আসি, আবার আসছে ছুটির দিন।

শ্রীসত্যনারায়ণ

বাজিমাত

কথা দিয়ে বাজিমাত
কম নয় উৎপাত
বঙ্গের রঙ্গের মঞ্চে,
জোর জোর কথা সব
একঘেয়ে কলরব
হরদম ময়দান-গঞ্জে।
বাক্যের বহু রসে যশে মেশা অপযশে ভিয়েনের কারিগর পাকা,
ভিত্তির মূল ঘেঁসে গাঁইতিই মারে ঠেসে ইমারতে দেয় জোর ধাক্কা।
ক্ষুদে যারা বাঁধে দল
ভাঙিবারে শৃঙ্খল
রচে গোঠ, করে ঘোঁট মর্ত্ত্যে,
বারে বারে হেঁকে বলে,
"মুক্তির বেদীতলে
রচি দল নব নব শর্ত্তে।"
বাক্যের তরবারি নিয়ে করে পায়চারি এক হয়ে মিলিবার পর্ব্বে,
ধন্য এ বঙ্গের বাহাদুরি রঙ্গের তক্তেই বসিবার গর্ব্বে।
কাঁধে যার ভর করি
গাছে গাছে উঠে পড়ি
মারি শেষে তারি শিরে ঠ্যাঙটা,
চুরি করি যার ধন
বলি তারে অনুখন
জোচ্চোর, দুশমন, ল্যাঙটা।
তবু মোরা ধন্যই, হব তবু গণ্যই—দুনিয়ায় সবদিকে শ্রেষ্ঠ,
মুর্গীর কারি খেয়ে, ঘুরি ফিরি গান গেয়ে, লোকে জানে ভজি মোরা কেষ্ট।
সব্বাই দিনে দিনে
আমাদের নিল চিনে
আমরাই নিজেদের চিনি নে।
ভেজালের গুণ গাই—
দিয়ে দাম তাই চাই,—
খাঁটি মাল মোরা আর কিনি নে।

শ্রীগুপ্তানন্দ ভারতী

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক—'সমাচার দর্পণে'র কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা সম্প্রতি দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাল্যরচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রচনাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সমাচার দর্পণ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২। ১৭ ফাল্গুন ১২৫৮)

বিরলে বাস।

শ্রীযুক্ত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কএক পঙ্ক্তি আপনকার দর্পণে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়।

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।
যেই জন বাস করে সুখী সেই জনে॥

সেই নির্জন বটে কিন্তু একা নয়।
নিত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত্য কয়॥

কতমত কাণাকাণি রাজার গোচরে।
ভালকে অবজ্ঞা যাহে মন্দে শ্রদ্ধা করে॥

তাহাতে সুমিষ্ট মিষ্ট, পক্ষির বিলাপ।
বিয়োগিনী পক্ষিণীর, কঠোর সন্তাপ॥

---

* বোধ হয় লেখকের হস্তাক্ষর ঠিকমত পড়িতে না পারায়, 'সমাচার দর্পণে' মুদ্রণকালে কবিতটিতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১০ মার্চ ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন ('শনিবারের চিঠি', ১৩৩৮, পৃ. ২৮৯-৯১ দ্রষ্টব্য)। ভুলগুলি সংশোধন করিয়া কবিতাটি প্রকাশ করা গেল।

তুচ্ছ মান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।
তাহাহতে মলয়জে, মিষ্ট বলা যায়॥

আর মিষ্ট নবপুষ্পে সুগন্ধি পবন।
ধন বিষ হতে মিষ্ট, নদীর জীবন॥

চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পূর্ণিত সংসার।
সত্য সুখ বনে, শুদ্ধ ছায়া সহকার॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমরা প্রেতের জাতি

আমরা প্রেতের জাতি। অকর্ম্মন্য ইচ্ছার ক্রন্দনে
এদেশের আদি-অন্ত ব্যাপিয়াছে। জীবনের মোহ
আজো কাটে নাই—শুধু অশরীরী মূঢ় আকিঞ্চন
ব্যর্থতার অন্ধকারে ঘোষিতেছে বিফল বিদ্রোহ।
অক্ষম আত্মার সাথে বাস্তবের কঠোর সংগ্রামে
শুধু ওঠে হাহাকার—প্রতিপক্ষ রহে অবিচল,
ওষ্ঠপ্রান্তে বক্রহাসি। আলস্যের অভিশাপ নামে
অবিশ্রান্ত, অকরুণ। মোরা খুঁজি হতাশের ছল—
"দুঃখই পরম কাম্য"। আমাদের মুগ্ধ প্রেতলোকে
একদিন প্রাণ ছিল। অন্যায়ের মৃত্যুদণ্ড হাতে
সতর্ক সহস্র বীর, অসম্বৃত বজ্রবহ্নি চোখে,
জাগ্রত রহিত নিত্য। আজিকার আশাহীন রাতে—
অভিযোগ, অনুনয়, হাহাকার, প্রবঞ্চনারাশি—
অমৃতের পুত্রগণ অবশেষে প্রেতলোকবাসী।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পৃথিবী সামান্য একটু ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয় নি। ছানা কেটে গেলে দুধ যেমন দেখতে হয়, খোবা খোবা ছানার ফাঁকে ফাঁকে সবুজাভ ছানার জল যেমন দেখা যায়, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশের অবস্থা অনেকটা তেমনই হয়েছে। ফাটা মেঘের মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেদুর জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক আবিষ্ট। মেঘমুক্ত পূর্ণিমা-রাত্রির শোভা নয়, আবছা অর্দ্ধস্ফুট মাধুরী। দেওয়ালের ওপাশে সদ্যস্নাত হাস্নুহানার ঝাড়ে উৎসব সুরু হয়ে গেছে টের পাচ্ছি। খোলা আকাশের নীচে ব'সে আছি, কিন্তু মশারির ভেতর। ভয়ানক মশা। এমন রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ভাল লাগে। পাশে কোন সঙ্গিনী থাকে তো ভালই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বস্তুত সশরীরে না থাকাটাই বোধ হয় বেশি বাঞ্ছনীয়, অনায়াসে কল্পনা ক'রে নেওয়া যেতে পারে, নীলাম্বরী তন্বী একজন ব'সে আছে পাশে। সেই কল্পনা-সঙ্গিনী আর যাই করুক, কথা ব'লে রসভঙ্গ করবে না।

কিন্তু এসব কিছু না ক'রে লণ্ঠন জেলে আমি লিখতে বসলাম। স্বর্ণেন্দু এসে ভর করেছে। এই মেঘমেদুর জ্যোৎস্নার মধ্যে স্বর্ণেন্দু প্রচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কি না, কে জানে!

কলুটোলার মোড়ে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখাটার কথা মনে পড়ছে।

মশারির বাইরে রক্তপিপাসু অসংখ্য মশা চীৎকার ক'রে তাই করছে, প্রচলিত ভাষায় যাকে গুঞ্জন বলে। এই রক্তলোভী মশার দল কোন মন্ত্রবলে হঠাৎ যদি মালপোলোভী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হয়ে সবিনয়ে আমাকে বলে, আপনাকে একটা কীর্ত্তন শোনাতে এসেছি আমরা, দয়া ক'রে মশারিটি তুলে বসুন, তা হ'লে আমি যত আশ্চর্য্য হয়ে যাই, তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম সেদিন স্বর্ণেন্দুর হাতে টকটকে লাল খাপে ঢাকা চকচকে ছোরাখানা দেখে। অথচ ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। মানুষের হাতেই তো ছোরা থাকে। আসলে সেদিন শেষরাত্রে প্ল্যাটফর্মের ওপর ব'সে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার মধ্যে ছোরার সম্ভাবনা ছিল না। রজ্জু সহসা সর্পে রূপান্তরিত হ'লেই আমরা চমকাই। একটু পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, রজ্জুতে আমার সর্পভ্রম হয়েছে, রজ্জু ঠিক রজ্জুই আছে। কিন্তু ওই ভ্রমের মধ্যেও যে একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, সেদিন তা বুঝি নি।

ধরণীবাবুর কথাগুলা মনে পড়ছে, ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশাই, ওরা বাঙালী নয়, আলাদা জাতের লোক। ধরণীবাবু লোকটি অবশ্য নিখাদ বাঙালী। চাকরি ক'রে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, পরনিন্দা করেন, দোল-দুর্গোৎসব করেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রে "লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ" ছাপান, লৌকিকতা গ্রহণ করেন তা সত্ত্বেও, দেনও; বাড়িতে শাকচচ্চড়ি খেয়ে বাইরে সশব্দে উদ্গার তুলে মুখ বিকৃতি ক'রে বলেন, রিচ ফুড আর হজম হয় না মশাই; ভুঁড়ি আছে, টাক আছে, অষ্টধাতুর আংটি আছে, হুঁকো আছে। বাড়িতে ন-হাতী কাপড় প'রে মিতব্যয়িতা এবং সকালবেলা ঠুকঠুক ক'রে হেঁটে

স্বাস্থ্য চর্চ্চা করেন। আলাপ হবার পর থেকে এই প্রাতর্ভ্রমণের মুখে মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় এসে চা-পান করতেন, এবং সেই সময়ই স্বর্ণেন্দুদের সম্বন্ধে আলোচনা চলত। স্বর্ণেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল (বন্ধুত্ব কথাটাই তিনি ব্যবহার করতেন) সেই কারণে, যে কারণে নাকি, তাঁর ভাষায়, "দুটো কুকুরের মধ্যেও বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব"—অর্থাৎ দায়ে প'ড়ে। চাকরির ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে দুজনেই এমন স্থানে গিয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তৃতীয় কোন বাঙালী ছিল না। সুতরাং বন্ধুত্ব হয়েছিল, ধরণীবাবু এটাকে বন্ধুত্বই বলতেন, যদিও তাঁর কথাবার্ত্তা থেকে বেশ বোঝা যেত যে, এ বন্ধুত্বের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তা আত্মার নয়, স্বার্থের। ধরণীবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর পাল্লায় প'ড়েই নাকি তামাক খেতে শিখেছিলেন, অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি, কারণ পূর্ণেন্দুবাবু তাঁর ওপর-ওলা অফিসার ছিলেন।

বাঙালী ব'লেই যেতে হ'ত—ধরণীবাবু বলতেন,—সায়েবী ধাতেরই হোক আর যাই হোক, বাঙালী তো, নাড়ীর যোগ আছে একটা। নাড়ীর টানে যেতাম, কিন্তু আলাপ জমত না। পূর্ণেন্দুবাবু ঢিলে পা-জামা প'রে আর পাইপ কামড়ে যেসব গল্প জুড়তেন, তা এমন বিদঘুটে যে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। এই ধর না, একদিন সাফ্রাজেট্‌স্‌দের নিয়েই খুব বক্তৃতা সুরু করলেন, কি করব, সায় দিয়ে যেতাম। একদিন বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে। তারপর বললেন, তামাক ধর তুমি।

ধরণীবাবুর কথায় আমিও মুচকি হেসে সায় দিতাম। আমি ডাক্তার, ব্যবসার খাতিরেই আমাকে মুচকি হেসে সায় দেওয়াটা শিখতে হয়েছিল। মুচকি হাসির সায় পেয়ে ধরণীবাবুর মনের দরজাটা আরও

খুলে যেত, অনর্গল ব'লে যেতেন তিনি এদের কথা। তবে সমস্ত কথা যে তিনি বলেন নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে।

কলুটোলা স্ট্রীট যেখানে এসে কলেজ স্ট্রীটে মিশেছে, সেইখানেই হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে আবার দেখা। মনে পড়ছে, ঠিক সেই সময় মেডিকেল কলেজের গেট থেকে একটা মড়াকে কাঁধে নিয়ে হরিধ্বনি করতে করতে জনকয়েক লোক কলুটোলার মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক ওই মোড়ের কাছাকাছি আপাদমস্তক পেতলের বালা-পরা যে উড়েনীটা ফুটপাথে শুয়ে থাকত, তার কাছে মোটা-গোছের একজন বাবু উবু হয়ে ব'সে কিছু খাবার নিয়ে তাকে খাওয়াবার জন্যে সাধ্যসাধনা করছিলেন, (উড়েনীর সম্বন্ধে নানারকম গুজব প্রচলিত ছিল ;—কেউ বলত, ও নাকি তন্ত্রসিদ্ধ যোগিনী ; কেউ বলত, স্পাই ; কেউ বলত, পাগল।) হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ওপর-তলা থেকে কে যেন গাইছিল, 'কে যাবি পারে', আমি এস্প্ল্যানেডের ট্রাম থেকে নেবে হার্ডিঞ্জ হস্টেলের অভিমুখেই যাচ্ছিলাম আমার মামাতো ভাই হারাধনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ; তখনও ঠিক সন্ধ্যে হয় নি, এক্সরা হস্পিটালের পেছন-দিকের গাছগুলোতে অসংখ্য কাকের ডাকাডাকি শুনে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, স্বর্ণেন্দু চলেছে ওপারের ফুটপাথ দিয়ে। মাথা হেঁট ক'রে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমন ভাবে চলেছে—যেন তার আশপাশে আর কেউ নেই, যেন সে আর তার সমস্যা ছাড়া অন্য সব কিছু অনাবশ্যক, এত অনাবশ্যক যে তাদের দিকে ফিরে চেয়ে তাদের অস্তিত্বটুকু স্বীকার করবার মতও বাড়তি সময় যেন নেই তার।

স্বর্ণেন্দু!

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমাকে দেখতে পেল না, সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কলুটোলার ফুটপাথে কাক-কলরব-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায় তার চোখের বিস্মিত সেই দৃষ্টি এখনও আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

এগিয়ে গেলাম।

ও, তুই ঘনশ্যাম।

একটু ছোট্ট হাসি, তারপর কলুটোলার ফুটপাথে তার আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সলজ্জ একটু জবাবদিহি—একটা চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম ভাই, সিটি কলেজে একটা লেক্‌চারারের পোস্ট খালি ছিল। একটু থেমে—হ'ল না, লোক ঠিক হয়ে গেছে। তারপর এমন হাসি-ভরা চোখে সে চেয়ে রইল, যেন স্বর্ণেন্দু নামক বেকার যুবকের চাকরির জন্যে এই হাস্যকর ছটফটানিটা সে নিজে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে।

তোর হাতে ওটা কি?

খবরের কাগজের মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল খাপে ঢাকা বাঁকা ছোরাটা।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমি।

কিনলি নাকি?

না। এটা ফার্নাণ্ডিজ রাতুকে জন্মদিনে উপহার পাঠিয়েছে। আমাদের এখানকার ঠিকানায় প'ড়ে ছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

ফার্নাণ্ডিজ কে আবার?

বাবা যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, ফার্নাণ্ডিজ তখন আমাদের ড্রাইভার ছিল। প্রতি বছর রাতুর জন্যে একটা না একটা কিছু পাঠায়।

স্বর্ণেন্দুর চোখ দুটো সহসা যেন স্বপ্নাতুর হয়ে এল। বলতে

লাগল, তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তবু তার চেহারাটা একটু একটু মনে আছে এখনও। লম্বা-চওড়া কালো-কুচকুচে চেহারা। একটু থেমে—হাবসী ক্রিশ্চান। খুব ভালবাসে রাতুকে, ও বাহাল হবার বছর দেড়েক পরে রাতুর জন্ম হয়, মানে রাতুকে জন্মাতে দেখেছে ব'লেই বোধ হয়—। ছোট্ট হাসিটি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

খুলে দেখলাম। খাপ থেকে খুলতেই চকমক ক'রে উঠল। স্বর্ণেন্দুর মুখখানা ছোরাটার শাণিত ফলকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠল একবার। মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে স্বর্ণেন্দু বললে, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই, চললাম ভাই।

মধুপুরেই ফিরে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

জ্যোতির্ম্ময়বাবু এসেছেন?

সেই দিনই তো ট্যাক্সি ক'রে এসে পড়ল, তুই চ'লে যাবার একটু পরেই।

বাবা কেমন আছেন?

তেমনই।

ঘাড় নেড়ে হেসে স্বর্ণেন্দু চ'লে গেল।

২

তাড়াতাড়িতে স্বর্ণেন্দুকে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, তার দূর-সম্পর্কের ভগ্নীপতি নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে শুধু আলাপ নয়, বেশ একটু মাখামাখি হয়েছে আমার। মাখামাখি হবার একটা স্থূল আধিভৌতিক কারণও ঘটেছিল। বিপত্নীক নিখিল চৌধুরীর কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড কাহার

চাকর চামেলির রন্ধনপটুতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার গোকুলচন্দ্র যে মাংস রাঁধতে পারে না তা নয়, কিন্তু খুব ভাল করবার আগ্রহাতিশয্যে ধনে-হলুদ-আদা-জিরে-দই-পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কার সম্মিলনে যে বস্তু সে প্রস্তুত করে, তা শুধু যকৃতের নয়, রসিকের পক্ষেও দুষ্পাচ্য। ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণ ওই চামেলির রান্নার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তা মসলার নয়, ওর নিজের বৈশিষ্ট্য। স্বাদটারই প্রাধান্য, উপকরণের নয়। একটা কথা ভেবে ভারী আশ্চর্য্য লাগে, এই চামেলি না থাকলে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপটা হৃদ্যতায় পরিণত হ'ত না এবং এই উপাখ্যানের অনেকখানিই হয়তো আমার অগোচরে থেকে যেত।

সেদিন সকালে গোটা চারেক বুনো হাঁস কিনেছিলাম। হৃষ্টপুষ্ট গোটা-চারেক 'লালসর'। খাবার জন্যেই যখন কিনেছিলাম, তখন তাদের মৃত্যু অনিবার্য্য; সহসা মনে হ'ল, গোকুল রান্না করলে এ মৃত্যু শোচনীয়ও হয়ে উঠবে। দিলাম পাঠিয়ে সেগুলো নিখিল চৌধুরীকে। সদ্গতি হবে।

হার্ডিঞ্জ হস্টেলে হারাধনের সঙ্গে দেখা সেরে ফিরে এসেই নিখিল-বাবুর চিঠি পেলাম—

ঘনশ্যামবাবু,

লালসর শুধু বন্যহংস নহে, পরমহংস। এই কলিকাতা শহরে মহাভাগ্যবলে দৈবাৎ ইঁহাদের দর্শনলাভ ঘটে। আপনার উদারতার জন্য গদ্গদ কণ্ঠে সাধুবাদ জানাইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসুন, চামেলি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

নিখিল চৌধুরী

না উড়লে নীলকণ্ঠ পাখীর নীল-বর্ণসম্পদ যেমন সম্যকরূপে নয়ন-

গোচর হয় না, একটু উত্তেজিত না হ'লে তেমনই আসল নিখিল চৌধুরীকে চেনা যায় না। সেদিনে সন্ধ্যায় আহারাদির পূর্ব্বেই খোলা ছাদে ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্বর্ণেন্দুদের কথা আলোচনা করতে করতে নিখিল চৌধুরী একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক নজর আমার পানে চেয়ে হাতীর দাঁতের নস্যদানিটা থেকে বড় এক টিপ র ম্যাড্রাসি নস্যি বার ক'রে একটু হেঁট হয়ে ঘন ঘন নাকের ছিদ্র দুটো বোঝাই ক'রে নিলেন। তারপর নাকের আশপাশে-লাগা নস্যিটা না ঝেড়েই ঈষৎ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিছুই জানেন না আপনি।

বুঝলাম, নিখিল উত্তেজিত হয়েছেন। কারণ, আমি যে কিছু জানি—এ দাবি আমি মোটেই করি নি। স্বর্ণেন্দুকে উপলক্ষ্য ক'রে যে কথোপকথন সুরু হয়েছিল, তা স্বর্ণেন্দুতেই নিবদ্ধ ছিল না, রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্ত্তিত হচ্ছিল এবং সেই আবর্ত্তের মুখে আমি কেবল আমার সরল বিশ্বাসটুকুই ব্যক্ত করেছিলাম—কালো হ'লে কি হয়, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। এ কথা শুনে প্রথমটা কিছু বলেন নি নিখিলবাবু, কিন্তু দ্বিতীয় বার এ কথা বলতেই নস্যি নিয়ে উক্ত উক্তিটি করলেন।

আমি পুনরায় বললাম, চমৎকার নয়?

আবার এক টিপ নস্যি তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে কটমট ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার পানে, তারপর সশব্দে সেটা নাসারন্ধ্রে টেনে নিয়ে নাকের আশপাশের নস্যিগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মনে হ'ল যেন অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর! তারপর আমি কিছু বলবার আগেই স্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, চেকভ না শেহভ, উচ্চারণ ঠিক জানি না, তার লেখা ডার্লিং আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

আনাতোল ফ্রাঁসের থেয়া না থেস, উচ্চারণ ঠিক জানি না, পড়েছেন?

পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা?

পড়েছি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কুচকুচে কালো লম্বা একটা বাঘিনী আছে, দেখেছেন?

দেখেছি।

অমাবস্যার অন্ধকার দেখেছেন একা মাঠে দাঁড়িয়ে কখনও?

দেখেছি।

চকচকে তলোয়ার দেখেছেন?

দেখেছি।

চুম্বক?

দেখেছি।

তা হ'লে এই সমস্তগুলির আত্মাকে আকাশের মত বিরাট একটা কটাহে একত্রিত ক'রে কোন জলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর চাপিয়ে ডিষ্টিল করতে থাকুন কল্পনায়।

তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, করছেন?

চেষ্টা করছি।

করুন। যা হবে, দেখবেন, তা ওই ড্রয়িং-রুম-মার্কা ছোট্ট চিকমিকে 'চমৎকার' কথাটা দিয়ে বর্ণনীয় নয়।

আবার একটু থেমে বললেন, 'সাংঘাতিক' বললে কিছু আভাস পাওয়া যায় হয়তো, তাও যৎসামান্য—

এর পর আমি কি বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কারণ নিখিল-

বাবুর সঙ্গে রাত্রির একটা ঘোরতর রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে ঘটেছে, তা অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি আলোড়ন-যোগ্য কি না, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সাবধানতা অবলম্বন ক'রে বললাম, আপনার আত্মীয় যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাল ক'রে চেনেন। আমার তো সে সুযোগ—

বিরক্তিকর! আবার আপনি একটা ভুল কথা ব্যবহার করলেন অজ্ঞাতসারে। রাত্রির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। আমার স্ত্রী ওর জন্যে আত্মহত্যা করেছে, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

এর পর চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না। দুজনেই নির্ব্বাক হয়ে রইলাম। চারটে বুনো হাঁসের মধ্যস্থতায় এত-বড় একটা সত্যের সম্মুখীন হতে পারব, তা আমি কল্পনাই করি নি। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিখিলবাবু বললেন, এখনও কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি, ঘৃণাও করি,—বিরক্তিকর!

বললাম, অর্থাৎ না ব'লে পারলাম না, আপনার সঙ্গে ওদের যা সম্পর্ক, তাতে অনায়াসেই তো ওকে বিয়ে করতে পারতেন আপনি।

দুটো বাধা ছিল। প্রথমত, পূর্ণেন্দুবাবু, পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, রাত্রি এরা ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়া-টাকেই পরমার্থ মনে করে, অন্তত আমার তাই ধারণা; আর দ্বিতীয়ত, আমিও ঠিক সেই ধরনের উদার লোক নই, যে সব জেনে শুনে একটা প্রেম-করা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।

একটু ইতস্তত ক'রে একটু হেসে বললাম, কিন্তু প্রেম তো আপনার সঙ্গেই হয়েছিল।

নিখিল সশব্দে আর এক টিপ নস্য টেনে নিলেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, রাত্রির আকাশে অগণিত নক্ষত্র। আবার একটু থেমে, দিনের আকাশেও অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু দেখা যায় না। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে 'বিরক্তিকর' কথাটা হয়তো উচ্চারণ করেছিলেন নিখিল চৌধুরী, কিন্তু গোলমালে আমি শুনতে পাই নি, একটা দ্রুতগামী লরির ঘড়ঘড় শব্দের তলায় শেষের দিকের কয়েকটা কথা চাপা প'ড়ে গিয়েছিল।

নিখিলবাবুর মুখে সেদিন যা শুনেছিলাম, সেই স্মৃতির সঙ্গে আর একটা শ্রুতিস্মৃতি মিলিয়ে দেখছি। সেদিন লুকিয়ে তার কান্না শুনে-ছিলাম। নিখিল চৌধুরী-বর্ণিত অগণ্য নক্ষত্রময়ী রাত্রির পাশে মেঘ-ভারাক্রান্ত বর্ষণমুখর রাত্রির ছবিটি রেখে বিস্মিত হয়ে দেখছি। এই বাড়িতেই গভীর রাত্রের নির্জ্জন অন্ধকারে ওই পাশের ঘরটায় সে লুকিয়ে কাঁদছিল। এই ছাতেরই এক প্রান্তে আধখোলা জানলাটার পাশে অন্ধকারে আমি যে সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা সে জানত না। মাঝে মাঝে ভাবি, জানলে সে কি করত? হয়তো হেসে উঠত। তার কলকণ্ঠের অট্টহাস্য ভীরু অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে বিদ্যুতের মত ঝকমক ক'রে উঠত হয়তো। কিন্তু সে দেখতে পায় নি। আমি কিন্তু দেখেছি, শুনেছি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে অঝোরে কাঁদছিল সে।

আমি জানতাম না, (এখনও অবশ্য কতটুকুই বা জানি!) তাই একটু সসঙ্কোচে নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবনীশ জ্যোতির্ম্ময় কি তখনও ছিল?

না, এদের নাম তখন শুনি নি, অন্তত মনে পড়ছে না। তখন ছিল খগেন, সৌম্যেন্দ্র, তপেশ, জমীর ব'লে এক মুসলমান ছোকরা, হারুবাবু নামে এক বুড়ো ডেপুটি, আর নিখিল চৌধুরী। অর্থাৎ এদের কথা

আমি জানতাম, আরও অনেক ছিল নিশ্চয়। একটু থেমে আবার বললেন, ওদের বাড়িটায় পুরুষদের একটা মস্ত আড্ডা ছিল যে তখন।

আড্ডা ছিল?

রীতিমত। হবে না? যে বাড়িতে অমন চমৎকার চা তৈরি হয় এবং তা যখন খুশি গেলে পাওয়া যায়, যে বাড়িতে বাজি রেখে ব্রিজ খেলা হয় এবং খেলার সঙ্গিনী হিসেবে রাত্রির মত মেয়েকে পাওয়া যায়, যে বাড়ির গিন্নী, গড নোজ হোয়াই, সংসার ছেড়ে তীর্থে তীর্থে গুরুদেবের সেবা ক'রে বেড়ান, যে বাড়ির কর্ত্তার সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সে বাড়িতে পুরুষমানুষের, মানে আমাদের মত পুরুষমানুষের, আড্ডা হবে না তো কি হবে?

কোথায় ছিলেন আপনারা তখন?

এই কলকাতা শহরেই। পূর্ণেন্দুবাবু তখন ছ মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

তখনও পক্ষাঘাত হয় নি তাঁর?

আরে না না, তখনও তিনি রকেটের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন। বছর তিনেক আগে আর কি।

নিখিল চৌধুরী আবার একবার নস্যি নিলেন।

আমি তখনও সিগারেট ধরি নি। অন্যমনস্কভাবে গোঁফের ডগাটা পাকাতে লাগলাম।

বিরক্তিকর!

নিখিল বাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

স্বর্ণেন্দুও কি আপনাদের আড্ডায় যোগ দিত?

না। সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ে, এম. এ. পড়ছিল।

ও তো স্কটিশে আমার সঙ্গে পড়ত।

পরে লক্ষ্ণৌ চ'লে যায়।

স্বর্ণেন্দু আমার সঙ্গে কিছুদিন এক কলেজে পড়েছিল ব'লে তাকে যতটা আপন ব'লে মনে হচ্ছিল, এই সামান্য সংবাদটায় সেই আত্মীয়-ভাবটা কেমন যেন খানিকটা ক'মে গেল। আমি ভাবছিলাম—

হঠাৎ ছ ফুট লম্বা নিখিল চৌধুরী আমার দুই কাঁধে থাবার মত দুটো হাত রেখে বললেন, সাবধান হোন।

এ অবস্থায় সাধারণত লোকে যা করে, ভাষার সাহায্যে আত্ম-গোপন, আমি তাই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হ'ল না, চামেলি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

দুজনেই নীচে নেমে গেলাম।

এমন চমৎকার ডাক-রোস্ট আমি আর কখনও খাই নি। নিখিল-বাবু কিন্তু, দেখলাম, খুব খুশি হন নি। কেমন যেন খুঁত খুঁত করতে লাগলেন এবং অতি সব তুচ্ছ কারণ আবিষ্কার ক'রে চামেলিকে ধমকাতে লাগলেন। পরে জেনেছিলাম, এইটেই তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরন। তিনি তাঁর এই ছিপছিপে কালো কাহার ভৃত্যটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন ব'লেই তুচ্ছ অলীক কারণে ধমকান। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিখিল চৌধুরীও অবশ্য নিজেকে লুকোতে পারেন নি, চামেলি সব বুঝত। নিখিলবাবু যখন তাকে ধমকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে যদিও সে শুষ্ক মুখে অপরাধীর মত ভাব প্রকাশ করছিল, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে হাসছিল।

যেন ছাতে কোন আরব্ধ কর্ম্ম অসমাপ্ত রেখে আমরা নেবে এসে-ছিলাম এমনই একটা মনোভাব নিয়ে খাওয়া শেষ হতেই যন্ত্রচালিতবৎ আবার আমরা দুজনে ছাতে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেই

রইলাম, যদিও দুজনেই একই কথা ভাবছিলাম এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, দুজনেই তা বুঝতে পারছিলাম। নিখিলবাবুর একটা কথা ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, এরা কেউ ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে—কথাগুলোর নানা রকম অর্থ করা যায়। আমার সহসা কৌতূহল হ'ল, নিখিলবাবু কি অর্থে কথাগুলো ব্যবহার করলেন কে জানে! কৌতূহলটাকে বাঙ্ময় করলাম যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক আকার দিয়ে এবং নিরুৎসুক কণ্ঠে।

মেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলে, আজকালকার দিনে, যাকে তাকে বিয়ে করতে চায় না। স্বর্ণেন্দুর কথাটারই পুনরুক্তি করলাম, তাদেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো।

বড় মানে কি, কত বয়সের মেয়েকে আপনি বড় বলেন?

শুধু নিখিল চৌধুরীই নয়, অনেকেই দেখেছি কোন একটা জিনিস বুঝেও যখন না বুঝতে চান, তখন তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন। পৃথিবীতে প্রায় সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে, এই সত্যটার সুযোগ নিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করবার প্রয়াস পান। হ'লও তাই।

আমি যেই বললাম, এই ধরুন ষোল সতরো।—শিকারের ওপর ঝম্পনোন্মুখ শিকারী পশুর চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, নিখিল চৌধুরীর চোখেও ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল। এক টিপ নস্যি তুলে নিয়ে বললেন, তার ঢের আগে আপনার ওই রাত্রি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের চোটে সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল একদিন। তখন ওর বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে।

সশব্দে নস্যিটা টেনে নিলেন।

হয়েছিল কি?

বিয়ের কনে পিঁড়ি থেকে উঠে পালিয়েছিল, বরের কানে একটু খুঁত ছিল ব'লে।

কানে?

হ্যাঁ, কানে। ঠিক কাটা নয়, কানটা একটু মোড়া গোছের ছিল।

কি রকম?

পূর্ণেন্দুবাবু যখন আশীর্ব্বাদ করতে যান, তখন সেটা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা ছিল ব'লে দেখা যায় নি।

বর আশীর্ব্বাদ করবার সময় পাগড়ি প'রে ছিল নাকি?

হ্যাঁ। ছেলেটি পশ্চিমেই মানুষ, পশ্চিমেই থাকত, তাই পাগড়ি-পরাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছিল তখন সকলের। আসল কারণটা বোঝা গেল বিয়ের ঠিক আগে, টোপর পরবার সময়।

নিখিল চুপ করলেন।

আমি বলতে গেলাম, জোচ্চোরকে বিয়ে না ক'রে তো ঠিকই—

বিরক্তিকর! আমি কি বলেছি, বেঠিক করেছিল? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, অন্য কোন মেয়ে ঠিক এমনটা করত না ওই বয়সে।

আমি মানস-চক্ষে যেন দেখতে পেলাম ছবিটা। টোপর-পরা বরের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিষ্পলক নয়নে চেয়ে থেকে তারপর উঠে গেল সে। পরনে লাল চেলী, কপালে কনে-চন্দন।

পূর্ণেন্দুবাবু সেই একটিবার মাত্র সম্বন্ধ ক'রে ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, আর করেন নি। একটু থেমে নিখিলবাবু আবার বললেন, ওর মায়ের জন্যে আর সম্ভবও হয় নি।

মায়ের বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল নাকি খুব?

নিখিল চৌধুরী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন কি না এবং জানলেও দিতেন কি না, জানি না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে টং টং ক'রে

বারোটা বেজে উঠতেই দুজনেই প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হতে বাধ্য হলাম। নিখিলবাবু বললেন, বিরক্তিকর! কাল আবার সকালেই কোর্ট আছে আমার।

আমারও একটি রোগীকে ভোরেই ইন্‌জেক্‌শন দেবার কথা ছিল। সুতরাং উঠতে হ'ল। কিন্তু বেশ মনে আছে, নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারেই উঠেছিলাম সেদিন। নিখিলবাবুকে এতক্ষণ ধ'রে একা পাবার সুযোগ আর একদিন মাত্র ঘটেছিল আমার। সেদিনও প্রসঙ্গ এই, কিন্তু অবস্থাটা বিভিন্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

আমি গোড়াতেই বলেছি, রাত্রির সবটা আমি দেখি নি। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি এবং অনেকখানি কল্পনা করেছি। যদিও সকলের সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান এই তিনটি জিনিসের যোগ-বিয়োগের ফল, তবু রাত্রির সম্বন্ধে এ কথাটা আরও বেশি ক'রে মনে রাখা উচিত এই কারণে যে, এক্ষেত্রে যোগ-বিয়োগের ফলে যে ধারণাটা আমাদের মনে স্থায়ী হবার সম্ভাবনা, সে ধারণাটার স্বরূপ সমাজ-স্বার্থের দিক থেকে; কিন্তু না, থাক। বাক্যের আবর্তে আপনাদের সহজ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলতে চাই না। আমি ঘটনাগুলির যথাযথ বর্ণনা ক'রে যাচ্ছি, আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বকীয়তা অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। কেবল সত্যনিষ্ঠার খাতিরে এইটুকু শুধু আমি বলছি যে, ঘটনাগুলির মধ্যে পারম্পর্য্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। 'যথাযথ' শব্দটাকেও বৈজ্ঞানিক অর্থে নিলে চলবে না। নারীর সম্বন্ধে

পুরুষের বর্ণনা কখনও 'যথাযথ' হতে পেরেছে? 'পারম্পর্য্য নেই'—এ কথাটা যে তুচ্ছ করবার মত নয়, একটা উদাহরণ দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। বিছুটি-লতার সুনাম নেই। মনে করা যাক, আপনি এই বিছুটির পাতা দেখেছেন, শিকড় দেখেছেন, বীজ দেখেছেন, অখ্যাতি শুনেছেন এবং সংস্পর্শও লাভ করেছেন, কিন্তু বিছুটির জীবনের সেই কটা দিন হয়তো আপনি দেখেন নি, যখন সে ফুলে ফুলে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যদি পুষ্পালঙ্কৃতা রূপান্তরিতা বিছুটিকে একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে কোন দিন দেখতেন, তা হ'লে হয়তো বিছুটির সম্বন্ধে আপনার ভূতপূর্ব্ব তিক্ত ধারণায় হঠাৎ খানিকটা মাধুর্য্য-সঞ্চার হ'ত। আপনার অজ্ঞাতসারেই বিছুটির বিজ্ঞানসম্মত বদনাম সত্ত্বেও আপনার মন অনেক রকম দার্শনিক তথ্য, সত্য-অসত্যের অভিন্নতা, স্বপ্নের বাস্তবতা, আপাতদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা—নানা রকম উদ্ভট আলো-আঁধারির মোহ সৃজন ক'রে অসহায় আত্মহারা ভাবে বিছুটির পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যুক্তি আহরণ করতে ব্যস্ত হ'ত। অর্থাৎ বিছুটি নামক বিষাক্ত উদ্ভিদটির জীবনের ঘটনা-পরম্পরা পর পর দেখবার সুযোগ যদি কারও ঘটে, তা হ'লে বিছুটির ওপর চ'টে থাকা অসম্ভব হবে তার পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিছুটির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি বিছুটির জীবনে স্বল্পকাল থাকে এবং অধিকাংশ লোকের তা নয়নপথবর্ত্তী হয় না।

আমি যে রাত্রির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি দেখতে পেয়েছিলাম তা নয়, কিন্তু কল্পনা করতে ক্ষতি কি, বিশেষত সে কল্পনার যখন অতি স্বাভাবিক একটা ভিত্তি আছে। নিখাদ বাঙালী ধরণীবাবুও কল্পনা করেন—ওদের কুল-কিনারা পাবেন না মশায়, ওরা বাঙালী নয়, ওরা আলাদা জাতের লোক! আমারই বা কল্পনা করতে বাধা কি যে, রাত্রির জীবনেও একদিন অতিশয় স্বাভাবিক নিয়মে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছিল, যে ফুলের

সৌরভ শুধু অলিকুলকেই নয়, রাত্রিকেও আবিষ্ট করেছিল, যে আবেশের মোহে সে ভেবেছিল, অলিদের নয়, বসন্তকেই সে বন্দী ক'রে রাখতে পারবে তার পুষ্পিত কারাগারে।

আমার বিশ্বাস, স্বর্ণেন্দু তার এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপটি দেখেছিল, শুধু দেখে নি, মিলিয়ে দেখেছিল তার নিজের অপুষ্পিত ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে। তা না হ'লে—কিম্বা হয়তো তার মায়ের কথা—না, কারণটা এখনও ঠিক জানি না আমি। কিন্তু স্বর্ণেন্দুর, সেই আদর্শবাদী স্বর্ণেন্দুর নিষ্পাপ মুখচ্ছবিটা ভুলতে পারি না আমি কিছুতে। অতিশয় শান্তভাবে কেবল সে বলেছিল, আমি করেছি। কোন উত্তেজনা, কোন বাহাদুরি, কোন উত্তাপ ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। তাই আমার মনে হয়, রাত্রির পুষ্পিত জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যর্থ জীবন সে মিলিয়ে দেখেছিল এবং—। কিন্তু এসব আমার কল্পনা। ঘটনাটা শুনুন।

নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রিদের সম্বন্ধে আলোচনা হবার প্রায় ছ মাস পরে ঘটনাটা ঘটেছিল। এই ছ মাস আমি এদের কারও কোন খবর পাই নি, রাখিও নি। সেদিন রাত্রে নিখিলবাবুর সাবধান-বাণী অনুসরণ ক'রেই যে আমি এদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম তা নয়, ধরণীবাবুর আলোচনা শুনেও আমার মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হয় নি, রাত্রির সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য এতটুকু কমে নি, বরং বেড়েছিল; তবু এদের সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করি নি—সম্ভবত মজ্জাগত সেই স্বভাবের প্রভাবে, যার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়ে কোন কিছুই করি না। যা চোখে পড়ে তাই দেখি, যা কানে ঢোকে তাই শুনি। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ছ মাসের খবর যদি আমি রাখতাম, অন্তত চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান যদি চলত, তা হ'লে হয়তো খবরের কাগজে কাহিনীটা যত বীভৎসভাবে বেরিয়েছিল, আমি তার প্রতিবাদ

করতে পারতাম; এবং এই কাহিনীতে কল্পনায় যে সত্যটা অনুভব করছি, প্রত্যক্ষদর্শনের জোর পেলে—কিম্বা হয়তো ভুল বলছি—প্রত্যক্ষদর্শনের উগ্রতাটা এত বেশি যে, তার দাপটে সূক্ষ্ম সত্য অনেক সময় মারা পড়ে। কল্পনার সূক্ষ্ম জালেই সূক্ষ্ম সত্য ধরা যায়। সবটা প্রত্যক্ষদর্শন করলে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তিই থাকত না হয়তো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিস্পেন্সারি থেকে ফিরলাম প্রায় সাতটার পর। নানা কারণে মনটা ভাল ছিল না। দিন সাতেকের মধ্যে দুটো রুগী মরেছিল, আরও দুটো মরমর হয়েছিল, একজন বড়লোক ভাটিয়ার বাড়িতে দুটো সঙিন-গোছের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। অল্পদিন মাত্র ঘরটায় ঢুকেছিলাম, দুটো মৃত্যু ঘ'টে গেলে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির সঙিনতার নয়, আমারই বদনাম হবে। ঘোষেদের বাড়ির টাইফয়েডটাকে পথ্য দিয়েছিলাম, বিকেলের দিকে শোনা গেল, তার একটু জ্বর হয়েছে। সকালবেলা শুভ-বিবাহ-মার্কা যে নেমন্তন্নর চিঠিখানা পকেটে পুরেছিলাম, সেটার কথা মনেই ছিল না। বাড়ি ফিরে পকেট থেকে স্টেথস্কোপ বার করতে গিয়ে চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। বিরক্তিতে সারা মনটা ভ'রে গেল। না গিয়ে উপায় নেই। শুধু যেতে হবে তা নয়, একটা উপহার কিনে নিয়ে যেতে হবে। এড়াবার উপায় নেই, কারণ ধনী জমিদার রায় মশায় একজন মস্তবড় 'পেট্রন' আমার। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে কোমরে গামছা বেঁধে দই পরিবেশন করতেই লেগে যাওয়া উচিত ছিল আমার। অন্তত টাকা পাঁচেকের মত দিশী বিলিতী জাপানী জার্মানী যাই হোক কিছু একটা শৌখিন দ্রব্য কিনে ঠোঁটে ভদ্রতার হাসিটি ঝুলিয়ে আত্মীয়তার অভিনয় করতেই হবে গিয়ে। অভিনয় করা শক্ত হবে না, কিন্তু কি জিনিস কেনা যায় তাই একটা সমস্যা। কারণ জিনিসটা তো আর অভিনয় করবে না। ফুল-

দানি, টয়লেট-সেট, টি-সেট, নিটিং-সেট, রাইটিং-সেট নানা রকম সেটের কথা মনে হ'ল, কিন্তু একটাও মনঃপুত হ'ল না। শাড়ির কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। পাঁচ টাকা দামের শাড়ি রায় মশায়ের মেয়ে রুচিত কখন পরলেও পরতে পারে হয়তো, কিন্তু সে শাড়ি উপহারের ভিড়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই তো উপহার দেওয়া। মনে হ'ল, তেমন কিছু পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ধড়াচূড়া ছেড়ে স্নান করলাম। স্নানান্তে এক কাপ চা খেয়ে একটু প্রফুল্লিত হলাম। মনে হ'ল, দুলাল সাধুর শরণাপন্ন হ'লে সে পাঁচ টাকার মধ্যেই নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম। গোকুল এসে পথরোধ করলে।

আজ রায়েদের বাড়ি নেমন্তন্ন না তোমার?

সেইখানেই তো যাচ্ছি।

কাপড়-চোপড়গুলো বদলে যাও, ওরকম ময়লা জামা-কাপড় প'রে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি কেউ?

জানি, প্রতিবাদ করা বৃথা।

বললাম, শিগগির দে তা হ'লে।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, বাবুধাক্কা-পাড় কাপড়, ফিতে-বসানো পেটেন্ট লেদারের কালো পাম্প-শু, মায় রূপো দিয়ে বাঁধানো শৌখিন ছড়িটি পর্য্যন্ত এনে হাজির করলে গোকুল। আলমারি খুলে এসেন্সের শিশি বার ক'রে পাট-করা রুমালে এসেন্সও ঢালতে লাগল। পৃথিবীতে এত লোকেরই যখন মন রেখে চলেছি, বস্তুত সমাজ-জীবন মানেই যখন একনাগাড়ে সকলের মন রেখে চলা, তখন গোকুলকেই বা মনঃক্ষুণ্ণ করি কেন? কোন আপত্তি করলাম না।

বেশি রাত ক'র না যেন।

আচ্ছা।

তখন কি জানি, রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!

আমার সচেতন সত্তা জানত না যদিও, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, অবচেতন মনের কোন স্তরে সংবাদটা এসে পৌঁছেছিল বোধ হয় এবং সেইজন্যেই আমি বোধ হয় আমার কিছুক্ষণ আগেকার উপহার-বিরোধী মনোবৃত্তি সত্ত্বেও—না, ভুল বলছি—আসলে সেটা দুলাল সাধুর কীর্ত্তি। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েই সোজা সেই মনিহারী দোকানটির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হলাম, যার একচ্ছত্র মালিক শ্রীদুলাল-চন্দ্র সাধু। একাধিক কারণে দুলাল সাধুর অসাধুতার নানা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আমি সব জিনিস তার দোকান থেকেই কিনি। প্রথমেই বলেছি, চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। দুলাল সাধুর চোখ দেখেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার প্রতি। বড় ট্যারা চোখ। যখন মনে হবে, দুলাল সাধু রাস্তার ষাঁড়টার দিকে চেয়ে আছে, তখন কিন্তু সে নিরীক্ষণ করছে আপনাকে। যখন তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আকস্মিক ভর্ৎসনা ঘনিয়ে উঠতে দেখে আপনার মনে আতঙ্ক-সঞ্চার হচ্ছে, তখন তার 'মাপ কর বাবা, এখানে হবে না' শুনে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যাত ভিখারীটাকে দেখে আশ্বস্ত হবেন। ওর অদ্ভুত ট্যারা চোখই আকৃষ্ট করেছিল আমাকে প্রথমে। পরিচয় পেয়ে আরও আকৃষ্ট হলাম। অতি অমায়িক লোক। যখন গলা কাটছে, তখনও অমায়িক। পৃথিবীতে গলা তো সকলেই কাটে, অমায়িক কজন হয়? আমার বিশ্বাস, এটা ওর নিছক ভণ্ডামির আবরণ নয়, এটা ওর বিশেষ একটা গুণ। 'আপনি হলেন ঘরের লোক'—এটা শুধু ওর মুখের কথা নয়, আচরণেও সেটা ফুটিয়ে তোলবার শক্তি আছে ওর। কেবল

মুখের কথায় মানুষ বরাবর ভোলে না, খানিকটা আন্তরিকতাও থাকা চাই।

তৃতীয়ত, ধার দেয়। সকলকে দেয় না, লোক বুঝে দেয়। দুলাল সাধুর এইটে একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ট্যারা চোখের এক চাউনিতেই ও বুঝে নেয়, লোকটা কোন্ জাতের, একে ধার দেওয়া চলে কি না।

আমি যখন দুলাল সাধুর দোকানে গিয়ে পৌছলাম, তখন বেচারা ভারী ব্যস্ত। নানা রঙের শাড়ি-পরা এক ঝাঁক কলেজের মেয়ে তাকে ঘিরে ছিল। দুলাল যে কখন কার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, তা বোঝবার উপায় ছিল না। তবে এটা ঠিক, ফরসা লম্বা মেয়েটি যখন মনে মনে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে করতে মুখে একটা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করছিল, তখন দুলাল তাকে দেখছিল না, তখন দুলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল খুব সম্ভবত বাঁ-ধারের শ্যামবর্ণাটির ওপর। শ্যামবর্ণা মেয়েটি নিজেকে যখন বিব্রত মনে করতে লাগল, তখন দুলালের দৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর—

আসুন আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, বসুন।

বসব না আর, আমাকে টাকা পাঁচেকের মত কিছু একটা দিন তো—বিয়ের উপহার।

এক মিনিট, এক্ষুনি দিচ্ছি। ওরে ভোঁদড়, পান দে ডাক্তারবাবুকে।

বলা বাহুল্য, একাধিক মিনিট বসতে হ'ল।

ব'সে ব'সে লক্ষ্য করতে লাগলাম মেয়েগুলিকেই। মুগ্ধ নয়, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। নানা রকম লোভনীয় মনিহারী জিনিসের দিকে সঞ্চরমান ওদের দৃষ্টিতে সেদিন যে লুব্ধতা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা ভুলব না কোন দিন। চোখ দিয়ে ওরা জিনিসগুলোকে গিলছিল যেন। এক একবার মনে হচ্ছিল, আমার যথাসর্ব্বস্ব খরচ ক'রে কিনে দিই

ওদের জিনিসগুলো। ট্যারা দুলাল সাধুর সামনে ওদের ওই লুব্ধতা আমারই আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করছিল যেন। কিন্তু আমার যথাসর্ব্বস্ব আর কতটুকু! খুব বেশিও যদি থাকত, তা হ'লেও ওদের তৃপ্ত করতে পারতাম না। হুতাশনকে ঘি খাইয়ে তৃপ্ত করবে কে? অনেক দর-কষাকষি ক'রে (সেদিন এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, এ বিষয়ে মেয়েরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পটু) একখানি মাত্র শাড়ি কিনে চ'লে গেলেন ওঁরা। শাড়ির দরকার ছিল একজনের, বাকি কজন বোধ হয় পছন্দ করতে এসেছিলেন।

এইবার ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি দোব বলুন? ওহে জগু, ফ্যানটা খুলে দাও ওদিকের।

টাকা পাঁচেকের মত যা হোক একটা কিছু দিন শৌখিন-গোছের, বিয়েতে উপহার।

সসম্ভ্রমে দুলাল বললে, রায়েদের বাড়ির জন্যে বুঝি?

হ্যাঁ।

সামনের তাকে রক্ষিত গণেশের দিকে চেয়ে দুলাল হুকুম করলে, ওহে চণ্ডী, ওপর থেকে নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আন তো, সাবধানে এনো।

একটু পরে চণ্ডী নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আনলে এবং দুলাল সাধু সসম্ভ্রমে সেটা খুলে দেখাতে লাগল।

এর পাঁচ টাকা দাম?

দাম কিছু বেশি। কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে জিনিস যাবে, দামের দিকে লক্ষ্য রাখলে তো চলবে না আমার।

শাড়ি ব্লাউজ পরা ডামিটার দিকে চেয়ে দুলাল সাধু মুচকি হেসে

এমন একটা ভাব প্রকাশ করলে, যা সত্যই অবর্ণনীয়। তবু আমি শেষ চেষ্টা করলাম—আমার সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি নেই যে!

দাম আপনি যখন খুশি দেবেন, নাও যদি দেন তাও সহ্য হবে আমার, কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে চার পাঁচ টাকা দামের খেলো জাপানী জিনিস পাঠাতে পারব না আমি।

ডামিটার দিকে এমন মর্ম্মাহতভাবে চাইলে দুলাল সাধু যে, আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না।

সকলেই প্রশংসা করেছিল আইস্‌ক্রীম-সেটটার। রাত্রি প্রশংসা করেছিল আমার রুচির। বছর-খানেক পরে দুলাল বিল পাঠিয়েছিল—চল্লিশ টাকা পনরো আনা।

রায় মশায় আমাদের পাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু লোক। সুতরাং এ পাড়ার অতি-পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাইরের লোকও অনেক ছিল। সামিয়ানার তলায়, টিনের চেয়ারে, বৈঠকখানা-ঘরের বিস্তৃত ফরাসে, বারান্দায়, সামনের একটা তাঁবুতে—চতুর্দ্দিকে গিজগিজ করছিল নিমন্ত্রিতের দল। কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেট সহ আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। ভাগ্যে গেটে কেউ এসে আটকায় নি, কারণ যে কার্ডখানা গেটে প্রদর্শন করবার কথা সেটা আমি আনতে ভুলেছিলাম।

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, কন্‌সার্ট, লাল নীল হলুদ সবুজ ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি, কুকুরের চীৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নজনিত চেঁচামেচি—সমস্তটা মিলে একটা প্রলাপ যেন।

খানিকক্ষণ পরে আর একটা প্রলাপ যে আমাকে শুনতে হবে—বংশীর প্রলাপ—তা তখন কে জানত!

ক্রমশ

"বনফুল"

অনাধুনিক

সমর্‌সেট মঘামের সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি বই পড়ছিলাম। তাতে তাঁর মতে যে যে গ্রন্থ অপঠিত থাকলে আধুনিক পাঠক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সেই সেই গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সে তালিকা কোনও দেশকালে সীমাবদ্ধ নয়। এ তালিকার প্রথম গ্রন্থ ডিফোর মোল ফ্ল্যাণ্ডার্‌স; ক্রমে গালিভার্স ট্রাভ্‌ল্‌স, ফিল্‌ডিঙের টম জোন্‌স, বস্‌ওয়েল-কৃত জনসন-জীবনী, গিবনের আত্মজীবনী, ডিকেন্স, জেন অস্টেন, থ্যাকারে, মেরেডিথের নামোল্লেখ করা হয়েছে; অন্য য়ুরোপীয় লেখকদের মধ্যে ডন কুইক্সো, মন্‌টেন, বাল্‌জাক, টলস্টয়ের যুদ্ধ ও শান্তি, ডস্টয়েভ্‌স্কি, রুশোর আত্মকথা, ফ্লবেয়ার; আমেরিকার লেখকদের মধ্যে হার্মান মেল্‌ভিল, হুইট্‌ম্যান, হেন্‌রি জেম্‌স এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এড্‌গার অ্যালেন পোর নামোল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্য থেকে নবলব্ধ জ্ঞানে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, আধুনিক লেখকদের সঙ্গে তাঁদের পিতামহদের নাড়ীর টান থাকলেও তাঁদের পিতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝি নিতান্তই কম, এবং যদি তাঁরা পিতৃপরিচয়াভাবকে স্বকীয় অক্ষমতার নিদর্শনের পরিবর্ত্তে কালোচিত কলাবৈকল্য ব'লেই নিঃসন্দিগ্ধ সমালোচকের মনে বিভ্রম জাগাতে চান, তা হ'লেও সব সময়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যে ডিকেন্স ইংলণ্ডের স্থূল মধ্যবিত্ত সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি, তাদের কূপমণ্ডুকতা, অদূরদৃষ্টির মোহ কাটাতে পারেন নি, আধুনিক যুগে যাঁর ভাষা অপ্রচলিত, দৃষ্টিভঙ্গি অচল এবং জ্ঞান অতি সংকীর্ণ, তাঁর লেখা না পড়লে এ যুগের সাধারণ পাঠক, যিনি সাহিত্যের ঐতিহাসিক

বিচারে আগ্রাহান্বিত নন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—এ কথা বলা একটু দুঃসাহস নয় কি? এর চেয়ে স্কটের লেখা পড়লেও বোধ হয় আধুনিক সমালোচক বেশি তুষ্ট হতেন।

কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত এখানেই নয়। সেদিন শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত'র প্রবন্ধগুলি নতুন ক'রে পড়ছিলাম। তার প্রথম প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন:—"বোঝা যাবে নীচের নমুনাগুলি কেন কাব্য হিসাবে স্মরণীয়, এত স্মরণীয় যে আমার মত অলসমনা লোকের পক্ষেও সেগুলোর আবৃত্তি দুষ্কর নয়—

Immemorial Elms
And murmur of innumerable bees. (Tennyson)

* * *

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল।...ইত্যাদি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।"

যাঁরা অত্যাধুনিক কালের মানুষ, তাঁদের একটু বিস্মিত হতে হয় বইকি। আমাদের ধারণা জন্মে গেছে—টেনিসনের নাম করা অসংস্কৃতির পরিচয়, ব্রাউনিঙের স্তবগান অজ্ঞানতার নামান্তর, আর সত্যেন্দ্রনাথের কথা কোনও ভদ্র-সমাজে উল্লেখ করাই চলতে পারে না। যাঁর সম্বন্ধে শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রে বলেছেন ('অনামী' পৃ. ৩৬৬): কবিতায় প্রকৃত রসবস্তু বেশির ভাগ পাঠকই খোঁজেন না এবং পেলেও বোঝেন না।—নইলে বলুন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে স্বীকৃত হন! এবং যাঁর সম্বন্ধে দিলীপ-কুমারের অভিমত খুবই সুস্পষ্ট,—সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা কাব্যপদবাচ্য নয়;—এমন কি যাঁর সম্বন্ধে অজিত দত্তও লিখেছেন—

মাইকেল আর রবিঠাকুর ছেড়ে ওদের দলে
সত্যেন্দ্র দত্তজকেই ছন্দরাজা বলে।

('পাতালকন্যা' পৃ. ৩৭)

সেই কবির কাব্যকে কোন বিশেষ ব্যাপারেও সুধীন্দ্রনাথের মত সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও এজ্‌রা পাউণ্ডের সমশ্রেণীতে উল্লেখ করবেন এবং অকুণ্ঠ স্তুতিবাদে পশ্চাৎপদ হবেন না—এ কথা আজকের দিনে নিশ্চয়ই একটু বিস্ময় জাগায়। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-সম্ভারে আবেগবাহিতার ফলে কবিতাটি কাব্য হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথের এ মত স্বীকার করতে অসন্ধানী পাঠকদের দুঃসাহসের প্রয়োজন।

কিন্তু ব্যাপারটি কৌতূহলজনক সন্দেহ নেই। পূর্ব্বে দেখা গেছে, সমালোচকেরা তাঁদের কৃপাকটাক্ষবঞ্চিতদের উপরে তীব্র বাণ নিক্ষেপ করেছেন এবং অতি দ্রুতগতিতেই করেছেন। নবীন লেখকেরা সে কারণে যদিও বিদ্রূপ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু লাভ করেন নি, তবুও তাতে সাহিত্যের একটি মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে। এই সমালোচনার ফলে বাংলার উর্ব্বর ভূমিতে আগাছার অবসর হয় নি, এবং যে বীজ অঙ্কুরিত হবার সময় আগাছা ব'লে উৎখাত হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও লুপ্ত হয় নি, বোঝা গেছে, সে বীজে বনস্পতির প্রাণশক্তিই সন্নিহিত ছিল। এমন কথা হয়তো এতকাল পরে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা চলবে না যে, এ ব্যবস্থায় অকালমৃত্যুর সংখ্যা একেবারে শূন্যের কোঠাতেই নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না, সে যুগে আমাদের সাহিত্যকুঞ্জে অনবধানের স্থান ছিল না, এবং যাঁরাই সেখানে প্রবেশলাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই অবশ্য স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটিকে পরিষ্কার রাখতে উৎসুক ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম হয়ে তাঁকে সমালোচনার অযোগ্য মনে ক'রে দূরে পরিহার করেন নি, বরং তাঁর কাব্যরীতির বিনাশের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তেমনই যখন পূর্ব্ববর্ত্তীদের সদয়

বা নির্দ্দয় সমালোচনার ফলে যশোলাভের সহজ পন্থা অবলম্বন করার কোনও প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের ছিল না, তখন তাঁর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রস উজ্জ্বলতর হয়েছে। মাইকেলী ভঙ্গিতে অবিশ্বাসী হ'লেও তাঁকে উপেক্ষা করা রবীন্দ্রনাথ সমীচীন মনে করেন নি, এবং অন্তত ১৩০২ থেকে ১৩৪৭ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের ভাষার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বহু সময় ক্ষেপণ করেছেন; যদিও এ কথা বাতুলেও বলতে পারে না, সাহিত্যিক যশের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী।

আধুনিক যুগে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে এ ঐতিহ্য সত্য নয়। সাম্প্রতিক সমালোচনায় যে উন্নাসিক ভাব দেখা দিয়েছে, তাতে এ সজীব প্রাণবত্তার বিশেষ অভাব ব'লেই আমার ধারণা। যাঁরা বর্ত্তমানের কুলীন পত্রিকাগুলির অনুসন্ধানী পাঠক, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সমালোচক-মনের এ উদারতা বোধ হয় লুপ্তপ্রায়। সমালোচকের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হয়ে এসেছে। যে কয়টি লেখক বর্ত্তমান যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সুষ্ঠু প্রকাশ দিতে পেরেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে অজস্র উচ্ছ্বাস থাকা সত্ত্বেও, যাঁদের লেখনী যথেষ্ট পরিমাণে সফল নয়, তাঁদের অসদয় উল্লেখও সহজলক্ষ্য নয়। মনে হয়, সে লেখকেরা অনুকম্পার পাত্র, অসীম করুণাই তাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের অপকর্ষ বিচারেও সময়-ক্ষেপণ কৌলীন্যের বিরোধী। ফলে পুরালব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের অধুনাপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির সন্ধান-লাভ সব সময়ে অকঠিন হ'লেও বর্ত্তমান সাহিত্যের গতির নিদর্শন পাবার উপায় নেই। এই কারণে অল্ডাস হাক্সলির কোনও অধুনা-বৈচিত্র্যহীন উপন্যাসেও যে দুন্দুভিনিনাদ শোনা যাবে, বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবে কিছু খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও মিড্‌ল্‌টন মারির সে সম্মান হয়তো কপালে জুটবে না; শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীরের

স্পষ্টত রোমান্টিক কবিতাগ্রন্থ প'ড়েও বিভিন্ন পত্রিকায় আধুনিক সমালোচক শুধু তাঁর রোমান্টিকতার সুখ্যাতি ক'রেই নিশ্চেষ্ট নন, তার মধ্যে আধুনিকতার বীজ দর্শন ক'রেও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অথচ কোনও অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ কবির রচনা—যাঁর কয়েকটি কবিতাতে ঠিক অনুরূপ চিত্তবৃত্তিই দেখা গিয়েছে—তার ভূয়োপ্রশংসা সহজলক্ষ্য নয়; এমন কি, তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তিতে আধুনিক সমালোচক এতই বিচলিত হয়েছেন যে, তাঁর অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের অনুরূপ অবসর হয় নি।

এ কথায় কেউ কেউ রুষ্ট হবেন জানি, এবং বলবেন, প্রত্যেক কবিই স্বকীয় গুণে প্রসিদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছেন এবং সে হিসেবে যাঁরা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভে অসমর্থ, তাঁদের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ নিশ্চয়ই হয় নি। এ যুক্তির সঙ্গে একমত হ'লেও এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হওয়া কিন্তু সম্ভব নয়। লেখকসম্প্রদায়ের দিক থেকে ঐ যুক্তির বলে বিশেষ চিন্তার কারণ যদি বা না উপস্থিত হয়, পাঠকসম্প্রদায়ের এবং বাংলা সাহিত্য যাঁদের কাছে শুধু অবসর-বিলাসেরই বস্তু নয়, তাঁদের কাছে বর্ত্তমান সমালোচনা-পদ্ধতিতে চিন্তিত হবার কারণ ঘটেছে। কারণ এর পরিণাম দ্বিবিধ। বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে এর ফলে অকারণ দল সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়, এবং ফলে স্বকীয় দলের ত্রুটি এবং পরকীয় দলের গুণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য সহজেই সম্ভব। কিন্তু এ ছাড়াও বিপদের ব্যাপার, সাহিত্যকে ইতিপূর্ব্বে যাঁরা নব নব পথে চালিত করেছেন, তাঁদের কোন কোন লেখকের প্রতি অমার্জ্জনীয় ঔদাসীন্যের ফলে সাহিত্যের ক্ষতি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথাই আলোচনীয়। অস্বীকার করা চলে না, তাঁর ছন্দোগুণ তাঁর কবিতাকে বহু সময়ে কাব্য-

পদবী থেকে বঞ্চিত করেছে। স্বীকার করা চলে না, রবীন্দ্রনাথের মত সব সময়ে তাঁর আঙ্গিক ও তাঁর রসের অদ্ভুত ভারসাম্যের ফলে লোকোত্তর কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যে পাঠক শুধু কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই রসাস্বাদ করতে ইচ্ছুক নন, কাব্য যাঁর মতে হৃদয়গ্রাহী হবেই এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য হ'লেও কোন ক্ষতি নেই, সে পাঠককে বহু সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় নিরাশ হতে হবে। এমন কি, যাঁরা এ কথা বলবেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের কারিকুরিতে অভ্যস্ত হয়ে বাংলার পাঠকসমাজ যে কিছুদিনের জন্য প্রকৃত কাব্যের রসগ্রহণ হতে পিছিয়ে পড়েছিল, তাঁদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করাও সব সময় সম্ভব নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'তা না হলে সত্যেন্দ্রনাথ' ইত্যাদি একাক্ষর সমালোচনা নিশ্চয়ই সত্যেন্দ্রনাথের উপযুক্ত নয়, এবং সেটা সাহিত্যের মঙ্গলের জন্যই নয়—এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কারণ যদিও সত্যেন্দ্রনাথের এ লাইন কটি :—

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

(চম্পা, 'কাব্যসঞ্চয়ন', পৃ. ৫০)

অজিত দত্তের

সব চেয়ে বড় গোলাপ যেখানে ফোটে, ওড়ে যেথা প্রজাপতি,
তমাল-শ্যামল ছায়া সুশীতল যেথা, কুসুমিত বসুমতী,
... ...
ম্লান জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় যেথা, চাঁপাফুল হয় পরী,
বাতাস যেখানে স্তবগুঞ্জন গায়, শোনে যেথা শর্ব্বরী,
ঋতু বসন্তে চঞ্চল কুসুমেরা, ডাকে যেথা ইসারাতে
তুমি আর আমি যাব সে মধুর দেশে, দোঁহে মিলি এক সাথে।

('পাতালকন্যা', পৃ. ৩৪)

এই লাইন কটির চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট ব'লে অন্তত আমার ধারণা নেই, এবং সে কারণে অজিত দত্ত সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীরব থাকা আধুনিক সমালোচকের পক্ষে সাধুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়—এমন একটা সম্ভবত অন্যায় ধারণা কখনও কখনও নিজের অজ্ঞাতসারে মনে উঁকি মারলেও আমার বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রনাথের এবং অনুরূপ কোন লেখকেরই একাক্ষর সমালোচনার সমর্থন কোনও মতেই চলে না অন্য একটি কারণে। সে কারণটি এই :—সত্যেন্দ্রনাথ যে কারণে আধুনিক পাঠকদের মনস্তুষ্টিতে অপারগ, সে কারণগুলি বিস্তৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করতেই হবে। এবং তাতে যদি একটি তত্ত্বান্বেষী পাঠকের রসবোধও জাগ্রত হয়, তা হ'লেও সাহিত্যের অসীম মঙ্গল। তাই যাঁরা এ যুগের সাহিত্যপ্রধান হবার দাবি করছেন, তাঁরা যদি স্বকীয় রচনাতেই ব্যস্ত থাকেন, তা হ'লেই তাঁদের কর্ত্তব্য সমাপন হ'ল না, স্বকীয় রচনার সঙ্গে পাঠকসমাজ ও লেখকসমাজের রসবোধ-জাগরণ ও রুচি-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও তাঁদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

অধুনা-প্রকাশিত 'বঙ্কিম চরিতে' শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি রচনার গুণাগুণ উল্লেখ করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কৈফিয়তে জানতে পারা গিয়েছিল, আত্মসর্ব্বস্ব হওয়া লেখকপ্রধানের কর্ত্তব্য নয়। 'নতুন লেখক কোন্ দিকে কে হচ্ছে তার দিকে একটু নজর রাখতে হয় বৈ কি'। জনৈক আধুনিক কবি কিছুদিন পূর্ব্বে আক্ষেপ করেছিলেন, সাহিত্যে সাহিত্যিকদের গুরুত্ব ক্ষীয়মান এবং সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ব'লে তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ থেকে বহু কবিই তাঁর সম্বন্ধে কাব্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ যুগের কোন কবিরই হয়তো সে সম্মান মিলবে

না। কথাটি বিশেষ চিন্তনীয়। যাঁরা নিজেদের রচনাকে রসোত্তীর্ণ ব'লে দাবি করেছেন এবং বিদগ্ধ পাঠকেরা যখন সে দাবি স্বীকারে ইতস্তত করেন নি, তখন যদি পাঠকসাধারণে তাঁদের রসোপলব্ধিতে অক্ষম হয়, তাতে আক্ষেপ ক'রে আত্মসংবৃত হয়ে ব'সে থাকা সাহিত্যিক ধর্মের অপমান, কারণ তাঁদের পক্ষে রসোত্তীর্ণ রচনার সঙ্গে সমগ্র সাহিত্যের গতির দিকে লক্ষ্য রাখা এবং পাঠকসমাজের রসবোধ জাগ্রত করা সমান কর্ত্তব্য—এমন কি অনেকের মতেই শেষের ব্যাপারটির গৌরব বেশি।

বাংলা সাহিত্যে অধুনা যে যে লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে, তাতে এ বিষয়টির গুরুত্ব ক্রমবর্দ্ধমান সন্দেহ নেই। পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এমন কি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে রুচিনিয়ামক ও পাঠকদের রসবোধ-নিয়ন্তা হিসেবে যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, সে খ্যাতি তাঁদের সাহিত্যিক যশের চেয়ে কম নয় এবং অনেক বেশি সার্থক। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও রুচিবিভ্রাট প্রকাশ পেয়েছে। এ সময়ে আমাদের সাহিত্যে শুধু যে রসোত্তীর্ণ লেখকেরই প্রয়োজন তা নয়, পাঠকদের জন্য এবং সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য একদল সমালোচকের প্রয়োজন, যাঁরা শুধু স্বকীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রেই ক্ষান্ত হবেন না এবং শুধু যে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দোষই দর্শন করবেন তাই নয়, যাঁরা এ পর্য্যন্ত রসোত্তীর্ণ হন নি অথচ নানা কারণে খ্যাতিলাভ করেছেন বা যাঁরা কোনকালে রসোত্তীর্ণ থাকলেও বর্ত্তমানে নেই, তাঁদের নির্ভীক সমালোচনাতেও কার্পণ্য করবেন না। এই দলের আবির্ভাবের অভাবে রসোত্তীর্ণ পাঠকসমাজ গ'ড়ে ওঠা সম্ভব নয় এবং সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এই কারণেই উজ্জ্বল নয়। বাস্তবিক পক্ষে এমন আশঙ্কাও অমূলক নয় যে, আধুনিক পাঠকেরা আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে

যে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেন, তার মধ্যে তাঁদের সদা-সক্রিয় রসবোধের নিদর্শন ছাড়াও কোন কোন সময় হয়তো প্রচলিত রীতির নিশ্চিন্ত সমর্থনই দেখা যায়। লেখকদের পক্ষে এটি গৌরবের বস্তু নয়। অপর দিকে এ ব্যবস্থায় যতদিন কোন একটি লেখক বা কোন একটি লেখক-সম্প্রদায়ের প্রশংসাই হাল-ফ্যাশান ব'লে পরিচিত থাকবে, ততদিন নতুন শ্রেষ্ঠতর লেখকের আবির্ভাবও সুগম হবে না, কারণ এ সাহিত্যস্তুতিতে বিচার নেই, অনুকরণ আছে। তাই অনেকের পক্ষেই হয়তো বাহ্য কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য কৌলাচারভ্রষ্ট হতে সাহস নেই এবং সে কারণে মানসিক দ্বিধা সুস্পষ্ট হ'লেও প্রকাশ করার সাহস সময়বিশেষে দুর্ঘট হয়ে পড়া আশ্চর্য্য নয়। তাঁকে হাল-ফ্যাশানের সঙ্গে মিল রেখে চলতেই হয়। ভাবতে সাহস হয় না, যাঁরা অধুনা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের মধ্যেও অসঙ্গতি এসেছে কি না! সে কারণে আমরা হয়তো আজ টি. এস. এলিয়টকে (যিনি দশ বছর আগে বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ ব'লেই স্বীকৃত হয়েছিলেন) জ্ঞানগর্ভ বক্রহাসিতে উপেক্ষা করবই, যদিও শেলীর চেয়ে ড্রাইডেন ভাল হতে বাধ্য, এ মতও আমরা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করব; অডেন ইশের-উডের নামে উচ্ছ্বসিত হবই; শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা মাত্রই ভাল হয়েছে মনে করবই এবং যদি সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে, তা হ'লে সে সন্দেহ আমাদের অনুৎকর্ষের চিহ্ন ব'লে সেটিকে সযত্নে গোপন করার চেষ্টা করব; প্রকাশ করতে সাহসী হব না, ডিকেন্স পড়া চলবেই না। আমাদের এ ভীরুতা কাটাবার দিন এসেছে, তা না হ'লে সাহিত্যের প্রগতি সম্ভব নয়। সেই সাহস সঞ্চয়ের জন্য একবার জোর ক'রে বলতেই হবে, সত্যেন্দ্রনাথ ভাল কবি এবং বড় কবি, টেনিসনের কাব্য ভালই, ব্রাউনিং-কাব্য মহৎ এবং ডিকেন্স পড়া অপরাধ নয়, যদিও প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন, এঁদের রচনা এ যুগের বিদগ্ধ পাঠকের মনে হয়তো পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে সক্ষম নয়।

দিঙ্‌নাগ

মরণ আজি মেলেছে পাখা

মরণ আজি মেলেছে পাখা—
কোথায় রবি, কোথায় রাকা !
পক্ষছায়ে পড়েছে ঢাকা
বিশ্ব ;
ঝাপটি পাখা ঝটিকা তুলি
উড়ায়ে দূরে ধ্বংস-ধূলি,
ধরেছে ধরা শ্মশান-চুলী-
দৃশ্য ।

মানুষ হোথা শ্বাপদ সম
অথবা ক্রূর ভুজঙ্গম
বেঁধেছে বাসা অন্ধতম
গর্ত্তে,
সহসা মেঘে মেলিয়া ডানা
দীর্ণ করি আকাশখানা
মৃত্যু দিল আসিয়া হানা
মর্ত্ত্যে ।

সে যেন শ্যেন শিকার-হারা—
হিংস্র দুটি নয়ন-তারা
দূরবিসারী আলোক-পারা
দীপ্ত,
ভ্রমিয়া ফিরে নীলিম নভে
গগন ছেয়ে সঘন রবে
নরমৃগয়া-মহোৎসবে
ক্ষিপ্ত ।

ছিন্ন শিরা ছিন্ন স্নায়ু
অযুত নর হারায় আয়ু
বাষ্প-বিষে জীবন-বায়ু
বন্ধ,
শোণিতধারা সিক্ত ভূমে
লুটায় সবে মরণ-ঘুমে,
ধরণী হ'ল ধূলি ও ধূমে
অন্ধ ।

শোণিত-ক্লেদ-পঙ্করাশি
অঙ্গে মাখি অট্টহাসি
নাচিছে কে ও সর্ব্বনাশী
চণ্ডী,
মথিত করি নৃত্যছলে
মত্ত তার চরণতলে
ভণ্ড ভীরু দৈত্যদলে
দণ্ডি !

দানব-বল-দম্ভহরা !
চূর্ণ কর জীর্ণ-জরা
যুগান্তের কলুষ-ভরা
কৃষ্টি !
জ্বালাও রোষ-অনলে তব
সভ্যতার গলিত শব !
ভস্ম হতে জাগিবে নব
সৃষ্টি ।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

পন্নগ ও বিহঙ্গ

কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী সিগারের ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিয়াছি। ইয়ং-মেন্‌স রেস্তরাঁয় বসিয়া ছিলাম।

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। হোটেলটিতে শুধু আমি আর হোটেলের ম্যানেজার হরিসহায় ; আর কেহ নাই।

পাশের সিনেমা-হাউস এখন স্তব্ধ—ইভ্‌নিং শো এখনও শেষ হয় নাই। নগরীর কোলাহল এখনও কিছুমাত্র কমে নাই। জনতার স্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। রাত্রি শহরের রূপ বদলাইয়া দিয়াছে। দোকানে দোকানে রেডিওর গান। অত্যুজ্জ্বল আলোক-মালায় সজ্জিত শহর। দিনের কদর্য্যতা সব ঢাকা পড়িয়াছে। কলহাস্য-মুখর যুবক যুবতী হাতে হাত দিয়া চলিয়াছে। শাড়ি স্কার্ট আর ফ্রকের বাহার, এসেন্স আর পাউডারের গন্ধ মাঝে মাঝে মনে মোহ আনে। পানের দোকানে প্রতিদিনের ন্যায় ভিড় ; সেখানেও রেডিও বাজে। কালিঘাট, এস্‌প্ল্যানেড—ট্রাম ও বাস কণ্ডাক্টারগণের হাঁক কানে আসে।

পথের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে সেই দৃশ্যই দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই একজন পকেটমারকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস সাব-ইন্‌স্পেক্টরের হাস্যকর প্রশ্ন মনে পড়িতেছে।

কেন পকেট কেটেছিলি, বল ব্যাটা ?

খেতে পাই না সার্।—পানের ছোপ-লাগা লাল কালো দাঁত বাহির করিয়া গ্রন্থিছেদক উত্তর দিয়াছে।

হরিসহায়ের এই হোটেলটি কলেজের ছাত্রদের একটি আড্ডাবিশেষ

—সুতরাং হরিসহায় মার্ক্সিজম্ সম্বন্ধে কিছু কিছু ওয়াকিবহাল। তিনি মার্ক্সীয় দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বুঝাইবার জন্য অনর্গল বকিয়া চলিয়াছেন যে, পকেটমারের কোন দোষ নাই, দোষ যত যাহার পকেটে টাকা ছিল তাহার।

হরিসহায়ের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে এবং সিগারে টান দিতে দিতেই ঝিমাইতেছিলাম। এভাবে আর বেশিক্ষণ চলিল না। সোজা উঠিয়া বসিতে হইল। ওপারের ফুটপাথের ল্যাম্প-পোস্টের সামনের চওড়া গলিটার মোড়ে হঠাৎ একটা সোরগোল উঠিল। দেখিতে দেখিতে লোকজনও জমিতে সুরু হইল। গোলমাল আর থামে না।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সিগারটায় একটা শেষ টান দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া গোলমালের কারণটা জানিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

গলির ভিতরে ঢুকিয়াই ডানহাতি যে বাড়িটা পড়ে, তাহার সম্মুখেই বেশি ভিড়। বাড়িটার ড্রইং-রুমের সামনেই একটা ছোট বারান্দা। সেই বারান্দার এক কোণে অবিন্যস্তকেশা, বিস্রস্তবাসা একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী অধোবদনে দণ্ডায়মানা। সেই বারান্দাতেই একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবককে লোক ধরিয়া রাখিয়াছে। উত্তেজনায় যুবকের চোখ মুখ লাল, সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং চীৎকার করিতেছে, Eliza, Eliza! Oh! You, you Eliza! Leave me, leave me, I will kill her, I will kill her—

যাহারা ভিড় করিয়াছিল, তাহারা ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিলেও তামাসাটা বেশ উপভোগ করিতেছিল।

* * *

নিম্নতম-মধ্যবিত্তশ্রেণীর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার—জন স্মিথ

তাহার কর্ত্তা। জন প্রচলিত অর্থে ঠিক সাধুও নয়, আবার অসাধুও নয়। একটা বড় কণ্ট্রাক্টরের ফার্মে কুলী খাটাইবার কাজ সে করে। যে মাহিনা পায়, তাহাতে বস্তিতে বাসা বাঁধিলে সেখানকার বাসিন্দাদের নিকট বড়-লোক আখ্যা পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু যৎসামান্য ভদ্রতার মুখোশটুকু পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইলে অতি হীনভাবে জীবন-যাপন করিতে হয়। বস্তির জীবন বরণ করায় বাধা আছে—কটা চামড়ার আভিজাত্য ভুলিতে পারা সহজ কথা নয়। তাই শত বিড়ম্বনা সহিয়াও চর্ম্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হয়।

কুলীদের মাহিনা হইতে মাথা পিছু কিছু পয়সা কাটিয়া লইয়া পকেট ভর্ত্তি করার প্রথা এতই সুপ্রচলিত যে, উহাকে অসাধুতা আখ্যা দেওয়া কঠিন। জনও তাহাই করে। সে অর্থে পকেট ভর্ত্তি অবশ্য ঠিক হয় না—কারণ সে পয়সাটা শুঁড়ীর দোকানেই যায়। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির অবসাদ দূর করিবার একটা উপায় চাই তো! তাই বলিয়া জনের মনুষ্যত্ব লোপ পায় নাই। মত্ত অবস্থায় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে প্রহার হয়তো সে করে; কিন্তু পরে অনুতপ্তও হয়। স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট যেন না হয়, সেদিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি। মদ্যপ হইলে কি হয়, ছেলে-মেয়েরা যাহাতে উন্নত চরিত্রের হয়, সেদিকেও সে কিছু কিছু লক্ষ্য রাখে।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসরের পর বৎসর যায়। কালের চাকা স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুরিতে থাকে।

জনের বয়স হইয়াছে। তাহার দুই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বামীর ঘর করিতেছে। ছেলেও বড় হইয়াছে, জাহাজে কাজ করে। বৎসরে হয়তো দুই একবার পিতার কাছে আসে, আবার চলিয়া যায়। পিতার ন্যায়ই সে মদ্যপায়ী, উপরন্তু চরিত্রহীন।

এলিজা জনের সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যা।

বৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জন একেবারে শক্তিহীন হয় নাই। মত্তাবস্থায় আসিয়া একদিন স্ত্রী আগাথাকে সে পদাঘাত করে। সেই আঘাতের ফলে আগাথা শয্যাগ্রহণ করে। পরে সমাধিস্থানে নয় হাত মাটির নীচে তাহার জন্য একটা পাকাপাকি শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়।

নেশার ঘোর কাটিবার পর জন অনুতপ্ত হইয়াছিল বইকি। যুবা-বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুতে একটা ক্ষণিক শোকের ঝড় বহিয়া যায় সত্য, কিন্তু বৃদ্ধের স্ত্রী মরিলে তাহার শোক আরও বেশি মর্ম্মান্তিক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। মাতাল, দরিদ্র এবং কুলীর রক্তশোষক জনও ভাঙিয়া পড়ে। শুধু সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অবলম্বনের পরিসমাপ্তিই তাহাকে অতটা মুহ্যমান করে না। স্ত্রীর মৃত্যুর কারণটা ভুলিতে পারিবে অতটা হৃদয়হীন জন নহে। কুলীর গ্রাসাচ্ছাদনে ভাগ বসাইলেই একেবারে পাষাণ হয়তো হওয়া যায় না।

কিন্তু শোক ভুলিবার চেষ্টা মানুষে করে। শোক-বিলাস করা জনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়, এবং জনের মত লোক শোক নিবারণ করিতে পারে কেবলমাত্র একটি উপায়ে। সুতরাং মদ, আরও মদ—সুরাই হয় একমাত্র সঙ্গী।

এই পরিবেষ্টনীর মধ্যে এলিজা বাড়িয়াছে। কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে।

চাকুরি লোকের চিরদিন থাকে না। বয়স হইলেও অবসর লইতে হয়। অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না। স্ত্রী না মরিলে জন হয়তো আরও কিছুদিন কাজ করিতে পারিত, হয়তো বয়সের কথা উঠিত না। প্রাইভেট ফার্মে অতটা কড়াকড়ি করে না। মদের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার জন্যই জনের চাকুরি গেল।

মদের মাত্রা "অতিরিক্তের" উপরে উঠিল।

মদ্যপ ও মাতৃহন্তা পিতাকে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী হয়তো ঘৃণা এবং ভয় করাই এলিজার উচিত ছিল। কিন্তু এলিজার বেলা ঠিক বিপরীত-টাই ঘটিল। হয়তো উহা স্বাভাবিক নহে; কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছুই বাঁধাধরা নিয়মে চলে না।

এলিজা সুন্দরী; বরং বড় বেশি সুন্দরী। সামর্থ্য নাই বলিয়া যদিও রুজ, পাউডার, পোমেড, লিপ্‌স্টিক প্রভৃতি এলিজা ব্যবহার করে না, তবু তাহার রূপ অসাধারণ। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে না বলিয়াই হয়তো তাহার রূপ বিস্ময়কর। তাহার রূপ বহ্নিশিখার জ্বালাময়ী রূপ নয়, সে রূপ লালসার ইন্ধন যোগায় না। লুব্ধ মানুষকে আগুনে ঝাঁপ দিবার জন্য দুর্নিবার আকর্ষণে টানে না। সন্ধ্যায় নিস্তরঙ্গ নদীর যে শান্ত মাদকতাময় রূপ দেখা যায়, এলিজার রূপের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

এলিজা সংযতবাক্। কথা কম কহে। বড় চাপা স্বভাব।

জন ভাগ্যবান। ভাগ্যবান এই অর্থে যে, চাকুরি যাইবার ফলে ভয়াবহ বর্ত্তমান ও ততোধিক আতঙ্কজনক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কড়িকাঠের আংটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিবার এবং উহারই সহিত রজ্জু সংলগ্ন করিয়া একটা সহজ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুঃখকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা যখন তাহার মনে অহরহ জাগিতেছিল, সেই সময় এলিজা একটা মার্চেন্ট অফিসে স্টেনোগ্রাফারের চাকুরি পাইয়া গেল। মাহিনা বড় কম। তবু একেবারে অসহায় অবস্থা আর রহিল না।

কিন্তু অবস্থা যে খুব বিশেষ ভাল হইল, তাহা নহে—হইবার কথাও নহে। বহুদিনের পুরাতন অভ্যাস সহস্র অবস্থা-বিপর্য্যয়েও ছাড়ে না—জন মদ ছাড়িতে পারিল না। টাকা কিন্তু এলিজার হাতে, এবং সে

বড় কঠিন ঠাঁই। আশ্চর্য্যের বিষয়, জন অনুযোগ, অভিযোগ, অভিমান, রাগারাগি, কোনটার মধ্যেই গেল না। তাহার ধমনীতে যে ভদ্র ব্রিটিশ সন্তানের রক্ত বহিতেছিল, তাহাই বোধ হয় মুখ ফুটিয়া আত্মজার নিকট হাত পাতিতে জনকে সঙ্কুচিত করিল। মদের খরচার যোগান দিল এলিজা নিজেই। মদ না পাইলে বুড়ো জন মড়ার মত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকে। এ দৃশ্য এলিজা সহ্য করিতে পারে না, নিজেই মদ আনিয়া দেয়।

আরও দিন যায়। এলিজা কাজ করে। জনের অভিভাবকগিরি করে।

যুবতী নারী, তায় রূপসী। জ্বালাময়ী রূপ না থাকিলে কি হয়, স্নিগ্ধ শান্ত রূপেও মানুষ আকৃষ্ট হয়। রিরংসা-জর্জ্জরিত যুবকেরও অভাব নাই। কালিদাসও সরস্বতীর বক্ষের বন্দনাই প্রথমে করিয়াছিল।

মধুমক্ষিকার গুঞ্জন আরম্ভ হয়। এলিজা যখন বাড়ি ফিরিয়া আসে, তখন তাহারই ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ভিক্টর, জিম আর টমেরা অকারণেই শিস দেয় না, অকারণেই বাছিয়া বাছিয়া প্রেমের গান গাহে না। গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেও বিরত হয় না। যখন এলিজা সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হয়, তখন ফেউয়ের ন্যায় পিছু পিছু ঘুরিয়াও বেড়ায়।

সঙ্গিনীরাও খবর পায়। তাহারা হাসে। ইঙ্গিতময় হাসি।

সংসারে থাকিয়া ভরা-যৌবনে সাধারণত কেহ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে না। এলিজারও সঙ্গিনীর অভাব নাই। এলিজার নিজের বেশি উৎসাহ না থাকা সত্ত্বেও সঙ্গিনীদের তাহার প্রতি টান বড় বেশি। মেরী, জ্যানেট, ক্যাথ্‌রিন তাহার সহিত গায়ে পড়িয়া মাখামাখি করে। সঙ্গিনীদের হাব-ভাব রকম-সকমে এলিজা মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়।

মেরী, জ্যানেট বা ক্যাথ্‌রিন, কেহই যৌবনে যোগিনী সাজিয়া বসে নাই। তাহারা সর্ব্বদাই ফিটফাট হইয়া সাজিয়া-গুজিয়া বেড়ায়। দামী দামী জামা-কাপড়, স্নো, সেন্ট ব্যবহার করে। ওষ্ঠ লিপ্‌স্টিকে রঞ্জিত না করিয়া পথে বাহির হয় না। এক দিন দুই দিন অন্তর সিনেমা দেখে। হাসি, গান আর গল্প লাগিয়াই আছে। কখনও বিমর্ষ ভাব দেখা যায় না। গল্প চলে হয় সিনেমার উপর, নয়তো বয়-ফ্রেণ্ডদের লইয়া। নিত্য-নূতন বয়-ফ্রেণ্ডদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সবই চার্মিং। সিনেমার নায়ক-নায়িকাও চার্মিং; নব নব বয়-ফ্রেণ্ডরাও চার্মিং; নামজাদা বড় হোটেলের ডিনার ও মদও চার্মিং; অন্যান্য বান্ধবীদের কেলেঙ্কারির খবরও চার্মিং। ইহারই উপর গল্প চলে। পুরাতন হয় না, একঘেয়ে হয় না। উহাতেই আনন্দ।

এলিজা জানে, অত বিবিয়ানা করিবার মত আদৌ উহাদের অবস্থা নয়। পয়সা কোথা হইতে পায়? প্রশ্ন জাগে এলিজার মনে। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসাও করে। জ্যানেট ও ক্যাথ্‌রিন মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া যায়, সোজা উত্তর দেয় না। মেরী ফস করিয়া জবাব দেয়, পৃথিবীতে মূর্খ পুরুষমানুষ বাঁচিয়া থাকিতে যুবতী নারীর আবার পয়সার ভাবনা কি? আদর করিয়া এলিজার পিঠ চাপড়াইয়া মেরী বলে, মূর্খ এলিজা, দুঃখ জীবনে আছেই, থাকিবেও, তবু যে কয়দিন পারা যায় জীবনটাকে উপভোগ কর—একটু ফুর্ত্তি করিয়া লও। বয়স হইলে আপসোস করিবে, অনুশোচনার আর অন্ত থাকিবে না।

এলিজা গম্ভীর হইয়া যায়।

পথে পথে সিনেমার মনোহারী বিজ্ঞাপন। বিপণিতে বিপণিতে রমণীমনোহর দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বস্তুর সমাবেশ। হাতছানি দিয়া

তাহারা যেন ডাকে, এলিজা আমরা তোমারই। সিনেমা-হাউসগুলির সম্মুখে বড় বড় পোস্টার আর প্ল্যাকার্ড। প্রেমিক-প্রেমিকার বিভিন্ন লোভনীয় অভিব্যক্তি। সুদর্শন যুবক সুন্দরী যুবতীকে বক্ষে জড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত। এলিজা দেখিয়া চক্ষু নামাইয়া লয়। আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পিছু ফিরিয়া অতি সন্তর্পণে সেই ছবিরই দিকে তাকায়। চারিদিকে শুধু যেন আনন্দ, যৌবনেরই জয়গান। আনন্দ শুধু আনন্দ, দুঃখ যেন লজ্জায় লোকালয়ে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। শুধু মাঝে মাঝে কুষ্ঠরোগী, অন্ধ, খঞ্জ ভিখারীর আতুর অঞ্জলি, অফিস-ফেরতা নতমস্তক কেরানীদের দৃশ্য ক্ষণিকের জন্য একটা রূঢ় আঘাত দিয়া বাস্তবের অন্য দিকটা মেলিয়া ধরে। কেহ কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপও করে না। সন্ধ্যায় জোড়ে জোড়ে নরনারী চলে। আনন্দ শুধু আনন্দ। কাহারও সাজসজ্জা চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। এলিজা নিজের বসন-ভূষণের প্রতি চাহিয়া লজ্জা পায়। অক্ষম আক্রোশে নিজের সাদা ধবধবে হাত দুইটা নিজেই বারেকের জন্য কামড়াইয়া ধরেও বুঝি। পার্কেও প্রেমেরই লীলা চলে। হোটেলে পানাহাররত মানবসন্তানদের হাসির হররা রাস্তায় ভাসিয়া আসে। নিরানন্দ শুধু এলিজারই জন্য। সহস্র মণ ওজনের ভার এলিজার মাথায় চাপিয়া বসিতে থাকে।

পোস্টারে দেখা সুদর্শন নায়কের ছবি বার বার মনে ভাসিয়া আসে। নায়ক নায়িকাকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত কি করিল? জীবনটাকে উপভোগ কর—একটু ফুর্ত্তি করিয়া লও। বয়স হইলে আপসোস করিবে, অনুশোচনার আর অন্ত থাকিবে না। জীবনটাকে উপভোগ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন—পৃথিবীতে মূর্খ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিতে যুবতী নারীর আবার পয়সার ভাবনা কি?—মেরী তো সেইদিনই বলিয়াছে।

রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে অনাবশ্যক বসন পরিত্যাগ করিয়া আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এলিজা নিজেই নিজেকে দেখিয়া বিস্মিত হয়। এত তাহার রূপ, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহার যৌবনের কলোচ্ছাস! বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সে নিজেকে মুগ্ধ নয়নে দেখিতে থাকে। হাত, পা, বক্ষ, সব টিপিয়া টিপিয়া নিজেকে অনুভব করে। তাহার এই রূপ, এই যৌবন কি শুধু জনের তত্ত্বাবধান করিয়াই কাটিয়া যাইবে? প্রতি ধমনীতে, প্রতি শিরায় এলিজা উষ্ণ রক্তের প্রবাহ অনুভব করে। মাথায় তাহার আগুন ছুটিতে থাকে। কিন্তু ভিক্টর, জিম, বা টমের নিকট আত্মসমর্পণের চিন্তায় পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এলিজার ক্ষুধা মিটাইতে পারে তেমন ক্ষমতা তাহাদের নাই।

এক স্মরণীয় সন্ধ্যায় মেরী আসিয়া বলিল, চল এলিজা, বেড়াইতে যাই।

মেরীর বেশবাস সবই উৎকৃষ্ট, তাহার পাশে দাঁড়াইতেই এলিজার লজ্জা হয়।

এলিজা বলিল, তোমার সহিত এই বেশে যাইতে লজ্জা হয় মেরী।

মেরী হাসিল—গূঢ় রহস্যভরা হাসি। বলিল, কোন চিন্তা নাই, তুমি আমার সঙ্গে চলই না।

পথে বাহির হইয়া মেরী বলিল, একটা ভাল কার্নিভাল কিছুদিন এখানে আসিয়াছে, সেখানে যাইবে?

কিছু না ভাবিয়াই এলিজা উত্তর দিল, চল।

সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ ধর্ম্মতলার কাছে আসিয়া যেখানে মিশিয়াছে,

তাহারই কাছে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া কার্নিভাল বসিয়াছে। সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক আলোয় রাত্রি দিন হইয়া গিয়াছে। মেরী এলিজাকে লইয়া কার্নিভালে প্রবেশ করিল।

সুবেশ, সুকেশ, হাস্যোজ্জ্বল তরুণ-তরুণীরই মেলা। ঝকঝকে নূতন নূতন 'কারে' করিয়া মেয়ে পুরুষ আসিতেছে যাইতেছে। Merry go round-এ অশ্বপৃষ্ঠে ভয়ের ভান করিয়া যুবতীরা যুবকদের জড়াইয়া ধরিয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে। চারিদিকে হাসির ঘটা। এক দিকে হাওয়াইন ডান্স, জয়-হুইল, অন্য দিকে লোমহর্ষণকারী মোটর-বাইকের খেলা। কার্নিভালের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ কিন্তু অন্যত্র। সেখানে Try your luck Sir, try your luck Madam চলিতেছে।

কার্নিভালের চতুর্দ্দিকে একটা টহল দিয়া মেরী সেইখানেই ভিড়িল। 'ডার্ট' খেলা চলিয়াছে।

মেরী বলিল, খেলিবে নাকি এলিজা?

এলিজা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, না।

মেরী খেলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মেরী হারিতে সুরু করিল। কিছু পরে একটু পড়তা ফিরিল। প্রত্যেকের মুখেই চাপা উত্তেজনার ছাপ। শুধু খেলা দেখিয়াই এলিজার কান গরম হইয়া উঠিল।

এলিজা মেরীকে ফিরিবার জন্য তাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মেরীর পঞ্চাশটা টাকা গেল। পাঁচ নম্বর, যে ঘরে মেরী ধরিয়াছিল, একটা তীরও সে ঘর বিদ্ধ করে নাই। মেরী কিন্তু হারিয়া আদৌ বিচলিত হয় নাই। নির্ব্বিকার চিত্তে সে কুড়িখানা দশ টাকার নোট আবার পাঁচ নম্বরে ধরিয়া দিল। অবাক হইয়া এলিজা মেরীর প্রতি চাহিল; মেরী করিতেছে কি! বাধা দিবার পূর্ব্বেই টাকা কাউন্টারে রাখা হইয়া গিয়াছে। বাজি ধরিয়াছে মেরী, কিন্তু ঘাম ছুটিতেছে এলিজার।

আবার তীর ছুটিল। তীর ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে এলিজা তাহার স্বভাবসিদ্ধ সংযম ত্যাগ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, Number five, number five। পাঁচ নম্বরই আসিয়াছে। পর পর আরও চারিটি তীর ছুটিল। পাঁচটির মধ্যে তিনটি তীর পাঁচ নম্বর বিদ্ধ করিয়াছে। মেরী আট শত টাকার নোট গুনিয়া হ্যাণ্ডব্যাগে ভরিয়া এলিজার কাঁধে হাত দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

Let us have some drinks.—বাহিরে আসিয়া মেরী বলিল।

উত্তেজনায় এলিজার মাথা ঘুরিতেছে। অত অল্প সময়ের মধ্যে মেরী অত টাকা উপায় করিয়াছে; ইহাই বার বার তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে।

একজন যুবক তাহার গা ঘেঁষিয়া ধাক্কা মারিয়া গেল। হাসিয়া চোখ টিপিয়া "Sorry"ও বলিল।

মেরী এলিজাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। সারি সারি রংবেরঙের পানীয় বোতলে সজ্জিত। উগ্রতর পানীয়ও লোভনীয়ভাবে রাখা রহিয়াছে।

চেয়ারে উপবেশন করিয়া মেরী অর্ডার দিল, বয়, দো গ্লাস লেমন ক্রাপ।

Why are you looking so agitated Eliza?

Oh, it's nothing. I am only feeling a slight headache Mary.

Have a stronger drink, it will soothe your nerves.

এলিজা জীবনে কয়বার কড়া পানীয় আস্বাদন করিয়াছে, তাহা আঙুলে গুনিয়া বলিতে পারে। মাথা নাড়িয়া সে আপত্তি জানাইল। মেরী কিন্তু এক এক করিয়া তাহার সকল যুক্তি খণ্ডন করিল। শেষ

পর্য্যন্ত এলিজার আপত্তি টিকিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে এলিজা চার পেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করিল।

উত্তেজনা কিন্তু প্রশমিত হইল না।

এলিজাকে লইয়া মেরী কার্নিভালে আবার একটা টহল দিয়া যেখানে ডার্ট খেলা চলিতেছিল, সেইখানেই ফিরিয়া আসিল।

মেরী হাসিল, খেলিবে নাকি এলিজা?

পয়সা নাই।—এলিজাও হাসিল। চেষ্টাকৃত হাসি।

পয়সার আবার ভাবনা কি? আমার কাছে টাকা আছে, যত লাগে দিব।

হারিলে শোধ করিব কি করিয়া মেরী?

হারিবেই এ কথা তোমায় কে বলিল, একটু বরাতটা পরীক্ষা করিয়াই দেখ না। অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া একই ঘরে ডবল করিয়া যাইও, একবার না একবার আসিবেই।

বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় নিষ্প্রভ একখানি চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িল।

সায়কের পর সায়ক ছুটিতেছে।

এলিজা জিতিতেছে।

মেরী বলিল, এই ভাবে খেলিলে ভাল করিয়া জিতিতে পারিবে না এলিজা। আরও বেশি বেশি করিয়া দান ধর।

দান আসা বন্ধ হইয়াছে।

নয় নম্বর। পাঁচ, দশ, কুড়ি, চল্লিশ, আশি, একশো ষাট।

একই ঘরে ডবল করিয়া যাইও; একবার না একবার আসিবেই।

এলিজার জামা-কাপড় সমস্ত ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। কান দিয়া যেন আগুনের হল্কা ছুটিতেছে।

মেরীর চোখ দুইটা জ্বলিতেছে।

ভয় কি এলিজা, এবার তিনশো কুড়ি টাকা ধরিয়া দাও। এবার আসিবেই।—মেরী ব্যাগ খুলিয়া নোটের তাড়া বাহির করিল।

না না, অত টাকা ধরিব না।—অস্ফুট স্বরে এলিজা বলিল।

Absurd, how are you going to make up your losses then?

দুইশোয় রফা হইল। দুইটা একশো টাকার নোট এলিজার হইয়া মেরী নয় নম্বরে ধরিয়া দিল।

Come on...come on...try your luck...Any more... any more...No more...Start.

Number one...number three...number ten...Number three...number three...Lucky three.

Come on...come on...try your luck...try your luck.

মেরীর ওষ্ঠের কোণে চকিতের জন্য একটা হাসির রেখা যেন একবার দেখা দিয়াই আবার মিলাইয়া গেল।

আবার ধর এলিজা, এবার চারশো।—মেরী আবার ব্যাগ বাহির করিল।

না—না—না। এলিজা কোনমতে মেরীর কাঁধ ধরিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। কাহারও মুখে কথা নাই। কার্নিভাল ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া নিঃশব্দে দুইজনে চলিতে লাগিল। কোন্ রাস্তা দিয়া যে তাহারা চলিয়াছে, সেদিকে এলিজার লক্ষ্য নাই।

একটা হোটেলের সামনে আসিয়া মেরী মৌন ভঙ্গ করিল, "Come Eliza, let us have some drinks."

মন্ত্রচালিতের ন্যায় এলিজা তাহার অনুসরণ করিল।

উগ্র পানীয় আসিল। এলিজা কোন কথা বলিল না, প্রতিবাদ

করিল না। এক নিশ্বাসে সমস্তটাই ঢকঢক করিয়া পান করিয়া গেলাসটা সশব্দে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দিল।

মেরী বয়কে ইঙ্গিত করিল। বয় আসিয়া আবার গ্লাস ভরিয়া দিল। এক বার, দুই বার, তিন বার, চার বার।

মেরী উঠিল, এলিজাও। পথে বাহির হইয়া এলিজার মুখে কথা ফুটিল, কি করিয়া তোমার টাকা শোধ করিব মেরী?

মেরী তাহার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, তাহার জন্য ভাবনা কি? তুমি আমার সঙ্গে চলই না।

একটা বড় গলির ভিতরে ঢুকিয়া ছোট একটা সুসজ্জিত বাড়ির ফটক খুলিয়া মেরী এলিজাকে লইয়া প্রবেশ করিল। ড্রইং-রুমের ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল।

আরে, মেরী যে, কি সৌভাগ্য! এস, এস।—হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধা দুইজনকেই হাত ধরিয়া ড্রইং-রুমের ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া কৌচে বসিয়া মেরী বলিল, মিসেস হিগিন্স, ইনি আমার বান্ধবী এলিজা। এবং এলিজার দিকে ঘুরিয়া বলিল, এলিজা, ইনি আমার ডিয়ার আন্টি মিসেস হিগিন্স।

মিসেস হিগিন্স দুই বাহু দিয়া এলিজাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, Why didn't you come to me before, naughty girl?

বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া মিসেস হিগিন্সের মুখে পড়িয়াছে। বৃদ্ধা হইলে কি হয়, সাজসজ্জায় মিসেস হিগিন্স এখনও যে কোন সোসাইটি-গার্লের সহিত টেক্কা দিতে পারে। মুখময় পাউডার, ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক আর গালে রুজ ঠিক আছে। অঙ্গে বহুবর্ণ-বিচিত্রিত ফ্রক।

ককটেল আসিল।

মিসেস হিগিন্স এত বকিতেও জানে!

রূপ যৌবন লইয়া যাহারা চুপচাপ বসিয়া থাকে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় মূর্খ আর নাই। ঈশ্বর রূপ যৌবন নারীকে দিয়াছেন কিসের জন্য? উপভোগ করিবার জন্য। যাহারা এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারে না, বয়স চলিয়া গেলে অনুতাপ করিয়াই তাহাদের জীবন কাটাইতে হয়। রূপ থাকিলে, যৌবন থাকিলে, সমস্ত পৃথিবী আপনি পায়ে লুটাইয়া পড়ে। যত কাম্য বস্তু, যত ভোগ্য বস্তু, সবই অযাচিত-ভাবেই আসে। পৃথিবী দুঃখদারিদ্র্যময় সত্য, কিন্তু যাহার রূপ আছে, যাহার যৌবন আছে, তাহার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ? মিসেস হিগিন্স আপন মনেই বকিয়া চলিয়াছে, বকিয়া চলিয়াছে।

এলিজা নির্জ্জীবের ন্যায় শুনিতেছে।

মেরী হঠাৎ হাসিয়া মিসেস হিগিন্সের বাক্যস্রোতে বাধা দিল, বলিল, জান মিসেস হিগিন্স, আজ একটা বড় মজার ব্যাপার হইয়াছে।

কি আবার হইল মেরী?—মিসেস হিগিন্সের কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য।

সে এক ভারী মজার ব্যাপার, হিঃ হিঃ হিঃ—মেরীর হাসি আর থামিতেই চাহে না, এলিজা আজ কার্নিভালে যাইয়া আমার নিকট হইতে প্রায় পাঁচশো টাকা লইয়া হারিয়াছে। এলিজার তাই আর ভাবনার অন্ত নাই। বলিতেছে, মেরী, তোমার টাকা আমি কি করিয়া শোধ করিব? কি করিয়া শোধ করিবে? হিঃ হিঃ হিঃ।

তাই নাকি? হিঃ হিঃ হিঃ।—মুখে রুমাল গুঁজিয়া মিসেস হিগিন্সও হাসিতে হাসিতে ভাঙিয়া পড়িল।

তুচ্ছ পাঁচশোটা টাকা কি করিয়া শোধ করিবে, তাহারই ভাবনায় এলিজা চিন্তাকুল, ইহা অপেক্ষা হাসির কথা আর কি হইতে পারে!

তোমার আবার টাকার ভাবনা? কত টাকা তুমি চাও এলিজা?

লোকে সাধিয়া আসিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব দিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

মিসেস হিগিন্স হাসিতেছে। তাহার চোখে মুখে কদর্য্য ইঙ্গিত। এলিজার নেশা ছুটিয়া যাইতেছে। এসবের অর্থ কি? মেরী হাসিতেছে। নাগিনীর অসহায় শিকার ধরিবার হাসি!

কত টাকা তোমার চাই এলিজা? মিসেস হিগিন্স আবার প্রশ্ন করিল।—ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সুখ, এসব তোমারই জন্য। তুমি একবার চাহিলেই হয় এলিজা। তুমি ইচ্ছা করিলেই হয় এলিজা। শত শত অর্থবান, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান যুবক তোমার সামান্য কৃপা পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অর্থ চাও—কত চাও? শুধু অর্থ নহে, চাহিবার আরও অনেক কিছু আছে। তুমি যাহা চাও তাহাই পাইবে। বল, বল এলিজা, তুমি কি চাও বল।

মিসেস হিগিন্স বারবার একই কথা বলিয়া চলিয়াছে, বলিয়া চলিয়াছে, বলিয়া চলিয়াছে। তাহার কথাগুলি ধীরে ধীরে এলিজার উপর সম্মোহনশক্তি বিস্তার করিতেছে।

হ্যারল্ডকে কি তুমি চেন এলিজা? শত শত যুবতী যাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত, সেই হ্যারল্ড তোমার পায়ে লুটাইবে। বুঝিয়াছ, বুঝিয়াছ এলিজা? তুমি তাহার সহিত শুধু একবার পরিচয় কর এলিজা। যাহা কিছু কাম্য তোমার আছে, সবই সে তোমাকে দিবে। কোন সাধই সে তোমার অপূর্ণ রাখিবে না। আমি ডাকিলেই সে আসিবে। দেখিবে, দেখিবে তাহাকে এলিজা?

এলিজা মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মেরী একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

মিসেস হিগিন্স পাশের ঘরে যাইয়া ফোন তুলিয়া লইল।

এলিজা হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ চোখ ঘোর রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। নাসা স্ফুরিত। নেশা ছুটিয়াছে।

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এলিজা কহিল, Mary! You have brought me here for this!

এলিজা আর দাঁড়াইল না, মেরীর চোখের পলক পড়িবার পূর্ব্বেই বিদ্যুৎবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিতেই এলিজা জনের সামনে পড়িল। জন তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া আশঙ্কান্বিত হইয়া জন জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে তোর এলিজা, অসুখ করিয়াছে নাকি?

এলিজা বোধ হয় এই প্রথম মিথ্যা কথা বলিল, অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, হ্যাঁ, মাথাটা বড় ধরিয়াছে, আমি আর রাত্রে কিছু খাইব না।

এলিজা নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ এলিজার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া এলিজা উঠিয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানাও। এলিজা স্বপ্ন দেখিতেছিল, একজন সুবেশ সুপুরুষ যুবকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিতেছে, হ্যারল্ড, ডিয়ার ডিয়ার! সেই অ্যাপোলোকান্তি যুবক দুই বাহু দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া চুম্বন করিবার জন্য মুখ নামাইয়াছে। ঠিক সেই সময় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে।

মাসের পাঁচ তারিখ। এলিজা সেদিন মাহিনা পাইয়াছে। অফিসে কাজ থাকার জন্য ছুটি হইতে দেরি হইল। অফিস হইতে এলিজা যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে। বাড়ি ফিরিবার পথেই

কার্নিভালটা পড়ে, কার্নিভালের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে এলিজা থমকিয়া দাঁড়াইল। অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত কার্নিভাল চুম্বকের ন্যায় তাহাকে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। মেরীর টাকা শোধ দিতে হইবে। মন্ত্রচালিতের ন্যায় এলিজা একটা টিকিট কিনিয়া কার্নিভালে প্রবেশ করিল।

Try your luck Sir...Try your luck Madam...Try your luck...try your luck...Come on...come on...

মেরী তো সেদিন জিতিয়াছিল। মেরীর টাকা শোধ করিতে হইবে। অদৃশ্য একটা হাত যেন এলিজাকে টানিয়া যেখানে ডার্ট-খেলা চলিতেছিল, সেইখানে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

ওরূপ জায়গায় দাঁড়াইয়া বেশিক্ষণ খেলা দেখা চলে না। আপনা হইতেই ব্যাগ হইতে টাকা বাহির হইয়া কাউন্টারে যাইয়া পড়ে।

চকচকে, তীক্ষ্ণ, সুদৃশ্য পালক লাগানো সায়কের পর সায়ক ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে লাগিল—ছুটিতে লাগিল—ছুটিতে লাগিল। নির্ম্মম নিষ্ঠুর তীরগুলি বারবার বোর্ডের বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া বোর্ড বিদ্ধ করিতে লাগিল।

যাহা সাধারণত ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। বেশি সময়ও লাগিল না। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাহিনার সব কয়টা টাকা নিঃশেষিত হইয়া গেল।

এলিজা মৃদু হাসিল। সে সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। নির্ব্বিকার চিত্তে এলিজা বাড়ি ফিরিল। সেদিনকার মত তাহার পা একবারও টলিল না।

বাড়ি ফিরিয়া এলিজা দেখিল, জনের সামান্য জ্বরভাব হইয়াছে। স্নান শেষ করিয়া চা-পানান্তে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে

হইতে এলিজা জনকে বলিল, আজ রাত্রে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, হয়তো ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে; তুমি আমার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শুইয়া পড়িও।

আত্মহত্যা করা অত সহজ নয়। পটাসিয়াম সায়ানাইডও পথে-ঘাটে পাওয়া যায় না। যুবতী নারীর পক্ষে আফিং ক্রয় করাও সহজ নয়। আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়া এই সত্যটাই এলিজা উপলব্ধি করিল। লেকে, হেদোয়, লালদীঘিতে সর্ব্বত্রই লোকের ভিড়। চট করিয়া ডুবিয়া মরিবার সুযোগও সহজে পাওয়া যায় না।

পার্কে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া ব্যর্থকাম এলিজা তাহার অসহায় অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিল। অসুস্থ জন—মেরীর টাকা—সংসার-খরচ—মিসেস হিগিন্স। মিসেস হিগিন্স হাসিতেছে, কত টাকা তোমার চাই এলিজা?

পাশেই একটা গাছের পিছন হইতে আওয়াজ আসিতেছে,—You naughty devil...no no...there are men around। নারী কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের কণ্ঠস্বর, Let them go to the devil। তাহার পরই চুম্বনের পর চুম্বনের শব্দ।

এলিজা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কেন সে মরিবে? তাহার হাসি পাইল, মিছামিছি সে কিনা আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল! না, সে মরিবে না, সে জীবন উপভোগ করিবে, যেমন করিয়া করে মেরী, জ্যানেট, ক্যাথ্‌রিন; যেমন করিতেছে গাছের আড়ালে ওই যুবক-যুবতী।

এলিজা সোজা দ্রুত পদক্ষেপে চলিতে লাগিল। মিসেস হিগিন্সের

বাড়ির ফটক খুলিয়া এলিজা সোজা ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল। একটুও বাধিল না। যেন সে রোজই সেখানে যাতায়াত করে।

মিসেস হিগিন্স একা বসিয়া ছিল। মিসেস হিগিন্সকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই এলিজা বলিল, মিসেস হিগিন্স, দুইশো টাকা ধার দাও তো, আমার টাকার বড় দরকার।

মিসেস হিগিন্স হাসিল। সেই কুৎসিত ইঙ্গিতময় হাসি।

শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইলে তোমার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে এলিজা। টাকা? তাহার জন্য আর ভাবনা কি?—মিসেস হিগিন্স ড্রয়ার খুলিয়া এক তাড়া নোট এলিজার হাতে দিল।

টাকা লইয়া এলিজা উঠিবার উপক্রম করিতেই মিসেস হিগিন্স বলিল, The night is yet young Eliza! তাহার কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস।

আশ্চর্য্য! এলিজাও হাসিতে জানে। সেও হাসিল। বাঁকা হাসি। চেষ্টাকৃত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত। এলিজা নিজেই বিস্ময় অনুভব করিল।

Yes, Mrs. Higgins, what then?

আজ মেট্রোয় একটা চমৎকার ফিল্ম আছে। হ্যারল্ডের সহিত দেখিতে যাইবে নাকি?

Of course, of course, specially when I placed you in such a false position that evening।—নিজের ব্যবহারে নিজেই এলিজা অবাক হইতেছে।

চকচকে ঝকঝকে প্যাকার্ডে চড়িয়া হ্যারল্ড আসিল। মিসেস হিগিন্স বাড়াইয়া বলে নাই। হ্যারল্ড সত্যই সুপুরুষ।

হ্যারল্ডের সহিত থার্ড শো সিনেমা দেখিতে যাইতে এলিজা কিছুমাত্র

সঙ্কোচ বোধ করিল না। এলিজা নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এলিজা আর সে এলিজা নাই।

তবু কিন্তু অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে হ্যারল্ডের পাশে বসিয়া পর্দ্দার নায়ক-নায়িকার ক্রিয়া-কলাপে এলিজা তন্ময় হইতে পারে না। অস্বস্তি অনুভব করে। সময় বুঝিয়া হ্যারল্ড তাহার হাতে হাত রাখিতেছে এবং কটি বেষ্টন করিয়া মৃদু চাপ দিতেছে বলিয়াই কি এলিজা বিব্রত?

শো শেষ হইল। হ্যারল্ডের সহিত এলিজা ক্যাসানোভায় চলিল। Mild drink-এর নামে উগ্রতম পানীয় চলিল, গেলাসের পর গেলাস। টলিতে টলিতে এলিজা আসিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়ি স্টার্ট করিয়া হ্যারল্ড বাম হস্ত দিয়া এলিজার কোমর জড়াইয়া ধরিল। এলিজা বাধা দিল না।

জড়িত স্বরে হ্যারল্ড বলিল, Let us have a joy ride 'Liza. Why are you so cold—speak, speak my darling, speak?

প্যাকার্ড ছুটিতেছে। পথঘাট ক্রমশ জনবিরল হইয়া আসিতেছে। চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—পঁয়ষট্টি—সত্তরের কাছে আসিয়া স্পীডোমিটারের কাঁটা কাঁপিতে লাগিল।

অন্ধকার মাঠের পাশে নির্জ্জন এক গাছতলায় আসিয়া 'কার' থামিল।

বাড়ি ফিরিয়া অবসন্ন এলিজা বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে।

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর ঘুরিয়া আসিল।

এলিজাকে আর চিনিতে পারা যায় না। অশ্লীল রসিকতায় এখন আর তাহার জুড়ি মেলে না, অতি বড় নির্লজ্জাও তাহার কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হয়। ঠাট-ঠমকেও সে এখন সবাইকে হার মানাইতেছে। তাহার নয়নের বিলোল কটাক্ষে, হাস্যে, লাস্যে দুর্নিবার যৌন-আকর্ষণ। লুব্ধ পুরুষকে ভাল করিয়া ফাঁদে ফেলিবার সকল কৌশল সে রীতিমত চর্চ্চা করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে। সংযতবাক এলিজা এখন প্রগল্‌ভা। প্রথম প্রথম কিছুদিন লজ্জা ছিল। পর্দ্দায় ঢাকা রিক্‌শয় চড়িয়াই সন্ধ্যার অন্ধকারে মিসেস হিগিন্সের আস্তানায় যাইত। এখন সেটুকু সরমও বিসর্জ্জন দিয়াছে। সন্ধ্যায় চূড়ান্তরূপে প্রসাধন করিয়া সকলের সম্মুখেই এলিজা গটগট করিয়া মিসেস হিগিন্সের বাড়িতে প্রবেশ করে; রাত্রির অপরিচিত বান্ধবদের কণ্ঠলীনা হইয়া গদ্গদভাবে প্রেমালাপ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না।

জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বুড়া সব বোঝে। নেহাৎ অসহ্য হইলে অক্ষম প্রতিবাদ জানায়। এলিজা হাসে। পারতপক্ষে জনের কথার উত্তর দেয় না। জনের পরিচর্য্যার কোন ত্রুটি কিন্তু এখনও এলিজা করে না। একেবারে মনুষ্যত্বহীনা হয়তো সে হয় নাই।

সেদিন রাত্রে মিসেস হিগিন্সের কাছে একজন আগন্তুক আসিয়া "that much-talked of fairy"র মূল্য জিজ্ঞাসা করিল। অনেক দর-কষাকষির পর মূল্য ঠিক হইল। মিসেস হিগিন্স যুবককে এলিজার ঘর দেখাইয়া দিল। আগন্তুক দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সবুজ বাল্‌বের আলোয় এলিজাকে fairyর মতই দেখাইতেছিল। এলিজা কৌচে হেলান দিয়া শুইয়া ছিল। আগন্তুক যুবককে দেখিয়া দিগম্বরী এলিজা উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার লিপ্‌ষ্টিক-রঞ্জিত অধরে মাদকতাময় হাসি।

হাসি কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গেল। কৌচের উপর হইতে কিমোনোটা ক্ষিপ্রতার সহিত জড়াইয়া লইয়া এলিজা লজ্জা নিবারণের প্রয়াস করিল।

অনেকদিনের পরে এলিজা লজ্জা পাইয়াছে।

আগন্তুক থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। থরথর করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

আগন্তুক এলিজার সহোদর ভাই হ্যারিস। সেই দিনই তাহার জাহাজ আসিয়া শহরের বন্দরে লাগিয়াছে।

হ্যারিস হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পা দুইটায় কে যেন পেরেক ঠুকিয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল। তাহার সহোদর ভগিনী বারবিলাসিনী! সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া লম্পট, মদ্যপ হ্যারিস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া সহসা বাঘের মত এলিজার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চুলের মুঠি ধরিয়া এলিজাকে সে পাগলের ন্যায় প্রহার করিতে লাগিল।

I will kill you—I will kill you—Oh, you Eliza! I will kill you—I will kill you!

* * *

বাড়ি ফিরিতেছিলাম। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে খেয়াল ছিল না। অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার সহিত ধাক্কা খাইয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

Are you drunk?—রোষকষায়িত লোচনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীটি আমার প্রতি চাহিল। তাহার সঙ্গের যুবকটিও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, এলিজা?

Hey, what the hell do you mean?—যুবকটি আস্তিন গুটাইয়া আমার নিকট আগাইয়া আসিল।

Sorry Mister...sorry Madam।

সেকেণ্ড শো সুরু হইবে। সামনের সিনেমা-হাউসের রঙিন বাল্‌বগুলি বারবার জ্বলিতেছে নিবিতেছে।

WELCOME—WELCOME—স্বাগতম্—স্বাগতম্!

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

ভ্রমান্ধ

উপলের মাঝে মানিক পড়িয়া থাকে—
তাহারা তাহাকে হেলা করে অবিরত,
শামুক গুগুলি ঝিনুকে দাবায়ে রাখে,
মুক্তাভরা সে—মূল্য জানে না কুত।

পাখীরা গরুড়ে পাখীই বলিয়া জানে,
বোঝে না কতই শক্তি মহিমা তার,
শ্যাওড়াও হাসে চাহি চন্দন পানে,
ভাবে, গন্ধের গৌরব কিবা আর!

কবীরের সনে জোলারা যাইত হাটে—
কবীরে তাহারা ভাবিত সকলে হীন,
বুনানির গুণে তাদের বস্ত্র কাটে,
বুঝে না কিসে যে কবীরের কাটে দিন।

রামপ্রসাদের তবিলদারির কাজ
বহুজনে আরো ভাল পারে তাহা বুঝি;
ক'রে দেখ দেখি হিসাব-নিকাশ আজ,
কত রেখে গেছে কাল-ভাণ্ডারে পুঁজি!

ধরণীর মীন কূর্ম্ম ও বরাহেরা—
যতই দেখুক ঘুরে ফিরে চারিপাশে,
চিনিতে নারিবে, চিনে না চিনিবে এরা—
হরি তাহাদের রূপ ধ'রে যদি আসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আ-শরীরী

আর সকলের বিবৃতি শেষ হইলে শৈলেনের উপর তাগাদা হইল, এবার এ বিষয়ে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে বল।

শৈলেন বলিল, আমায় বরং ছেড়ে দাও।

সুধেন প্রশ্ন করিল, তার কারণ?

শৈলেন বলিল, আমি যদি কিছু বলতে যাই, তোমরা তার মধ্যে নিশ্চয় কোন গল্পের প্লট আছে মনে ক'রে বসো। ফলে এমন সন্দেহের সঙ্গে প্রত্যেক কথাটি শোন তোমরা যে, আমি ব'লে কোন আরামই পাই না। কোথায় ভরা বিশ্বাসে মন দিয়ে শুনবে, না, কেবলই আমার প্লটের ফাঁকি ধ'রে ফেলবার চেষ্টা। যখন সত্যিই কোন গল্প হাঁকড়াই, তখন এটা সহ্য করা যায়; কিন্তু যখন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছি, তখনও যদি—

তারাপদ বলিল, এতে অভিমানের কিছু নেই, এ তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা লেখকেরা সামান্য অভিজ্ঞতাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সচেতন অচেতন নানা রকম জিনিসের দোহাই দিয়ে এমন একটা জিনিসে দাঁড় করাও যে, তোমরা যে কখনও সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সুধেন বলিল, ও বেচারাদের মুশকিল আছে, সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখলে ওদের পেট চলে না। তোমরা চাও রস, সত্য কথায় তা মোটেই নেই। যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জীবন আগাগোড়া দেখে গেলে মাত্র একটিবার রস বা রসিকতার সন্ধান মিলবে—যখন তিনি "ইতি গজ" বলেছিলেন। অবশ্য কখনও রসের অপব্যয় করেন নি ব'লে

রসিকতাটা একটু মারাত্মক রকম হয়ে জ'মে উঠেছিল। নাও শৈলেন, এই চমৎকার রাত্রের উপযোগী একটা গল্প ফাঁদ—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় ভালই, গালগল্প হয় আরও ভাল, এই ভূতুড়ে রাত্রির রুদ্র রসে আমরা একটু ডুবে থাকতে চাই।

সুধেন র‍্যাপারটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল।

শৈলেন বলিল, নাঃ, মিথ্যেবাদী ব'লে ক্রমেই যে রকম বদনাম হয়ে যাচ্ছে, সত্যিকার অভিজ্ঞতাই একটা বলি।

সুধেন বলিল, আমার গা-শিউরনো চাই কিন্তু। সেইজন্যে আমি গা আর মন দুটোকেই মুড়ি দিয়ে তোয়ের হয়ে বসেছি।

শৈলেন বলিল, যাতে আমার সমস্ত শরীর অসাড় ক'রে সংজ্ঞালোপ ক'রে দিয়েছিল, তাতে তোমার গায়ে একটু কাঁটাও জাগাতে পারবে না, এত বড় বীর তোমায় আমি মনে করি না।

একটু চুপচাপ গেল; অলৌকিক গল্পের উপক্রমণিকা হইতেছে মৌনতা। গল্প বলিবার বা শুনিবার আগে লোকে যেন অনুভব করে, সে একটা নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করিতেছে, চকিত হইয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়ায়।

শৈলেন দূর ভবিষ্যতে কোথায় যেন একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—

ব্যাপারটা ঘটে ছোটনাগপুর সাইডে একটা জায়গায়—একটা ডাক-বাংলোয়। জায়গাটার নাম আর খুলে বললাম না। রাঁচী থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো রাস্তা অনেক দিকে চ'লে গেছে, তারই একটার একটা ডাক-বাংলোর কথা বলছি। আমার তখন তিন বছরের জন্যে বনবাস,—ফরেস্ট রেঞ্জার্সের চাকরি নিয়েছি, একটা জঙ্গলের চার্জ নিতে হবে।

মোটর-বাসে চলেছি। শীতের সময়, বেলা প্রায় চারটের সময়ই দিন মলিন হয়ে এল। দূরে আকাশের কোলে "এমুড়ো-ওমুড়ো একটা লম্বা পাহাড়ের রেখা আমাদের মোটর এগুবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, যেন বিরাটকায় কি একটা এতক্ষণ শুয়েছিল, আমাদের এগুতে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে। ঐ পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভয়, আগ্রহ, বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা কৌতুক বোধ করছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের নীচে পৌঁছে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। যখন প্রায় শিখরদেশে পৌঁছেছি, মোটর গেল বিগড়ে। সারতে দেরি হবে, রাত্রি হয়ে যাবে। সান্ধ্য পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্যে আমি মোটর থেকে নেমে খানিকটা তফাতে একটা চাঁইয়ের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। পেছনে রয়েছে একটা খাড়া শিখর, সামনে গভীর খাত,—খুব গাঢ় জঙ্গলে ঢাকা ব'লে আরও গভীর মনে হচ্ছে। প্রথমটা বেশ লাগছিল, কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া যত গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনটার ওপর জেঁকে বসতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ, রহস্যময়। অতবড় একটা বিরাট ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর অসহায় ব'লে মনে হতে লাগল। কি যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব,—যদি পাহাড়ের ওপর কোন সন্ধ্যা বা রাত্রি না কাটিয়ে থাক তো বুঝতে পারবে না। অন্ধকার ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল যে, যে বিরাটকায় জীবটা খানিকটা আগে আমাদের দেখে জেগে উঠেছিল, তারই গর্ভে আস্তে আস্তে জীর্ণ হয়ে চলেছি। এই আতঙ্কের মধ্যে যখন মগ্ন হয়ে রয়েছি, হঠাৎ ডান দিকে আগুনের ভাঁটার মত প্রকাণ্ড দুটো চোখ জ্ব'লে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তলুব্ধ জন্তুর গর্জ্জনের মত এমন একটা উৎকট আওয়াজ চারিদিক

কাঁপিয়ে উঠল যে, আমার পায়ের নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি সেই পাথরের ওপর থেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—

সুধেন একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, ভাঁটার মত চোখ নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল? তোমার কল্পনার অজগর বাস্তব হয়ে পড়ল নাকি?

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল, তখুনি নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। মোটর তোয়ের হয়েছে, ইলেক্‌ট্রিক হর্ন দিয়ে হেড্‌লাইট জ্বেলেছে, সামনের একটা পাথরের গায়ে তার আলো ঠিকরে পড়েছে।

হাসি পেল—ভয়ে এমন তন্ময় ক'রে সব ভুলিয়ে দেয়!

মোটরে এসে উঠলাম। পাহাড়ে পথ দুই চক্ষু দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে ফিরে মোটর নামতে লাগল।

কেন জানি না, ঐ যে সন্ধ্যায় কেমন একটা অহেতুক ভয়ের ছাপ মনের ওপর পড়ল—কোনমতেই যেন তা কাটতে চায় না। আমায় যেন আজকের রাত্রিটা একলা একটা ডাক-বাংলোয় কাটাতে হবে—এই চিন্তাটা আমায় পীড়া দিতে লাগিল। বরাবরই কেমন যেন অন্যমনস্ক আর মনমরা হয়ে রইলাম। বিপদের ওপর বিপদ, মোটর আর একবার বাগড়া দিলে, আরও প্রায় কোয়ার্টার তিনেক গেল। পাহাড় থেকে যখন নামলাম, তখন দিব্যি রাত হয়ে গেছে। যখন ডাক-বাংলোর সামনে পৌছলাম, কব্জি উল্টে হাত-ঘড়িতে দেখি, সাড়ে নটা। শীতের সাড়ে নটাকে গভীর রাত্রিই বলতে হয়, সে নিযুতি আবেষ্টনীর মধ্যে প্রায় দুপুর রাতের সামিল।

ড্রাইভার কয়েকবার ঘন ঘন হর্ন দিলে। কোন সাড়া নেই। ড্রাইভার বললে, মোটর প্রায় ঘণ্টা চারেক লেট হয়ে গেল, কীপার গ্রামে

চ'লে গেছে নিশ্চয়, অবশ্য যাওয়া বেটার উচিত হয় নি। ওর ডিউটি হচ্ছে মোটর দেখে নিয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া, কোন লোক না নামলে—

খাতির ক'রে আমার বাক্স, বিছানার গাঁটরি আর সুট্‌কেসটা ডাক-বাংলোর বারান্দায় এনে রেখে দিলে। বললে, আপনার টর্চ রয়েছেই, একটু দূরেই গ্রাম, সেখানে গেলেই তারা কীপারকে ডেকে দেবে। কিন্তু বাবু—। কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

প্রশ্ন করলাম, কি?

এই সময় মোটর থেকে তাগাদার হর্ন বেজে উঠল।

না, কিছু নয়। মানে, এখানকার কীপার লোকটা—

আবার তাগাদা হওয়ায় তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে যেতে বললে, একলা মানুষ, তা ভয় পাবার কিছু নেই এমন। কিছু বলতেও পারলাম না; প্রায় ঘণ্টা তিন চার লেট যাচ্ছে, তাই নিজে হতেই একটু খাতির করলে। আর বলবার ছিলই বা কি? মোটরটা চ'লে গেল। যতক্ষণ তার একটুও আওয়াজ শোনা গেল, কান পেতে রইলাম। একবার একটা শেষ হর্নের পর একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল,—যেমন দপ ক'রে একবার জ্ব'লে উঠে প্রদীপ নেবে, আওয়াজটাও সেই রকম একটা আর্ত্তনাদ ক'রে যেন নিবে গেল। নির্জ্জন বাড়িটার বারান্দায় আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা চারিদিকে পরিষ্কার, বেশ খানিকটা পর্য্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টির সীমার বাইরেই নিবিড় অন্ধকার, ডান দিকটায় অন্ধকার যেন আরও এক পোছ ঘন, সেটা পেরিয়ে এলাম, সেই পাহাড়টা আর কি।

বেশ গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। টর্চটা জ্বেলে গ্রামের দিকেই যাব? কিন্তু কোন্ দিকে গ্রাম? যদি আন্দাজে ঠিক যাই তো হয়তো পাশেই

পাব, যদি ভুল দিকে পা বাড়াই তো বোধ হয় এমন দু চার মাইল গিয়েও মানুষের চিহ্ন পাব না, দেখে তো আসছি সমস্ত দিন, নিতান্ত বিরল-বসতি দেশ।

কি করব, না করব, কিছুই ঠিক করতে না পেরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর কি মনে ক'রে পা বাড়াব, পায়ের পেছন দিকটায় একটা লম্বা ভিজে টানে আচমকা শিউরে উঠলাম। ফিরে দেখি, একটা খুব বড় কালো কুকুর। তাড়াতে গিয়ে আরও শিউরে উঠলাম হঠাৎ মানুষের আওয়াজ শুনে। কাছেই বারান্দার কোণের কাছটায়, কুকুরের খটকাটা সামলাতে না সামলাতেই হঠাৎ এটা কানে যাওয়ায় একটু অভিভূত হয়ে উঠেছি, এমন সময় কুকুরকে শাসাতে শাসাতেই একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, সামনে এসে সেলাম ক'রে বললে, ও কিছু বলবে না হুজুর। মোটর আজ আপনাদের খুব দেরি হয়ে গেল, কিছু দুর্ঘটনা হয়েছিল নাকি?

লোকটার খুব বয়েস হয়েছে ব'লে মনে হ'ল, আর আশ্চর্য্য রকম রোগা। এত রোগা যে, চলছে তা মাটিতে পায়ের আওয়াজটুকুও হচ্ছে না যেন। গায়ে প্রায় আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া একটা সাদা কম্বল। আঙুলগুলো এত শীর্ণ আর অস্থিসার যে, মনে হচ্ছে, যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। মোটর ছাড়ার পর থেকে যে একটা কেমন ছমছমে ভাব মনে লেগে ছিল, মানুষ দেখে সেটা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যাওয়া তো দূরের কথা, বরং বেশ একটু বেড়ে গেল, আমি সঙ্গে সঙ্গেই তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না; উত্তর দেওয়াই হ'ল না বলা ঠিক। তাকে আড়চোখে একটু ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা ক'রে বললাম, চাবি খোল।

এই যে খুলি।—ব'লে আমার আর দোরের মাঝখানটায় আমার

দিকে পেছন ক'রে দাঁড়াল আর একটু ঝুঁকে যেন কোমরের চাবিটা তালায় লাগিয়ে দিয়ে তালাটা খুলে ফেললে। দরজা দুটো ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, যান। আমি বাক্স বিছানা নিয়ে আসছি ভেতরে।

তালা খুলল বটে, কিন্তু আমার যেন মনে হ'ল, কোন শব্দ হ'ল না। যা হোক, অতটা গ্রাহ্য না ক'রে আমি বললাম, তবেই হয়েছে, তোমায় যেমন সবল দেখছি—

লোকটা হি-হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

আমায় কথাটা ব'লেই বারান্দায় মোটগুলোর দিকে গিয়েছিল ব'লে ওর মুখটা দেখতে পেলাম না বটে, তবে হাসির আওয়াজটা কানে একটু নতুন ধরনের ঠেকল যেন। যেন মুক্ত মাঠের ওপর দিয়ে যে একটা কনকনে হাওয়া হু-হু ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, তারই একটা ঝলক ঘরের মধ্যে ঢুকে, তরঙ্গিত হয়ে আবার কোন্ পথে বেরিয়ে গেল। হাসি কিন্তু ঐ হাওয়ার মতই সুরহীন আর কনকনে, আমার হাড় পর্য্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল।

ভয়ের এত সামনাসামনি কখনও হই নি, কিন্তু নিরুপায়; আর নিরুপায় ব'লে জবরদস্তি একটা ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করলাম—না, নিশ্চয় মানুষ। নিজের মনকে ধিক্কার দেওয়ারও চেষ্টা করলাম—দেখ তো! কথা কইলে একঝুড়ি, মোট আনতে গেল, মানুষ নয়?

টর্চটা জেলে ঘরে ঢুকে একবার দেখে নিলাম। বেশ বড় ঘরটা, টর্চ ফেলতে আলোটা সামনে একটা খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতর দিকে আর একটা দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল, অর্থাৎ এই ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর আছে, ছোটই ব'লে মনে হ'ল। বাক্স বিছানা

আনার কোন শব্দ না পেয়ে ফিরে টর্চ ফেলে দেখতে যাব, দেখি সবগুলি ঠিক পেছনে এনে জড় করা রয়েছে। সুধেন, কি রকম লাগছে?

ডাক শুনিয়া সুধেন একটু চমকিয়া উঠিল, একেবারে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল আর কি। সামলাইয়া লইয়া বলিল, বেশ; এত হাতের কাছে যে ভূতকে পাব, কল্পনাও করতে পারি নি। আর এত স্পষ্ট ভূত যে, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন সাহিত্যিক গল্পের অবতারণা কর নি—

তারাপদ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, হদ্দ একটা গাঁজাখুরি আরম্ভ করেছ। তা সে বরং ভাল। তুমি দুঃখ করছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের সাহিত্যিক গল্পে সর্ব্বদাই একটা যেন ধুকপুকুনি লেগে থাকে। হয়তো যা ভাবছি তা নয়, হয়তো যা হবে মনে করছি ঠিক তার উল্টোটি হয়ে বসবে, হয়তো ঠিক ক'রে রেখেছি এইবার বিয়ে হবে, দুজনের একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। নাও, বেশ বিষ্টিটা জ'মে এসেছে। সেই অত্যন্ত রোগা বুড়োটি নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে সেই অত্যন্ত ভারী মোটমাটগুলো এনে তোমার পেছনে জড় করলে। তারপর?

শৈলেন বলিল, জিনিসটা বোধ হয় গাঁজাখুরির মত শোনাচ্ছে, কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর, যা প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম আর নিজের কানে শুনেছিলাম, মাত্র তাই তোমাদের কাছে ব'লে যাচ্ছি। একটা কথা আমি গোড়াতেই ব'লে রেখেছি, লুকোই নি, অর্থাৎ সেদিন সন্ধ্যে থেকেই কেমন একটা থমথমে ভাব আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—পাহাড়ের ওপরের সেই গম্ভীর স্তম্ভিত ভাব, তারপর সেই জনহীন বাংলোতে সেইভাবে একলা পরিত্যক্ত হওয়া, সেই কালো কুকুরটার নিঃশব্দে এসে পা চেটে দেওয়া, তারপরে আচমকা সেই শীর্ণ লোকটার

অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভাব—সব মিলিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমার আতঙ্কটা পুষ্ট ক'রে যাচ্ছিল। ওরই মধ্যে আবার লোকটাকে পেয়ে এক আধ বার একটু সাহসের মত হয়েছিল বোধ হয়, কিন্তু সে ভাবটা স্থায়ী হতে পেল না। হয়তো জিনিসগুলো আনতে, রাখতে শব্দ হয়েছিল। প্রেত ইথারজাতীয় বটে; কিন্তু সে যা স্পর্শ করবে তাও যে লঘু হয়ে যাবে, এমন কথা আমি কোথাও পাই নি। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকার দরুনই হোক বা যে জন্যেই হোক, ঘুরে জিনিসগুলোর ওপর নজর পড়তেই মনে হ'ল, কই, শব্দ শুনলাম না তো!

একটা কথা বলি নি—আমি 'লোকটা' ব'লেই চালাই—কোনও আলো সঙ্গে আনে নি।

তিন চারটে জিনিস এল—দিব্যি ওজনদুরস্ত, অথচ একটু শব্দ কানে এল না, আর এসে পড়লও যেন ফিরে না দেখতেই,—একটা বিশ্রী খটকা লাগল। আবার তখনই সেটা কেটে গেল, কেন না কড়া টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখছি একটা মানুষ ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে; এই শুনলাম কথা কইলে,—স্বরটা হয়তো একটু চাপা, কিন্তু নাকী নয়; এ অবস্থায় সন্দেহও আবার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মনটাকে আবার ধাতস্থ ক'রে নিলাম। বললাম, বিছানাটা পেতে ফেল দিকিন। আচ্ছা, আগে আলোটা জেলে ফেল। কোথায় আলোটা? টর্চ আর কতক্ষণ জেলে রাখব? জেলে রাখা মানেই তো পয়সা পোড়ানো। আলাপটা সহজ ক'রে ফেলবার জন্যে এইটুকু রসিকতাও করেছিলাম। লোকটা সেই রকম হি-হি ক'রে হেসে উঠল, বললে, না, টর্চ আর আপনাকে বেশিক্ষণ জেলে রাখতে হবে না বাবু—হি-হি-হি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা মজা হ'ল, টর্চের চাবিটা টিপে ধ'রে টর্চটা জেলে রেখেছিলাম, আঙুলটা একটু আলগা হয়ে গিয়ে টর্চটা নিবে

গেল। আলগাভাবে ধ'রে রাখলে স্প্রিং-ওলা টর্চগুলো হয়ই এ রকম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর জ্বলল না, ফিউজ হয়ে গেল।

বললাম, টর্চটা যে খারাপ হয়ে গেল।

অত কড়া একটা আলো নেবায় আরও অন্ধকার হয়ে গেছে, কাউকে দেখতেও পেলাম না, কোন উত্তরও পেলাম না।

টর্চটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে যাওয়াটা খেয়ালের মধ্যে আনি নি, ও রকম কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু উত্তর না পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত দুয়েকের মধ্যে এই লোকটা ছিল, অথচ উত্তর নেই কেন? নিজের গলার আওয়াজে নিজের ভয়টা ভাঙবার জন্যে একটু জোর আওয়াজে প্রশ্ন করলাম, কোথায় গেলে?

উত্তর নেই। শুধু হাওয়ার শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বুঝতে পারছি, শরীটা ঝিমঝিম ক'রে আসছে। মরিয়া হয়ে আরও জোরে বললাম, গেলে কোথায়? তোমায় যে আলো আনতে—

হঠাৎ থেমে যেতে হ'ল, আমার নিজের কথার প্রতিধ্বনিতে ঘরটা এমন বোঝাই হয়ে গেল যে, মনে হ'ল, অন্ধকার ঘরটায় মেলা ব'সে গেছে। আমার ভয়ে অতি-সজাগ কানে শোনাল যেন ঘরের চারিদিকে শতকণ্ঠে কারা আমারই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলছে, গেলে কোথায়? তোমায় যে আলো আনতে—

অনুভব করছি, মাথার চুলগুলো যেন কদমফুলের মত খাড়া হয়ে উঠেছে। কি যে করব, বুঝতে না পেরে অসাড় হয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। তারপর পাশে নজর পড়তে মনে পড়ল, দরজাটা খোলা আছে। একটা চীৎকার ক'রে ছুটে বেরুতে যাব, দেখি সামনের দেয়ালে একটি অস্পষ্ট আলো পড়ল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ঠন হাতে পাশের

ঘর থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। পাশে জমাট-বাঁধা এক থাবলা অন্ধকারের মত সেই কুকুরটা। ময়লা চিমনি, তেলটা খারাপ নিশ্চয়, খানিকটা ধোঁয়ার নীচে একটা মিটমিটে শিখা জ্বলছে। গাছের শেকড় যেমন মাটি আঁকড়ে থাকে, সেই রকম ভাবে লিকলিকে কালো কালো আঙুল দিয়ে লোকটা লণ্ঠনের হাতলটা লেপটে ধরেছে। অস্পষ্ট আলো তার কোটরগত চোখে, উঁচু চোয়ালের হাড়ের ওপর প'ড়ে উৎকট দেখাচ্ছে। কিন্তু তা দেখাক, রোগা মানুষ, উপায় কি? যা হোক ভূত তো নয়, ভূতে তো আর আলো জেলে আনবে না। একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, তাই বলি, তুমি বুঝি আলো জ্বালতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, আলোটা জেলে নিয়ে এলাম। এবার আপনার বিছানাটা ক'রে দিই। খাবেন কি?

বললাম, সেজন্যে ভাবনা নেই। টিফিন-কেরিয়ারে আমার খাবার আছে, তুমি শুধু বিছানাটা ক'রে দাও।

কই, আপনার টিফিন-কেরিয়ার তো দেখলাম না!

সে কি!—ব'লে ফিরে মোটগুলো দেখতেই চক্ষুস্থির। টিফিন-কেরিয়ারটা সত্যিই নেই। বিমূঢ়ভাবে একটু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। সরালে নাকি খাবারসুদ্ধু কেরিয়ারটা?

বললাম, বারান্দা থেকে আন নি বোধ হয়। দাঁড়াও তো দেখি।

আলোটা নিয়ে বারান্দায় এলাম, সেখানেও নেই কেরিয়ারটা। লোকটা মোটগুলো ভেতরে নিয়ে আসবার সময় লুকিয়ে ফেলে নি তো? কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। আমি যতদূর বুঝলাম, ও বাইরে থেকে যেটুকু সময়ের মধ্যে জিনিস তিনটে এনেছে, তাতে একটা জিনিসই

আনা চলে না, এর মধ্যে আর লুকোবার সময় পাবে কোথা থেকে? তবুও কেমন একটা জিদ ধ'রে গেল, সেই কালি-পড়া আলো নিয়ে সমস্ত বারান্দাটা এমুড়ো-ওমুড়ো একবার দেখে নিলাম। না পাওয়াতে আরও রোখ চেপে গেল—নিশ্চয় কোথাও রেখেছে। বারান্দা থেকে নেমে বাড়িটার পেছনে গেলাম। একহারা বাংলো, মাঝখানে একটা বড় ঘর, দু দিকে দুটো ছোট ছোট ঘর; সামনের দিকে বারান্দা আছে, পেছন দিকে তাও নেই। বাড়িটার পরেই পরিষ্কার জমি। কোথায় লুকোবে? অথচ টিফিন-কেরিয়ার আমি এনেছি। বাসে একবার প'ড়ে গিয়ে বাটিগুলো আলগা হয়ে গিয়েছিল, গুছিয়ে ভাল ক'রে বসিয়ে দিলাম। তবে? চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ দূরে নজর পড়ায় মনে হ'ল, খানিকটা দূরে—কম্পাউণ্ডের শেষে একটা ঘরের মত আছে। চোর যেন ধ'রে ফেলেছি এই রকম উৎসাহ নিয়ে এগুলাম। একটা ছোট্ট ঘরই শেকল দেওয়া। খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি, একটা কেরোসিন তেলের আধভরা টিন, গোটা দুই আলো, গোটা দুই বালতি, টিফিন-কেরিয়ার নেই। রাগ, কি জিদ, কি নিরাশা, কি ঘরে ফিরে আবার সেই লোকটাকে দেখতে পাওয়ার ভয়—ঠিক বুঝতে পারি না, তবে এটা বেশ মনে আছে যে, নিশিতে পাওয়ার মত আমি ক্রমাগতই সেই মিটমিটে লণ্ঠনটা হাতে ক'রে বাড়িটার চারিদিকে চক্কর দিয়ে চলেছি দুবার, চারবার, পাঁচবার, তারপর আর হিসেব নেই, ঘুরেই চলেছি, মনে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন—আমার খাবার কোথায় গেল? কেরিয়ারের মধ্যে ক'রে আনা আমার খাবার? কোথায় গেল আমার খাবার? ভেতরে ভেতরে কার সঙ্গে যেন একটা তুমুল তর্ক বেধে গেছে—বাঃ, গেলেই হ'ল খাবার, অত কষ্টে ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম!

মাটির দিকে চেয়ে খুব একমনে খুঁজছিলাম। হঠাৎ একবার চোখ

তুলতে প্রায় এক রকম আঁতকে উঠলাম, পাহাড়টা যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। প্রথম তাড়সটা কেটে গেলে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি,—পাহাড়ের ঠিক মাথায় সবে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই আলোয় পাহাড়ের ওপরকার রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় মনে হচ্ছে, পাহাড়টা যেন খুব কাছে। কিন্তু অন্যমনস্ক হওয়ায় একটা ফল হ'ল, নিজে যে কোথায় রয়েছি জ্ঞান হ'ল। দেখি আলোটাতে আর কিছু নেই, গাঢ় কালির মধ্য দিয়ে একটা ক্ষীণ রাঙা টকটকে শিখা কোন রকমে দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ গাটা শিউরে উঠল, হাতে হাত দিয়ে দেখি একেবারে হিম হয়ে গেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঘড়িটাতে দেখি প্রায় একটা, অন্তত ঘণ্টা তিনেক ঘুরেছি এই ছটাকখানেক বাড়িটার চারিদিকে।

শৈলেন একটু চুপ করিয়া সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

তারাপদ বলিল, বৃষ্টি দেখছি আজ আর থামবে না।

সুধেন কহিল, তোমায় বাহাদুরি দোব, জ্ঞানটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লে না! প্রায় সেই রকমই হয়, লোকে ভয়ের মধ্যে অনেক সময় ঠিক থাকে, কিন্তু ভয়ের ঝোঁকটা কেটে গেলে যখন দেখে কি অবস্থার মধ্যে ছিল, তখন অনেক সময় আর টাল রাখতে পারে না। অনেক সময় মারা পর্য্যন্ত যায়।

শৈলেন ধীরে ধীরে যেন আবিষ্টভাবে বলিল, অজ্ঞান তখনও হই নি, তবে কেন যে হই নি, আমার এখনও আশ্চর্য্য বোধ হয়। ফিরে এসে দেখি, লোকটা বারান্দায় একটা যেন কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হ'ল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হ'ল রাগ, বললাম, আমি ঘণ্টা তিনেক—। কি ভেবে কথাটা আর শেষ করলাম না। লোকটা

দুহাতে চোখ রগড়ে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবু, ঘুমকাতুরে মানুষ—পেলেন না?

বললাম, না।

বাসে এনেছিলেন ঠিক মনে আছে?

আমার রাগটা আরও বেড়ে গেল; হাত ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিতে যাব, তখুনি সম্বিৎ হ'ল—যদি হাত ধরতে গিয়ে শূন্যে মুঠো বাঁধি! কিম্বা যদি দেখি, শুধু একটা মড়ার হাড় মুঠিয়ে ধরেছি! এখন তবুও তো মাঝখানে একটা সন্দেহের ব্যবধান আছে, তখন? নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, নিশ্চয় এনেছিলাম।

বললে, আচ্ছা, আপনি ভেতরে যান, নিশ্চয় খুব শীত করছে আপনার।

আমার ভুল বোধ হয়, কিন্তু মনে হ'ল, যেন ঘরে ঢুকে কপাট দুটো ভেজিয়ে সেই অন্ধকার আলোর শিষটা উসকে দিয়েছি, এইটুকুর মধ্যেই লোকটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। টিফিন-কেরিয়ারটা সামনে রেখে দিয়ে বললে, এই নিন, হি-হি-হি-হি।

সেদিন আমি মনের একটা অদ্ভুত অনুভূতির পরিচয় পাই, ভয়ের চরম অবস্থায় আর ভয় থাকে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, এটা বড় ভীষণ অবস্থা, এর একচুল পরেই উন্মাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা; এটা ঠিক বর্ডারল্যাণ্ড। আর সন্দেহ নেই; বেশ বুঝতে পারছি, হাতখানেক দূরেই প্রেতাত্মা; তারই সঙ্গে কথা কইছি, বেশ স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় পেলে?

প্রতি মুহূর্তেই উৎকট ভয়ের এক একটা ঢেউ যেন সমস্ত শরীর তোলপাড় ক'রে ভেঙে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই মরিয়া হয়ে রুক্ষ হয়ে উঠছি; কেমন যেন একটা নেশা চেপে গেছে—যা স্পষ্ট

নগ্ন সত্য, তার সম্মুখীন হতে হবে। একটু রূঢ় স্বরেই বললাম, রেখেছিলাম মোটর বাসে, সেটা এখন পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে আনতে হ'লে—

শেষ করতে পারলাম না; নিজের কথাতেই যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে শরীরটা ভেতর থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল,—পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে!! পঁচিশ ত্রিশ মাইল!!!

এর পর এইটুকু মনে পড়ে যে, হি-হি-হি-হি ক'রে একটা হাসি ক্ষীণ হতে হতে একেবারে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে যেন মিলিয়ে গেল। আর অল্প একটু মনে পড়ে, বরফের মত একটা ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শের অনুভূতি।

শৈলেন চুপ করিল, মনে হইল, কাহিনীটা বলিতে সে যেন একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে তাহার সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিল। এবার বেশ ঘরোয়া কথাবার্ত্তার মত বলিতে লাগিল, মাঝে অল্প জ্ঞান হয়েছিল কি না মনে নেই; তবে একটু ভাল ক'রে যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সকাল হয়েছে, দেখি আমার চারিদিকে বেশ একটি ভিড় জমেছে, আমি একটা বড় ঘরে একটা খাটের ওপর শুয়ে আছি। একজন লোক মাথায়, একজন পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

পায়ের কাছের লোকটির ওপর চোখ পড়তেই চোখ আর ফেরাতে পারি না। লোকটি হি-হি-হি ক'রে হেসে বললে, কিছু ভয় নেই বাবু, রাতে অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? আমি না ধ'রে ফেললে তো প'ড়েই যেতেন মুখ থুবড়ে।

ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর হুঁস হ'ল,—সত্যিই তো, না হয় বেয়াড়া রকম রোগাই, কিন্তু এ মানুষকে অত ভয় পাবার—

তারাপদ ও সুধেন বিস্ময় আর নিরাশায় এক রকম চীৎকার করিয়াই উঠিল, মানুষ!

শৈলেনও ঈজি-চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তবে তোমরা কি ভেবেছ? রোগা আর খাপছাড়া মানুষ মানুষই নয়?

দুজনেই কতকটা অপ্রস্তুতভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শৈলেনের দিকে চাহিয়া রহিল। সুধেন বলিল, আবার ঠকালে,—সেই অভিজ্ঞতার ওপর রং ফলিয়ে গল্প!

শৈলেন বলিল, তোমরা যে রস চেয়েছিলে সেটা পেয়েছ তো? ডাক-বাংলোর কীপারেই যদি তা পরিবেশন করতে সক্ষম তো আপত্তি কিসের?

তারাপদ বলিল, বেশ, গল্পই যদি, সমালোচনার ধাক্কা সামলাও—মানুষ পঁচিশ মাইল দূরে বাসের ভেতর থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এল কি ক'রে? আর সবই নয় বাদ দিলাম—তোমার মনটা সেদিন ভয়ে খুব high strung ছিল, সবই তার বিকার।

শৈলেন ক্রমেই বেশি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আনে নি তো অত দূর থেকে।

তবে?

শৈলেন উত্তর করিল, সে কথা তো ও লোকটা নিজেই ব'লে দিলে—আমি যেখানে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে এসেছে।

কোথায় রেখেছিলে?

মোটর থেকে নামিয়ে রাস্তায়।

তারাপদ, সুধেন শৈলেনের মুখ থেকে দৃষ্টি নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। শৈলেনের মত অবস্থায় না পড়িয়াও যে তাহার মত ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য বোধ হয় লজ্জিত হইল একটু।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুন এদেশে ছাপার কাগজ দুর্মূল্য হইয়াছে; 'শনিবারের চিঠি' যে কাগজে ছাপা হয় তাহার দাম, পূর্ব্বে যে কাগজে ছাপা হইত তাহার দামের প্রায় তিনগুণ দাঁড়াইয়াছে; ছাপাখানা-সংক্রান্ত অন্যান্য জিনিসেরও দাম চড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বের আকৃতি বজায় রাখিয়া চার আনা দামে কাগজ দেওয়া অসম্ভব; সুতরাং আমরা কাগজ কুড়ি বাইশ পাতা কম করিতে বাধ্য হইয়াছি। অনেকে ইহাতে আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহারা দাম কিছু বাড়াইয়া আকৃতি অব্যাহত রাখিতে বলিতেছেন। সেইরূপ হইলে আমাদেরও সুবিধা হয়, কারণ এখন স্থানাভাবে অনেক লেখা কম্পোজ করিয়াও ফেলিয়া রাখিতে হইতেছে। "প্রসঙ্গ কথা" ও "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগ কমাইতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। ইহাতেও অনেকে অনুযোগ করিয়াছেন।

এই অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব নয়। যদি যুদ্ধের দরুন বাজার এইরূপই থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে এদিক-ওদিক একটা সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে। চার আনা মূল্য বজায় রাখিতে হইলে আমরা এই সংখ্যায় যে পরিমাণ পৃষ্ঠা দিয়াছি (১২৮ পৃষ্ঠা) সেই পরিমাণ পৃষ্ঠা কোনও রকমে দিতে পারিব। যদি পূর্ব্বের ন্যায় কাগজ মাসে দেড়শত পৃষ্ঠা হিসাবে বাহির করিতে হয়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা (।/০) ধার্য্য করিতে হইবে। আগামী বাংলা নববর্ষের (বৈশাখ, ১৩৪৮) মধ্যেই আমাদিগকে যাহা হউক স্থির করিতে হইবে। বিবেচনা করিবার জন্য আমরা মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাস সময় লইতেছি। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় দাম পূর্ব্ববৎ চার আনাই থাকিবে, কিন্তু পৃষ্ঠা-সংখ্যা কম হইবে। আমাদের পাঠক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা চৈত্রের পূর্ব্বেই তাহা জানাইবেন। তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করিবে। এ বিষয়ে আমরা যাহা স্থির করিব, চৈত্র সংখ্যায় তাহা বিজ্ঞাপিত হইবে।

—

বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীসত্যনারায়ণ-লিখিত "সোভিয়েটে শনিবার", প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসত্যনারায়ণ অবাঙালী ভারতবর্ষীয়; জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট পাইয়াছেন; তাহার বিষয় ছিল—অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। কিন্তু যাঁহারা ডক্টর সত্যনারায়ণের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন, বিদ্যাবত্তার এই পরিচয় তাঁহার পরিচয়ই নয়। জীবনের এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ ভারতবর্ষে অল্পই দেখা গিয়াছে। অথচ তাঁহার বয়স ত্রিশের উর্দ্ধে নয়। এই অল্প বয়সেই তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, আফ্রিকার উত্তরভাগ এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন—একেবারে খালি হাতে। ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় এবং ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় তাঁহার তত্তৎ দেশবাসীর মতই দখল জমিয়াছে। রুশিয়াতে রুশ এবং জার্মানিতে জার্মান হিসাবেই তিনি গণ্য হইতে পারিয়াছিলেন; সম্প্রতি তিনি বাংলা দেশে বাস করিতেছেন; কথায়-বার্ত্তায় ধরণ-ধারণে আমরা তাঁহাকে অবাঙালী মনে করিতেই পারি না। বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করিবার অত্যাশ্চর্য্য পটুতা তাঁহার। তাঁহার ভবঘুরে জীবনের প্রারম্ভে তিনি গুরুর নিকট যে তিনটি মহামূল্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ করিয়া তিনি আজও পর্য্যন্ত চলিয়াছেন। এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। সেই শিক্ষা সংক্ষেপে এই—পৃথিবীর দেশ ও মানুষকে জানতে হ'লে যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়, দেশের মানুষের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল। সেখানকার ভাষাও যদি জানা না থাকে, ইশারায় কিংবা যে কোনও ভাবে পার, তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা কর। সেখানকার লোকেদের মত তাদের সঙ্গে ব'সে আহার কর।

বস্তুত এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া ডক্টর সত্যনারায়ণ পৃথিবীর বহু দেশের খাঁটি পরিচয় লাভ করিয়াছেন। রুশ এবং জার্মানির অন্তরের সত্য পরিচয় ভারতবর্ষের আর কেহ এমন ভাবে পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তিনি মামুলী ভ্রমণকারীর মত ট্রেন-মোটর-হোটেল-বিলাসের দ্বারা, গাইড-বইয়ে বর্ণিত প্রসিদ্ধ স্থান ছুঁইয়া ছুঁইয়া অথবা স্থানীয় কিউরিও ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন নাই—

অনেক আত্মত্যাগ ও দুঃখবহনের দ্বারা প্রত্যেক দেশের মর্ম্মের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। জার্মানির যৌবন-আন্দোলনে তিনি স্বয়ং বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেখানকার সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির তিনি ছিলেন একজন এবং হিট্‌লারের অভ্যুদয়কালে ন্যাশন্যাল সোশ্যাল ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক দলের সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। রুশিয়ার সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় ম্যাক্সিম গোর্কির সহায়তায়; রুশ-বর্ণমালার সঙ্গে তিনিই সত্যনারায়ণের পরিচয় সাধন করান এবং তাঁহারই সাহায্যে তিনি সোভিয়েটের আদর্শ ও রীতি-নীতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। ইতালীর সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধে তিনি ইউরোপের এক প্রসিদ্ধ সংবাদ-এজেন্সির প্রথম শ্রেণীর সংবাদ-দাতা হিসাবে আবিসিনিয়ায় আসেন ও সেখানে যুদ্ধে আবিসিনিয়ার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিয়া তত্রত্য বিপন্ন ভারতবাসীদের উদ্ধার-সাধনে সহায়তা করেন। ১৯৩৬ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি তিনি ইউরোপ এবং ইটালির ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে হিন্দীতে দশখানি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় তাঁহার 'রোমাঞ্চক রাশিয়ায়' নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়িয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। আমরা বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে লাভ করিয়া অনেক কিছু আশা করিতেছি। তিনি এখন 'দিশেহারা ইউরোপে' নামক পুস্তক-রচনায় ব্যস্ত। এই পুস্তকের দুই একটি অধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইবে। ইহা ছাড়া তাঁহার ইউরোপের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন প্রবন্ধে আমরা প্রকাশ করিব।

—

হঠাৎ "দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী" নামক একটি অবাঙালী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত ও প্রচারিত 'বঙ্গদর্শন' এক সেট হাতে আসিয়াছে। ইহারা পুরাতন পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' (বঙ্কিমের ও সঞ্জীবের আমলের) সম্পূর্ণ নয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন এবং বহু দেশপ্রেমিক বাঙালী ইহার নগদ ও কিস্তিবন্দী গ্রাহকও হইয়াছেন। ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ছাপ

ও কুৎসিত হেডপীস সহযোগে ইঁহারা বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের কতখানি অমর্য্যাদা করিয়াছেন, তাহার বিচার করিব না; কারণ, বাঙালীর রসবোধ ও ধর্ম্মবোধ বর্ত্তমানে গোল্লায় গিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা যেভাবে খরিদ্দারদের ধোকা দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্ময়বোধ করিলাম। ইঁহারা সম্পূর্ণ বলিয়া যাহা দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নয়। এই কোম্পানির ধুরন্ধরগণ অবগত নহেন—পুরাতন পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' কয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন সকল অর্ব্বাচীন ব্যক্তির সম্পাদনায় কি বস্তু বাহির হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইঁহারা ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' ছাপিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে ভাবিয়াছেন। কিন্তু ১২৯০ সালেও যে 'বঙ্গদর্শন' কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল এবং সেগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ সংবাদ জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যাঁহারা সম্পূর্ণ 'বঙ্গদর্শন' পাইয়াছেন মনে করিয়া পুলকানুভব করিতেছেন, তাঁহারা আশা করি এই সংবাদে নূতন করিয়া আনন্দ পাইবেন।

—

শিশু-সাহিত্যে প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর 'বন্দী-বীর' নামক একটি ছেলেদের জন্য লিখিত নাটক দেখিলাম। সুনির্ম্মলবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"একটি আবৃত্তির আকারে লেখা বইয়ের কিছু কিছু সাহায্য আমার নিতে হয়েছে।" পুকুর-চুরি করিয়া যাঁহারা মৎস্য-শিকারের অপরাধ ঘাড়ে লইতে দ্বিধা করেন না, সুনির্ম্মলবাবু যে সেই শ্রেণীর সাধু ব্যক্তি ইহা আমাদের জানা ছিল না। সাধারণ লোক-ব্যবহারে এইরূপ স্বীকারোক্তিতে তাঁহার সুযশই হইবে, কিন্তু ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব যাঁহারা লেখনী মারফৎ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা আর একটু স্পষ্ট হইলে ভাল হইত। "কিছু কিছু" অর্থে যে "আপাদমস্তক" ছেলেরা অভিধান খুলিয়া তাহা অবগত হইবে না। কবিতাকে প্যারাফ্রেজ করিলেই "সবটা" "কিছু কিছু" হয় না। আশা করি, সুনির্ম্মলবাবু এই তথ্যটি ভবিষ্যৎ সংস্করণে স্মরণ রাখিবেন। "কিছু কিছু"র সামান্য পরিচয় দিতেছি—

১। প্রতাপচন্দ্র মাইতি প্রণীত 'ভারত-বীর' নামক পুস্তকের (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) ১১-১২ পৃষ্ঠা—

আলেক। আসুন রাজন,
অভ্যর্থনা করুন গ্রহণ।
তক্ষশীলারাজ। চরিতার্থ আমি।
বীরবর,
আজি মম সুপ্রভাত, ভাগ্যবান আমি,
সম্বর্দ্ধনা মম করুন গ্রহণ।
তক্ষশীলাবাসী
সমাদরে আপনারে করেছে বরণ।
তাই আমি আসিয়াছি প্রতিনিধিরূপে
দিতে আপনারে এ অভিনন্দন।

সুনির্ম্মল বসু প্রণীত 'বন্দী-বীর' পুস্তকের (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) ১৩ পৃষ্ঠা—

আলেক্। এই যে আসুন আসুন। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

তক্ষশীলারাজ। আজ আমি কৃতার্থ, আমার জন্ম সার্থক। মহারাজের দর্শন পেয়ে আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আপনার আগমন বার্ত্তা পেয়েই তক্ষশীলাবাসী আপনাকে প্রভুর পদে বরণ করেছে। আমি তাদের প্রতিনিধিরূপে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করতে ছুটে এসেছি।

২। 'ভারত-বীর' পৃ. ২৪-২৫।

মন্ত্রী। বালক,
স্থির হয়ে শোন মোর কথা।
কারা হ'তে এসেছি পলায়ে শুনে পুরুরাজ
রহিবে কি নীরবে কখন?
বুঝেছ কি দণ্ডাদেশ হবে মোর প্রতি?
পারিবে সহিতে তাহা?
বধ্যভূমে লয়ে গিয়ে পিতারে তোমার
ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বধিবে জীবন।
এ দৃশ্য হেরিবে চ'খে—
না হ'তে চাও যুবরাজ?
রাজপুত্র রাজা হয়ে পালিবে ধরণী
না পিতৃমুণ্ড লয়ে করিবে কন্দুক ক্রীড়া।
কহ অরিজিৎ চাও কোন্ পথ?

অরি। পিতা, ক্ষমো অপরাধ।
পিতৃমুণ্ডে খেলিবে গেণ্ডুয়া
কোন পুত্র আশা নাহি করে।
কিন্তু বড় হতভাগ্য আমি
পিতা মোর দেশদ্রোহী।

'বন্দী-বীর' পৃ. ২৫-২৬

মন্ত্রী। তা' হ'লে পুত্র আমারও একটা বক্তব্য আছে। পুরুরাজ যখন শুনবেন যে আমি কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি,—তখন তিনি কি করবেন জানো? বধ্য-ভূমিতে যখন ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তোমার পিতার ছিন্নমুণ্ড ধূলাতে লুটাবে,—তুমি তা চোখে দেখ্‌তে পারবে? বল অরিজিৎ, যুবরাজ হয়ে,—রাজা হয়ে দেশ শাসন করতে চাও, না পিতার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে খেলা করতে চাও। বল অরিজিৎ,—চুপ্‌ করে' রইলে কেন?

অরি। ছিঃ ছিঃ পিতা, আমায় ক্ষমা করুন। পিতার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে খেলা—একথা শোনাও যে ছেলের পক্ষে মহাপাপ। আমি আজ বড় ভাগ্যহীন—আমার পিতা দেশদ্রোহী।

এরূপ আগাগোড়া, page to page; উভয় পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যাও এক—'ভারত-বীরে'র ৪৮; 'বন্দী-বীরে'র ৪৮। সুনির্ম্মলবাবু চোরাই মাল ও তাহার মালিকের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। করিলে কোনও ক্ষতি ছিল না, খ্যাতনামা ব্যক্তি অখ্যাতনামার নাম করিলে ঔদার্য্যই প্রকাশ পাইত। প্রতাপবাবুর "দুই বিঘা জমি"র উপেনের ভাগ্য! "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

—

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মনের পক্ককেশের উপর "কন্যাকুমারী"র তারুণ্য-কলপ পড়িয়া আশ্চর্য্য ফল দেখা দিয়াছে। মাঘের 'ভারতবর্ষে'র ২৪৪ পৃষ্ঠায় রায় বাহাদুরের স্বরচিত কবিতা দ্রষ্টব্য। ছন্দ, মিল ও ভাবের এমন নেক-টু-নেক গতি ভাইস্‌রয়-কাপেও দেখা যায় নাই। দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

মলয়ে খসিল দীর্ঘনিশ্বাস জলধি উঠিল উচ্ছ্বসি
দূরে নটরাজ ঊর্দ্ধ তাণ্ডবে নাচে বাঘাম্বর পড়িল খসি।

নিজের বাঘাম্বর যে এদিকে খসিয়া পড়িতেছে, তরুণ রায় বাহাদুরের কি তাহা খেয়াল আছে?

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৭ [৫ম সংখ্যা

শ্রীমধুসূদন

'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ—কল্পনা ও কবিশক্তি (৫)

'মেঘনাদবধে'র ভাষা সম্বন্ধে সেকালের সমালোচনায় বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না—যেটুকু প্রশংসা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহাকে আবেগের প্রশংসা বলা যাইতে পারে, সমালোচনার প্রশংসা নয়। সেকালে কোন কাব্যকে উৎকৃষ্ট বলিতে হইলে, তাহার ভাষাও একই রকম ছিল, যথা—'এরূপ অলঙ্কারের ছটা, এরূপ শব্দের ঘটা, এরূপ ছন্দের বৈচিত্র্য, এরূপ ভাবের প্রস্রবণ, এরূপ কবিত্বের সাগর একত্র আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না'। কাজেই ভাষা সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ ছিল না; বরং মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে দুইটি অখ্যাতিই সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রথমত, অভিধান হইতে অতিশয় দুরূহ ও শ্রুতিকটু শব্দের সঙ্কলন; এবং দ্বিতীয়ত, বাক্যের গঠনে সরলতার অভাব; তা ছাড়া, ব্যাকরণ লঙ্ঘনের

কথা তো আছেই। আমি এ সকল দোষের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষায় যে কবিশক্তির নিদর্শন আছে, তাহাতে খাঁটি কবিভাষার যে লক্ষণ আছে, তাহারই আলোচনা করিব; কারণ ভাষাই কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান; এবং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভাবে নয়—ভাবের প্রকাশ-সুষমাতে অর্থাৎ ভাষার কারুশিল্পেই, প্রকৃত কবিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কবির ভাষায় সে লক্ষণ নাই, তাঁহার কাব্যে ভাবের একরূপ বিকাশ থাকিতে পারে—প্রকাশ নাই; কারণ সে ভাব রসরূপ ধারণ করে নাই; অতএব সে কবি সত্যকার কবি নহেন। মধুসূদনের কাব্যে আমরা যে শক্তির পরিচয় সর্ব্বাধিক পাই, তাহা তাঁহার ভাষার এই কবিত্বলক্ষণ; ছন্দে ও বাক্যে তিনি বাংলা কাব্যের ধাতুকেই পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; বাক্যের সঙ্গীতগুণ, শব্দের নূতনতর প্রয়োগ ও মিলন-কৌশলে (phrase-making) সে ভাষার যে অপূর্ব্বত্ব—ভিন্ন ধরনে বিহারীলাল ব্যতীত সে যুগের আর কোন কবি বাংলা কাব্যের ভাষাকে তেমন শিল্প-কৌলীন্য দান করিতে পারেন নাই। সেকালের কাব্যরসিকেরা কাব্যের সমালোচনা করিতেন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা; সেই বিচারে, কাব্যের কাহিনীগত কল্পনার মনোহারিত্ব, ভাবের অর্থ-সঙ্গতি এবং ভাষার ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শুদ্ধি—মুখ্যত এই তিনটির দিকেই লক্ষ্য থাকিত, এবং ভাষা, কেবল গম্ভীর বা ললিত-মধুর এই দুইটি গুণের দ্বারা, প্রশংসার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের শাসন বা তজ্জনিত সংস্কার এড়াইবার মত স্বাধীন রসদৃষ্টি তাঁহাদের ছিল না; কাব্যের ভাষা যে শুধুই আলঙ্কারিক কবিভাষা নয়, সে ভাষাও যে কবির নিজেরই সৃষ্টি, তাহাতে মৌলিক ভাবকল্পনার ছাপ থাকে বলিয়াই সে ভাষা একটি বিশেষ কাব্যের বিশেষ রস আস্বাদনের উপায়স্বরূপ

হইয়াছে—এরূপ ভাবনাই সে সমালোচনার বহির্ভূত ছিল; কোন সত্যকার প্রতিভাশালী কবি, আর পাঁচজন কবির মতই আর একজন কবি হইয়া, কেবল কবি-সমাজের সংখ্যা-বৃদ্ধিই করেন না, পরন্তু, একজন স্বতন্ত্র রুবিরূপে কবিত্বের একটি নূতন দেশ জয় করিয়া, কাব্য-রাজ্যে সেই ভাষার অধিকার বিস্তার করেন, এই বোধ বা বিচার সেকালে রসশাস্ত্রীদের প্রয়োজনই হইত না। তাই, 'মেঘনাদবধে'র ভাষা সম্বন্ধে—কাব্যের যাহা মুখ্য পরিচয় তাহার সম্বন্ধে—আমরা কোন বিশেষ আলোচনা এ পর্য্যন্ত হইতে দেখি নাই; শুধু 'মেঘনাদবধ' কেন, একালেরও কোন কাব্য-বিচারে কাব্যের সেই বাঙ্ময় রসরূপ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা হয় না। আসল কথা, সাহিত্য-সৃষ্টিতে স্রষ্টার স্রষ্টৃত্বের প্রধান লক্ষণ যে স্টাইল—কাব্যের বাক্‌ভঙ্গির সেই বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইবার মত কাব্যরসজ্ঞান আমাদের সমাজে এখনও বিরল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা; অর্থাৎ, ভাষা এখানে সর্ব্বপ্রকারে কবির নিজস্ব প্রয়োজনের অধীন হইয়াছে; ছন্দে ও বাগ্‌বন্ধে, ধ্বনি ও রূপব্যঞ্জনায় তাহাকে কবির কল্পনা অনুযায়ী যে বেশবিন্যাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার অভ্যস্ত রুচি ও রীতি-সংস্কারকে অনেকাংশে বর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাহার নিজের প্রকৃতিকেই যেন কাব্যের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইতে হইয়াছে; তাহার ফলে, ভাষা শুধুই ভাষা মাত্র নাই, একটি স্বতন্ত্র কবিভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনপন্থীরা হয়তো ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন না, বলিবেন, ইহা আর নূতন কথা কি? এক এক কবির শব্দযোজনা-ভঙ্গি এক এক রূপ হয়, এজন্য আমাদের শাস্ত্রে কয়েকটি রীতি তো নির্দ্ধারিত করাই আছে; কবির ভাষা যেমনই হউক, তাহাকে এইগুলির একটির মধ্যে পড়িতেই হইবে। অথচ ঠিক

সেই কারণেই এইরূপ রীতিসম্মত ভাষা কোন কবির বিশিষ্ট কবিভাষা বা স্টাইল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; সেই রীতি অনুযায়ী ভাষার যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অভিনব কবিভাষা নয়; তাহাতেও ভাবের উপরে ভাষাই আধিপত্য করে—কল্পনার প্রকৃতি অনুসারে ভাষা আপন ধাতুতেই গলিয়া নূতন ছাঁচে ঢালাই হইয়া উঠে না; সেখানে ভাষাকে পৃথক করিয়া লইয়া তাহার লক্ষণ বিচার করা সম্ভব হয়। আমি অলঙ্কার-শাস্ত্রের কথাই বলিতেছি, সংস্কৃত কাব্যের কথা বলিতেছি না। উৎকৃষ্ট কাব্যমাত্রেরই স্টাইল স্বতন্ত্র, তাহার ভাষার যে একটি রূপ আছে, তাহা সেই কাব্যেরই রূপ, অর্থাৎ তাহা সেই কাব্যের অন্তর্গত কবি-মানসেরই প্রতিমূর্ত্তি। সেই উৎকৃষ্ট কাব্যের ভাষাও যেমন আর সাধারণ কবিভাষা থাকে না, তেমনই যে ছন্দে সেই কাব্য রচিত হয় তাহা যদি একটি প্রচলিত সাধারণ ছন্দ হয়, তথাপি সেই ছন্দেও একটি স্বতন্ত্র সুর বাজিয়া উঠে—সেই কবিতার ভাব, ভাষার মত ছন্দকেও, আপনার ছাঁচে ঢালিয়া লয়। কবির কল্পনা যদি তাঁহারই বিশিষ্ট রসকল্পনা হয়, অর্থাৎ (যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে) যদি তাহা বাহিরের পূর্ব্ব-প্রচারিত ভাবকল্পনা হইতে সংক্রামিত একটা বীজের অঙ্কুর না হইয়া, কবির নিজের অন্তর হইতেই উদ্ভূত হয়, তবে তাহা ভাষায় যে কলেবর ধারণ করে, তাহা আকারে-আয়তনে, গঠনে-বর্ণে, চলনে-বলনে, চাহনিতে ও কণ্ঠস্বরে অনন্যসাধারণ হইবেই, এবং সেই সকলের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সুষমার সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে। কাব্যের ভাষা কাব্যের কলেবর বলিয়া, এবং তাহাতে এই সকল গুণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে বলিয়া, কেবল শব্দযোজনার রীতিটিকে পৃথক করিয়া, সেই রীতির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিলেই কবিভাষার সম্যক বিচার হয় না। কবিভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হইলে, বাণীবিন্যাস-ভঙ্গিই লক্ষ্য

করিতে হয়, এবং সেজন্য, শব্দ-চয়ন ও তাহার প্রয়োগচাতুর্য্য, বাক্যগঠন-কৌশল, ও শব্দযোজনায় অ-পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতি—এ সকলই গণনীয় বটে, তথাপি তাহাতে কোন রীতির সন্ধান চলিবে না; কারণ সে সকল গুণও যদি ঐ কাব্যের বিশিষ্ট গুণ না হইয়া কাব্য-সাধারণের গুণ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে সে ভাষাও যেমন স্টাইল নয়—রীতি মাত্র, তেমনই সে কাব্যও সৃষ্টি নয়—রচনা মাত্র।

মধুসূদনের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য কোন রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। এ ভাষা যে কোন্ অর্থে কবিভাষা, তাহা সেকালের অপর মহাকাব্যগুলির ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই, বুঝিতে পারা যাইবে। গদ্যের ভাষাকে ছন্দোবদ্ধ করিলেই তাহা যে কবিতার ভাষা হয় না, তাহার প্রমাণ আমরা একালের অনেক ছন্দসর্ব্বস্ব কবিতায় পাইয়া থাকি। আবার, ভাবের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথবা বক্তৃতার উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষাও যে কবিতার ভাষা নয়, তার প্রমাণ খাঁটি গদ্যেও উহা সম্ভব। মধুসূদনের সমসাময়িক কবিদিগের একটা সুবিধা এই ছিল যে, তখনও এখনকার মত একটা কৃত্রিম কবিভাষার সৃষ্টি হয় নাই; তখন নূতন গদ্যের ভাষাই যথেষ্ট চমকপ্রদ ছিল, তাই তাঁহারা সরল গদ্যের ভাষাতেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমি এখানে সেকালের সেই ভাষার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা :—
'না নিক্ষেপ অস্ত্র দেব এ মর-আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী,
বহু পরিশ্রমে প্রভু করেছি সঞ্চয়
এ সকল; হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।
* * *

লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ,
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে
সংহারাত্রিশূলতুল্য তেজ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুঙ্কারিবে সদা ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্রনামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।
('বৃত্রসংহার'—১৯শ সর্গ)

বাজিল দুন্দুভি রণনাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে নাদে
ছাড়ে সিংহনাদ ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্য সেনাদল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ কাছে।

* * *

ধূলিধূমজালে গগন আচ্ছন্ন,
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন,
অমরা-নগরী ঘোর অন্ধকার,
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমক নয়ন ধাঁধে।
(ঐ—২০শ সর্গ)

(২) ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি, হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে,
শোক, দুঃখ, ভয় ত্রাস, নিরাশ প্রণয়
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস,
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।
('পলাশীর যুদ্ধ', ২য় সর্গ)

ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ!
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?

দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব—কি দেখিছ আর?

* * *

মূর্খ তুমি! মাটি কাটি লভি কোহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?

কিম্বা সেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্ত-কাল বুঝি এই উপস্থিত!
(ঐ—৪র্থ সর্গ)

'বৃত্রসংহারে'র ভাষা শুধুই গদ্য নয়—তাহা সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতবর্জ্জিত, এবং শব্দের কোন সৌষ্ঠবই নাই; স্থানে স্থানে কবির ভাব-অর্থ প্রকাশের তাড়নায় ভাষা যেন ছেকড়াগাড়ির ঘোড়ার মত গলদঘর্ম্ম হইয়া, রাস্তার উপর হাঁটু ভাঙিয়া পড়িয়া যাইতেছে। নবীনের ভাষাও ছন্দোবদ্ধ গদ্য, তবে ভাবের আবেগযুক্ত হওয়ায় সেই ছন্দ সুরযুক্ত হইয়াছে। এ ভাষায়, ভাবের রসরূপ কোথাও বাক্য হইয়া উঠে নাই, অর্থাৎ বাক্য রসাভিলাষী হইলেও, রসাত্মক নহে। ইহাদের যে ছন্দ তাহা বর্ণ বা মাত্রাধ্বনিকে লীলায়িত করে না, কেবল আবেগময়ী বক্তৃতার ভঙ্গিতে কম্পিত করে মাত্র। খাঁটি রস-প্রেরণায় কবিচিত্তে ভাবের অনুভূতি এমনই রসার্দ্র হইয়া উঠে যে, তাহা যেন বাক্যের বর্ণবিন্যাসেও রূপময় হইতে চায়; ভাব, কেবল বাক্যের অর্থ ও ছন্দের ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া কোনরূপে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, ভাষার যত কিছু উপাদানকে স্ববশে আনিয়া আপনার রূপটিকেও

প্রকাশ করিতে চায়। এইজন্যই, গদ্যভাষা ও কবিভাষা উভয়ের পক্ষেই স্টাইলের সংজ্ঞা এক হইলেও, কাব্যের কল্পনামূলে বস্তু অপেক্ষা ভাবের আধিপত্য অধিক বলিয়া—যাহা অনুভূতিগোচর, কিন্তু সহজে বাক্য-গোচর নয়, তাহাকেই বাগর্থের সাহায্যে মূর্ত্তিমান করিতে হয় বলিয়া, কাব্যই বাণীশিল্পের পরাকাষ্ঠা—কবিগণই বাণীবরপুত্র; কবিরাই ভাষাকে ভাবের অধীন করিয়া তাহাকে ক্রমাগত ভাঙিয়া গলাইয়া, ঢালিয়া মিলাইয়া, তাহার প্রকাশক্ষমতা ও রসাস্বাদমাধুর্য্য নিরতিশয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। যে ভাষা ইতিপূর্ব্বে হয়তো সাহিত্যগুণবর্জ্জিত ছিল, সেই ভাষাই সহসা একজনমাত্র শক্তিশালী কবির আবির্ভাবে একেবারে যেন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। এমন ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। আমাদের নবযুগের সাহিত্যেও মধুসূদন সেই কবি—যাঁহার প্রতিভায় সেকালের সেই নিতান্ত শ্রীহীন ভাষাই এক অভিনব কবিভাষার রূপ ধারণ করিল; সেকালের অন্যান্য কবিগণ যে ভাষার গদ্যত্ব ঘুচাইয়া তাহার রসসংস্কৃতি সাধন করিতে পারেন নাই—মধুসূদন তাহার সেই নূতন গদ্যচ্ছন্দকেই যেমন অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীত-সুরধুনীতে পরিণত করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার সেই গদ্য বাগ্‌বৈভবকেই রসসিঞ্চিত করিয়া তাহা হইতে নব্য বঙ্গসরস্বতীর বীণাপাণি-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমি অতঃপর মধুসূদনের সেই ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

২

'মেঘনাদবধে'র ভাষার প্রকৃতি, কাব্যের যে কোন অংশ পড়িলেই বুঝা যাইবে; এবং পাঠমাত্রেই মনে হইবে, ইহা এক স্বতন্ত্র ভাষা—আমরা এক নূতন কবি-পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। নিম্নোদ্ধৃত

পংক্তি-পর্ব্ব ও বিচ্ছিন্ন পংক্তিগুলিতে কবিভাষার যে লক্ষণ আছে, তাহাকে ভাষার আলঙ্কারিকতা বলিলেই চলিবে না; কারণ এ ক্ষেত্রে অলঙ্কার নামটাই ভুল। যাহা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, লতায় পুষ্পের মত যাহা ভাষার দেহে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে, যাহা তাহার নিজেরই রস-শ্রী বা ভাব-লাবণ্য, তাহা বাহিরের ভূষণ নয়, সে সৌন্দর্য্য তাহার নিজেরই কাব্যযৌবনজনিত অনঙ্গ অঙ্গ-শোভা। এখানে বৈয়াকরণ-বুদ্ধি লইয়া কেবল অলঙ্কার নিরূপণ করিলে, তাহা ফুলের বাগানে উদ্ভিদ-বিদ্যার মাহাত্ম্য ঘোষণা করার মতই হইবে। আমি যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে সর্ব্বত্র কেবল অলঙ্কার-শোভাই নয়—কবিভাষার বহু বিচিত্র গুণও লক্ষণীয়।—

এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,...

* * *

এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুলবালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধু-বোলে
বাজিল কিঙ্কিনী, করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়ন-রঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।

* * *

নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ হে রাজসুন্দরী,
তোমার।

* * *

অনম্বর-পথে সুকেশিনী
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে;

সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে।

* * *

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী মেঘাবৃত যেন
উষা।

* * *

বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র চূর্ণি মেঘদলে।

* * *

শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজী-ভালে
মণিময় সিঁথীরূপে জোনাকির পাঁতি।

* * *

এই ত তুলিনু
ফুলরাশি, চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা,

* * *

এতেক কহিয়া বামা শির নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শির মন্দ সমীরণে।

* * *

বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।

* * *

তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে
অমর!

* * *

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ?

* * *

পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!

* * *

দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী…

* * *

শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে।

* * *

ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কিরে তোর সম, এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?

* * *

অনম্বর পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।

* * *

চিত্র-পুত্তলিকা সম চারু চিত্রলেখা!

* * *

কিংবা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে।

* * *

বাড়ে যথা রশ্মিকর জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দনকাননে।

* * *

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে।

* * *

উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম।

* * *

উত্তরিলা রাণী
মুছিয়া নয়নজল রতন-আঁচলে।

* * *

ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী
কুসুমবিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে।

* * *

উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ…
আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।

* * *

শৃঙ্গধর সম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ, প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে!

* * *

সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে!

* * *

রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী

* * *

বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি

* * *

তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল—অকাল নিদাঘে!

* * *

হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্ত্যেয়? না শান্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে—সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি?

* * *

শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দৃঢ় বীর-পদভরে; দেখিনু আকাশে

অগ্নিশিখা সম শর; দিবা-অবসানে
জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।

এ ভাষার মৌলিকতা বুঝিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা এ যুগের অর্থাৎ রবীন্দ্রোত্তর-কাব্যযুগের ভাষা নয়। তথাপি, এ ভাষায় এখনও বাংলা কবিতার একটি অভিনব রূপ অম্লান হইয়া আছে। যেমন উৎকৃষ্ট বসনের বয়ন-কৌশল বুঝিবার জন্য তাহার যে কোন প্রান্ত পরীক্ষা করিলেই চলে, তেমনই, আমি এই সুদীর্ঘ কাব্য-দুকূলের বাণীবয়নচাতুর্য্য বুঝাইবার জন্য, ইহার শুধুই কলহংসলক্ষণ প্রান্তটিই নয়—যে কোন স্থান হইতে বুনানির নমুনা তুলিয়া ধরিয়াছি। এ বস্তুর মহার্ঘতা বুঝিবার জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই—তাহা সম্ভবও নয়; কারণ সূতাগুলিকে পৃথক করিয়া দেখিলে বুনানির পারিপাট্য চোখে পড়িবে না। অতএব পাঠকের শুধু শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেই চলিবে না—কাব্যভাষার স্বাদ ও সৌরভ-বোধও থাকা চাই; যাঁহাদের সেই অনুশীলন আছে, তাঁহারা উপরি-উদ্ধৃত বাণীখণ্ডগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, উহাদের রচনায় বাণীপ্রতিভার কোন্ লক্ষণ আছে। কাব্যের রস-আস্বাদন করিতে যেমন ভাষাকেই আস্বাদন করিতে হয়—তেমনই ইহাও মনে হয়, কবিও যেন শব্দগুলিকে, রচনাকালে, নিজের রসনায় আস্বাদন করিয়াছেন। কাব্যের কবিত্ব বিশ্লেষণ যে দুরূহ, তাহার কারণ—কবিভাষার এই যাদুগুণ; কবিত্বের বারো আনা—বারো আনা কেন, ষোল আনা নির্ভর করে ভাষার এই বাণী-লাবণ্যের উপরে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, রস-ব্রহ্ম ও বাক্-ব্রহ্ম এক। তথাপি, সেরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব না হইলেও, আমি এই ভাষার দুই চারিটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব।

মধুসূদনের ভাষার সবচেয়ে বড় লক্ষণ তাহার সঙ্গীতগুণ—যে

প্রতিভার বলে তিনি এতবড় ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভাষার এই শব্দ-সঙ্গীতও (phrasal music) সেই প্রতিভার পক্ষেই স্বাভাবিক। কেবল ভাবকেই কোন প্রকারে বাক্যার্থের দ্বারা প্রকাশ করিবার যে আবেগ, তাহাতে ভাষার এই সঙ্গীত-সংযম ঘটে না; সেরূপ আবেগ কবিত্ব-প্রবণতা মাত্র—তাহা সত্যকার কবিত্বের লক্ষণ নয়। কাব্যসৃষ্টির আদিতেই শব্দসৃষ্টি; বক্তার পক্ষে যেমন বাক্‌পটুতা, কবির পক্ষেও তেমনই শব্দনির্ম্মাণ-পটুতা—বক্তাকে কেবল আহরণ করিতে হয়, কবিকে সৃষ্টি করিতে হয়। কবি কেবল বাক্যের অর্থের দ্বারাই ভাব-সঞ্চার করেন না, শব্দের রূপ ও ধ্বনির দ্বারাও সেই ভাবকে যেন চক্ষু-কর্ণের গোচর করাইতে হয়। ইহার মধ্যেও ধ্বনিই প্রধান—কারণ উহাই শব্দ-রসের একমাত্র অনুপান। মধুসূদনের ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য্য অধিকাংশ স্থলে—বাহ্যত, যমক-অনুপ্রাসের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকিলেও সেরূপ শব্দালঙ্কার মূল শব্দকে অতিক্রম করে নাই—যে শব্দগুলিকে তাহারা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের নিজস্ব ভাব-ব্যঞ্জনাও অল্প নহে। যদি কেবল যমক-অনুপ্রাসই তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মধুসূদনের বহুপূর্ব্বে বাংলা কাব্যভাষার চরম উৎকর্ষ হইয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের ভাষায় যে সঙ্গীত আছে, তাহা রসবিগলিত স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গীত—বিশেষত, সঙ্গীতের যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই স্বর-ধ্বনির অপূর্ব্ব লীলা। উপরি-উদ্ধৃত প্রথম উদাহরণটির প্রথম পংক্তিতেই ইহার আভাস পাওয়া যাইবে। এ সঙ্গীত কাব্যরচনাকালে প্রাণ হইতেই কানে বাজিয়া উঠে, এবং তাহা হইতেই কবির রসনায় শব্দ সৃষ্টি হয়। যে মাদকতা হইতে ইহার সৃষ্টি, ভাষায় তাহা সঞ্চারিত না হইয়া পারে না; এবং তাহাই সঙ্গীতরূপে—ছন্দোবন্ধে, যমক-অনুপ্রাসে—বাক্যের ব্যঞ্জন ও স্বর ধ্বনিতে পর্য্যন্ত

প্রবাহিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে। কাব্যের ভাব ও কল্পনাবস্তু—অর্থাৎ কাব্যের প্রকৃতি অনুসারে কবিভাষার যে পার্থক্য ঘটে, তাহার মূলে আছে এই সঙ্গীত; প্রাণের স্পন্দনভেদেই শব্দ-স্পন্দনেও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে; তাই সকল কবির ভাষা এক নয়। উপরের পংক্তিগুলিতে এই শব্দগত সঙ্গীতের নানা রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং পাঠ করিবার সময়ে ইহাও অনুভব হইবে যে, এই সকলের মূলে আছে সেই এক মন্ত্র—সেই অমৃতচ্ছন্দের অমিত্রাক্ষর; তাহারই যতিবিন্যাস-সুষমায় পদগুলি যেন আপনা হইতে এমন সুডৌল ও সঙ্গীত-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। মধুসূদনের ভাষার যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি সাধারণত ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিলেও, তাহারা যেমন ছন্দকেও ধারণ করিয়া আছে, তেমনই অনেক স্থলে, ভাবের সুর অনুযায়ী ছন্দ-সঙ্গীতেরও বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছে। 'পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে'—এখানে অনুপ্রাস কেবল শব্দালঙ্কারই নয়,—ভাবের ধ্বনিরূপ বজায় রাখিবার জন্য, অমিত্রাক্ষরের গতিচ্ছন্দকে পরিবর্ত্তন করিয়া, ভাষায় গীতি-সুর যোজনা করিয়াছে। 'সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে'—এখানে যেটুকু যমক বা অনুপ্রাসের টান আছে, তাহা কেবল ভাষার অলঙ্কার-বৃদ্ধির জন্যই নহে। এই অনুপ্রাসে যে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষায় ভাবানুরূপ গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার হইয়াছে। আবার, 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে'—এই চরণের নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসও, Tennyson-এর "Immemorial elms and murmur of innumerable bees"-এর মত নিকৃষ্ট শব্দালঙ্কার মাত্র নয়; কারণ, তাহাও সেই 'মধুকর-নিকর-করম্বিত'-জাতীয় অনুপ্রাসেরই ইংরেজী সংস্করণ; যে স্থানে যে ভাবে উহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন অতর্কিত তেমনই স্বাভাবিক।

যেক্ষণে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক মেঘনাদ হত হইল, সেই-ক্ষণে—

যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনকমুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!

অনুপ্রাসের দ্বারাই ভাবের এমন অপরোক্ষ অনুভূতি সঞ্চার করার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। পূর্ব্বপংক্তিগুলির পরে সহসা ঐ পংক্তিটিতে আসিয়া পাঠকের চিত্তেও একটা কম্পন-শিহরণ জাগে—রাবণের প্রাণেও যেমন সহসা একটা অমঙ্গলের ভীতি-শিহরণ জাগার সংবাদ ঐ শব্দ কয়টি জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে কেবল বর্ণের সমধ্বনি নয়—বিশিষ্ট ধ্বনিতেই, সেই শিহরণ-উদ্রেকের গুণ আছে। অতএব, 'মেঘনাদ-বধে'র ভাষায় যমক-অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য্য প্রায় সর্ব্বত্র আছে, তাহার কারণ শুধু শব্দালঙ্কারপ্রীতি নয়—অব্যর্থ শব্দধ্বনির দ্বারা ভাবের যথা-যথ রূপসৃষ্টি ও তাহার অভিপ্রায়। মহাকাব্যের বস্তুপ্রধান বর্ণনার ভাষাকে—নানা শব্দের রুক্ষ কঠিন উপলরাশিকে—মসৃণ করিবার, এবং সর্ব্বোপরি অমৃতাক্ষর-ছন্দের প্রবাহকে তরঙ্গিত করিবার জন্যও, কবির পক্ষে এই উপায় অবলম্বন স্বাভাবিক; শেষের বিষয়টি পরে ছন্দের প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

৩

'মেঘনাদবধে'র ভাষার দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ—যাহা উৎকৃষ্ট কবি-ভাষার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ—তাহা এই যে, ইহাতে কবির নূতন শব্দ-সৃষ্টির যে শক্তি লক্ষিত হয়, তাহা সেকালে আর কাহারও ছিল না বলিলেই

হয়। কবির পক্ষে এই শব্দনির্ম্মাণ-শক্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক বড় কবির ভাষায় আমরা যে একটি নবীনতার ভঙ্গি লক্ষ্য করি তাহা এই কারণেই হয়—শব্দের সেই নবীনতার জন্যই নব-ভাবের রসাস্বাদে আমাদের চিত্ত আরও উৎসুক ও সজাগ হইয়া উঠে। আমি 'মেঘনাদবধ' হইতে যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার এই নবীনতা রসপিপাসু পাঠক-মাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। যাহাকে ভাষার শব্দমন্ত্র বলে, তাহা এতই সূক্ষ্মভাবে অতিশয় স্বল্পাক্ষর শব্দেও নিহিত থাকে যে, সমগ্র বাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে, তাহা অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। তথাপি, আমি কয়েকটির উল্লেখ করিব; তাহাতে অন্তত, আমি, ভাষার কোন্ লক্ষণের কথা বলিতেছি, এবং সেই লক্ষণ ভাষায় কেমন করিয়া প্রকাশ পায়, তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। মধুসূদন শুধুই নূতন শব্দ ব্যবহার করেন নাই, অনেক সময়ে ব্যাকরণ-অভিধানকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও শব্দের ধ্বনি-সৌন্দর্য্য ও ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি করিয়াছেন; ছন্দ ও ভাবের সুর বজায় রাখিবার জন্য, অপরিচিত ও অতি-পরিচিত উভয়বিধ শব্দকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, খাঁটি বাংলা শব্দকে প্রচলিত অর্থ ত্যাগ করাইয়া সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; সামান্য একটু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাতনকে নূতনত্ব দান করিয়াছেন;—এ সকল হইতে তাঁহার কবিচিত্তের বাণীরস-লোলুপতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কৃশ কটিদেশে', 'নিতম্ব-বিম্বে', 'হৈমবতী পুরী', 'অনম্বর পথে', 'নোমাইলা', 'অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে', 'কুসুম-বিবৃত পথে' ('বিবৃত' এখানে অন্য অর্থে), 'উচ্চ অবরোধে', 'জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে', 'ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে', 'সর্ব্ব-হর', 'বাসবীয় চমূ', 'অকম্প চামর' প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োগ তাঁহার

বাক্-ব্রহ্মচর্য্যার সাক্ষ্য দিতেছে। আমি ভাষার যে সূক্ষ্মতর যাদুগুণের কথা বলিয়াছি, তাহাও এই পংক্তিগুলির মধ্যে অনেক স্থলে অনুভব করা যাইবে; আমি এখানে দুই একটি মাত্র পুনরুদ্ধৃত করিব।—

শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজী-ভালে
মণিময় সিঁথীরূপে জোনাকির পাঁতি।
* * *
দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী—
* * *
ধীরে ধীরে রথিবর চলিল একাকী
কুসুম-বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে।

—ইহার কোনটিতেই ভাববস্তুর মৌলিকতা, অথবা অর্থগৌরব এমন নাই যে, তাহা মনকে বিশেষ করিয়া নাড়া দেয়—শব্দালঙ্কারেরও অতিরিক্ত শোভা নাই, বরং অপর পংক্তিগুলির অনেক স্থলে সে শোভা আরও অধিক আছে; তথাপি কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে, এইরূপ পংক্তি মনের মধ্যে কেবলই ঘুরিতে থাকে; ইহাকেই বলে ভাষার শব্দমন্ত্র। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহাদের কোন সংস্কার নাই, তাঁহারা ভাষার এ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষায় আর যে বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ আছে, তাহার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিব—মধুসূদনের সাহিত্যিক দীক্ষা, ও তাহার ফলে, তাঁহার রুচি ও কবিপ্রকৃতির কথা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি। এক দিকে হোমার, ভার্জিল ও মিল্টনের, এবং অপর দিকে বাল্মীকি ও কালিদাসের কাব্য তাঁহার মনে ভাষার সম্বন্ধে যে একটি নিষ্ঠার উদ্রেক করিয়াছিল, শুচিতা ও শোভনতার সঙ্গে, ভাষার কঠিনোজ্জ্বল দীপ্তির প্রতিও তাঁহার যে আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহারই ফলে এ কাব্যের ভাষায় একটি ক্লাসিকাল আভিজাত্যের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেকালের সেই প্রায়-গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট, শ্লথ ও শিথিল ভাষার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ—এ ভাষার—সংহতি-সুষমা ও কৌলীন্য-গরিমা বাংলা কাব্যেরই জাতিরক্ষা করিয়াছে। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, 'মেঘনাদবধ' শুধুই একটা কাব্য নয়—সে একটা ভাষা; তাহার যাহা

কিছু দোষ-গুণ সব লইয়া সে এতই অনন্যসাধারণ যে, তাহার দূরতম প্রতিধ্বনি, বা সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আর কোথাও নাই। মধুসূদনের কাব্যকীর্ত্তির পরিমাণ অতিশয় অল্প বলিয়া—এই স্টাইল ওই একখানি কাব্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া—ভাষার এই রূপ আরও প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। আবার, রবীন্দ্রযুগে ভাষার যে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা ইতিমধ্যেই প্রাচীনতার সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে অধিকতর বিচিত্র ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে—আধুনিক স্থাপত্যরীতির পাশে ভুবনেশ্বর-কণারকের মত—আধুনিক বাংলা কাব্যের পাশে 'মেঘনাদবধ কাব্য' অতীতযুগের বিস্ময়কর কীর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার সেই ক্লাসিকাল ভঙ্গির নিদর্শন পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্যেই পাওয়া যাইবে।—

(১) নয়নে তব হে রাক্ষসপুরী
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
(২) বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে
(৩) পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি।
(৪) সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে।

—ইহাদের কোথাও ভাষার উচ্ছলতা নাই—বর্ণনায়, চিত্রাঙ্কণে, অথবা অর্থনির্দ্দেশে, বাক্য যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই সরল; ইহাকেই বলে বচন-রচনার গাঢ়বদ্ধতা; অথচ এ ভাষার ঐশ্বর্য্যও অল্প নহে। আবার—

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর; করিলে আজ্ঞা সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা।

—এখানে ভাষা প্রায় কথ্য ভাষার মতই, কিন্তু তথাপি তাহাতে এমন একটি শালীনতা আছে, এমন একটি সংযম ও স্বচ্ছতা আছে যে, তাহাতেই উহা অনায়াসে কবিভাষার আভিজাত্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলির সর্ব্বশেষটির প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষার মূল ধাতু কি। এই পংক্তি কয়টির ভাষায় যে অতিশয় সরল অনাড়ম্বর শব্দযোজনা এবং বর্ণনার যে

বাক্‌সংযম ও ছন্দের যে মৃদুমন্থর গতি রহিয়াছে, তাহাতে ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের অতিশয় সুমার্জ্জিত রুচি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, নিরন্তর উৎকৃষ্ট কাব্যভাষার সহিত পরিচয় থাকাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট স্টাইলের প্রধান লক্ষণ—সংযম; মধুসূদনের কাব্যে যেখানেই অবকাশ হইয়াছে, সেখানেই এই সংযমের পরিচয় আছে; মনে হয়, এই দিকেই তাঁহার কবিমানসের স্বাভাবিক আকর্ষণ। এ কাব্যের যত কিছু শব্দালঙ্কার বা বাক্যের ঘনঘটা, তাহারও মূলে আছে সজ্ঞান প্রয়োজন-বোধ—ভাষার ঐশ্বর্য্য-বিধান এবং ছন্দের শক্তি-পরীক্ষা, এ কাব্যের কবির একটি পৃথক অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, মধুসূদন ভাষার ক্লাসিকাল আদর্শ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ ছিলেন; তাই একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষায় অসংযম অপেক্ষা সংযমই অধিক; ইহার বাগ্‌বন্ধ নিরতিশয় যত্নকৃত, এবং স্থলবিশেষে সেই লক্ষণই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। 'হে রাঘবকুল-চূড়া, তব কুলবধূ রাখে বাঁধি পৌলস্ত্যেয়" ইত্যাদিতে ভাষার যে গুণ, এখানেও অশোকবনে বন্দিনী সীতার মুখে, দূর হইতে দিনব্যাপী যুদ্ধের কোলাহল শুনিয়া, ক্লিষ্ট ক্লান্ত কণ্ঠে তাহার সম্বন্ধে যে ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহার গুণও সেই একই, সেখানেও যেমন ভাষা ভাবকে অতিক্রম করে নাই, এখানেও তেমনই সীতার উৎকণ্ঠা অতিশয় পরিমিত ও যথোপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। উপরন্তু, যখন পড়ি—

শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে…
জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!

তখন মনে হয়, কৃত্তিবাসী বা কাশীদাসী পয়ার ও তাহার ভাষা, কোন্ মন্ত্রবলে, এত সামান্য পরিবর্ত্তনে, এতখানি রূপান্তর লাভ করিল!

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার সম্বন্ধে আলোচনা বাকি রহিল, আগামী সংখ্যায় তাহা শেষ করিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বীর সাভারকর

যখনই বীর সাভারকরের বক্তৃতা পড়ি, তখনই দেশের রাজনৈতিক আকাশের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া যেন একটু আলো দেখিতে পাই। সাভারকরের রাজনীতি এতই সহজ ও সত্য বলিয়া মনে হয় যে, তাহা যেন রাজনীতিই নয়, সে যেন পুরুষের স্বাভাবিক পৌরুষ-ধর্ম্মনীতি। যে বাণীতে মানুষের প্রাণ, বুদ্ধি, ও মন সহজেই সাড়া দেয়—শুধু হিন্দুর নয়, যে কোন মানুষের—তাহাই এই প্রাণধর্ম্মী পুরুষের 'মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মল' চিত্ত হইতে উৎসারিত হইতে শুনি। আজিকার দিনে কোন জাতিকে বাঁচিতে হইলে যে জাতীয়তাধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে, যাহার দ্বারা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনও অটুট রাখা সম্ভব, তাহারই নির্দ্দেশ এই সকল বক্তৃতায় এমনই প্রত্যয়পূর্ণ হইয়া উঠে যে, কোন কূটচিন্তা বা কূটবুদ্ধির প্রয়োজন আর থাকে না। হিন্দু-ভারতের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে কয়জন মহাপুরুষ গত যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—যাঁহাদের কণ্ঠে নবযুগের জাগরণী-মন্ত্র অপৌরুষেয় দিব্যবাণীর মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের দুইজন—এই বাংলারই বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ; তৃতীয়—মারাঠার বালগঙ্গাধর টিলক। বাঙ্গালী দুইজনের ছিল অসামান্য প্রতিভা—ভাবকল্পনার দিব্যদৃষ্টি; মারাঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-মনীষা ও ক্ষাত্রতেজের যে অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল, তাহারই বলে তিনি, হিন্দু-ভারতের এই সঙ্কটক্ষণে,

পার্থ-সারথির মুখ হইতে সেই শঙ্কা-হরণ অভয়-মন্ত্র নূতন করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। টিলকের গীতাভাষ্যের ভূমিকা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই ব্রাহ্মণ পুরুষবীর হিন্দুর জাতিধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য—গত সহস্র বৎসরের অনার্য্যজুষ্ট ভক্তিরসপিচ্ছিল পন্থা হইতে তাহাকে ফিরাইবার জন্য—কি মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন! ইহারও পূর্ব্বে আমাদের দেশে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সেই মন্ত্রেরই বাণীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সে মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা। তার পর, বিলাতী পলিটিক্সের মোহ, এবং তাহারও পরে, জাতি-ও-সমাজ-চেতনা-বর্জ্জিত এক অহংসর্ব্বস্ব কাল্‌চার—ব্যক্তির ব্যক্তি-সাধনার উপযোগী এক তুরীয় ভাববাদ—বিশ্বমানবতার ছদ্মরূপে, আমাদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়াছে; জীবনের কোন ক্ষেত্রে বাস্তব সহজ সত্যকে স্বীকার করাই চিত্তপ্রকর্ষহীনতার লক্ষণ বলিয়া ধিক্কৃত হইয়াছে। জাতীয়তাবোধকে আমরা আর মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি না, কারণ, আমরা মনুষ্যত্বই হারাইয়াছি। ইহারও পরে, গত বিশ বৎসর ধরিয়া, ভারতের পশ্চিম উপকূলের কুক্ষি-দেশে এক জৈন নগ্ন-ক্ষপণকের অপূর্ব্ব আচার ও অদ্ভুত ধর্ম্মনীতির আকস্মিক ছটায়, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘোর তামসিক অবস্থায় এক অতিশয় অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকতার মোহ—অনাত্মের দ্বারা অভিভূত জনমণ্ডলীর উপরে আত্ম-লাঞ্ছনামূলক ধর্ম্মের প্রভাব—বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। যে ক্ষমা-রূপ অহিংসা মহাশক্তিমানের ভূষণ—অতিশয় দুর্ব্বল, কৃমিতুল্য মেরুদণ্ডহীন প্রাণীকে তাহারই আচরণ করিতে হইবে! যাহারা মাটির উপরে সোজা হইয়া চলিতে পারে না, তাহাদিগকে আকাশচারী হইতে হইবে! মহা-ভীরুও ক্ষণিকের জন্য মরিয়ার সাহস দেখাইতে পারে, তাই, যে হাড়িকাঠ হইতে গলা বাঁচাইবার শক্তি আমাদের নাই, বরং তাহাতে

গলা দিবার অশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সেই হাড়িকাঠের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার যে বীরত্ব তাহাই হইল আমাদের মহামোক্ষলাভের উপায়; নির্জ্জীব ও নির্ব্বীর্য্য সমাজের দারুণ নৈরাশ্য-অবস্থায় ঐ নীতিহীন নীতিই পরম লোভনীয় হইয়া উঠিল। আর কিছু করিবার শক্তি বা বুদ্ধি যাহাদের নাই, তাহারাই মরিয়ার কাজ ছাড়া আর কোন কাজই বীরের মত করিতে পারে না; সে কাজে যদি এমন একজন আদর্শ-নেতার নেতৃত্ব লাভ হয়, তবে কোন সংশয় আর থাকে না;—যাহা অসম্ভব, এমন কি, মনুষ্যবুদ্ধিরও বহির্ভূত, তাহাই পরম সত্য হইয়া উঠে। ইহার ফল জাতির পক্ষে কি হইয়াছে—সেই মরিয়ার ধর্ম্ম এখন কোন্ ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছা-অন্ধ ছাড়া আর সকলেই দেখিতে পাইতেছে। আজ শোনা যাইতেছে—এ ধর্ম্মের লক্ষ্য কেবল ভারতের মুক্তিই নয়—ত্রিভুবনের মুক্তি, ইহা দ্বারা ভারতের মুক্তি সম্ভব না হইলেও ইহাই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম!

আমরা পলিটিক্স বুঝি না; সোশ্যালিজ্‌ম, ফাসিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌মও বুঝি না; আমাদের একমাত্র উৎকণ্ঠা—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যাহা সার সত্য—যাহা জগতে অতুলনীয়, এবং মানবসভ্যতারই এক অমূল্য সম্পদ; যাহা যুগসঞ্চিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইলেও বজ্রমণির মত উজ্জ্বল ও অক্ষয়—তাহাকে আজিকার এই মহামন্বন্তরমুখে কি উপায়ে উদ্ধার করিয়া 'জগদ্ধিতায়' উৎসর্গ করা যাইতে পারে। ইহার জন্যই আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে; এবং সেই বাঁচিবার জন্য যে সংঘ বা রাষ্ট্রবন্ধন আবশ্যক, তাহাই আমাদিগের জাগরণে ধ্যান ও নিদ্রায় স্বপ্ন হওয়া উচিত। বীর সাভারকরের বাণীতে তাহারই নির্দ্দেশ আছে—সে বাণী প্রাণাগ্নিপূত বলিয়াই তাহা এত স্পষ্ট ও জীবন্ত। তাঁহার নাগপুর-বক্তৃতায় প্রাণ ও মন উভয়ের যে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—

ভাবুকতা ও যুক্তিশীলতার যে আশ্চর্য্য সমন্বয় তাহাতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, এ পুরুষ এক নূতন শক্তির আধাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন—ভারতভাগ্যবিধাতার কোন মহৎ অভিপ্রায়-সিদ্ধি ইঁহার দ্বারাই হইবে। সে কণ্ঠস্বর আজও তেমনই দৃঢ়, তেমনই সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সেই কণ্ঠোচ্চারিত প্রাণদমন্ত্রে যদি আবার আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে, ভয় ও বিমূঢ়তা দূর হয়, তাহা হইলে এইবার হিন্দুর ইতিহাস জগতের ইতিহাসে যুক্ত হইবে। সমগ্র হিন্দু-ভারতের মিলিত হৃদয়ের প্রাণপূর্ণ ফুৎকারে এই বীরের জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠুক।

* * *

রামমোহনই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি স্রষ্টা

বাংলা দেশে সবই চলে, এমন মজার দেশ আর নাই। এ দেশ যেমন হুজুগের দেশ, তেমনই অন্ধভক্তির দেশ—আবার তেমনই দলাদলির দেশ। কথায় বলে 'এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যায় না'; যত-বড় বিদ্বান হউক, শিক্ষা দীক্ষা যত গভীর হউক, নজর সেই ভাগাড়ের দিকেই। হয়কে নয় করিতে, সাদাকে কালো করিতে, মোকদ্দমা সাজাইতে, প্রতিপক্ষকে যেন-তেন-প্রকারে হারাইয়া দিতে এমন উৎসাহ, এমন বুদ্ধির খেলা বোধ হয় আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যাইবে না। তার উপরে যদি ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক গৌরব-ঘটিত হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা! যত-বড় সাধু, যত-বড় সত্যানুরাগী, এমন কি যত-বড় দৃষ্টিসম্পন্ন হউক, অন্ধ অভিমানের বশে দীপ্ত দিবালোকও তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সম্প্রতি কিছুকাল হইল রামমোহনকে লইয়া এই সমাজে একটা খুনোখুনি ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। তাহার

কারণ, রামমোহন সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কাহিনী এতকাল নির্ব্বিবাদে প্রচার করা সম্ভব হইয়াছিল—খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিল প্রভৃতির প্রমাণে সে কাহিনীর অনেকখানিই ভাঙিয়া পড়িয়াছে; এবং তৎক্ষণাৎ সাম্প্রদায়িক গৌরবধ্বজা খাড়া করিবার জন্য একদল মনুষ্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

রামমোহন বঙ্গের ও তথা ভারতের—কাহারও কাহারও মতে সারা পৃথিবীর—নবযুগপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি। বর্ত্তমান ভারতের যেখানে যাহা কিছু বোধ-বুদ্ধি-ধ্যান-জ্ঞানের উন্মেষ দেখা যাইতেছে, তাহার জন্মদাতা রামমোহন। বিগত শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সকল মনীষী ও প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই রাম-মোহনের সাগরেদ; রামমোহনের নিকটই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া গুরুপরম্পরায় সেই দীক্ষা—কেহ কেহ, নিজেরও অজ্ঞাতসারে, তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরে গ্রহণ করিয়া—কেহ প্রহ্লাদের মত সাক্ষাৎ ভক্তভাবে, কেহ বা রাবণের মত শত্রুভাবে—তাঁহার ভজনা করিয়া, নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় সর্ব্বসংশয় ছেদ করিলেন, তাহাতেই বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সেই নব-জাগৃতি সম্ভব হইল। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—ইঁহারা যদি কোন দিকে—সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে কিছু করিয়া থাকেন, তবে তাহার যেটুকু মৌলিক তাহাই পৌত্তলিক বলিয়া অতিশয় অহিতকর ও অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে দেশের প্রগতি একশত বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে; আর, যেটুকুতে কিছু জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা রামমোহনের গুরুমারা-শিষ্যের কাজ। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিও নিজেদেরই সাধনা ও শক্তির বলে কিছু

লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর তো সাক্ষাৎ রামমোহনের শিষ্য, তত্ত্ববোধিনীতে নাম লিখাইয়া তিনি ব্রহ্মভজনা করিয়াছিলেন; অক্ষয় দত্ত অথবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—যাঁহারা সেকালে বাঙালীর শিক্ষাসংস্কারে ও জ্ঞানচিন্তার নূতন আদর্শ স্থাপনে, ভিন্ন দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, এবং সেই নব-জাগরণের সহায়তা করিয়াছিলেন—তাঁহারাও, হয় রামমোহনের শিষ্য, নয়—কেহই নহেন; তাঁহাদের তুলনায় নব্য ব্রাহ্মসমাজের যে কোনও পাণ্ডা, বড় না হইলেও, ছোট ছোট পীর বা পয়গম্বর। সে যুগে ব্রাহ্ম-আন্দোলন ছাড়াও যে একটা হিন্দু-জাগরণ ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষ করিয়া দেখা দিয়াছিল—যাহার ফলে রামমোহন-সমেত সকল বালখিল্য ঋষি ও ব্রহ্মর্ষিরা প্রায় বনবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং যে জাগরণের মূলে ছিল রামমোহনী হিন্দুত্ব নয়, সনাতন হিন্দুত্বের গৌরব-বোধ—তাহার নামটি পর্য্যন্ত এক্ষণে করার জো নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরও শেষ পরিণতি এই কালে যাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল—সেই কেশবচন্দ্রও নামমাত্র রামমোহনপন্থী ছিলেন, এবং তিনিও শেষের দিকে তাঁহার ধর্ম্মমতকে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতেছিলেন, তাহাতে অব্রাহ্ম ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল—পরমহংসদেবের প্রভাব তাহাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে যতই মতভেদ থাকুক, সেই মতভেদও একটা প্রমাণ। এই কালেই সাধু বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর পন্থা বরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইতে স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ—নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে যুগ, সে যুগে রামমোহন কেহই ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজ তখন আপনার ঘরে বসিয়া, একটা নিষ্ফল অথচ না-ছোড়-ভাবের প্রতিবাদস্বরূপ কোনরূপে জীবনরক্ষা করিয়াছিল। সে যুগে আমরা

হিন্দুসন্তানেরা রামমোহনের নামমাত্রই জানিতাম, এবং বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিবেকানন্দকেই চিনিতাম। তারপর, রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি যেমন পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সঙ্গে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মন্ত্র, রবীন্দ্র-নাথের অসাধারণ বাণীসৌন্দর্য্যে ও সাক্ষাৎ প্রভাবে, কতকটা আড়াল পড়িয়া গেল, এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া রবীন্দ্রনাথ নব্যযুব-সম্প্রদায়ের আদর্শ ভাববিগ্রহ-রূপ ধারণ করিলেন, তখন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের কপাল ফিরিল। কিন্তু এ কথাও মনে আছে যে, সেদিন কোনও এক সমাজের উপাসনা-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথকে বেদীতে বসিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। তথাপি রামমোহনের মত, রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব সম্পত্তি—রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম, তাই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল; রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই যে নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, তাহার মূলে রামমোহনের সাক্ষাৎ যোগ আছে বলিয়া সারা শিক্ষিত হিন্দু-বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিল। এই স্বদেশী-আন্দোলনের গৌণ ফলস্বরূপ আর একটি ঘটনাও ঘটিল—পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাগীরথীতীরের সংস্কৃতি হইতে এতদিন দূরে থাকিয়া তাহাদের যে একটা সঙ্কোচভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল; এবং ক্রমে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায়, নানা ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়া, সেই সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করিতেও শিখিল। ইহাতেও রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি হইল; কারণ, পূর্ব্ববঙ্গেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা কিছু প্রসার ও প্রচার হইয়াছিল—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই, প্রকাশ্যে না হইলেও, ভিতরে ভিতরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিল। আজ ইঁহারাই প্রবল; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরাতনপন্থী তাঁহাদের যেমন নবদ্বীপই এখনও প্রধান তীর্থ, যাঁহারা নব্যপন্থী তাঁহাদের তীর্থ বোলপুর। আজ কলিকাতাতেও

পূর্ব্ববঙ্গের প্রভাবই বেশি—এবং এমন কোনও পূর্ব্ববঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে না যাঁহার মতে রামমোহন একটি বিরাট মহাপুরুষ নহেন। আমাদের সমাজে সেকালে এমন মত কেহ পোষণ করিতেন না—রামমোহন একটা পুরাতাত্ত্বিক নামমাত্র ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল কাহারও ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু-সমাজে রামমোহনের প্রভাবের ইহাই সত্য ইতিহাস।

* * *

আজ বিংশ শতাব্দীর এই অবস্থান্তরের সুযোগে, রামমোহনকে সারা হিন্দু-সমাজ অর্থাৎ হিন্দু-বাঙালীর জাতীয়-সমাজের নবজাগরণ ও নব্য সংস্কৃতির আদিগুরুরূপে স্থাপনা করিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে—যে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের লোকোত্তর প্রতিভা, অথবা যে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব-মহিমার সঞ্জীবনীস্পর্শে আধুনিক কালে বাঙালী জাতির মধ্যে যা কিছু জীবনস্পন্দন দেখা দিয়াছিল—যাহার তুলনায় রামমোহনের জীবনে কোনও মহত্ব এবং মনীষায় কোনও প্রাণদ-শক্তি ছিল না—তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া রামমোহনকেই বড় করিতে হইবে! রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা পাইয়া যে দুইখানি পত্রিকা বহুবর্ষ ধরিয়া প্রোপাগাণ্ডা করিতেছে—বাংলা দেশের হিন্দুসমাজ যে বিনা প্রতিবাদে তাহা হজম করিতেছে, অথবা সেরূপ হিন্দুত্বকে গোঁড়ামি বলিয়া, সভ্যসমাজভুক্ত হইবার আশায় তাহার পোষকতা করিতেছে—ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বাংলা দেশে আজ হিন্দুর জ্ঞান, শক্তি ও পৌরুষ যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার পরিচয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। এ শ্মশানে শৃগাল ও সারমেয়দেরই জয়জয়কার।

* * *

আমাদের মূল প্রসঙ্গ ছিল রামমোহনের পয়গম্বরত্ব নয়—তিনি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্মদাতা, এই প্রচলিত প্রবাদকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া চালাইবার যে অতিশয় অসাহিত্যিক অনৈতিহাসিক স্পর্দ্ধা সম্প্রতি আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা। এবারে স্থানাভাববশত তাহা মুলতুবি রহিল—এ প্রসঙ্গ আগামী বারে যথোচিত করা যাইবে, এবারে ভূমিকা করিয়া রাখিলাম।

শ্রীপঞ্চমী-সাহিত্য

প্রতি বারে সরস্বতীপূজা-উপলক্ষ্যে আমাদের সরস্বতী-সেবকেরা ভক্তির আবেগে যেরূপ নিমন্ত্রণ-লিপি রচনা করেন, তাহা পাঠ করিলে বাংলার সকল সুধী ও সাহিত্যপ্রেমিক প্রচুর আনন্দ পাইবেন। এই সাময়িক-সাহিত্য বৎসরে একবার করিয়া দেখা দেয়। কিন্তু তাহাতেই আমাদের যুবজানিদের অকপট বাণীসেবার যে মর্ম্মান্তিক পরিচয় ফুটিয়া উঠে, তাহা হইতে, সাম্প্রতিক ও প্রাগতিক সাহিত্যের ব্রজলীলা যে কেমন—যে লীলা গোষ্ঠবিহারে আরম্ভ হইয়া রাসলীলায় শেষ হয়—সে ধারণা কিঞ্চিৎ করা যাইবে; তাই আমরা শ্রীপঞ্চমীর এই চন্দ্রক-মালা হইতে নিম্নে দুইখানি তুলিয়া দিলাম।

(১) সুধি!

আজিকার এ হিংস্র-নগ্ন-ধ্বংস তাণ্ডবের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদের মাঝেও বাণী দেবীর মন্দির-মন্দ্র নিঃশেষ হয়ে যায়নি—এই সর্ব্বনাশা ধ্বংসের মাঝেও শোনা যাচ্ছে নবীন জগৎ সৃষ্টির সুর—সভ্যতা-কৃষ্টি ও কলার প্রতীক্ বীণাপানির আবাহন উৎসব শ্রীপঞ্চমীতে—সবাইকে আহ্বান করছি সেই শুভদিনে আপনাদের সাথে মায়ের পায়ে দু'টু (sic) ফুল দিয়ে যেন বল্‌তে পারি—

এ'সব মূর, (sic) ম্লান, মূক, মুখে দিতে হবে ভাষা।

(২) সবিনয় নিবেদন—

পূজারীর উদ্দেশে গ্যাঁদা,

'বরষের পরে ধরণীর বুকে
এসেছে লগ্ন ফিরে,
বন্দিতে মার চরণ-কমল
এসগো সকলে ছুটে',

পলাশ কহিছে ডাকি—

ওগো পূজারিণী, ফুলের সাজিকা ভরি
এস ত্বরা করি দিতে মার পূজারতি।

তারিখ—
হিম-উত্তরি ঘেরা
মাঘের মৌনউষা,
শিশির সিক্ত শুক্লা পক্ষ
শ্রীপঞ্চমী প্রাতে।

বিনীত—
ছাত্রদল।

প্রথমখানি—শ্রীপঞ্চমী উৎসবে একটি ব্যায়াম-সমিতির 'আবাহন'। তাঁহাদের ভাষায় একটু বীররসই স্বাভাবিক, কাজেই প্রথমে একটু হুঙ্কারধ্বনি বাহির হইয়াছে; কিন্তু ক্রমে সে ধ্বনি রীতিমত কোমল ও গদগদ হইয়া শেষে করুণ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, এই কয়টি ছত্রে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহাদের প্রিয় প্রায় সকল রসগুলিরই সাক্ষাৎ পাইবেন; আর, সরস্বতী নিজে, পালোয়ানদের মুখে এইরূপ গদগদ আধো-আধো ভাষা শুনিয়া, তাঁহাদের হাতের 'দু'টু ফুল' পাইয়া ও 'এ'সব মূর, ম্লান, মূক, মুখ' দেখিয়া বিশেষ বিচলিত না হইয়া পারিবেন না।

* * *

দ্বিতীয় পত্রখানি 'ছাত্রদল'-লিখিত, কোথাকার ছাত্র তাহা লেখা নাই, কোন ঠিকানাও নাই, বোধ হয়, নিখিল-ছাত্রসমাজের পক্ষ

হইতেই লেখা; তারিখও—নিখিল-শ্রীপঞ্চমীতিথি। ইহা ঠিক নিমন্ত্রণ-লিপিও নহে, অথবা, হইতেও পারে—'প্রতীকী' (symbolist) ভঙ্গিতে। তথাপি ইহাতে শ্বেতভুজার প্রতীক কিছুই নাই—আছে গ্যাঁদা ও পলাশের রং। পূজারীর আপন জন হইয়াছেন 'গ্যাঁদা', আর পূজারিণীর জন্য 'অস্থির হইয়াছে 'পলাশ'। এই গ্যাঁদা ও পলাশ, দুই নির্গন্ধ পুষ্প, সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে একটু রঙের খেলা খেলিতে চায়—একজনের সোনা, আর একজনের সিঁদুর। প্রতীক হয়তো ঠিকই হইয়াছে; ইদানীং সরস্বতীকে কাহারও সোনা, কাহারও সিঁদুরের জন্যই প্রয়োজন হয়। এখানেও এই কয়টি ছত্রেই, একাধারে নাটক আছে, গান আছে, গদ্য-কবিতা আছে। তারিখটি খাঁটি গদ্য-কবিতা—ভাষাও একেবারে আধুনিক। যাঁহারা ব্যাকরণ বিনা কাব্যরস উপভোগ করিতে অপারগ, তাঁহাদের জন্য কবি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। "শুক্লাপক্ষ শ্রীপঞ্চমী প্রাতে"—এখানে 'শুক্লা'র পক্ষাঘাত ঘটিলেও, কবি তাহার আকারের ক্ষতি হইতে দেন নাই। ইহাকেই বলে কাব্যিক ব্যাকরণ। আবার, 'গ্যাঁদা'র আ-কার দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মহিলা-জাতীয়, কাজেই তাঁহার টান পূজারীর দিকে। সেই নজিরেই বুঝিতে হইবে, 'পলাশ' মেয়ে নয়—পুরুষ, তিনি ডাকেন পূজারিণীকে। 'সবিনয় নিবেদনে'র মধ্যে যে এত রস লুকাইয়া আছে, তাহা ব্যাকরণ ভিন্ন আর কিসের দ্বারা বোধগম্য হইতে পারিত? কবি বাংলা অভিধানকেও একটি নূতন শব্দ উপহার দিয়াছেন—'সাজিকা'। এ রচনাটি দেখিয়া মনে হইতেছে, বাংলা সাহিত্য এইবার 'সাম্প্রতিক'ও পার হইয়া 'অতি-সাম্প্রতিকে' প্রবেশ করিতেছে।

* * *

আর একটি 'আবাহন'-পত্রে "স্বর্গীয়া ৺বাণীমাতা"র জন্য বড়ই আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা দেশে 'বাণীমাতা' এক্ষণে যে 'স্বর্গীয়া' হইয়াছেন—এ সত্য চাপিয়া রাখা দুষ্কর।

তাসের দেশে

এখানে তাসের দেশে ভালবাসা নহলা ও টেক্কায় ;
বি. সি. আর এ. ডি. ব'সে পাশাপাশি চলে এক এক্কায়।
শ্মশানবিহারী শিবে মুখে ডাকি নিশিদিবে,
কুবেরের ধন দিবে—অবিরাম মনে মনে ভিক্ষা ;
এখানে গোলাম যত সাহেবের পদানত,
দুরি তিরি অবিরত বিবিদের ধ'রে দেয় দীক্ষা।
মাতাল খানায় প'ড়ে হেথা কীর্ত্তন জোড়ে,
ফেরারী আসামী ফেরে সাধু হয়ে ঘুরে এসে মেক্কা।

কাগজের সাদা নভে কল্পনা-পাখা মোরা মেলছি,
ভাগাড়ে ফিরিয়া সাঁঝে দুকুড়ি-সাতের খেলা খেলছি।

ডেমি অ্যান্টিকে যাহা ছাপা হয়, হেথা তাই কাব্য,
ছন্দে ও ভাবে যার ঘটে মিল সে তো অশ্রাব্য !
এখানে তাসের দেশে এল যারা ভালবেসে,
তুরুপের খেলা শেষে কাবারিয়া ইস্তক-বিস্তি
ফিরিয়া গেল না আর, হাজার বছর পার
রংছুট বার বার, তবু থেকে যায় নিশ্চিন্তি।
চার রং তবু যেথা পঞ্চাশ-দুই কেতা,
সে দেশের গুণপনা কত বল লিখব ও ছাপব ?

কাল-সাগরের স্রোতে তাসের তরণী মোরা ঠেলছি।
শ্যাওলায় বাঁধা প'ড়ে দুকুড়ি-সাতের খেলা খেলছি।

কাক-ডাকা

কোকিল নয়, কলকাতায় কাক ডেকে উঠল।
ঘুম ভাঙল।

* * *

প্রায় দেড় মাস বিছানায় শুয়ে আছি, বাতে দেহ অচল। কোন-ক্রমে মুখ হাত ধুয়ে ভদ্রস্থ হয়েছি, এমন সময় খবর এল, মহীতোষবাবু এসেছেন। মহীতোষ আমার গায়ে-পড়া বন্ধু। এই কলকাতায় তার বন্ধুর অভাব নেই, গেজেটের মতই সে খবরবাহী এবং আমার উপর নিতান্ত সদয়। সময়ে অসময়ে আচমকা এসে পড়ে ; তা এক কাপ চা এবং একটি চেয়ার দিয়ে তাকে তুষ্ট করতেই হয়। বয়স অল্প, সাহিত্য ও শিল্পাভিমান প্রচুর, নিজে কিছু করে না। যেহেতু আমি লেখাপড়া করি ও ছবি আঁকি, সেইহেতু আমাকে দেখাশোনার ভার তাকে আপনা হতেই নিতে হয়েছে। তার ধারণা, অনেক প্রতিভা গোপন থেকে যায় বন্যলতার মত ফুল ধ'রেও ; সভ্যতার কাছে তাদের গন্ধটুকু বহন ক'রে নিয়ে আসাই তার কাজ।

চেয়ার ঠিক ক'রে তাকে ডাকতেই হ'ল।

চায়ের সরঞ্জাম এল। মহীতোষ চা খেলে, ব্রাহ্মণী আমাকে চা খাইয়ে গেলেন। বাতরোগে আমি কষ্ট পাচ্ছি, ব্রাহ্মণীর জন্য মহীতোষের সহানুভূতি ও বেদনার অন্ত নেই।

গল্প চলতে লাগল। কে একজন দত্তকুলোদ্ভব, নিষ্ক্রিয় নৈরাত্ম্য নিয়ে সাহিত্যের ক্রিয়াপদটিকেও বর্জ্জন করবার তালে আছেন, এবং কে একজন সেন-জাত সাহিত্য-সেনাপতি তাঁর মত বিশেষ্যটিকে তাল ঠুকে

বেতাল করবার ব্যূহ রচনা করছেন—এই হ'ল তার গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মহীতোষ শতমুখীর মত মুখর ও ভয়াবহ। কণ্ঠ আক্ষেপ ও ক্রোধে ভয়াবহভাবে মুদারা ও তারায় উদ্দৃপ্ত হয়ে উঠেছে এবং আমি তার সাহিত্যের অসামান্য মর্ম্মজ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছি, এমন সময় বারান্দায় একজোড়া জুতো-পরা পায়ের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলুম।

অনেক দিন, প্রায় চার বছর আগেকার-শোনা পায়ের আওয়াজ। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সাধারণ নয়, এ পায়ের জুতো-পরা চলা। আর একজোড়া পায়েও জীবনে এমন রসিয়ে চলা দেখি নি।

পথের মলিনতাকে যেন দূর ক'রে চলেছে; দীর্ঘ দেহের দ্রুত চলা—যেন হেঁটে আসছে ফল আর পাতা নিয়ে রসালদ্রুম।

এ চলায় প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, একজনই চলত অথচ মনে হ'ত—চলেছে দুজন, গন্ধর্ব্বলোকের কোন দুহিতাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, শুনছি যার নূপুরের ধ্বনি অথচ দেখা পাই না তার।"

মহীতোষকে বললুম, ঐ চেয়ারটায় ব'স, আমার গুরুদেব আসছেন।

বলতে বলতেই তিনি এলেন।

দশরথের আঙরাখায় আঁটা কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর বেঁকে গেল তাঁর চোখের তারা, বললেন, "গুরুকে তো আসতেই হয়, তোদের এত কম বয়েস, ঘুণ ধরলে আমরা বাঁচি কি ক'রে?"

ক্লান্ত দেহে ব'সে পড়লেন চেয়ারের ভিতর। বললেন, "এতদিন ধ'রে চলেইছি, চলেইছি, পিছন দিকে ফিরে তাকাই নি, আজ ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছি।"

আমার মুখে কথাই নেই, বোধ করি ছিল আনন্দ,—মেঘের মত কালো তারায় বিদ্যুতের চমক।

মহীতোষের দিকে চেয়ে দেখি, অবাক হয়ে মহীতোষ দেখছে, অথচ চোখের কোণে চাপা রয়েছে তাচ্ছিল্যের ভাব। মহীতোষ দেখলে, একটি জীর্ণ পুরুষ চেয়ারে এসে বসেছেন।

সাদা আর কালোয় সখ্য পাতিয়েছে তাঁর চুলে, নাতিবৃহৎ টাকের দুপাশ দিয়ে চুলের বাহার লাগাম-ছেঁড়া উর্দ্ধমুখ ঘোড়ার মত; অসমান ভ্রূ, প্রকাণ্ড মাথা, মুখের বন্ধুরতা অত্যন্ত প্রকট; হাতে মাথা-বাঁকানো লাঠি, পায়ে চীনে চটি, দীর্ঘ দেহে খদ্দরের পুরু আলখাল্লা, ঠোঁটে হাসির আভাস; মুখের বাম পাশে একটি প্রকাণ্ড তিল।

মহীতোষ দেখলে, গলায় এবং হাতে শিরা জেগেছে, অথচ দেহের পিঙ্গল সমগ্রতায় শিশুর মত একটি স্বচ্ছন্দ নিরভিমানতা।

আমার গায়ে হাত বুলিয়ে গুরুদেব বললেন, "আমি এসেছি, আর তোর ভয় নেই, সেরে উঠতেই হবে তোকে, মুখ ম্লান ক'রে থাকিস নি।"

"আপনার জন্যে একটু কফি আনতে বলি"—এই ব'লে ব্রাহ্মণীকে ডাক দিলুম। ব্রাহ্মণী এলেন, প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ নিয়ে চ'লে গেলেন কফির আয়োজনে।

গুরু শিষ্যে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলুম।

মিলনে স্তম্ভিত হয় বাণী, বিরহে হয় মুখর।

হঠাৎ একটা চেয়ার ন'ড়ে উঠল, দেখি মহীতোষ চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্ষুণ্ণ অভিমানে। অপরাধ স্বীকার ক'রে বললুম, গুরুদেব, এটি আমার বন্ধু মহীতোষ পাঞ্জা, কলাবিৎ। আমাকে প্রকাশ করবার ভার আপনা

হতেই নিয়েছেন। সাহিত্য ও ছবিতে খুব সখ, সমালোচনার দিকেই প্রবৃত্তি। আর মহীতোষ, ইনি আমার গুরুদেব।

মহীতোষ একটু হেসে ঠোঁট বাঁকিয়ে ভ্রমরকৃষ্ণ বাবরিকে ঈষৎ তরঙ্গিত ক'রে আঁখিপ্রান্তে নম্রতা এনে বললে, "গুরুদেব তো বুঝলুম, কিন্তু অতটুকুতেই তো শান্তি নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল আপনি বাগগুহার mask-dancer। ছবি থেকে যেন নেমে এসেছেন। আপনার চলনেও একটা নাচের ভঙ্গি রয়েছে। তা প্রদোষবাবু, আপনি তো আপনার গুরুদেবের চূড়ান্ত পরিচয়—তাঁর নামটি আমাকে বললেন না!"

নামটি জানবার দিকেই মহীতোষের বেশি আগ্রহ।

মহীতোষের কথার ভঙ্গিতে হেসে উঠলুম। "হায়রে, তোমার মুখে এ প্রশ্নও আমাকে শুনতে হ'ল? গুরুদেবের নামোচ্চারণ করবে আমার মত একজন প্রবীণ ভক্ত?"

সনাতন রসিকতার অর্দ্ধপথেই ঘরে প্রবেশ করলে ঝ'ড়ো হাওয়ার মত আমার ব্যস্তবাগীশ ভ্রাতা প্রণবেশ, যেন উদ্দণ্ড। গুরুদেবকে ত্বরিত প্রণাম ক'রেই যেন শত্রুনিবেশে আক্রমণ করার পাঁয়তাড়া কষতে লাগল। ঝড়ের মুখে কুটোর মত কোথায় উড়ে গেল গুরুদেবের-পরিচয়-দেওয়া মহীতোষকে। যেন রঙ্গমঞ্চের পিছনে প'ড়ে গেল মহীতোষ।

কাছেই একটি বেতের মোড়া ছিল। তাতে ব'সে প'ড়ে আবিসিনিয়ার পাহাড় থেকে ইটালির দিকে যেন তোপ দাগল প্রণবেশ। আমি তো তার চঞ্চলতা দেখে অবাক, কথার মাঝে মাঝে পালঙ্কের দণ্ড ধ'রে আবার দাঁড়িয়ে ওঠে। বললে, "এ আপনার বড় অন্যায় হচ্ছে। নিজের হাতে রোপণ ক'রে বিষলতাকেও কেউ কাটে না, আর এ আপনি কি করতে বসেছেন? অমন একটা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যেতে

বসেছে, সে কেবল আপনার জন্যেই। সম্প্রতি কি ঘটেছে, আপনি জানেন? অর্থের দৈন্যে অতদিনকার একজন প্রবীণ প্রফেসার বৈকুণ্ঠ-বাবুকে ওরা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। কে শেখাবে? দেশের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি গ'ড়ে উঠেছে, বিদেশেও পেয়েছে প্রচার, তাকে আপনি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন? এ কি সাংঘাতিক ঔদাস্য?"

আমি লজ্জায় নত হয়ে গেলুম। আমাকে দেখতে এসে আমারই ঘরে ব'সে হিংস্র আক্রমণ?

ব্রাহ্মণীকে হাঁক দিলুম, "কফিটা নিয়ে এস।"

কিন্তু গুরুদেবের মুখে সেই অচঞ্চল হাসি। তিনি বললেন, "তোরা বড় একটুতেই ব্যস্ত হয়ে উঠিস। ওখানে যদি ছবি-আঁকার ব্যাঘাত ঘ'টে থাকে, তা হ'লে ত্যাগ কর না ঐ শিল্প-বাসর। বৈকুণ্ঠবাবুকে বল বাড়িতে টোল খুলতে, সেখানেই তো শিখলে পারিস।"

"হেসে হেসে কি যে বলেন আপনি? আপনি কি বলেন, প্রতিষ্ঠানটি উঠে যাক? ও রকম টোল তো আপনার দুএকজন শিষ্য খুলেছেন। না না, আপনার কথা আমি বুঝতে পারি না। শিকড়ে যদি ঘা পড়ে, তবে ফুল পাতা গজাবে কোন্ গাছে? ওর নাম যদি মুছে যায়, সেটা দেশের একটা নিন্দা, বলব দুর্দ্দিন। একদিন আপনিই বুক ফুলিয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—"

মধ্যপথে বাধা দিয়ে গুরুদেব হেসে বললেন, "আমার ইচ্ছে করছে এই মাথাবাঁকা লাঠি দিয়ে দু ঘা তোর পিঠে বসিয়ে দিই। তোদের কি চোখ খুলবে না—দেখছিস না আমি হাঁপাচ্ছি, আমার হৃৎপিণ্ডকে কাহিল ক'রে দিয়েছে হাঁপানি? কই হে শিষ্য, আমার কফি কই?"

হাঁক পাড়লুম।

ব্রাহ্মণী এলেন; যতবারই আসেন ততবারই ভাল লাগে—নিত্য-

নতুন। এবারে এলেন মুখ একেবারে লাল। কানের পাশে এসে ফিস ফিস ক'রে বললেন, "এত তাড়া কিসের? দুটো কড়াইশুঁটির ডালপুরি ক'রে আনছিলুম।"

গুরুদেবের মুখে চলকে উঠল কথার হাসি। থাক থাক মক্ষিদিদি, একটু না হয় দেরিই হবে। ডালপুরিটা মন্দ নয়। সকালে মেঘ জমছে, গরম গরম সেঁকা ডালপুরি! কি বল প্রণবেশ? কফিটা চাইছিলুম, হাঁপানির পক্ষে বড় উপকারী।"

তারপর মহীতোষবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "সেদিন অন্নদাপুরের মহারাজের ওখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। মোগলের হাতের রাঁধা বিলিতি ভোজ। অপূর্ব্ব রান্না, খাওয়া শেষ হতেই হাঁপানি, তারপর এল ব্ল্যাক কফি। মিশরী কফিতে একটু ফরাসী সাঁক্র দিতেই ফিরে এল বুকের জোর, ওঁরা তো সবাই দেখে অবাক।"

মহীতোষ চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল, টেবিলের উপরে বা নীচে সাঁক্রর বোতল আছে কি না।

গুরুদেব বললেন, "না না, দরকার হবে না, মক্ষিদিদির হাতে গড়া ডালপুরিতেই সাঁক্রর কাজ হবে। যাও মক্ষিদিদি, দেরি ক'র না।"

তারপর হঠাৎ আমার ভ্রাতার দিকে দেহটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "তোমার বাপু, বিয়ে হওয়া উচিত নয়। (লেখা বাহুল্য ভ্রাতার বিবাহ ছিল আসন্ন।) তুমি এখনও আমার-আঁকা ছবি চিনতে শিখলে না, আমার-আঁকা ছবিটা তুমি কিনা কিরণের নাম দিয়ে এক্সিবিশনে 'লোন' পাঠিয়েছ? তোমার বাপকে ব'লে বিয়েটা বন্ধ না করলে আমার শান্তি নেই।"

এবারে মহীতোষ না হেসে পারলে না। বললে, "যাই বলুন, আপনার

লাঠি আর আঙুলগুলোর মতই আপনার কথাগুলো বড় বাঁকা বাঁকা। ছবিতে ভুল নাম দেওয়ার সঙ্গে বিবাহের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?"

উত্তরে হেসে বললেন গুরুদেব, "যে লোক ছবি চিনতে শিখলে না, সে লোক বউ চিনবে কেমন ক'রে? নবমালতীর লতায় ভুলেও কি কখনও নাগকেশর ফোটে?"

তারপরে প্রণবেশকে বললেন, "তুমি শিল্প-বাসরে কতদিন শিখছ?"

"প্রায় চার বছর।"

"কি শিখলে?"

"শিখলুম আর কি? রং চিনতে শিখেছি, wash দিতে, Stippling।"

গুরুদেব যেন শিউরে উঠলেন বিস্ময়ে, বললেন, "রং চিনেছ?"

"বৈকুণ্ঠবাবু তো আমার দেওয়া রং কেবলই বদল করেন।"

"বাস্, তবে আর কি, বৈকুণ্ঠবাবুকে বদল করার তা হ'লে নিতান্ত প্রয়োজন দেখছি। উনি তা হ'লে তোমাদের শেখাতে চান না, এক একটি বৈকুণ্ঠ ক'রে তুলতে চান?"

"আপনার ঐ এক কথা। আমরা যা শিখেছি, সবই তো ঐ বৈকুণ্ঠবাবুর কৃপায়। আমাদের বাসরের রাধাকৃষ্ণের ছবি বিখ্যাত। ও রকম রেখার ভঙ্গি, বর্ণের সাযুজ্য, কোন স্কুলের কোনও ছাত্রের হাত থেকে বেরিয়েছে?"

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গুরুদেব বললেন, "ওহে শিষ্য, তোমার ভাইটিকে বাসর থেকে ছাড়িয়ে নাও। কটা টাকা বাঁচবে। আমি ব'লে দিচ্ছি, ওর আর কিছু হবে না।"

অপ্রতিভ হয়ে গেল প্রণবেশের মুখ।

এমন সময় বাইরের আকাশে হঠাৎ বেজে উঠল মেঘের মৃদঙ্গ। ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। আলো জেলে ঘরে ঢুকলেন মক্ষিরাণী, হাতে দুটি থালা, কফি আর সেঁকা ডালপুরি।

গুরুদেবের রসিকতায় মক্ষিরাণীর ঠোঁট বেঁকে গেল মৃদুহাস্যে।

গুরুদেব তখন বলছেন, "কি বল হে শিষ্য, এঁরা যেখানে যান, আলো জেলে দিয়ে যান, তারপরে আলো জলতে থাকে আর এঁরা আলোর নীচে গাঢ়তম অন্ধকারে যান মিলিয়ে। ধারাই এম্নি সংসারের। বলিষ্ঠের দর্পিত বিক্রমের ফল।"

বললুম, "আমি কিন্তু নিজেকে বড় দুর্ব্বল মেনেই বাঁচিয়ে চলি; ওঁর ডানায় কিছুতেই আঁচ লাগতে দিই না, পাছে উড়ে যায় বা পুড়ে যায় তাই ভয়।"

পালঙ্কের তলদেশে ব'সে ছিলেন ব্রাহ্মণী। তাঁর ঘোমটা লজ্জায় একটু নেমে এল; এক হাতের আঙুল জড়িয়ে ধরল আর এক হাতের আঙুলকে। দক্ষিণা পেলুম, শব্দহীন নায়নিক ভর্ৎসনা—অতি মধুর। কফিতে চুমুক দিয়ে ডালপুরির একটি কোণকে বিবরসাৎ করার অবকাশেই বৃষ্টি থেমে গেল। ছিন্নমেঘের রন্ধ্রপথে দুই খণ্ড আর্দ্র রৌদ্র ক্রৌঞ্চমিথুনের মত বসল এসে গুরুজীর কাঁধে এবং চিবুকের প্রান্তে। সিঁদুরছোঁয়া সোনালী রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। রঙের লীলা দেখছি তাঁর মুখশ্রীতে, এমন সময় গুরুদেব ব'লে উঠলেন, "আমাদের প্রণবেশের অভিমান ঐ এক পশলা বৃষ্টির মত। ঐ দেখ কেটে গেল।"

প্রণবেশ।—"আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই দায়। সব কথাই হেসে উড়িয়ে দেন, গায়ে মাখতেই চান না। আমি নিয়ে এলুম মাস্টার্ড গ্যাস আর আপনি ছাড়লেন হাসির বোমা।"

গুরুদেব।—"দেখ হে বাপু, তোমাকে একটা কথা বলি, ভাঙতে

যদি চাও, তা হ'লে বোমা ছোঁড়। গড়তে যদি চাও, তা হ'লে বোমা ভোলো। সাধনায় ঝগড়া নেই, নেই সেখানে আক্রমণের আড়ম্বর।" তারপরে আবার হাসি। হেসে বললেন, "তোমার মত বয়েস যখন আমার ছিল, তখন বড় বড় তিন-ফুটে তুলি নিয়ে আমি সবাইকে আক্রমণ করতুম। এটা তোমরা মানবে, ইটালির মত পৃথিবী জয়ের আশা নিয়ে অন্ততঃ আমি আবিসিনিয়াটুকু জয় করতে পেরেছিলুম। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালের আলোর দিকে চেয়ে আমার চোখের দেখা কেমন যেন বদলে গেল। ভেঙে ফেললুম তিন-ফুটে রুল, খ'সে গেল অহঙ্কার, গায়ের সমস্ত জোর নিয়ে যেন থুবড়ি খেয়ে মাটিতে ব'সে পড়লুম। আমার চোখ থেকে কালো রঙের পর্দ্দাটা গেল খ'সে। চোখে দেখলুম, সবই আলো, গাছের রংটা আলোর রং, মাটির রং আলোর রং, আমার চামড়ার রংটা আলোর রং। ওর মধ্যে তো ছায়ার রং নেই। ছেড়ে দিলুম জগজ্জয়ের আশা, জয় করতে লেগে গেলুম ছায়াকে। শেষে দেখি ছায়াকে আঁকতে গেলেও আলোর রং দিয়ে আঁকতে হয়। লোকে বললে, পাগল। কি করব, নিজেকেই নিজের পাগল ব'লে মনে হতে লাগল, ভয়ানক হাসি পেত। যে হাসিকে তুই নিন্দে করছিস, দেখছিস তো সে হাসিকে প্রণবেশ, আজও ছাড়তে পারি নি।" ব'লেই গুরুদেব হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠলেন।

এ হাসি ছোট্ট ছেলের মুখের যেন অকারণ কলকলধ্বনি,

এ হাসি পশুপতির দক্ষিণ মুখের যেন প্রলয়-ভোলা অট্টরোল

এ হাসি যেন পদ্মরাগমণির খনিতে হীরের স্বপ্ন।

প্রণবেশের গায়ের রং হেমন্তের হেমধান্যের মত। রংটিকে দেখিয়ে দিয়ে সে বিষণ্ণকণ্ঠে বললে, "এইখানেই তো যত ঝগড়া। এক দল বলে, ছায়ার পায়ে মাথা খোঁড়, তবে চিনতে পারবে আলোকে; সেটা আলো-ছায়ার

স্থূল। আর একদল বলছে ছায়াও কিছু নয়, আলোও কিছু নয়, একমাত্র রয়েছে রেখা, ভেদ-রেখা, চিনিয়ে-দেবার রেখা। সেদিন এক্‌সিবিশনে গিয়ে দেখি হাজার রকম পদ্ধতিতে (technique) হাজার রকম ছবি। আমাদের মনে কাজে কাজেই সন্দেহ জাগে, রেখা না আলো, না ছায়া! একে তো শিল্প-বাসরের এই বিভ্রাট চলেছে, তার উপর রয়েছে বিদেশী আন্দোলনের আক্রমণ, সবার উপরে এই টেক্‌নিক-বিভ্রাট। ছেলেরা তো বিব্রত হয়ে উঠেছে, তাদের ধান্দা কোন্ টেক্‌নিকে ছবি আঁকলে এক্‌সিবিশনে খ্যাতি, সঙ্গে সঙ্গে পারিতোষিক পাওয়া যায়।"

কৌচের গহ্বর থেকে মহীতোষের কণ্ঠ শোনা গেল। "সেদিন মৈত্র মহাশয়কে এই প্রশ্নই করেছিলুম। তিনি বলেন, রেখাই ভাল, বিলিতি রং যত কম কেনা যায় ততই ভাল। রেখায় রং লাগে কম। তিনি বলেন ,আর্ট তো দু রকমের—Decorative আর Expressionist। চিত্র বলতে Decorativeই বেশি বোঝায়, আর Expressionএর জন্যে গান রয়েছে, সাহিত্য রয়েছে, দর্শন রয়েছে, বিজ্ঞান রয়েছে; ও রেখাই ভাল। মশায়, এই টেক্‌নিকেই খেয়েছে। ভারতবর্ষের আঠারোটা চলতি ভাষার মধ্যে কোন্‌টি যে মুকুট পাবে এটাও যেমন সমস্যা, ছবিতে কোন টেক্‌নিক গদি পাবে সেটাও তেমি সমস্যা। এর কি যে গতি হবে ভেবেই পাই না।"

ব'লেই কাকপুচ্ছচিক্কণ বাবরির মধ্যে আঙুলগুলি চালিয়ে দিয়ে কৌচের গহ্বরে কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল মহীতোষ—ভাবনায় বিহ্বল।

গুরুদেবের দিকে চেয়ে দেখি, তিনি অটল হয়ে ব'সে রয়েছেন। কোলের উপর অকম্পিত প'ড়ে রয়েছে বঙ্কশীর্ষ যষ্টি, কেবল তাঁর আঙুলগুলি মুখের মধ্যে কড়াইশুঁটির ডালপুরির অবশেষটুকু তুলে দিতেই ব্যস্ত।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ থমথমে ভাব, ঘড়িতে টকটকে একঘেয়ে আওয়াজ। চেয়ারগুলোতেও কুঁচকাঁচ শব্দ নেই।

পেয়ালার কফিটুকু শেষ ক'রে যেই টেবিলের উপর রেখেছেন, অমনই, কৌচের গহ্বর থেকে শব্দ উঠল, "এবার তো হাঁপানির শান্তি হ'ল! গুরুদেবের মুখে তা হ'লে দু একটা তত্ত্বকথা শোনা যাক।"

"ওহে শিষ্য, তোমার বন্ধুটি তো বড় রসিক লোক।"—ব'লেই গুরুদেব হেসে উঠলেন।

কিন্তু গুরুদেবের দেহের সমগ্রতায় আমি এতক্ষণ ধ'রে নীরবে লক্ষ্য করছিলুম একটি ধীর রূপান্তর। অনেক দিন এমন দেখেছি। সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারি নি। লক্ষ্মীগ্রামের সেই কুঁড়েটির বারান্দায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, অপেক্ষা করছি প্রতুলের, মাঠের ওপারে বাঁশের ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম থেকে প্রতুল এলেই হয়। বিলম্ব হচ্ছে মধ্যাহ্ন-ভোজনের, এমন সময় হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে আসে কালবোশেখীর ঝড়। গুরুদেব আমাকে তাঁর দীর্ঘ বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলেন, "চুপ ক'রে থাক। কথা ক'স নি। নাচ শিখছে। আমার সোনার মেয়েকে নাচ শেখাতে এসেছে আকাশের ময়ূর। লুকিয়ে দেখে নে ওর রং, ওর বিচিত্রমণি রং, লুকিয়ে শিখে নে ওর তাল, এ ছন্দ আর পাবি নি।"

সেদিনের মতই আজও আমি নীরবে লক্ষ্য করছিলুম, ধীর রূপান্তর গুরুদেবের সমগ্রতায়।

বাঁদরের আলখাল্লার উপর পড়েছিল কফির এক খয়েরী বিন্দু।

ব্রাহ্মণী একটি ভিজে তোয়ালে দিয়ে সেটিকে মুছে দিতে লাগল।

গুরুদেব তার মাথায় চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "মক্ষিদিদি, তোমার টেক্‌নিক আজও বুঝলুম না। তুমি ভাল, কি তোমার চেয়ে

আমাদের কলিন্‌স্কি সাহেবের মেয়ের টেক্‌নিক ভাল, এ আমি কেমন ক'রে বলব! আমি বলি, ও সবই ভাল। আমার এই বুড়ো শিরায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত রক্ত নেচে উঠলেই হ'ল।"

তারপরে প্রণবেশকে বললেন, "খাটের ডাটি ধ'রে অমন ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠিস নি। স্থির হয়ে ব'স্। তোর সঙ্গে দুটো কথা কই।"

বললেন, "আমি যে জিনিসটা আজ তোদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছি, সেটা আমাকে পেতে হয়েছিল বহু সাধনা ক'রে। আগে বড় চঞ্চল ছিলুম। মাঠে, ঘাটে, হাটে খুঁজে বেড়াতুম, বেহারা রঙের বাক্স ব'য়ে পিছনে পিছনে ছুটত। টাকা দিয়ে ধ'রে এনে মডেল তৈরি করতুম, শাড়ি পরাতুম, কারও মাথায় সিঁথি, মুকুট—তারা হাই তুলত, ধমক দিয়ে তাদের মুখে হাসি আনতুম। তারপরে একদিন এল, যেদিন আমার মনে হ'ল, এমন ক'রে পাব না, পাওয়া যায় না। টেক্‌নিকের বিভ্রাটে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

"আমি বলছি প্রণবেশ, টেক্‌নিক ব'লে কিছু নেই। রয়েছে সাধনা, রয়েছে ভালবাসা। এক রকম ক'রে কি ভালবাসা যায় বউকে, হাজার রকম ক'রে ভালবেসেও আবার নতুন রকম ক'রে ভালবাসার খোঁজ চলে। ছিটিয়ে দাও জল, রূপের বিন্দুর লক্ষ লক্ষ খেলা দেখিয়ে সেই জলেই এসে শেষ হয়ে যায় জল। টেক্‌নিকের কথা ভুলে যা। যাদের খোরাক জোটে না, তারাই টেক্‌নিকের পাতালে বাসুকীর নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে।"

তারপরে হঠাৎ প্রণবেশের হাতটা তাঁর বিরাট মুঠোর মধ্যে ধ'রে বললেন, "তিনখানা পাতা পড়তে শেখ। বাস্, ঐ তিনখানা পাতা।"

মহীতোষ কৌচের ভিতর থেকে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল। এ কি ধর্মারণ্যে প্রবিশতি গজঃ!

কিন্তু বিচলিত ভাব দেখলুম না গুরুদেবের। তিনি প্রণবেশের হাতটাকে মুঠোর মধ্যে ধ'রে বললেন, "ঐ তিনখানা পাতা পড়তে শেখ।"—ব'লেই চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে প্রণবেশকে সঙ্গে নিয়ে জানলার ধারে চ'লে গেলেন।

শুনতে পেলুম গুরুদেব বলছেন, "ঐ আকাশ, ঐ জল, এই মাটি।"

ধীরে ধীরে জুতোর সেই অদ্ভুত ধ্বনি তুলতে তুলতে গুরুদেব এসে চেয়ারে ব'সে পড়লেন, মোড়াতে ব'সে পড়ল প্রণবেশ। তার মুখে দেখতে পেলুম না আর সেই হিংস্র আক্রমণের ভাব।

ঘরের মৌনতাকে চকিত ক'রে দিয়ে হঠাৎ জেগে উঠল এক তাচ্ছিল্যের ভাষা—"বেদান্ত পড়া কি সাঙ্গ হ'ল প্রণবেশের?"

মহীতোষের দিকে গুরুদেব একবার ফিরে চাইলেন, হেসে উঠে বললেন, "মহীতোষবাবু আপনার রসবোধ রয়েছে, একদিন আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নেবেন।"

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ওহে শিষ্য, তোকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি। ভেবেছিলুম হবে না, এখন দেখছি নাতির আমার রসবোধ হয়েছে। ছোটবেলায় তাকে একবার বড়দিনের সময় একটা টুপি কিনে পাঠিয়েছিলুম। এবার সে বিলেত গিয়ে পাল্টা জবাব মেরেছে, বড়দিনে এই টুপিটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দেখ।"—ব'লে আলখাল্লার দীর্ঘ পকেট থেকে একটি ছোট্ট টুপি বার করলেন, সাদা টুপি, সরু লাল পাড়, অনেকটা উল্টোনো চায়ের পিরিচের মত।

ব্রাহ্মণী টুপিটা হাতে নিয়ে বললেন, "মুকুলের কি সবই অনাসৃষ্টি !"

গুরুদেব বললেন, "কি আবার লিখেছে জান ? লিখেছে, 'সেবার বড়দিনের সময় একটা কেনা টুপি দিয়ে আমাকে ঠকিয়েছিলে, আমি তোমাকে ঠকালুম না, হাতে বোনা এই টুপিটা পাঠিয়ে দিলুম। যখন রোদ লাগবে বা রাত্রে বেড়াতে বেরুবে, তখন তোমার সুন্দর টাকটিকে ঢেকে বেরিও, দিদিমাকে জানিও না।' "—ব'লেই টুপিটি টাকে প'রে ফেললেন। মহীতোষের দিকে ফিরে চাইলেন, বললেন, "কি হাস্যকর দেখায় দেখুন। অথচ সাদা কাগজের উপর শুধু একটা লাল রঙের রেখা টানলেই টুপির ছবি হয়ে যায়। রং কম লাগবে, রাজনীতির গুরুরা ছবি দেখে তারিফ ক'রে ব'লে উঠবেন, ঠিক হয়, ঠিক হয়, রং কম্‌তি লাগা হয়।"

"দেখ প্রণবেশ, আর কিছু ভাববে না, মনে রেখো বরাবর, এটা গন্ধর্ব্বলোকের বিদ্যা, মর্ত্ত্যলোকের নয়, ভুলে যাবে স্বদেশী, কি বিদেশী। এটা তোমার একান্ত আপনার। এর ভাষা আলাদা, এর সুর আলাদা। বছরের পর বছর কেটে গেছে, দিনের মধ্যে চার ঘণ্টা ক'রে ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতুম না, বাবা একদিন রেগে ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেছিলেন।"

তারপরে হঠাৎ গুরুদেব যেন বদলে গেলেন।

হাসির ঝঙ্কার গেল মিলিয়ে, শ্লেষঘন বাক্যের জ্যানির্ঘোষ হ'ল সংহত। তার বদলে কণ্ঠে এল অনুরাগের কাকলী, নয়নে এল একটা ছলছল ভাব; বাইরের আকাশের পটভূমিকায় জানালার ফ্রেমে-আঁটা গুরুদেবের ছবিকে দেখতে হ'ল অদ্ভুত, দেখতে হ'ল ভয়ঙ্কর, দেখতে হ'ল অনুপম। বললেন,

"আমরা গন্ধর্ব্বলোকের মানুষ। পৃথিবীতে এসে অপমান সহ্য করেছি, অহঙ্কারকে চিনেছি, পরেছি অলঙ্কার। কিন্তু মিল খুঁজে পাই

নে। এখানে এসে দেখছি, সুন্দর কিছু দেখলেই এরা ভাঙতে চায়, টুকরো টুকরো ক'রে দেখতে চায়।

"হিমালয়ে এক ঋষির আশ্রম ছিল, একলা ব'সে সেখানে তিনি ধ্যান-ধারণা করতেন, হিমালয়ের পরিবেশের সঙ্গে ঋষির সমাধির কেমন একটা সুন্দর মিল দেখেছিলুম। এবারে সেখানে গিয়ে দেখি, কতকগুলি ছেলে আর মেয়ে গ্রামোফোনে জ্যাজ্ রেকর্ড বাজিয়ে, কোমর ধরাধরি ক'রে সাহেবদের অনুকরণে নৃত্যরস অনুভব করছেন, পাশে প'ড়ে রয়েছে কয়েকটা গেলাস। দেখলুম, ঋষির অন্তর্দ্ধান; দেখলুম, হিমাচলের ভ্রূকুটি।

"ওহে শিষ্য, আমার জীবনের একটা দিনের কথা তোকে আজ বলি। এ কি বিষম সমস্যা দাঁড়িয়েছে বল তো, যারা দেখতে পেল, লোকে তাদের বললে দেখতে পায় নি; যারা পেল না, তারা 'পেয়েছি' ব'লে কাগজে কাগজে চীৎকার ক'রে বেড়ায়। কি পেয়েছে এরা—Proton, Protozone ? এ কি পাওয়ার সভ্যতা ? এ তো ধ্বংসের সভ্যতা।

"অনেক দিন আগে, তখন আমার এই সৌন্দর্য্যের উপরেও আর একটি সৌন্দর্য্য ছিল, কার্ত্তিকের মত গোপুচ্ছ গোঁফ। আমরা রোজ সকালে একটা দল পাকিয়ে ষ্টীমারে বেড়াতে যেতুম, ভোরের ষ্টীমার। লোক খুব কম থাকত। সামনের ডেকের সমস্তটাই আমরা জুড়ে ব'সে থাকতুম। দলটি ছিল ভারী, দশ বারো জন হবে। হাসি হ'ত, গল্প হ'ত, ভৈরবী জৌনপুরী পটমঞ্জরীর দেখা মিলত। সোমেশ্বর ছিল আমাদের দলপতি। ষ্টীমার চলত। ক্রমে মিলিয়ে যেত কলের চীৎকার, শহরের গেরিমাটি রং, টিনের চোখ-ঝলসানো চালা। আসত সবুজ, আসত নীল, আসত সর্ষেফুলের ক্ষেত, টোকা মাথায় চাষীদের—আমার এই লাঠিটারই

মত—কালো বাঁকা দেহ। ক্রমে নদী চওড়া হ'ত, তীরের রেখাটি হ'ত ক্ষীণ। ভারী ভাল লাগত, মথুরদাস সুরবাহারে আলাপ জমাত, বেণু বাজাত গজেন বক্সী। কত রকমের ডিস্কাশান হ'ত, তার ঠিকানা নেই। দুটো ঘণ্টা উড়ে চ'লে যেত ডানা মেলে। মুখে এসে লাগত ভিজে হাওয়া, কে যেন মাখিয়ে দিয়ে যেত চন্দনের রস।

"সেদিন শীতের সকাল। মোটা মোটা কোট, আলখাল্লা, কম্ফর্টার জড়িয়ে ঘাটে এসে জমেছি। হালকা কুয়াশায় আবছায়া নদী। ষ্টীমার ছাড়ল। খানিকদূর গিয়ে হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল, আমাদের যোগীন্দর তার প্রকাণ্ড অলেষ্টারের পকেট থেকে লাল খেরোর মলাট দেওয়া ছোট্ট একখানি বই বার ক'রে চশমা এঁটে চোখের সামনে ধরলে। আমাদের দলের একটা নিয়ম ছিল, ষ্টীমারে বই কেউ নিতে পারবে না। যোগীন্দর পড়ায় মন দিয়েছে, নীচের পুরু ঠোঁটটাকে চেপে ধরেছে উপরের পাতলা ঠোঁট, গোটানো হাঁটু প্রায় মাথায় এসে ঠেকেছে, এমন সময় সোমেশ্বর তার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়াল। বললে, ভায়া, ও কুকীর্ত্তি তো চলবে না। হামড়ে উঠল যোগীন্দর, বললে, ধর্ম্মকর্ম্ম করব না? ফাজলামো শোনার চেয়ে গীতা পড়ায় কাজ বেশি হয়।

"সোমেশ্বর আমাদের দিকে একবার চাইলে, তারপরে বললে, ভায়া, বইখানা দিতে হ'ল। শুনছ, যোগীন্দর আমাদের গীতা পড়ছেন, ঘরে প'ড়ে এলেই তো হয়।

"গলায় জোর এনে যোগীন্দর বললে, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি, এ কুয়াশায় করব কি? যা করছ কর, গীতা ছাড়ব না।

"মুহূর্ত্ত পরেই দেখতে পেলুম, রেলিঙ ডিঙিয়ে পাতা ফরফর করতে করতে একটা ছোট্ট আওয়াজ ক'রে জলের মধ্যে ডুবে গেল যোগীন্দরের গীতা।

"যেমন চলছিল হাসিতামাসা, তেমনই চলতে লাগল গান, বাজনা, ষ্টীমার। কেবল ম্লান হয়ে রেলিঙের ধারে ব'সে রইল যোগীন্দর।

"আমি সেদিন এক অপূর্ব্ব গীতা পড়েছিলুম, শিষ্য। আমার চোখের সামনে কে যেন খুলে ধরলে একখানা গীতা, দুখানা পাতা যার আকাশ আর জল, মাঝখান দিয়ে সেলাই চলেছে পৃথিবীর ক্ষীণ রহস্যময় রেখা।"

গুরুদেব স্তব্ধ হলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলুম সকলে।

গৃহিণী পানের কৌটো খুলে ধ'রে দিলেন গুরুজীর সামনে।

মহীতোষ কৌচ থেকে উঠে ঘরে একবার পায়চারি ক'রে নিয়ে আলমারির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লুটন্ত চাদরটিকে কাঁধের উপর রাখল, তারপর চোখে জ্যোতিঃ এনে ভ্রূটিকে বাঁকিয়ে পালিশ করতে লাগল বাবরি; উদাসীনের মত দেখতে লাগল নিজের মুখ।

কথা কইল প্রণবেশ, "বুঝলুম তো সব। কিন্তু শিল্প-বাসরকে ভাসিয়ে দেওয়া আপনার চলবে না। আপনি না এসে দাঁড়ালে চলবে না।"

এবার অধীর হয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন গুরুদেব, "চলবে না, চলবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সাধের মেয়েটাকে তুলে দিয়েছিলুম তোদের হাতে। বেছে বেছে ভাল জামাই করেছিলুম। দেউলে হয়ে আজ পৃথিবীর মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কাঁদছে আমার মেয়ে। তোরা কি ভাবিস, ছিঁড়ে যাচ্ছে না আমার হৃদয়? কিন্তু আমার মেয়ে, সে তো সাধারণ মেয়ে নয়। সে কেন আসবে? তার গর্ব্ব নেই, তার সম্মান নেই? ওদের বল্, না পারে, তাকে মেরে ফেলতে; হিমাচল থেকে ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত তার শবদেহটাকে কাঁধে ক'রে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াতে। ও সতীর একটা নখও যেখানে পড়বে, সেখানে গ'ড়ে উঠবে মন্দির।"

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠলেন।

দীর্ঘ আলখাল্লা নিয়ে লাঠিটা ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে গেল। শিষ্য, আজ আসি। মক্ষিদিদি, তোর সেঁকা ডালপুরিটা আবার আর একদিন এসে খেতে হবে।"

প্রণাম ক'রে প্রণবেশ সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে কিন্তু আপনাকে শেখাতে হবে।"

"তোরা যা চাস, আমার কাছে যে তা নেই।"

"আপনি যা দেবেন, তাই আমি কুড়িয়ে নেব।"

"আমি দিয়েছিলুম আমার হিরণ্যবর্ণা কন্যা, তোরা তাকে খয়েরী রং ক'রে যাদুঘরে রেখে দেবার বন্দোবস্ত করেছিস।"—এই ব'লেই গুরুদেব আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, "লাঠি ধর, লাঠি ধর। অমন ক'রে প'ড়ে থাকলে এখন চলবে না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।"

বারান্দায় জুতো-পরা পায়ের সেই অদ্ভুত ধ্বনি; একজনই চলেছে অথচ মনে হ'ল, যেন চলেছে দুজনে। গন্ধর্ব্বলোকের কোন দুহিতাকে যেন সঙ্গে নিয়ে চলেছে, শুনেছি যার নূপুরধ্বনি অথচ দেখা পাই না তার।

চেয়ারে ব'সে প'ড়ে মহীতোষ হাঁপ ছাড়লে।

বললে, "প্রদোষদা, এ রত্নটিকে পেলে কোথায়? যাদুঘরেই সাজিয়ে রাখার জিনিস। যেমন চেহারা, তেমন চলন, তেমি পোষাকের বাহার। একখানা চীনে হরপের ছবি, আঁকলেই হয়। একেবারে আস্ত পাগল। আজ সকালটাই মাটি ক'রে দিলে বারা! কেবল আকাশ আর মাটি, পাতা আর জল। বলি, ওঁর নামটি জানতে পারি কি?"

প্রণবেশ বললে, "উনি হিমাচল।"

বললুম, "উনি আমার গুরুদেব, শ্রী—।"

"অ্যাঁ, বল কি, আর্টিস্ট? আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব!"

দাঁড়াবার সময় পেল না মহীতোষ। হঠাৎ দরজার কাছে দেখতে পেলুম ফিঙে পাখীর মত কালো একগোছা চুল উড়ে চ'লে গেল।

কোকিল নয়, কলকাতায় কাক ডাকে।

ঘুম ভেঙে যায়।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

আলোচনা

অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে "বাঙালীর প্রতিষ্ঠান" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু লিখিয়াছেন—"হয়তো আমার মত অপরেও শিক্ষিত বাঙালীর অসামাজিকতা দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে ইহার মূল কারণ এবং তাহা নিরাকরণের উপায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেকের মনেই যদি নূতনতর সমাজ গঠনের বাসনা সঞ্জাত হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর জীবনে যে তাহার সুফল ফলিবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের কারণ নাই।" নির্ম্মলবাবুর ন্যায় আমিও শিক্ষিত বাঙালীর অসামাজিকতা দেখিয়া মর্ম্মপীড়া বোধ করিয়া থাকি এবং ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান ও তাহা নিরাকরণের উপায় সম্বন্ধে অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি। 'শনিবারের চিঠি'তে এই প্রসঙ্গের অবতারণ করিয়া শিক্ষিত বাঙালীকে তাহার অসামাজিকতা সম্পর্কে সচেতন করিতে উদ্যোগী হওয়াতে, বিশেষত এই সম্পর্কে আমাকে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্ম্মলবাবুকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সভায় বাঙালীর অসামাজিক আচরণ, শহরে, পথে, ট্রামে, বাসে পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিদারুণ অবহেলার ভাব, সমিতির মধ্যে দায়িত্ববোধের একান্ত অভাব, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকমের ঔদাসীন্য—এই সকলের জন্য শিক্ষিত বাঙালীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপ্রীতিকেই নির্ম্মলবাবু প্রকারান্তরে দায়ী করিয়াছেন। এক দিক দিয়া বিচার করিলে, তিনি যে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত বাঙালীর অসামাজিক ব্যবহার কি তাহার উচ্ছৃঙ্খল মনের পরিচয় নয়? শিক্ষিত বাঙালী যে ক্রমশ অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে, নির্ম্মলবাবু হয়তো সৌজন্যের খাতিরে সে কথা বলিতে ইচ্ছুক নহেন। শুধু সভা-সমিতি কেন, নিজ পরিবারের ভিতরেও শিক্ষিত বাঙালী যে রকম অসামাজিক ব্যবহার করিয়া থাকে, সে রকম ব্যবহার অবাঙালী পরিবারে, এমন কি অশিক্ষিত বাঙালী পরিবারেও সচরাচর দেখা যায় না। কাজ শেষ হইয়া গেলে যেখানকার জিনিস সেখানে রাখিলে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই সুবিধা হইবার কথা; কাহাকেও সেই জিনিসটি খুঁজিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে হয় না। অথচ খুব কম বাঙালী-বাড়ি আছে, যে বাড়ির ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের জিনিস গুছাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত, বাড়ির সাধারণ ব্যবহার্য্য জিনিস ঠিক জায়গায় রাখা তো দূরের কথা। ফলে প্রায় বাঙালী-বাড়িতে একটা না একটা হট্টগোল লাগিয়াই থাকে। যাহারা নিজ পরিবারের লোকের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এরূপ উদাসীন, তাহারা যে সাধারণত সভা-সমিতি, শহরের পথে, ট্রামে অথবা বাসে পরের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে সচেতন থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না।

স্ব-ইচ্ছায় নিয়মানুবর্ত্তী হওয়া কেন জানি এখনও আমাদের ধাতস্থ হয় নাই। নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে ব্যক্তিগত জীবনেও যে বহু বিষয়ে আমাদের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে, লেখাপড়া শিখিয়াও এ বোধ আমাদের এখনও সবিশেষ জাগ্রত হয় নাই। অপরের প্রবর্ত্তিত নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি না হয় ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং নিজ জীবনযাত্রার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিলেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। অথচ আমরা সাধারণত কি ইহাই দেখিতে পাই না যে, আমরা যেরূপ সঙ্কল্প করি প্রায়শই তাহার বিপরীত কাজ করিয়া থাকি? এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্যকে যদি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি আখ্যা দিতে হয়, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা আর কাহাকে বলে? স্বীয় কার্য্যাবলীর উপর শিক্ষিত বাঙালীর নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রভাব কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমাদের জীবন-ধর্ম্ম নহে। অথচ ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি আমাদিগকে প্রায়ই বিচলিত করিয়া থাকে। ইহাই শিক্ষিত বাঙালীর সমস্যা।

ব্যষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সমষ্টির সহজ মিলন মানব-সমাজের আদর্শ। যাহাতে একাধারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত এবং সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানুষ সেই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছে, যদিও সে চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই; কেন না, কখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এমনই আকার ধারণ করিয়াছে, যাহাতে সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে; আবার কখনও বা এমন হইয়াছে যে, সমাজের প্রচণ্ড শক্তির নিকট স্বীয় সত্তাকে বলি দিয়া ব্যক্তি দাসে পরিণত হইয়াছে, অদ্যাবধি মানব-ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য দিয়া থাকে—তথাপি মানুষ এই আদর্শ অনুসরণ করিতে কদাপি বিরত হয় নাই। সাময়িক উত্তেজনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপ্রীতিতে বিভ্রান্ত হইয়া কখনও হয়তো সে এমনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে; আবার উত্তেজনার অবসানে এমনই শান্ত ও শিষ্ট হইয়াছে যে, সমাজের সর্ব্বপ্রকার অন্যায় উপদ্রব নীরবে সহ্য করিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই ব্যষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সমষ্টির সহজ মিলন ক্রমশ সম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ইহাই সমাজ-প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যখন স্বাভাবিক উত্তেজনা অথবা অবসাদের সুযোগ লইয়া কোন সুকৌশলী ব্যক্তি নিজ কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই সমাজ-প্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতি বিকৃত হইয়া এমন একটা মারাত্মক আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহাতে ব্যষ্টি ও সমাজ এককালীন ধ্বংস হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে সেই রকম এক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা বাস করিতেছি।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, সাময়িক উত্তেজনায় তাহা বিস্মৃত হইলে ব্যষ্টি ও সমাজের বিশেষ ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু কোন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি যদি উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলিয়া ভুল করিয়া বসেন এবং সেই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে থাকেন,

তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অনুসারে ব্যষ্টি এবং সমাজের নিদারুণ অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যাহার মন সাধারণত স্ববশে থাকে না, সে যে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ব্যক্তি ইহা সহজেই অনুমেয়। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি নিজ অথবা অপর কাহারও হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সচরাচর কাজ করিতে অক্ষম; তাহার মন যখন তাহাকে যে দিকে পরিচালিত করে, তখনই সে সেই দিকে ধাবিত হয়, কোন কার্য্যেই বুদ্ধি-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। স্বেচ্ছাচারীর সহিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির প্রভেদ এইখানে যে, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করে, যাহা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি সাধারণত করে না। এক কথায় বলিতে গেলে, যে কোন কাজের পিছনে স্বেচ্ছাচারীর নিজকৃত সঙ্কল্প থাকে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির কোন কাজেই সঙ্কল্পের বালাই নাই। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না প্রভূত শক্তিসম্পন্ন এবং সবিশেষ প্রতিষ্ঠাবান হইয়া উঠে, ততদিন তাহার স্বেচ্ছাচারিতা বৃহত্তর সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হয় না। কিন্তু তাহার পরিবারবর্গ এবং যে গণ্ডির ভিতরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সে সক্ষম হয়, তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ যে সময় সময় তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার কারণ স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি অপরের মতামত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি কদাচিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

ব্যষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সমাজের প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারে কি না সন্দেহ। শুধু ইহাই নহে, ব্যষ্টির সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেন-না, তাহা না করিলে কোন ব্যক্তিরই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নহে। একই সমাজের এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অধিকার অস্বীকার করিবার অধিকারী হইলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। কোন একটি গানের মজলিসে ধ্রুপদ গান হইতেছে। মজলিসে খেয়াল, ঠুংরি এবং আধুনিক গানও হইবার কথা আছে। দুই বন্ধু গান শুনিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের একজন আধুনিক গান শুনিতে ভালবাসেন, ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গানের রস গ্রহণ করিতে তিনি একান্ত অক্ষম। অপর বন্ধুটি একজন প্রকৃত সমঝদার। যিনি রাগিণী আলাপ করিতেছেন, তিনিও একজন সত্যকার ওস্তাদ। রসজ্ঞানহীন ব্যক্তিটির ধ্রুপদ অসহ্য হওয়াতে তিনি সমঝদার বন্ধুটিকে নানা কথায় এমনই বিব্রত করিয়া তুলিলেন যে, তাঁহার আর সে গান শোনা হইল না। সভাস্থ আরও অনেক ব্যক্তি এরূপ আচরণ করাতে ধ্রুপদ গান বিশেষ জমিল না। মজলিসে প্রত্যেক ব্যক্তিই গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। সভায় কি ধরনের গান হইবে, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ইহাও অবগত ছিলেন। আবার এ কথাও স্বীকার করা অসঙ্গত হইবে না যে, সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজারী। অথচ তাহাদের এক দল যে অপর দলের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, সে কথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-খর্ব্বকারীদিগের একবারও মনে হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য। সেই মজলিসে রামের যেমন গান শুনিবার অধিকার আছে, শ্যামেরও তেমনই অধিকার ছিল। শ্যামের যদি সেই

অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। অন্যপক্ষে শ্যামের যদি গান শুনিবার অধিকার থাকে, রাম সেখানে গোলমাল করিয়া শ্যামের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারী নয়। রামের যদি ধ্রুপদ ভাল না লাগে, সে সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, অথবা একান্ত অসহ্য বোধ হইলে অপরের কোন প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া সভা পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থায় শ্যামের ধ্রুপদ শুনিবার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কারণ শ্যাম ও রাম উভয়েরই মজলিসে গান শুনিবার অধিকার আছে। যদি তাহাদের উভয়েরই একই সঙ্গে সে অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোন অর্থই হয় না।

অনেক সময় আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করি। আমরা, শিক্ষিত বাঙালীরা, যে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল অথবা স্বেচ্ছাচারী, তাহা নহে। আসল কথা হইতেছে যে, আমরা অনেকেই এখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যেখানে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই একই অধিকারে অধিকারী, সেখানে অপরের অধিকার সুরক্ষিত রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য। সেরূপ না করিলে নিজের অধিকারও যে খর্ব্ব হইতে পারে, এ কথা, কেন জানি না, সচরাচর আমাদের মনে থাকে না। "আমার দাবি," "আমার অধিকার," "আমার দাবি করিবার অধিকার" ইত্যাদি মুখরোচক অনেক কথাই আজকাল আমরা প্রায় শুনিতে পাই। কিন্তু "অপরের অধিকার," "অপরের দাবি" প্রভৃতির কথা বড় একটা শোনা যায় না কেন? ইহার কারণ, অপরের প্রতি যে আমাদের কর্ত্তব্য আছে, এ কথা মনে করিতে আমাদের ভাল লাগে না। যাহা ভাল লাগে না তাহা করিতে, বলিতে অথবা শুনিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না, ভাল লাগা অথবা ভাল না লাগা যেখানে একমাত্র মাপকাঠি, জ্ঞান ও বিবেচনার যেখানে কোন স্থান নাই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সেখানে কি ভাবে সুরক্ষিত হইবে, ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয়।

অপরের যেখানে কোন কর্ত্তব্য নাই, নিজস্ব কোন অধিকারও সেখানে থাকিতে পারে না। কেন না, নিজের প্রতি অপরের কর্ত্তব্য হইতেই নিজস্ব অধিকার জন্মিয়া থাকে, অন্য কোন প্রকারে অধিকার জন্মে না। রামের হ্যারিসন রোড দিয়া অবাধে যাইবার অধিকার আছে, ইহার অর্থ—রাম ব্যতীত অপর সকলের কর্ত্তব্য সেই রাস্তা দিয়া রামকে অবাধে যাইতে দেওয়া। অপর সকলের যদি রামের প্রতি এরূপ কর্ত্তব্য না থাকিত, তাহা হইলে সে রাস্তা দিয়া যাইবার রামের অবাধ অধিকার জন্মিত না। অপরের কর্ত্তব্য আছে বলিয়াই রামের সে অধিকার জন্মিয়াছে। যদি অপর কেহ নিজস্ব কর্ত্তব্য পালন না করে, তাহাতে রামের অধিকার খর্ব্ব হয় এবং সেজন্য কর্ত্তব্য-অবহেলাকারী আইনত দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। অধিকার এবং কর্ত্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের অস্তিত্বের উপর অপরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ত্তব্য না থাকিলে যেমন অধিকার জন্মিতে পারে না, তেমনই অধিকার না থাকিলে কর্ত্তব্য থাকে না। ইহা সামাজিক জীবনের

ফল। একাধিক ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। যে ব্যক্তি একাকী মরুভূমিতে বিচরণ করে, যাহার কোন সমাজ নাই, তাহার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য কোন ব্যক্তি নাই, অতএব তাহার কোন অধিকার নাই।

সাধারণত মানুষ নিজের অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন, অপরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে তেমনই উদাসীন। এই কারণে সমাজ অপরের অধিকারের প্রতি উদাসীন, কর্ত্তব্য-অবহেলাকারীর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কারণ তাহা না করিলে একের কর্ত্তব্য-অবহেলার জন্য অপরের অধিকার সুরক্ষিত থাকে না। সমাজের এই শাসন তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসীর পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। উহারা স্বীয় অভিষ্টসিদ্ধির জন্য অপরের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সেইরূপ অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত রাখিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারীকে নির্ম্মমভাবে আঘাত দিয়া সংযত করা সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য। একের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অপর কোন ব্যক্তি নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই কর্ত্তব্য, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। তাহা না করিলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পরিণতি লাভ করিতে পারে না; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একটা কথার কথা রহিয়া যায় মাত্র।

সমাজ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে বিফলকাম হইলে স্বেচ্ছাচারী কুপিত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে সমাজকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হয় এবং তাহার ও সমাজের শক্তির তারতম্য অনুসারে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়া থাকে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, সমাজের অনেক ব্যক্তির স্বীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নাই; যাহাদের সে ধারণা আছে, তাহারাও এতৎ সম্পর্কে সকল সময় সমান সচেতন থাকে না; ফলে স্বেচ্ছাচারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহারাও সমাজকে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বীয় অপরাধ প্রক্ষালনের নিমিত্ত নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণ করিয়া আত্মসমর্থন করা স্বেচ্ছাচারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। দণ্ডিত অপরাধীর প্রতি মমতা প্রদর্শন করাও অন্যায় অথবা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমরা যদি অত্যধিক মমতাবশত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-খর্ব্বকারীর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক সমাজে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হই, তদ্বারা যে আমরা আমাদেরই নিজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিব, উত্তেজনার মুখে এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু সমাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য আমাদিগকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কথঞ্চিৎ সংযত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি হতাশায় লিখিয়াছেন, "কেবলই মনে হইতেছে, আজ নূতন করিয়া বাঁচিবার দিন আসিয়াছে। এমন অবস্থায় আমাদের প্রতি প্রতিষ্ঠানকে, প্রত্যেক সঙ্ঘকে জাতীয় জীবনের পোষণ-কার্য্যের জন্য নূতন শক্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এমন অবস্থায় যদি সমাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অপরিসর পথে পরিচালিত করিতে হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আজ যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমরা ভোগ করিতেছি, তাহার দ্বারা আমাদের চারিদিকের মানুষ কতটুকুই

রা লাভবান হইতেছে, সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিই বা এমন ফুল ফুটিয়াছে, যাহার সৌরভ নষ্ট হইলে সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?" শাল্মলীবৃক্ষে কি কখনও পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে? বাংলা দেশ যদি সত্যকারের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজারী হইত, শিক্ষিত বাঙালী যদি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিত, তাহা হইলে নির্ম্মলবাবুকে এরূপ হতাশার বাণী উচ্চারণ করিতে হইত না।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিছক ভাববিলাসের সামগ্রী নহে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মূর্ত্ত না হইলে ইহার কোন সার্থকতা থাকে না। একাধারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত এবং সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্যক্তিগত চরিত্র ও জাতীয় চরিত্র সুগঠিত এবং সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন। এই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন

মুক্তি

মরণের ছায়াপথে লোকোত্তর তমিস্রার মাঝে
জ্যোতির্ম্ময় ভগবান নখরে নক্ষত্র দীপ্তি রাজে।
গাঢ়তম অন্ধকার আঁখি নাই-দৃষ্টি নাই আলো,—
এ নিরীহ আত্মারাম এই মাত্র বুঝিয়াছে ভালো;
যে আলো-সঙ্কেতরশ্মি মরমের রন্ধ্রপথে আসে—
অন্ধ হয় চক্ষুষ্মান তমোসুদ সূর্য্য পরকাশে,
ভেদ করে তমসায়, যে আলো বাঁশীর সুরে সুরে,
সীমাহীন শূন্যে বাজে অন্তরের কারাগৃহ-পুরে—
সেই আলো সেই মুক্তি রমণীয় ময়ূখমালায়
করে করে কণ্ঠে কণ্ঠে মুক্তি-ডোরে বাঁধিবে আমায়।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বেবি

দূর কর ঐ কালো হুঁদহুদে ছোঁড়াকে, রাতদিন জ্বালাতন ক'রে মেরেছে! আর ঐ হারামজাদীকে কানে ধ'রে ঘরে বেঁধে রাখ। বেবি, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? বাইরে যা।

বৈঠকখানায় বসিয়া আগামী বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈয়ারি করিতেছিলাম। স্ত্রীর উঁচু পর্দ্দার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম। সকাল হইতেই সপ্তমে সুরু করিলেন কেন? ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময়ে আমার দশ বৎসরের মেয়ে বেবি ঘরে ঢুকিল। ইঙ্গিতে কহিলাম, কি হ'ল? বেবি হাস্য গোপন করিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, জানি না বাবা।—বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

উঠিয়া অন্দরে যাইতেই দেখিলাম, ভৃত্য পাঁচকড়ি বেবির কানে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে। বেবির করুণ আর্ত্তনাদ তাহার হৃদয় দূরে থাক, কর্ণপটহ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

স্পষ্ট দিবালোকে, চক্ষের সম্মুখে নারী-নির্যাতন! পৌরুষ চাড়া দিয়া উঠিল। ধমক দিয়া কহিলাম, ও কি করছিস? ছেড়ে দে।

পাঁচকড়ি জবাব দিল না, টানাটানিও বন্ধ করিল না। কেবল একবারমাত্র রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। দৃষ্টিপথ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের দাওয়ায় পত্নী গম্ভীর বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। চোখোচোখি হইতেই কড়া স্বরে আদেশ দিলেন, ছাড়িস নি, একেবারে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে আয়। তারপর ঐ হতভাগাকে মেরে দেশছাড়া ক'রে দিয়ে আয়।—বলিয়া বাহিরের দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়া ওপাড়ার ভুলো উঁকি মারিতেছে।

দীর্ঘ, উন্নত, পরিপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ; কুচকুচে কালো রং; ছোট-ছোট লোমওয়ালা গায়ের চামড়া, সদ্য-বুরুশ-করা কালো বনাতের মত চকচকে লেজটি একটি পরিপুষ্ট তিন-ফুটের মত পৃষ্ঠান্তদেশ হইতে লম্বমান। খাঁটি

দেশী হইলেও ভুলোর চেহারা দুদণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, অবশ্য ভুলোর মর্জ্জি হইলে। কারণ কোন অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তিকে নিজের এলাকায় দেখিলেই ভুলো এমনই হাঁকডাক ও তাড়া করে যে, রূপাবেক্ষণ দূরে থাক, সাদা ভদ্রলোকের চালে পথচারণই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

এই স্বনামধন্য শ্রীমান আমার বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছে কেন? আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে বলিয়া তো মনে হয় না। কারণ, স্কুলে যাইবার সময় সামনে পড়িলে তাড়া না করুক, যে ভাবে তাকায়, তাহাতেই বুকের রক্ত জল হইয়া যায়।

তবে কি বেবির বন্ধন-দশা ও ভুলোর আবির্ভাবের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে? থাকিলে কেমন করিয়া থাকা সম্ভব হইল?

সমস্যার স্বয়ং সমাধান না করিয়া শ্রীমতী উত্তর-মালার দিকে চাহিলাম। তিনি তখনও দাওয়ায় দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহার আদেশ পুরাপুরি প্রতিপালিত হইতেছে কি না দেখিতেছিলেন, এবং ভাব ও ভঙ্গির দ্বারা প্রতিবাদীকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিতেছিলেন। তথাপি ডাক দিয়া কহিলাম, শুনছ! জবাব দিলেন না। কাছে গিয়া কহিলাম, কি ব্যাপার? পত্নী ঝাঁজের সহিত কহিলেন, বোঝ না নাকি? কচি খোকা!

সবজান্তার মত হাসিয়া কহিলাম, সব বুঝেছি, তবু তোমার মুখে—। কথাটা শেষ করিতে না করিতেই পত্নী কহিলেন, আমার এত ঢং দেখবার সময় নেই।—বলিয়া রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমিও পশ্চাদনুসরণ করিলাম। রান্নাঘরের মধ্যে আমাকে দেখিয়া পত্নী মুচকি হাসিলেন। সাহস পাইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার বল দেখি?

পত্নী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, বলছি, ব'স। জরুরী কথা। —বলিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। আমি উবু হইয়া বসিয়া, কলিকাতায় ফুটপাথের উপর জ্যোতিষীর সামনে যেমন করিয়া লোকে হাত দেখাইবার জন্য বসিয়া থাকে, তেমনই ভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বেবিকে কোন দিন চোখ মেলে চেয়ে দেখেছ?

দেখিয়াছি এবং চক্ষু মেলিয়াই দেখিয়াছি, কিন্তু কিছু না বলিয়া শুধু হাঁ-সূচক ঘাড় নাড়িলাম। পত্নী কহিলেন, ঘাড় তো নাড়ছ, তবে চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন?

বলিলাম, কি করতে হবে?

কেন? ডাক্তারবাবুদের টমকে নিয়ে এসে ওর সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও।

মাস্টার ও মালিনী মাসী, দুইয়ের কাজ আমাকেই করিতে হইবে নাকি! এড়াইবার জন্য কহিলাম, কেন ভুলো? নিজেই যখন এসে পড়েছে, তখন আপত্তি কিসের? দেখতে-শুনতে তো বেশ।

স্ত্রী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, ছিঃ, দিশী! ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, তুমি টমকেই আনার ব্যবস্থা কর।

আমাদের গ্রামের সরকারী ডাক্তারখানার যিনি ডাক্তারবাবু, টম তাঁহারই সম্পত্তি। হাড়-বাহির-করা জিরজিরে চেহারা; দাঁত-বাহির-করা শীর্ণ মুখ; সলিতার মত সূক্ষ্ম লেজ। ডাক্তারবাবু তাহাকে যতই বিলাতী গ্রে-হাউণ্ড-বংশীয় বলিয়া জাহির করুন, সে যে বর্ণ-সঙ্কর ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা তাহাকে দেখিবামাত্র কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না।

তবু এক জোড়া লটকানো কান এবং কিঞ্চিৎ লোম-বাহুল্যের জোরে সে যে ভুলোর উপর টেক্কা দিয়া যাইবে, তাহা আমার কাছে অত্যন্ত অন্যায় মনে হইল। তা ছাড়া নিজেরও কিছু স্বার্থ ছিল। ভুলোর এলাকা দিয়া আমাকে নিত্য স্কুলে যাতায়াত করিতে হয়। ভুলোর সঙ্গে একটা সুবাদ স্থাপিত হইলে, আর ভরা পেটে ঘোড়দৌড় করিতে হইবে না। অতএব কহিলাম, কি দরকার এত হাঙ্গামায়, যখন—

পলিতায় আগুন দিতে না দিতেই বোমা ফাটিয়া গেল। স্ত্রী সগর্জ্জনে কহিলেন, তুমি পারবে না তো! তা আমি জানি। কাঁচুমাচু মুখে কহিলাম, না না, পারব না কেন? স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি গো জানি! কোন্ কাজটা তোমাকে দিয়ে হয় শুনি? ভাগ্যে

আমি আছি তাই। যাক, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি পাঁচুকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করব। তুমি দয়া ক'রে কর্ত্তামি না করলেই বাঁচি।—বলিয়া আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া মামলা ডিস্‌মিস করিয়া দিলেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিলাম।

স্কুলে যাইবার সময়ে দেখিলাম, অদূরে পথের ঠিক মধ্যস্থলে ভুলো দাঁড়াইয়া আছে। অত্যন্ত চিন্তাকুল ও ম্রিয়মাণ ভাব। শুনিয়াছি, প্রেমে পড়িলে অনেককে কবিত্বে ধরে; ভুলোরও সেই অবস্থা নাকি! তবু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। কারণ কবি হইয়া উঠিলেই যে ভদ্র হইয়া উঠিবে, তাহার কোন মানে নাই। সঙ্গে সঙ্গে নজিরও মনে পড়িল। মাস দুই আগে জেলা-জজের কোর্টে জুরি হইয়া গিয়াছিলাম। জজ-মহোদয় একজন স্বনামধন্য বাঙালী কবি। কিন্তু তিনি একজন নিরীহ ডাক্তারকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কায়দায় পাইয়া যে ভাবে নাস্তানাবুদ করিলেন, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া হাকিম বাহাদুর নিজে ছাড়া, আদালত-সুদ্ধ উকিল, আমলা, মায় পেয়াদারা পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল। তবে? কিন্তু খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই তো চলিবে না, স্কুলের সময় হইয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই ভুলোর চক্ষে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, ভুলো তাহার সনাতন তর্জ্জন-গর্জ্জন বর্জ্জন করিয়া, বাৎসরিক পরীক্ষার পর অত্যন্ত ডানপিটে ছেলেও যেমন বিনয়ের অবতার বলিয়া পায়ে পায়ে ফিরিতে থাকে, তেমনই ভাবে আমার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

রাস্তায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি আমার সঙ্গে ভুলোকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কি মশায়! একেও পুষেছেন নাকি? প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আজ্ঞে না, দেখুন না, কি মুশকিল! ভুলো তখন গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডাক্তার অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, আর না না কেন? কিন্তু খুব পোষ মানিয়েছেন তো! সঙ্গে ক'রে স্কুলে পর্য্যন্ত নিয়ে চলেছেন

দেখছি।—বলিয়া একবার আমার ও একবার ভুলোর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু কি মুশকিল দেখুন দেখি! আমি একজন গরিব স্কুল-মাস্টার, আমার এই সারমেয়-সাহচর্য্য লোকে সহ্য করিবে কেন? হাকিম-হুকিম হইলেও বা কথা ছিল। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের ইউনিয়ন-বোর্ড পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে আসিয়াছিল, একটা বাঘের মত প্রকাণ্ড কুকুর, যেমন থাবা, তেমনই মুখের হাঁ, নিশ্বাস লইতেছিল, না, হাপর চালাইতেছিল। আমরা মেম্বাররা যুক্তহস্তে সাহেবের সামনে বসিয়া মনে মনে ইষ্টনাম জপ করিতেছিলাম—সাহেবের ভয়ে যত না হোক, ঐ দুশমনী চেহারাওয়ালা কুকুরটার ভয়ে; একটু ত্রুটি হইলেই যদি ঘাড়ে পড়িয়া প্রাণবায়ুটুকু বাহির করিয়া দেয় তো কোন চারা থাকিবে না। কিন্তু ইহা দেখিয়া আমাদের গ্রামের সকলে, কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করা দূরে থাক, একসঙ্গে মোহিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ঐ ডাক্তারবাবু (যিনি একটি নেংটি ট্যাঁস পুষিয়া নিজেকে কুকুরের বিশেষজ্ঞ মনে করেন) উক্ত সারমেয়প্রবরের কুলপঞ্জী ও কৃতিত্বের বিশদ বর্ণনা করিয়া, আমাদের মত অখ্যাত পল্লীগ্রামে তাহার পদার্পণ যে অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার, তাহা এমনই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমরা সকলেই তাহার যথোচিত সমাদর করিতে না পারার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আজ সেই ডাক্তারবাবুই—কিন্তু যাক সে কথা।

ভুলো সঙ্গত্যাগ করিল না। তাহাকে নিষেধ করিব বা বুঝাইয়া বলিব—বাবাজী! তোমার দুঃখ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি, তোমার জন্য চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু নিরুপায়। কারণ, নিষেধ করিলেই যে শুনিবে এবং বুঝাইয়া বলিলেই যে বুঝিবে, তাহার স্থিরতা কি? বরং উল্টা যদি প্রাক্তন-মূর্ত্তি ধরিয়া বসে তো অনর্থের সীমা থাকিবে না। তাহার চেয়ে, সে যাহা ইচ্ছা করুক এবং লোকে যাহা ইচ্ছা বলুক, আমার পক্ষে নির্ব্বাক ও নির্ব্বিকার থাকাই নিরাপদ।

যাক, স্কুল পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া ভুলো নিরস্ত হইল। কিন্তু

সারাদিন অস্বস্তির সীমা রহিল না। বাড়ি ফিরিবার সময়েও সঙ্গ লইবে নাকি? তাহা হইলে ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছে অত্যন্ত লজ্জায় পড়িতে হইবে এবং স্ত্রীর চোখে পড়িলে যাহা ঘটিবে, তাহা সকলের কাছে না বলাই ভাল।

স্কুল বন্ধ হইবার পরও অনেকক্ষণ অফিসে বসিয়া কাজ করিলাম, এবং সকলে চলিয়া যাইবার পর বাহিরে আসিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, তন্ন তন্ন করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। সমস্ত রাস্তা নির্জ্জন ও নিঃশ্ব। নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। কিন্তু ভুলো কোথায় গেল? এই সময়ে প্রতিদিন সে রাস্তার ধারে একটা বটগাছের তলায় পাড়ার ও বে-পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের লইয়া মজলিস করে। আজই সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দিয়া একেবারে বৈরাগী বনিল নাকি? বিশ্বাস নাই। প্রেমের পাল্লায় পড়িলে কাহারও কোনও কাজ করিতে বাধে না। আমাদের পাড়ার নটবর এক বৈষ্ণবীর প্রেমে পড়িয়া, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সব ছাড়িয়া দিয়া আশ্রম-বাস সুরু করিয়াছে এবং গলায় মালা ও কটিতে কৌপীন পরিয়া বৈষ্ণব-বাবাজী বনিয়াছে। কাজেই—। না না, ভুলোর সম্বন্ধে এই চরম পরিণাম চিন্তা করিবার এখনও সময় আসে নাই। কারণ, দেখিলাম, রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া আমাদের পাড়ার দিকে গিয়াছে, ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া ভুলোর অনুচরদের একজন; শহরে মোড়ে মোড়ে মোতায়েন পুলিস-কন্‌স্টেব্‌লদের মত সোহং ভাব, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। না করুক, কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কেন? পাশ কাটাইয়া চলিলাম। আরও কিছু দূরে দেখিলাম আর একজন দাঁড়াইয়া, আরও কিছু দূরে আর একজন। তবে? ব্যাপারটা সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইতেছে না। ভুলো কি দিনে ডাকাতি করিবে নাকি? পা চালাইয়া দিয়া, একে একে আরও তিন মূর্ত্তিকে পাশ কাটাইয়া বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিলাম, বাড়ির পিছনে বেড়ার ধারে স্বয়ং ভুলো। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বেড়ার ওপাশে বেবি, দুইজন বেড়ার ফাঁক দিয়া, মুখে মুখ ঠেকাইয়া, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বাবাজী তাহা হইলে এইখানেই আসিয়া জুটিয়াছে! কিন্তু কাজটি

কি ভাল হইতেছে? আমি না হয় ভয়ে হোক, ভক্তিতেই হোক, কিছু বলিতেছি না, কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকের বেড়ার ধারে প্রকাশ্যে প্রেমালাপ? ইহার প্রতিবিধান করিতে না পারিলেও প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু পা বাড়াইতে গিয়া, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, ভুলোর অনুচরবর্গ দল বাঁধিয়া একেবারে কাছেই আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, প্রভুর প্রণয়-ব্যাপারে কাহারও হস্তক্ষেপ তাহারা পছন্দ করিবে না। অতএব পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম।

কিন্তু নিজের অসহায়তা ও অক্ষমতার জন্য মনটা ছোট হইয়া গেল। জানি কুকুর-জাতি আমাদের রাজাদের পরম প্রীতিভাজন; কিন্তু তাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিবে নাকি? রীতি-নীতি, আইন-কানুন কিছুই মানিবে না? নিরীহ গৃহস্থের মান-মর্য্যাদার মাথায় পা দিয়া ভরাডুবি করিয়া দিবে? কিন্তু আক্ষেপ নিষ্ফল। ইহাই আমাদের, মানে, বাঙালী হিন্দুর ভাগ্যলিপি।

বৈঠকখানা হইতে অন্দরে ঢুকিতেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই দিকেই আসিতেছিলেন; আমাকে দেখিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া দিক পরিবর্ত্তন করিলেন।

ব্যাপার কি? নূতন কোন অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। তবে হয়তো রাগ নয়, অভিমান। স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়াছে কিনা, তাই। চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। অনেকদিন দা-কাটা কড়া তামাক খাইবার পর যেন অম্বুরীর সুমিষ্ট গন্ধ নাকে আসিল। তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছাড়িয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, রান্নাঘরে গিয়া দেখিলাম, স্ত্রী খাবার সাজাইতেছেন। সামনে বসিয়া সরস কণ্ঠে ডাকিলাম, হ্যাঁগো, শুনছ! স্ত্রী জবাব দিলেন না। কহিলাম, বেবির কি ব্যবস্থা হ'ল? ইহার পর জবাব মিলিল, জানি না। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, বেবির কোন কথাতেই নেই আমি, যা ইচ্ছে তুমি করগে।

রসের বদলে রোষ! ঘাবড়াইয়া গেলাম। আদিম দাম্পত্য-জীবনে অভিমান উপশম করিবার জন্য কয়েকটি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতাম। ভাগ্যে আজ তাহারই দুই একটি প্রয়োগ করিয়া বসি নাই! তাহা হইলে

অনর্থের সীমা থাকিত না। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কি হ'ল? ধমকের সুরে কহিলেন, জানি না কি হ'ল? জিজ্ঞাসা কর পাঁচুকে, ডাক্তারবাবু কি ব'লে পাঠিয়েছে।

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। সকালের ভুলো-ঘটিত ব্যাপারটা ফাঁস করিয়া দিয়াছে নাকি? ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলাম, কি?

সরোষে কহিলেন, জানি না কি?—বলিয়া ঠক করিয়া থালাটা সামনে নামাইয়া দিয়া দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

খাওয়ার পর পাঁচুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই সে কহিল, বলেছেন, আমরা নাকি ভুলোকে পুষেছি। ও রকম দুষ্ট দিশী কুকুর যে বাড়িতে, সেখানে কুকুর তাঁরা পাঠাবেন না, সহবৎ খারাপ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন করিলাম, আমরা যে ভুলোকে পুষেছি, এ খবর কে দিয়েছে তাঁদের?

পাঁচু ঢোক গিলিয়া কহিল, ডাক্তারবাবু যে ভুলোকে নিজের চোখে আপনার সঙ্গে যেতে দেখেছেন।

শুষ্ক কণ্ঠে কহিলাম, এই কথা বলেছে? আচ্ছা মিথ্যেবাদী লোক তো! তুই তোর দিদিমণিকে এ কথাও জানিয়েছিস বুঝি?

পাঁচু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ।

ধমক দিয়া কহিলাম, ওসব কথা বলতে গেলি কেন?

পাঁচু গৃহিণীর পেয়ারের চাকর, বাপের বাড়ি হইতে আমদানি, ধমক সহ্য করিতে পারে না, কাঁদকাঁদ স্বরে কহিল, দিদিমণি জিজ্ঞেসা করলেন যে।

মুখভঙ্গি করিয়া কহিলাম, জিজ্ঞেসা করলেন যে! জিজ্ঞেস করলে ব'লেই বলতে হবে!

পাঁচু অনুযোগের স্বরে কহিল, জামাইবাবু! মিথ্যে বলব? আপনিই তো সেদিন বললেন, সাহেবরা মিথ্যে বলে না।

সত্যই। পাঁচু সেদিন বিড়ি খাইতে খাইতে ধরা পড়িয়াছিল। স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও কিছুতেই তাহাকে স্বীকার করাইতে পারি নাই।

শেষে জর্জ ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতার গল্প বলিয়া তাহাকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।

কড়া গলায় কহিলাম, খুব হয়েছে, যা, বেরো আমার সামনে থেকে।

পাঁচু চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিরক্তি সত্ত্বেও, বলিতে কি, একটু আনন্দ হইল। এই পনরো বছরের শিক্ষক-জীবনে বিস্তর সুশিক্ষার বীজ ছড়াইয়াছি, কিন্তু গাছ দূরে থাক একটিতেও অঙ্কুরোদ্গম পর্য্যন্ত হয় নাই। আজ কিনা পাঁচুর প্রস্তরাধিক কঠিন হৃদয়ক্ষেত্রে—

পত্নীর কঠোর কণ্ঠস্বর কানে আসিল, মিথ্যে বলে নি ব'লে মার! এমন তো কোথাও শুনি নি! পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নিজের মত মিথ্যে বলতে হবে নাকি? বাইরে যা ইচ্ছে তাই ক'রে আসবে, আর ঘরে এসে পরের ছেলের ওপর অত্যাচার! পাঁচুর উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিলেন, কালই বাড়ি চ'লে যা, অত মারধর আমি দেখতে পারব না।

আকাশ হইতে পড়িলাম। পাঁচুকে মারিলাম কখন? তাহার পৃষ্ঠে দূরে থাক, কর্ণে পর্য্যন্ত হাত দিই নাই। তবু পাঁচু মিথ্যা লাগাইল! এই তাহার সত্যনিষ্ঠা! আর আমি কিনা মিথ্যাবাদী! শিক্ষকের ইহার চেয়ে বেশি দুর্নাম আর কি হইতে পারে? আর তাহার প্রচারক যদি স্বয়ং স্ত্রী হন, তাহা হইলে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস লওয়াই ভাল।

মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। সংসার, সমাজ, সভ্যতা, এমন কি জীবনের উপরও বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলাম। শঙ্করাচার্য্য বহু তপস্যা দ্বারা যে মোহ-মুদ্গর লাভ করিয়াছিলেন, স্ত্রীর তাড়নায় অনায়াসে তাহা আমি করায়ত্ত করিলাম। জীবন যে পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ চঞ্চল, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেহ যে আমার আপন জন নহে, সংসার যে সকল দুঃখের আকর, সমাজ যে একটি নিরীহ নিষ্পেষণী-যন্ত্র, সভ্যতা যে মানুষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত দুষ্কৃতির কর্ম্মফল, এই সব গাঢ় তত্ত্বগুলি এক মুহূর্ত্তে জলের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারিলাম, এই সংসার সমাজ ও সভ্যতার বেড়াজাল ডিঙাইয়া না বাহির হইতে পারিলে শান্তি নাই। হঠাৎ গৌরদাস বাবাজীর কথা মনে পড়িল। বৎসর দুই পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। দীর্ঘ দোহারা গঠন, নধর নবজলধর

কান্তি, দাড়ি ও গুম্ফ সমন্বিত মুখ, মাথায় মেয়েদের মত বড় বড় চুল, পরিপাটী ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। পৃথিবীতে একখানি কন্থা ও গুটি-পাঁচেক সেবাদাসী ছাড়া আর আপনার বলিতে কিছুই নাই। অথচ তাঁহার মত নিখাদ নির্লিপ্ততা ও নিখুঁত শান্তি আমি খুব কম দেখিয়াছি। আমাদের মত সকাল হইলেই ধোপা ও নাপিতের নাম স্মরণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতে হয় না; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ছুটোছুটি ও গুঁতোগুঁতি করিতে হয় না; ছেলেমেয়েদের ঝামেলা সহ্য করিতে হয় না; আপ-টু-ডেট বনিবার জন্য খবরের কাগজ মুখস্থ করিতে হয় না, এবং সর্ব্বোপরি উঠিতে বসিতে স্ত্রীর ধমক খাইতে হয় না। দিবারাত্র গাঁজা খাইয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকেন, সেবাদাসীগুলি পালা করিয়া ভিক্ষা করিয়া আনে, রান্না করে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাঁজা সাজিয়া দেয়, গা-হাত-পা টিপে, স্নান ও প্রসাধন করায়, জীর্ণ কন্থাটি সংস্কার করে এবং সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া খঞ্জনী ও মন্দিরা বাজাইয়া সুমিষ্ট স্বরে কীর্ত্তন গাহিয়া শোনায়। অথচ এই সেবাদাসীগুলির উপরেও বাবাজীর বিন্দুমাত্র অধিকার-বোধ নাই, আকর্ষণ নাই। নহিলে আমাদের নটবর যখন একটি নবীনা বৈষ্ণবীর উপর ভার বসাইতে চাহিল, তখন প্রতিবাদ তো করিলেনই না, উল্টা সোৎসাহে নিজে তাহাদের কণ্ঠী বদল করিয়া দিলেন। আর নটবরের কি পরিবর্ত্তন! বৈষ্ণবীর হেফাজতে বৎসর দুইয়ের মধ্যেই দেহে মাংস ও মনে স্ফূর্ত্তি গজাইয়াছে।

পাঁচু আসিয়া কহিল, জামাইবাবু! দিদিমণি ডাক্তারবাবুদের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছেন, ছেলেরা রইল, দেখবেন।—বলিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি দশটার পর পত্নী বাড়ি ফিরিলেন। কি ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন, নিজে বলিলেন না, আমিও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময়ে ভুলোকে এড়াইবার জন্য অন্য পথ দিয়া গেলাম এবং ফিরিলামও সেই পথ দিয়া। ভয় হইয়াছিল, ভুলো হয়-তো ফিরিবার সময়ে সঙ্গ লইবে। কিন্তু না, কোথাও ভুলোর দেখা পাইলাম না। যাক, তাহা হইলে তাহার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। সত্যই তো, প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য লম্ফঝম্প করিয়া লাভ কি? তাহা ছাড়া ভুলো কি বেবির উপযুক্ত? সে দিশী নেটিভ; ভূতের মত কালো

চেহারা। বেবির মত সুন্দরী স্প্যানিয়েল-বংশীয়া সারমেয়-নন্দিনী তাহাকে কৃপা-কটাক্ষ দান করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে দেহ দান করিবে—এ আশা তাহার পক্ষে দুরাশা। যাক, তাহার সুবুদ্ধির সুবৃদ্ধি হোক; হৃদয় যদি কিঞ্চিৎ জখম হইয়া থাকে তো তাহা সত্বর নিরাময় হইয়া উঠুক, এবং হে ভগবান! আমার উপর তাহার যেন বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ না থাকে।

বাড়ির কাছে আসিয়া দেখি, ভুলো বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া। আজ আর সাঙ্গোপাঙ্গগুলি সঙ্গে নাই, থাকিলেও সরজমিনে হাজির নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বেবিও বাগানের মধ্যে নাই। আজ তাহার উপর কড়া পাহারা পড়িয়াছে বোধ হয়। হয়তো বা শ্রীমান টমের শুভাগমন হইয়াছে। বেবি তাহাকে লইয়াই মত্ত হইয়া আছে। ভুলোর কথা খুব সম্ভব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাই নিয়ম। একটুখানি হাসি কাসি বা চাহনি নিছক দৈহিক ব্যাপার, ইহার সহিত অন্তরের যোগ থাকিতেই হইবে তাহার কোন মানে নাই। অথচ এই নকলকেই আসল ভাবিয়া পুরুষের নাকাল হওয়ার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু, ভুলোর এ কি চেহারা হইয়াছে! সারা গায়ে ধুলা মাখিয়াছে, চোখ দুইটা লাল; মুখের ভাব ভীষণ; নির্নিমেষে আমার বাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। আজ সারাদিন বেবিকে না দেখিতে পাইয়া ভুলো বোধ হয় বুদ্ধি-বিবেচনার শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর যা-তা করিয়া বসা অসম্ভব নয়। অতএব—। হঠাৎ ভুলো আমার দিকে তাকাইল, এবং নিমেষমধ্যে তিন লাফে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া লেজ খাড়া করিয়া দাঁত বাহির করিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, এ অবস্থায় ছুটিলেই বিপদ। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া যা হোক একটা কিছু হাতে লইতে হয়। আমিও না পলাইয়া, কাছাকাছি যা হোক কিছুর অভাবে পকেট হইতে ফাউন্টেন-পেনটি বাহির করিয়া বর্শা মারিবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইলাম, ও মুখে ধ্যেৎ-ধ্যেৎ শব্দ করিতে লাগিলাম। ভুলো ভয় পাইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া গর্জ্জনধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়াইতে লাগিল। আমিও তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, মুখে তেমনই শব্দ করিতে করিতে এদিক ওদিক চাহিয়া কেহ কাছাকাছি

আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কাহারও দেখা মিলিল না। এদিকে ভুলোর ক্রোধ ক্রমে বাড়িতে লাগিল, এবং ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্য পায়তাড়া সুরু করিল; অতএব বুদ্ধি করিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম, বেবি! বেবি! ফাউণ্টেন-পেনটাকে দিয়া বেড়াটাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলাম, ঐ যে বেবি। ফুটন্ত উথলাইয়া পড়া দুধে জল দিলে যেমন তাহা এক মুহূর্ত্তে শান্ত হইয়া যায়, ভুলোও তেমনই শান্ত হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং বার দুই লেজটি এদিক ওদিক নাড়িয়া কি যেন দেখিতে পাইয়া বেড়ার দিকে ছুটিল, আমিও উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটিলাম।

বৈঠকখানার দাওয়ায় উঠিয়া এক হাতে একটা খুঁটি ও আর এক হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সামলাইতে লাগিলাম। নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, মাথাটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, এবং পা দুইটা থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া কোনমতে বৈঠক-খানায় ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু কি বিপদ দেখুন দেখি! পৃথিবীতে রামের অপরাধে নিরপরাধ শ্যামের নির্যাতনই কি একমাত্র নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল? ইউরোপে দেখুন, দুই চারি জন রামের মতান্তরের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্যাম ধনে প্রাণে মরিতেছে; বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দুই দশ জন রাম রহিমের স্বার্থ-সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য শ্যাম ও শোভানরা পরস্পরের টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতেছে। অথচ উপায় নাই। শ্যামদের দুঃখে রামের হৃদয় গলিবে না, তাহারা নিজ নিজ মত ও পথে অটল হইয়া থাকিবে; অতএব শ্যামদের শাস্তি অনিবার্য্য।

কিন্তু সম্প্রতি এই সার্ব্বজনীন ও সনাতন সমস্যা আমার পক্ষে এমনই ব্যক্তিগত ও প্রাত্যহিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উপায় নাই বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মেয়েমানুষ নয় যে ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে। অথচ পথে বাহির হইলেই ভুলো যদি দেখিবা-মাত্র আস্ফালন সুরু করে, তবে? আর শুধু আস্ফালন? যদি কামড়াইয়া দেয়? তাহা হইলে কসৌলি না হোক, কলিকাতা ছুটাছুটি করিতে হইবে।

শ্রীমান পাঁচকড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করিয়া চা। নামাইয়া দিতেই তাড়াতাড়ি হাত দিয়া দেখি, আগুনের মত গরম। ছাড়িয়া দিয়া কহিলাম, গ্লাসে কেন? পেয়ালা কি হ'ল? টমকে চা দেওয়া হয়েছে।—বলিয়া পাঁচু প্রস্থান করিল।

খুব চমৎকার ব্যবস্থা! কিন্তু যাহার প্রতিকার নাই, তাহা নীরবে সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব গ্লাসটি কাপড় দিয়া ধরিয়া কোনমতে চা গিলিতে লাগিলাম; এবং এই ভাবে নিত্য চা খাওয়ার চেয়ে চা ছাড়িয়া দিব কি না চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার বাড়িতে চায়ের বিশেষ চাহিদা নাই। শ্রীমতী নেহাৎ সর্দ্দি-কাসিতে কাবু না হইলে চা স্পর্শ করেন না, ছেলেমেয়েদেরও স্পর্শ করিতে দেন না। আমি ছাত্র-জীবনে, যখন আই. সি. এস. হইবার স্বপ্ন দেখিতাম, তখন এই অভ্যাস করিয়াছিলাম। স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু চা এখনও ঘাড়ে চাপিয়া আছে। কাজেই শহর হইতে এক জোড়া পেয়ালা-পিরিচ সংগ্রহ করিয়াছি; অবশ্য নিজেরই জন্য, কোন অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নহে, তা দেশীই হোক কি বিলাতী হোক। তাহাদের জন্য, বিশেষ করিয়া শ্বশুর ও শ্যালকদের জন্য পত্নী নিজের পছন্দমত দুই জোড়া শৌখিন পেয়ালা-পিরিচ বাপের বাড়ি হইতে কিনিয়া আনিয়াছেন। চা-ও মাঝে মাঝে শহর হইতে আনাইয়া লই, এবং সেই চা পত্নী প্রতিদিন স্বহস্তেই সিদ্ধ করিয়া দেন; অবশ্য প্রতিদিনই বলিয়া থাকেন, এত নবাবী আমার সহ্য হয় না। জবাব দিই, কেন? তোমার বাবা, দাদা—। কথা শেষ করিতে না করিতে গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, ওঁদের সঙ্গে তোমার তুলনা? কত টাকা রোজগার? আর তোমার? চুপ করিয়া যাইতে হয়। সত্যই তো! গরিব মাস্টারের শৌখিনতা লোকে সহ্য করিবে কেন? হইলই বা স্ত্রী! কিন্তু আমার এই অদ্বিতীয় পেয়ালাটির এমন করিয়া জাতি মারা উচিত হইয়াছে কি? ওটিকে এর পর বিসর্জ্জন দিতেই হইবে এবং নূতন একটি সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। শৌখিন পেয়ালা দুটি দেওয়াল-আলমারিতে সাজানোই থাকিবে, কোন কাজে আসিবে না।

চা পান শেষ করিয়া টম বাবাজীর আদর-আপ্যায়ন কি রকম

চলিতেছে, দেখিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলাম। উঠানের এক ধারে একটা মজবুত গোঁজে শিকল দিয়া টমকে বাঁধা হইয়াছে। কাছেই ছেলেমেয়েরা তাহাদের বন্ধুবান্ধবসহ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমার স্ত্রী শুচিতা-রক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ, দুই কার্য্য একসঙ্গে চালাইতেছেন। টমের ঠিক সামনে উবু হইয়া বসিয়া পাঁচু খাওয়ার তদারক করিতেছে। এক পাশে, একটু দূরে বেবি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় উৎসুক নয়নে টমের দিকে তাকাইয়া আছে। দেখিলাম, চা পান শেষ হইয়াছে, সম্প্রতি বিস্কুটচর্ব্বণ চলিতেছে।

পাঁচুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, বিস্কুট কোথায় পেলি? পাঁচু আমার কথার কোন জবাব না দিয়া তাহার দিদিমণির দিকে তাকাইতেই তিনি আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিলেন, বিস্কুট বাড়িতে নেই নাকি? আছে, কিন্তু তাহার জন্য গৃহিণীর কোন কৃতিত্ব নাই। সম্প্রতি আমাদের স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য শহর হইতে এক টিন বিস্কুট আনাইয়াছিলাম এবং মাস্টার ও ছাত্রদের কবল হইতে কোনমতে বাঁচাইয়া কতকগুলি ঘরেও আনিয়াছিলাম। গৃহিণী কহিলেন, না থাকলেও কিনে আনতে হ'ত। বেবির মত যে-সে ঘরে প'ড়ে তো ব'য়ে যায় নি, বিস্কুট খাওয়া অভ্যেস। কহিলাম, বিস্কুট অভ্যেসটা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু চা-টা কি পেয়ালায় না খাইয়ে অন্য কোন, মানে, ধর—নারকেলের মালা, কিম্বা—

গৃহিণী এবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়াই খনখনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তা কি করব? ডাক্তার-গিন্নী পইপই ক'রে ব'লে দিয়েছে, পেয়ালা পিরিচ না হ'লে চা খায় না।

পিরিচে ঢেলে বুঝি নিজেই খায়? সার্কাসে কুকুর দেখছি!

তা কেন খাবে? একজনকে ঢেলে দিতে হয়। বেবি সতৃষ্ণ নয়নে বিস্কুটের দিকে তাকাইয়া ছিল। পাঁচুকে কহিলাম, ওরে! বেবিকে দে না একটা বিস্কুট।

গৃহিণী নিষেধ করিলেন, না না, বেশি নেই, কুলোবে না।

বুঝিলাম, গৃহিণী বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়াছেন; তাই, কাউন্সিলে কংগ্রেসী সভ্যদের মত ভালমন্দ সকল বিষয়েই প্রতিবাদ করিতেছেন।

কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী পাঁচুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, যা যা করতে হবে নিজের কানেই তো শুনেছিস। যে কদিন থাকে, ঠিক ঠিক সেইগুলি ক'রে যাবি, কারও কথা শুনিস নি। তারপর খুব সম্ভব আমাকে শোনাইবার জন্যই কহিলেন, পাঠাতে কি চায়! কত তোয়ামোদ ক'রে যে এনেছি, তা আমিই জানি।

চলিয়া আসিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হাঙ্গামা না চুকিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিব। কিন্তু রাত্রি নয়টার সময়ে পাঁচকড়ি যখন কম্বল কাড়িয়া লইতে আসিল, তখন মৌনব্রত ভঙ্গ করিতেই হইল। কহিলাম, কম্বল নিয়ে কি করবি?

পাঁচু পেয়াদা-সুলভ প্রাধান্যের সহিত কহিল, টমকে শোয়াতে হবে, দিদিমণি ব'লে দিলেন। অসহায়ভাবে কহিলাম, চারটি খড়-টড় পেতে দিলে হয় না?

পাঁচু জবাব দিল, না জামাইবাবু, ওসব অভ্যেস নেই, ওনারা ব'লে দিয়েছেন। কহিলাম—প্রকাশ্যে নয়, স্বগত, ওনারা বলে দিয়েছেন! একেবারে লাট-গিন্নীর ল্যাপ-ডগ কিনা!

অন্দর হইতে ডাক আসিল, পাঁচু! পাঁচু কহিল, দিদিমণি ডাকছেন যে। খাতাপত্র সরাইতে সরাইতে কহিলাম, সারারাত্রি নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় তো ও রকম হতভাগা কুকুরের কি দরকার?

পাঁচু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, কি ক'রে জানব, জামাইবাবু! ওনাদের জিজ্ঞেস করবেন।

বলিয়া কম্বল লইয়া চলিয়া গেল। আমি পাঁচুর পলায়মান পৃষ্ঠদেশের উপর বজ্র-কঠোর দৃষ্টি উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিন্তু কি অত্যাচার দেখুন দেখি! এই কম্বলটি আমি শহর হইতে নিজে পছন্দ করিয়া, ভেড়িওয়ালাদের কাছে বেশি দাম দিয়া কিনিয়া আনিয়াছি। এইটিতে বসিয়া আমি লেখাপড়া করি; কোন গ্রাম্য অতিথি-অভ্যাগত আসিলে বসিতে দিই। টমকে শোওয়াইবার জন্য এইটি ছাড়া আর কোন জিনিস বাড়িতে পাওয়া গেল না! বিলাতী হোক, চা-বিস্কুট থাক, কুকুর তো! ঐ কম্বলের উপরই কত রকমের

কুৎসিত কাণ্ড করিবে! কাচিয়া লইলেও ঐ কম্বলে বসিয়া আর তৃপ্তি পাইব না। তা ছাড়া কম্বলটিও নষ্ট হইয়া যাইবে। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, ভগবান! এই শয্যাই যেন টমের শেষ শয্যা হয়। আমি কম্বলের বিরহ কোনমতে সহ্য করিব।

কিন্তু ইহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে? হইবে বইকি। না হইলে গৃহে শান্তি থাকিবে না। কাল যদি গৃহিণী বলেন, টমকে মাথায় করিয়া দিনে দশবার নাচাইতে হইবে—অভ্যাস, ডাক্তার-গিন্নী বলিয়া দিয়াছেন, গৃহের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাকে তাহাই করিতে হইবে। নিছক শান্তির জন্য প্রবল পক্ষের অত্যাচার দুর্ব্বল পক্ষ তো চিরদিন এমনই নীরবে সহ্য করে। কয়েক বৎসর আগে আমাদের জেলায় লাটসাহেব আসিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদেশ দিয়াছিলেন, লাটসাহেবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনার জন্য আমাদিগকে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে মোটা টাকা তুলিয়া দিতে হইবে। সেই সময়ে গরিব গৃহস্থের উপর, দুঃস্থ কৃষকের উপর আমরা কিরূপ উৎপীড়ন করিয়া চাঁদা আদায় করিয়াছিলাম, তাহা তো মনে আছে। কিন্তু কেহ কি প্রতিবাদ করিয়াছিল? গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া লোকে টাকা দিয়াছিল। শুনিয়াছি, কোন কোন জমিদারের জমিদারিতে প্রজাদের গৃহের লাউ, কুমড়া, বেগুন হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-বধূ পর্য্যন্ত জমিদারের ভোগের জন্য দিতে হয়; প্রতিবাদ করে না; চুপ করিয়া থাকে। এমনই করিয়া প্রজা রাজার অত্যাচার, শ্রমিক মালিকের অত্যাচার, দরিদ্র ধনীর অত্যাচার, অভদ্র ভদ্রের অত্যাচার, অশিক্ষিত শিক্ষিতের অত্যাচার, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমানের অত্যাচার, শিষ্য গুরুর অত্যাচার, ভৃত্য প্রভুর অত্যাচার, কেরানী বড়বাবুর অত্যাচার, তীর্থযাত্রী পাণ্ডার অত্যাচার, দেশসেবক নেতার অত্যাচার, ভক্ত ভগবানের অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করে। মানবসৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এই অত্যাচার সুরু হইয়াছে; জাহ্নবীপ্রবাহের মত অবিশ্রান্ত গতিতে কখনও মন্দ কখনও মত্ত বেগে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কতবার প্রতিবাদ হইয়াছে, আঙুল গনিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু কেন এই নীরব সহিষ্ণুতা? শান্তির জন্য। আমরা শান্তির জন্য সব সহ্য

করিতে পারি। দুর্ব্বলের শান্তির প্রতি এই গভীর আসক্তি প্রবলের হাতে প্রধান পীড়নাস্ত্র।

সেইদিন রাত্রে শূন্য শয্যায় (গৃহিণী বয়কট করিয়াছেন) ছটফট করিয়া রাত্রি দুইটার সময়ে চোখ মুদিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময়ে ভুলো সঙ্গীত সুরু করিল; কি মর্ম্মভেদী অথচ মারাত্মক সঙ্গীত! ঘুম দেশ ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু ভুলোর সঙ্গীতের শেষ নাই। মাঝে মাঝে মাঝে চুপ করে; ভাবি, কালোয়াতির কসরৎ বুঝি বা থামিল; কিন্তু এদিকে বেবি ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে; অমনই ভুলো নবোদ্যমে আবার সুরু করিয়া দেয়। এমনই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাপান-উতোর চলিতে লাগিল, আমি ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। কিন্তু রাগ করিলে কি হইবে? ইহাই নাকি বিরহে বিধি। রোমিও জুলিয়েতের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগিয়া দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বিরহ-সঙ্গীত গাহিত। আমাদের পাড়ার অপূর্ব্ব বিবাহের পর প্রথম প্রথম বউ বাপের বাড়ি গেলে, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত হারমোনিয়াম সহযোগে 'নিদ্ নাহি আঁখি-পাতে' গাহিয়া সমস্ত পাড়াকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। অবশ্য ভুলো যদি দিনের পর দিন এই বিরহ-সঙ্গীত চালাইতে থাকে, তাহা হইলেই মুশকিলের কথা।

পরদিন স্কুল যাইবার সময়ে স্কুলের চাকরকে ডাকাইয়া খাতা-পত্র বহাইবার অছিলায় সঙ্গে লইলাম, এবং হাতে লইলাম একটা মোটা লাঠি। রাস্তায় রাধানাথের সহিত দেখা হইল। রাধানাথ আমাদের শত্রুপক্ষীয় লোক। দেখিবামাত্র দাঁত বাহির করিয়া কহিল, কি বাবাজী! আজকাল বেতে শানছে না বুঝি, লাঠি চালাতে সুরু করেছ? মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিলাম, আজ্ঞে না, হাঁটুতে একটা বেদনা উঠেছে এমনই যে, চলতে কষ্ট হচ্ছে।—বলিয়া লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। রাধানাথ আমার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া, সহানুভূতির ভান করিয়া কহিল, তাই নাকি! বউমাকে একটু সেকটেক দিতে ব'ল। এই বয়সেই বাতে পঙ্গু হ'লে চলবে কেন? গাঁটার ভাল-মন্দ একটা কিছু হয়ে যাক। তারপর চোখ মটকাইয়া কহিল, তা এত খাতাপত্তর কিসের? ইউনিয়ন-বোর্ডের কাজ অফিসে ব'সেই

সারছ নাকি আজকাল? প্রতিবাদ করিলাম, সে কি কথা! এসব স্কুলের খাতা। ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতা স্কুলে যাবে কেন? রাধানাথ হাসিয়া কহিল, তা হ'লেই বা বাবাজী, কাজ তো। যেখানে হোক করলেই হ'ল। তা বেশ, আসি বাবাজী।—বলিয়া প্রস্থান করিল। আমি রাধানাথ দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত খোঁড়াইতে লাগিলাম।

বাড়ি ফিরিবার সময়েও চাকরকে সঙ্গে লইলাম। কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। ভুলোকে কোথাও দেখা গেল না, না রাস্তায়, না বেড়ার ধারে। কাল সারারাত্রি সঙ্গীতোদ্গীরণ করিয়া ভুলোর হৃদয়াবেগ সম্ভবত শান্ত হইয়াছে। আমাকে বোধ হয় আর বিরক্ত বা বিব্রত করিবে না। বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, টম ও বেবি পরম আনন্দে খেলা করিতেছে। ইহার মধ্যেই দুইজনে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে তো! ভালই হইয়াছে। এখন ভুলো আসিয়া একবার নিজের চক্ষে দেখিয়া গেলে আরও ভাল হইত। মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র মোহ অবশিষ্ট থাকিলে ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যাইত।

অন্দরে গিয়া দেখিলাম, পারিবারিক আবহাওয়ারও কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। গৃহিণীর গুমোট ভাবটা একেবারে কাটিয়া না গেলেও কিঞ্চিৎ গা-সহা হইয়াছে। খাওয়ার সময়ে কাছেই বসিয়া রহিলেন; চোখোচোখি হইলে সবেগে মুখ ফিরাইয়া লইলেন না, এমন কি দুই একবার কিঞ্চিৎ হাসির আভাসও যেন দেখিলাম বলিয়া মনে হইল। সক্রিয় সহযোগ না করিলেও আমি যে অসহযোগ করিতেছি না, গৃহিণী বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার মনের উপর এ কয়দিন যে ভারটা চাপিয়া ছিল, তাহা কখন নামিয়া গিয়া মনটা হালকা হইয়া উঠিল। দুই দিন আগে যে এই সংসার বিষবৎ পরিত্যাজ্য ও সন্ন্যাস একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া হাসি পাইতে লাগিল। কাল সারারাত্রি ঘুম হয় নাই। কাজেই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে গেলাম এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে কাঁদিতেছে নয়? ভাল করিয়া কিছুক্ষণ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কান্না নয়, গান। ভুলো আজও

আবার গান সুরু করিয়া দিয়াছে, অত্যন্ত করুণ স্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া। তবে তো ভুলোর রোগ এখনও সারে নাই! কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হইয়াছিল মাত্র, আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আমিও উঠিয়া খাড়া হইয়া বসিলাম। গান করুণ হইতে করুণতর ও করুণতম হইয়া হঠাৎ কঠোর, কঠোরতর ও কঠোরতম হইয়া উঠিল। আমি দুই কান হাত দিয়া চাপিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পত্নী ও ছেলেমেয়েরা নির্ব্বিকারে ঘুমাইতে লাগিল।

ভুলো বুঝিতেছে না কেন? কেন সে মিথ্যার মোহে মাতামাতি করিতেছে? কিন্তু ভুলোর কি দোষ? বেবি পোড়ামুখী ভাবে বা ভঙ্গিতে কোন আশা না দিলে, সে নিশ্চয় এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় আনাগোনা সুরু করিত না। ওদিকে বেবি তো নূতন প্রণয়ী লইয়া মশগুল হইয়া আছে, এদিকে পুরাতন প্রণয়ীটির পাগলামির ধাক্কা যে একা আমারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা যে কি করিয়া সামলাইব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ভুলোর সঙ্গীত কখনও বেহাগে ও বাগেশ্রীতে, কখনও বা ধ্রুপদ ও ধামারে চলিতে লাগিল। বেবি জাগিয়া আছে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ভুলোর সঙ্গীতময় আহ্বানে আজ সে সাড়া দিল না। ভালই করিল। কারণ ঘণ্টা দুই পরে ভুলো ক্লান্ত হইয়া চুপ করিল। আমিও আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে পাঁচুর ডাকে ঘুম ভাঙিল, জামাইবাবু, উঠুন, বেলা হয়ে গেছে। চোখ বুজিয়া থাকিয়াই কহিলাম, কটা বেজেছে? পাঁচু জবাব দিল, ঢের। তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া হিসাব করিতে করিতে কহিল, আটটা এক দুই তিন চার—। নিখুঁৎ হিসাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিলাম, সে কি রে! এত বেলা হয়ে গেছে!

চোখ মুছিতে মুছিতে বারান্দায় আসিতেই গৃহিণী রান্নাঘর হইতে কহিলেন, আজ আর চা খেয়ে কি দরকার? একেবারে নেয়ে খেয়ে নিলেই হয়! মনে মনে জবাব দিলাম, রসিকতা করিবার ভাবনা কি! সারারাত্রি কি ধকল গিয়াছে, তাহা তো কেহ জানে না। আর

জানিবেই বা কি করিয়া? যা নিরেট ঘুম, ভুলোর গান দূরে থাক, কামান দাগিলেও চিড় খাইবে না।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া কাজ লইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে অন্দরে কোলাহল উঠিল; ববি, পাঁচু, অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এবং গৃহিণী নিজেও, হৈ হৈ সুরু করিয়া দিয়াছে। মনে মনে বিরক্ত হইলাম। হয়তো একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এমনই গোলমাল করিতে পারে সব! একটু নিরিবিলিতে যে কাজ করিব, তাহার উপায় নাই। কোলাহলটি আমার ঘরের দিকেই সরিয়া আসিতেছে মনে হইল। মিনিট কয়েক পরে, বাবা, দেখ কি করেছে!—বলিতে বলিতে ববি ঘরে ঢুকিল, সঙ্গে পাঁচু। মুখ তুলিয়া তাকাতেই দেখিলাম, পাঁচুর হাতে এক পাটি জুতা এবং আমারই জুতা। বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, কি হ'ল রে? পাঁচু জুতাটি মুখের সামনে আগাইয়া দিল। দেখিলাম, জুতাটির সম্মুখ-ভাগের নরম অংশটি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। বাকি যেটুকু আছে, তাহাও দাঁতের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ববি কহিল, টম করেছে, বাবা। বেবি কিছু জানে না, বেবির এসব রোগ নেই আমি জানি। ইহা নিশ্চয়ই হতভাগ্য টমের কাজ। পাঁচু কহিল, খাঁটি বিলেতী কিনা! না হ'লে এই লোহার পাতের মত শক্ত চামড়ায় দাঁত বসানো দিশীর সাধ্য নেই। বাহাদুর বটে!—বলিয়া মুখ ও চোখ বারকয়েক চরকার মত ঘুরাইয়া দিল। কটকট করিয়া তাকাইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম, বাহাদুর! বলতে লজ্জা করে না! তুইই তো যত নষ্টের গোড়া! গৃহিণী আসিয়া হাকিমী চালে কহিলেন, হচ্ছে কি? পাঁচুকে কহিলেন, জুতোটা ফেলে দিয়ে কাজ করগে যা। হাত পা ধুবি কিন্তু। ঐ কুকুর-খাওয়া জুতো ছুঁয়ে সব একশা ক'রে দিস নি। পাঁচু চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল, এবং ছেলেমেয়েরাও একে একে বাহির হইয়া গেল। রহিলাম, আমি এবং তিনি। তিনি কহিলেন, কি করবে বল! বিলিতী কুকুর, তার ওপর বড়লোকের কুকুর, দিন মাংস খাওয়া অভ্যেস। আমাদের বাড়িতে তো ওসব পায় নি, তাই ঐ শুকনো জুতোটা চিবিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে। তা তোমার তো পুরোনো জুতো, কোন্ মান্ধাতার আমলে কেনা। ওগুলো তো কত

বলা সত্ত্বেও বদলাও নি, আর এই অঘটন না ঘটলে বদলাতেও না। ভালই হয়েছে, এই রবিবার শহর থেকে এক জোড়া ভাল দেখে জুতো কিনে আনগে। চমৎকার যুক্তি! ইহার পরও যদি এই পরম উপকারের জন্য টমের প্রতি আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হইয়া না উঠে তো আমাকে অমানুষ বলিতে হইবে। কহিলাম, স্কুলে যাব কি ক'রে? গৃহিণী অবলীলাক্রমে জবাব দিলেন, কেন? চটিজুতো প'রে। পায়ে চটিজুতা, হাতে মোটা লাঠি, ইহারা আমাকে গদাই পণ্ডিত সাজাইবে নাকি? গদাইয়ের অবশ্য এক পায়ে গোদ; কিন্তু যে দুঃসময় পড়িয়াছে, আমারও গোদ গজাইতে কতক্ষণ! কহিলাম, জুতো কিনতে যে শহরে যেতে বলছ, তাও কি চটিজুতো প'রেই যাব? গৃহিণী বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন, ওমা! তাতে কি দোষ? কত লোক যে খালি পায়ে যাওয়া-আসা করে। তোমার আবার যত ঢং।—বলিয়া সমস্ত সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন সভৃত্য চটিজুতা ফটর ফটর করিতে করিতে হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা লইয়া স্কুলে গেলাম; স্কুল হইতে ফিরিলামও। ফিরিবার সময়ে বাড়ির কিছু দূরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। অদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া ভুলো না? তাহার সামনে দাঁড়াইয়া, বার কয়েক চোখ মুছিয়া দেখিলাম, বেবি। গৃহিণীর কড়া পাহারা এড়াইয়া, টমকে ফাঁকি দিয়া বেবি একেবারে বেড়া ডিঙাইয়া বাহিরে আসিল কিরূপে? দুইজনে মুখামুখি দাঁড়াইয়া কি গভীর পরামর্শ! কি মতলব উহাদের? বীরপদে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। বেবি, হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র, বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া পলাইয়া, বেড়া ডিঙাইয়া, বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ভুলোও পিছন ফিরিয়া একবার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। ভুলো কি আমাকে চিনিতে পারিল না? খুব সম্ভব মর্ত্ত্যমানবকে চিনিবার মত মনের অবস্থা এখনও তাহার হয় নাই। বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বেবি টমের সঙ্গে খেলা করিতেছে। সে যে এইমাত্র বাহিরে গিয়া কি কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বিন্দুমাত্র বুঝিবার জো নাই।

কিন্তু 'পরিস্থিতি' খুব জটিল হইয়া উঠিতেছে নাকি? বেবি টমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতেছে, অথচ ভুলোকেও হাতছাড়া করিতে চাহিতেছে না। অবশ্য, ইহার ফলে ভুলোর মেজাজের কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কত দিনের জন্য? আসল ব্যাপার কাহারও কাছে চাপা থাকিবে না। তখন বাহিরে ভুলো আবার মার-মূর্ত্তি হইয়া উঠিবে এবং ভিতরে টম বিলাতী মতে কি করিবে জানা নাই। শুনিয়াছি, বিলাতের সুসভ্য মানব-সমাজে একই নারী স্ত্রী ও বান্ধবী রূপে একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে পারে, তাহাতে কোন পক্ষে কোন আপত্তি উঠে না। হয়তো বিলাতী সারমেয়-সমাজেও ঐ প্রথাই চলিয়া থাকে। (আমাদের দেশে প্রগতিশীল সমাজেও নাকি এই প্রথা শুনিতে পাই।) আর চাপা থাকিলেও, আমি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ হইয়া আমার গৃহের মধ্যে কিছুতেই এই অনাচার চলিতে দিব না। কাজেই বেবি যে দুই পক্ষে ভর দিয়া প্রণয়-সরোবরে সুখে সাঁতার দিতে থাকিবে, তাহা হইবে না। তাহাকে এক পক্ষ বর্জ্জন করিতেই হইবে।

সেই রাত্রি শান্তিতেই কাটিল। কিন্তু সকাল হইতেই সোরগোল উঠিল। গৃহিণী ক্রন্দনের স্বরে চীৎকার করিতেছেন, কি কাণ্ড করেছিস বল দেখি? রাত্রে শোবার আগে ভাল ক'রে দেখলি না কেন? কাছেই শুয়ে থেকেও ঘুম ভাঙল না! এমন ঘুম! তোর যে ঘরে ডাকাত পড়লেও ঘুম ভাঙবে না রে হতভাগা! হায় হায়! বেচারা কুকুরের পেটে গেল শেষে! পাঁচু উচ্চ কণ্ঠে আত্মদোষস্খালনের চেষ্টা করিতেছে, আমি কি করব? ভাল ক'রেই তো দরজা বন্ধ করেছিলাম। মুখ দিয়ে খুলেছে। ঘুম ভাঙবে কি ক'রে? চেঁচাতে কি সময় দিয়েছে? একেবারে খপ ক'রে ধ'রে ঘাড় মটকে দিয়েছে। বিলেতী কুকুর যে! কত বুদ্ধি! কত কায়দা! ছেলেমেয়েরাও চীৎকার করিয়া কেহ রোষ, কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

ব্যাপারটি এই—গৃহিণী মাস কয়েক আগে পিতৃগৃহ হইতে একটি ময়নাপাখী আনিয়াছিলেন। সেটিকে নিজহাতে খাওয়াইতেন, নাওয়াইতেন, এবং মাঝে মাঝে তাহাকে গালে ও বুকে চাপিয়া ধরিয়া

এমনই আদর করিতেন যে, দেখিয়া আমারও হিংসা হইত। পাখীটি নানা রকম কথা বলিতে শিখিয়াছিল, যথা—ময়না কই? মাগো! ও বাবা! ববি! বেবি! পাঁচু রে! রাধাকৃষ্ণ। রামরাম। ইত্যাদি। অর্থাৎ পাখীটির সেবা-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন, শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছিল; কিন্তু একটি ত্রুটি ছিল, খাঁচাটি পোক্ত ছিল না, বিশেষ করিয়া খাঁচার দরজাটি; একটু নড়িলেই খুলিয়া যাইত। অবশ্য ইহাতে কোন ভয়ের কারণ ছিল না। কারণ পাখীটি এমনই পোষ মানিয়াছিল যে, দরজা খোলা পাইলেও পলায়ন করিত না। কিন্তু বহিঃশত্রুর কথা আমরা কেহ ভাবিয়া দেখি নাই। ভাবিবার কথাও নয়। কারণ আমাদের বাড়িতে বিড়ালের বালাই ছিল না। একমাত্র শত্রুজাতীয় বেবি, সেও অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। কাজেই ময়নাটির সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলাম।

সরজমিনে হাজির হইতেই পত্নী সজল চক্ষে কহিলেন, শুনেছ?

শুনিয়াছি, তবু উৎকণ্ঠিত মুখে কহিলাম, কি?

ময়নাটাকে মেরে দিয়েছে।

পাঁচকড়ির দিকে তাকাইয়া কড়া গলায় কহিলাম, পেঁচো বুঝি?

পাঁচু প্রতিবাদ করিল, সে কি জামাইবাবু? আমি—

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন, পাগল নাকি! ও কেন হবে?

কহিলাম, তবে? বেবি নাকি?

অদূরে ছেলেমেয়েদের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বেবি নিরীহের মত মিটমিট করিয়া আমাদের দিকে তাকাইতেছিল। পত্নী তাহার দিকে একবার তাকাইয়া কহিলেন, না, ওর এ কাজ নয়।

তবে?

মুখ ও চক্ষুর ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন, ঐ পোড়ামুখো। অর্থাৎ টম, যে এসব হৈচৈয়ে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া দূরে দেওয়ালের ধারে লেজ নাড়িতে নাড়িতে ঘাসের উপর কি শুঁকিয়া বেড়াইতেছিল।

কহিলাম, বিলিতী কুকুর কিনা! তা' ছাড়া বড়লোকের কুকুর, মাংস খাওয়া অভ্যেস।

গৃহিণী কটাক্ষ-ক্ষেপ করিলেন। আমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলাম, পাখীটা কোথায়? চল তো, দেখি একবার।

গৃহিণী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হায় হায়! তার কি কিছু আছে! পোড়ামুখো ব'সে ব'সে সারারাত ধ'রে সব গিলেছে।

ছেলেপিলে সমভিব্যাহারে দারোগাবাবুর মত অকুস্থানে হাজির হইয়া দেখিলাম, গৃহিণী মিথ্যা বলেন নাই; ঠোঁট, পায়ের পাতা, ডানা, পালক ও কয়েকখণ্ড অস্থি ছাড়া ময়নাটির পার্থিব দেহের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই।

গৃহিণী শোকার্ত্ত কণ্ঠে পাঁচুকে কহিলেন, সবগুলো জড় ক'রে তুলসী-তলায় পুঁতে দে। এ জন্মটা তো আমাদের হাতে প'ড়ে এমনই ক'রে গেল, পরজন্মটাতে যেন একটা গতি হয়।

কহিলাম, কিছু করতে হবে না। মোক্ষলাভ হয়ে গেছে ওর, বিলিতীর পেটে গেছে যখন।

সেদিন পক্ষীবিরহে পত্নী রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন না। কাজেই যা হোক কিছু মুখে দিয়া স্কুলে গেলাম। ফিরিতেই দেখিলাম, বাগানের বেড়া হইতে কিছু দূরে ভুলো দাঁড়াইয়া; বাগানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া টম; আর, বেবি বেড়া ডিঙাইয়া মাকুর মত দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইল, বেবি টমকে বেড়ার বাহিরে টানিয়া আনিয়া ভুলোর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু টম তাহা পছন্দ করিতেছে না। ভয়ে নয় নিশ্চয়ই, কারণ বিলাতী ভয় বলিয়া কোন বস্তু সংসারে আছে বলিয়া জানে না, খুব সম্ভব দেশীর প্রতি বিলাতীর স্বাভাবিক ঘৃণায়। যাই হোক, বেবির মতলব কি? সে কি দেশী ও বিলাতীর মিলন সাধন করিয়া অঘটন ঘটাইতে চায়, না দুইজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কে ভাল, কে মন্দ যাচাই করিয়া লইতে চায়?

বাড়িতে ফিরিয়া পত্নীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁগো! টমকে খেতে-টেতে দিয়েছ?

পত্নী বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, ভালবাসা যে উথলে উঠছে দেখছি।

কহিলাম, ভালবাসা আবার কি? হবু কুটুম। তার ওপর বিলিতী। দিশী হ'লেও বা না খেলেও চলত।

পত্নী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, বাবা রে বাবা! একদিন একটু ত্রুটি হবার জো নেই! খোঁটা দিয়ে দিয়া পোটা বের ক'রে দেয়! ঝাঁটা মার মেয়েমানুষের মুখে, কেন যে বেঁচে থাকা!

রাত্রে শুইবার আগে পাঁচুকে ডাকিয়া কহিলাম, আমার বাকি জুতোটা টমের কাছে দিয়ে আয়। না হ'লে রাত্রে আবার কোথায় কি অনর্থ বাধিয়ে বসবে।

শেষরাত্রে বেবির চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল; এমন কি গৃহিণীরও। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, শুনছ?

কহিলাম, কি?

বেবি এত চেঁচাচ্ছে কেন?

কি ক'রে জানব? ডেকে জিজ্ঞেস কর।

ঘরে চোর ঢোকে নি তো?

স্কুল-মাস্টারের ঘরে আবার চোর ঢোকে?

চোর জমা-খরচ খতিয়ে কারও বাড়ি ঢোকে নাকি?

বেবির চীৎকার চলিতেই লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে টমের আর্ত্তনাদ।

গৃহিণী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, নিশ্চয় চোর, টমকে মারছে, এর পর বেবিকে মেরে সব চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে, তুমি ওঠ দেখি।

কহিলাম, পাঁচুকে ডাক দাও না।

গৃহিণী ধমক দিয়া কহিলেন, পাঁচু কি করবে? ছেলেমানুষ! ওঠ দেখি! বেরিয়ে দেখ, কি ব্যাপার! পুরুষমানুষ—শুয়ে থাকতে লজ্জা করছে না?

উঠিতে হইল। কিন্তু শুধু-হাতে বাহির হওয়া কি ঠিক? অস্ত্রের মধ্যে তো আছে একটি ফাউন্টেন-পেন ও একটি পেন্সিল-কাটা ছুরি। কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইবে কি? পত্নী তাড়া দিয়া কহিলেন, ভয় কি? বেরিয়ে পড়, তোমাকে দেখলেই চোর হয়তো পালাবে। মনে মনে কহিলাম, হয়তো। যদি না পালায়! বেবির চীৎকার ও টমের আর্ত্তনাদ

ক্রমে বাড়িতে লাগিল ; গৃহিণী জোর তাড়া দিলেন, যাও না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

রাজপুত-রমণীরা স্বামীদের স্বহস্তে রণসজ্জায় সাজাইয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমরা গদ্গদ হইয়া উঠি। কিন্তু আমার পত্নীর বীরত্ব কম কিসে ? যে রমণী একটিমাত্র স্বামীকে এমন অবিচলিত চিত্তে চোরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে, তাহার বীরত্ব-কাহিনী লিখিবার জন্য লেখক কোথায় ?

সশব্দে কাসিলাম, গলা ঝাড়িলাম, খিল খুলিলাম, যে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেচক চোরের এই সব শব্দ শুনিয়া পলায়ন করা উচিত। গৃহিণীর তাড়া সত্ত্বেও একটু অপেক্ষা করিলাম ; এক মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়া মনুষ্যদেহের পক্ষে সম্ভব নহে ; এতখানি উঠান পার হইয়া দেওয়াল ডিঙাইতে হইবে, একটু সময় দেওয়াই উচিত। গৃহিণী আবার তাড়া দিলেন। হড়াস করিয়া দরজা খুলিয়া এক পা বারান্দায় বাড়াইয়া উঁকি মারিলাম। কৃষ্ণা-পঞ্চমীর শেষরাত্রি, চারিদিকে জ্যোৎস্না ফুটফুট করিতেছে। পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম, কেহ কোথাও নাই। অতএব, 'কে রে ! কে রে !' শব্দে বাহিরে আসিলাম। ভাঁড়ার-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বেবি চীৎকার করিতেছিল ; আমাকে দেখিয়া দরজায় আঁচড় দিতে লাগিল। চোর কি ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া আছে নাকি ? ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দেখিলাম, জানালার গরাদ অভগ্ন দরজায় তালা ঝুলিতেছে। তবে ? ভিতর হইতে টমের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। টম ভিতরে ঢুকিয়াছে নাকি ? নিশ্চয়। ভাঁড়ার-ঘরের জানালাটি মেঝের খুব কাছে, এবং গরাদগুলির মধ্যে এত ফাঁক যে, জানালা খোলা থাকিলে কুকুর ও বিড়াল অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকিতে পারে। অন্য দিন গৃহিণী স্বহস্তে জানালা বন্ধ করেন ; কাল বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাক, ভাঁড়ার-ঘর-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

পাঁচু ইতিমধ্যে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। গৃহিণীও আসিলেন এবং জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ও মাগো ! আমার সর্ব্বস্ব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছে। ও পাঁচু !

দরজাটা খুলে হতভাগাকে বের কর। আমার ঠাকুর কেমন আছেন আগে দেখি।

এই ঘরে কয়েকটি দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পট একটি ভাঙা জলচৌকির উপরে বহুদিন ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন। গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। এই পাইকারী প্রণাম ছাড়া ইঁহাদের জন্য আর কোন নিত্য-সেবার বন্দোবস্ত নাই। তবু হয়তো ভবিষ্যতে সেবিকার সুমতির উদয় হইয়া বরাদ্দ-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, এই আশায় দেবতাগুলি জীবন-বীমার দালালদিগকেও হার মানাইয়া অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঁচু দরজা খুলিতেই দেখা গেল, চাল ডাল মসলা ইত্যাদির হাঁড়ি-গুলি মেঝেতে গড়াইতেছে ; তেলের ও ঘিয়ের ভাঁড় উল্টাইয়া গিয়া কতকটা মেঝে পিছল হইয়া উঠিয়াছে ; জলের কলসী ভাঙিয়া গিয়া সারা মেঝের উপর বান বহিতেছে ; দেবতাবৃন্দ সিংহাসনচ্যুত হইয়া জলশায়ী হইয়াছেন, এবং এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রলয়ঙ্কর মহাকালের মত টম, এক পা তুলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে লাফাইতেছে। গৃহিণী, দেবতাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হায় হায় ! কি করেছে দেখ ! আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, জলে ভিজিয়া পটগুলি ন্যাৎনেতে ও মূর্ত্তিগুলি স্যাঁৎসেঁতে হইয়া উঠিয়াছে ; রং চটিয়াছে, এবং এ অনাচারী ম্লেচ্ছ ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে যা কাণ্ড করিয়াছে, তাহা দেখিলে যে কোন হিন্দু-মহাসভার সভ্যের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। গৃহিণী টমের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মর মর, মরণ নেই তোর ? জবাব না দিয়া টম চীৎকার করিতেই লাগিল। গৃহিণী সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমি টমের অবিরাম তাণ্ডবনৃত্যের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কাছে যাইতেই দেখিতে পাইলাম, টম যে পাটি তুলিয়া আছে, সেই পায়ে একটি জাঁতিকল আটকাইয়া রহিয়াছে। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। গৃহিণী ইঁদুর ধরিবার জন্য ভাঁড়ার-ঘরের এক পাশে জাঁতিকল পাতিয়া রাখেন। জানালা খোলা থাকায় টম নিজেই অথবা

কাহারও কুপরামর্শে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া জাতিকলে পা দিয়া এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে।

স্ত্রীকে বুঝাইলাম, বৃথা আক্ষেপে কালক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, উদ্ধার-কার্য্য সত্বর আরম্ভ করা উচিত। গৃহিণী বুঝিলেন। দেবতাগুলিকে একে একে বাহিরে আনিয়া প্রথমে গোবরমিশ্রিত জলে, পরে কূপ হইতে সদ্যোত্তলিত বিশুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া তুলসীতলায় নামাইয়া রাখা হইল। কাল গঙ্গাজল ছিটাইয়া আবার ঘরে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে। পাঁচু ভাঁড়ার-ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল। আমি টমের পাটিকে মুক্তিদান করিয়া চুন-হরিদ্রার প্রলেপের ব্যবস্থা করিলাম।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময়ে শুনিতে পাইলাম, গৃহিণী পাঁচুকে হাঁক দিয়া কহিতেছেন, পোড়ামুখোকে আজ আর ঘরে ঢুকতে দিস নি। বাগানেই থাক। সন্ধ্যের পর আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব, আর সেই দেমাকী মাগীকে বেশ ক'রে দুকথা শুনিয়ে আসব।

বুঝিলাম, আজ টম-বিদায় ও বন্ধুবিচ্ছেদ—দুইয়েরই ব্যবস্থা হইবে।

সেদিন শনিবার; বেলা দুইটার সময়ে বাড়ি ফিরিতেই দেখিলাম, বাড়ির কাছে একটা প'ড়ো জমিতে পাড়ার ছেলেদের ভিড় জমিয়াছে। বাজি হইতেছে নাকি? আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইলাম, বাজি যুদ্ধ। ভুলো ও টমের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে। ভুলোর চেহারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে; লেজ খাড়া; চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুখ বীভৎস। টমও যথাসম্ভব লেজ খাড়া করিয়া, দাঁত বাহির করিয়া এবং হাঁকডাক করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মুখে ও চোখে ভীতি ও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘিরিয়া ভুলোর অর্দ্ধ ডজন অনুচর উর্দ্ধ মুখে ও উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ভুলোকে উৎসাহদান করিতেছে। রণস্থলের ওপাশে কিছু দূরে একটা ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া বেবি উৎসুক নয়নে যুদ্ধের গতি ও ফলাফল নিরীক্ষণ করিতেছে; এপাশে দাঁড়াইয়া পাড়ার ছেলেরা নির্ব্বিচারে ঢিল ছুঁড়িয়া দুই পক্ষকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

টমকে এই বিপদে ফেলিয়াছে কে? সে স্বেচ্ছায় ভুলোর সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গৃহিণী ও পাঁচুর অনবধানতার সুযোগ

লইয়া বেবিই হয়তো তাহাকে ভুলাইয়া বাহিরে আনিয়াছে; তারপর দলবল সমেত ভুলোর সামনে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে। কিন্তু টমকে উদ্ধার করিব কি করিয়া? ভুলোর ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, সে যে কোন মুহূর্ত্তে টমের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। এখনও যে দেয় নাই, সে টম নেহাৎ বিলাতী বলিয়াই। এ অবস্থায় মধ্যস্থতা করিতে গেলে তাহার সমস্ত রাগটা হয়তো আমার ঘাড়েই পড়িয়া যাইবে। অতএব টমকে তাহার বিলাতী বুদ্ধি ও বাহুবলের উপর ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে দাঁড়াইলাম।

হঠাৎ ছেলেদের একটা ঢিল ভুলোর মুখে লাগিতেই সে চক্ষু বুজিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। এই সুযোগেই টম এক লম্ফে সারমেয়ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর শীর্ণ লেজটিকে পিছনের দুই পায়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া, সদ্য-আহত পায়ের যন্ত্রণাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভুলো পলকমাত্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল; তারপর একবার হুঙ্কার ছাড়িয়া, দ্রুতগতিতে টমের পশ্চাদ্ধাবন করিল; ভুলোর অনুচরবর্গ ও পাড়ার ছেলেরা কলরব করিতে করিতে তাহাদের পাছু পাছু ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে টম ও ভুলো দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং ভুলো যে টমের নাগাল কিছুতেই পাইবে না, সে বিষয়ে আমার তিলমাত্র সংশয় রহিল না।

আমি অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেদের কলরব কানে আসিতে লাগিল। তাহারা টমকে দুয়ো দিতেছে। দেশী ছেলে কিনা! স্বল্পমাত্র সুযোগ ও সময় পাইয়া টম যেরূপ কৌশল ও নিপুণতার সহিত বিপদজাল কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে, বিলাত হইলে ধন্য-ধন্য পড়িয়া যাইত, খবরের কাগজে টমের ছবি বাহির হইত এবং বেতার-বার্ত্তায় টমের স্তুতিবাদ শুনিতে শুনিতে দেশ-বিদেশের লোক অস্থির হইয়া উঠিত। তবে কি পলায়ন-বিদ্যাটি আমাদের খাঁটি স্বদেশী জিনিস নয়? বিলাতী সভ্যতা ও তাহার আনুষঙ্গিক বিদ্যা ও অপবিদ্যাগুলির সঙ্গে এটিরও এদেশে আমদানি হইয়াছে? অসম্ভব নয়। কারণ

পলায়ন-বিদ্যাটিকে মুরগী-ভক্ষণের মত আমরা সকলেই, কেহ গোপনে কেহ প্রকাশ্যে, অভ্যাস করিয়াছি ও করিতেছি বটে, কিন্তু এখনও নিজস্ব করিয়া তুলিতে পারি নাই। বেকায়দার পড়িলেই পলায়ন করি, কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি না। কাহাকেও পলাইতে দেখিলে তো নিন্দায় রীতিমত পঞ্চমুখ হইয়া উঠি। কাজেই বিদেশীরা; বিশেষ করিয়া ইংরেজেরা নিতান্ত স্নেহবশে যখন আমাদিগকে পলায়নপটু বলিয়া বাহবা দেন, তখন আমরা ঘাড় হেঁট করিয়া তাহা মাথা পাতিয়া লই বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা এখনও এই প্রশংসা পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি নাই।

বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলাম, বেবি নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছে; টমের বিচ্ছেদ তাহাকে কিছুমাত্র কাবু করে নাই।

মাস দুই পরে একদিন সকালে ববি আসিয়া কহিল, বাবা, দেখবে এস।

প্রশ্ন করিলাম, কি?

তুমি এস না!—বলিয়া হাত ধরিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। অচিরে দেখিতে পাইলাম, গোয়াল-ঘরের এক কোণে মাটিতে বিছানো খড়ের উপরে চারিটি কুকুরের ছানা, দুটি ভুলোর মত কালো কুচকুচে, দুটি বেবির মত সাদা ধবধবে। সবগুলিরই বেবির মত লটকানো কান, গায়ে বড় বড় তুলোর মত নরম চুল।

আমাকে দেখিয়াই বেবি পায়ের কাছে আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, এবং আমার দুই পায়ের উপর মুখ ঘষিতে ঘষিতে মৃদু অস্ফুট শব্দ করিয়া ভক্তি, ভালবাসা, ও বোধ করি কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। আমি সস্নেহে একবার তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলাম।

শ্রীঅমলা দেবী

হিমালয়ের পূজারী

হিমালয়ের এক অঞ্চল। হট হট, সর সর, সি সি, হি হি। ব্যাস নদীর উচ্ছ্বাস, আদর আর হাসি। তার লুকোচুরি আর অভিমান ভরা বঙ্কিম গতি। কোথাও বা বুক ফুলিয়ে লাফাতে লাফাতে ফেনিল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছে। ওপর থেকে দেখায় তলোয়ারের মত লিকলিকে, চকচকে আর সুন্দর।

দুদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। মাথায় বরফের সাদা পাগড়ি। শিখরে হীরের চেয়েও চমক। বুকের ওপর গলা তুষার সাপের মত এঁকে বেঁকে নীচের দিকে চলেছে। সব মৌন। সব শান্ত।

আমি এগুলাম। 'নগগর' গ্রামের প্রান্ত। একটা বাগান। আমি ভেতরে ঢুকলাম।

হেল!—হাত উঁচু ক'রে ওপর থেকে কেউ ডাকছে। আমার দৃষ্টি গেল পাহাড়ের চূড়োয়।

হেল!—আবার আওয়াজ এল। এবার তাকালাম সামনে।

সৌন্দর্য্যের ধ্যানে মগ্ন চোখ। প্রশস্ত ললাট—সাংসারিকতার ওপরে পৌঁছে গেছে। সদ্য-ঝরা তুষারের মত বুক পর্য্যন্ত দাড়ি। পূজারীর মতই চেহারা, আদল উত্তর-এশিয়ার। নিজের ঢঙের পোশাক। বয়সে বৃদ্ধ হ'লেও চালচলনে অদ্ভুত স্ফূর্ত্তি। প্রত্যেক লোমকূপ থেকে স্বাভাবিক নির্ম্মল রাশিয়ান হৃদয় যেন ঝ'রে পড়ছে।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোরিক। চিত্রকর, কবি, দার্শনিক। কিন্তু সকলের ওপর হিমালয়ের পূজারী।

তিনি আমাকে ডাকছিলেন।

জ্‌দ্রাস্তুই।—আমার মুখ থেকে বেরুল।

জ্‌দ্রাস্তুই, জ্‌দ্রাস্তুই।—বলতে বলতে তিনি হাত বাড়িয়ে আমাকে বসালেন সোফার ওপর। নিজে একটা কুর্সির ওপর ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে, তুমি তো রাশিয়ান বলছ, শিখলে কোথায়?

দেতুশ্‌দা গর্কির কাছে।

সে তো আমার বন্ধু ছিল।

তবে আপনিও আমার গুরু।

আমরা পরিচিত হয়ে গেলাম। 'চেরি'র শরবৎ আনালেন। এক গ্লাস আমায় দিলেন, আর এক গ্লাস তুলতে তুলতে বললেন, তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন নিজের স্টুডিওতে। ক্যান্‌ভাসের ওপর একটা ছবি ছিল। মনে হচ্ছিল, এইমাত্র শেষ টান দেওয়া হয়েছে। আমরা কয়েক পা পিছু হ'টে দেখতে লাগলাম।

পাহাড়—মানুষ—জানোয়ার।—তিনি গুনগুন করতে লাগলেন, যেন জপ করছেন। ভয় নেই; কেউ কাউকে ভয় করে না। উঁচু পাহাড়, কত মানুষ, এত পশু, আনিয়ে রয়িস্যা (আর ভয় নেই)।

আর এই দেখ।—আর একটা ছবির দিকে দেখিয়ে বললেন, কজন মানুষ ব'সে আছে। পাহাড়ে আগুন লেগেছে। কি হ'ল, সকলেই মুখ বের ক'রে তাকাচ্ছে।

আর এইটা তিব্বতের, তৃতীয় চিত্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, 'সম্বলের সংবাদ'। সূর্য্যোদয়ের রং। কোন এক অজ্ঞাত দূত পাহাড়ের ওপর থেকে বিহারে একটা তীর পাঠাচ্ছে। দেখ দেখ, সূর্য্যোদয়ের কিরণ সেই তীরকে করছে স্পর্শ, সেই তীরে আটকে আছে একটা সংবাদ।

আর এই ছবিতে দেখ, এখানে সংবাদ পৌঁছে গেছে। পূজারী সেটা খুলে পড়ছে।

কিছুক্ষণ ধ্যাননেত্রে ছবিটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার কাছে আমার ছবি আছে?

না তো।

তবে নাও। এক এক ক'রে নিজের চিত্রের ফোটো দিতে লাগলেন, এটা নাও, এইটা নাও, এইটাও। আর এই দেখ, এটা অগ্নিযোগ, আর—

আপনি তো শুধু আমাকে হিমালয়ের ছবিই দিচ্ছেন, রুশের ছবি কি আপনার কাছে নেই?

আছে বইকি, এই নাও। লেল আর তুষার-কন্যা।

এটা তো রাধাকৃষ্ণ মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, রাশিয়াতে লেল আর তুষার-কন্যা, ভারতীয় কৃষ্ণরাধার মতই। আর রাশিয়া আর ভারতের সংস্কৃতি তো একই। রাশিয়া তো এশিয়ার মধ্যেই। কে বললে যে, উরল পাহাড় এশিয়ার সীমা? ভুল। ককেশীয় তো এশিয়াতেই। তাতার? তাও। কাজানও তো? নিশ্চয়ই। নওগোরোদ এশিয়াতেই আছে। তবে মস্কো আর লেনিনগ্রাদ কেন নয়? আমাদের দিল এক, আমাদের সংস্কৃতি এক।

খাবার জন্যে 'মাতুস্কা' (মাদাম রোরিক) ডাকতে এলেন।

আমার দুই হাত ধ'রে তিনি বললেন, আগে খেতে এস তো।

রাশিয়ান প্রথানুসারে আমরা মোমবাতি জ্বালিয়ে খেতে বসলাম।

আচ্ছা, তুমি কখনও রাশিয়ান পরিবারে থেকেছ?—মাতুস্কা জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ।

সেখানে কেমন ক'রে গেলে ?

একটা রেল-স্টেশনে সব পয়সা চুরি হয়ে গেছল। আমায় আশ্রয় দিয়েছিল একটি রাশিয়ান পরিবার।

টাকা চুরি গেল তো পুলিসকে খবর দিলে না ?

দিলাম বইকি।

পুলিস ভায়া কি করলে ?

সে বলল, চুরি হয়েছে হয়েছে, তাতে আর ভাববার কি আছে, এগিয়ে দেখ।

তারপর তোমাকে রাশিয়ান পরিবার খেতে দিলে কাস্ত, কার্তোস্কা, কেসিল (রাশিয়ান খাবার), আর ওরা তোমাকে রাশিয়ান অপেরাও দেখালে ?

হ্যাঁ, ওয়েগিন, অনেগিন, পিকোওয়ায়া দামা, সাধকো, আরও অনেক।

আর কি সুন্দর! আমাদের পিটার্সবুর্গের মারিন্স্কী থিয়েটারের মত অপেরা আর কোথাও হয় না।

এখনও ?

হ্যাঁ, এখনও। সে কলা আমাদের কাছ থেকে কে নিয়ে নেবে ?

বর্ত্তমান রাশিয়ার সম্বন্ধে আপনার কি মত ?—আমি রোরিককে জিজ্ঞাসা করলাম, অনেকে বলে, শিল্পী সেখানে তার প্রতিভার বিকাশ করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি না।—তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন। শিল্পী তো চিরকালই শিল্পী, তা সে যে আবেষ্টনেই থাক। জেলে থাকল থাকলই। সেখানে থেকেও যদি শিল্পী না থাকে, তবে আর কি শিল্পী! আমাকে

তুমি যে কোন অবস্থাতেই ফেল না কেন, আমি যেমন আছি তেমনই থাকব, যা করছি তাই করব।

আর সংস্কৃতির বিকাশের দৃষ্টিতে আপনি বর্ত্তমান রাশিয়ান সিদ্ধান্তগুলি কি ভাবে নেন ?

সংস্কৃতি থাকে দেশের জনতার রক্তের সঙ্গে মিশে, তার প্রত্যেক শিরায় শিরায় এর প্রবাহ। এমন জিনিস কি কখনও নষ্ট হতে পারে ? যদি তা নষ্ট হয়ে যেত তো রাশিয়ানরা জীবিত থাকত কি ক'রে ? বিপ্লব সেখানে করেছে কি ? নিয়ে এসেছে পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের আবশ্যক ছিল বিকাশের জন্যে। সংস্কৃতিতে নতুন জীবন আনার জন্যে এর আসা অনিবার্য্য ছিল। আমাদের এতে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এই পরিবর্ত্তনকে আমাদের স্বাগত করতে হবে।

রাশিয়ার জীবনে যে নতুন শক্তি এসে ধাক্কা মারছে, তাকে অনুভব করতে পারে না শুধু অন্ধ। শিল্প সকলের জন্যে, রাশিয়া চেষ্টা করছে তাকে সার্ব্বজনীন করবার জন্যে। আমাদের শুধু স্কুল, মিউজিয়াম, আর পাঠাগারকে সাজালেই চলবে না—জেলকেও সাজাতে হবে, তাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে। তখন সংসারে আর জেল ব'লে কোন জিনিস থাকবে না।

রাশিয়ার কাজ এই ধারাতেই চলছে। আর রাশিয়ান জনগণ তো চিরকালই শিল্পের পূজারী। বহু প্রাচীন কাল থেকেই তার জীবন শিল্পের বাস্তব সৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত। আজ এই নতুন যুগে তার কলা-উপাসনার ধারা নতুন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার সৌন্দর্য্য-উপাসনার প্রবৃত্তি যেমন ছিল তেমনই আছে। রাশিয়ান জনগণের এই শিল্প ও সৌন্দর্য্য আরাধনা, বড় বড় শব্দে নয়, তার জীবনে ব্যক্ত। আমাদের তো খুশি হওয়া চাই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার বর্ত্তমান বংশধরেরা এই

শিল্পের প্রদীপ খুব উঁচুতে তুলে রেখেছে। আজ রাশিয়ানরা বুঝতে পারছে যে, শিল্প শখের জিনিস নয়, দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে দরকারী বস্তু। শিল্পেই তো জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ পায় গতি।

অনেক দিনের অনভ্যাসের ফলে তাঁর সঙ্গে রাশিয়ান বলতে আমার একটু অসুবিধে হচ্ছিল। আমি বললাম, আমি রাশিয়ান ভুলে যাচ্ছি।

এতো নিলজ্জেয়া—এ উচিত নয়। তোমাকে রাশিয়ান ভাষার অভ্যাস রাখতেই হবে। একটু দাঁড়াও। নিজের ঘরে গিয়ে তিনি নিজের লেখা এবং আরও কয়েকখানি বই নিয়ে এলেন এবং বললেন, এ তোমারই জন্যে; রাশিয়ান ভুলো না।

বইগুলোর নাম দেখে বললাম, আমার য়াস্ত্রোভ্‌স্কীর নাটক চাই। অনেক দিন আগে আমি তাঁর 'গ্রজা' (তুফান) পড়েছিলাম। তাতে যেন আমাদের ভারতীয় সমাজেরই চিত্র দেখতে পাই।

দাঁড়াও, দেখছি।

নিজের ঘর থেকে বই খুঁজতে খুঁজতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দাস্তোয়িয়েভ্‌স্কী পড়েছ?

হ্যাঁ।

আর গোগোল?

তাও পড়েছি।

এঁরা হচ্ছেন আমাদের রাশিয়ান সংস্কৃতির সত্যিকার প্রতিনিধি।

মাতুস্কাও কয়েকখানা বই নিয়ে এলেন। রোরিক নিজেই সেগুলো কাগজ দিয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বাঁধতে লাগলেন।

আমাদের এখানকার পুস্তকালয় বড় ছোট্ট।—মাতুস্কা বললেন। তুমি আমাদের কাছে পিটার্সবুর্গে এলে না কেন, অনেক বই দিতাম তোমাকে। আমরা, রাশিয়ানরা বই বড় ভালবাসি। সাধারণ

বাড়িতেও তুমি অনেক বই পাবে। প্রখ্যাত লেখকদের বই তো ঘরে ঘরেই মিলবে। আচ্ছা, তোমাকে আরও বই পরে পাঠিয়ে দোব।

আমি রওনা হবার জন্যে তৈরি হলাম। বাড়ির সকলে দরজার কাছে এলেন। একটি মেয়ে কোন কাজে ছিল ব্যস্ত। তাকে ডেকে মাতুস্কা বললেন, রালা (এই রাশিয়ার কুমারী), এদিকে আয়। তোকে সাস্কা নারানীচের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

সে মুচকি হেসে এল। আমরা শেকহ্যাণ্ড করলাম।

এ কোজাক-কন্যা, আমাদের কাছে থাকে। চেহারা দেখে চিনতে পারছ?—ওর বিশেষ পরিচয় দিতে দিতে মাতুস্কা বললেন।

আমাকে এগিয়ে দিতে বাগান পর্য্যন্ত এলেন। বিস্কুট আর চেরি দিতে দিতে বললেন, এই তোমার রাস্তার রসদ। 'নগ্‌গরে'র মাকে ভুলো না—আবার এস, নিশ্চয়ই এস।

আমি এগুলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, সব সবুজ। গিরিশৃঙ্গে কুয়াশা, তাই সেখানকার রং একটু গাঢ়। সামনে যা কিছু ছিল, সব দেখাচ্ছিল কোন মহান চিত্রকরের পটভূমি, কোন অজ্ঞাত চিত্রকর তখন তার ওপর ঘোর নীল রঙের তুলি বুলোচ্ছিল।

নীচে দেখা যায় অনেক জীব। দু একটা মানুষও দূরে দেখা যায়। তার ওধারে বরফে ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়। আমার মনে পড়ল, 'আনিয়ে বয়িস্যা'।

শ্রীসত্যনারায়ণ

পূজার ছুটি

পূজার ছুটি কেটেই গেল, ভেবেছিলাম সেদিন মনে,—
আজ মনে হয় মেশানো সে এই জীবনের সারাক্ষণে।
তিরিশটি দিন তিনশো বছর তারও যেন কত বেশি!
আমার দেশের গায়ে-লাগা দেখছি সকল দেশ বিদেশই!
কত কালের কতই লোকের কতই কথা দেখাশোনা,—
ছুটির কটি দিনে রাতে সব যেন সে মিশিয়ে বোনা!
দিন হয়েছে, রাত হয়েছে, এসেছে দিন রাতের মতই,
আবার গেছে এমন দিনও রাত ছিল যার ভাষাগতই,—
সরল কথায় মানেটি তার, ঘুম আসে নি সেদিন রাতে,—
মনের মত দুটি কথায় মনের মত লোকের সাথে!
তারপরে তাও কদিন গেছে,—হাতে আছে কটি টাকা,
বেশ গেছে দিন খেয়ে-দেয়ে, কদিন আবার হাতটি ফাঁকা!
চেয়ে চিন্তে কি আর করি, ধার করেছি এধার-ওধার,
শোধ যে কিছু না দিয়েছি এমনও নয়, কসম খোদার!
মনে ছিল ডিজ লণ্ঠন, শয্যা পাব দুগ্ধনিভ!—
আধময়লা কাঁথা বালিশ, পেলেম পিদিম নিভ-নিভ!
কিন্তু যদি এইটুকুতেই ক্ষান্ত থাকি শয্যালোভী,—
ওয়েসিসটা বাদ দিয়ে ঐ হয় বুঝানো মরু 'গোবি'!
শয্যাটি কে আলো করে, হবে কি তাও ব'লে দিতে?
খেলেন সেথায় খোকনমণি মায়ের বুকের আড়ালটিতে!
কিন্তু আবার মাঝরাত্রে হিম লেগে সেই ছেলের বুকে

বাড়ল যখন কাসির বহর শয্যা-আরাম গেছে চুকে।
তাও দেখেছি, সকালবেলায় সেই ছেলেরই মুখের হাসি,—
ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে সে ভোরের রাঙা আলোক-রাশি।
পথে-ঘাটে ফিরছে যেন তারই মুখের সে ডাকখানি,—
এই যত সব ছেলে আছে ঘর এদেরো আছে জানি!
এমনিতরো ঘরে ঘরে দিনের পরে প্রতিদিনই
ছেলেমেয়ে-বউ-ঝি ফেরে, সব চিনি আর নাইবা চিনি।
কাছেই থাকুক দূরেই থাকুক,—এক ছবি সে সবাই দেখি,—
কি তিনি সেই বড়বাবু,—কি আমি এই খাতা লেখি!
ঘরে আছে আমি ছাড়াও আরো প্রাণী দুচারজন
নেহাৎ কাছের,—মানে, যাদের মুখ চেয়ে এই উপার্জন!
তাদের নিয়ে চলতে গিয়ে প্রতিদিনের ছবি এ যে,—
নোংরাভরা আঁস্তাকুড় আর ধোয়াপোছা ঘরের মেঝে।
যেমন আছে আটপৌরে, তেমনি আছে পোশাকীও,
মন্দ আছে ভালোও আছে, তাই নিয়ে আর গোসা কি ও!
যেমন আছে কান্না শিশুর তেমনি আছে পাতার বাঁশি,—
সব নিয়ে এক পূজার মতো, সংসারে তাই দেখতে আসি।
বিদেশটাতে যতই সুখে কাটাই একা নিরিবিলি,—
তার চেয়েও ভালো লাগে বাড়ির শিশুর কিলিবিলি।
চোখের উপর দেখি অভাব, দেখি হাজার ঝগড়াঝাঁটি,
দেখি লোকে এ সংসারে ছেড়ে দেয় না ছটাক মাটি।
তবু ভাবি পূজায় এসে এসব ছেড়ে যাব কোথা,—
বাড়ি আর ঐ বড়বাড়ি সংসারটার একই কথা।
কত কি চাই, কিছু বা পাই,—চাওয়াপাওয়া যায় ছাড়িয়ে
এমন দানও অমনি মিলে মিলায় সেটা সংসারই এ!
এ সংসারে জীবন কাটে, সেটাই যেন পূজার ছুটি,—
দুটি কথা বলতে আসা, ব'লে গেলাম কথা দুটি॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ধোপদুরস্ত

স্‌সালা, হারামী, সুয়ারকা বাচ্চা—

খোট্টা ধোবা টাকার তাগাদা করিতেছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কলিকাতা শহরে, এবং বাঙালীবাবুর বাড়িতে। অন্যত্র ইহারা এতটা সাহস পায় না। আর কোন জাত এমন নির্ব্বিকার চিত্তে অপমান সহ্য করিতে পারে না।

এধারের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এবং দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। সুধীর নন্দী সঙ্গে ছিল, সে কহিল, দেখেছেন?

আমি কহিলাম, দেখতে হয়ই, চোখ যখন আছে।

সে কহিল, এর দস্তুরমত ইয়ে করা উচিত।

আমি কহিলাম, নিশ্চয়ই। একটা তীব্র প্রতিবাদ-সভা অন্তত।

ধোবা সমানে গালাগালি চালাইয়া যাইতেছে। যাহাদের লক্ষ্য করিয়া গালাগালি, তাহাদের তরফ হইতে কিন্তু এতটুকু প্রত্যুত্তর আসিতেছে না।

সুধীর কহিল, কাদের বাড়ি?

জানিতাম না। মস্তবড় বাড়ি, অনেকগুলা ফ্ল্যাট করিয়া ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়াটে ও বাসিন্দা অসংখ্য, প্রায় কেহ কাহাকেও চেনে না এমনই অবস্থা। পাশের সরু গলি দিয়া পিছনদিকের ফ্ল্যাটে যাইতে হয়, সেই গলির মুখে দাঁড়াইয়া ধোবা গালাগালি দিতেছে। পিছন দিকের বহু ফ্ল্যাটের বহু ভাড়াটের মধ্যে কে তাহার লক্ষ্য, তাহা অনুমানে বলা অসম্ভব।

কহিলাম, তা জানি না, তবে বাঙালীর বাড়ি, সন্দেহ নেই। অন্য কোন জাত হ'লে সাহস করত না।

সুধীরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কহিল, বাঙালীর বাড়িতে এসে এই ভাবে গাল দিয়ে যাবে?

কহিলাম, যাদের দিচ্ছে গাল, তারা যদি আপত্তি না করে, তুমি বলবার কে?

সুধীর কহিল, সেগুলো মানুষ, না আর কিছু? মার পেটে জন্মায় নি?

আমি কহিলাম, এখন নিশ্চয়ই মার দুধ খাওয়া দরকার হয় না। হ'লেও বোতলের মা আছে, গ্ল্যাক্‌সো, ল্যাক্‌টোজেন।

পাশের বাড়ির দোতলার একটি জানালা খুলিয়া গেল। ভদ্রলোকের বোধ হয় সহ্যশক্তি কম; না হইলে কলিকাতায় নূতন আসিয়াছেন, এখনও অভ্যাস হয় নাই। মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, এই ধোবি, গালাগাল দিচ্ছ কেন?

ধোবা এতক্ষণ নীরব শূন্যকে সম্বোধন করিতেছিল, এবার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভাঙা হিন্দী ও বাংলা মিশাইয়া কহিল, দেখিয়ে বাবুজী, কাপড় কেচে দিয়েছি, আমার টাকা দিচ্ছে না।

কেন দিচ্ছে না?

বলছে, দোব না।

বলছে, দোব না, ব্যস? আমি তো সব শুনেছি এইখান থেকে। তুমি কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছ।

গাধা ছিঁড়ে দিয়েছে বাবুজী, আমি কি করব?

কাপড়ের দাম কেটে দেবে। জামা হারিয়েছ। ওঁরা টাকা দেবেন না বলেন নি। বলেছেন, জামা খুঁজে এনে দিতে হবে, জামা দিয়ে তবে টাকা নিয়ে যাবে।

সে বাবুজী, জামা ভুলে কোথা চ'লে গিয়েছে, আমি কি ক'রে বার করব?

বেশ বলেছ! তুমি কাপড় হারাবে, ছিঁড়বে, আর লোকে খালি খালি লোকসান সইবে? জিনিস না এনে দিলে টাকাও পাবে না—ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

আলবৎ দেনে হোগা।

বেশ, আদালতে যাও, মামলা ক'রে আদায় কর টাকা। কিন্তু গালাগাল ক'র না।

ভদ্রলোক জানালা বন্ধ করিলেন। ধোবা আবার গলির দিকে মুখ ফিরাইল, অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ক্যা সালা, রূপেয়া দেগা কি নহীঁ দেগা?

সুধীর গায়ের চাদরটা খুলিয়া ফেলিল। আমার হাতে দিয়া কহিল, ধরুন তো, আমি দেখে নিই ব্যাটাকে।

আমি হাতের ঘড়িটা খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম, সেটা তাহার হাতে দিয়া কহিলাম, বরং তুমিই এইটে ধর। তোমার চেয়ে এ বিদ্যে আমি বেশি জানি।

বলিতে বলিতেই গলি হইতে দুটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল। একটি পাতলা, মাথায় বেশি নয়, বয়স ষোল-সতরো হইবে। অন্যটি দোহারা, লম্বা, বয়স বাইশ-চব্বিশ। এক রকম মুখের ছাঁচ, দেখিলেই বুঝা যায়, ভাই।

সুধীর কহিল, এদের বাড়ির নাকি?

কহিলাম, সম্ভবত। গলা চড়াইয়া ডাকিয়া কহিলাম, বেশ তো মশাই, মাকে গাল খাওয়াচ্ছেন?

ছোট ছেলেটি কহিল, এই ধোবি, গাল দিয়েছ তুমি?

ধোবা কহিল, আলবৎ দিয়েছি। আমার টাকা কেন দেবে না? সালা সুয়ারকা বাচ্চা!

ছোট ছেলেটি কহিল, খবরদার।—বলিয়া ধোবাকে একটা ঘুষি মারিল। হাতে জোর নাই, ঘুষি বিশেষ লাগিল না।

ধোবা কহিল, সালা!—বলিয়া দুই হাতে তাহার মাথায় বুকে পিঠে একপশলা কিল ও চড় বর্ষণ করিল।

সুধীর কহিল, আমি চললাম।

তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিলাম, একটু দাঁড়াও, ওরা যদি না পারে তখন যেও। মারবার প্রথম রাইট ওদের।

গলির মুখে অন্ধকারে আর একটি মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ দেখিলাম না, রাস্তার আলোকে পায়ের কাছে শাড়ির লাল পাড়ের একটু প্রান্ত চক্ষে পড়িল। মা।

ধোবা ও ছোট ছেলেটির মধ্যে ক্ষিপ্রবেগে আঘাত-বিনিময় হইতেছিল। মার খাইতেছিল ছেলেটিই বেশি, কারণ সে দুর্বল। তাহার দাদাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, এবার সে আগাইয়া আসিল।

আমি সুধীরকে কহিলাম, ওরা দুজন আছে, আমাদের বোধ হয় দরকার হবে না।

ধোবার সঙ্গীটি এতক্ষণ নীরব ছিল, সেও অগ্রসর হইল। ছোট ছেলেটি কহিল, দাদা, ও ব্যাটাকে দেখ।

দেখিলাম, মার খাইতেছে, কিন্তু ছেলেটা দমে নাই। সুধীর অস্ফুট স্বরে কহিল, সাবাস ভাই।

দাদা কিন্তু ধোবার সঙ্গীকে আগলাইল না, সোজা আসিয়া ভাইটিকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, ছি ছি, এই লোকটার সঙ্গে হাতাহাতি করছিস, ভদ্রলোক নস তুই?

ধোবার হাতের কিলচড় তখনও ভাইটির পিঠে পড়িতেছে। দাদার ঘাড়ে পিঠেও দুই একটা লাগিল। দাদা মুখ ফিরাইয়া তাহাকে কহিল, যেতে দাও ভাই, ছেলেমানুষ, বোঝে না।

বলিয়া ভাইটিকে জোর করিয়া টানিয়া সরাইয়া লইয়া গেল। সে দুই একবার নিঃশব্দে হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, তারপর হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দাদা তাহাকে টানিয়া লইয়া গলির মধ্যে

অন্তর্হিত হইয়া গেল ; তাহার শেষ কথাটা শুধু শুনিলাম, রাস্তাসুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে দেখছে, ছি ছি ছি ! হ'লি কি তুই ?

ধোবা হাঁপাইতে হাঁপাইতে গর্জ্জন ছাড়িল, রূপেয়া নহী দেগা ? স্‌সালা !

পাশের বাড়ির জানালাটা আবার খুলিয়া গেল। ভদ্রলোক মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, এই ধোবি, ক টাকা তোমার ?

আঠ রূপেয়া, বাবুজী।

কাপড় ছিঁড়েছ ক টাকার ?

সো মুঝে ক্যয়সে মালুম।

কাল সকালে এস, টাকা পাবে। আমি দোব। এখন চ'লে যাও, নইলে পুলিসে দোব তোমাকে।

ধোবা সেলাম করিয়া কহিল, জী, হজোর।

বলিয়া সঙ্গীকে লইয়া চলিয়া গেল।

আমরা দুইজনেও বাড়ি ফিরিলাম। বাকি রাত্রিটুকুর মধ্যে সুধীর নন্দী একটাও কথা কহিল না।

পরদিন সকালে সেই ফুটপাথেই কয়েকজনে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মসমস শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই বড় ছেলেটা গলি হইতে বাহির হইতেছে। পরনে খাকি শার্ট, খাকি শর্টস্, পায়ে পট্টি-বুট, হাতে ছড়ি।

জার্মানি, ইতালি ও জাপান তিন দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে, মহামান্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে। তাহাদের হাত হইতে বৃটিশ রাজের মর্য্যাদা, ভারতমাতার সম্ভ্রম সে রক্ষা করিবে। প্যারেড-গ্রাউণ্ডে তাহারই মহড়া দিতে যাইতেছে।

নূতন জুতার মসমস ধ্বনি ও নূতন সজ্জার গর্ব্বের হিল্লোল বাতাসে তুলিয়া ছেলেটা শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। তাহার দিকে তাকাইয়া সুধীর নন্দী দাঁতে দাঁত পিষিয়া কহিল, সুয়ারকা বাচ্চা।

"সম্বুদ্ধ"

মনঃসমীক্ষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বপ্ন

স্বপ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। অনেক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন, শারীরতত্ত্বের (Physiology) দ্বারা স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, তাঁহাদের মতে স্বপ্ন সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারই শরীরের বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। একজন তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় নিদ্রা যাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, প্রখর রৌদ্রে সাহারার উষ্ণ মরুভূমিতে জলান্বেষণে তিনি ছুটাছুটি করিতেছেন। শরীরের আভ্যন্তরীণ কোন যন্ত্রের অসুখে ভুগিলে এমন সব স্বপ্ন দেখা যায়, যেগুলির সহিত রোগাক্রান্ত যন্ত্রটির কোন না কোন যোগাযোগ আছে। যেমন হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন এমন এক ব্যক্তি অনেক সময় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, কেহ যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, আর তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারিতেছেন না। কেহ স্বপ্ন দেখিলেন, দস্যু আসিয়া তাঁহার বাড়ি লুণ্ঠন করিতেছে, আর তিনি প্রাণপণে তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, চেষ্টার ফলে তাঁহার ডান হাতটি দস্যুর অস্ত্রে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং তিনি ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ডান হাতটি সত্যই কাটা গিয়াছে কি না ? দেখিলেন যে, হাতের কিছুই হয় নাই, তবে বিশেষ অবস্থায় শুইবার জন্য রক্ত-চলাচলের স্বাভাবিক ধারা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায়, ডান হাতটি একেবারে

অবশ হইয়া গিয়াছে, এমন কি চিমটি কাটিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ ইঁদুরে ঘট উল্টাইয়া শব্দ করিয়া গেল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, চীনদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং আমার চতুর্দ্দিকে কামানের ভীষণ আওয়াজ হইতেছে। নিদ্রাকালে চক্ষুর সম্মুখে আলো জ্বালা থাকিলে, বাড়িতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। এই ধরনের স্বপ্নাবলীর উপর নির্ভর করিয়া শারীরতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শারীরিক প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ অঙ্গবিশেষের স্বাস্থ্য, দেহের অবস্থিতি বা নিদ্রাকালে বাহ্যিক কোন ঘটনার দরুন শরীরের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনাই স্বপ্ন দেখার মূল কারণ।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের এই মত অনুসরণ করিলে যে অনেক স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা অবশ্য খুবই সত্য। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বপ্নব্যাখ্যার সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে এই মত গ্রহণ করা যায় না। সুহাসচন্দ্র সেদিন স্বপ্ন দেখিল, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ পৃথিবীতে কি করিয়া চিরশান্তি আনয়ন করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য তাহার ঘরে আসিয়াছেন। সুহাসের স্বাস্থ্য বেশ ভাল, তাহার শুইবার ঘরে সম্রাটের কোন ছবিই নাই। প্রবাসী এক পুরাতন বন্ধু অসুখে পড়িয়াছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া আমার একদিন ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। বন্ধুটির সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করি নাই। এই স্বপ্নগুলিকে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ যে ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ঠিক সেই শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে কি? শুধু তাহাই নহে। যদি ধরিয়াই লই যে, প্রত্যেক স্বপ্নের সহিত কোন না কোনরূপ শারীরিক উত্তেজনার যোগাযোগ আছে, তাহা হইলেও এই মত সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। প্রথমেই দেখুন, কেহ

স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঘর পুড়িয়া যাইতেছে এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, শয়নকালে তাঁহার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। আর একবার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল এবং তিনিই স্বপ্ন দেখিলেন যে, বাড়ির ছেলেমেয়েরা খুব তুবড়ি পোড়াইতেছে। এখানে কারণ এক থাকা সত্ত্বেও কার্য্যের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই, উদ্দীপক (Stimulus) এবং ব্যক্তিবিশেষ এক রহিল, অথচ বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন হইল। আবার এমনও হয় যে, ঘর পুড়িয়া যাইবার বা তুবড়ি জ্বালাইবার স্বপ্ন একজন দেখিলেন, কিন্তু শয়নকালে ঘরে আলোর লেশমাত্র ছিল না। এ ক্ষেত্রে, স্বপ্নের বিষয়, আগেকার স্বপ্ন দুইটির ন্যায় সম্পূর্ণ এক রকমের হইলেও কারণের বৈষম্য প্রকাশ পাইতেছে। এই তো গেল নিদ্রাকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত স্বপ্নবিষয়ের যোগাযোগের কথা। সেইরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত স্বপ্নবিষয়ের কতখানি সম্বন্ধ আছে, সে বিচার করিতে গেলেও অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত বা সম্পূর্ণ নীরোগ ব্যক্তি উভয়েই নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া কষ্ট পাওয়ার স্বপ্ন দেখিতে পারেন। আবার রোগী ব্যক্তিটি নিশ্বাসের কষ্ট সম্বন্ধীয় স্বপ্ন না দেখিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখিতে পারেন। ইঁদুরে ঘট উল্টাইবার শব্দ স্বপ্নে কোন ক্ষেত্রে কামানের গর্জ্জনে এবং কোন ক্ষেত্রে পাঁচিল পড়িয়া যাওয়ার শব্দে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের এই বৈষম্যের হেতু কি? স্বপ্নের বিষয়বস্তু এক হইলেও কারণ বিভিন্ন হয় কেন? সম্ভব ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এই সকল রূপান্তরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে সমস্ত আজগুবি বা অসম্ভব বিকৃতি আমরা অনেক সময় স্বপ্নে দেখিয়া থাকি, তাহা ব্যাখ্যা করিবার কোন সূত্রই আমরা এই তত্ত্ব হইতে পাই না। স্বপ্নের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বপ্ন আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। ইহার সম্বন্ধে এই

প্রণালীর ব্যাখ্যা কোনরূপ আলোকপাতই করে না। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও শারীরতত্ত্ববিদেরা, এই ভুলিয়া যাইবার কারণ সুসঙ্গতভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। শারীরিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে হয়তো কোন কোন স্বপ্নের জন্য দায়ী হইতে পারে, কিন্তু উহাই স্বপ্নের একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাখ্যা স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল নীতিই হইতেছে তাহার সর্ব্বব্যাপিতা।

শারীরতত্ত্বের ন্যায় মনস্তত্ত্বের দিক হইতেও স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা বহু পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-দেশীয় সাহিত্যে ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আমরা এই আলোচনার পরিচয় পাই। রবার্ট নামে একজন বৈজ্ঞানিক বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণের ফলে শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটি মত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার মতে, স্বপ্ন হইতেছে জাগ্রত অবস্থার ব্যাহত চিন্তারাশির পূর্ণবিকাশের একটি উপায় মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে অনেক চিন্তা নানা কারণে অসমাপ্ত অবস্থায় জমিয়া থাকে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া সেইগুলির পূর্ণ পরিণতি ঘটে। কেবলমাত্র দৈহিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাই স্বপ্নের জন্য দায়ী নহে; বাধাপ্রাপ্ত মানসিক কোন উপাদান না থাকিলে স্বপ্ন ঘটিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, মানসিক কোন ক্রিয়া ব্যাহত অবস্থায় জমিয়া থাকিলে মনে তীব্র অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয় এবং স্বপ্নের কাজ হইতেছে, সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিয়া মনে শান্তি আনয়ন করা। ডিলাজও (Delage) মানসিক বৃত্তির প্রভাব ভিন্ন যে কোন স্বপ্নবৃত্তান্ত গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহা দেখাইয়াছেন। সার্নার (Scherner) বুড্‌ডাক্ (Burdach), পুরকিন্‌জী (Purkinje) প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিকগণ মানসিক বৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহাদের পরস্পরের মতে অল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও এইটুকু আমরা জানিতে পারি, স্বপ্ন, শুধু শারীরিক নহে, মানসিক ক্রিয়া-কলাপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ফ্রয়েড তাঁহার 'Interpretation of dreams' পুস্তকে এই বিভিন্ন মতাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। স্বপ্নের সাধারণ তত্ত্ব-হিসাবে এই সকল অনুসন্ধানকারীদের মতামত মানিয়া লইবার পক্ষে একটি প্রতিবন্ধক আছে। ইঁহাদের প্রত্যেকেই, যে কোন কারণেই হউক, স্বপ্নের কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া, তাঁহাদের গবেষণা চালাইয়াছিলেন। কাজেই স্বপ্নের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহাদের তত্ত্ব হইতে আমরা পাই না। মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা করিতে করিতে ফ্রয়েডও রোগীদের স্বপ্নের কথা জানিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন। রোগের লক্ষণের সহিত স্বপ্নের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ প্রমাণ পাইয়া, স্বপ্ন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে তিনি প্রবৃত্ত হন। রোগীদের ও সাধারণের বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া স্বপ্ন যে একটি মানসিক ব্যাপার এবং মনোবিদ্যার সাহায্য লইয়াই যে তাহা অধ্যয়ন করা সম্ভব ও সঙ্গত, এই সিদ্ধান্তে তিনি ক্রমশ উপনীত হন। কি উপায় অবলম্বন করিলে মনোবিদ্যার দিক হইতে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের অধ্যয়ন এবং সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশও তিনি দিয়াছেন। স্বপ্ন আলোচনার জন্য ফ্রয়েড যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এইবার তাহার আলোচনা করিব।

মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ, আমরা তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি। স্বপ্ন সম্বন্ধেও ফ্রয়েড এই মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। স্বপ্নবৃত্তান্তের বিভিন্ন অংশ লইয়া অবাধ ভাবানুষঙ্গ পন্থা

অনুসরণ করিলে আমরা অবশেষে এমন কতকগুলি বাসনা ও চিন্তা প্রভৃতির সন্ধান পাই, যেগুলি স্বপ্নদ্রষ্টার নিতান্ত অন্তরের জিনিস। এই অন্তর্নিহিত বস্তুগুলির সমষ্টিকে স্বপ্নের "অব্যক্ত অংশ" (Latent Content) বলা হয়; এবং ঠিক যে সকল ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহার নাম স্বপ্নের "ব্যক্ত অংশ" (Patent or Manifest Content)। স্বপ্নের "ব্যক্ত অংশ" "অব্যক্ত অংশের"ই রূপান্তর মাত্র। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ সাধারণত অর্থহীন, অসম্ভব বা খাপছাড়া বটে; কিন্তু যে অব্যক্ত অংশগুলির রূপান্তর আমরা স্বপ্নে দেখি, সেগুলি মোটেই খাপছাড়া নহে। তাহারা স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক জীবনের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি বিদ্যমান থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই রূপান্তরের কারণ কি, অব্যক্ত অংশ সোজাসুজিভাবে প্রকাশ না হইয়া এইরূপ বিকৃত আকারে হয় কেন? হয় এইজন্য যে মনের প্রহরী (Censor) অব্যক্ত অংশটিকে স্বরূপে সংজ্ঞানে আসিতে দেয় না। প্রহরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই ইহাকে নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। এই মনের প্রহরীর কল্পনা মনোবিদ্যাজগতে ফ্রয়েডের একটি বিশিষ্ট দান। অবদমিত মানসিক ঘটনার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।* অপ্রীতিকর কোন ঘটনাকে মন অবদমন করিয়া রাখে অর্থাৎ সংজ্ঞান হইতে নির্জ্ঞানে পাঠাইয়া দেয়। নির্জ্ঞান হইতে কোন বস্তু যাহাতে সংজ্ঞানে ফিরিয়া আসিতে না পারে, তাহার জন্যও মনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। মনের যে অংশ অবদমিত বস্তুর সংজ্ঞানে পুনরাগমনে বাধা দেয়, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন, মনের প্রহরী। আজকাল এই যুদ্ধের দিনে censor-এর কর্ত্তব্য কি, তাহা ধারণা করা খুবই সহজ। কোন্ সংবাদ প্রকাশ করা উচিত এবং

* 'শনিবারের চিঠি'—পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ৩২৯ দ্রষ্টব্য।

কোন্‌টি প্রকাশ করিলে ক্ষতি হইবে, অতএব চাপিয়া যাওয়া উচিত, ইহা যেমন press-censor ঠিক করিয়া দেন, সেইরূপ মনের প্রহরীও নির্জ্ঞানের কোন্ চিন্তা বা ভাব সংজ্ঞানে আসিবার উপযুক্ত এবং কোন্‌টি নহে, সে বিষয়ে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু হাজার নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও, সাঙ্কেতিক বা অনুরূপ আপাত-অর্থহীন উপায়ে অনেক গুপ্ত সংবাদ press-censor-এর সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মনের ক্ষেত্রেও, ছদ্মবেশ, রূপান্তর ও নানাপ্রকার সম্ভব ও অসম্ভব বিকৃতির মধ্য দিয়া অবদমিত অনেক বস্তুই স্বপ্নে প্রকাশ পায়। এই রূপান্তরের আবার বিভিন্ন প্রণালী আছে, এলোমেলোভাবে হয় না। কোন্ অব্যক্ত অংশ কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ রূপান্তর গ্রহণ করিবে, সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড কতকগুলি বিশেষ সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন। এইগুলি সম্বন্ধে আমরা এখনই আলোচনা করিব। সূত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, স্বপ্ন-ব্যাখ্যার পথে আমরা অনেক' দূর অগ্রসর হইতে পারিব।

প্রথম সূত্রটির নাম সংক্ষেপন (condensation) স্বপ্নে আমরা যতটুকু দেখি, স্বপ্নের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি, অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ অপেক্ষা অব্যক্ত অংশের পরিমাণ ও ব্যাপকতা অধিক। ব্যক্ত অংশের একটি প্রকরণ (item) অনেক সময়েই অব্যক্ত অংশের দুই বা ততোধিক প্রকরণের সংমিশ্রণের ফল। এই সংক্ষেপন নানা উপায়ে ঘটিতে পারে। স্বপ্নে দৃষ্ট একটি ব্যক্তি সমগুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে, অথবা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সংমিশ্রণ হইয়া স্বপ্নে একটি নূতন মানুষের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইরূপ অব্যক্ত অংশের প্রকরণগুলি, যেমন—বাসনা, ইচ্ছা, স্থান, ব্যক্তি, নাম প্রভৃতি, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নে

একটি আজগুবি প্রকরণের সৃষ্টি করিতে পারে। গর্দ্দভের মস্তিষ্কযুক্ত কোন পরিচিত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলে, সেই ব্যক্তির বুদ্ধি সম্বন্ধে স্বপ্ন-দ্রষ্টা কি ধারণা পোষণ করেন, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। সংবাদপত্রে বা মাসিক-পত্রিকায় রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া যে সকল ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা আপনাদের স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বপ্নে দৃষ্ট একটি প্রকরণ, যে সমস্ত প্রকরণের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রে তাহাদের একটিকে, কোন ক্ষেত্রে তাহাদের দুইটিকে এবং কোন ক্ষেত্রে সবগুলিকেই বুঝাইতে পারে। একটির অধিক প্রকরণকে ইঙ্গিত করার নাম "অতিলক্ষ্য" (overdetermination)। "বাগবাজারে আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি থাকেন, আবার বাগবাজারে রসগোল্লাও পাওয়া যায়। স্বপ্নে বাগবাজার দেখার অর্থ, ঐরূপ ক্ষেত্রে আমার প্রিয় ব্যক্তির নিকট যাওয়াও বটে এবং রসগোল্লা খাওয়াও বটে।"* ব্যক্ত অংশের একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ, অব্যক্ত অংশের কোন্ প্রকরণ বা প্রকরণগুলিকে নির্দ্দেশ করিতেছে, অবাধ ভাবানুষঙ্গ পন্থা অবলম্বন না করিলে তাহা বুঝিতে পারা একান্তই অসম্ভব।

অন্যান্য সূত্রের বিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

যদি

স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত—বাংলার মাটি হ'ত সোনা;
এ দেশের লজ্জাবস্ত্র কচুরি-পানায় যেত বোনা।

* 'স্বপ্ন'—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, পৃ. ৬৯।

চতুর্দ্দশী

কৃষ্ণা ॥ পূর্ণ শশী শীর্ণ হ'ল ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে কলায় কলায়,
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এল; অমাবস্যা নহে সখি দূর—
রক্তের নর্ত্তকী আজি ক্লান্তিভরে খুলিছে নূপুর,
তোমারো বাহুর বন্ধ শ্লথ হ'ল আমার গলায়।

যতদিন আলো ছিল, করেছি কত না অভিনয়
পাদ-প্রদীপের আগে—হাস্যকর নট-আস্ফালন;
তুমিও কত না সাজে নগ্নতারে ঢেকেছ আপন—
কি বিচিত্র অভিনয়! হাবভাব মিষ্টতা বিনয়!

আলো নিবে আসে সখি, খুলে দাও গ্রন্থি সরমের,
তোমাতে আমাতে হোক লজ্জাহীন নব-পরিচয়—
আপনারে নগ্ন করি শূন্য করি ভাণ্ড মরমের
দীনতার রিক্ততার এস করি পূর্ণ-বিনিময়।

এই তো সময় প্রিয়ে, তুমি আমি একান্ত একাকী;
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি—তমোভারে দৃষ্টিহীন আঁখি।

শুক্লা ॥ অমার মরমকোষে অমর্ত্ত্য আঁধার মাঝে পশি
বুকে বুকে মুখে মুখে যে কথা হয়েছে সখি বলা—
মন্ত্র চরমের সুরে পরমের সেই গীতিকলা
অঙ্গ মোর অতীন্দ্রিয় রসোল্লাসে দিল যে হরষি।

মদন চন্দন হ'ল, রতি হ'ল আরতির ধূপ ;
অপ্রদীপ এ মন্দিরে তুমি যে নবোঢ়া বধূ মোর ;
বাহিরে নীরন্ধ্র নিশা অবাস্তব রভস-বিভোর
তুমি আমি একসাথে—ওতপ্রোত, কমল-মধুপ।

এ লগনে আলোকের আর তো ছিল না প্রয়োজন,—
তবু এল শুক্লা তিথি—আকাশের বঙ্কিম কৌতুক ;
শয্যায় পড়িল আলো—চারিদিকে আলোর স্পন্দন—
চকিতে নয়ন খুলি হেরিনু তোমার বধূ-মুখ।—

লজ্জা নাই, ক্লান্তি নাই, মুখে চোখে উচ্ছ্বসিত হাসি।
আজি শুক্লা চতুর্দ্দশী—কাল সখি নব-পৌর্ণমাসী।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূমকেতু

সূর্য্য হ'ল অন্তর্দ্ধান, ধূমকেতু উদিল অমনি,
বিষ্ণুপ্রিয়া না হতেই পলাইল পুরীর নিমাই ;
ঘটিতেছে যুগান্তর—ফরোয়ার্ড ব্লকাগ্রে রমণী—
সাহিত্যের স্তনে মুখ, মোরা শিল্প-কাঁথায় ঝিমাই।

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

বংশী যে প্রলাপ বকবে, তা বোধ হয় রাত্রিও জানত না, জানলে সে আমাকে নিয়ে যেত না সঙ্গে ক'রে। অবশ্য রাত্রি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, এটা ঠিক সত্য কথা নয় ; আমিই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কিছুই সম্ভব হ'ত না, যদি কান্তি পালের সঙ্গে দেখা না হ'ত।

অগ্রগামী কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেট নিয়ে রায় মশায়ের বিরাট বাড়ির চৌহদ্দিতে যেই আমি ঢুকলাম, অমনই দেখা হয়ে গেল কান্তি পালের সঙ্গে। সেদিন কান্তি পালের সঙ্গে ওই ভিড়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে আমি এখন আর আকস্মিক ব'লে মনে করি না। আমার মনে হয়, নিয়তির এই চক্রান্তের মধ্যে কান্তি পালের স্থান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

কান্তি পাল লোকটি কান্তিমান লোক নন। রোগা বকের মত চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো, কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়, প্রত্যহ তো নয়ই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নগ্নগাত্রে একখানা ভিজে লাল গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে ব্যাজন করছিলেন তিনি ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমি তাঁকে দেখতে পাই নি। তিনিই এগিয়ে এসে বললেন, ডাক্তার যে, এস এস, কুলীর মাথায় ও কি ?

উপহার একটা।

ও নিতু, ডাক্তারবাবুর এই জিনিসটা মাঝের হল-ঘরে রাখিয়ে দাও, বেশ সামনের দিকে রাখিয়ে দিও।

নিতু এসে কুলীটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। হল-ঘরে উপহারের একটা প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

কান্তি পাল বললেন, উঃ, রগ দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে আমার! আবার বনবন ক'রে গামছা ঘোরাতে লাগলেন এবং আমি কিছু বলবার আগেই বললেন, সকাল থেকে কব্যাটা উড়েকে নিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুনের সামনে—উঃ!

কান্তি পালকে আমি চিনি, তিনি আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছিলেন, তাও আমার অবিদিত ছিল না। বললাম, আপনি ব'লেই পারেন এসব, আমরা হ'লে ম'রে যেতাম।

আর পারি না ভাই, বয়স তো হচ্ছে। চল, তোমাকে বসিয়ে দিইগে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকো না, ওধারের বারান্দার কোণে একটা নিরিবিলি জায়গা আছে, সেখানেই চল। একটা ফ্যানও আছে সেখানে, আরামে বসতে পারবে।

তারপর যেতে যেতে বললেন, উঃ, মনে হচ্ছে, দুটো রগে দুটো ইস্কুরুপ কে যেন প্যাঁচকস দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাচ্ছে!

কান্তি পালের এই বৈশিষ্ট্য। শিবহীন যজ্ঞ বরং সম্ভব, কিন্তু এ পাড়ায় কান্তি-পাল-হীন 'যগ্যি' অসম্ভব। সকাল থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি রান্নাবান্নার তদারকের ভার নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তারপর যত বেলা বাড়তে থাকবে, কান্তি পাল তত গম্ভীর হতে থাকবেন এবং ক্রমশ চেনা-শোনা যার সঙ্গে দেখা হতে থাকবে, তার কাছেই চুপিচুপি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে নিজের একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ ক'রে 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা'-মার্কা এমন একটা নিদারুণ রকম

আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন (গোপনে গোপনে কিন্তু) যে, শ্রোতাকে সহানুভূতি-মিশ্রিত দুচারটে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতেই হবে। কান্তি পাল এর বেশি আর কিছু চানও না। অসুখের প্রতিকারকল্পে কেউ যদি কোন ব্যবস্থা করতে যায়, কান্তি পাল বলবেন, না, থাক। সমস্ত দিন রান্নাঘরে ঘোরাফেরা করবেন, কিছু খাবেন না এবং রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এক গ্লাস শরবৎ কিম্বা বড় জোর একটা মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চ'লে যাবেন।

কান্তি পাল আমাকে নিয়ে গিয়ে যে স্থানটিতে বসিয়ে দিলেন, সে স্থানটি আমি এই ভিড়ের মধ্যে নিজে খুঁজে বার করতে পারতাম না এবং তা না পারলে পরবর্ত্তী ঘটনা-পরম্পরা আমার জীবনে ঘটত কি না সন্দেহ। আমার সহানুভূতিসূচক কথায় বিগলিত হয়ে কান্তি পাল যেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেটা অতিথিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গা নয়। সেটা পেছন দিকে অন্দর-মহলের কাছাকাছি একটা স্থান। খুব পর্দ্দানশীনও নয়, খুব প্রকাশ্যও নয়। মেয়েরাও বসতে পারে, পুরুষরাও বসতে পারে। সেখানে ছিল একটা গোল টেবিলের চারপাশে খান কয়েক চেয়ার, আর মাথার ওপরে একটা পাখা। আশপাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল বটে, কিন্তু সেখানে থামছিল না কেউ। এই ভিড়ের বাড়িতে এমন একটা জায়গা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ফ্যানটি খুলে দিয়ে কান্তি পাল মুচকি হেসে ব'লে গেলেন, ওদিক পানে চেও না যেন।

তাঁর অঙ্গুলিনির্দ্দেশে চেয়ে দেখলাম, একটু দূরে একটি বিস্তৃত ঘরে নিমন্ত্রিতা ভদ্রমহিলারা সমবেত হয়েছেন। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে। তাঁরা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মনে হ'ল, বুনো রামনাথের স্ত্রী এঁদের মধ্যে নেই। হাতে শাঁখা (এমন কি অভাবে লাল সুতো), সীমন্তে সিঁদুর, আর সাধারণ সাদাসিধে সুতোর কাপড় প'রে যে মহিলা সগৌরবে নিজের আত্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, এই মেকী প্রজাপতির দলে তিনি নিশ্চয়ই নেই। বুনো রামনাথের স্ত্রীর আত্মমর্য্যাদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্বামীর ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর, আর এই মেকী প্রজাপতিদের আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত কেবল তাদের স্বামীর উপার্জ্জন কিম্বা ধার করবার ক্ষমতার ওপরই নয়, সৎ অসৎ ভদ্র অভদ্র নানা উপায়ে সেটা জাহির করবার প্রচেষ্টার ওপর। এদের আত্মসম্মান পরিপুষ্ট হয় সোফা-সেটি-মোটর-বসন-ভূষণ কিনেই নয়, তা অধনী-অধন্যদের চোখের সামনে নানা ভাবে আস্ফালন ক'রে। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের কথা কেউ আজকাল ভাবেই না, বাইরের ঐশ্বর্য্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। তাই নানা রঙের কাপড়, নানা ঢঙের গয়না প'রে, মুখে পাউডার ক্রীম ঘ'ষে, আন্তরিকতা-বর্জ্জিত হাসি হেসে প্রাণপণে সবাই অভিনয় ক'রে চলেছে। সবাই সবাইকে সমালোচনাও করছে মনে মনে, মুখের ভদ্র হাসিটুকু বজায় রেখে। কার স্বামী কেরানী এবং কার স্বামী সেই কেরানীর প্রভু, তা বোঝবার উপায় নেই তাঁদের স্ত্রীদের দেখে। গয়না-কাপড়ের দৌলতে সবাই রাজরাণী। পেট ভ'রে খায় না, মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করে না, যা কিছু রোজগার করে তা দিয়ে ঠুনকো ঐশ্বর্য্যের সস্তা চাকচিক্য কিনে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। বুনো রামনাথের স্ত্রীর নিরলঙ্কৃত মর্য্যাদাবোধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হয়তো এক রকম কম্‌প্লেক্স; কিন্তু এই দরিদ্র পরাধীন দেশে গয়না-কাপড়-সর্ব্বস্ব ঝুটো আভিজাত্য-কম্‌প্লেক্সের চেয়ে দারিদ্র্য-কমপ্লেক্স ঢের বেশি শ্রেয় এবং সম্মানার্হ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে ঢের কম রোজগার ক'রে ঢের

বেশি সুখে ছিলেন, কারণ তাঁদের মর্য্যাদাবোধ আর্থিক ছিল না, আত্মিক ছিল। সুখে জীবনযাপন করবার জন্যেই অর্থ, অর্থের জন্য জীবনযাপন নয়—এ কথা আমরা ভুলে গেছি ব'লেই যে কোন ধনী দুরাত্মার কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাথা নোয়াতে পেলে ধন্য হয়ে যাই।

পলাশীর যুদ্ধ···রামমোহন রায়···বিদ্যাসাগর···বঙ্কিম···বিবেকানন্দ ···রবীন্দ্রনাথ···একশো তিরাশি বছর মনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল।

দিস ইজ ক্যাল্‌কাটা কলিং—

চাল ডালের দর থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের সংবাদ, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সেতারে কানাড়ার আলাপ, মধ্যযুগের সাধনা, আবৃত্তি, নাটক, ফুটবল খেলার ফলাফল তারস্বরে একের পর এক শূন্যে চীৎকার ক'রে মরছে—পানবিড়ির দোকানেও, মহারাজার প্রাসাদেও। আর এই গান! বাংলা ভাষা যারা বোঝে না, তারা হয়তো ভাবে, বাংলা দেশ জুড়ে মড়াকান্না উঠেছে। কিন্তু কাঁদবে কে? একটা মড়া কি আর একটা মড়ার শোকে কাঁদে কখনও? কান্না নয়, গানই হচ্ছে; ভাষা বুঝলে গানের কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত, কেউ মরে নি, সবাই বেঁচে আছে, এবং এত আনন্দে আছে যে, অষ্টপ্রহর গান গাইছে সবাই।

টর্চের আলো নিবিড় অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে দেয় যেমন ক'রে, আমার মনের তমিস্রাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাশের ঘরে তেমনই ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, কে আপনি? সবিতা দেবীর বাড়িতে স্বর্ণেন্দুবাবু খবর পাঠিয়েছেন? রাত্রিকে ডাকছেন? কি বলব তাঁকে, একা রুগীকে সামলাতে পারছেন না? আচ্ছা, আমি দেখছি। যিনি ফোন ধরেছিলেন,

তিনি ওদিকের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে আমি দেখতেই পেলাম না। আমার মনে পর পর দুটো অসংলগ্ন চিন্তা জাগল, রায় মশায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি, রাত্রির সঙ্গে দেখা করতে হবে—

হঠাৎ উঠে বারান্দার সিঁড়িটা দিয়ে হনহন ক'রে আমি লনে নেমে গেলাম, সম্ভবত সিঁড়িগুলো সামনে ছিল ব'লেই। লনের ওধার দিয়ে এক ছোকরা ট্রেতে সাজিয়ে শরবৎ নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, রায় মশায় কোথায় বলতে পারেন?

তিনি গেস্ট-হাউসে রয়েছেন। দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার আছেন কিনা সেখানে।

ছোকরা চ'লে গেল।

যদিও রায় মশায়ের নিমন্ত্রণেই এসেছিলাম, তবু—কিন্তু না, দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার থাকতে রায় মশায় আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সময় নষ্ট করবেন—এ কথা চিন্তা করাও অন্যায়, হলামই বা আমরা নিমন্ত্রিত। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোকের অভাব নেই তো। এতবড় একটা রাজসূয় ব্যাপারে জনে জনে প্রত্যেককে আপ্যায়িত করা রায় মশায়ের পক্ষে সম্ভব কি? আর তা ছাড়া, আর একটা কথাও কি সত্য নয় যে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করলে, কিম্বা আমি না এলে, এ উৎসব এতটুকু অসম্পূর্ণ থাকত না? আমাকে অনুগ্রহ করেন ব'লেই নিমন্ত্রণ করেছেন, না করলেও পারতেন।

সমস্ত তিক্ততা মুহূর্তে মাধুর্যে রূপান্তরিত হ'ল।

নমস্কার। আপনিও এসেছেন দেখছি।

চেয়ে দেখি, রাত্রি নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে, মুখে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা। তার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটির রঙ এত অদ্ভুত রকম ফরসা যে, হঠাৎ দেখলে ইহুদী ব'লে

সন্দেহ হয়। তখন আমি জানতাম না, রাত্রি বিনা-নিমন্ত্রণেই এ বাড়িতে এসেছিল এই সবিতাকে দেখবে ব'লে। সবিতার বাড়ি গিয়ে দেখা পায় নি; সবিতা এখানে চ'লে এসেছিল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করবার জন্যে, রাত্রিও খোঁজ নিয়ে এসেছিল। সবিতা ও রাত্রি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল—হ্যাঁ, সেই পুরাতন উপমাটাই ব্যবহার করছি—ঠিক যেন আলো আর অন্ধকার। রাত্রির মুখভাবে সেদিন অতি ভদ্র অতি মোলায়েম শিষ্টাচার-মসৃণ যে স্নিগ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা যে অন্তরোৎসারিত নয়, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না সেদিন। দেশলাই-কাঠির কালো মাথাটার ভেতর আগুন যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, রাত্রির মধ্যেও সেদিন তেমনই আগুন লুকানো ছিল আমি বুঝি নি। সবিতার সঙ্গে রাত্রির যে সেদিন প্রথম আলাপ, রাত্রি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, তাও আমি জানতাম না। কাল সকালে জ্যোতির্ময় এসে রাত্রিদের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা ক'রে এই সবিতাদের বাড়িতেই উঠবে—এ কথাও তখন আমার অজ্ঞাত ছিল। রাত্রি দেখতে এসেছিল সবিতা মেয়েটি কেমন, একটা চুম্বক আর একটা চুম্বকের শক্তি-নির্দ্ধারণ করতে এসেছিল।

আপনারা মধুপুর থেকে কবে এলেন?

দিন চারেক আগে।

রাত্রি না হয়ে যদি অপর কেউ হ'ত, তা হ'লে এই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবরও বলত। আমার প্রশ্নটির উত্তরটুকু মাত্র দিয়ে রাত্রি চুপ ক'রে রইল। আমি চেয়ে দেখলাম, সে সবিতার মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে, এবং সবিতা মেয়েটি অস্বস্তি ভোগ করছে সেজন্যে। আমিও কম অস্বস্তি ভোগ করছিলাম না। এর পর কি করব, কি কথা ব'লে আলাপটাকে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব, তাই ভাবছিলাম

(রাত্রির সামনে বরাবরই আমার এমনই বাক্‌সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে), এমন সময় নিতু একটা কার্ড আর লাল পেন্সিল নিয়ে হাজির হ'ল।

আপনার নামটা কাইণ্ডলি বলুন না?

কেন?

আপনার দেওয়া আইস্‌ক্রীম-সেটটার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে দোব।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন, উপহারগুলো কোথায় রাখা হয়েছে, আমরা একবার দেখতে পাই না?

ওই যে, বাঁ দিকের ওই হলটায়। আসুন না।

সকলে নিতুর অনুসরণ করলাম।

উপহার-প্রদর্শনীর বর্ণনা ক'রে সময় নষ্ট করতে চাই না, মনিহারী দোকানে যত রকম জিনিস পাওয়া যায়, সবই ছিল সেখানে। রাত্রি নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা দেখে (নিতু আমার নাম-লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিচ্ছিল তখন) দুটি কথা মাত্র বলেছিল, বেশ জিনিসটি। তারপর হঠাৎ সবিতার দিকে ফিরে বলেছিল, ইনি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার। নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর মামুলি প্রথায় দুচারটে শিষ্ট বাণীর আদান-প্রদানও হয়তো চলত, কিন্তু হঠাৎ পাশের দুয়ারের পর্দা ঠেলে ব্যস্তবাগীশ-গোছের মালকোঁচা-মারা ঘর্ম্মসিক্ত ঢিলে গেঞ্জি গায়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে পড়লেন এবং সবিতা দেবীকে সামনে পেয়ে বললেন, ও, সবিতা, তুমি এদিকে চ'লে এসেছ, স্বর্ণাপ্রভাকে আমি আবার ভেতরের দিকে পাঠালাম তোমার খোঁজে। এখনই তোমাদের বাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক ফোন করছিলেন, রাত্রি ব'লে একজন মেয়েকে, আই মীন মহিলাকে, স্বর্ণেন্দুবাবু ব'লে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বললেন, তিনি রুগীকে একা

সামলাতে পারছেন না। আমি তো রাত্রি ব'লে কাউকে খুঁজেই পাচ্ছি না।

ইনিই রাত্রি দেবী।

ও, নমস্কার।

ভদ্রলোককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে রাত্রি বললে, এখুনি যাচ্ছি আমি।

আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সম্ভবত প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

বংশীদার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়বার ভান করলাম। ও, বলেন তো আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

বেশ তো, আসুন।

বেশ মনে পড়ছে, সবিতার দিকে ফিরে রাত্রি বলেছিল, আজ ভোরেই জ্যোতির্ম্ময়বাবু আসছেন, বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের বাড়িতে যাবেন। আপনি যে আগেই চিঠি পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না, তাই খবরটা দিতে এসেছিলাম।

হাস্যদীপ্ত চক্ষে সবিতা বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

উপহার-প্রদর্শনী-হল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা দুজনে।

৩

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চীৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, শামিয়ানার তলায় ভোজননিরত নিমন্ত্রিতের দল,

পরিবেশনের গোলমাল, রেডিওর নিনাদ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল যেন আমার চোখের সামনে থেমে। মনে হ'ল, কেউ কোথাও নেই, রাত্রি আর আমি পাশাপাশি চলেছি। মুহূর্তগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। মনে হচ্ছিল, যেন একটা সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়ে নিবিড় অন্ধকার রজনীতে পাশাপাশি চলেছি দুজনে, রাত্রির অঞ্চলতলে শঙ্কিত ভীরু দীপশিখা,—বাতাস উঠেছে। সহসা রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চীৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের চীৎকার, পরিবেশনের কলরব, রেডিওর নিনাদ সব আবার একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন আমার সচেতন মনের ওপর। দেখলাম, রাত্রি ঝুঁকে তার স্যাণ্ডালের স্থানচ্যুত স্ট্র্যাপটাকে বাঁধছে। রায় মশায়ের বাড়ির হাতা থেকে বেরিয়ে গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ দুলাল সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, টাকা পাঁচটা পকেটে আছে, ট্যাক্সি ডাকলাম।

ট্যাক্সিতে তার সঙ্গে আমার মাত্র দুটি কথা হয়েছিল।

নতুন কোন বই সুরু করেছেন নাকি আর?

না।

যে বংশীর অসুখের সংবাদে চিন্তিত হয়ে হিতৈষীর ছদ্মবেশে বিনা আহ্বানেই যাচ্ছিলাম, সেই বংশীর অসুখের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই উঠল না কোন দিক থেকে। নীরবেই ব'সে রইলাম দুজনে। আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি পেছনে ফেলে চলেছিলাম। ফুটপাথের জনতা থেকে একটি মেয়ের কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পেয়েছিলাম মনে আছে, কোণের অন্ধ ভিখারীটা তখনও হাত পেতে ব'সে ছিল, ট্রামের ঘণ্টা, রিক্‌শ, হকারের চীৎকার, রাস্তার বিচিত্র জনতা রোজ যেমন থাকে

সেদিনও তেমনই ছিল। আমিই ঠিক তেমনই ছিলাম না। রাত্রিকে পাশে বসিয়ে ট্যাক্সি ক'রে ছুটছিলাম আমি। একটু পরে রাত্রির নির্দ্দেশ অনুসারে থামল ট্যাক্সিটা। ভাগ্যে থামল! আর কিছুক্ষণ চললে আমি বোধ হয়—মানে, ট্যাক্সি থেকে যখন নামলাম, মনে হ'ল, নক্ষত্র-লোক থেকে নামলাম।

এক পাশে একটা ডাস্টবিন আর এক পাশে একটা ল্যাম্প-পোস্ট, মাঝখানে গলিটা। অন্ধকার সরু একটা অন্ধ গলি। সেই গলির অপর প্রান্তে ছোট দ্বিতল বাড়িখানা, দেখতেই পাওয়া যায় না গলির এ প্রান্ত থেকে।

আসুন।

কপাট খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল এক জোড়া জলন্ত চোখ, তারপর একটি তরুণীর মুখ, তারপর তার গৈরিক বসন। হ্যাঁ, প্রথমে তরুণীই মনে হয়েছিল তাঁকে আমার। তখনও ভাবতেই পারি নি যে, ইনি স্বর্ণেন্দুর মা, রাত্রির মা। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, রাত্রির সমবয়সী। আমাকে দেখেই তাঁর চোখের জলন্ত দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। অতিশয় কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে বাবা তুমি?

আমি স্বর্ণেন্দুর বন্ধু ঘনশ্যাম। শুনলাম বংশীর অসুখ—

এস বাবা, এস। এখুনি তোমার কথা বলছিল স্বর্ণেন্দু।

রাত্রি কোন কথা না ব'লে কারও দিকে না চেয়ে ভেতরে চ'লে গেল। স্বর্ণেন্দুর মা খানিকক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, আমি স্বর্ণেন্দুর মা।

প্রণাম করলাম আমি।

হয়তো আমার সদ্যলব্ধ জ্ঞানের ফলেই আমার দৃষ্টির তারতম্য ঘটল। প্রণামান্তে চোখ তুলে যখন চাইলাম, তখন মনে হ'ল, তাঁর মুখের

তরুণী-ভাবটা যেন তিরোহিত হয়েছে। অন্তরালবর্ত্তিনী বৃদ্ধাকে যেন দেখা যাচ্ছে। নিটোল মুখখানি যদিও জরালেশহীন (পদ্মপত্রে জলের দাগ পড়ে না, আকাশের গায়ে মেঘের মলিনতা লেপটে থাকতে পায় না), তবু কিন্তু কোথায় যেন, খুব সম্ভবত চোখের দৃষ্টিতেই, তাঁর আসল বয়সের পরিচয় পেলাম। পরে এই মহিলার জীবন-রহস্যের যতটুকু আবিষ্কার করেছি, যদিও তার অধিকাংশই হয়তো আমার কল্পনা, কারণ মাত্র একখানা চিঠির টুকরো টুকরো কথা থেকে নিঃসংশয়ে কতটুকুই বা জানা যায়, ডি. কে.-র কথাই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা কে জানে, তা ছাড়া তার মুখ থেকে সব ঘটনাটা আমি শুনিও নি, রাখালবাবু পূর্ণেন্দুবাবু জ্যোতির্ম্ময় নামে অন্য লোক থাকাও যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব নয়—যাই হোক, যতটুকু আবিষ্কার করেছি ব'লে আমার বিশ্বাস, এবং যে বিশ্বাসের জোরে রাত্রির সমস্ত দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা সম্ভবপর হয়েছিল আমার পক্ষে—সেদিন সে রহস্যের আভাস স্বর্ণেন্দুর মায়ের চোখে দেখেছিলাম যেন। সেই চির-পুরাতন চির-নূতন রহস্য, সর্ব্বযুগের সর্ব্বস্তরের নারীর দৃষ্টিতে যার কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত প্রকাশ সর্ব্বযুগের সর্ব্বস্তরের পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে নানা ভাবে।

এই সামনের ঘরটাতেই আছে স্বর্ণেন্দু, যাও, ভেতরে যাও তুমি।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। এমন নির্ব্বিকার-ভাবে গেলেন, যেন এ বাড়ির তিনি কেউ নন, কিংবা যেন সমস্তই তাঁর এত জানা, এমন নখদর্পণে যে, এ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল তাঁর অবশিষ্ট নেই, এমন কি এই সব কেন্দ্র ক'রে শিষ্টাচার করাও যেন তাঁর পক্ষে ক্লান্তিজনক।

দ্বার ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই স্বর্ণেন্দুর বাবার মুখখানা চোখে পড়ল, আধখানা মরা আধখানা জীবন্ত মুখ। দ্বার খোলার শব্দে জীবন্ত চোখটা খুলে গেল, সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর আবার বুজে গেল চোখটা, নীরবে যেন তিনি বললেন, ও, বুঝেছি। ঘরে আর কেউ নেই। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। রকেটের মত ছুটে বেড়াতেন যিনি, যাঁর সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে, তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কিনা সন্দেহ, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিছানায় প'ড়ে আছেন—নির্ব্বাক, নিঃসঙ্গ, ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ কাছে নেই। এ রকম করুণ দৃশ্য আমার ডাক্তারী জীবনে আরও দেখেছি। বাড়ির কর্ত্তা হঠাৎ যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যা নেন, তখন তাঁকে ঘিরে কিছুকাল চিকিৎসার সমারোহ হয়, যার যেমন সঙ্গতি সেই অনুসারে। তারপর ক্রমশ সব থেমে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য্য দুর্ঘটনাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে আসে, আত্মীয়-স্বজনের স্নায়ুকেন্দ্রে উত্তেজনা সঞ্চার করার মত তীব্রতা আর তাতে থাকে না। তখন অসহায় চলচ্ছক্তিহীন শয্যাশায়ী বৃদ্ধের সেবা করাটা ক্রমশ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর মত নিয়ম-রক্ষাগোছ কর্ত্তব্যে পরিণত হয়। ঠাকুরের সঙ্গে শয্যাশায়ী কর্ত্তার কিন্তু অনেক তফাত। সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে বিলম্ব হ'লে মাটির ঠাকুর প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেবার ত্রুটি ঘটলে (এবং অনেক সময় সেবার ত্রুটি ঘটেছে কল্পনা ক'রে নিয়ে) পক্ষাঘাতগ্রস্ত কর্ত্তা অসন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেবক-সেবিকারাও—হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলে মেয়েরাই—বিরক্ত হয়ে ওঠেন দেখেছি। কতদিন আর একটানা রাত্রি জাগা যায়, বারবার কতবার বিছানা বদলাতে পারে মানুষে,—হ'লই বা স্বামী, হ'লই বা বাবা—মানুষের, রক্তমাংসের মানুষের, সহ্যের সীমা আছে তো! পুত্রও

তখন পিতাকে রূঢ়ভাষণ করে, সতী রমণীর মুখ দিয়েও যে বাক্য নির্গত হয়, তা রমণীয় নয়। আমার মনে একটা কথা জাগছিল, মধুপুর ছেড়ে কলকাতা শহরের এই এঁদো গলিতে চ'লে এলেন কেন এঁরা! পরে জেনেছি, আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্ণেন্দু যখন তার মাকে মথুরা থেকে আনতে গিয়েছিল, তখন তাঁকে বলে নি যে, মধুপুরে জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়িতেই যাচ্ছে তারা; এবং তিনি পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে এত নির্ব্বিকার ছিলেন যে, কৌতূহলও তেমন প্রকাশ করেন নি তখন, পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহলই যেন অবসান হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্বর্ণেন্দুর মা জানতেন, জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়িতে ভাড়াটে আছে, এবং জ্যোতির্ম্ময় মেতে আছে তার চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ে কলকাতায়। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে—জ্যোতির্ম্ময় ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়েছে, চিত্র-প্রদর্শনীর দরজায় তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চ'লে এসেছে, এসব কিছুই জানতেন না তিনি। যেদিন জানতে পারলেন, সেই দিনই তিনি মথুরা থেকে চ'লে এলেন এবং এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন, এমন ঘন ঘন ভর হতে লাগল তাঁর যে, স্বর্ণেন্দু বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে চ'লে এল কলকাতায়। আমার মনে হয়, স্বর্ণেন্দু যদি সমস্ত ব্যাপারটা মথুরাতেই মাকে খুলে বলত, এত কাণ্ড হ'ত না, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় আর রাত্রি এতদিন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেত না। এ কথা শোনামাত্রই প্রবল আপত্তি করতেন তিনি, এবং তাঁর প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু, জ্যোতির্ম্ময়, রাত্রি কেউ দাঁড়াতে পারত না। স্বর্ণেন্দু ভেবেছিল, মাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোন রকমে এনে ফেলতে পারলে হয়তো তিনি বুঝবেন সব, হয়তো তিনি রাত্রি আর জ্যোতির্ম্ময়ের মেলামেশা দেখে বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভুল ভেবেছিল স্বর্ণেন্দু, নিজের মাকে সে চিনত না। কজনই বা চেনে? গাছ কি

মাটিকে ভাল ক'রে চেনে? মাটির সব দৈন্য-ঐশ্বর্য্যের খবর রাখে? সে শুধু মাটির রস চেনে, যা শোষণ ক'রে সে বড় হয়।

পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা আবার খুলে গেল। শুধু খুলে গেল নয়, ক্রমশ বড় হতে লাগল, মনে হ'ল, ছুটে এসে বুলেটের মত আঘাত করবে আমাকে এখুনি। যদিও মৃত চোখটা সঙ্গে সঙ্গে মিনতি করছিল, তবু আমি সামনের দেয়ালে পর্দ্দা-ঢাকা যে দরজাটা ছিল, সেইটে দিয়ে দ্রুতপদে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘরটাতে।

খুব লম্বা সরু গোছের ঘরটা, কমানো টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ঈষৎ আলোকিত। ঘরের অপর প্রান্তে একটা খাটে বংশী শুয়ে ছিল, তার মাথার শিয়রে ব'সে ছিল স্বর্ণেন্দু। তার গোঁফ-দাড়ি-সমাকীর্ণ আনত মুখখানাতে সস্নেহ সেবা-পরায়ণতা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। স্বল্পালোক সত্ত্বেও আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম, আমার ভুল হয় নি। ভুল হয় নি ব'লেই প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি জানি, স্বর্ণেন্দু নির্দ্দোষ। আমি এগিয়ে যেতেই স্বর্ণেন্দু চোখ তুলে চাইলে, তারপর একটু হাসলে—ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার, তারপর বললে, আয়, ব'স।

বসলাম।

কি হয়েছে বংশীর, কে দেখছে?

কোন ডাক্তার ডাকি নি এখনও। এসেই কম্প দিয়ে জ্বর এল, ভাবলাম ম্যালেরিয়া, দু এক দিনে সেরে যাবে, কিন্তু আজ বিকেল থেকে কেমন যেন—

কম্প দিয়ে জ্বর, নিশ্বাসের দ্রুত গতি এবং প্রলাপ দেখে সন্দেহ হ'ল লোবার নিউমোনিয়া। বংশী বিড়বিড় ক'রে বকছিল, হঠাৎ জোরে জোরে ব'লে উঠল, তোমার বয়স কত, তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি, আমি তোমাকে চাই। কোথায় রাতু, রাতু!—আবার খানিকক্ষণ বিড়বিড় ক'রে কি খানিকটা ব'লে গেল। তারপর আবার জোরে, হ্যাঁ দিয়েছিলে, একদিন তো দিয়েছিলে, কেন দিয়েছিল, কেন?—উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠতে গেল, স্বর্ণেন্দু শুইয়ে দিলে জোর ক'রে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি,

হঠাৎ চোখে পড়ল, অন্ধকারে রাত্রিও ব'সে আছে বিছানার ওপাশটায় বংশীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। চোখে অদ্ভুত একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম তিনজনেই। বংশী কখনও বিড়-বিড় ক'রে কখনও জোরে জোরে প্রলাপ বকতে লাগল। ঠিক কতক্ষণ যে ব'সে ছিলাম, এসব শুনে ঠিক সেই সময়ে মনে কি কি ভাবোদয় হয়েছিল, তা এখন ভাল ক'রে মনে নেই। এর পরে যে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে তা এই, স্বর্ণেন্দু রাত্রিকে বলছিল, ভোরে জ্যোতির্ময়কে তুই কি স্টেশন থেকে আনতে যাবি? সে তো এ বাসা চেনে না।

যাব।

স্বর্ণেন্দু স্নেহভরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাত্রির দিকে। শুধু স্নেহ নয়, একটা মুগ্ধ ভাবও যেন লক্ষ্য করেছিলাম তার চোখে। বিছুটির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি হয়তো দেখেছিল সে তখন।

হঠাৎ বংশী ব'লে উঠল, ঈজিপ্টে ভাই-বোনে বিয়ে হ'ত—

রাত্রির নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

বংশী প্রলাপ বকছে।

জ্যোতির্ময় কয়েক ঘণ্টা পরেই এসে পড়বে।

এর পর সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা যদিও এই অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু, পর পর ঘটেছিল, সুতরাং একসঙ্গেই বর্ণনীয়, কিন্তু তাদের গুরুত্ব এত বেশি, এবং শুধু লেখক-হিসাবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমি এ কাহিনীর সঙ্গে এমন বিজড়িত যে, একটানা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় ব'সে আছি। সার্শির লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা রঙের কাচের ভেতর দিয়ে একই সূর্য্যালোক নানা বর্ণে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে আমার খাতার ওপর। একই সূর্য্যালোক! সবিস্ময়ে এই কথাটাই ভাবতে ইচ্ছে করছে বারবার।

ক্রমশ

"বনফুল"

বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ

জামসেদপুর, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় জানতে চেয়েছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক রূপ ও তাহা সর্বজনমান্য করিবার উপায়' সম্বন্ধে আমার অভিমত কি। আমার উত্তর সম্মেলনে পড়া হয়। আমার বক্তব্য সংক্ষেপে এই ছিল। বহু দিন পূর্বে 'সাধু ও চলিত ভাষা' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তা থেকে কিছু কিছু নিয়েছি।

সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল—বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ। তার মানে এই বুঝেছি—লিখিত বা সাহিত্যিক বাংলা ভাষার চেহারা কিরকম হ'লে আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী হবে। অর্থাৎ সাহিত্যের বাহনই আলোচ্য, বাহিত বিষয় অপ্রাসঙ্গিক।

ভাষার রূপের তিন অঙ্গ—(১) লিপি বা বর্ণমালার আকৃতি, (২) শব্দাবলীর প্রকার বা form, এবং (৩) বানান। প্রথম অঙ্গটির আলোচনা করব না, কারণ তার এখনও তেমন তাগিদ নেই।

শব্দাবলীর প্রকার নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে, এখনও তা থামে নি। সাধুভাষা ভাল, না চলিতভাষা ভাল? তার ভঙ্গী কিরকম হওয়া উচিত —বঙ্কিমীয়, প্রাচীন রবীন্দ্রীয়, আধুনিক রবীন্দ্রীয়, না অত্যাধুনিক তরুণ-বিক্রীড়িত?

যদি সংজ্ঞার্থ (definitions) ঠিক না থাকে তবে বিতর্কে বৃথা বাক্যব্যয় হয়, সেজন্য প্রথমেই 'মৌখিক, লৈখিক, সাধু, চলিত' এই কটি সংজ্ঞার অর্থ বিশদ হওয়া দরকার।

আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিক ভাষা আছে, তা রাঢ়ের বা পূর্ব

বঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। যদি কথাবার্তায় প্রাদেশিকতা বর্জন করিতে চাই তবে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিক ভাষার অনুরূপ ক'রে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হ'ক, আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্বসম্মত, যার দ্বারা সকল বাঙালীর সঙ্গে আমার 'সাহিত্য' বা সহযোগ হয়, অর্থাৎ যা সাহিত্যের উপযুক্ত।

মৌখিক ভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিক ভাষা দেখে অর্থাৎ প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব। লৈখিক ভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে এক রকমে না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিক ভাষা সর্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হ'ক।

আজকাল বাংলা সাহিত্যে যে ভাষা চলছে তার দুই ধারা—সাধু ও চলিত। প্রথম ধারা অবশ্য প্রবলতর। কিন্তু তার কিছু পরিবর্তন যে দরকার তা অনেকেরই মনে হয়েছে। পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয়ও এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

'সাধুভাষা'র মানে সৎলোকের বা সভ্য লোকের ভাষা নয়। 'চলিতভাষা'র মানে প্রচলিত ভাষা নয়। বাংলা ভাষার বিশেষণ হিসাবে 'সাধু' আর 'চলিত' দুটিই রূঢ় শব্দ, দুই ভাষাই লৈখিক বা সাহিত্যিক। সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান প্রভেদ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের জন্য, যথা—'তাঁহারা বলিলেন' কিংবা 'তাঁরা বললেন'; এবং কতকগুলি অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের জন্য, যথা—'উঠান একচেটিয়া মিছা সুতা' কিংবা 'উঠন একচেটে মিছে সুতো'। আর যা প্রভেদ দেখা যায় তা লেখকের ভঙ্গীগত। কেউ বা বেশী সংস্কৃত শব্দ ও সমাস, কেউ বা বেশী বিদেশী

শব্দ চালান; কেউ বা পদবিন্যাসে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের চেষ্টা করেন। কিন্তু এসকল ভঙ্গী সাধু বা চলিত ভাষার বিশেষক লক্ষণ নয়।

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিতভাষা আর পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষা একই। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। সাদৃশ্য এই পর্যন্ত আছে যে চলিতভাষার সর্বনাম ক্রিয়াপদাদি উল্লিখিত কতকগুলি শব্দের বানান ভাগীরথীতীরস্থ কয়েকটি জেলার মৌখিক ভাষার শিষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। কিন্তু ঐসব জেলাবাসী লেখক যখন চলিতভাষায় লেখেন তখন তিনি তাঁর মুখের ভাষার সর্বাঙ্গীণ অনুসরণ করেন না। তিনি তাঁর বন্ধুকে হয়তো বলেন—'গ্যালো রোব্বারে কোথা গেশলে হ্যা?' কিন্তু লেখেন—'গেল রবিবারে কোথা গিয়েছিলে হে?' লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয় কথাবার্তায় ততটা হ'তে পারে না।

সাধু বা চলিত যাই হ'ক, সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার সমান হ'তে পারে না। তথাপি কোনও এক অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ভিত্তিতেই লৈখিক ভাষা গ'ড়ে ওঠে এবং কালক্রমে একের পরিবর্তনের ফলে অপরের পরিবর্তন আবশ্যক হয়। এই পরিবর্তন বিনা বিতর্কে বিনা পরামর্শে সাধুভাষায় কিছু কিছু ঘটেছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। 'লিখা শিখা শুনা ঘুরা লতানিয়া জলুয়া হয়েন যায়েন' স্থানে এখন সাধুভাষাতেও 'লেখা শেখা শোনা ঘোরা লতানে জ'লো হন যান' চলছে। এই পরিবর্তন জীবন্ত ভাষার লক্ষণ এবং তা সাধারণের অজ্ঞাতসারে হয়েছে। ভাষার গতি বুঝে সজ্ঞানে সবিচারে আরও অগ্রসর হ'লে ক্ষতি হবে না।

লৈখিক ভাষার অবলম্বন হিসাবে পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষারই

যোগ্যতা বেশী, কারণ এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে। কিন্তু যদি পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে প্রগতি না হয়ে বিপ্লব হবে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বানান আর উচ্চারণের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। ও-কার আর হস্-চিহ্নের বাহুল্যে লেখা কণ্টকিত করায় কিছুমাত্র লাভ নেই, অর্থবোধ থেকেই অভীষ্ট উচ্চারণ আসে। লৈখিক বা সাহিত্যিক ভাষার রূপ ও পদ্ধতি নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বমান্য হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিক ভাষা থেকে অল্পাধিক প্রভেদ—অপরিহার্য।

সাধু আর চলিত দুরকম লৈখিক ভাষার পৃথক অস্তিত্বের আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না। দুইএর সমন্বয় অসাধ্য নয়। এমন লৈখিক ভাষা চাই যাতে বর্তমান সাধুভাষা আর মার্জিতজনের মৌখিক ভাষা দুইএরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংক্ষেপ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিক ভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না।

আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করছি।—

(১) ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের সাধু রূপের বদলে চলিত রূপ গৃহীত হ'ক।

(২) অন্যান্য অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের কতকগুলির সাধু রূপ এবং কতকগুলির চলিত (অথবা পশ্চিমবঙ্গীয় মৌখিক) রূপ গৃহীত হ'ক। যে শব্দের সাধু আর চলিত রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধু রূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর পেছন পেতল ভেতর' না লিখে 'উপর পিছন পিতল ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার

চলিত রূপই নেওয়া হ'ক, যথা—'কুয়া মিছা উঠান একচেটিয়া' স্থানে 'কুয়ো মিছে উঠন একচেটে'।

(৩) বর্তমান সাধুভাষায় প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতরূপে রাখা হ'ক। 'সত্য মিথ্যা নূতন অবশ্য শীঘ্র জিজ্ঞাসা' স্থানে 'সত্যি মিথ্যে নোতুন অবিশ্যি শীগ্‌গির জিজ্ঞেস' লেখা হবে না।

(৪) বর্তমান সাধুভাষার কাঠামো বা অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অন্ধ অনুকরণ অথবা অকারণে কর্তা কর্ম ক্রিয়ার বিপর্যয় বর্জনীয়।

এ ভাষায় অনুবাদ করলে সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এতে দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না এমন আশঙ্কা অমূলক। দুরূহ সংস্কৃত শব্দ এবং সমাসের সঙ্গে মৌখিক ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম চালালেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। বলা বাহুল্য, গল্পনাটকাদির পাত্রপাত্রীদের মুখে সব ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি।*

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে প্রস্তাবিত ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দিচ্ছি। কেবল সর্বনাম ক্রিয়াপদ বদলানো হয়েছে।

'মহাভারতে এও দেখতে পাই যে যাতে যুদ্ধ না হয় তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করেছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠল, তখন তিনি যুদ্ধে কোনও পক্ষে ব্রতী হতে অস্বীকৃত হয়ে কেবল অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হলেও তিনি পরম ধর্মজ্ঞ, সুতরাং ওস্থলে ধর্মের পথ কোন্‌টা, তা অর্জুনকে বোঝাতে বাধ্য। অতএব অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন যে যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম।' (শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়)

'স্ত্রীর বেনামিতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ, এ মুচিরাম বুঝলেন; কিন্তু এই সংকল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল—মুচিরামের স্ত্রী নেই। এ পর্যন্ত তাঁর বিবাহ করা হয় নি। অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এস্থলে অনুকল্প চলবে কিনা তদ্‌বিষয়ে

ভাষার রূপের তৃতীয় অঙ্গ বানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের কতকগুলি নিয়ম সংকলন ক'রে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তা সকল সাহিত্যসেবীকেই প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও তাঁর লিখিত দৃষ্টান্তের প্রভাবে নূতন বানানগুলি ধীরে ধীরে প্রচলিত হচ্ছে। সবিস্তার আলোচনা না ক'রে নূতন বানানের কয়েকটি প্রধান বিধি জানাচ্ছি।

(১) হিন্দী মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি সংস্কৃতজাত ভাষায় রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না। ব্যাকরণ অনুসারেও দ্বিত্ব আবশ্যক নয়। বাংলাতেও দ্বিত্ব বর্জনীয়, 'কর্ম্ম' লিখতে একটা ম যথেষ্ট।

(২) কতকগুলি বাংলা শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'ছিল বড় কত'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দে হয় না, যথা—'ছিলেন তোমার কেমন'। শেষোক্ত শব্দগুলিতে হস্-চিহ্ন দেওয়া হয় না, যদিও উচ্চারণ হসন্ত। যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকে তবে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন বর্জনীয়। 'ওস্তাদ পকেট হুক ডিশ' প্রভৃতি শব্দে হস্-চিহ্নের কোনও দরকার নেই।

(৩) অ-সংস্কৃত শব্দে ণ থাকবে না, কেবল ন। 'কান বামুন কোরান করোনার' প্রভৃতিতে ন। এই প্রথা নূতন নয়, অনেক খ্যাতনামা লেখক বহু দিন থেকে এইরকম লিখছেন। নূতন নিয়মে ন-র প্রয়োগ সকল অ-সংস্কৃত শব্দেই বিহিত হয়েছে।

(৪) আরবী ফারসী ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে বাংলা বানানে s স্থানে স, sh স্থানে শ হবে। যথা—'জিনিস

পেশকার মহাশয় কিছু সন্দিহান হলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হ'ল—কিন্তু ভজগোবিন্দ এক প্রকার বুঝিয়ে দিলে যে এস্থলে অনুকল্প চলবে না। অতএব মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন।' (মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত, ৮ম পরিচ্ছেদ)

সরকার ক্লাস নোটিস' দন্ত্য স; 'শরম শুরু শাগরেদ শেমিজ পালিশ' তালব্য শ। হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতেও এই রীতি চলে, অনেক বাঙালী মুসলমান লেখকও এই রকমে বানান করেন।

(৫) নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় বর্জনীয়। war—ওআর, ওয়ার নয়। কিন্তু wire—ওয়ার। বক্র আ (বা বিকৃত এ) বোঝাবার জন্য আদিতে অ্যা, মধ্যে বা অন্তে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড হ্যাট'।

(৬) পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয় চলিত ক্রিয়াপদের খামখেয়ালী বানানের নিরূপণ চেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কৃত নিয়মে তা আছে। 'বল্লেন কর্ছিল' নয়, 'বললেন করছিল'।

কেউ কেউ বলেন—এইসব নিয়মের কতকগুলি পালন করতে গেলে নানা ভাষায় জ্ঞান দরকার। 'জিনিস'এর মূল 'জিন্‌স্', 'শাগরেদ'এর মূল 'শাগির্দ্' তা কত লোক জানে? দন্ত্য স বা তালব্য শ স্থির করবে কি ক'রে? আমি বলি, জানবার বিশেষ দরকার নেই। ব্যুৎপত্তি না জেনেও আমরা শিখি যে 'উজ্জ্বলে'এ ব-ফলা আছে কিন্তু 'কজ্জল'এ নেই। যাঁরা জানেন এবং যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁরা নির্দেশ দেবেন এবং সাধারণে ক্রমে ক্রমে শিখবে।

রাজশেখর বসু

ওমরখৈয়ম

কাদার তালের রূপ জানে শুধু কুম্ভকারে,
দেড়শ বছর কুম্ভকারের ঘুরছে চাকা—
একজন গড়ে, আর জন এসে ভাঙছে তারে,
আজ কলকাতা, কালকে ফ্যাশান চাটগাঁ-ঢাকা।

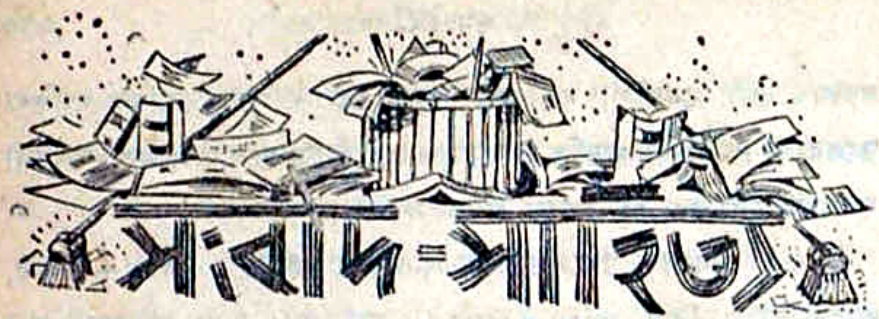

সেদিন স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; পত্র-লেখক আজকালকার স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক-গুলির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা বাঙালী লেখকদের রচনার নিদর্শনের একান্ত অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সত্যই আমাদের চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। যে সকল পুস্তক বাংলা সাহিত্যের গঠনে সহায়তা করিয়া একদিন বাংলা দেশের সর্ব্বত্র পঠিত ও সমাদৃত হইয়াছিল, আজকালকার ছাত্রেরা সে সকল পুস্তকের নামই জানে না। টেক্সট-বুক-কমিটির সভ্যদের পরস্পর পিঠ-চুলকানি এবং প্রকাশক-সম্প্রদায়ের সহিত বাধ্যবাধকতা ও দহরম-মহরমের ফলে যে সকল অতি-অর্ব্বাচীন পুস্তক পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হয়, সেগুলি দেখিলে বাংলা দেশের আধুনিক শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এই যে, যাঁহাদিগকে আমরা পণ্ডিত ও চিন্তাশীল বলিয়া জানি, প্রকাশকদের হাতে মোটা ঘুষ খাইয়া তাঁহারাও পাইকারী দরে এই সকল কদর্য্য পুস্তক নির্ম্মাণে তৎপর হইয়াছেন। যাঁহাদিগকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানি, এরূপ কয়েকজন পণ্ডিতের নামাঙ্কিত পাঠ্যবই দেখিয়া আমরাই লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি। আমাদের সন্দেহ হইয়াছে, তাঁহারা পয়সার লোভে নাম ধার দেন, নিজেরা লেখেন না। সর্ব্বাপেক্ষা

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কমিটির সভ্যেরাই গ্রন্থ-লেখক; সুতরাং এই ব্যভিচারে তাঁহারা পরস্পর সহায়তা করিয়া থাকেন। এরূপ অনেকগুলি জঘন্য এবং ভয়াবহ পাঠ্যপুস্তক আমাদের হাতে আসিয়াছে। আমরা সেগুলির সমালোচনা করিতে বাধ্য। ভবিষ্যতে "প্রসঙ্গ কথা" বিভাগে এই সকল পাঠ্যপুস্তক সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * *

যে কারণে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম, তাহা নিবেদন করিতেছি। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য "প্রসিদ্ধ লেখক নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত" ও প্রসিদ্ধ প্রকাশক "বেঙ্গল পাবলিশার্স" কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একটি পুস্তক সম্প্রতি খরিদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। একদিন সন্ধ্যায় কোনও কাজ ছিল না; পুত্র কি জাতীয় "জ্ঞান-বিজ্ঞান" শিখিতেছে, তাহা দেখিবার আগ্রহ হইল। বইখানি পড়িতে বসিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলাম, লেখককে তাঁহার বাল্যকালে "জ্ঞান-বিজ্ঞান" শিখাইবার কোনও বন্দোবস্ত কেহ করে নাই। বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার একটি মাত্র করণীয় আছে। নিজ সন্তানকে এই জাতীয় "জ্ঞান-বিজ্ঞান" হইতে রক্ষা করা এবং আজিও যাঁহারা ঠকেন নাই, তাঁহাদিগকে সাবধান করা। পুত্রের মারফৎ অনেকগুলি টেক্সট-বই সংগ্রহ করিলাম। নিজে পণ্ডিত নই, তবু মাথা ঘুরিয়া গেল। কচি গাছের গোড়ায় যাহারা অবিরাম নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছে, সেই সকল ছাগলদের না তাড়াইয়া বুদ্ধদেব-প্রবোধ সান্ন্যালদের পিছনে ধাওয়া করা সঙ্গত নয়, এই কথাই মনে হইল।

* * *

'জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। "জানবার বিষয়" বিভাগে দেখিতেছি—

১২। শোনপুরের প্ল্যাটফরম্ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা। ইহার দৈর্ঘ্য ২৪১৫ ফিট। এই ষ্টেশনটি বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের অন্তর্গত।

২৪। ম্যান্‌চেষ্টার ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম।
৫। আমাজন নদী পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়।
২১। উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী।
৩। স্কটল্যাণ্ডের টে ব্রীজ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা।
২০। আমেরিকার অক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ৪½ মাইল। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়।

পাতায় পাতায় এরূপ ভুল ও অসঙ্গতি। বৈদেশিক নামের ধরিয়া রূপ ভয়াবহ। কৌতুকও আছে। যথা—

গয়া—মৃত্যুর পর পিণ্ডদানের জন্য হিন্দুগণ এখানে আসিয়া থাকেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।

রবীন্দ্রনাথ—গীতাঞ্জলি রচনা করিয়া ইনি সর্ব্বপ্রথম সমগ্র বিশ্বে তাঁহার অসামান্য কবি প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯১৩ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁহার রচিত 'গোড়া', (গল্প), পূড়বী, বলাকা, মহুয়া প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলি তাঁহার কবি প্রতিভার পরিচয় দেয়।

এ বিষয়ে আমাদের নীড়ব থাকাই ভাল।

রাধাকৃষ্ণণ—একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যাপক।

লেখকের প্রদেশপ্রীতির পরিচায়ক।

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনিষীগণ"—এই শিরোনামায় উদয়শঙ্কর ও গুরুসদয় দত্তের নাম দেখিয়া লেখকের নৃত্যপ্রীতি সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

৫৪ পৃষ্ঠায়—

হ্যাভ্‌লক্‌—একজন প্রখ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ। ইনি এই অল্প দিন হয় মারা গিয়াছেন।

মারা গিয়া বাঁচিয়াছেন।

—

আমাদের গত সংখ্যায় উল্লিখিত 'বঙ্গদর্শন'-পুনঃপ্রকাশক "দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানি" ২৪ টাকা মূল্যের 'জ্ঞানভারতী' প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে "পৃথিবীর যে-কোন দেশের যে-কোন সময়ের যে-কোন বিষয়ের যা কিছু জ্ঞাতব্য আপনার চোখের সম্মুখে"। এই মহামূল্য গ্রন্থখানি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিতেছেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; বিশ্বভারতীতে থাকার দরুন তিনি একটি বিশ্বজ্ঞানের ডিপো। 'জ্ঞানভারতী'র ৮ পৃষ্ঠা (এক ফর্মা) নমুনা আমরা পাইয়াছি—"চ্যাপ্‌টা" হইতে "জগন্নাথ" পর্য্যন্ত। "চ্যাপ্‌টা মাপনী" ও ঠুঁটো জগন্নাথই 'জ্ঞানভারতী'র পরিচয়! আট পৃষ্ঠার কেরামতি দেখিলেই "দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানি"কে ভাল করিয়া চেনা যাইবে।

ছাগ, ছাগল—...সাধারণত মাংসের জন্য ইহাকে লোকে পোষে।...হিন্দুরা কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবীর কাছে ছাগ বলি দেয়। বাজারের কসাইরা ইহার মাংস বিক্রয় করে। ছাগের চামড়াকে ছাল (skin) বলে।...পাঁটা বেশি বড় হইয়া গেলে গায়ে দুর্গন্ধ হয়। [জ্ঞাতব্য সংবাদ!]

জগৎ শেঠ—...মীরজাফর পরাভূত হইয়া পলায়ন কালে ইহাদের সঙ্গে লইয়া যান ও হত্যা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লন। [মীরজাফর=মীরকাসিম]

জগদীশ গুপ্ত—ইনি বাঙলা মাসিকে প্রথম ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। [হায় রবীন্দ্রনাথ!]

জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর—ময়মনসিংহে জগদীশের জন্ম হয় (১৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৮, ৩৪ নভেম্বর ১৮৫৮ [নভেম্বর মাস ৩৪ দিনেও হয়! বাংলা ইংরেজী সনে দশ বৎসরের তফাতও হইতে পারে!] ...ক্রেসোগ্রাফ নামে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের...[ক্রেস্কোগ্রাফ নয়!]

আমাদের ন্যাশন্যাল লিটারেচারের জয়জয়কার!

—

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী পৌষের 'কবিতা'য় "অর্থনীতি" সম্বন্ধে কাব্যালোচনা করিয়াছেন—তবু ইকনমিক্স-পলিটিক্সের ডক্টরেট নয় তাঁহার। সবটা না বুঝিলেও মাঝে মাঝে যে তথ্যের চমক আছে, তাহাতে শূন্যপকেটে মনটা খুশি হইয়া উঠিল। বেনামিতে একটু আত্মপরিচয়ও আছে—

বাজার নিয়ে বিশ্ব এবং বিশ্ববিদ্যার ব্যবসায়,
কার পদার্থ কতটা, কিসে হয় পায়া ভারি
বুঝেচ এতক্ষণে, হে পিয়ারী—
বইয়ের আল্‌মারির দামে জ্ঞানের ওজন পয়সায়।

বিলেতফের্তা বটে—তা বটে—সুনীত সেন, তবু কেন প্রফেসারির গ্রেডে ওঠেনি ?

টীকাকার বলিতেছেন—হে ইয়ার, এ অপবাদ তো আর দেওয়া চলে না।

—

মাঘের 'পরিচয়ে' এ যুগের সাহিত্যিকদের যে পরিচয় আছে, তাহাকে সত্যকার গদ্য-কবিতা বলা যায়। একটানা না ছাপাইয়া এই ভাবে ছাপিলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত।

এ যুগের সাহিত্যিক আর ভীরু নয়।
সে সৈনিক।
সে মসিজীবী বটে,
কিন্তু অসি ধরতেও জানে।
এরা writers in arms.
'জনসাগরে' অমৃতের সন্ধান করতে হলে,
নির্ভীক পুরুষসিংহের মত তাকে
জনগণের মাঝখানে নেমে আসতে হবে।

ইহাদের ঠিকানা জানা থাকিলে নিমন্ত্রণ করিতাম। 'পরিচয়ে' পরিচয় আছে, কিন্তু ঠিকানা নাই।

—

ভুল সকলেরই হয়, বুদ্ধদেব বসুরও হইয়াছে।

ট্র্যাম থেকে নেমে
ক্লান্ত, ভারি, জুতো-আঁটা।
নিঃসাড়, মাড়াই।
ঐ তো আমার বাড়ি, রাস্তাটুকু হাঁটা।
ঘাস ছেড়ে অ্যাসফল্টে, নকল পাথরে,
সিঁড়ির কংক্রীটে আর বারান্দার ইঁটে
চাপা, ফাঁপা, চড়া শব্দে জুতো

মগজেরে প্রভেদ জানায়।
মগজেই ঘাস।

সারকে ফসল বলা ভুল।

—

ফাল্গুনের 'প্রবাসী'র মলাটের সচিত্র তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—

তারকার ইঙ্গিত। ছায়া-ছবির জগতের বিশিষ্ট অভিনেত্রী,...বিখ্যাত চিত্র-তারকা...

এই সঙ্গে "বিবিধ প্রসঙ্গ" ৬৮৮ পৃষ্ঠা দেখিতে হইবে—

নারীজাতীয়া সিনেমা-উপগ্রহদের ছবির বাহুল্যে বঙ্গে প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট চিত্রকলাসম্মত চিত্রের আদর নাই, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ কথাটাও এখানে বলা আবশ্যক। ইহাদিগকে ষ্টার বলা হয়। কিন্তু উপগ্রহ (satellites) বলিলে অপেক্ষাকৃত ঠিক বলা হয়।

"উপ" অর্থপূর্ণ। কিন্তু "উপগ্রহের ইঙ্গিত" কি অর্থপ্রসূ হইবে ?

—

শহর কলিকাতায় বসিয়া ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষ' পড়িতেছিলাম। মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রদীপ্তি স্তিমিত। সামনের বাড়িতে রেডিওতে গান হইতেছে। প'ড়ো মাঠটার ছাতিমগাছের শাখায় একদল কাক সম্ভবত বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে।

ভালই লাগিতেছিল। হঠাৎ কে যেন চাবুক মারিল—"শ্রীনিকেতন"-প্রবন্ধের লেখকের উক্তি—

আমরা শহরবাসী। পঙ্গু প্রভাত, ম্লান মধ্যাহ্ন, নীরস দিন নীরবে অতিবাহিত করি প্রাচীর ঘেরা নিঃসাড় কারাকক্ষে—শহরের সংকীর্ণ সসীম সীমানায় বসে ভাবি, শহর সভ্যতার বোঝা নামিয়ে কোন দিনও কি আমরা ছুটে যাব না আমাদেরই একান্ত জনের কাছে—বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ? গুরুদেবের মহান আদর্শ কোন দিনও কি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে না—যারা আমাদের মেরুদণ্ড তাদেরই মেরুদণ্ডে আজ ধরেছে ঘুণ! আর কতদিন অলীক অহঙ্কার বুকে ব'য়ে উদাসীনতার চাপে নিশ্চিন্তে আমরা দূরে সরে থাকব!

মধ্যাহ্নের মৃত্যু হল। অপরাহ্নের আরম্ভ। আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টি বিচিত্র—এই আসে, এই যায়।

ভাল-লাগাটা বিস্বাদ হইয়া গেল। বুদ্ধদেববাবু সত্যই বলিয়াছেন, "মগজেই ঘাস।"

—

আত্মগ্লানির মধ্যে 'কবিতা' পড়িতে লাগিলাম—"আমি : যখন"—

কখনো কুকুরতন্দ্রা-ভাঙা
আমার চৈতন্য যেন ট্রেন এক, রাত্রির টানেলে।
অভিভূত জাগরণ নিমজ্জিত স্নানার্থীর পায়ে তবু আনে যেন ডাঙা।
প্রহান্তরবাদ পাই অতিক্রান্ত মানস পা-ফেলে।
রক্তসার মদ ঝরে গতির ফানেলে।

সুভাষচন্দ্র কেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, এত দিনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। ইদানীং তিনি 'কবিতা' পড়িতেছিলেন।

—

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র পৌষের 'নিরুক্তে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—

বাংলার আধুনিক যুগপ্রবর্ত্তক কবিদের সম্বন্ধে সব চেয়ে মজার কথা এই যে তাঁদের সদ্যস্ত নিনাদিত নূতনত্বটাও একেবারে নির্লজ্জ নকল। কাব্যের নামে যে বিকৃত প্রলাপ তাঁরা চালাতে চান তাও খানিকটা করুণার যোগ্য হয়ত হত যদি বোঝা যেত এখানকার কাব্যের হাওয়াতেই এ ব্যাধির উৎপত্তি। কিন্তু নিজস্ব রীতি প্রবর্ত্তন দূরে থাক তাঁদের বিকৃতিটাও বিদেশী আমদানি। বাইরে থেকে ব্যাধির বীজ সংক্রামিত হওয়াটাই তাঁরা নূতনত্বের বাহাদুরী বলে প্রচার করতে চান।...কাব্যের বর্ত্তমান বিকার সম্বন্ধে তাঁর [মোহিতলাল মজুমদারের] কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা উদ্ধৃত করে আজকের মত এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

"কবিতার ভঙ্গি ও রূপ এমন কি ভাবের আদর্শও স্বতন্ত্র এবং অভিনব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন একটা সুস্থ হৃদয়-মনের অধিগম্য ভাব, অর্থ ও রস থাকা দরকার; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা আত্মভাববিলাসের একটা সীমা আছে। তা' ছাড়া কবির মনোভাব যতই মৌলিক হোক, এবং তজ্জন্য প্রকাশভঙ্গির নবত্ব যতই অবশ্যম্ভাবী হোক, ভাষার উপরে জোর জবরদস্তিরও একটা সীমা আছে। তাহা না মানিলে কবিতা সেই ভাষাভাষী সমাজের—মনুষ্যসাধারণের কোন প্রয়োজনে লাগে না। এরূপ কবিতা প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিলাতি আধুনিকতার আমদানি বা অনুকরণে প্রতিভার প্রমাণ নাই; যাহা সহজে অনুকরণসাধ্য তাহা মুদ্রাদোষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছন্দ-মিল না থাকিলে রচনায় রসসৃষ্টি হয়, তার প্রমাণ গদ্যরচনাতেই আছে।

কিন্তু ভাবের সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতা এবং ভাষার পরিচ্ছন্নতা না থাকিলেও যদি কবিতা হয় তাহা হইলে যে যত মূর্খ এবং বিকৃতমস্তিষ্ক সে তত বড় কবি।"

নিরুক্তের নিজস্ব বক্তব্য—এর চেয়ে সুস্পষ্ট করে বলা সম্ভব ছিল না।

—

গত সংখ্যার "সংবাদ-সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর বিরুদ্ধে আমরা যে অভিযোগ আনিয়াছিলাম, তিনি তাহার ছন্দোবদ্ধ একটা জবাব পাঠাইয়াছেন, নিম্নে সেটি মুদ্রিত হইল।—

"বন্দীবীরে"র জবানবন্দি—

সম্পাদক মহাশয়,—
গুরু অভিযোগ আনি' পুকুর চুরির,
ধরেছেন ছল্-কলা গুপ্ত-চাতুরির;
ফস্ করে তস্করে করি গ্রেপ্তার বামাল—
করেছেন একেবারে চোরে বে-সামাল।
নাহি মানি দিন, ক্ষণ, পুণ্যাহ পাঁজির,
শনির বিচারালয়ে করেন হাজির।
বন্দীর জবানবন্দি লিখিত ছড়ায়;
হুজুরে হাজির করি এ কাঠ্-গড়ায়;
অপরাধ হয় যদি মারুন দু' কীল,
নাহিক মোক্তার মোর, নাহিক উকীল।
বহু বছরের কথা, মোর প্রকাশক—
অনুরোধ করে মোরে লিখিতে নাটক;
দেরাজ হইতে টানি বই কবিতার
দিল হাতে, দেখিলাম ছেঁড়া সবি তার,
নাহিক মলাট তার, নাই 'টাইটেল',
পুরাণ, কোরাণ, কিম্বা বেদ, বাইবেল,—
রচয়িতা কোন্ জন, কি নাম তাঁহার
প্রথম দর্শনে কিছু বোঝা হোলো ভার।
বুঝিলাম চক্ষু দুটি বুলায়ে পাতায়;
'পুরু-সেকেন্দার' কথা—লিখিত গাথায়;
বন্ধু প্রকাশক কহে "এই বই নাও,
এইরূপ একখানি নাটক বানাও।
ছন্দ ছেড়ে গদ্যে লেখো, লেখো যথাযথ,
পরোয়া কোরো না কিছু কারো মতামত।"
প্রকাশক বন্ধুবরে আমি কহিলাম,
"কে ইহার রচয়িতা, কিবা তাঁর নাম?
যথাযথ ভাবে যদি লিখি এ নাটক
বিরক্ত হইতে পারে লেখক-পাঠক।"
আবার কহিল বন্ধু "লেখো যথাযথ
পরোয়া কোরো না কিছু কারো মতামত।"
আমি বলি "তুমি বেশ আছ নির্ব্বিকার,
ভূমিকায় ঋণ যদি না করি স্বীকার,
বড়ই অন্যায় হবে, হবে অপরাধ—
হয়তো বহিতে শিরে হবে অপবাদ।
লেখকের নাম আমি জানিবারে চাই।"
বন্ধু বলে,—"নাম জেনে প্রয়োজন নাই।
ভূমিকায় স্বীকারেরও কিবা প্রয়োজন,
নাটক লেখার তুমি কর আয়োজন।"
কথা শুনে বন্ধুবরে আমি কহিলাম
"বইটি লিখিব, নাহি দিব মোর নাম।"
মোর বাক্যে প্রকাশক উৎসাহ না পায়,
গ্রন্থকার রূপে মোর নামটি ছাপায়।
"যথাযথ" লিখিবার পেয়েও আদেশ,
নতুন অনেক অংশ করি সন্নিবেশ;
"বন্দীবীর" আর সেই "ভারতবীরে"র
দৃশ্যে, অংশে, সংলাপেতে ভেদ আছে ঢের।

তথাপি সরল ভাবে সবারে জানাই
আদর্শ আমার ছিল এ বইখানাই।
সাহায্য যেটুকু আমি নিয়েছি লিখায়,
স্বীকার করেছি তাহা গ্রন্থ-ভূমিকায়।
লেখকের নাম যদি আগে জানিতাম,
আনন্দে তাঁহার নাম অবশ্য দিতাম।

—

'প্রবাসী' পত্রিকার ১১ই মাঘ সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৪৭) রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি মনীষীরা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় "সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজো প্রশমিত হয় নি।" এরূপ অনুযোগের অর্থ বুঝা দুষ্কর। বাংলা দেশের শিক্ষিত-সমাজের হাজার-করা নয় শত নিরানব্বইজন রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং অশিক্ষিত সমাজের হাজার-করা নয় শত নিরানব্বইজন তাঁহার নামের অস্তিত্বই অবগত নয়। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন নিশ্চয়ই শিক্ষিত-সমাজের হিসাবই ধরিয়াছেন। এ যুগে রামমোহনের বিরোধিতা করিয়াছেন এরূপ কোনও শিক্ষিত বাঙালীর খবর আমরা জানি না। তাঁহার ভক্তসম্প্রদায় যে সময়ে সময়ে নানা লোকহিতকর ব্যাপারের জনয়িতা হিসাবে অকারণে তাঁহার নাম করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিবাদ কেহ কেহ করেন বটে। ইহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান মাত্র—বিরোধের উত্তাপ নয়। এরূপ ঐতিহাসিকও বাংলা দেশে একজন বা দুই-জনের অধিক নাই। প্রিন্স দ্বারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, শিবনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, রমাপ্রসাদ, ক্ষিতিমোহন, যতীন্দ্র, প্রভাত, যোগানন্দ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ গত শতাব্দীকাল ধরিয়া রামমোহনের কীর্ত্তি ও চরিত্র প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক কোনও ঈর্ষাদিগ্ধ আত্মীয় অথবা গোঁড়া সমাজবদ্ধ হিন্দু যদি তাঁহার কুৎসা প্রচার করিয়াও থাকেন, কালতরঙ্গে সে কুৎসা তো বৎসরকালও টিকে নাই। বাংলা দেশের আকাশ বাতাস রামমোহনের জয়োচ্চারণে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানের এই কাঁদুনিপূর্ণ অভিযোগের ভিত্তি কোথায়? যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রবল, তাঁহারা পীড়িত ও নিগৃহীত হওয়ার ভান করিলে তাহা শোভন হয় না।

* * *

অথচ যে 'প্রবাসী'তে মাসে মাসে এই কল্পিত আক্ষেপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার পৃষ্ঠাতেই যে গত কয়েক মাস ধরিয়া বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের সাহিত্যকীর্ত্তিকে খাটো করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা কি "সংস্কারের আবিলতা" নয়? যে বিদ্যাসাগরকে সেদিনও মেদিনীপুরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার গুরু ও পথপ্রদর্শকের সম্মান দিয়াছেন, তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করার চেষ্টা কি তাঁহার নজরে পড়ে নাই? সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি মহতেরও মতিভ্রম ঘটাইয়া থাকে, ইহাই কি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া কি আমাদিগকেও বলিতে হইবে—

তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।

['প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৪৭—"চিরস্মরণীয়" পৃ. ৫৮০]

—

চিরকুমার সুভাষচন্দ্র দীর্ঘকালের সাধনার পর "রাষ্ট্রপতি" হইয়াছিলেন; পরে কেহ কেহ তাঁহাকে "লোষ্ট্রপতি" আখ্যা দিয়াছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যে প্রফেসর "গণপতি" হইয়া বাক্স খালি করিয়া উধাও হইবেন—পতিত্বের এই পরিণতি কে কল্পনা করিয়াছিল?

—

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তাঁহার নাম খারিজ করিয়াছিলেন—এইরূপ গল্প পরম্পরায় শুনিতে পাই। এ যুগে ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়েরও সে দুর্গতি ঘটিয়াছে। সেদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক তাঁহাকে যে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হইয়াছে, এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসী 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং সেই সম্বর্দ্ধনা-সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানের খবর 'প্রবাসী'তে বাহির হয় নাই। অথচ অনেক অযোগ্যতর লোকের সম্মানের খবর 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গ" বিভাগে আমরা পাইয়া থাকি। অনুমান হইতেছে, দত্ত মহাশয়ের 'গীতায় ঈশ্বর-বাদ' পুস্তকের নামের হাইফেনটি এই বিভ্রাট বাধাইয়া থাকিবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবত উহাকে 'গীতায় ঈশ্বর বাদ' মনে করিয়া দত্ত মহাশয়কে আমল দেন নাই।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত "সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা"র ৫ম ও ৬ষ্ঠ জীবনী 'রামনারায়ণ তর্করত্ন' ও 'রামরাম বসু' প্রকাশিত হইয়াছে। 'কুলিন কুল সর্ব্বস্ব'কে বাংলার প্রথম সার্থক নাটক ধরিলে এই দুইটি জীবনীই পাইওনীয়রদের জীবনী; একজন নাট্য-সাহিত্যের জনয়িতা, অন্যজন বাংলার প্রথম মৌলিক গদ্য-গ্রন্থের স্রষ্টা। উভয়ের কীর্ত্তিই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয়। উভয়ের জীবনই বিচিত্র। রামরাম বসুর জীবন প্রায় উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। ইংরেজদের সহিত প্রথম সংঘর্ষের যুগে একজন বাঙালী কি ভাবে শুধু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে তাঁহাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন, সেই কাহিনী চমকপ্রদ। এই প্রখর বুদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি অন্য বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের অন্যতম জনয়িতা হইতে পারিয়াছিলেন। এই চরিতমালার প্রত্যেকটি গ্রন্থের মূল্য মাত্র চার আনা হওয়াতে সকলের পক্ষেই ইহা সংগ্রহ করার সুবিধা হইবে।

'আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর...'

পরিমিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জন করুন ও সঞ্চয় করুন

ওরিয়েণ্টাল পাব্লিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডে

২, কমার্শিয়াল বিলডিংস্

ব্র্যাঞ্চ ও অফিসসমূহ : ময়মনসিংহ—গৌরীপুর—জলপাইগুড়ি

রাণীগঞ্জ—আসানসোল

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমধুসূদন

'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ—কল্পনা ও কবিশক্তি (৫)

৩

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ যুগের সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে; স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এক-আধটুকু যাহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহাতেই বাল্যাবস্থায় যে সামান্য পরিচয়লাভ, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্যহিসাবে যেটুকু নিগ্রহভোগ, তাহার অধিক সম্বন্ধ তাহার সহিত আর কাহারও নাই। তথাপি সে কাব্যের সহিত পরিচয় যেমনই থাক—তাহার একটা দুর্নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তাহার ভাষা যে অতিশয় কৃত্রিম—দুরূহ ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের দ্বারা কণ্টকিত, অতএব তাহা খাঁটি বাংলা ভাষা নয়—এমন মত রবীন্দ্রনাথের মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা নিত্য-ব্যবহার্য্য ভাষার মত সরল ও সহজ নয় বলিয়া উহা কৃত্রিম, এবং সেইজন্য এক হিসাবে উহা বাংলাসাহিত্যের বহির্ভূত—সাহিত্য ও সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ইহাই প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজে সাহিত্য-বিচারে মূল নীতির প্রতিষ্ঠা এখনও সুদূরপরাহত। ভাষা কোন্

যুগে কি রূপ ধারণ করিবে—সর্ব্বকর্ম্ম ও সর্ব্বজনের উপযোগী ভাষা কি হইবে, সে সমস্যা কোন মৌলিক প্রতিভাশালী কবির সমস্যা নয়। রবীন্দ্রনাথের মত একজন এতবড় সাহিত্যস্রষ্টাও তাঁহার নিজের রুচি-সম্মত বা শিল্পী-মনোমত কোন রীতিকে ভাষার একমাত্র রীতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না; তেমন রীতি একটা ফ্যাশন বা গড্ডালিকা-রীতিই হইতে পারে। ভাষার কোন ভঙ্গিমা নয়,—তাহার genius বা মূল ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া নব-নব কবির নব নব বাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই ধর্ম্মকে কেহ নিজেরই রীতির লক্ষণে চিহ্নিত করিতে পারে না, একটা বিশেষ প্যাটার্নে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে পারে না। যত বড় প্রতিভাই হোক—তাঁহার স্টাইলের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ভাষার সেই ধর্ম্মটিকে বজায় রাখিয়াই নিজস্ব বাণীকে গড়িয়া লইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যে স্টাইল তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই, তাহা আর কাহারও হইতে পারে না; সেই স্টাইল সত্ত্বেও বাংলা গদ্য-ভাষার যে ধর্ম্মকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই একটি সাধারণ রীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সে রীতির পরিমার্জ্জন ও পরিশোধন এখনও চলিতেছে, এবং তাহাতে দেখা যাইতেছে, সেই রীতিতে ভাষার ধর্ম্ম এমন ভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, তাহার বহিরঙ্গের সংস্কার যতই হোক, মূলে তাহাই বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ। কিন্তু ইহাও গদ্যের ভাষা, কাব্যের ভাষায় কোন রীতির প্রশ্নই উঠে না। সকল কবির মতই, মধুসূদনের ভাষাও তাঁহার নিজস্ব—সে ভাষা আর কাহারও অভীষ্ট ভাষা হইতে পারে না, হইলে তাঁহার কাব্য কাব্যই হইত না। রবীন্দ্রনাথ ততটা না বলিয়া কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, সে ভাষা খাঁটি বাংলা নয়; 'মেঘনাদবধ কাব্য' খাঁটি বাংলা ভাষায় ও খাঁটি বাংলা ছন্দে রচিত হইলে সমান উপাদেয় হইত। কিন্তু, প্রকৃত কাব্য-সমালোচনার দিক হইতে, ইহারও অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে কাব্য সত্যকার কাব্য হয় নাই; কারণ, কাব্য ও কাব্যের ভাষা অভিন্ন। সে কাব্য যে আর কোন ভাষায় লিখিত হইতে পারিত, এবং হইলে কিছু-মাত্র ক্ষতি হইত না—এমন কথা বলিলে সে কাব্যের কাব্যত্বকেই অস্বীকার করা হয়। যদি কেহ বলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য' কাব্যই হয় নাই, সে কথার বরং একটা অর্থ হইতে পারে; কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য'

অন্যবিধ ভাষায় রচিত হইলেও, তাহা যেমন কাব্য তেমন কাব্যই থাকিত—এমন কথা সাহিত্য-ধর্ম্মেরই বিরোধী।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা আর কোনরূপ হইতে পারিত না,—ওই-রূপ যে হইয়াছে, তাহাও বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনার প্রমাণ। মধুসূদন তাঁহার কল্পনার অনুযায়ী শব্দচয়নে কেবলমাত্র অভিধানের শরণাপন্ন হন নাই, সেই শব্দরাশির উপরে তিনি নিজের অসামান্য কবিশক্তি প্রয়োগ করিয়া, কাব্যেরই প্রয়োজনে, একটি বিশিষ্ট বাণী-রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে ভাষার শক্তিই বাড়িয়াছে—স্বভাবের বিকৃতি ঘটে নাই। কারণ, একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সে ভাষা, প্রয়োজনমত, প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে অনায়াসে উঠানামা করিতেছে, এবং তাহারও একটি মধ্যস্তর আছে—যাহা কাশীদাস কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত, বাংলা কাব্যের যে খাঁটি সাহিত্যিক ভাষা, তাহারই একটি মার্জ্জিত রূপ। 'মেঘনাদবধ' হইতে আমি, এই আলোচনা ব্যপদেশে, বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিব, তাহাতে আমার এই বিশেষ বক্তব্যটি বুঝাইবার সুবিধা হইবে। একটিতে প্রায় আদ্যোপান্ত সংস্কৃত বা সাধু—অর্থাৎ নিত্য-ব্যবহৃত নয়—এমন শব্দের সমাবেশ আছে, যথা—

এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নরত্রাস। বাহিরিল বেগে,
বারী হ'তে (বারিস্রোতঃসম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে,
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝনঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে।

এই যে ভাষা, ইহার জন্য কি কবির অকারণ অভিধান-প্রীতিই দায়ী? বাংলা ভাষার অনভ্যস্ত এই যে বর্ণনা কবি এইখানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কি আর কোন্ উপায়ে, ওই ভাবমণ্ডল এবং ছন্দধ্বনি বজায় রাখিয়া—যথাযথ প্রকাশ করা যাইত? 'বক্রগ্রীব'এর পরেই 'চিবাইয়া রোষে মুখস্'—এই যে ভাষা, ইহা কি কবির অকারণ অভিধান-প্রীতিই প্রমাণ করে? এই সকল শব্দের মধ্যেই যখন 'কনক-শিরস্ক শিরে' 'আয়সী-আবৃত দেহ' প্রভৃতি পাঠ করি, তখন কি কবির শব্দনির্ম্মাণ-চাতুর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া শব্দের অনাবশ্যক আড়ম্বরে বিরক্ত হইতে হয়? বাংলাভাষার এই যে নূতন সজ্জা—রণসজ্জা—কবি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত শব্দকোষ বা শব্দযোজনা-রীতির যেটুকু সাহায্য লইয়াছেন, তাহা শুধুই কর্ত্তব্য নয়, প্রতিভা ব্যতিরেকে তাহা অসাধ্য। যদি স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ স্থানে ঐ ভাষাই একান্ত উপযোগী, তবে তাহা বাংলাও বটে; কারণ, এই কাব্যের ভাষায় যে একটি মধ্যস্তরের কথা বলিয়াছি—যাহা বাংলা কাব্যের কুল-ভাষা—ইহা সেই মধ্যস্তর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে মাত্র। এইবার সেই মধ্যস্তরের একটি উদাহরণ দিব।—

বন্দী সম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরী, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয়-হৃদয়ে কহ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ, ত্বরা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"

এ ভাষা যে খাঁটি বাংলা ভাষা—বাঙালীর পৈতৃক কবি-ভাষা, তাহা স্বীকার করিতে যাঁহার বাধে, আজিকার সেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যিক নিজেই জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটির ভাষা ও এই ভাষার মধ্যে ধাতুগত পার্থক্য নাই, থাকিলে—একই কাব্যে, একই কবির লেখনীমুখে, এক ছন্দস্রোতে একটি অপরটির অনুধাবন করিত না। আমি যে স্তরভেদের কথা বলিয়াছি, এই দুইটি নমুনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; এই স্তরভেদ যেমন ভাষাভেদ নয়, তেমনই ভাব বা বর্ণনা-বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষার এইরূপ স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা

তাহার শক্তি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। মধুসূদন যেমন পয়ারকে তাঁহার অমিত্রাক্ষরের উপাদান-রূপে লইয়াছিলেন, তেমনই পুরাতন বাংলা কাব্যের ভাষাকেই, তাঁহার নূতন কাব্য-প্রেরণার প্রয়োজনে মার্জ্জিত ও শক্তিপূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা শব্দচয়নের পার্থক্য মাত্র—এ পার্থক্য স্টাইলের পার্থক্য নয়, ইহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। কাব্যের বিশিষ্ট ভাব-মণ্ডল—কবির নিজেরই অন্তরের সৃষ্টি; ভাষা ও বাণীসঙ্গীতের মূলে সেই ভাব-মণ্ডলের প্রভাব থাকে, এবং তাহারই কারণে, কাব্যের যে স্টাইল ফুটিয়া উঠে—শব্দ-সঙ্কলন, শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার ভঙ্গিতে ভাষার যে শ্রী, সৌন্দর্য্য ও মহিমা লাভ হয়—তাহাতেই সেই ভাষা ধন্য হয়; তখন আর অন্য কোন প্রশ্নই থাকে না। এইজন্যই মিল্টনের মহাকাব্যকে 'the noblest achievement of the English tongue'—বলা হইয়া থাকে। তথাপি, মধুসূদনের এই স্টাইলও যে খাঁটি বাংলার ছাঁচে ও সুরে গড়া, তাহার প্রমাণ ঐ দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আরও স্পষ্ট পাওয়া যাইবে। যিনি এই পংক্তিগুলি অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, বিশেষ করিয়া প্রথম দুই পংক্তির শব্দধ্বনি কানে আস্বাদন করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিবেন কোন্ ভাষা মধুসূদনের আদর্শ ছিল। এই উক্তিটি কবি হনুমানের মুখে দিয়াছেন। প্রমীলার নারী-বাহিনী যখন রঘু-সৈন্য ভেদ করিয়া বীরদর্পে লঙ্কা-প্রবেশে উদ্যত, তখন রামের শিবির-দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত হনুমানকে প্রমীলার এক সখী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে যুদ্ধে আহ্বান করিল। তখন সেই যুদ্ধোদ্যমের আস্ফালন-কোলাহলের মধ্যেই রামায়ণের আদর্শ-ভক্তবীর তাহার প্রভুর পরিচয় দিতে গিয়া ধীর স্থির কণ্ঠে যে রাম-বন্দনা গাহিয়া উঠিল, তাহার স্তোত্র-গম্ভীর শব্দবিন্যাসে এবং প্রতি পর্ব্বের যতি-তালে আমরা যে খঞ্জনি-ধ্বনি শুনিতে পাই—

বন্দীসম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম রবি-কুল-রবি,...

তাহার আত্মা যে খাঁটি বাংলা, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

অতএব 'মেঘনাদবধে'র ভাষা বাংলা ভাষা নয়—এমন কথা একটা স্বতঃসিদ্ধকে অস্বীকার করার মত। মিল্টনের Paradise Lost-এর ভাষা ইংরেজী নয় বলিয়া তাহা যে বরখাস্ত হইয়াছে, এ সংবাদ আমরা

এখনও পাই নাই। সে ভাষা যদি ইংরেজী হয়, তবে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা তাহার দশগুণ বাংলা। যাঁহারা দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একান্ত ভক্ত ছিলেন, সেযুগের সেই সহৃদয় বাঙালী-সমাজ 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও সমান উপভোগ করিতেন। ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, তাঁহারা—অর্থাৎ সেকালের সাহিত্য-রসিক বাঙালী, ভাষার সংস্কৃত ভঙ্গিতে অভ্যস্ত ও আসক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সংস্কারই ছিল অন্যরূপ, তবে ইহাই বলিব যে, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালী-জাতির একমাত্র সংস্কৃতি তখনও লোপ পায় নাই। আজকাল যে ভাষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বাংলা ভাষার একটা অতি কুৎসিত ফিরিঙ্গী সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের "খাঁটি বাংলা" এই ভাষাকেই জাতে তুলিবার বড় সুবিধা করিয়া দিয়াছে। অতঃপর মধুসূদনের ভাষা বাংলা কি না সে বিচারের প্রয়োজনই থাকিবে না; কারণ, আমরা ক্রমে সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ব্বের তুলনায় যেরূপ খাঁটি বাঙালী হইয়া উঠিতেছি, তাহাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভাষাও যখন সেই অনুপাতে খাঁটিতম হইয়া উঠিবে, তখন এ ভাষার আর অস্তিত্বই থাকিবে না— 'মেঘনাদবধ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' একই কবরে কবরস্থ হইবে।

তথাপি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার উপরি-স্তরে সংস্কৃতের গাঢ় প্রলেপ থাকিলেও, মধুসূদন খাঁটি বাংলা বুলিরও যে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ এ কাব্যের প্রায় সকল পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। কবি বিহারীলাল যেমন তাঁহার সেই সরল অথচ শুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষায়,—যেখানে যেমন ইচ্ছা একেবারে 'মুখের বোল' ব্যবহার করিয়াছেন, মধুসূদনও তেমনই, তাঁহার সেই অতিশয় সাধু ও অলঙ্কৃত ভাষায়, প্রাচীন ও আধুনিক—কাশীদাস কৃত্তিবাস এবং কবি-পাঁচালির—ভাষা মিশাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই; বরং অনেক স্থলে, ভাব-অর্থ ঠিক-ঠিক ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, এবং ভাষাকে একটি সহজ গতি দান করিবার আগ্রহে, নিতান্ত কথ্য বুলিকে এমন প্রশ্রয় দিয়াছেন যে, তাহাতে স্পষ্ট রসভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি, সাধারণত সাধুভাষার সঙ্গে এইরূপ প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ এমনই স্বাভাবিক হইয়াছে—ভাষার সেই দুই ধাতু এমন সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাতেই প্রমাণ হয়, মধুসূদনের ভাষা বাংলা ভাষার genius'বা মূল ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে নাই। 'মেঘনাদবধে'র ভাষার ফাঁকে ফাঁকে এই যে খাঁটি বাংলার ভঙ্গিটি আপন

অধিকার অটুট রাখিয়াছে, আমি এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব—

পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে…
* * *
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
* * *
মজালে রাক্ষস কুলে মজিলা আপনি।
* * *
তখনি স্বজনি
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?
* * *
হেন হরি-হারা হ'য়ে বাঁচিল যে রমা…
* * *
বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে, বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
* * *
যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে…
* * *
মরি মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে…
* * *
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে…
* * *
তার তারে বিপদে তারিণি!
* * *

এতেক কহিয়া রতি সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
* * *
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো, আমারে।
* * *
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি।
* * *
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
* * *
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে, অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি
* * *
দৈত্যদল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?
* * *
কি হেতু
সভয় হইলা আজি কহ, মা আমারে?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি?
* * *
নয়নের তারা হারা করি রে থুইলি
আমারে এ ঘরে তুই!

উপরের দৃষ্টান্তগুলি আমি কতকগুলি পৃষ্ঠা মাত্র উলটাইয়া যেমন চোখে পড়িয়াছে, তুলিয়া দিলাম। এইরূপ বাক্‌পদ্ধতি ছাড়া, এ কাব্যে খাঁটি বাংলা শব্দ যে কত ছড়াইয়া আছে তাহার সংখ্যা নাই। জাঙাল, ঠাট, সাপটি, এড়িলা, দেউল, দেউটি, বোল, বীরপণা, গুণনিধি, রাঙা পা' দুখানি, হাদে দেখ, ভেটিব, খেদাইনু, ফাঁফর, ঘাঁটায়, তিতিয়া, স্বজনি প্রভৃতি—প্রাচীন এবং প্রচলিত ভাষার নানা ভঙ্গি ও নানা শব্দ, মধুসূদন তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন; সে সকল শব্দের অধিকাংশই এখনকার খাঁটি বাংলায় আর প্রচলিত নাই—যে খাঁটি বাংলার দাপটে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা জাতিচ্যুত হইতে বসিয়াছে। আসল কথা, এখনকার বাংলা ভাষা শুধুই বাংলা নয়—'বিশ্ব-বাংলা';

মধুসূদনের ভাষা তেমন ভাষা নয় বলিয়াই তাহার কোন মর্য্যাদা আর নাই।

মধুসূদনের পত্রাবলীর মধ্যে, ভাষা সম্বন্ধে কবির অতিরিক্ত সচেতনতার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এক স্থানে তিনি যে লিখিতেছেন—

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you.

তাহা যে কত সত্য, তার প্রমাণ আমি পূর্ব্বে দিয়াছি। Thoughts and images—অর্থাৎ, যাহা, ভাব ও চিত্র উভয়বিধরূপে, কবির অন্তরিন্দ্রিয়ের সমক্ষে আবির্ভূত হয়, তাহারা স্ব স্ব বাক্-দেহ কোন্ অনধিগম্য নিয়মের বলে আপনারাই স্থির করিয়া লয়, মধুসূদন ইহাই অনুভব করিয়া বলিতেছেন, 'Here is a mystery for you'। কবির এ সাক্ষ্য অতিশয় সত্য ও মূল্যবান। সত্যকার কবিভাষার সৃষ্টি এমনই করিয়া হয়; ভাষার বিষয়ে এই নিগূঢ় চেতনা যাহাদের নাই, তাহাদের কবি-প্রতিভাও সন্দেহস্থল। কিন্তু কাব্যের সর্ব্বত্র, সর্ব্ব অঙ্গে, এইরূপ প্রেরণার ক্রিয়া থাকে না। তাই, কবি যখন তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন—"You must weigh every thought, every image, every expression, every line"—কারণ তাহার প্রত্যেকটি নিখুঁত হওয়া চাই, তখন কবির সেই আকাঙ্ক্ষাই সাধু বটে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। এ কাব্যে সর্ব্বত্র কেবল সেই আবেশের অবস্থাই নাই, কবিকে কাব্যবিধির সজ্ঞান দাসত্বও করিতে হইয়াছে। কারণ, দুইটি বিষয়ে কবিকে অবহিত থাকিতে হইয়াছে; প্রথম, কাব্যখানি মহাকাব্য, অতএব তাহার রচনায় একটা পদ্ধতি মানিতে হইবে—উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ব্যতিরেকে এ কাব্যের গৌরব-রক্ষা হইবে না; দ্বিতীয়ত; যমক অনুপ্রাস প্রভৃতিও ছন্দের ধ্বনিসৌষ্ঠব ও ভাষার লালিত্যবৃদ্ধির একটা বড় উপায়; এজন্য আলঙ্কারিক শব্দ-বিন্যাসে কবিকে বিশেষ যত্ন করিতে হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষার দোষ যে কারণে, গুণও সেই কারণে। এক দিকে কাব্যের বিধিবদ্ধ আদর্শ-রক্ষা, অপর দিকে ভাষার—

বিশেষতঃ সেকালের সেই অপরিপুষ্ট ভাষার—পুষ্টি ও অভিজাত্য বিধান, একসঙ্গে এই দুইটি প্রয়োজন-সাধন মধুসূদনের মত কবির পক্ষেও সুসাধ্য হয় নাই। তথাপি তিনি যে, (তাঁহারই ভাষায়) 'weak and nerveless expressions and rough lines' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাহার প্রমাণ—'মেঘনাদবধে'র মত, ভাষার বন্যাস্রোতময় কাব্যেও—সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে। ছন্দধ্বনিকে তরঙ্গিত করিবার জন্য যেমন অনুপ্রাস, তেমনই 'rough lines'-কে মসৃণ করিবার জন্য যমকের ব্যবহার তিনি যে ভাবে করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, উহা যেন তাঁহার ভাষারই স্বভাব, যত্নকৃত নয়; বাহিরের কৃত্রিম কলা-কৌশল তাহাতে যেমনই থাকুক, ভিতরের অকৃত্রিম বাক্‌সৃষ্টির প্রেরণা উহাদের মূলে রহিয়াছে। 'সমরে অমরত্রাস', 'হে দানবপতি ময়, মণিময়…' 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি, চন্দ্রাননা', 'মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি, অনন্ত বসন্ত বায়ু', 'কি ছার ইহার কাছে' 'কাল-পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা…' 'নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে', 'ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু', 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা'—এরূপ দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধৃত করিতে হইলে সমগ্র কাব্যখানিই উদ্ধৃত করিতে হয়; এ যেন ভাষার অলঙ্কার মাত্র নয়—ইহাই এ কাব্যের ভাষা। 'Nerveless expression' অর্থাৎ নির্ব্বীর্য্য ভাষা পরিহার করিবার জন্যও কবি অনেক সময়ে অনুপ্রাসের শরণাপন্ন হইয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটিতে তাহার প্রমাণ মিলিবে।—

মূঢ় দক্ষদোষে যবে দেহ ছাড়ি সতী
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,—

এখানে প্রথম পংক্তিতে 'দেহ ছাড়ি,' এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'জন্ম গ্রহিলা'—ভাষার কি প্রভেদ! প্রথমটির আদর্শে 'গ্রহিলা'র স্থানে 'লইলা' হওয়াই উচিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রথম পংক্তিতে অক্ষরের ধ্বনিসাম্যের জন্য 'ছাড়ি' কানে বাধে না। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে, 'গ্রহিলা' শুধুই অনুপ্রাস রক্ষা করে নাই, উহার স্থানে 'লইলা' বসাইলে, পংক্তির ঐ স্থানে ধ্বনি-দৌর্ব্বল্য ঘটে—তার ঢিলা হইয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে কবির কান, সর্ব্বত্র সম্ভব না হইলেও, অনেক স্থলে এইরূপ সতর্ক আছে দেখা যায়; এবং যমক অনুপ্রাস কেবল যে অলঙ্কারপ্রীতির

জন্যই নহে—কোথাও তাহারা ভাষার মসৃণতা, কোথাও বা ধ্বনিসাম্য রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; ছন্দের প্রয়োজনে তো বটেই। অতঃপর আমি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার কলা-কৌশলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহাতে যে সকল দোষ আছে, তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিব।

৪

'মেঘনাদবধে'র ভাষায় যে বহু ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ আছে তাহার সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই ; কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই যে কবির স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, অনেকগুলিই প্রয়োজনমূলক, এবং তাহাও যে কবি একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষার ভাবে করিয়াছেন, ইহাও সত্য। এই পরীক্ষার ফলাফল তাঁহার কাব্যেরই অঙ্গীভূত হইয়া আছে—মন্দ যাহা তাহা ঐ কাব্যেরই দূষণ, এবং ভাল যাহা তাহা বাংলা কাব্যমাত্রেরই ভূষণ হইয়াছে। অতএব এই দুঃসাহসের জন্য যে লাভ হইয়াছে, তাহার আনুষঙ্গিক ক্ষতির পূরণও অন্য দিক দিয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, নিষ্ঠাবান বৈয়াকরণেরা যাহা আদৌ সহ্য করিতে রাজি নহেন, তাহার সবই কাব্যের ভাষার পক্ষে অমার্জ্জনীয় কি না। মধুসূদনের সবচেয়ে বড় দোষ—তাঁহার ক্রিয়াপদনির্ম্মাণের হঠকারিতা ; কিন্তু আজ আমরা জানি ও মানি যে, ইহাতেও তাঁহার দুঃসাহস নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। কয়েকটি স্থানে কবির এই স্বাধীনতা সীমা অতিক্রম করিলেও [যথা, মুক্তিল, বৃষ্টিল, আয়াসিতে, স্তুতিল, কোপি (কোপ করিয়া, কুপিত হইয়া), নিকটয়ে (নিকটবর্ত্তী হয়)], মধুসূদন বাংলা ক্রিয়াপদগুলিকে কাব্যচ্ছন্দের শাসনাধীন করিবার জন্য যেভাবে ভাঙিয়া গড়িয়াছেন, তাহা ব্যাকরণসম্মত কি না সে বিচার অপেক্ষা, তাহা বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অনুরূপ কি না, তাহাই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শেক্স্পীয়ারের সময়ে ইংরেজী ভাষার যে অবস্থা, মধুসূদনের সময়ে, সাহিত্যের দিক দিয়া, বাংলা ভাষার অবস্থা তদপেক্ষা মন্দ ; সে অবস্থায় শেক্স্পীয়ার নিজ কল্পনা ও কবিভাবকে ভাষায় পূর্ণ মুক্তি দিবার জন্য ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে

যেরূপ নিরঙ্কুশ হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় মধুসূদন অধিক কিছু করেন নাই। তাঁহার কাব্যের দীর্ঘপদযোজনায় বাংলা যৌগিক ক্রিয়াপদগুলির যে বাধা, এবং সেই সঙ্গে, ভাষার গাঢ়বন্ধতার জন্য সর্ব্ববিধ শৈথিল্য পরিহারের যে প্রয়োজন—এই দুই কারণেই, মধুসূদনকে বহু নূতন নামধাতুর সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল ; এবং এ বিষয়ে তাঁহাকে কতক পরিমাণে ভবিষ্যৎ ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেও হইয়াছিল। আমি এখানে এ বিষয়ে ব্যাকরণঘটিত সমস্যার আলোচনা করিব না, কেবল সাহিত্যিক সৌকর্য্য ও প্রয়োজনের দিকটিই দেখিব। তথাপি বাংলা ভাষায় এই নামধাতুর প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাঁটি বাংলা বুলিতে বহু নামধাতুর ব্যবহার আছে, যথা—উঁচাইয়া, ঘনাইয়া, লতাইয়া, পোহাইল (প্রভাত হইতে), পিছাইয়া, ফেনাইয়া, গুঁড়াইয়া, বিষাইয়া, তলাইয়া, রাঙাইয়া, গুছাইয়া ('গুচ্ছ' বা 'গোছা' হইতে) প্রভৃতি ; চাবকাইয়া ('বঁটাইয়া' এইমত—তবু হাস্যোদ্রেক করে না), ফাঁসাইয়া, কোদলাইয়া (কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া), বিনাইয়া ('বেণী' হইতে), এমন কি ভুলিয়া বা ভুলাইয়া প্রভৃতি, বহু ধাতু বাংলা ভাষার প্রয়োজন ও প্রবণতার সাক্ষ্য দিতেছে। জন্মিল, আরম্ভিল, বাহিরায়, তেয়াগিয়া, চিকণিয়া, ফলিল (সংস্কৃতেও), জড়াইয়া ('জট' হইতে), মুঞ্জরিল ('মঞ্জরী' হইতে), বিউনিল (ব্যজনী হইতে), প্রসবিল প্রভৃতি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই আসন পাতিয়াছে। 'প্রসবিল' যদি চলে, তবে মধুসূদনের 'বিলাপিল', 'প্রতিবিধানিতে' 'দানিল' প্রভৃতি না চলিবার কারণ কি ? প্রাচীন কাব্যে 'উজোরল' (উজ্জ্বল করিল), 'দীপে' (দীপ্তি পায়), উমতায়ল (উন্মত্ত করিল—'উমতায়ল মন মোর') যদি ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে সেই নজিরে, নূতন বাংলা কাব্যে নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি নূতন বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে না কেন ? 'সান্ত্বনিল', 'রুষিল', 'বিলম্বিল' প্রভৃতি এমন কি দোষ করিয়াছে ? 'বাঞ্ছে' (বাঞ্ছা বা কামনা করে) যদি চলিয়া থাকে, তবে 'ইচ্ছে' চলিবে না কেন ? বিদাইনু, বিমুখিবে, সমরিব, উলঙ্গিল (অসি), বিনোদিয়া (চক্ষু) প্রভৃতি যদি ব্যাকরণে বাধে, তবে সে কোন্ ব্যাকরণ ? মধুসূদনের সময়ে বাংলা ভাষা যে রূপ ধারণ করিতেছে, সে রূপ পূর্ব্বে তাহার ছিল না—কারণ, আবশ্যক হয় নাই ; এ ব্যাপারে

কবির কাজ আগে—ব্যাকরণ পরে। মধুসূদন যাহা করিয়াছিলেন তাহারই ফলে, পরবর্ত্তী বাংলা কাব্যে আমরা অনেক নূতন প্রয়োগ পাইয়াছি, যথা—হিল্লোলিছে, কল্লোলিয়া, অঙ্কুরি' (অঙ্কুরিয়া), পুষ্পিয়া, ব্যথিয়া ('ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে'—রবীন্দ্রনাথ ; 'ব্যথিয়া নয়ন মন'—বিহারীলাল), আকুলিয়া, আঁধারিল, নীরবিল, ধ্বনিছে, অঞ্চলিয়া, চঞ্চলি', মুকুলি', আশীষিল প্রভৃতি। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রও 'স্বনিল' 'নির্ঘোষিল'—মানিয়া লইতে পারেন নাই। একজন পরবর্ত্তী কবি 'নূপুরিয়া চরণে' (চরণে নূপুর পরাইয়া) পর্য্যন্ত লিখিতে দ্বিধা করেন নাই ; ভারতচন্দ্রেও ইহার নজির আছে, যথা—'কুলুপিল কুলুপ কপাটে'। এ সকল হইতে প্রমাণ হয় যে, মধুসূদনের এই আচরণকে স্বৈরাচার না বলিয়া বীরাচার বলাই সঙ্গত ; ইহা দ্বারা তিনি, ছন্দকে স্বচ্ছন্দ করার মত, ভাষারও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বক্তব্য এই যে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষায় খাঁটি পুরাতন বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যবহার যত আছে তাহার তুলনায় এইরূপ নামধাতুর প্রয়োগ অল্পই বলিতে হইবে—আমাদের অনভ্যস্ত চোখে এগুলি বেশি করিয়া লাগে বলিয়াই, মনে হয়, মধুসূদন ইহাদের উপরে প্রধানত নির্ভর করিয়াছেন ; বরং এই সকল খাঁটি বাংলা ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য্যেই 'মেঘনাদবধে'র ভাষা এমন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

তথাপি, আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষায় এই ক্রিয়াপদের ব্যাপারে কোথাও অনাবশ্যক হঠকারিতা নাই ; নিয়মের সঙ্গে অনিয়মও আছে—অনেক স্থলে কবির মাত্রাজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। ইংরেজীর অনুকরণে ক্রিয়াপদ-সৃষ্টির ঝোঁকও তাঁহার ছিল ; যেখানে মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে, সেখানেই তাহার ফল ভাল হয় নাই। এইরূপ প্রয়োগের মধ্যেও 'আয়াসিতে' (আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে) যতটা অশোভন মনে হয়, 'নির্ব্বীরিবে' ('নির্ব্বীরিবে লঙ্কা আজি') ততটা নয় ; বরং 'নিঃশঙ্কিলা' অপেক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠু হইয়াছে। এ বিষয়ে 'টেবিলিল সূত্রধর, কাপড়িল তাঁতি'-র যে প্রতিবাদ তাহা আমরা অস্বীকার করি না ; কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, কবির এইরূপ দুঃসাহসিকতা ভাষার যে উপকার করিয়াছে—অতিশয় সংযমী, সুবোধ ও সাবধানী লেখকের দ্বারা তেমন উপকার কখনও হইতে দেখা যায় নাই।

কবির স্বাধীনতাকে কোন ব্যাকরণের দ্বারা—বিশেষত যে ভাষাই তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, সেই ভাষার একটা ব্যাকরণ ঠিক করিয়া লইয়া—তদ্দ্বারা সংযত করিতে চাহিলে, ভাষাই পঙ্গু হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে ভাষার সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি বলি, তার অধিকার প্রতিভাশালী শক্তিমান কবিরই আছে, এবং কবিকীর্ত্তির অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া সে অধিকার সাব্যস্ত করিতে হয়। কবির ব্যক্তিত্বের মত তাঁহার ভাষায় যদি কোন বিশেষ লক্ষণ থাকে, তবে তাহা বৈশিষ্ট্য বলিয়াই পরিগণিত হয়—মধুসূদনের ভাষার এই লক্ষণও তেমনই। তাই, এই নামধাতুর মধ্যে কয়েকটিকে—যথা, 'সরস' (সরস কর), 'অযতনে' (অযত্ন করে), স্নেহেন (স্নেহ করেন) প্রভৃতি—আমরা মধুসূদনের নিজস্ব প্রয়োগ বলিব ; বাকিগুলি শুধুই মধুসূদনের কবি-ভাষা নয়—বাংলা কাব্যেরই ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ স্বেচ্ছা-প্রয়োগ অন্য কবিদেরও আছে—মধুসূদন যেমন 'ত্রাসে' (ত্রস্ত হয় অর্থে) লিখিয়াছেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথও 'উদাসে' 'বিবশে' লিখিয়াছেন ; এমন কি ঠিক ঐরূপ প্রয়োগই করিয়াছেন, যথা—'তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো' ; এখানে 'লাজে' অর্থ—'লজ্জা পায়'। 'লোভাতে' (লোভ পাওয়াইতে বা লুব্ধ করিতে) শব্দটিও একাধিক কবি ব্যবহার করিয়াছেন ; সম্ভবত ইহাও একটি প্রচলিত বুলি। অতএব নামধাতুই বাংলা ভাষার আসল ধাতু বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদনের ভাষায় আরও দুই একটি ব্যাকরণঘটিত রীতি-বৈষম্য দেখা যায়। কর্ম্মকারকে সাধারণত —কে, বা —রে বিভক্তি-চিহ্নের পরিবর্ত্তে কবিতায় এ-চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে, যথা 'লক্ষ্মণকে দেখিলাম' স্থানে 'হেরিনু লক্ষ্মণে'। কিন্তু মধুসূদনের এই এ-চিহ্ন-ব্যবহারে একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয়—যেখানে সাধারণত এ-চিহ্ন আবশ্যক হয় না, সেখানেও কতকগুলি স্থানে তিনি এ-চিহ্ন রাখিয়াছেন। প্রাচীন রীতির অনুযায়ী হইলে সর্ব্বত্র এইরূপ করাই সঙ্গত, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। 'মজালে রাক্ষসকুলে', 'জুড়াই নয়নে', 'শুনিলা ঘোর কোলাহলে', 'ভাঙিনু পিনাকে', 'খুলিবে পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে', 'আস্ফালিল শূলে'—এইরূপ বহু স্থানে আছে, অথচ সর্ব্বত্র এরূপ নহে। অতএব, ইহার পক্ষে বৈয়াকরণেরা কি সূত্র নির্ম্মাণ করিবেন জানি না—

আমার মনে হয়, এরূপ স্থলে, কোথাও শব্দটির উপরে কোনরূপ অর্থের জোর দিবার জন্য, কোথাও বা ছন্দের ধ্বনি-সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য, কবি এইরূপ করিয়া থাকিবেন। কারণ যাহাই হোক, ব্যাপারটি লক্ষ্য করিবার মত। 'রাক্ষসকুলে', 'ফুলকুলে', 'শিলাকুলে', 'সে সকলে', 'ফলকপুঞ্জে' প্রভৃতি সকল বহুবাচক শব্দে যেমন এই এ-বিভক্তি-চিহ্ন দেখা যায়, তেমনই সমগ্রতা বা ব্যাপ্তি অর্থ যেখানে আছে, সেখানেও এইরূপ এ-কার যুক্ত হইয়াছে, যথা—'আঁধারি জগতে', 'আবরি অম্বরে'। আবার -টা, -টি, -খানির মত, বিশেষ-নির্দ্দেশের অভিপ্রায়েও এইরূপ এ-কার যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, যথা—'রক্ষ নাথ লক্ষ্মণের দেহে' (দেহটা), 'পরিলা দুকূলে' (দুকূলখানি), আনিবে ঔষধে' (ঔষধটি)। মধুসূদন যে ভাষা সম্বন্ধে কত সতর্ক ছিলেন—শব্দচয়ন ও শব্দযোজনা, বাক্যসৃষ্টি ও বাক্যের গঠন, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ সজাগ ছিলেন—তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি এই বিষয়টির উল্লেখ করিলাম। আরও একটি বিষয়ে মধুসূদনের ব্যাকরণ-নিষ্ঠার প্রমাণ আছে। বাংলা ক্রিয়া-বিশেষণগুলিতে সাধারণত এ-বিভক্তি-চিহ্ন থাকে, ইহাই পুরাতন রীতি; ভাষাতত্ত্ববিদেরা ইহাকে করণ-কারকের বিভক্তি বলিয়া থাকেন। এই রীতি অনুসারে, 'সত্বর গমন করিল' না লিখিয়া 'সত্বরে গমন করিল' লেখা উচিত, কিন্তু এই বিভক্তি-চিহ্ন এক্ষণে প্রায় খসিয়া যাইবার মত হইয়াছে। মধুসূদন কিন্তু এই বিভক্তি-চিহ্নটিকে একটু অধিক মান্য করিয়াছেন—'মন্দে মন্দে', 'দ্রুতে', 'ত্রস্তে' তাহার প্রমাণ। এইরূপ করিবার একটু কারণ ছিল। বাক্যের স্বল্পাক্ষরগাঢ়তার জন্য মধুসূদনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল; এজন্য বিশেষণমাত্রকেই ক্রিয়া-বিশেষণ করিবার প্রয়োজনে তিনি এই রীতিটিকে সর্ব্বদা কাজে লাগাইয়াছেন। ইংরেজী বাক্যরীতির স্বাচ্ছন্দ্য বাংলায় কতকটা আনিবার অভিপ্রায়ে, তিনি অনেক স্থলে বিশেষণকে কর্ত্তা বা কর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া ক্রিয়ার সহিত যুক্ত করিয়াছেন; ইহাতে বাক্য-সংক্ষেপ হয়, অর্থের একটু গাঢ়তাও হয়। 'নাদিল গম্ভীরে' (গম্ভীর নাদ করিল) 'উত্তরিল প্রগল্‌ভে' (প্রগল্‌ভতাপূর্ণ উত্তর করিল), 'দীপে উজ্জ্বলে' (উজ্জ্বল দীপের মত জ্বলে) 'চাহিল ত্রস্তে' (ত্রস্ত হইয়া চাহিল)—এ সকল স্থলে ক্রিয়া-বিশেষণগুলির ক্রিয়া অপেক্ষা কর্ত্তা বা কর্ম্মপদের দিকেই আকর্ষণ বেশি। "উভয়ে যুঝিল ঘোরে"

এখানে 'ঘোরে' ক্রিয়া-বিশেষণ হইলেও, আদৌ উহা যুদ্ধেরই বিশেষণ, অর্থ—উভয়ে ঘোর যুদ্ধ করিল। বাংলা ক্রিয়া-বিশেষণের কোন বাঁধা-বাঁধি নিয়ম এখনকার ভাষায় বোধ হয় আর ঠিক করিয়া দেওয়া যাইবে না,—নানা স্থানে ইহার নানারূপ, এবং তাহারও ব্যতিক্রম দেখা যাইবে; আমি এখানে সেই ব্যাকরণ-বিধির আলোচনা করিতেছি না। তথাপি, এই বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহারে, বাংলাভাষার রীতি সম্বন্ধে মধুসূদনের যে সজ্ঞানতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা, অন্য অনেক বিষয়ে নূতনত্বের প্রয়াস সত্ত্বেও, যে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক, তাহাও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনায়াসে 'ত্রস্ত' লিখিয়াছেন ('কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই'—কৃষ্ণকলি, 'ক্ষণিকা'), মধুসূদন সেখানে 'ত্রস্তে' লিখিতেই বাধ্য হইয়াছেন।

মধুসূদনের ভাষায় কোথাও কোথাও স্পষ্ট ইংরেজী প্রভাব আছে—তাহা সর্ব্বত্র দোষাবহ নয়। 'বারীন্দ্র' 'জলনাথ' 'জলদলপতি 'জলদলেশ্বরী' প্রভৃতি শব্দ নির্ম্মাণে ইংরেজীর ছায়া আছে, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই। আর এক প্রকার শব্দযোজনায় মধুসূদনের বিশেষ আসক্তি দেখা যায়, যথা—'রাঘব-বাঞ্ছা', 'কেশব-বাসনা', 'রাঘবকুল-মঙ্গল', 'দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য' প্রভৃতি। এগুলিতেও ইংরেজীর স্পষ্ট প্রভাব আছে—ভাববাচক শব্দকে সেই ভাবের পাত্র বা আধার অর্থে ব্যবহার ইংরেজী সাহিত্যের একটি অলঙ্কার হইলেও, বাংলায় তাহা সুপ্রযুক্ত হয় না; যদিও 'রাক্ষসকুল-ভরসা' (রবীন্দ্রনাথের 'ভুবন-ভরসা')—'ভরসার স্থল' অর্থে বাংলায় বাধে না; এবং 'রাক্ষসকুল-কলঙ্ক' বা 'রক্ষোকুল-কালি' সম্পূর্ণ রীতিসম্মত—'বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না'র মত অলঙ্কার আমাদের ভাষার অনুপযোগী নহে। 'জগৎ-নয়নানন্দ' যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে 'রঘুরাজগৃহ-আনন্দ'ও রীতিবিরুদ্ধ নয়। মধুসূদনের ভাষার আরও দুই একটি রীতি নূতন বলিয়া মনে হয়; এখানেও বিদেশী রীতির প্রভাব আছে। আমি কেবল উদাহরণ মাত্র দিলাম।

(১) একই বাক্যে সমান কর্ত্তৃবাচক দুইটি পদ—

...কহিলা মহিষী চিত্রাঙ্গদা চাহি সতী
রাবণের পানে
* * *
মা আমার দাসী পাশে আসি দয়াময়ী কহিলা...
* * *

আপনি পার্ব্বতী, দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা…

* * *

হেথায় চেতন পাই (পাইয়া) মায়ার যতনে
সৌমিত্রি হুঙ্কারে ধনু টঙ্কারিল বলী।…

* * *

…চামুণ্ডা যেমতি রক্তবীজে নাশি দেবী…
ফিরিলা নিনাদি…

* * *

সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত নেতৃনাথে,
সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—

[কর্তৃপদের দ্বিতীয় শব্দগুলি—সতী, দয়াময়ী, সাধ্বী, বলী, দেবী, সুমতি—প্রায় সকলেই বিশেষণ-পদ হইলেও উহারা এখানে বিশেষ্যের মতই, এবং অন্যত্রও সেইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।]

(২) বাক্যের মধ্যে বিশেষণ-পদের নূতন অন্বয়-রীতি—

চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্র শোকে বিকলা। (বিকলা হইয়া)

* * *

মোর বরে পশিবে দুজনে অদৃশ্য। (অদৃশ্য ভাবে)

* * *

কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী। (চিরবন্দী দশায়)

* * *

মৃগপাল যথা ধায় বেগে…ঊর্দ্ধশ্বাস! (ঊর্দ্ধশ্বাসে)

* * *

চিরপরিমলময় সমীর বহিছে বাসন্ত।

* * *

রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে…শোকার্ত্ত!

* * *

কাঁদে রক্ষোরথী,…হতজ্ঞান! (হতজ্ঞান হইয়া)

[একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে,—বিশেষণ-পদের এই দুরান্বয় ছন্দের জন্যই নহে। 'বাসন্ত' ও 'শোকার্ত্ত' এই দুইটি বিশেষণে জোর দিবার জন্য উহাদিগকে ঐরূপ শেষে আনা হইয়াছে।]

ইংরেজী রীতির প্রতি মধুসূদনের এইরূপ পক্ষপাতের দুইটি অতিশয় কৌতুককর নিদর্শন এ কাব্যে আছে। মধুসূদন 'নশ্বর' শব্দটি ইংরেজী 'mortal' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—'নশ্বর শরে', 'নশ্বর রণে', 'নশ্বর দংশনে'। এমনই আর এক স্থানে, 'প্রতারিত রোষ'-এর অর্থ করিতে হইবে—'প্রতারণাপূর্ণ (pretended, feigned) রোষ'।

ব্যাকরণ লঙ্ঘন না করিয়াও মধুসূদন দুই একটি এমন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা সুষ্ঠু বা শোভন হয় নাই; ইহাদের মধ্যে 'গীতী' ও 'শোকী', 'দৈত্যকুলদল' ও 'রক্ষোবংশধ্বংস' (দলনকারী ও ধ্বংসকারী অর্থে) ব্যাকরণ ভিন্ন আর কিছুরই সাক্ষ্য দেয় না। 'শোকাকুল' বা 'শোকার্ত্ত' না লিখিয়া 'শোকী' লিখিবার প্রয়োজন হয়তো ছিল—'মিত্র শোকে শোকাকুল' না লিখিয়া কবি 'মিত্রশোকে শোকী' লিখিয়াছেন; 'মিত্রশোকে আকুল' লিখিলে তেমন জোর হয় না, আবার, পূরা 'শোকাকুল' বড় হইয়া যায়—এই উভয় সঙ্কটে কবি 'শোকের' এক নূতন বিশেষণ সৃষ্টি করিলেন; স্বল্পাক্ষরতার প্রয়োজনে তাঁহাকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে। বাংলায় 'রোগ' হইতে 'রোগা' হয়, কিন্তু 'শোক হইতে 'শোকা' হয় না; যদিও 'শোকা-তাপা মানুষ'—এমন ভাষা আমরা মায়েদের মুখে শুনি। লোভ হইতে 'লোভা'ও দেখা যায়—ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'কি কাজ মুক্তায়, হাড়ের মালায় কন্যার মা হবে লোভা'; 'মনোলোভা'র তো কথাই নাই। কিন্তু মধুসূদনের ভাষায় খাঁটি বাংলা বুলির উপরে কোথাও হস্তক্ষেপ নাই—ভাষার সম্বন্ধে তাঁহার সংস্কার এমনই দৃঢ় ও অভ্রান্ত ছিল; তাই নূতন সৃষ্টির জন্য তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

কিন্তু আরও কয়েকটি ব্যাপারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাকরণ-অভিধানের জ্ঞান এবং তাহার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকিলেও, মধুসূদন কবিহিসাবে কিছু স্বাধীনতার দাবি রাখিতেন—নিজস্ব কবিভাষা-নির্ম্মাণে একটু সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তি উৎকৃষ্ট কবি-নীতি বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই বোধ হয়, প্রয়োজন না থাকিলেও, সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে ব্যাকরণের শাসন লঙ্ঘন করিতেন; নতুবা, 'দমনিয়া' 'দানিয়া' প্রভৃতির প্রয়োজন যে

কারণেই থাক, 'নায়কী' বা 'গায়কী'র কোন প্রয়োজনই ছিল না; 'কৌমুদিনী'র সার্থকতা যেমনই হোক, 'প্রফুল্লিত' চলে বলিয়া 'বিকচিত' চলিবার কোন কারণ নাই। 'রূপসী'র পুংলিঙ্গে 'রূপস' হাস্যোদ্রেক করে মাত্র, ইহার সংস্কৃত মূল যেমনই হোক (রূপীয়স—রূপীয়সী ?)। এ সকল ছাড়া, আরও কয়েকটি শব্দ খাঁটি আর্ষপ্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এইরূপ অবাচকতা-দোষ তিনটি আমার চোখে পড়িয়াছে।—(১) মধুসূদন 'রজত' অর্থে 'রজঃ' লিখিয়াছেন, যথা—'কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন'; (২) ভীষণ রব বা ঘোর কোলাহল অর্থে 'ভৈরব', যথা—'লঙ্কা পূরিল ভৈরবে'; (৩) কোষ বা পিধান অর্থে 'নিকষ', যথা—'নিকষে যথা অসি'।

ইহার পর, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যে কয়টি দাঁতভাঙা বা দুর্বোধ্য শব্দ আছে তাহার একটি তালিকাও দিব; তাহা হইতে দেখা যাইবে, সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে এইরূপ শব্দের ব্যবহার এত অল্প যে, তজ্জন্য মধুসূদনের ভাষার যে দুর্নাম আছে, তাহা যথার্থ নহে। এরূপ শব্দ যে আদৌ কেন আছে, তাহার একটা কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহাই—অর্থাৎ মধুসূদন সেকালের পণ্ডিতদিগের জন্য একটু ভাবনা না করিয়া পারেন নাই। "ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার। নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।"—তখনও একেবারে অপাংক্তেয় হয় নাই। সেইজন্যই সম্ভবত, এখানে ওখানে দুই চারিটি দুর্দ্দন্ত্য শব্দের প্রয়োগ তিনি অনাবশ্যক মনে করেন নাই। আমি এই কয়টি শব্দমাত্র আপত্তিকর মনে করি:—ইরম্মদ, কলম্ব, অবলেপে, যাদঃপতি, প্রক্ষ্বেড়ন, মলম্বা, বামী, ওদন, আস্কন্দিত, অরুরু, হর্য্যক্ষ, প্রতিঘ, রয়, কাদম্বা। বাকি যে শব্দগুলি আধুনিক সাহিত্যিকবর্গের অরুচিকর অর্থাৎ দুর্বোধ্য বলিয়া বর্জ্জনীয় মনে হইবে, সেগুলি মধুসূদনের কাব্যের স্টাইল-বিরুদ্ধ নয়; অতএব তাহাদের সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই শব্দগুলির মধ্যেও, 'ইরম্মদ' স্থানবিশেষে ব্যবহারযোগ্য, 'প্রক্ষ্বেড়ন' একটি অস্ত্রের নাম, এবং 'আস্কন্দিত' এমন একটি শব্দ যাহার প্রতিশব্দ বাংলায় নাই, এবং মধুসূদনের কাব্যে, অন্যান্য অনেক শব্দের মত ইহাও কাজে লাগিয়াছে—অশ্বের একটি বিশেষ গমন-ভঙ্গি (মন্দগতি অথচ

নৃত্যশীল) বুঝাইবার জন্য তিনি ইহা ব্যবহার করিয়াছেন; 'ওদন' শব্দটি প্রাচীন বাংলা কাব্যেও আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। মধুসূদনের ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রায় নাই বলিলেই হয়, কেবল এই কয়টিমাত্র আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যথা—'রবাব', 'সরম', 'মলম্বা', 'বারুদ'; 'সাবাসি' বা 'বিদায়' ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই কয়টিও বোধ হয় অনবধানতাবশত প্রবেশ করিয়াছে; কারণ, মধুসূদন যেন এইরূপ প্রয়োগ সর্ব্বত্র অতি সাবধানে বর্জ্জন করিয়াছেন। আমি 'বরজ' শব্দটিকেও ('বরজে সজারু পশি বারুইর যথা') এই শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়াছিলাম—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে ইহা আরবী 'বুর্জ' বা 'বুরুজের'-এর অপভ্রংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু পরে জানিয়াছি শব্দটি দেশী, সেন-রাজগণের আমলের একখানি তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ আছে। মধুসূদন তাহা না জানিয়াও খাঁটি বাংলা শব্দহিসাবে উহা ব্যবহার করিয়াছেন।

মধুসূদনের ভাষার যত কিছু ত্রুটি বা স্বেচ্ছাচার, এবং তাহার বাক্‌ভঙ্গি ও বাক্যগঠনে যেটুকু বিদেশী প্রভাব আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। ব্যাকরণ বা প্রচলিত শব্দার্থরীতির সম্পূর্ণ বশ্যতা-স্বীকার কোন মৌলিক কবি-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়; কেবল, ভাষার প্রকৃতি ও কবির স্টাইল এই দুইয়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। অতিশয় মৌলিক প্রকাশ-ভঙ্গি বা অভিনব কবি-ভাষায় এই সামঞ্জস্য যত অধিক হয়, ততই কবির কবিশক্তির গৌরব। যাঁহারা আর কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কবি-ভাষার বিচারে কেবল ব্যাকরণ খুলিয়া বসেন, তাঁহারা সাহিত্য-সমালোচনার অধিকারী নহেন। কবি-ভাষার প্রধান কৃতিত্ব ভাবকে রূপ দান করা, রসকে বাক্যের দ্বারা মানস-গোচর করা; এজন্য কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে—"It is not so much a triumph of language as a triumph over language"। মধুসূদনের ভাষার সর্ব্ববিধ ত্রুটি সত্ত্বেও, সেই ত্রুটি যে কারণে ঘটিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই—কবির প্রতিভাজনিত আত্মপ্রত্যয় বা দুঃসাহসের ফলেই—'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষা সর্ব্বপ্রথম রূপ-

পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি যে ত্রুটিগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহাতে, কবির অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় সাধনে যে বাধা ছিল, প্রধানত তাহাই নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছি। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই কাব্য রচনাকালেও মধুসূদনের কবিশক্তির পরীক্ষা চলিতেছে, এ কাব্যেও তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণ পরিণতি ঘটে নাই—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৫

অতঃপর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার কবিত্ব বা কাব্যকলার পরিচয় দিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমি ইতিপূর্ব্বে মধুসূদনের কবিভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ বা স্টাইল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে সেই ভাষার কলাকৌশল সম্বন্ধেও কিছু বলিবার প্রয়োজন এই যে, তাহাতেও, দেশী ও বিদেশী কাব্যকলার যে মিলন ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের একালের এই প্রথম আধুনিক কবিভাষার আলোচনায় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-বাহুল্যের কথা বলিতে হয়। এই ধরনের আলঙ্কারিকতা প্রাচীন আদর্শের কবিকর্ম্ম বলিয়াই, বোধ হয়, মধুসূদন তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—কোনরূপে নিয়মরক্ষাই করিয়াছেন; অনেক স্থলে তাহা কবির ভাষা না হইয়া কাব্যের ভাষা হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন কাব্যে কালিদাস, ও আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, যে ধরনের উৎকৃষ্ট কবিশক্তির পরিচয়, এই উপমাতেই দিয়াছেন, মধুসূদনের কবিশক্তি যে তাহার অনুরূপ নয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কালিদাস অলঙ্কারশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াই এইরূপ অলঙ্কারকে তাঁহার বিশিষ্ট কবিত্বে মণ্ডিত করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়াই, স্বাভাবিক কবিবৃত্তির বশে, যে অত্যুৎকৃষ্ট উপমা তাঁহার রচনায় রাশি রাশি ছড়াইয়াছেন, তাহাতে কালিদাসকেও তিনি কোন কোন বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছেন; এবং উপমা যে কাব্যের অলঙ্কার নয়, কবিকল্পনারই

একটি সহজ প্রকাশভঙ্গি—প্রাচীন ও আধুনিক সকল কাব্যেরই কবিত্বের উপাদান, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। মধুসূদন দেশীয় প্রাচীন কাব্য-কলারই মান রাখিয়াছেন—তজ্জন্য সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কার এবং প্রাচীন বাংলা কাব্য ভাল করিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ আমি প্রথমেই "মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে একটি খাঁটি শাস্ত্র-সম্মত অলঙ্কার উদ্ধৃত করিতেছি। রাত্রিকালের একটি ঘটনার বর্ণনা এইরূপ—

বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত;
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে।
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।

ইহার নাম' 'ভ্রান্তিমান' অলঙ্কার। মধুসূদন এ সকলের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এবং ইহারই পুরস্কারস্বরূপ সেকালের পণ্ডিত-গণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার পত্রে উদ্ধৃত সেই উক্তি, 'হাঁ, মন্দ হয় নাই, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে'। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতেও একরূপ কবিশক্তির পরিচয় আছে; এবং আবশ্যকমত এইরূপ অলঙ্কার-রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগী হইলেও, ইহার মধ্যে যে স্বচ্ছন্দ-কল্পনা ও মাত্রাজ্ঞান আছে, তাহাতে আধুনিক ও প্রাচীন রুচির সমন্বয়-সাধনে তাঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। এক্ষণে আমি এমন কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব, যাহাতে কৃত্রিম কলাকৌশলের উপরে কবিত্বই জয়ী হইয়াছে।—

চূর্ণরথ অগণা, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্র! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু
স্থানে স্থানে;—
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।

* * *

পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়!

* * *

পশিলা ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা, যথা গরুত্মতী তরী

তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল-সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।

* * *

রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।

* * *

হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষু বিনোদিয়া—
তুষার-রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর।

* * *

জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
করপদ্ম সঞ্চালনে!

* * *

নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা দ্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

* * *

নয়নজল, অবিরল বহি
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ!

* * *

উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।

* * *

রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও হে সে কালে!

* * *

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—

* * *

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে!

উপরি-উদ্ধৃত কবি-বচনগুলি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন ও অবকাশ নাই; আমি যতদূর সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্তগুলির দিকেই দৃষ্টি করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দুই জাতীয় উপমা আছে—কতকগুলিতে নিত্যপরিচিত ব্যাপারের সহিত সাদৃশ্য-যোজনা, তাহাতে বর্ণনার ভাবচিত্র নিমেষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আর কতকগুলি আছে, তাহার রস বাস্তব-অভিজ্ঞতার ভাব-রস নয়—অনুভূতি-কল্পনার আয়ত্ত। 'তুলসীর মূলে সুবর্ণ-দেউটি', 'অশোকের ফুল—অশোকের তলে,' 'জননী যেমতি—মশকবৃন্দে'—এগুলির মধ্যে যে সহজ ও সুস্পষ্ট চিত্র আছে, তাহাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট রস-প্রকৃতির অনুকূল; ইহাই ক্ল্যাসিক্যাল কাব্য-

রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আবার, 'দ্বিষাম্পতি শান্তরশ্মি', 'উচ্ছ্বাসিল বীরবৃন্দ' এবং 'ধুতুরার মালা যেন'—এগুলি শুধুই বাস্তব অভিজ্ঞতা বা নৈতিক সৌন্দর্য্যবোধের পরিপোষক নয়; ইহারা—বস্তুর রূপ, অথবা উপমান-উপমেয়-সম্পর্কের সুষমাকেও ছাড়াইয়া, একটা ব্যাপকতর রস-চেতনার নিমিত্ত বা সঙ্কেত হইয়া দাঁড়ায়। মরণাহত, ভূপতিত মেঘনাদকে দিগন্ত-আশ্রয়ী অস্তমান সূর্য্যের সহিত উপমিত করায়, উপমেয়কে যেমন বিশিষ্ট গৌরব দান করা হইয়াছে, তেমনই উপমানকেও এমন একটি করুণ মহিমায় নূতন করিয়া আমাদের চক্ষে ধরা হইয়াছে যে, সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী একই অখণ্ডনীয় নিয়তির লীলা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই—আমাদের অনুভূতি, বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিশেষের অভিমুখী হয়। গহন বিপিনে, নিশীথ-সমীরণে মহীরুহ-ব্যূহের উচ্ছ্বাস—ইহা অতিশয় বাস্তব হইলেও, আমাদের জাগ্রত চেতনাকে অভিভূত করিয়া মনের মধ্যে একটা অবাস্তব মায়ালোক সৃষ্টি করে, এবং তাহা নিত্য-পরিচিত ও সুস্পষ্ট নয় বলিয়াই, তাহার রস আরও উপাদেয়। 'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে'—এমন উপমা এ কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই—যদিও ইহার রস আস্বাদন করিতে হইলে, হিন্দু-পুরাণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তজ্জনিত ভাব-সংস্কার থাকা চাই। এই সকল উপমার মূলে যে কল্পনাবৃত্তি আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট কাব্যরসের জনয়িতা—এ কল্পনাকে রোমাণ্টিক নাম দিলেও, এবং ইহাই বিশেষ করিয়া আধুনিক কাব্যের আদর্শ হইলেও, ইহাই কবিত্বের চিরন্তন উৎস—ইহাকে আর কোন নাম দিবার প্রয়োজন নাই।

আর এক ধরনের আলঙ্কারিক কবিভাষা আছে—তাহা একরূপ বাক্-নৈপুণ্য মাত্র; কোন একটি ভাব, চিন্তা বা তত্ত্বকে সংক্ষিপ্ত ও শাণিত বচনের সাহায্যে উজ্জ্বল বা স্ফুটতর করিয়া তোলাই তাহার সার্থকতা। সংস্কৃতে, বিশেষত কালিদাসের কাব্যে, এইরূপ উৎকৃষ্ট কবি-বচন অনেক আছে; আমাদের ভারতচন্দ্রও ইহাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধুসূদনের কাব্যেও এই বচন-রচনার দৃষ্টান্ত আছে। আমি এখানে দুই একটিমাত্র উদ্ধৃত করিব, তাহাতে দেখা যাইবে, মধুসূদন এখানেও বিশুদ্ধ বাক্-নৈপুণ্য অপেক্ষা উপমার উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছেন; যথা—

যে বিদ্যুৎ-ছটা সর্ব্বহর কাল তারে পারে না হরিতে।
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।

* * *

বহলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।

* * *

ভুলিল স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!

* * *

মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।

* * *

যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী

* * *

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আসনে!

এরূপ বচন-রচনার প্রধান গুণ—বাক্যার্থের গাঢ়তা। ভারতচন্দ্রের 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥' অথবা, 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'—এইরূপ বচন-রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উপরি-উদ্ধৃত বচনগুলির মধ্যে একটি মাত্র এইরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী'; তাহাও ইংরেজ কবির "To be a Prodigal's Favourite—then, worse truth, a Miser's Pensioner" স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং তুলনায় সে উক্তি আরও উৎকৃষ্ট। আলঙ্কারিক বচন-রচনায় মধুসূদন বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নাই, ইহাই সত্য। যদিও তাঁহার ভাষায় প্রাচীন কবিভাষার অনুকরণ যথেষ্ট আছে, এবং তাহাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক, তথাপি শব্দালঙ্কারে—যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতিতে তাঁহার যেমন পটুত্ব, অর্থালঙ্কারে তেমন নহে; তার কারণ—একটি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, অপরটি কাব্যবিধির বাধ্যতামূলক। মধুসূদনের কবি-প্রকৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা হইতেও তাহার প্রমাণ মিলিবে।

অতঃপর, 'মেঘনাদবধে'র কাব্যকলায়, বিদেশীয় প্রভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এ প্রসঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ঋণ-গ্রহণের উল্লেখ করিব না—সে সকলের প্রমাণ ও পরিচয়, ইতিপূর্ব্বে এ কাব্যের একাধিক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে; আমি কেবল ভাব-কল্পনা ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিকটিই লক্ষ্য করিব, তখনকার বাংলা কাব্যের পক্ষে যে সকল কলা-কৌশল নূতন তাহারই কিছু পরিচয় দিব।

ইংরেজ কবির কাব্যকৌশলও এককালে য়ুরোপীয় কাব্যশাস্ত্রের শাসন মানিত; মধুসূদন, তথাকার প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের মত, সেই কাব্যশাস্ত্রেরও পরিচয় রাখিতেন; তাই 'মেঘনাদবধে'র কয়েকটি অলঙ্কার

পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান ও সুস্পষ্ট,—একটির নাম, Personification; অপরটির নাম, Apostrophe। প্রথমটির সহিত যদিও আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারের মিল আছে, তথাপি মূলে এ দুইটি এক নহে। দেশীয় অলঙ্কারটিতে শব্দার্থের কূট-কৌশলই মুখ্য, কিন্তু বিলাতীর তাহা নহে; কারণ সে অলঙ্কার কবিকল্পনাঘটিত—অতিশয় স্বাভাবিক ও ব্যাপক। প্রাকৃতিক বস্তু সকলের উপরে মানুষী-চেতনার আরোপ কবিতার জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—বিদেশী কাব্যে ও পুরাণে যেমন, আমাদের কাব্যে ও পুরাণেও তেমনই ইহার অজস্র রূপ ফুটিয়াছে; বরং, আমাদের শুধুই সাহিত্যে নহে, ধ্যান-ধারণাতেও, এইরূপ কল্পনার প্রসার আরও অধিক, ইহা হইতেই বহু আধ্যাত্মিক ভাব-বিগ্রহের জন্ম হইয়াছে। অতএব আমাদের সাহিত্যে এইরূপ অলঙ্কারের কোন নূতনত্ব নাই বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু মধুসূদন যে ভঙ্গিতে এই অলঙ্কার তাঁহার কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা আমাদের কাব্যপদ্ধতিতে নূতন, এবং তাহাতে বিদেশী কাব্যকলারই স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। আমি দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!

* * *

নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরী,
তোমার!

* * *

ফুল-কুল-সখা উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্ম-কর দিয়া
কালি,.....

* * *

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন-ভাবে
চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।

* * *

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব।

দ্বিতীয়টি যে ধরনের অলঙ্কার, তেমনটি আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও নাই ; ইহার দ্বারা, অনুপস্থিতকে উপস্থিত, বা অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ সম্বোধন করা হয়। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ইহারও যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা—

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে ?

* * *

বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা ; রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিংবা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাধাল যেমতি…

* * *

উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব…

* * *

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা,
হে জাহ্নবী, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি।……

* * *

…বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাসগিরি, তব উচ্চ-চূড়ে!

* * *

কিন্তু এইরূপ নানা অলঙ্কার-যোজনাই 'মেঘনাদবধে'র কাব্যকলার মুখ্য গৌরব নয় ; এ কাব্যে প্রাচীন কাব্যভঙ্গির যে পরিবর্ত্তন, বা নূতনতর প্রকাশরীতির প্রবর্ত্তন দেখা যায়, তাহার সন্ধান না লইলে কাব্যপাঠ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইংরেজী ও তথা য়ুরোপীয় কাব্যের যে বিচিত্র কল্পনাবিলাস, এবং বাক্যকে রসাত্মক করিবার যে নানা কৌশল, বাংলা ভাষায় আয়ত্ত করিতে না পারিলে, নবযুগের নূতন বাংলা কাব্যরচনা সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না—মধুসূদন কিরূপ অবলীলাক্রমে ও অকুতোভয়ে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারই পরিচয়-স্বরূপ, আমি এক্ষণে ভাব-কল্পনা ও প্রকাশরীতির সেই নবত্বসূচক কয়েকটি নমুনা এ কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিব—এবং তাহাতে আবশ্যকমত ক্ষুদ্রবাক্য ও বাক্যাংশ থাকিবে।—

(১) বিদেশী কাব্য-কল্পনা

যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা,……

* * *

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত ;

* *

মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা !

* * *

চলিলা আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।

* * *

ডাকিছে কূজনে
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল !

* *

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগী-হাস্য যথা।

* * *

কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা ! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণ-পদ্ম যথা !

* * *

…বসিতাম কভু দীর্ঘতরুমূলে
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়।

* * *

সরসী আরসী মোর।

* * *

…দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী।

* * *

চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল-নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা !

* * *

কালমেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু !

* * *

শৃঙ্গানিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।

* * *

…ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর-প্রার্থনে !

(২) পাশ্চাত্য পুরাণের অনুসরণ

আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ।

* * *

...কোথা দেবী জলদলেশ্বরী
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?

* * *

স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—

(৩) বিদেশী ভাব ও তদনুযায়ী ভাষা

পশ তুমি কৃতান্ত-নগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।

* * *

বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

* * *

নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা

* * *

দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
স্বর্ণি বারিদপুঞ্জে!

* * *

...যে দিন হরিল
পাপ-প্রাণ যম-দূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।

* * *

রমার আশার বাস হরির উরসে—

* * *

নারিবে রজনী মূঢ় আবরিতে তোরে

* * *

চির কোলাহলময় পয়োনিধি তীরে।

* * *

দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরী!
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।

(৪) হোমার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কল্পনা, কাব্যরীতি ও অন্যান্য আদর্শ

বারীশ—পাশী; শূলীশম্ভুনিভ—কুম্ভকর্ণ; দেবাকৃতি—সৌমিত্রি; স্কন্দ—তারকারি সেনানী; বিভীষণ, বীরভদ্র—বলী;—প্রভৃতি নিত্যযুক্ত বিশেষণ। (বিভীষণ বলী—যেমন, Tennyson-এর—'Bold Sir Bedivere')

* * *

...প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি,
কারাবদ্ধ বায়ুদলে;...
উল্লাসে দেব চলিলা অমনি
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। ... ...
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারে বায়ুকুল বাহিরিল বেগে।

* * *

শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়!

* * *

লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
স্বর্ণ-ঘনবাহনে;

* * *

চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বর-পথে দূতী।

* * *

রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে।

(৫) বর্ণনীয়কে চাক্ষুষ করাইবার কৌশল

চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা……

* * *

অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়কা ধরি' হড় হড় হড়ে—
বজ্রশব্দে খোলে দ্বার;

* * *

পশ্চাতে থমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কাপানে!

* * *

লম্ফ দিয়া রথীবর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝনঝনি।

(৬) বাক্যের পুনরাবৃত্তি দ্বারা ভাবের গাঢ়তা বৃদ্ধি

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি;
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!

* * *

"এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন হায়?"—অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি—"এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন হায়?"…

[শেষেরটিতে পুনরুক্তির কারণও আছে। এ কাব্যে, কবি পাশ্চাত্য গাথা এবং কাহিনীকাব্যের অনুকরণে, বহুস্থলে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যের পুনরুক্তি দ্বারা ভাবকে রসঘন করিবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।]

উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণগুলির সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, তাহা এই যে, বর্ণনা ও প্রকাশ-কৌশলের এই নূতনত্ব, আজিকার দিনে, উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে না হইলেও, আধুনিক বাংলা কাব্যের আদি-কবির ভাষায় ও কলাকৌশলে এই নবত্বের লক্ষণ বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান। আমি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার যে বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা হইতে, আশা করি, এ

কাব্যের কবিকর্ম্মে যে দুরূহ সাধনা মধুসূদনের প্রতিভায় সম্ভব ও সফল হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে যুগে যে অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে, কেবল বাহির হইতে এ কাব্যের রূপ ও রস বিচার করিলে কবির কৃতিত্বের সম্যক পরিচয় লাভ হইবে না; কবি-কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া সেখানে—যে উপকরণ উপাদান যে ভাবে কাব্য-নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইতেছে; অতি সামান্য আয়োজনেই বৃহৎ অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপায় হইতেছে; অতিশয় কঠিন আকারহীন ধাতুকে গলাইয়া পিটাইয়া রূপ দিবার অসাধ্যসাধন চলিতেছে—তাহা দেখিয়া লইতে না পারিলে, এ কবির কবিশক্তির পরিমাপও করা যাইবে না। মধুসূদনের প্রতিভার সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতার সেই অবস্থায়—এত অল্প সময়ে, এমন আকস্মিকভাবে—সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এমন একখানি কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সেই বাধাকে অতিক্রম করিবার সাহস ও শক্তি, এবং সেই বাধার দুরূহতার জন্যই যেন অধিকতর স্ফূর্ত্তি—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরিচয়-প্রসঙ্গে, আমি সেই অদ্ভুত কাহিনী উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করিলাম; ছন্দ সম্বন্ধে যে পৃথক প্রবন্ধ বাকি রহিল, তাহা এইরূপ আলোচনা নয় বলিয়া, "'মেঘনাদ-বধ কাব্য' পাঠ" এইখানেই সমাপ্ত হইল। মধুসূদনের কাব্য শুধুই আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসগত নয়, তাহা শাশ্বত বাংলা সাহিত্যের সম্পদ—'a possession for ever'। এই কথাটাই একালের শিক্ষিত-সমাজের স্মরণে আনিবার জন্য, আমি বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এই অতুলনীয়

ক্লাসিকখানির নূতন করিয়া পরিচয় দিতে ব্রতী হইয়াছিলাম। গতযুগে বাঙালী-জাতির যে শক্তিস্ফুরণ হইয়াছিল—কর্ম্মে ও চিন্তায়, প্রতিভায় ও মনীষায়, মাত্র দুই পুরুষ পূর্ব্বেও, বাঙালী যে কীর্ত্তিকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল, আজ আমাদিগকে তাহার সকল দিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম, বিচার ও রসগ্রাহিতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' আমাদের সেই অনতি-অতীত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট গৌরব। কাব্যের আদর্শ যেমনই পরিবর্ত্তিত হউক, শক্তি ও প্রতিভার মানদণ্ড চিরদিন একই থাকিবে; যাহারা জীবিত বা জীবন-ধর্ম্মী, তাহারা সেই শক্তির সঞ্জীবনী প্রেরণা হইতে কখন বঞ্চিত হয় না; সম্পূর্ণ আত্মভ্রষ্ট না হইলে, কোন জাতি বা সমাজ পূর্ব্বগামী মহাপুরুষ-গণকে জানিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া, তাঁহাদের অমূল্য দান অগ্রাহ্য করে না। মধুসূদনের মহাকাব্য জাতির এমনই একটি সম্পদ; ইহাকে একালের কোন কৃতবিদ্য বাঙালী যদি বিস্মৃতি বা অবহেলার জঞ্জালস্তূপে ফেলিয়া রাখিতে চায়, তবে, অমর কবির অমর ভাষায়, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সে ব্যক্তি এমন একজন—"whose hand like the base Judean threw a pearl away richer than all his tribe"। একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচক যে কথা বলিয়া মিল্‌টনের মহাকাব্যের আলোচনা শেষ করিয়াছেন, আমিও কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে সেই কথা বলিয়াই মধুসূদনের কাব্য-পরিচয় শেষ করিলাম—

What has made the poem live is not the story—nor the construction—nor the learning—nor the characterisation : not these things, though all are factors in the greatness of the poem—but the incomparable elevation of the style, 'the shaping spirit of imagination,' and the mere majesty of the music.

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি পরবর্ত্তী একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেই কারণে করতে চাই, যে কারণে মহাভারতের সম্ভব পর্ব্বে "অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, অযুত নাগেন্দ্র সদৃশ বলবান, সুবিদ্বান, মহাবীর্য্য, মহাভাগ" ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়েছিলেন, মহাভারতকার বলেছেন, মায়ের দোষে। সত্যবতী যদিও পুত্রবধূ অম্বিকাকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন, 'তোমার এক দেবর আছেন, আজ রাত্রে তিনি তোমার নিকট আসবেন, তুমি অপ্রমত্তা হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কর'; কিন্তু অম্বিকা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন নি। দীপশিখার প্রদীপ্ত আলোকে কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়ন-যুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চক্ষু দুটি নিমীলিত ক'রে ফেলেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ হতে হয়েছিল। অন্ধতা-প্রযুক্ত তিনি যা করেছিলেন, তার জন্যে দায়ী তাঁর মা—অম্বিকা।

সেদিন শেষরাত্রে জ্যোতির্ম্ময়কে স্টেশন থেকে আনতে যাবার মুখে রাত্রি আমার বাসায় এসেছিল কয়েক মিনিটের জন্য। স্টেথোস্কোপ প্রভৃতি নিয়ে রীতিমত চিকিৎসক-বেশে আমি দ্বিতীয় বার যখন বংশীর চিকিৎসা উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে ব'লে এসেছিলাম, একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি,

প্রলাপটা যদি না কমে, খবর দিও। সেই ঠিকানার সহায়তায় রাত্রি এসেছিল ভোরবেলা।

মনে দুশ্চিন্তা ছিল, মোহ ছিল, পেটে ক্ষুধাও ছিল প্রচুর (কারণ রায় মশায়ের বাড়িতে খাওয়া হয় নি এবং সে কথাটা গোকুলকে অত রাত্রে বলবার সাহস হয় নি), তবু এসে শোওয়ামাত্র আমি অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখেছিলাম একটা। যেন প্রকাণ্ড একটা দিগন্তবিস্তৃত জলাশয়, কিন্তু তাতে জল নেই, আছে খালি কাদা, কাদা যে আছে তাও দূর থেকে বোঝা যায় না ; মনে হয়, শক্ত জমি ; স্থানে স্থানে সবুজের আভাস আছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে চলতে গেলেই হাঁটু পর্য্যন্ত পুঁতে যায়। সেই নির্জ্জলা জলাশয়ের ওপর দিয়ে আমি আর রাত্রি যেন চলেছি, বার বার হাঁটু পর্য্যন্ত পুঁতে যাচ্ছে। রাত্রি আমার ওপর ভর দিয়ে পঙ্ককুণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে, কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে নেই, নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে শূন্য দিগন্তের পানে।

হঠাৎ কড়কড় ক'রে দুয়ারের কড়াটা নড়ে উঠতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম আমি। নেবে গেলাম। কপাট খুলেই দেখি, রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সুট্‌কেস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল সে, আমিও চেয়ে রইলাম।

বংশী কি এখনও প্রলাপ বকছে ?

থেমে গেছে।

অতি সাধারণ ব্রোমাইডে এত তাড়াতাড়ি এমন ফল পাওয়া যাবে, তা যদিও আমি প্রত্যাশা করি নি, তবু আত্মপ্রসাদে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আপনি কি জ্যোতির্ম্ময়বাবুকে আনতে হাওড়া যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ। এই সুট্‌কেসটা আপনার এখানে রেখে যেতে চাই। আপনার কি কোন অসুবিধে হবে ?

না, কিছুমাত্র না।

একটা সুট্‌কেস হাতে ক'রে জ্যোতির্ম্ময়বাবুকে আনতে যাবার হেতু কি এবং হেতু থাকলেও মধ্যপথে সে সুট্‌কেস আমায় বাসায় রেখে যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন, এই সব অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন আমার মনে জাগে নি তখন। আমি সেদিন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, বাস্তব জগতের সঙ্গতি-অসঙ্গতির কোন অর্থ ছিল না আমার কাছে। এখন জেনেছি, পাছে পুলিসের হাতে চিঠিখানা পড়ে, এই ভয়েই সে সুট্‌কেসে চিঠিখানা পুরে নিয়ে এসেছিল, তারপর মাঝরাস্তায় তার মনে হয়েছিল, জ্যোতির্ম্ময় যদি চিঠিখানা দেখে ফেলে ! চিঠিখানা সে নষ্ট ক'রে ফেলে নি কেন, তা এখনও আমি ভেবে পাই না। বোধ হয় চিঠিখানা রেখেছিল নিজের ধর্ম্মপরায়ণা মায়ের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিলস্বরূপ, অবশ্য এসব আমার কল্পনা।

রাত্রি চ'লে গেল। স্টেশন থেকে জ্যোতির্ম্ময়কে নিয়ে আর ফেরে নি সে। সবিতার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের দেখা হবার সুযোগই সে দেয় নি। ফিরেছিল মাস চারেক পরে। জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গে ছিল না, সঙ্গে ছিল অবনীশ। অবনীশও বেশিক্ষণ থাকে নি, রাত্রিকে রেখে সে পরের ট্রেনেই ফিরে গিয়েছিল বম্বেতে। ব্যবসায়ী লোক সে, নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে ছিল না।

যে সুট্‌কেস রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল···হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময়ের মুখটা মনের মধ্যে জেগে উঠছে আমার। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলতে পারেন ? একটা কথা ভাবতে ভাবতে অতর্কিতে আর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে, একটা ছবিকে আড়াল ক'রে আর একটি

ছবি নিজেকে জাহির করতে চায়? জ্যোতির্ম্ময়কে আমি দেখি নি কখনও, কিন্তু তার কথা শুনেছি অনেক। যখনই আমি তাকে কল্পনা করি, তখনই দেখি, সে যেন খুব দামী বিরাট একখানা মোটর ফুল স্পীডে হাঁকিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড ভারী ফরসা মুখে টানা টানা চোখ, কালো সরু লম্বা একটা সিগারেট-হোল্ডার মুখের এক কোণে কামড়ে ধ'রে আছে, হু হু শব্দে হাওয়া বইছে, হু হু শব্দে মোটর ছুটে চলেছে, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলো উড়ছে, ষ্টিয়ারিং ধ'রে সামনের দিকে চেয়ে ব'সে আছে জ্যোতির্ম্ময়। সে আশপাশের কাউকে দেখছে না, গাড়ির ভালমন্দর দিকেও তার লক্ষ্য নেই, পাশে কে ব'সে আছে তাও তার খেয়াল নেই, সে ফুল স্পীডে খালি ছুটে চলেছে।

সেদিন যে সুট্‌কেসটা রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল, তা আমি প্রায় তিন মাস পরে খুলেছিলাম, মানে খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাতে রাত্রিরই দু-একখানা কাপড় শেমিজ় ব্লাউজ় ছিল, আর ছিল একখানা চিঠি। রাত্রির মায়ের চিঠি, পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা। সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি এই চিঠিখানার কথা বলতে চাই। অবশ্য চিঠিখানা যে পূর্ণেন্দুবাবুকেই লেখা, চিঠিতে তার কোন প্রমাণ নেই, চিঠিতে 'শ্রীচরণেষু' ছাড়া অন্য কোন সম্বোধনই ছিল না। তবু কিন্তু চিঠির ধরন-ধারন, তাতে ফার্ন্ডিজের উল্লেখ, অনুতাপ-মিশ্রিত একটা ক্ষুব্ধ আকৃতি, আমার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি—অবশ্য কল্পনায়—যে, চিঠিখানি পূর্ণেন্দু-বাবুকেই রাত্রির মা লিখেছিলেন। আদালতে হয়তো এ কথা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার অন্তর্যামী এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

আমার গোকুলচন্দ্র ছুটি না নিলে এ আবিষ্কার সম্ভবপর হ'ত না। শুধু তাই নয়, গোকুল যদি নীলুর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমান আর

কাউকে দিয়ে যেত, তা হ'লেও হয়তো হ'ত না। তৃতীয় এবং সর্ব্বপ্রধান যে কারণে এই 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়েছিল, সেটা হচ্ছে গয়াতে হঠাৎ আমার বাল্যবন্ধু ডি. কে.র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অদ্ভুত রকম যোগাযোগ সেটা। আমার কলকাতারই এক বড়লোক মক্কেল গয়ায় গিয়েছিলেন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। গয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং গয়ার চিকিৎসকদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না পেরে (অদ্ভুত জিনিস এই আস্থা!) আমাকে টেলিগ্রাম করলেন। আমি এলাম, চিকিৎসা করলাম। নিজের জীবনী-শক্তির জোরেই বোধ হয় তিনি সেরে উঠলেন। আমি কিছু সুনাম এবং অর্থ নিয়ে সানন্দে ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় ব্যায়ামবীর ধীরেন্দ্র-কুমারের সঙ্গে দেখা। ধীরেনের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমার আরও দু-একবার দেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে সে দু-একবার আমার বাসায় এসেছে গেছে, সুতরাং এক নজরেই দুজনে পরস্পরকে চিনতে পারলাম। সাধারণ কাপড় জামা প'রে থাকলে ধীরেনকে ব্যায়ামবীর ব'লে চেনবার যেমন উপায় নেই, তার নেপালী-ধরনের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডলের মৃদু হাসি দেখেও তেমনই বোঝবার উপায় নেই যে, ছোকরা ভীষণ রকম একগুঁয়ে। মাথায় একবার একটা ধারণা ব'সে গেলে আর নড়তে চায় না। গয়ার ধূলিধূসর রাস্তায় আমাকে দেখতে পেয়ে ডি. কে. থমকে খানিকক্ষণ দাঁড়াল, ক্ষণকাল কি চিন্তা করলে, এবং পরমুহূর্ত্তেই উল্লসিত হয়ে উঠল—আমার অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভ ক'রে নয়, অন্য কারণে। গয়ায় আমার আগমনের কারণ খুলে বলতেই, "অদ্ভুত যোগাযোগ তো" এই কথা কটি উচ্চারণ ক'রে ডি. কে. আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করলে। অর্থাৎ সে সঙ্গে সঙ্গে কৃতনিশ্চয় হয়ে গেল যে, আমি নির্ঘাত ওর সঙ্গে তাজমহল দেখতে আগ্রা

যাচ্ছি, আকস্মিক যোগাযোগটাই ওর বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করছিল। আমি যে ওর সঙ্গে যাবই, অর্থাৎ নিজের শক্তি সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'খপ্পর' নামক ছোট্ট কথাটি যে কত প্রবল এবং কিরূপ জটিলতাবোধক ধীরেনের খপ্পরে না পড়লে তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শিকারের গায়ে এক পাক কোন-ক্রমে জড়াতে পারলে পাইথন যেমন শিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, আমার নাগাল পাওয়ামাত্র ধীরেনও তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক, একজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া গেল। বাঙালী সঙ্গী না হ'লে যে ওর ভ্রমণ আটকে ছিল তা নয়; কিন্তু ধীরেনের ওই স্বভাব, একটা ধারণা মাথায় একবার প্রবেশ করলে সহজে বেরুতে চায় না। সাধারণত বাঙালীরা যেমন ফোটো তোলায় একবার বিয়ের সময় আর একবার মৃত্যুর পর, তেমনই ভ্রমণও করে—হয় চাকরি কিম্বা ব্যবসায় ব্যপদেশ, অথবা ধর্ম্মকামনায় বৃদ্ধবয়সে যদি সঙ্গতি থাকে। শুধু শুধু তাজমহল দেখতে পয়সা খরচ ক'রে আগ্রা যাব, এ চিন্তাও বাঙালী-সন্তানের কাছে হাস্যকর। সত্য মিথ্যা নানা অজুহাত দেখিয়ে আপত্তি করলাম। কিন্তু ডি. কে.র মাথায় ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল, তা ছাড়া সে ভাল ক'রে জানত, কি করলে বাঙালী-সন্তান কাবু হয়। কিছু না ব'লে সে এগিয়ে এল এবং আমার গলাটি জড়িয়ে আমার টিকিট এবং সদ্যলব্ধ 'চেক' সমেত মানিব্যাগটি বুক-পকেট থেকে বার ক'রে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডি. কে. পালোয়ান লোক, কপাল দিয়ে লোহার ডাণ্ডা বেঁকাতে পারে, বুকের ওপর মোটরকার চড়ায়, তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করতে যাওয়া বৃথা। সকাতরে বললাম, আমি প্রায় এক কাপড়ে চ'লে এসেছি ভাই, যদি নিতান্তই যেতে হয়, কলকাতা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি তা হ'লে।

ডি. কে. আর একবার মৃদু হেসে চাইলে আমার দিকে।

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দুজনে খানিকক্ষণ।

পোস্ট-অফিসের সামনে এসে ধীরেন বললে, দাঁড়া একটু।

দাঁড়িয়ে রইলাম, পালাবার উপায় নেই, ব্যাগ ওর কাছে। মিনিট দশেক পরে পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চল।

কোথায়?

ধর্ম্মশালায়, ওইখানেই উঠেছি আমি।

ধীরেনকে ভ্রমণের নেশায় পেয়েছিল। বললে, দু মাস ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্ম্মশালায় পৌঁছে বললে, তোকে আগ্রা থেকেই ছেড়ে দোব। আমার কেদার-বদরী পর্য্যন্ত ধাওয়া করবার ইচ্ছে আছে। একা একা ভাল লাগছিল না, এমন সময় তোর সঙ্গে দেখা।

আমার যে কাপড়-চোপড় কিছু সঙ্গে নেই।

রাত এগারোটা নাগাদ সব এসে পড়বে। আমার চেনা-শোনা একটি লোক আসছে আজ, তাকেই টেলিগ্রাম করলাম তোর বাসা থেকে তোর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন, না এসে পড়ে, কিনে নিলেই হবে। আমি দাম দোব।

পাইথনের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

আমার বাসায় গোকুল ছিল না, নীলু ছিল। গোকুল থাকলে আমার নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা এসে পড়ত; কিন্তু নীলু থাকাতে এসে পড়ল সেই সুটকেসটা, যা একদা তিন মাস আগে রাত্রি রেখে গিয়েছিল আমার কাছে প্রদোষের গোপনতায়।

২

ধীরেনকে মিছে কথা বলেছিলাম। একেবারে যে আমার কাছে কাপড়-চোপড় ছিল না তা নয়, অল্পস্বল্প ছিল। আগ্রার ধুলোয় দুদিনেই সেসব ময়লা হয়ে গেল। ধীরেনের সেদিন যাবার কথা, ট্রেনের বেশি দেরি ছিল না। নিজের জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল সে। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হঠাৎ সে বললে, আচ্ছা, তুই এ সুট্‌কেসটা আনালি, অথচ একদিনও খুললি না কেন বুঝতে পারছি না!

ওর চাবি আমার কাছে নেই।

চাবি নেই ব'লে ময়লা কাপড় জামা প'রে ঘুরবি!

ঘরের কোণে সুট্‌কেসটা ছিল, ডি. কে. উবু হয়ে গিয়ে বসল তার সামনে এবং আমি কিছু বলবার আগেই তালাটা ধ'রে এমন একটা মোচড় দিলে যে, সবসুদ্ধ উপড়ে উঠে এল। অপর কেউ হ'লে বাক্সের ডালাটা তুলে দেখত এর পর, কিন্তু ডি. কে.র তা স্বভাব নয়। সে স্থানচ্যুত কলসুদ্ধ তালাটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে একবার চাইলে এবং তারপর বেসুরে একটা গান গুনগুন করতে করতে আবার নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। সেই দিনই ও মথুরা হয়ে হরিদ্বার যাচ্ছিল, সেখান থেকে হৃষিকেশ, কনখল সেরে লছমনঝোলা যাবে। লছমনঝোলা থেকে কেদার-বদরী। ও তখন মনে মনে মশগুল হয়ে ছিল, একটা ছোট সুট্‌কেসের ভেতর কি আছে তা দেখবার কৌতূহলই হ'ল না ওর। তালা ভাঙা সত্ত্বেও আমিও যে তখুনি উঠে বাক্সটা খুললাম না, সেটাও ওর নজরে পড়ল না। ওর স্বভাবই ওই রকম। একটু পরেই টাঙা ডেকে আমি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলুম ধীরেনকে। ধীরেন ব'লে গেল, কেদার-বদরী থেকে যদি ফিরতে পারে, তা হ'লে আবার কলকাতায় দেখা করবে এসে। আমি আগ্রায় আরও দু-একদিন থেকে গেলাম, কাছাকাছি আরও দু-একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে যাবার লোভ হ'ল।

এই সূত্রে এক সিগারেটখোর সায়েবের গল্প মনে পড়ছে, এবং তার সঙ্গে নিজের আচরণের তুলনা ক'রে মনে যে অনুভূতি জাগছে, চলতি ভাষায় তাকে লজ্জাই বলতে হয়; কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা নির্লজ্জ। এক ডাকবাংলোয় এক সিগারেটখোর সায়েবের দেশলাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি সব দোকানে খোঁজ করলেন, কিন্তু 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই পাওয়া গেল না, সব 'মেড ইন জাপান'। দু ক্রোশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের তৈরি দেশলাই পাওয়াই গেল না। সন্ধ্যেবেলা ষ্টীমার এল, তাতে মেড ইন ইংল্যাণ্ড দেশলাই পাওয়া গেল, তারপর সায়েব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত দিন তিনি সিগারেট খান নি।

আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অতিশয় ঠুনকো। সামান্য একটু চাপ পড়লেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ডি. কে. চ'লে যাবার পর রাত্রির সুট্‌কেস খুলে দেখেছিলাম। তাতে দু-একখানা শাড়ি ব্লাউজ ছাড়া একখানা চিঠি ছিল। কারও চিঠি তার বিনা অনুমতিতে পড়া যে অনুচিত, এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানা পড়েছিলাম আমি। পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা রাত্রির মায়ের চিঠি।

৩

তার পরদিন ঠিক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাজমহলের একটা মিনারেটের উপর একা ব'সে ছিলাম। গ্রীষ্মকাল। দেখছিলাম, প্রায়-নির্জ্জলা যমুনা পূর্ব্বমহিমার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে কোনক্রমে। কল্পনা করবার চেষ্টা

করছিলাম, আলমগীর-কল্পিত কালো তাজমহল যদি যমুনার ওপারে সত্যিই নির্ম্মিত হ'ত, কেমন দেখতে হ'ত সেটা, তাজমহলের অভ্যন্তরে বৃদ্ধ পরিচারকের মুখনিঃসৃত "আল্লা—" শব্দটার করুণ প্রতিধ্বনি আবার যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল, আগ্রা ফোর্টের সেই অংশটা যেখানে শাহ্‌জাহান এসে বসতেন, দেওয়ালের গায়ে সারি সারি সবুজ গোল পাথর আর তার প্রত্যেকটিতে তাজমহলের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি— ; সহসা সমস্ত অবলুপ্ত ক'রে মনে পড়ল চিঠিখানার কথা। চিঠিখানা পকেটেই ছিল, আবার খুলে পড়লাম, বার বার ক'রে সেই অংশটাই পড়লাম, যার অর্থ বুঝতে পেরেও বুঝতে না পারার ভান করছিলাম।

"তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার অনুমতি না নিয়ে কেবলমাত্র ফার্নাণ্ডিজকে সঙ্গে ক'রে আমি শিবসমুদ্রম্ দেখতে কেন গিয়েছিলাম, সেখানে কেনই বা আমার দু দিন দেরি হ'ল—এসবের জবাবদিহি তোমার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জান। জেনে-শুনেও তুমি তবু জবাবদিহি তলব করেছ, কারণ তুমি পুরুষ, উচ্ছ্বাসের মুখে যেসব প্রতিশ্রুতি কর, উচ্ছ্বাস ক'মে গেলে তা পালন করবার কষ্ট স্বীকার করতে চাও না। এখন তুমি অনায়াসে ভুলে গেছ যে, শান্তনুর মত তুমিও একদিন আমার কাছে গদগদ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার কোন আচরণের প্রতিবাদ তুমি করবে না। অথচ আজ তুমি কড়া ভাষায় জবাবদিহি চেয়েছ। ন্যায়ত ধর্ম্মত যাঁর জবাবদিহি করবার অধিকার, তিনি ভুলেও কখনও তা করেন নি, করবেনও না। তুমি কি জান না, তুমিই এর মূর্ত্তিমান জবাবদিহি!..."

এ কটি কথার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। রাত্রির অন্ধকারে

গাছকে ভূত এবং মেঘকে পর্ব্বত ব'লে ভুল করা অসম্ভব নয়। তবু আমি জানি, আমি ভুল করি নি। রাত্রিকে এ বিষয়ে কোন দিন—হ্যাঁ, অধিকার পেয়েও—প্রশ্ন করি নি। সুট্‌কেসটি নিখুঁতভাবে সারিয়ে নিরুৎসুকভাবেই ফেরত দিয়েছিলাম।

বেশ মনে পড়ছে, চিঠিখানা পড়বার পর আবার আমার কল্পনায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল যমুনার অপর পারে কালো তাজমহলের নিকষকৃষ্ণ নিবিড় কান্তি, তার কোথাও একবিন্দু সাদা নেই, আগাগোড়া সমস্ত কালো।

তারপর সহসা অনুভব করলাম, আমি শুভ্র তাজমহলের সু-উচ্চ মিনারেটে ব'সে সূর্য্যোদয় দেখছি—কালো তাজমহলের নিছক কল্পনা-মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

সেদিন ভোরে সুট্‌কেসটা আমার কাছে রেখে রাত্রি যখন চ'লে গেল, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ ক'রে। রাত্রির অপ্রত্যাশিত অভ্যাগম ও অন্তর্দ্ধান, তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্‌শ্চারের কার্য্যকরী শক্তি এবং তজ্জন্য নিজের ঈষৎ গর্ব্ব, আমার বৈঠকখানা-ঘরের নূতন কেনা নীল-ডোম-দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক বাতির নীলাভ আলো, কয়েকটা কলের সমবেত বংশীধ্বনি—সমস্তটা মিলিয়ে সেটা যেন একটা নতুন রকম ভোর।

এই গলিতে যতদিন থেকে বাস করছি, ততদিন ভোরের সঙ্গে যে

কটা জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব'লে আমার ধারণা, সেদিন ভোরে এক ওই কলের বাঁশী ছাড়া, কি ক'রে জানি না, বাকি কটা জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোজ হড়হড় শব্দ ক'রে ময়লা-ফেলা গাড়ি যায়, কড়কড় শব্দ ক'রে পাশের বাড়ির ঝি এসে কড়া নাড়ে, ঘড়ঘড় শব্দে গলার কফ তুলতে তুলতে সামনের বাড়ির দ্বারিকবাবু তামাক খান, বড়বড় ক'রে মন্ত্র পড়তে পড়তে একদল লোক গঙ্গাস্নান করতে যায়, ছড়ছড় ক'রে কলে জল আসে। সেদিন ভোরেও এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনায় দাগ কাটতে পারে নি। সেদিনকার ভোরটা গগন ঠাকুরের ছবির মত একটা বিশিষ্ট অপরূপতায় আঁকা আছে আমার মানসপটে এখনও। নীলাভ আলোতে রাত্রি এসে দাঁড়াল, বংশীর প্রলাপ থেমে গেছে শুনে আমার মন আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাত্রির স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত প্রশংসার আভাস-মাত্র না দেখে একটু ক্ষোভ জাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রাত্রির গভীর প্রকৃতির পরিচায়ক মনে হওয়াতে সান্ত্বনা এল, নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে কলের বাঁশীগুলো বেজে উঠল, রাত্রি চ'লে গেল।

বেশ মনে পড়ছে, আমার মনে হয়েছিল যে, কলকাতা শহরে মাটি, আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের কোন অর্থ নেই,—যেখানে ফুলের স্থান গাছে নয় বাজারে, যেখানে পাখী নীড় বাঁধে না, খাঁচায় থাকে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলেই যেখানে নেশার ঘোরে উন্মত্ত, সুস্থ মনোবৃত্তি যেখানে উপহাসের খোরাক, নারীর নারীত্ব, কবির কবিত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে পণ্যদ্রব্যের সামিল, যেখানে ট্রামে, বাসে, সিনেমায়, বড় রাস্তায়, গলিতে সর্ব্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মৃতপ্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিস্তেজ আক্ষেপকে আনন্দ ব'লে মনে ক'রে কৃত্রিম উল্লাসের ভান করছে, সেই কলকাতা শহরের বুকে এমন একটা ভোর

সম্ভব হ'ল কি ক'রে! বিস্ময় জেগেছিল মনে, একটা স্বপ্নসুলভ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি, সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলাম যে, বর্ত্তমান যুগের উন্মাদ জনতার আমিও একজন, যে আনন্দে অভিভূত হয়েছি তা বর্ত্তমান-যুগ-সুলভ স্বাপ্নিক আনন্দই, বলিষ্ঠ কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, সেই নীলাভ আলোতে একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে তন্ময় হয়ে 'লোবার নিউমোনিয়া' সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করছি। আমার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিদ্যা একাগ্র হয়ে উঠেছে—বংশীকে বাঁচাতে হবে। হোক রাত্রির প্রকৃতি সুগভীর, বংশীকে যদি সত্যি সত্যি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, এতটুকু কৃতজ্ঞতার ঢেউ কি জাগবে না তার রহস্যময় অন্তর-সমুদ্রে, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টিতে সামান্যতম কোমলতাও কি আভাসিত হবে না? কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই, আরও অনেকক্ষণ হয়তো পড়তাম, যদি না একটা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় উঠে বসতে হ'ত। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। সমস্ত রাত খাওয়া হয় নি। সহসা-পুঞ্জীভূত বিরক্তি-সহকারে ডাক্তারী বইগুলো সরিয়ে ফেলে অনাবশ্যকরকম উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম গোকুলকে, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খোলা দরজা দিয়ে কুণ্ঠিত ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করল, ইলেক্‌ট্রিক আলোর ভয়ে সে যেন এতক্ষণ বাইরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়েছিল।

আদেশ শুনে গোকুল খুশি হ'ল, মনে মনে একটু বিস্মিতও হ'ল বোধ হয়। ভয়ানক খিদে পেয়েছে ব'লে খাবার দাবি করছি, এর চেয়ে আনন্দজনক বিস্ময়কর ঘটনা গোকুলের জীবনে বেশি ঘটে না। ওকে প্রত্যহ অনুযোগ, মিনতি, বকুনি, অভিমান—নানা উপায় অবলম্বন করতে হয় আমাকে পেট ভ'রে খাওয়াবার জন্যে। ওর ধারণা, ছোট ছেলেরা যেমন মাকে ফাঁকি দিয়ে নানা ছুতোয় খায় না, আমিও তেমনই

নানা ছুতোয় ওকে ফাঁকি দিই। মহানন্দে গোকুল একটা বড় পাঁউরুটি কাটতে ব'সে গেল, একটু পরে শব্দ শুনে বুঝলাম, ডিমও ফ্যানাচ্ছে—গোকুল জানে আমি কি ভালবাসি, ও পুরুষমানুষ নয়, ও মা।

এখন আমার মনে হচ্ছে, সেদিন এই দেরিটা যদি না হ'ত, অর্থাৎ রাত্রির আসা, সুটকেস রাখা, চ'লে যাওয়া—এই সামান্য ঘটনা যদি আমাকে সেদিন অতটা স্বপ্নাচ্ছন্ন না করত, বড় বড় ডাক্তারী বই ঘেঁটে অতখানি সময় যদি আমি অনর্থক নষ্ট না করতাম, অমন অসময়ে যদি অত খিদে আমার না পেত, রায় মশায়ের বাড়িতে রাত্রির সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব্বেই যদি আমি আহারটা সমাধা করতে পারতাম, অর্থাৎ অনিবার্য্যভাবে যে যে ঘটনা ঘটাতে স্বর্ণেন্দুর ওখানে যেতে আমার দেরি হয়ে গেল, সেগুলো যদি না ঘটত, তা হ'লে হয়তো জিনিসটা অন্যরকম হতে পারত। দেরি হ'ল ব'লেই প্রাতর্ভ্রমণ-ফিরতি ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, তিনি গল্পের অবতারণা ক'রে আরও দেরি করিয়ে তো দিলেনই, আমার মুখে সমস্ত শুনে পূর্ব্ববন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং নিজের চোখে সমস্ত দেখে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

আমি স্নান সেরে যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে দ্বারের কাছে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রঙচটা গাঁট-গাঁট লাঠিটি বগলে ক'রে ঈষৎ ঝুঁকে রুমালের ঝাপটা দিয়ে প্যানেলা জুতো থেকে ধুলো ঝাড়ছেন ধরণীবাবু। আমাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন, তারপর যেন আমার একটা জুয়াচুরি ধ'রে ফেলেছেন এই ভাবে প্রশ্ন করলেন, এর মধ্যেই চা তৈরি যে দেখছি আজ, ব্রাহ্মণকে সকালবেলায় চা খাইয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করবার মতলব নাকি হে?

বললাম, আসুন, বসুন।

খুটখুট ক'রে প্রবেশ করলেন ধরণীবাবু।

২

যদিও আমি খুব অন্যমনস্ক ছিলাম, অর্থাৎ আমার মনের যে অংশটা ধরণীবাবুর সঙ্গে লৌকিকতা করতে ব্যস্ত ছিল, তার চেয়ে ঢের বড় একটা অংশ যদিও নীরবে নেপথ্যে ব্যস্ত ছিল রাত্রিকে নিয়ে, তবু ধরণীবাবুর একটা কথা কানে প্রবেশ করামাত্রই রাত্রিকে নিয়ে ব্যস্ত মনের বৃহৎ অংশটার অধিকাংশই যেন সহসা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসে যোগদান করলে ধরণীবাবুর অংশটায়। এক চুমুক চা পান ক'রে ভারী একটা হৃদয়-রোচক প্রসঙ্গ তুললেন ধরণীবাবু।

শুধু ধরণীবাবুই নয়, আমাদের অনেকেরই জীবনদর্শন এবং জীবনযাপন এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। সত্য অথবা মিথ্যা দার্শনিকতার পাখায় ভর ক'রে মনোলোকের যে আকাশে আমরা অহরহ উড্ডীয়মান হই, সত্যি সত্যি উড়তে গিয়ে দেখা যায়, সে আকাশ-বিলাস বাস্তব জগতে আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমাদের পাখা এবং আকাশ দুইই কাল্পনিক, আসলে একটা পঙ্ককুণ্ডে কৃমির মত কিলবিল করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কল্পনাবান কৃমির যা দুর্দ্দশা, আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা। ধরণীবাবু সাহেবদের ওপর চটা, স্ত্রীশিক্ষার ওপর চটা, ব্রাহ্মদের ওপর চটা, সিনেমার ওপর চটা, টর্চের ওপর চটা, ট্যাক্সির ওপর চটা, আধুনিক অনেক জিনিসেরই ওপর হাড়ে-চটা তিনি। তাঁর মন কল্পনার পাখায় ভর ক'রে যে যুগের আকাশে উড়ে বেড়ায়, সেটা—ধরণীবাবু যদিও বলেন বৈদিক যুগ—আসলে বোধ হয় শায়েস্তা খাঁর

আমল। সে যুগে টাকায় আট মণ চাল ছিল, প্রচুর টাটকা দুধ ঘি মাছ সস্তায় পাওয়া যেত, স্ত্রীলোকদের আব্রু ছিল, একব্যক্তিক নয় একান্নবর্ত্তী পরিবারে লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবী হয়ে গ্রামে বাস করত। এই যুগের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাস্তব জীবনে কিন্তু ধরণীবাবুকে সাহেবদের ঝুঁকে সেলাম ক'রে তাদের অধীনে চাকরি করতে হয়েছে, শহরে এসে বাস করতে হয়েছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়েছে, নিজের ছোট মেয়েটিকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিতে হয়েছে, সিনেমা দেখতে হয়েছে, টর্চ কিনতে হয়েছে, গত যুগের ব্রাহ্মদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়েছে, ট্যাক্সি চড়তে হয়েছে, কলের চাল, পচা মাছ, জ'লো দুধ দুর্মূল্যে কিনতে হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু করতে হয়েছে যা শায়েস্তা খাঁর আমলে কেউ করত না। এর ফলে যা হয়েছে, তাকে যদিও আমরা শুদ্ধ ভাষায় দার্শনিকের আকুতি বলি না, চলিত ভাষায় কুৎসা-প্রবণতা নামে অভিহিত ক'রে থাকি; কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে, কয়লাই অনুকূল অবস্থায় হীরকে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস, অনুকূল অবস্থায় পড়লে ধরণীবাবুর পরনিন্দা-প্রবণ মনোভাব দার্শনিক মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারত, তিনি আর কিছু না হোন জনপ্রিয় সম্পাদক হতে পারতেন, সকালে বিকেলে অপরের বৈঠকখানায় হানা দিয়ে বর্ত্তমান-যুগে-বাধ্য-হয়ে-বাস-করা-জনিত দার্শনিক ক্ষোভ উদাহরণ-সম্বলিত ক'রে প্রকাশ ক'রে বেড়াতে হ'ত না তাঁকে, লোকে সভা ক'রে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে সভাপতি-রূপে এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনত তাঁর দার্শনিক বাণী।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধরণীবাবু বললেন, ওহে, মেঘনাদ এতদিন মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, এইবার সশরীরে দেখা দিয়েছেন। ইয়া পাকানো গোঁফ। মেঘনাদ-প্রসঙ্গ ধরণীবাবু

ইতিপূর্ব্বে আরও দু একবার আলোচনা করেছেন, সুতরাং বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তিনি সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির অদৃশ্য অথচ বর্ত্তমান প্রণয়ীটির চাক্ষুষ দর্শনলাভ করেছেন, যে তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁর বাড়ির সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।

উৎসুক কণ্ঠে বললাম, তাই নাকি?

কাপে দ্বিতীয় চুমুক দেবার জন্যে কাপটি তুলেছিলেন ধরণীবাবু, কিন্তু ওষ্ঠ পর্য্যন্ত না নিয়ে গিয়ে শূন্যেই সেটাকে ধ'রে রাখলেন এবং সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

তোমরা নাড়ি টিপে তবে লোকের ভেতরের খবর বলতে পার, তাও সব সময় পার না, কিন্তু আমরা এক নজরেই পারি।

দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে সেই জাতীয় আনন্দ ক্ষরিত হতে লাগল, যা কোন আবিষ্কারকের দৃষ্টি থেকে উপচে পড়ে স্বাভাবিক আবিষ্কারের পর।

যখনই দেখলাম, ঘন ঘন সিডান বডি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে আর জানলায় ঘন ঘন টর্চের আলো ফেলছে—

তৃতীয় চুমুক দিয়ে খানিকটা চা ডিশে ঢাললেন।

বাধ্য হয়েই, মানে ভদ্রতার খাতিরেই বলতে হ'ল আমাকে, আজকালকার কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।

আমার এই উক্তিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা করবার সুযোগ পেলেন তিনি। উত্তেজনাভরে ডিশে ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি চাটা শেষ ক'রে মুখটা মুছে হাত ধুয়ে বহুবার-শ্রুত সেই হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগলেন, আমি স্মিতমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনতে লাগলাম। তারপর একটু পরেই আমার যা

স্বভাব, বাইরে হুঁ হুঁ করতে করতে ভেতরে ভেতরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম, ওই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির কথাই। ভাবছিলাম, ভাগ্যিস মহিলা কলকাতা শহরে চাকরি করেন! কলকাতা শহরের বিশাল জনসমুদ্রে এত অসংখ্য কুৎসা-বুদ্বুদ উঠছে এবং লয় পাচ্ছে যে, তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবসর নেই কারও, তা ছাড়া এখানে কেউ কারও তোয়াক্কাই করে না। কিন্তু এই মহিলা যদি কোন মফঃস্বল শহরের ডোবায় গিয়ে বুদ্বুদ কাটতেন, সেখানে যদি ঘন ঘন সমাগত সিডান বডি ট্যাক্সি এবং টর্চ দিয়ে আলো ফেলার সঙ্গে ইয়া পাকানো গোঁফকে জড়িয়ে ফেলবার সুযোগ দিতেন সেখানকার ধরণীবাবুদের, তা হ'লে কি বিপর্য্যয় কাণ্ডই না ঘটত! মফঃস্বলের ছোট শহরে সকলেই সকলের হিতৈষী, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। কতকগুলো বেকার বুড়ো আর ছোঁড়া সকলের সব খবরের জন্য সর্ব্বদা উৎকর্ণ। মফঃস্বলের ইস্কুল-মাস্টারনীদের দেখছি, তাদের কথা ভাবলে ভারী দুঃখ হয় আমার। শহরসুদ্ধ সবাই তাদের গার্জেন। তাদের স্বাধীনভাবে কোথাও যাবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে হেসে কথা কইবার উপায় নেই, রাত নটার পর কোথাও থাকবার উপায় নেই, (যেন রাত্রি নটার আগে কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব!) বেচারীদের কিছু করবার উপায় নেই। বহু গার্জেন কটমট ক'রে সর্ব্বদাই তাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন এবং তারাও লেখাপড়া শিখে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে হাস্যকর নিয়মের বোরখা প'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে বন্দিনীর মত।

সহসা সচেতন হয়ে উঠলাম ধরণীবাবুর একটা কথায়।

আরে, ওই যে তোমার পূর্ণেন্দুবাবুর মেয়ে, ওইটুকু বয়সে ও না করেছে কি?

তখন আমি জানতাম না, পরে জেনেছি, এই ধরণীবাবুই তাকে প্রেমপত্র লিখেছিলেন একটা। হ্যাঁ, এই ধরণীবাবুই, তার পিতৃবন্ধু।

উঠে পড়লাম।

আমাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়িতে। এখুনি। বংশীর খুব অসুখ।

ওঁরা এসেছেন নাকি এখানে?

হ্যাঁ।

রাত্রিও এসেছে?

এসেছে।

কবে?

কবে ঠিক জানি না।

জামাটা গায়ে দিয়ে হাতে যখন হাত-ঘড়িটা বাঁধছি, ধরণীবাবু বললেন, চল, আমিও দেখে আসি। হাজার হোক বন্ধু লোক।

আপত্তি করতে পারলাম না।

ধরণীবাবু সঙ্গী হলেন।

৩

সেদিন সকালের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার মনে আছে। বেরিয়েই হাত-ঘড়িটা দেখলাম, ছটা বেজে পনরো মিনিট। যে ঘটনা-পরম্পরার জন্যে অনিবার্য্যভাবে আমার দেরি হ'ল, সেগুলো না ঘটলে আমি অন্তত আরও দু ঘণ্টা আগে যেতে পারতাম বংশীর কাছে এবং ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না। আমার এখনও ধারণা, ব্যাপারটা যদি ধরণীবাবুর জ্ঞানগোচর না হ'ত, তা হ'লে হয়তো এত তাড়াতাড়ি

সব জানাজানি হয়ে যেত না, হয়তো অন্য রকমও হতে পারত। কারণ বাড়িতে কেউ ছিল না। যে ঠিকে ঝিটা ওরা বাহাল করেছিল এসেই, সেই ঝিটাও তখনও আসে নি। স্বর্ণেন্দুর মাও ও বাসায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তাঁর গুরুদেবের কাছে। বস্তুত, পরে শুনেছিলাম, তিনি এ বাড়িতে এসে ওঠেনই নি। তিনি গুরুদেবকে নিয়ে মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় উঠেছিলেন। রায় মশায়ের বাড়ি থেকে রাত্রির সঙ্গে এসে গত রাত্রে যখন তাঁকে আমি দেখেছিলাম, তার একটু আগে তিনিও এদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য, বংশী অথবা পূর্ণেন্দুবাবু নয়, জ্যোতির্ম্ময় এবং রাত্রি। তিনি দেখতে এসেছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় এসেছে কি না। আমি চ'লে আসবার একটু পরেই তিনিও ফিরে গিয়েছিলেন মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে।

ঘড়িটা থেকে চোখ তুলেই দেখতে পেলাম, ঘোর নীল লুঙ্গি পরা সেই রোগা ফরসা ছোকরাটিকে, যে রোজ রাস্তার ধারের জানলায় ছোট হাত-আয়নাটি রেখে তন্ময়চিত্তে মুখ-বিকৃতি সহকারে দাড়ি কামায়। সেদিনও সে তাই করছিল। জানলার নীচেই সরু ফুট্‌পাথে একটা কালো বেরাল দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দিকে পীতাভ সবুজ চোখ দুটো ক্ষণকাল নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ সে ত্রস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটায়। তার পরের বাড়ির কাকাতুয়াটা তারস্বরে চীৎকার করছিল সমস্ত পাড়াটা সচকিত ক'রে। রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে, সেই বাঁকের মুখে একটা কল আছে, সেই কলকে কেন্দ্র ক'রে কলতলার কাব্য-কলরব উঠছিল দগ্ধ-কটাহ-মার্জ্জন-নিরতা আঁটসাঁট-কাপড়-পরা একটি তরুণী পরিচারিকার নবোন্মেষিত যৌবনের ঈষন্মাদক আবহাওয়ায়; আর একটু দূরে একজন ফেরিওয়ালা এসে এ পাড়ার সবজান্তা গোষ্ঠবাবুর অহমিকাকে তোয়াজ

ক'রে কতকগুলো দাগী আম বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল তাঁর কাছে, বলছিল, আপনি হলেন সমঝদার লোক বাবু, তাই আপনার কাছেই আগে নিয়ে এলুম। বুলবুলভোগ আম এ কলকাতা শহরে কটা লোক চেনে, বলুন? এই আমগুলো দেখে ধরণীবাবুর ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হ'ল সম্ভবত, বললেন, তোমার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা হবে হে ডাক্তার? পকেট থেকে ব্যাগ বার ক'রে দেখলাম, কাল রাত্রে ট্যাক্সি-ভাড়া দেওয়ার পর পাঁচ টাকা থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তাই রয়েছে। ড্রাইভারকে আমি পাঁচ টাকার নোটটা দিয়েছিলাম, সে কত ফেরত দিয়েছিল তা গুনে নেবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন আমার। দেখলাম, একটা আধুলি রয়েছে, বার ক'রে দিলাম ধরণীবাবুকে। ধরণী-বাবু বললেন, ও নিয়ে আমি কি করব, কিছু কমলানেবু-টেবু কিনিগে চল। রুগীর বাড়ি যাচ্ছি, তা বললে কি চলে, হাজার হোক বন্ধু লোক। লোকত ধর্ম্মত একটা—। ধরণীবাবু কথা অসম্পূর্ণ রেখে এমন ভাবে আমার পানে চাইলেন, যেন আমি কমলালেবু কেনার বিরোধী। আমি কিছু না ব'লে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। মোড়ের চায়ের দোকানটায় দেখলাম, বাঁধা খদ্দেরগুলি যুদ্ধের সংবাদ আলোচনা করতে করতে বহুবার-মোছা অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের ধারে ব'সে রোজ যেমন চা খান, সেদিনও তেমনই খাচ্ছেন। ঠোঁটে ধবল, আঙুলে ধবল, চোখের কোলে ধবল জ্যোতিষীটি নিজের আসনটি পাতছেন ফুট্‌পাথের ওপর এদিক ওদিক চাইতে চাইতে। শ্যামবাজারমুখী ট্রামটার শিরোনামায় এস্‌প্ল্যানেড লেখা রয়েছে, হয় ড্রাইভার অন্যমনস্ক, না হয় ঘোরাবার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে। ডানহাতি গলির মোড়টায় শ্বশুরের সহায়তায় সদ্য-বিবাহিত যে যুবকটি মনিহারী দোকানটি সম্প্রতি খুলেছেন, তাঁকে সঙ্গসুখ দান করবার জন্যে যে কজন ছোকরা ওই সঙ্কীর্ণ দোকানের সঙ্কীর্ণতর

বেঞ্চিটায় ব'সে রোজ হাসাহাসি করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজন এসে জুটেছেন দেখলাম, যেটির নেউলের মত মুখ সেইটি এবং নাদুসনুদুসটি। কার বাড়ি থেকে জানি না, বড় বড় লোমওলা ছোট্ট একটা কুকুর ফুটপাথে বেরিয়ে ছুটোছুটি করছিল—চ্যাপটা-গোছের ছোট মুখ লোমে পরিপূর্ণ, চোখ দেখা যায় না।

চ'লে যেও না হে, দাঁড়াও।

ওধারের ফুটপাথে কমলালেবু দেখতে পেয়েছিলেন ধরণীবাবু। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে রাস্তা পেরিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন, আমি যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করলাম। পশ্চিমদেশীয় দোকানদারটির সঙ্গে হাস্যকর হিন্দীতে অনেক দর-কষাকষি করলেন, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। অনেক ধস্তাধস্তির পর টাকায় বত্রিশটা থেকে টাকায় চল্লিশটা দিতে সে যখন রাজি হয়, তখন আট আনার লেবু কিনলেন ধরণীবাবু। পাশের একটা মুদীর দোকান থেকে একটা বড় ঠোঙা ভিক্ষা ক'রে আনলেন।

এই সমস্তই এবং আরও নানা ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল সেদিন সকালে, সমস্তই আমি ধৈর্যভরে সহ্য করেছিলাম সেই শক্তিবলে, যে শক্তি মানুষ লাভ করে আনন্দের প্রেরণায়। আমার দেওয়া তিন ধোরাক ব্রোমাইড মিক্শ্চার পান ক'রে বংশীর প্রলাপ থেমেছে এবং রাত্রি নিজে এসে সে কথা আমায় ব'লে গেছে, এতেই আমার মন এমন একটা উত্তুঙ্গ লোকে আরোহণ করেছিল যে, এই সব তুচ্ছ ঘটনার সাধ্য ছিল না আমাকে বিচলিত করে।

মনুমেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে সমতলবর্ত্তী লোকজন গাড়ি বাড়ি মোটর এবং তাদের সমন্বয়বৈচিত্র্য লোকে যেমন নিরুৎসুক অনুকম্পাভরে দেখে, সেদিন সকালের ঘটনাবলী আমিও সেই রকম উদাসীন দৃষ্টিতে দেখছিলাম

অনেক উর্দ্ধলোক থেকে। যদিও রাত্রির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয় নি, তার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হর্ষের বিন্দুমাত্র আভাসও দেখতে পাই নি, তবু সেদিন কলকাতা শহরের কলরবের মধ্যেও দুটি কথা আমার কানে যেন গান গেয়ে ফিরছিল—"থেমে গেছে।"

৪

স্বর্ণেন্দুর বাসায় যখন পৌছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে, কিন্তু তখনও সেই অন্ধ গলিটা থেকে অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। সরু লম্বা ঈষৎ অন্ধকার গলিটা, তবু তার ভেতর থেকে ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল, কল থেকে চৌবাচ্চায় জল পড়ার একটা একটানা শব্দও ভেসে আসছিল কোথা থেকে যেন, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাশের বাড়ির বারান্দার খোপ থেকে পায়রাটা ডাকছিল তার সঙ্গিনীকে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে, ঠুনঠুন শব্দ ক'রে একটা রিক্শওয়ালা অলস মন্থর গতিতে চলেছিল।

প্রথম রসভঙ্গ হ'ল গলিতে ঢোকবার মুখেই, ধরণীবাবুর কমলালেবুর ঠোঙাটা ফেটে গেল, প'ড়ে গেল দুচারটে লেবু এবং সেগুলোকে সামলাতে গিয়ে আরও দুচারটে পড়ল। বিরক্ত ধরণীবাবু হেঁট হয়ে কুড়োতে লাগলেন সেসব, আমার লোকটাকে ঘোর মিথ্যুক ব'লে সন্দেহ হ'ল। গত তিন মাস যাবৎ ইনি কোমরের বাতের ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে, দেখা হ'লেই বলেন, ওষুধে কোন ফল হ'ল না হে, মোটে হেঁট হতে পারি না। স্বচক্ষে দেখলাম, বেশ হেঁট হতে পারছেন তিনি, অথচ সে কথা স্বীকার করেন না কখনও ভুলেও, চিকিৎসা করাচ্ছেন

যেন আমাকে বাধিত করবার জন্যেই। মানব-চরিত্রের একটা দিক যেন পরিস্ফুট হ'ল আমার কাছে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

গলির ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ল, স্বর্ণেন্দুদের বাসার দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার পাশেই একটা শ্যাওলাপড়া ছোট চৌবাচ্চা, একটা ভাঙা কলের মুখ থেকে অবিরাম জল পড়ছে তাতে, কাছেই হাতলহীন টিনের একটা মগ প'ড়ে আছে কাত হয়ে।

ধরণীবাবু কমলালেবুগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছিলেন। আমি একাগ্রদৃষ্টিতে খোলা দরজাটার পানে চেয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, হঠাৎ হয়তো রাত্রি এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে, অপরিচিত জ্যোতির্ময়বাবুও হয়তো বেরিয়ে আসতে পারেন। বেশ মনে আছে, এদের দুজনকেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম; ওই খোলা দরজায় স্বর্ণেন্দুর আবির্ভাব যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, আমি সেটা প্রত্যাশা করি নি।

কেউ এল না। এটাও বেশ মনে পড়ছে, তাদের না আসার একটা সঙ্গত কারণও আমি অনুমান ক'রে নিয়েছিলাম ওই অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে। মনে হয়েছিল, সারারাত জেগে এসে ক্লান্ত জ্যোতির্ময়বাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, রাত্রি হয়তো স্নান করছে, কিম্বা হয়তো নিদ্রিত বংশীর মাথার শিয়রে ব'সে হাওয়া করছে আস্তে আস্তে, সমস্ত রাত জেগে স্বর্ণেন্দু হয়তো শুয়েছে একটু।

খোলা দরজাটা দিয়ে আমি আগে ঢুকলাম।

আমার পিছু পিছু ধরণীবাবু।

ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা। যদিও তিনি উত্থানশক্তিরহিত, পাশের ঘরে কি ঘটেছে তা জানবার যদিও কোন উপায় ছিল না তাঁর, তবু আমার মনে হয়, কোন অতীন্দ্রিয় উপায়ে

কিছু আভাস যেন পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন্ত চোখটা যেন তারস্বরে প্রশ্ন করছিল, কি হয়েছে, ও ঘরে কি হয়েছে, জান তোমরা?

তাঁর বিছানার পাশেই খালি একটা চেয়ার ছিল। ধরণীবাবুর মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম, নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখে প্রাগ্‌জীবনের প্রভুভৃত্যসম্বন্ধজনিত দাস্যভাবটা প্রকট হয়ে উঠল, আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে সবিনয় নমস্কারান্তে সসঙ্কোচে উপবেশন করলেন তিনি চেয়ারটাতে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

স্বর্ণেন্দু যেন দোল খেলেছে। তার জামা কাপড়, বংশীর বিছানা সব লালে লাল। রক্ত! চাপ চাপ রক্ত চতুর্দ্দিকে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা হাঁ ক'রে আছে। পাশেই প'ড়ে আছে রক্তাক্ত বাঁকা ছোরাটা, যেটা ফার্নাণ্ডিজ রাত্রিকে উপহার পাঠিয়েছিল তার জন্মদিনে। লাল খাপখানাও প'ড়ে রয়েছে মেঝেতে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একি!

স্বর্ণেন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর তার ছোট্ট হাসিটি হেসে বললে, আমি করেছি।

ক্রমশ

"বনফুল"

বিভাবরী

অস্ত আর উদয়ের মাঝখানে পুরা অর্দ্ধদিন,
যদিও রাজত্ব মোর অনাদি অনন্ত কাল ধরি—
দিবসের প্রখরতা মোর মাঝে শান্তিতে বিলীন,
তবু রাত্রি নামে নিন্দা, যুগে যুগে আমি বিভাবরী।

নব বিধান

দিকে দিকে আশার বাণী আশ্বাসিছে নিঃস্বে—
বিলম্ব নাই, নব বিধান আসছে ত্বরা বিশ্বে।
চলছে যে এই হানাহানি জলে-স্থলে-শূন্যে—
এসব নাকি আমাদেরি পিতৃলোকের পুণ্যে!
রিক্ত মানবতা নেয়ে উঠল নর-রক্তে,
চির-অভিষিক্ত হবে মর্ত্ত্যে ময়ূর-তক্তে।

সুখের কথা; কিন্তু স্বতঃই প্রশ্ন জাগে চিত্তে,
শূন্য ধরা ভরবে কারা স্বর্গ-সুখের বিত্তে?
দিন-দুপুরে বিশ্ব জুড়ে দস্যুতা ও চৌর্য্য
চলছে যাদের, জ্বলছে যাদের সর্ব্বনাশা শৌর্য্য
কাম্য যাহা, শ্রেষ্ঠ যাহা, নিঃশেষে সব ভস্মি,
গুণ-গরিমার দীপ্তি যাদের ক্ষিপ্ত গ্রহের রশ্মি?

সাগর-দোলায় ঘুমায় সুখে প্রমোদ-তরীর যাত্রী,
ঘুমায় সুখে ধরার বুকে শুক্লা তিমির-রাত্রি;
হিংস্র জল-জন্তু যবে অলস ঘুমে মগ্ন,
যাদের কাছে ভরা-ডুবির সেই সে শুভ-লগ্ন?
জীবন-তরী আঁকড়ে ধরি নিবিড় বাহু-বন্ধে
দুলছে যবে যাত্রী সবে মৃত্যু-দোলা-ছন্দে,
ভেলায় ভাসা আশায় যারা হানছে অনল-বৃষ্টি
রচবে তারা নবীন বিধান, গড়বে নব সৃষ্টি?

করতে হরণ স্বাধীন জাতির মৃত্যু-বরণ মুক্তি
শক্তি শুধুই যাদের কাছে জন্তু-মনের যুক্তি,
বিশ্ব-নরের ভাগ্য নিয়ে খেলছে যারা স্ফূর্ত্তি
তাদেরই দান নব বিধান ধরবে সে কোন্ মূর্ত্তি?

তাহার চেয়ে ভোগ সে করুক, যাহা আছে যার তা,
থামাও তোমার স্বর্গ-সুখের নব-যুগের বার্ত্তা।
নেপ্‌টোনা আর অক্টোপাসের আলিঙ্গনের গ্রন্থি
দয়ার বশে দূরেই থাক শৃঙ্গী-নখী-দন্তী।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

সাধারণ

আদিতেও ভয় ছিল না রে ভাই, নববিধানেও কোন ভয় নাই,
ভয় করি বড়, খই নাহি পাই সামান্য সাধারণে।
সে যে প্রতিদিন আশেপাশে রহি তোমার আমার ভাষা কহি কহি
প্রতিবেশীদের বিশ্বাস বহি অতি মিঠা আলাপনে
গুছাইয়া লয় কাজ আপনার যার কাঁধে চেপে হয় মরু পার
তারি পিঠে লাথি মেরে বলে আর তোমাদের নহি কেউ,
পরের জমিতে চালায়ে শিকড় ফুটায় কুসুম-নিকর
ভাল জানে তারা ফাঁকির ফিকির এরা সাধারণ ফেউ।

বল্লভপুরের মাঠ

চাটুজ্জে মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দুইজন বরকন্দাজ সহ বাহির হইয়া পড়িলাম।

বল্লভপুরের মাঠ পার হইতে পারিলেই সদর কাছারি। সাত মাইল পথ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তা ছাড়া দুইজন বলবান পশ্চিমা ভৃত্য ও হ্যারিকেনের আলো রহিয়াছে, নির্ভয়ে হাঁটিতে লাগিলাম।

কাছারিতে সময়মত পৌছাইতে পারিলেই টাকাটা খাজাঞ্চিখানায় জমা দিয়া গোড়া হইতে থিয়েটার দেখিতে পারিব।

কলিকাতা হইতে কলেজে-পড়া ছোকরারা আসিয়াছে। ঘরোয়া কথা বলার মত নাকি উহারা অভিনব উপায়ে অ্যাক্‌টিং করিয়া থাকে। এই প্লে দেখিবার জন্য প্রায় ভোর হইতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছি। বৃহস্পতিবারে আবার নাপিত আসে না। গত্যন্তর না থাকায় ভোঁতা মরিচা-পড়া ক্ষুরটা লইয়াই দাড়ি কামাইয়াছিলাম, অনেক স্থলে কাটিয়া গিয়াছে। তা যাউক। গালটা বেশ মসৃণ বোধ করিতেছি। আহা, গৃহিণী এই সময় নিকটে থাকিলে অন্তত একবার—। গোঁফটা ঠিকমত ছাঁটিয়াছি কি? বোধ হয় না। গ্রহের ফেরে হাটে-কেনা পুরাতন আয়নাখানা কাল হাত হইতে পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল। পুরুষের চিহ্ন গোঁফ। হ্যাঃ, পুরুষের গোঁফ এদিক ওদিক হইলেই বা। তা ছাড়া অন্ধকারে কে দেখিতে আসিবে! চাটুজ্জে মহাশয়ের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহস্পতিবারের বারবেলাতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। দুর্গানাম করিয়া বাহির হইয়াছি, কিছুই হইবে না। একটা মস্ত সান্ত্বনা পাইলাম।

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল, আমোদ-প্রমোদের ভিতর একমাত্র তাস-খেলা অবলম্বন করিয়া নায়েবগিরি করিতেছি। খেলার ফাঁকে অবসর পাইলে, কাহারও না কাহারও চরিত্রদোষ লইয়া সময় কাটাইবার ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু প্রাণ খুলিয়া মুখরোচক ভাষা ব্যবহার করিতে না পারিলে পরনিন্দায় নিরীহ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। গ্রামের সকলের নিকটই আমি পরিচিত, এক দিক দিয়া উহারা ঘোরতর অবুঝ। অকারণ চাঁদা করিয়া মার দিবার ভয় দেখায়, ঠ্যাঙানির ভয়ে এমন একটি ভোগের বস্তু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সঙ্কট অবস্থায় শহুরে ছেলেদের থিয়েটারের খবর আসিল। পরনিন্দালোভী আত্মাকে সান্ত্বনা দিবার সুযোগ পাইলাম। নূতন লোক এইবার ধরিতে পারিব। 'মাভৈঃ' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার তত্ত্বাবধানে যে মহালটি ছিল, তাহার হস্তবুদ মোটা টাকার। এবারকার কিস্তি ভালই আদায় হইয়াছে। মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিতে-ছিলাম, ম্যানেজারবাবুকে মাহিনা বাড়াইয়া দিতে বলিব, নতুবা শহরে বদলি করিতে হইবে। দরখাস্ত অবহেলা করিলে চাকরি ছাড়িয়া দিব। দুত্তোর! এমন কি মাহিনা! কিন্তু উপরি পাওনার কথা মনে পড়িতেই চাকরি ছাড়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। জমিদারিতে চাকরি না করিলে সেদিন কি পুঁটীর (আমার ভগ্নীর) বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারিত? কচি পাঁঠা হইতে আরম্ভ করিয়া কাতলা এবং কালবোস ও তৎসহ যত রকমের শাকসব্জি বিনা পয়সায় কাহারা যোগাইত? আরে ছ্যাঃ, চাকরি ছাড়িব বলিলেই কি ছাড়িতেছি নাকি? ম্যানেজারবাবু মানকচু ও কচি আম ভালবাসেন। কয়েকটা সঙ্গে লইলে ভাল হইত। থাক, ভুল যখন হইয়াছে, তখন ও বিষয়ে

ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে বলিলেই ম্যানেজারবাবু সন্তুষ্ট হইবেন।

চাকরি, সংসার ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গাঁ ছাড়িয়া অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

মাঝে মাঝে শীতলের মুদ্রাদোষ—গলা-খাঁকরানি, ঝিল্লীর কলরব এবং বরকন্দাজদের সামরিক জুতার মসমস আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। লণ্ঠনের আলোর পরিধির বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের ফাঁকে অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ—আঁকিয়া বাঁকিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। পথের শেষ নাই। মাঝে মাঝে হাওয়ার মৃদু দোলায় খটখট ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আসিতেছে। সন্দিগ্ধ হইলে অনেক কিছুই ভাবিবার বিষয় আসিয়া পড়ে। হঠাৎ একটি শৃগাল রাস্তা অতিক্রম করিয়া সামনের ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। ঝোপটি ফতিমা বিবির গোর ঘিরিয়া আছে।

ফতিমা বিবি কে এবং কবে তিনি গত হইয়াছিলেন, সে খবর কেহ রাখে না। কিন্তু লোকে গোর সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ফতিমা বিবির নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

চাটুজ্জে মহাশয় পুনঃ পুনঃ এই স্থানটির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর মাছ ধরিয়া বাসায় ফিরিবার সময় তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল, মনে পড়িতে লাগিল। কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলাম, আমাদের কাহারও নিকট মাছ অথবা মাংস ছিল না!

এতটা আসিতে হঠাৎ মনে হইল, শীতল সিংএর গলা-খাঁকরানি অনেকক্ষণ শুনি নাই। কেন বলিতে পারি না, পিছন ফিরিতে সাহস পাইলাম না। সামনের দিকে মুখ রাখিয়াই ডাকিলাম, শীতল!

সাড়া নাই। গাটা ছমছম করিয়া উঠিল। পাঁড়ের স্কন্ধে হাত

দিলাম। সে চমকিয়া পিছন ফিরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিল, একটি জীবন্ত মানুষ কমিয়া গিয়াছে।

উভয়ে উভয়ের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলাম—প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ের এক। উভয়েই একসঙ্গে বলিলাম, শীতল কিধর গিয়া? নিঃশব্দে উভয়েই উভয়কে চক্ষের ভাষায় জানাইলাম, কেহই জানি না।

শীতলের নিকট টাকা ছিল না। সুতরাং সে সরিয়া পড়িবে কেন? নূতন বাহাল হইয়াছে, তাহার নিকট হাজার হাজার টাকার হুণ্ডি গচ্ছিত রাখার প্রশ্নই উঠে না। চারিধার ভাল করিয়া দেখিলাম; শীতলকে পাওয়া গেল না।

পাঁড়েকে বলিলাম, ফিরিয়া চল, দেখি শীতলের কি হইল! পাঁড়ে হাঁ না কিছুই বলিল না। আমার হাতে লণ্ঠন দিয়া অনুসরণ করিতে লাগিল। চাটুজ্জে মহাশয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পিছনের জীবন্ত মানুষ এই ভাবে অন্তর্ধান হইবে, কে ভাবিতে পারিয়াছিল! মাছ নয়, মাংস নয়, একটা সাজোয়ান জীবন্ত পশ্চিমা। যে উৎসাহ লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, এখন তাহা তিরোহিত হইয়াছে। কোন প্রকারে গাঁয়ের নিকট পৌছাইতে পারিলে বাঁচি। সাহস সঞ্চয় করিয়া শীতলকে খুঁজিয়া বাহির করিব সেরূপ উৎসাহ আর নাই, নিরুপায় হইয়াই সামনে চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, হঠাৎ স্কন্ধের উন্মুক্ত স্থলে লৌহের মত কঠিন পদার্থের স্পর্শ অনুভব করিলাম। কঙ্কালসার আঙুলের দৃঢ় চাপ মনে হইয়াছিল। হঠাৎ পিছন ফিরিতেই মনে হইল, হিমবৎ কঙ্কাল স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছু দেখিলে কি? সে প্যাচানো লোহা-বাঁধানো লাঠি সামলাইতে সামলাইতে অত্যন্ত ভীতভাবে উত্তর করিল, না। একবার

ভাবিলাম, পাঁড়ের লাঠির ডগাটা কাঁধে পড়ে নাই তো? কখনই না, আমি যে পাঁচটি আঙুলের চাপ অনুভব করিলাম! লাঠির ডগা হইবে কি করিয়া! তাহা ছাড়া পিছন ফিরিতেই হাত যে সরিয়া গেল। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলাম না। লক্ষ্য করিলাম, পাঁড়ের মুখ প্রায় বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাকে কিছু না বলাই ভাল। এখন মনে বল না আনিতে পারিলে রক্ষা নাই।

জমিদারিতে কাজ করি; অভিজ্ঞতায় জানিতাম, জীবন্ত মানুষ উপিয়া গিয়াছে বলিলে কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। অধিকন্তু গুমির অপরাধে শ্রীঘর-দর্শনলাভও হইতে পারে। সুতরাং খুঁজিয়া না পাই, অন্তত মানুষ যে হারাইয়াছে, তাহার একটা প্রমাণ থাকা দরকার। বাহিরে একটা সুস্থ মানুষের আব্রু টানিয়া পাঁড়েকে বলিলাম, শীতলকে বাহির করিতে হইবে। চল, দেখি সে কোথায় গেল! পাঁড়ে ভয়ে সম্মোহিতের মত হইয়া ছিল, কোনই আপত্তি করিল না—এরূপ বশ্যতা পাঁড়ের কখনও দেখি নাই। তাহার অস্বাভাবিক ব্যবহারে আমিও কেমন দমিয়া যাইতেছিলাম।

চীৎকার করিয়া শীতলকে ডাকিতে বলিলাম। কিন্তু পাঁড়ের গলা হইতে যে শব্দ বাহির হইল, তাহা দশ গজের বেশি পৌঁছাইয়াছিল কি না সন্দেহ। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন শীতলকে পাইলাম না, তখন পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি করা যায়? তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিবার আগেই বাঁশের ডালের উপর হইতে একটি অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং পর-মুহূর্ত্তে মনে হইল, পাশের ডোবায় কে ডুব দিল। শিহরিয়া উঠিলাম। এইখানেই তো চাটুজ্জে মহাশয় মাছ ধরিয়াছিলেন। তবে কি অন্তর্যামী অশরীরীর কোপ এখনও কমে নাই? আমরা তো মাছ ধরিতে আসি নাই; তবে কেন এই নির্দ্দয়তা? দুর্ব্বল

বোধ করিতেছিলাম। ইঙ্গিতে পাঁড়েকে নিকটে আসিতে বলিয়া তাহার গা টিপিলাম। সে জানাইল, শব্দ সেও শুনিয়াছে। জোর করিয়া সাহস সঞ্চয় করিলাম। ডোবার নিকট গিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া দেখিলাম, তখনও জলে ছোট ছোট তরঙ্গ রহিয়াছে, অথচ কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নাই। ডোবার খানিকটা অংশে পচা পাট। ঐ উদ্দেশ্যেই ডোবাটি কাটা—দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যায় না। এত নোংরা জলে এই সময় ডুব দিবে কে? মনকে স্তোক দিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিলাম, নিশ্চয় ভোঁদড়, ভাম অথবা গন্ধগোকুল। কিন্তু সান্ত্বনা পাইলাম না। সব ঘটনাই কেমন জটিল হইয়া উঠিতেছিল। শীতলের কি হইয়াছে ভাবিতে পারিতেছিলাম না। ভারাক্রান্ত দেহকে টানিয়া লইয়া চলিলাম।

যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই খোলা মাঠের জাগ্রত প্রহরী ঝিল্লীর দল রঁধ-ডাকার মত একদল আর একদলকে আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছে। একদল থামে তো আর একদল আরও দূরে সঙ্কেত পাঠাইয়া দেয়। ক্রমে আমরা কালীবাড়ি শ্মশানের নিকট আসিয়া পড়িলাম।

চাঁদ তখন সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মন্দিরের পিছনে ছোট্ট নদীতে যেটুকু জল ছিল, তাহার উপর চাঁদের ক্ষীণ আলো পড়ায় একটি রূপালী রেখার মত লাগিতেছে। মন্দিরের বিরাট আকার এখন মাথা উঁচু করিয়া আছে। লোকে জানে, বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ কেহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ওলাউঠার মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম নিঃশেষিত হওয়ায় এখন মানুষের বসতির পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে ছোট জঙ্গলের মত হইয়া আছে। মাঝে মাঝে চিতাবাঘের ডাকও অনেকে শুনিয়া থাকে। ইহাই মন্দিরের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, আরও নানা কথা

শুনিয়াছি। তথাপি সিঁড়ির ধাপে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। শীতলের কথা ভাবিবার এখন সময় নাই। বসিলাম। পাঁড়ে এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা পছন্দ করিতেছিল না। না বসিয়া উপায়ই বা কি আছে! জনমানবশূন্য মাঠ; চার মাইলের ভিতর কোন মানুষের অস্তিত্ব নাই। এখানে যেমনেই বিপদে পড়ি না কেন, না মরা পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে আসিবে না; কারণ শুনিয়াছি, এ মাঠ অতিক্রম করিতে হইলে মানুষ দিনের বেলায় পর্য্যন্ত দল বাঁধিয়া চলে। গম্যস্থল অতি দূরে, সুতরাং একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া ভাল। আগের ঘটনাগুলিতে ইতিমধ্যেই তালু শুকাইয়া গিয়াছিল, অথচ নদীর জল খাইবার সাহস পাইতেছি না। প্রথম উহাতে স্রোত নাই, দ্বিতীয় কারণ, এক আঁজলা জল তুলিতে হয়তো দুই একটি হেলে সাপও হাতে জড়াইয়া যাইতে পারে।

সিঁড়িতে বসিয়া মন্দির-সংলগ্ন পান্থশালা দেখিতেছিলাম। কোন-কালে এক পংক্তিতে সহস্রাধিক মানুষকে যে আহার দেওয়া হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পান্থশালার সামনেই অতি বৃহদাকার কুয়া। জল নিশ্চয় আছে, হয়তো স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মতই হইবে। কিন্তু পান করিবার উপায় নাই। ভগ্ন ইটের স্তূপ ও আগাছা পথ রোধ করিয়াছে। বৃহৎ পরিধি লইয়া পান্থশালার পাঁচিল—স্থানে স্থানে হেলিয়া পড়িয়াছে। কোথাও বা ধসিয়া গিয়াছে, কোথাও ভগ্নোন্মুখ অবয়ব বটের শিকড়ের দৃঢ় বন্ধনে প্রায় দোদুল্যমান, কিন্তু মাথা নত হয় নাই। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। কবাট নাই, কিন্তু ভিতরের প্রবেশপথ দুর্গম। নানা গাছের শিকড় বৎসরের পর বৎসর সংখ্যা বাড়াইয়া স্থানটি ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকাইতে মন চাহে না—কি জানি, যদি কিছু দেখিয়া ফেলি!

ধীরে ধীরে মন্দিরের পুরাতন ইতিহাস মনে আসিতে লাগিল। মহামারীর পর পান্থশালা কি ভাবে ডাকাতের আড্ডা হইয়াছিল, কি ভাবে নরবলির জন্য বলিষ্ঠ ও সুস্থ শিশু সংগ্রহ করা হইত, কি ভাবে কুলটা এখানে আত্মহত্যা করিয়াছিল—আরও কত ঘটনা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল বলা কঠিন।

চাঁদের আলো তখন ডালপালা ভেদ করিয়া পান্থশালার চাতালে আসিয়া পড়িয়াছে। কুহেলিকার সংস্পর্শে চন্দ্রকিরণ স্থানটিকে আরও ভীতিপ্রদ এবং রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। সব কিছুর রূপই সন্দিগ্ধ-ভাবে দেখিতেছি। কোন্‌টা কায়া, কোন্‌টা ছায়া—বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। হঠাৎ জ্যোৎস্নার শুভ্রতা স্তিমিত হইয়া আসিল। অস্বস্তিকর বাদলা হাওয়া—দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও অনুভব করিলাম। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মনে পড়িল, কুলটার কথা। ভাবিলাম, বারান্দার পার্শ্বে ঐ ঘরটিতেই হয়তো সে নীতির পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। দমকা হাওয়ায় চমকিত হইয়া সেই ঘরের দিকে তাকাইলাম।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—এলোকেশী যৌবনমত্তা নারী, নিটোল নগ্নবক্ষ স্ফীত করিয়া আমাকে স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেছে। চক্ষু দুইটি সিন্দুরবর্ণের প্রজ্জ্বলিত দুইটি অগ্নিগোলক। আবার দমকা হাওয়া। নারী শূন্যে উঠিয়া পুনরায় দরজার সামনে নামিল। তাহার পর বেগে ভিতরে প্রবেশ করিল। পর-মুহূর্ত্তে চাপা ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জানালাটা কে সজোরে ঠুকিতে লাগিল। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণে শুনিলাম, গুরুভার পতনের শব্দ! নারী যেন প্রেতলোক হইতে কি ভাবে আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছে। দেওয়ালের আড়ালে যাহা কিছু ঘটিতেছিল, তাহা অনুমানে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম।

মাথাটা ঝিমাইয়া আসিতে লাগিল। পাঁড়েকে আমার অতি নিকটে বসিতে বলিলাম। জীবন্ত মানুষের স্পর্শে অনেকটা বল পাইলাম। অন্য দিকে মুখ ফিরাইবার শক্তি আমার ছিল না, ঘটনাস্থলটি আমার দৃষ্টিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতেছিল।

কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ মনে হইল, কে দারুণভাবে জানালাটা আঁচড়াইতেছে। মানুষের শক্তি লইয়া নখের দ্বারা এই ভাবে কাঠ আঁচড়ানো সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। জানালার দিকে তাকাইতেই দেখিলাম সেই নারী—ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বেশ বিধবার, সাদা কাপড় আলো-আঁধারিতে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। মরিয়া হইয়া লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইলাম। আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই ঘোমটার নীচে অস্পষ্ট মুখ অপসৃত হইল। ক্রমে দেহের অন্য অংশও খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রাণের মায়া তখন ছাড়িয়া দিয়াছি। পাঁড়েকে জানালার দিকে আলো ধরিতে বলিয়া সর্ব্বশক্তিসহ একটি ঢিল ছুঁড়িলাম। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। একটি চলন্ত ঘোমটা। হাত নাই, পা নাই, মুখ নাই—সংক্ষেপে দেহের কোন অংশই নাই। কেবল একটি ঘোমটা, আমার দিকে লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। সাংঘাতিক দৃশ্য! যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া উঠিতেছিল। এই অল্প সময়ের ভিতরেই শ্বাসক্রিয়া হাঁপানির টানের মত মনে হইতে লাগিল। দম বন্ধ হইবার উপক্রম প্রায়। মনে হইল, দেহভার বহন করিতে পারিতেছি না। নড়িবারও সাহস নাই যে বসিব। কতকটা সিদ্ধির নেশার মত টলিতে লাগিলাম। চলন্ত ঘোমটার নির্দ্দিষ্ট গতি থামে নাই, অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। আলো পড়িতে পূর্ণাবয়ব

পাঁড়েকে আমার অতি নিকটে বসিতে বলিলাম। জীবন্ত মানুষের স্পর্শে অনেকটা বল পাইলাম।

দেখিবার অবকাশ পাইলাম। উহা ঘোমটা নয়, একটি সাদা খরগোশ—আমাদের মানুষ সন্দেহ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বুকের ভিতরটা তখন ঢিপঢিপ করিতেছে। সিদ্ধির নেশার প্রক্রিয়া থামে নাই। বসিলাম। খরগোশ দেখিয়া সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। পাঁড়েকে বলিলাম, চল, ভিতরে গিয়া দেখি কে কাঁদিতেছিল। সে কিছুতেই নড়িতে রাজি হইল না। অগত্যা কাছারির দিকে যাইব বলিয়া প্রস্তুত হইলাম। এমন সময় পান্থশালার ছাদের কার্নিসে দেখি, কে হামাগুড়ি দিয়া হাঁটিতেছে এবং মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে নাড়িতেছে। অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলেও কোন জীব এই ভাবে মাথা নাড়িতে পারে কি না সন্দেহ। জীবটির মাথা কতকটা মানুষের মত। কঙ্কালের মত সাদা—শুধু সাদা কেন বলি, নিরবচ্ছিন্ন কঙ্কালময় নরমুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেহের—চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সাদৃশ্য বেশি। ভয় অনেকটা সহনীয় হইয়া আসিতেছিল। এবার পাঁড়েকে বেশ জোর দিয়াই বলিলাম, আমার সঙ্গে এস, আলো আছে, ভয় কিসের? পল্টনের লোক, ভয় পাইয়াছ বলিতে লজ্জা করে না? পল্টনের অখ্যাতি স্বকর্ণে শুনা অপেক্ষা, সিপাহী মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয় মনে করিল। আমি আগে, পাঁড়ে পিছনে—চলিতে লাগিলাম।

ইটের পাঁজা, আগাছা এবং স্থানে স্থানে ভূমিকম্পের ফাটল যতটা সম্ভব সামলাইয়া চলিতে হইতেছিল। অস্থানে পা পড়িলে পা ভাঙিয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে।

চলিতেছি, হঠাৎ মৃত্যুর কঠোর ও নির্ভুল আহ্বান শুনিলাম সর্পের রোষমিশ্রিত গর্জ্জনে। কুলীন বিষধর দংশন করিয়াছে আমাদের কাহার ছায়াকে। বাঁচিয়া গিয়াছি, তথাপি নিজের অস্তিত্বকে

বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। দংশনানুভূতি কোন অঙ্গে নাই, একটু ভরসা পাইলাম। আলোর পরিধির সীমান্তে দেখিলাম, একটি গক্ষুরা ধীরে ধীরে গর্ত্তের ভিতর ঢুকিতেছে। গতি অতি মন্থর,—সবে খোলস ছাড়িবার মত। সরীসৃপের শ্রেষ্ঠ কুলপতি রাজগক্ষুরাকে অমর্য্যাদা প্রদর্শন করিবার সাহস ও শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না। মৃত্যুর করাল ও গতিশীল মূর্ত্তিকে সসম্মানে গম্যস্থলে যাইতে দিলাম। লাঙ্গুলের শেষ অংশ আর দেখিতে পাইতেছি না। পাঁড়েকে বলিলাম, চল, একে খোলস ছাড়িয়াছে, তাহার উপর দংশন করিয়াছে। এখন উহার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। পাঁড়ের মুখে ভাষা নাই। সে যন্ত্রচালিতের মত আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছে।

একটু অগ্রসর হইতেই বারান্দার নিকট আসিয়া পড়িলাম, নারীর চিহ্নমাত্র সেখানে নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘরের ভিতর ঢুকিবার সময় সজোরে কুলার মত বৃহৎ তালুর দ্বারা কেহ চপেটাঘাত করিয়াছিল। চকিতের ঘটনায় কেবল একটি বিরাট হস্ততালু লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই। অকারণ মাঠের মাঝে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া লাভ কি? কিন্তু নারী সম্বন্ধে কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছিলাম না। নারীর গঠনে মাদকতা ছিল। ভয় পাইলেও আর একবার তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলাম। খরগোশ যে নারী নয়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম, কারণ বক্ষের চক্রাকার কঠিন মাংসচূড়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশের সুরার তীব্র উত্তেজনায় মস্তিষ্ক এতটা টলিয়া উঠিত কি না সন্দেহ।

ঘরে ঢুকিলাম। প্রবেশপথে দ্বার ও আমাদের মাঝে যেটুকু ব্যবধান ছিল, তাহারই ফাঁকে অসংখ্য বাদুড় ও চামচিকা উড়িয়া

পলাইতে লাগিল। তবে কি চপেটাঘাত বাদুড়ের ডানার ঝাপটার? হইতেও পারে। কিন্তু নারী খরগোশ নয়—নারী কল্পনা নয়, নিতান্তই সে সত্য। যদিও বা সে প্রেতলোকেরই সত্য হয়, তথাপি তাহাকে আর একবার দেখিব। দেহ স্পর্শ করি নাই, সম্পূর্ণ আকৃতি দেখি নাই। কেবল গঠনের তীব্র লালসাপূর্ণ আকর্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার তাড়নায়—অস্পষ্ট আলোকে। অস্পষ্টতা যদি এই ভাবে মনকে মাতাল করিতে পারে, তাহা হইলে পূর্ণাবয়ব দেখিলে কি হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাতাল যখন হইয়াছি, তখন তাহার শেষ দেখিতে হইবে। মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। পাড়ে বয়সে ঘুন ধরাইয়াছে; সুতরাং সে কেমন করিয়া বুঝিবে, যৌবনোন্মত্ত হইলে যুবকের মনের অবস্থা কি হইতে পারে!

স্থপতির খিলান দেখিলে মনে হয়, ঘরটিতে পাশ্চাত্য প্রভাব রহিয়াছে। পরিধিতে ঘরটি নিতান্ত ছোট নয়। অধিকাংশ জানালা দরজা বন্ধ। কোথাও গাছের শিকড় কব্জার সহজ গতি বন্ধ করিয়াছে, কোথাও দীর্ঘকাল ধরিয়া মরিচা পড়িয়া লোহাকে জমাট করিয়া দিয়াছে। দেওয়ালে ওস্তাদ কারিগরের নিখুঁত পঙ্কের লেপন এখনও স্থানে স্থানে সুস্পষ্ট। যেখানে পঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে উইপোকা মানচিত্রের মত অসংখ্য রেখার দ্বারা সর্ব্বত্র কাটিয়া ফেলিয়াছে। লণ্ঠনের আলোয় যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে লক্ষ্য করিলাম, সিলিং কোন কালে সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। ছবিগুলি শ্যাওলা ও ছাদ-নির্ঝরিত বারিপতনে কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির ধ্বংসের লীলায় পুরাতন শিল্পীর কাজের উপরেও কত নব রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাবুক কেহ এখানে বসিলে, দেওয়ালে শ্যাওলা-অঙ্কিত

ছবির নকল করিয়া শিল্পী হিসাবে নাম কিনিতে পারিত। ছবি সম্বন্ধে বাল্যকালে সামান্য দুর্ব্বলতা ছিল, সেই কারণেই অপ্রত্যাশিত-ভাবে উহাদের নিকটে পাইয়া একবার চোখ না বুলাইয়া পারিলাম না। প্রথমেই আলো লইয়া ভাঙা জানালাটা পরীক্ষা করিলাম, নখরের আঁচড়ের চিহ্নমাত্র নাই। বন্ধ দ্বার খুলিবার সাহস পাইতেছিলাম না। কিন্তু ভিতরে কি আছে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। ঝকঝকে সাদা মার্ব্বেলের মেঝে দেখিয়া চমকিত হইলাম। যে অঞ্চলে মানুষ দিনের বেলা একলা চলিতে সাহস পায় না, সেইখানে নানা গল্পজড়িত ভগ্ন দেউলের ভিতর শ্বাপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া কে আসিল মেঝে পরিষ্কার করিতে! সন্দেহ গাঢ় হইয়া উঠিল। মেঝেতে পায়ের দাগ খুঁজিতে লাগিলাম। কোন জীবের পদচিহ্ন নাই, তবে সরীসৃপের গতায়াত যে আছে, তাহার প্রমাণ পাইলাম—দুই তিনটি খোলস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখিয়া। দেওয়ালের উত্তর কোণে মেঝের একটি পাথর স্থানচ্যুত হইয়াছে। ঠিক তাহারই নীচে একটি সন্দেহজনক গর্ত্ত এবং তাহার অতি নিকটে প্রায় সম্পূর্ণ একটি খোলস পড়িয়া আছে। মাথার অংশ পরীক্ষা করিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, একেবারে জাত সাপ। তবে কি এই গর্ত্তটাই উহার আবাস-ভূমি? একান্তই যদি অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হইবে না। ফিরিয়া পাড়েকে বাহির হইতে বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় তাহার গলায় অর্দ্ধজড়িত গোঙানির শব্দ শুনিলাম। মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, সে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। যাহা বলিতে চাহিতেছে, তাহা প্রকাশ হইতেছে না—কেহ যেন অদৃশ্যভাবে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। কোন প্রকারে সে হস্ত উত্তোলন করিয়া ঘরের বিপরীত দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার

চেষ্টা করিতেছে। স্থানটি লক্ষ্য করিতে মনে হইল, কার্নিসের হামাগুড়ি-দেওয়া জীবটি একটি ভগ্ন সিঁড়ির ধাপের উপর আসিয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িতেছে। আলো পড়িতে দেখিলাম, মাথাটি অস্থিময় নরমুণ্ড। সমস্ত রক্ত হিম হইয়া আসিতে লাগিল।

একইসঙ্গে দুইজন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। পাঁড়ে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে দেখিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিলাম। বুঝিলাম, সে জ্ঞান হারাইয়াছে। সে জড়পদার্থের মত বসিয়া পড়িল। বাধা দিলাম না। কম্বল তাহার পিঠে ঝুলিতেছিল, মেঝেতে পাতিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। ঘরের ভিতর সজ্ঞানে জীবিত মানুষ এখন আমি একা। নিজের অজ্ঞাতে সিঁড়ির ধাপের দিকে আবার দৃষ্টি অনুধাবিত হইল, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

আলোটা আরও জোর করিয়া পাঁড়ের কম্বলের কোণে একটু স্থান করিয়া তাহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরেই সে চক্ষু খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; অর্দ্ধনিমীলিত চোখে জল চাহিল।

তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিই কি প্রকারে? কাপড় ভিজাইয়া নদী হইতে জল আনিতে পারি, তবে গোক্ষুরা যে পথে ছোবল মারিয়াছিল, সেই দিক দিয়াই যাইতে হইবে, অন্য পথ তো জানা নাই! পাঁড়েকে অসহায় অবস্থায় ঘরে একলা ফেলিয়া যাইতে মন সায় দিতেছিল না। অথচ জল না পাইলে হয়তো আবার সে অজ্ঞান হইয়া যাইবে। সব দিক ভাবিয়া জল আনাই ঠিক করিলাম। আলো হাতে লইতেই পাঁড়ে নিতান্ত কাতর ইঙ্গিতের দ্বারা জানাইল, আমাকে একলা ফেলিয়া যাইও না। অগত্যা তাহার নিকট আবার বসিলাম। মাথায় হাত বুলাইতে সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। পাঁড়ে ঘুমাইয়া গিয়াছে।

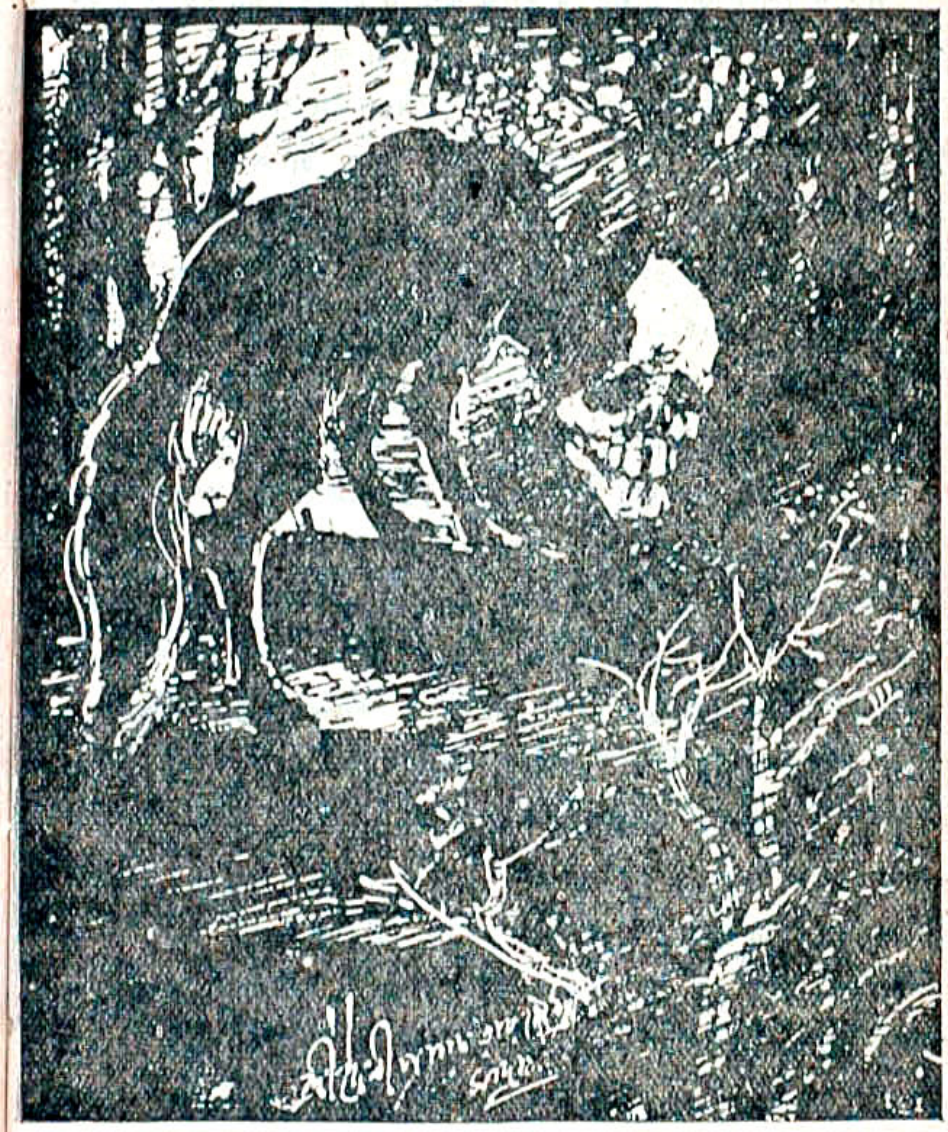

আলো পড়িতে দেখিলাম, মাথাটি অস্থিময় নরমুণ্ড। সমস্ত রক্ত হিম হইয়া আসিতে লাগিল।

অত্যন্ত শোকাতুর মানুষ যে ভাবে শ্মশানে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, সেই ভাবে আমি ভয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আসিতেছিলাম। বাঁচি বা মরি কিছুতেই আপত্তি নাই। পাঁড়ের লোহা-বাঁধানো লাঠিটা অতি নিকটে রাখিয়া সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। একনলা সরকারী ঠাসা বন্দুকটার কথা মনে পড়িল। থিয়েটার দেখিবার শখ ঘাড়ে না চাপিলে এত তাড়াহুড়া করিতাম না এবং বন্দুক সঙ্গে আনিতেও ভুল হইত না। তাহার পর ভাবিলাম, থিয়েটারের হুজুক না থাকিলে আমি নিজেই বা আসিতাম কেন? বরাবর বরকন্দাজ দিয়া খাজনা পাঠাইয়াছি, এবারও তাহাই করিতাম। কি কুক্ষণেই শহরের ছেলেরা গ্রামে আসিয়াছিল! যদি বা আসিল তো বনভোজন করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেই পারিত। শান্ত পল্লীজীবনে অযথা শহুরে আর্ট না দেখাইলে কি চলিত না! ভাবিলাম, আমার এলাকায় পাইলে কোন অছিলায় প্রহারের ব্যবস্থা করিব। তিন বৎসর ধরিয়া লাখ টাকা হস্তবুদের মহাল চালাইতেছি, গোটাকয়েক কলেজে-পড়া ছোকরাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিব না? এইটুকু ক্ষমতা যদি আমার নাই, তবে বাবুদের নায়েবগিরি করিতেছি কিসের জন্য? ছোট তরফের বড়বাবু সেদিন কলিকাতার বড় রাস্তায় কোন বিলাত-ফেরতা বাঙালী সাহেবের মোটর হুকুম দিয়া ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছিলেন। কি হইয়াছিল তাঁহার? কতকগুলা চায়ের পার্টির জরিমানা হইয়াছিল মাত্র। হাঃ, লেখাপড়া শিখিলেই বনিয়াদী জমিদারের মত হুকুম চালানো যায় কিনা! আর আমি সেই জমিদারের নায়েব হইয়া ঠিক করিলাম, প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শহুরেদের শিক্ষা দিব। হাঃ, জমিদারিতে কত কি কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। ও তো কয়টা শহুরে ছেলে মাত্র। কিন্তু ট্রামে উহাদের সাহস দেখিবার

সুযোগ পাইয়াছিলাম। এক হাতে বইয়ের গাদা, তথাপি ঝট করিয়া চশমা খুলিয়া সেই ফিরিঙ্গীটাকে একটা ন্যালাক্ষ্যাপা মড়ার মত ছোকরা কি চড়ানটাই চড়াইয়া দিল! হাঃ, শুধু হাতে ফিরিঙ্গী চড়ানো সোজা, আমাদের পোষাক-পরা পাগড়ি-আঁটা বরকন্দাজ মারা চলিবে না, হাঃ। মনে মনে জমিদারের নায়েব বলিয়া বেশ গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলাম। আত্মস্তুতিতে অন্যমনস্ক কতকটা হইয়াছিলাম। শ্মশানে শৃগাল প্রহর ডাকিল। রাত্রি গভীরতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ভুল নাই। শরীর ঝিমঝিম করিতেছিল। দেওয়ালে ঠেসান দিবার উপায় থাকিলে আরাম বোধ করিতাম। কিন্তু এত স্যাঁৎসেঁতে যে, ভরসা পাইলাম না। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় ঝিমাইতে লাগিলাম।

ঝিমানো অবস্থায় কতটা সময় কাটিয়াছিল স্মরণ নাই। ভয়, ক্লান্তি ইত্যাদির একত্র সমাবেশে সিদ্ধির নেশার মত লাগিতেছিল। নূতন উদ্যমে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলাম।

পায়ের তলায় মাটি থাকিলেও তাহা বিশ্বাস করিবার মত মনের অবস্থা নাই। মাথার উপর ছাদ তিরোহিত হইয়াছে। আমি অসীম ব্যোমের মাঝে বিচরণ করিতেছি। অথচ পৃথিবীর বাস্তবতাকে হারাই নাই।

মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থা লইয়া, কেন বলিতে পারি না, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কাঁটাঝোপ, সাপের গর্ত্ত অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। নেশা তাহার অপূর্ব্ব শক্তি দ্বারা আমাকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে।

মাঝে মাঝে মাথাটা, মনে হইতেছিল, ধড় হইতে খানিকটা উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িতেছে—হাত বাড়াইয়া তাহাকে আবার স্কন্ধের উপর যথাস্থানে বসাইয়া দিতেছি। মাথা বসিতেছে তো হাত দেহ হইতে

খুলিয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, ভগবান আমাদের গঠনে বোল্ট্ এবং নাট-এর ব্যবস্থা করিলে প্রতি অঙ্গের ফিটিংগুলি এত আলগা হইত না। চুলোয় যাক। ভগবান কি এইটুকু ভুল করিয়াই থামিয়াছেন? তাঁহার ভুলের বিরাট দৃষ্টান্ত তো আমি নিজে। আমি নায়েব না হইয়া যদি জমিদার হইয়া জন্মাইতাম! এতবড় ভুলের জন্য একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কে দায়ী হইতে পারে? ধর, আমি যদি জমিদার হইতাম, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম ঐ ম্যানেজারবাবুটিকে তাড়াইতাম। অল-ফাউণ্ড হাজার টাকা মাহিনা। কাজের মধ্যে তো কেবল পরের মেয়েদের দেখা, আর বড় বড় সরকারী অফিসারদের সহিত চা খাওয়া। আমি জমিদার হইলে দশ লাখ টাকা মুনাফার সম্পত্তি, সোজা কথায় দুই কোটি টাকা দুই বৎসরে উড়াইয়া দিতাম। পাতালপুরীতে রাজ্যস্থাপনা করিতাম, পৃথিবীর যত সুন্দরীকে একসঙ্গে জড় করিতাম। তাহাদের কেবল দেখিতাম। হয়তো একটু আদরও করিতাম। কেহ জানিতে পারিত না, আমার চরিত্র স্খলিত হইয়াছে। দিনের বেলা মাটির উপর গদিতে আসিয়া বসিতাম। সোনার ফরসিতে দিল্লীর এক শত টাকা ভরির তামাক খাইতাম। সন্ধ্যার প্রারম্ভে গোলাপের রু, চামেলির খস, ফরাসী শ্যাম্পেন সমস্ত আবেষ্টনীকে মশগুল করিয়া তুলিত। হাওয়ার মৃদু দোলায় হাজার-ডালি ভিনিসিয়ান ঝাড় ঠুনঠান করিয়া সঙ্গীতের মৃদু ধ্বনি তুলিত। এমনই একটি সময় আমার পদসেবা করিত পারস্য দেশের কন্যা সুন্দরী গৌরী। নিদ্রাবেশ আসিলে নিতান্ত কৃপার সহিত বলিতাম, ব্যস্ করো। গৌরী উন্নত বক্ষ আবৃত করিয়া চলিয়া যাইত, আমি পাশ ফিরিয়া শুইতাম।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ

আশুতোষ কলেজের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম.এ., পি. এইচ-ডি. লিখিত 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, প্রথম ভাগ' নামক একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি অধ্যয়ন করিলাম। ছোটখাট বই হইলে পড়িয়াই কাজ সারিতাম, কিন্তু এখানি যেমন তেমন বই নহে, তাই অগত্যা অধ্যয়ন করিতে হইল। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

> দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং বিজয়বাবুর 'The History of the Bengali Language' নামক পুস্তক পড়িতে পড়িতে দেখিতেছিলাম, তাঁহাদের পুস্তকে বিস্তর ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, এই সকল সমাধানের জন্য যে-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম, তাহারই ফল সাধারণের এবং সুধী সমাজের নিকট উপস্থিত করিলাম।

সুধী-সমাজ যে এ বই পড়েন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, সুধী-সমাজ এ পর্যন্ত এ বিষয়ে একটি কথাও বলেন নাই। তবে সুধী-সমাজের সম্বন্ধে বর্তমানে চিন্তা না করিলেও চলিবে। কিন্তু আমি সাধারণের দলভুক্ত, গ্রন্থকারের অনুসন্ধানের ফল সাধারণ্যে প্রচার করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। যে সকল সাধারণ লোক মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইবে।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ দিয়া লই। বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. ক্লাসের ক্লাসিকাল বেঙ্গলির পাঠ্য না করিলে এই বইখানি পড়িবার অবকাশ পাইতাম না। আর স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুরকেও কিছু ধন্যবাদ না দিলে ভাল দেখায় না। তিনি বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়াই পুত্র ত্রিলোচনের জন্ম হয় এবং ত্রিলোচন বি. এ. পড়ে বলিয়াই 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' কিনিতে হয়। তাও কি হইত?

ত্রিলোচন বটানি লইয়া তিনবার ফেল না করিলে তো এ বইয়ের নাম পর্যন্ত শুনিতাম না।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, কাহারও উপর আমার রাগ নাই। ছেলেটা ভুল পড়িতেছে শুনিয়া অর্থাৎ সে যাহা পড়িতেছে এবং আমি যাহা ঠিক বলিয়া জানি, সে দুইটা বস্তু এক নয় জানিয়া তাহার বইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। **বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ** শেষ করিয়া যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছি, তাহা আপনাদের জানাইয়া আবার বলেন তো **বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ** ধরিতে পারি।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তত্ত্ব জানিয়া রাখুন :—

বাংলায় সম্প্রদানে ও কর্মকারকে কে বিভক্তি হয়। তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

> ট্রাম্প সাহেব বলেন, বাঙ্গালা কর্ম্ম ও সম্প্রদানকারকের চিহ্ন 'কে' সংস্কৃত 'কৃতে' হইতে আসিয়াছে।...মোক্ষমূলরের মতে সংস্কৃত স্বার্থে 'ক' হইতে বাঙ্গালায় 'কে' আসিয়াছে। দীনেশবাবুও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।—পৃ. ২৬।

এই সম্পর্কে গ্রন্থকার দীনেশবাবুর অনেক ভুল দেখাইয়া (মোক্ষমূলরের ভুল নয়) পরিশেষে মন্তব্য করেন,—

> আমাদের মনে হয়, এই 'ক' বা 'কে' দ্রাবিড় ভাষার সম্প্রদানকারকের চিহ্ন হইতে আসিয়াছে।—পৃ. ২৯।

যে দুই ব্যক্তির ভ্রমপ্রমাদ সংশোধনের জন্য গ্রন্থকারের মাথায় এই পুস্তক চাপিয়াছে, তাঁহাদের অন্যতর হইতেছেন শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়। 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশে'র গ্রন্থকার যখন ঘুনসিমাত্র পরিধান করিয়া আপন মনে আঙুল চুষিতেছিলেন, তখন বিজয়বাবু কি করিতেছিলেন, সে কথাটা তাঁহারই ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল গ্রন্থের ভূমিকা হইতে তুলিয়া দিই,—

> It was in 1909 that I first gave a definite shape to the relusts of my study of the Bengal language...

উক্ত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ *History of the Bengali Language* গ্রন্থেরই দ্বিতীয় সংস্করণের ৭২ পৃষ্ঠায় এই কয়েকটি কথা ছাপার হরফে লেখা আছে,—

> When by about 1865 Bishop Caldwell suggested that the Tamil 'ku' as a dative denoting suffix was identical with Oriya 'ku' Bengali 'ke' and Hindi 'ko' denoting exactly the dative case a host of critics rose up to throw away the right suggestion of the Bishop."—Page 72, Lecture V, *History of the Bengali Language.*
>
> That it is the Dravidian 'ku' which has been adopted in source of the Aryan Vernaculars as the dative denoting suffix, receives further confirmation when we look to the use of it in Oriya,...—P. 78, Lecture V, *H. B. L.*

আবার ২৮৫ পৃষ্ঠায় আছে,—

> As so the Dravidian origin of the suffix কে to signify dative as well as accusative, my remarks in the 5th lecture should be referred to. The Dravidian কু remains unchanged in Oriya, and in old Bengali we get it both in the shape of কে and ক...

বাংলা সম্প্রদান ও কর্মকারকের 'কে' যে দ্রাবিড় 'কু'র সহিত সংপৃক্ত, তাহা বলিতে গিয়া বিজয়বাবু বিশপ কল্ডওয়েলের নাম করিতে লজ্জা পান নাই। কিন্তু 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশে'র গ্রন্থকার, বিজয়বাবুর নাম না হয় নাই করুন (যদিও তাঁহার বই পড়িয়াই ভদ্রলোক দ্রাবিড়ি ফলাইয়াছেন), কিন্তু কল্ডওয়েল সাহেবের নাম করিলেও কি তাঁহার মর্যাদা নষ্ট হইতে? দিব্য বলিয়া বসিলেন—"আমাদের মনে হয়"।

২৯ পৃষ্ঠায় "আমাদের মনে হয়" হইতে চার লাইনের মধ্যে আরও কয়েকটি নূতন গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

> উড়িয়াভাষায়ও 'কু'এর প্রয়োগ আছে। দ্রাবিড় 'কু' হইতে হিন্দীতে 'কো'... প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে...এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

দুই পৃষ্ঠা পরে আছে,—

অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন 'হন্তে', 'হন্তেঁ', 'হৈন্তেঁ', 'হয়িন্তেঁ', 'হইতে', 'হনে' প্রভৃতি প্রত্যয় প্রাকৃত 'হিংতো' হইতে আসিয়াছে।—ব. ব. ক্র., পৃ. ৩১।

বিজয়বাবুর গ্রন্থে দেখি,—

Thus it was that the ablative case-ending of বৃক্ষাৎ became রুক্-কতে বা রুখতে বা রুক্ হন্তে in old Prakrita: we get pure হঁতে in this book (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) as ablative case-ending, and this is what has become হতে in Bengali, it has no connection with the verb হইতে='to be'.—*H. B. L.*, p. 268

ক্রমবিকাশের গ্রন্থকার নিজের গবেষণা বলিয়া যাহা চালাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যে "বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ"-পূর্ণ বই হইতে না বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, দৃষ্টান্তরূপে তাহারই দুই চারিটি উল্লেখ করিলাম।

বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবের আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার যতগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সবই বিজয়বাবুর "বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ"-পূর্ণ পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। তাহা ছাড়া বিজয়বাবুর পুস্তকে আরও দুই তিন গুণ বেশি উদাহরণ আছে। কে কাহার বই হইতে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা কোনও পুস্তকেই লেখা নাই। 'ব. ব. ক্র.'-এর ১৫ হইতে ২০ পৃষ্ঠা এবং *H. B. L.*-এর ৬৬ হইতে ৯১ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখুন।

কিন্তু ইহারই মধ্যে কোন কোন স্থলে এমন মৌলিক গবেষণাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বিজয়বাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। দ্রাবিড় ভাষার সহিত বাংলা ভাষার উচ্চারণ-সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় অনেক স্থলে মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা বয় (=ভয়), দোপা (=ধোপা), বোন (=ভগিনী) ইত্যাদি।

গ্রন্থকার মহাশয় গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারি, বিদেশে অর্থাৎ শেয়ালদা স্টেশনে আসার সময় পর্যন্ত তাঁহার মনে রীতিমত আতঙ্ক ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার বয় বাঙাইল কে? আর এক কথা—"বোন" এই ব্যাপারে নিতান্ত অবলা, এ কথা ভ্রমসংশোধক গ্রন্থকারের জানা উচিত ছিল। ভগিনী শব্দ উচ্চারণ পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া (ভগিনী ভইণী বহিণী (metathesis) বইন (বোন এইরূপে) বোন হইয়াছে। তাঁহার উদাহরণগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য লেখা উচিত ছিল,—বগিনী (=ভগিনী)। তাঁহার পক্ষে ইহাতে দোষ হইত না।

বাংলা ভাষার "ধ্বনিতত্ত্বে" গ্রন্থকার এরূপ আরও অনেক গবেষণা করিয়াছেন,—

ক্ষ পরে আসিলে তাহার পূর্ববর্তী অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন—পক্ষ, বক্ষ, লক্ষ, কক্ষ, রক্ষা, লক্ষণ, লক্ষ্ম, লক্ষ্মণ, অক্ষর ইত্যাদি।

ভদ্রলোক লক্ষণ ও লক্ষ্মণ এই দুইটি শব্দ উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া 'মুদ্রাকর-প্রমাদ' বলিয়া পাশ কাটাইবারও পথ রাখেন নাই। 'ক্ষ'-এর সহিত ম-ফলা যোগ করিলে 'ক্ষ'-এর মধ্যস্থ 'ইঅ'-ধ্বনি লুপ্ত হইয়া যায় এ কথা কোন পুস্তকে লেখা নাই, আর থাকিলেও হয়তো তিনি পড়েন নাই। কাজেই গবেষণার "ইষণা" সত্ত্বেও "গব"ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি গবেষণা,—

জ্ঞ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী অ-কারের সংবৃত্ত উচ্চারণ হয়। যথা—যজ্ঞ,

অজ্ঞ...ইত্যাদি। জকার ও একারে সংযুক্ত হইলে 'জ্ঞ' হয়। এ-কারের উচ্চারণ একটু 'য'কার ঘেঁষা বলিয়া পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায়।

অর্থাৎ গ্রন্থকার বলিতে চান, 'যজ্ঞ' শব্দের উচ্চারণ যেমন "যোগ্‌গোঁ", 'অজ্ঞ' শব্দের উচ্চারণ তেমনই 'ওগ্‌গোঁ'। বি. এ.-পরীক্ষার্থী বাংলার ছাত্র যদি ওগ্‌গোঁ না বলিয়া অজ্ঞ বলে, তাহা হইলে নম্বর পাইবে কি?

আরও মজা আছে,—

ব-ফলাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ হয়। যথা—অন্বয়, অন্বেষণ, অন্বল, ধন্বন্তরী, অশ্ব ইত্যাদি। অন্তঃস্থ ব-কারের প্রকৃত উচ্চারণ 'উঅ'; সুতরাং পরে 'উ' আছে বলিয়া পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কার হইয়া থাকে। কিন্তু 'অন্বয়' শব্দের 'অ' সংবৃত নহে, কারণ এখানে অভাবার্থ প্রধান।

তাহা হইলে এই বুঝা গেল যে, 'অন্বয়' শব্দটি উল্লিখিত সূত্রের ব্যতিক্রম এবং 'অন্বয়, অন্বেষণ, অন্বল, অশ্ব' শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে—ওন্বয়, ওন্বেষণ, ওন্বল, ওঁশ্ব।

বাঙ্গালায় 'হ্ব' স্থানে 'ত্ত' উচ্চারিত হয়; যথা, 'জিহ্বা' স্থানে আমরা [কাহারা?] উচ্চারণ করি 'জিত্তা', 'আহ্বান' উচ্চারণ করিতে আমরা উচ্চারণ করি 'আত্তান'।

এই সূত্রের ব্যতিক্রম দেখাইতে গিয়া বলা হইয়াছে,—

বর্তমানে কলিকাতা অঞ্চলে 'জিহ্বা' ও 'আহ্বান' শব্দ যথাক্রমে 'জিউহা' ও 'আওহান' রূপে উচ্চারিত হয়।

বর্তমানে এইরূপ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বে কলিকাতার লোক 'জিত্তা' 'আত্তান' বলিত। যদি তাহাই হয় তো কত পূর্বে? বর্তমান বলিতে কয় বৎসর ধরিব? আর বর্তমানে শুধু এই দুইটি শব্দেই 'হ্ব'-এর ঐরূপ উচ্চারণ হয়, না সকল শব্দেই হইয়া থাকে? লেখকের কথার তো এই মানে হয় যে, এই দুইটি শব্দ ছাড়া সর্বত্রই 'হ্ব' 'ত্ত'-রূপে

উচ্চারিত হয়। লেখক যদি শুদ্ধমাত্র ত্রিপুরার ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে কোন হাঙ্গামা হইত না।

ভদ্রলোক বোদ অয় ধ্বোনিতোত্ত্ব ওন্বেষণ করিতে বিত্তল ওইয়া পড়িয়াছেন!*

গ্রন্থের নাম—বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, প্রথম ভাগ।

লেখকের নাম—আশুতোষ কলেজের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম-এ, পি-এইচ-ডি (ঢাকা)।

উৎসর্গ—যথাস্থানে।

ছাপা—ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা অপেক্ষা সুস্পষ্ট।

কাগজ—ঘেসো (ঘাসুয়া ঘাস+উআ)

দাম—আড়াই টাকা।

অঃ বিঃ আঃ

* শেষের ছত্রটি গ্রন্থকারের লেখা নয়; গ্রন্থকারের প্রদত্ত সূত্র অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গের 'বাযার' ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে সমালোচক কর্তৃক লিখিত। তিনি যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহার তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিয়াছেন, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"বনফুল"-প্রণীত
বিদ্যাসাগর
(নাটক)
আগামী সংখ্যা হইতে বাহির হইবে

রাবণ

লঙ্কার রাজপ্রাসাদের ছাত। রাবণ একাকী পায়চারি করিতেছেন। দূরে বানরদলের কোলাহল, রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি প্রভৃতি মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। সব কিছু ছাপাইয়া শোনা যাইতেছে কুম্ভকর্ণের নাসিকাধ্বনি।

রাবণ। রাত্রি গভীর। আকাশে হাসছে চাঁদ। কিন্তু লঙ্কার মুখে নেই হাসি—সে আজ অবরুদ্ধ। আর অবরুদ্ধ লঙ্কার রাজপ্রাসাদের ছাতে এই গভীর রাত্রে একা ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি—লঙ্কার রাজা রাবণ, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত। দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখছি দূরের দৃশ্য, আর দূরশোন কানে লাগিয়ে শুনছি দূরের শ্রাব্য। দেখছি, শুনছি আর শিউরে উঠছি—ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে। চারদিকে নর আর বানর, মাঝখানে অবরুদ্ধ লঙ্কা। ওঃ! লঙ্কা আজ অবরুদ্ধ। লঙ্কা আজ অবরুদ্ধ। যার ভয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র থরথর ক'রে কাঁপত, তার আজ এ কি গভীর অপমান! দুগ্ধপোষ্য শিশু রাম—সে এসে এমন রাম-লাথি মারতে পারবে, এ কথা কে আগে ভাবতে পেরেছিল!

লঙ্কার প্রদীপগুলো একে একে নিবে যাচ্ছে। বিরূপাক্ষ গেছে, বীরবাহু গেছে, আর ফিরবে না তারা। প্রাণটা থেকে থেকে কেঁদে উঠতে চায়, এই কঠোর বুকে প্রাণপণে কান্না চেপে রাখি। ঘরের ভেতরে কান্নাটা বেশি ক'রে চেপে আসে, তাই মন্দোদরীকে ঘুম পাড়িয়ে ছাতে এসে পড়েছি। কিন্তু ছাতে এসেও দূরে এ কি দেখছি! এ কি শুনছি!

হায়! কুম্ভকর্ণ যদি আজ জেগে থাকত! এখনও তার ছ মাস ঘুমের মেয়াদ শেষ হয় নি। ঐ ডাকছে তার নাক, সমস্ত

লঙ্কায় জাগছে তার প্রতিধ্বনি। ঘুমোও তুমি কুম্ভকর্ণ! ঘুমের এই তো চমৎকার সময়। কিছুতেই জেগো না। নর আর বানরে লঙ্কাকে ঘিরে ফেলে তার দফা সারবার চেষ্টায় আছে। এখন তুমি জেগো না। যখন সোনার লঙ্কা পেতলের লঙ্কা হয়ে যাবে, তখন, হে নিদ্রাবিশারদ, তখন তুমি জেগো।

না না, ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণকে শ্লেষ করবার কি অধিকার আমার আছে? ঘুমিয়ে সে যা করছে, আমি জেগে জেগে তার চাইতে বেশি কি করছি? নাক ডাকানোর চাইতে পায়চারি করা বড় হ'ল কিসে?

কিন্তু কি করব? আমার মাথার মগজে, আমার দেহের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলছে। লঙ্কা আজ অবরুদ্ধ। ওঃ! লঙ্কা আজ অবরুদ্ধ।

সারণ। মহারাজ!

রাবণ। কে, মন্দোদরী? তুমি ঘুম ছেড়ে উঠে এসেছ রাণী!

সারণ। আমি রাণী নই মহারাজ, আমি সারণ।

রাবণ। ওঃ! মন্ত্রী? আমি ভেবেছিলুম, মন্দোদরী বুঝি।

সারণ। মহারাজ! যে আপনার কখনও ভুল হ'ত না, সেই আপনার এমন ভুল! ওঃ! এও আমায় দেখতে হ'ল!

রাবণ। এ আর কি দেখছ মন্ত্রী? ভুলের চাষ সবেমাত্র সুরু। আরও কত ফসল ফলবে কে জানে!

সারণ। তা যদি সত্যি ফলে মহরাজ, তা হ'লে সে ফসল দেখার দুঃখ আমাকে এই বুড়ো বয়সে যেন আর না সইতে হয়—এই আশীর্ব্বাদ করুন।

একবার মন্ত্রণাকক্ষে চলুন মহারাজ। অন্যান্য মন্ত্রীরা সবাই

আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে গভীরভাবে মন্ত্রণা না করলে আর চলবে না।

রাবণ। হাঃ হাঃ হাঃ। মন্ত্রণা? মন্ত্রণায় আর কুলোবে না মন্ত্রী। এখন মন্ত্রণার চাইতেও বড় কিছু দরকার।

সারণ। এ কি কথা শুনি আজ আপনার মুখে মহারাজ!

রাবণ। তবে শোন মন্ত্রী। মন্দোদরী আজ ঘুমের ঘোরে কেঁদে কেঁদে উঠছিল। যে মন্দোদরী জেগেও কখনও কাঁদত না, সে যখন ঘুমিয়ে কাঁদতে সুরু করেছে, তখন আর সংশয় নেই মন্ত্রী। একটা নিদারুণ ব্যাপার ঘটবেই ঘটবে। (দূরে রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি) ঐ শুনছ সারণ?

সারণ। কি শুনব মহারাজ?

রাবণ। শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান। সে গান শুনে আকাশের বুক ফেটে যাচ্ছে, বাতাসের দম আটকে আসছে। শুনছ সারণ?

সারণ। শুনছি মহারাজ।

রাবণ। কিন্তু আমার রাজধানীতে আমার জয়গান শুনতে পাচ্ছ কি?

সারণ। না মহারাজ। যে গান গাওয়া হচ্ছে না, সে গান কি ক'রে শুনব? কিন্তু জয়গান যারা গাইবে, জয় যে তাদেরই হবে, এ কথার কোন মানে নেই মহারাজ।

রাবণ। কি কথার যে মানে আছে আর কি কথার যে মানে নেই, তা বুঝতে পারা অত সোজা নয়, সারণ। কত অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাচ্ছে আর কত সম্ভব হয়ে যাচ্ছে অসম্ভব। জলে যে শিলা ভাসিয়েছে, সে তো সোজা ইঞ্জিনীয়ার নয়। আরও কত অসম্ভবকে সে সম্ভব ক'রে তুলবে কে জানে। (সহসা আর্ত্তস্বরে) ওঃ! বিশ্বাসঘাতক! কাপুরুষ! শয়তান! (সারণকে চপেটাঘাত)

সারণ। (আর্ত্তনাদে) উঃ! চপেটাঘাত করলেন কেন মহারাজ? আমি বিশ্বাসঘাতক! আমি কাপুরুষ! আমি শয়তান!

রাবণ। না না, তুমি নও, তুমি নও সারণ।

সারণ। তবে কে মহারাজ?

রাবণ। বিভীষণ।

সারণ। কিন্তু চাঁটিটা তো মহারাজ, আমাকেই লাগালেন।

রাবণ। ভুল হয়ে গেছে সারণ, ভুল হয়ে গেছে।

সারণ। এমনই ক'রে আপনার সব ভুলের মাশুল কি আমিই যোগাব মহারাজ? উঃ! মাথাটা এখনও চনচন করছে।

রাবণ। দূরবীন চোখে দিয়ে বিভীষণকে একেবারে হাতের কাছে মনে হয়েছিল। লোভ সামলাতে না পেরে তাকে চড় লাগাতে গিয়ে সে চড় লাগল তোমার মাথায়। তুমি নিজেই একবার চেয়ে দেখ সারণ। তুমিও রাগ সামলাতে পারবে না। এই নাও দূরবীন, আর এই নাও দূরশোন যন্ত্র।

সারণ। দিন মহারাজ। কিন্তু দোহাই আপনার। আবার যেন কোন রকম ভুলটুল ক'রে বসবেন না। মাথাটা এখনও চনচন করছে।

দুইটি যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে ও শুনিতে লাগিল। দূরশোন যন্ত্রের সাহায্যে দূরে বিভীষণ ও হনুমানের কথোপকথন স্পষ্ট শোনা যাইবে।

বিভীষণ। দূর থেকে অবরুদ্ধ লঙ্কার দিকে চেয়ে থেকে থেকে প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে হনুমান। ঐ লঙ্কার ভেতরেই বিরহিণী সরমা আমার জন্যে কত না চোখের জল ফেলছে!

হনুমান। আহা-হা, বউদিদির জন্যে আমার পরাণটা কান্দে। ফেইলে চইলে আসলে ক্যান বিভুদাদা?

বিভীষণ। দাদার লাথি খেয়ে মাথার কি আর ঠিক ছিল হনু? বললুম

সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দিয়ে সব ল্যাঠা চুকিয়ে দিতে, আর উনি ক্যাঁৎ ক'রে মারলেন লাথি। আর কেউ হ'লে চিত হয়ে পড়ত, আমি ব'লেই সামলে নিলুম। তারপর বিষম রাগের মাথায় দাদাকে শাসিয়ে সাঁ ক'রে লঙ্কা থেকে বেড়িয়ে পড়লুম। আমার পেছনে সিংহদ্বার ঝপাং ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল। খেয়াল হ'ল তারপর। কিন্তু একবার বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন তো আর ফেরা চলবে না! লঙ্কার দফা না সেরে লঙ্কায় আর আমার ঢোকার উপায় নেই। মাথায় রাগ চ'ড়ে গেলে, বুঝলে হনুমান, ঐ রাগ ছাড়া আর কিছু খেয়াল থাকে না।

হনুমান। তা বলছ ঠিকই বিভুদাদা। আমিও তো একদিন রাগের মাথায় এক পাহাড়ের গায় মারলাম লাথি। পায়ে চোট এমনই লাগল রে দাদা। এখনও অমাবস্যায় অমাবস্যায় পায়ের গোড়ায় এমন কনকন কইরে ওঠে—আমি বইলে সই, অন্যে হইলে কেইন্দে ফ্যালত। কিন্তু লঙ্কার দফা রফা হইবে কবে, কও দেখি বিভীষণ-দাদা?

বিভীষণ। হবে ভাই, শিগগিরই হবে। নইলে আমার বিভীষণ নাম আমি পরিত্যাগ করব। লঙ্কার দফা সারা হোক—এই যে আমার একমাত্র কামনা, একমাত্র প্রার্থনা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। আমি যে প্রতি মুহূর্তে ধ্যান করছি—

ঠিক এই সময় সারণের হাত কাঁপিয়া উঠিয়া যন্ত্র দুইটি ছাতের উপর পড়িয়া ভাঙিয়া গেল সশব্দে

সারণ। উঃ! বিশ্বাসঘাতক!

রাবণ। এ কি করলে সারণ? দুটো যন্ত্রই হাত থেকে ফেলে চুরমার ক'রে দিলে?

সারণ। আপনি বলেছিলেন ঠিকই মহারাজ। দেখে শুনে কিছুতেই রাগ সামলাতে পারলুম না।

রাবণ। সামলাতে পারলে ভাল হ'ত সারণ। যন্ত্র দুটো বাঁচত। কিন্তু ওকি! দূর থেকে হাওয়ায় যেন কার মৃদু গান ভেসে আসছে! সারণ! সারণ!

গান

কাঁদি বন্দিনী সীতা।
হে পবন, তুমি বহিয়া নিও
আমার ব্যথার গীতা।
নিও মোর গান যেথা আছে মম
নয়নাভিরাম চির-প্রিয়তম
হায় কত আর রব আমি তার
দরশন-বঞ্চিতা—

সারণ। আহা! আঁধার অশোকবনে সীতাদেবী গাইছেন। কি করুণ মধুর কণ্ঠ!

রাবণ। ও গান থামিয়ে দিতে পার, সারণ? পার?

সারণ। না মহারাজ। বরং ছাতের একেবারে ওপাশে চলুন। ওখান থেকে গান শোনা যাবে না।

দুইজনে তাড়াতাড়ি ওপাশে চলিয়া গেল। ফলে গান আর শোনা গেল না।

রাবণ। শুধু যার জন্যে সোনার লঙ্কা আজ অবরুদ্ধ, তার গান কানে যেন হুলের মত ফুটছিল সারণ। কে জানত, সীতাকে হরণ ক'রে এনে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হবে? তাই তো তাকে রেখেছি অন্ধকার বনে, তাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে একদল চেড়ী। বাইরের আলো

সে বনে প্রবেশ করবার পথ পায় না ; আর তার ভেতরেও কোন আলোর ব্যবস্থা করি নি সারণ।

সারণ। ভাল করেছেন মহারাজ। সীতাদেবী অন্ধকারে কারুর চেহারা দেখতে পান না।

রাবণ। কুম্ভকর্ণের ঘুমের ছমাস এখনও পুরো হয় নি। কি করি বল তো সারণ? এখনও মাস দেড়েক বাকি।

সারণ। আমি তো বলি মহারাজ, সীতাদেবীকে ফেরত দেবার এখনও সময় আছে।

রাবণ। ক্ষেপে গেলে মন্ত্রী? শূর্পী ছুঁড়ীর তো নাক কাটা গেছে। এখন সীতাকে ফেরত দিলে আমার নাক কান দুইই কাটা যাবে না? এমন অপদার্থ মন্ত্রণা তুমি আমায় দিতে সাহস করলে সারণ?

সারণ। মহারাজ!

রাবণ। আমায় আর বিরক্ত ক'র না সারণ, একা থাকতে দাও। যাও।

সারণ। মহারাজ!

রাবণ। (উত্তেজিত) আমি তোমার আর কোনও কথা শুনতে চাই না। যাও। যাও। যাও।

সারণ। যে আজ্ঞা মহারাজ। নমস্কার।

প্রস্থান

রাবণ। আশ্চর্য্য! নিজের অবস্থার কথা ভেবে আমার নিজেরই মায়া হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। হাতীরও যে খাদে পড়া অসম্ভব নয়, এ আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। কুম্ভকর্ণ এখনও নাক ডাকাচ্ছে। আর বিভে'ছোকরা—

মন্দোদরী। মহারাজ!

রাবণ। জ্বালাতন ক'র না সারণ। ওঃ, মন্দোদরী।

মন্দোদরী। একি মহারাজ! আপনার আজ এ রকম ভুল কেন? আর আমাকে ঘুমন্ত রেখে চুপিচুপি শয্যাত্যাগ করে চ'লে এসেছেন কেন? পরামর্শ করতে করতে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জাগালেন না কেন?

রাবণ। এমনিতেই যে প্রলয় চলেছে মন্দোদরী, তার ওপর আবার স্ত্রীবুদ্ধি গ্রহণ করা নিরাপদ মনে হ'ল না। কিন্তু তুমি কেন শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে এলে? তোমার শরীর ভাল নয়। হিম লাগবে। ঘুমোওগে যাও।

মন্দোদরী। আপনাকে এ অবস্থায় রেখে কোন্ প্রাণে আমি ঘুমুতে যাব মহারাজ? কোন সাধ্বী স্ত্রী এ রকম পারে? চলুন মহারাজ, আপনিও আর হিম লাগাবেন না। যা ভাববার কাল ভাববেন। আজ রাত্রে ঘুমোবেন চলুন। মহারাজ! এখন ভুলে যান অতীত, ভুলে যান ভবিষ্যৎ, মনে রাখুন শুধু বর্ত্তমান আর মনে করুন ঘুমের চাইতে বড় বর্ত্তমান আর কিছুই নেই। শূন্যে মিলিয়ে যাক আর সব কিছু। থাক শুধু বর্ত্তমান আর ঘুম, ঘুম আর বর্ত্তমান।

রাবণ। তোমার এক ঠাকুরপো তো এ নীতি খুব ভাল ক'রেই মানছে রাণী।

মন্দোদরী। কুম্ভ ঠাকুরপোর কথা বলছেন মহারাজ?

রাবণ। হ্যাঁ। ঐ শোন তার নাকের ধ্বনি। আর তারই সঙ্গে ঐ শোন মন্দোদরী, শোন, (দূরে শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি) এখনও আমায় ঘুমুতে যেতে বল মন্দোদরী?

মন্দোদরী। তাই তো বলি মহারাজ।

রাবণ। মন্দ বল নি মন্দোদরী। বিরাট ঘুমের আগে ছোট ঘুমের রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া মন্দ নয়। হাঃ হাঃ হাঃ। কিন্তু শোন

মন্দোদরী। আমার মনের ভেতরে থেকে কে যেন অহরহ ব'লে দিচ্ছে, আমাকে যেতে হবে, যেতেই হবে। ভেবেছিলুম, ঐ ক্ষুদ্র নরশিশুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজেকে অপমানিত করব না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়তো যেতেই হবে।

মন্দোদরী। শেষের কথা এখনই ভাববেন না মহারাজ! চলুন।

রাবণ। হায়! মহাবীর কুম্ভকর্ণ যদি আরও মাস দেড়েক আগে ঘুমুতে সুরু করত! তা হ'লে এতদিনে তার ঘুমের মেয়াদ ফুরিয়ে যেত। কিন্তু এখন তাকে কাঁচা ঘুমে জাগানো চলবে না। কি দুর্ভাগ্য! আর শোন মন্দোদরী। বিভীষণ অমর হবে, রামচন্দ্র দিয়েছে তাকে বর।

একি! ভবিষ্যতের কালো যবনিকা আমার চোখের সামনে থেকে স'রে গেল। একি দেখছি! শুধু বিভীষণ নয়, কুম্ভকর্ণও অমর হয়েছে। চোখের সামনে দেখছি শত শত কুম্ভকর্ণ, শত শত বিভীষণ। যুগ হতে যুগান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে—কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ, নানা রূপে নানা ভাবে, কুম্ভকর্ণের নাসিকা-ধ্বনিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, বিভীষণের ক্রূর হাসিতে ততই হয়ে উঠছে বিষাক্ত। ওরে কুম্ভকর্ণ! জাগ, জাগ! তুই যত ঘুমুবি, বিভীষণ তত বেশি ক'রে জাগবে। জেগে ওঠ কুম্ভ, জেগে ওঠ।

মন্দোদরী। মহারাজ! মহারাজ!

রাবণ। মন্দোদরী! ওঃ! ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দেখলুম, তা তোমায় ব'লে বোঝাতে পারব না। আমার মাথা ঘুরছে, মগজের শিরায় শিরায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি আর ভাবতে পারছি না। ঐ শোন কুম্ভকর্ণের নাসিকাধ্বনি; আর দূরে ঐ শোন রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি। তা হোক, আজ আর কিছু ভাবব না। আজ শুধু ঘুমের রিহার্সাল দোব। ভুলে থাকব অতীত, ভুলে থাকব ভবিষ্যৎ। থাকবে শুধু ঘুম আর বর্ত্তমান, বর্ত্তমান আর ঘুম। চল মন্দোদরী।

মন্দোদরী। চলুন মহারাজ।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

বাংলা ভাষায় আদি সংবাদপত্র কোন্‌খানি, ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এক পক্ষের মতে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। অপর পক্ষ বলেন, এই সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য।

১৮৫২ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি লেখেন যে, শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক ১৮১৮ সনে প্রবর্ত্তিত 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র নহে,—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১২২২ কিম্বা ১২২৩ (ইং ১৮১৫-১৬) সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।* পাদরি লং ১৮৫০ সনে 'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন,† কিন্তু ১৮৫৫ সনে—সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি পাঠ করিয়া, তিনি পূর্ব্বমত বর্জ্জন করেন।‡ তদবধি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোন্ খানি—এই লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই এ-যাবৎ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি কতকগুলি প্রমাণের সন্ধান পাই; গৌণ প্রমাণ হইলেও এগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫-১৬ সনে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

* এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ৮ মে ১৮৫২ তারিখের *Englishman and Military Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† *The Calcutta Review* for 1850, p. 145.

‡ Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works.*

হয় নাই—হইয়াছিল ১৮১৮ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ; ইহাও মনে হয় যে, 'সমাচার দর্পণ' সম্ভবতঃ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ। কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, তাহা নিশ্চিত। প্রমাণগুলি পর পর উপস্থাপিত করিতেছি।

১১ জুন ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্রপাত হয়—১৮৫২ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তির অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্ব্বে। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট। চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।*
>
> ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় **কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।** চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক **ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল**

* 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৬ জুন ১৮৩১।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬ দ্রষ্টব্য।

> **সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া** তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।—'সমাচার দর্পণ,' ১১ জুন ১৮৩১।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় না, কাজেই আলোচ্য বিষয়ে আর কোন পত্র 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, সেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মন্তব্য সহ তাহা স্বীয় পত্রে পুনর্মুদ্রিত করিতেন।* সুতরাং ১৮৩১ সনে যতটা তথ্য জানা ছিল, তদবলম্বনে 'সমাচার দর্পণে'র দ্বিধাহীন উক্তি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল।

১৮৩১ সন হইতে ১৮২০ সনে পিছাইয়া যাওয়া যাক। ১৮২০ সনে

* 'বাঙ্গাল গেজেটি'র সপক্ষে যে আর কোন কিছু 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয় নাই তাহা মনে করিবার আর একটি কারণ, ভবানীচরণ এই ঘটনার তিন বৎসর পরে—১৮৩৪ সনে লিখিয়াছিলেন :—

> "সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র সর্জ্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ…।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮-২৯।

দেখা যাইতেছে, ভবানীচরণ দৃঢ়তার সহিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিতে পারেন নাই ; বলিয়াছেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে।

ত্রৈমাসিক 'ক্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয় :—

The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity ; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," pp. 134-35.

'ক্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র এই উক্তি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের দুই বৎসর পরে এবং বিলোপের এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, সুতরাং ইহার মূল্য সমধিক।

এইবার আমরা ১৪ মে ১৮১৮ ও ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি একেবারে সমসাময়িক সাক্ষ্য; এগুলি হইতে জানা যায়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে ও ৯ই জুলাই তারিখের মধ্যে কোন-না-কোন দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি বিজ্ঞাপনের প্রথমটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language ; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee Language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month. Extras included.

Calcutta, Chorebagaun Street, No. 145.

বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫ বা ১৮১৬ সনে প্রকাশিত হয় নাই,—হইয়াছিল ১৮১৮ সনে, অর্থাৎ যে-বৎসর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই সকল বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ কথার প্রমাণ 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র উদ্ধৃত অংশে দ্রষ্টব্য। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশকরূপে হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে হইতে ৯ই জুলাই ১৮১৮ তারিখের মধ্যে কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। ঠিক কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়, জানা না গেলেও, ১৮২০ সনে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ২৩ মে ১৮১৮ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। তখন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই জন পরিচালক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় জীবিত, কিন্তু তাঁহারা কেহ এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইহা ছাড়া, ১৮৩১ সনে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকও দৃঢ়তার সহিত অনুরূপ কথা বলেন; তাঁহার মতে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল 'সমাচার দর্পণে'র "কদাচ পূর্ব্বে নহে," "ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ

হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া" ইত্যাদি। এই কারণে 'সমাচার দর্পণ'কে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

* * *

এই প্রসঙ্গে একটি নূতন সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ১৮১৯ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

BENGALEE NEWSPAPER.

From the Oriental Star, May 16.—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents.—*The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' কলিকাতায় বাঙালী-প্রবর্ত্তিত একখানি বাংলা সংবাদপত্রের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সংবাদপত্র যে 'বাঙ্গাল গেজেটি,' তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী ২৩এ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত) 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been commenced." তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের মধ্যে কোন একটি দিনে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল

গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে"—এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই 'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে—এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোন গলতি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; "the publication··· has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই সকল কারণে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে 'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—এ-বিষয়ে চরম কথা বলা উচিত হইবে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই চরম—অর্থাৎ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল যত দিন সঠিক নির্দ্ধারিত না হইতেছে, তত দিন পরোক্ষ প্রমাণের বলে ইহাকে 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ মনে করা সঙ্গত নয়। সে পরোক্ষ প্রমাণগুলি যে পর্য্যাপ্ত নয়, বরঞ্চ 'সমাচার দর্পণে'র পক্ষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উক্তি যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, ব্রজেন্দ্রবাবু যুক্তি-প্রমাণসহযোগে তাহা দেখাইয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও আমরা যে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য দিতেছি, তাহার কারণ,

গত ফাল্গুনের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক মহাশয়ের একদেশদর্শী মন্তব্য। ঐ সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৬৫৪-৬৫৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে যে-কোনও পাঠকের ধারণা হইবে যে, 'ওরিয়েন্টাল ষ্টারে'র মন্তব্যটির দ্বারা 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রবাবুর সংশয় প্রভাতবাবু খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কারণ, যে-কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ঐ মন্তব্যের "publication of a Bengalee newspaper has been commenced" অর্থে "প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে" এইরূপই বুঝিবেন। আমরা এইরূপই বুঝিয়াছি। সম্পাদক মহাশয় পাঠকদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া, তাঁহাদের হাতে বিচারের দায়িত্ব না ছাড়িয়া দিয়া, অন্যায় ভাবে প্রভাতবাবুর দিকে তাঁহার "মনের মগ্নচৈতন্যের স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব" প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। রামানন্দবাবুকে স্মরণ করিতে বলি যে, তাঁহারই সম্পাদিত 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় (ফাল্গুন ১৩৩৬ ও বৈশাখ ১৩৩৮) ব্রজেন্দ্রবাবুই 'বাঙ্গাল গেজেটি'র "প্রথমত্ব" প্রচার করেন, পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উক্তি আবিষ্কার করিয়া সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় জন্মে। এই সংশয় নিরসন করিবার পক্ষে কোনও উপকরণ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রামানন্দবাবু ইংরেজীনবিশ, 'ওরিয়েন্টাল ষ্টারে'র উক্তিটি আর একবার ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝিবেন, উক্ত মন্তব্য করিবার কালে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত মন্তব্যের "observe" (এই সংখ্যার পৃ. ৭৮৫ দ্রষ্টব্য) অর্থে যে "পর্য্যবেক্ষণ" নহে, তাহা নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার-পড়া যে-কোনও উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিতে পারিত। কায়স্থ পাঠশালার ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল বিশেষ ধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন না হইলে এরূপ interpretation ছাপিতে লজ্জিত হইতেন।

দুঃখের বিষয়, শুধু ইংরেজীই নয়, "মগ্নচৈতন্যে"র চাপে প্রবীণ সাংবাদিক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভাষাও বিস্মৃত হইয়াছেন, দেখিতেছি। নতুবা 'সমাচার দর্পণে'র "আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট-নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে" (এই সংখ্যার পৃ. ৭৮০ দ্রষ্টব্য)—এই উক্তিটির সম্বন্ধে তিনি কখনই মন্তব্য করিতেন না যে, স্বয়ং মার্শম্যান "তাঁহার উক্তিটিকে 'অনুমান' বলিয়াছেন।" "অনুমান" যে "দুই সপ্তাহ পরে"র সঙ্গে যুক্ত, "কদাচ পূর্ব্বে নহে"র প্রতি লক্ষ্য করিলেই রামানন্দবাবু তাহা বুঝিতে পারিতেন। তবে তিনি যদি জাগিয়া ঘুমান, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা! রামানন্দবাবু যদি একটু ক্লেশস্বীকার করিয়া উক্ত 'সমাচার দর্পণ' স্বয়ং দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তাহা ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত এবং উক্ত মন্তব্যের ইংরেজী অনুবাদ স্বয়ং মার্শম্যান এইরূপ করিয়াছেন—"The Bengal Gazette was published (we believe) a fortnight *after* the first number of our paper had appeared, certainly not *before* the publication of the Durpun." স. শ. চি.

তাৎক্ষণিক

(বীজ-রূপ)

সংবাদ-ক্লান্ত মানস-লোকে
বৃহদারণ্যকীয় যাজ্ঞবল্ক্যোদয়,
চাটনি।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—
আ-টেরিয়র শুন।
উত্থান
(ঈজি-চেয়ার থেকে)।
ডোরা-ছিটের ফতুয়া-ঢাকা পিঠ,
নেপথ্যে জীর্ণ ক্যাম্বিস জুতো।
কানের পাশ দিয়ে
তোবড়ানো-বালতির কানা-দর্শন।
সে……
পিড়িং
চড়ুই পাখী।
ফরফর
রঙিন কাগজ।
…ঘুড়ি, ছেলেবেলা, অমূল্য পণ্ডিত,
অমূল্য উকিল, বত্রিশ টাকা, অচল টাকা,
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শসা, শিম।
জ্যাঠামশায়, বহুমূত্র, ডাক্তারের ফী।
ট্রিং ট্রিং…সাইকেল,
হুড়মুড়…গরুর গাড়ি,
এক জোড়া ছুটন্ত ছোকরা ষাঁড়—
হেতু পা,
নহাঁ নহাঁ নহাঁ।
ড্রেন-ঘেঁষা দিলদার মিঞা—
বয়েত, আতর, ফাহা।
দুঃসময়,
গ্রীবা-চালনা।
(যাজ্ঞবল্ক্যীয় ঘাই !)
প্রায়-নগ্ন নারী—
ছবি, বিজ্ঞাপন, বাঁধানো, টাঙানো।
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার—
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুবলেন)
পাশের বাড়ি।
দুটি ছবি—
তন্বী, তম্বুরী—
বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে।
ছড় ছড় ছড় ছড়—বাচো ধাক্কা—
একার সারি—
উকিল, মোক্তার, মক্কেল,

শিক্ষক, ছাত্র, কেরানী……
দৃষ্টি পরিবর্ত্তন—
কুশনের ময়লা ওয়াড়,
ধোপা, সোমবার, ক্লাব,
এইচ. জি. ওয়েল্‌স—
নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞান।
খুট্—
পিওন,
দাড়ি-নেই নিরীহ-গোছের মুসলমান।
চক্ষু-চড়কগাছকারী চিঠি।
সদলবলে জনার্দ্দন।
গৃহিণী,
রাঁধুনি,
(যাজ্ঞবল্ক্যের পুনরুক্তি)
আদেশ।
উৎপাটিত-গাত্র ভৃত্য,
রোদের ফালি,
ক্যাম্বিসের জুতো শুকানো।
অভিনেত্রী—
সবুজ ঘর,
আভ্যন্তরিক অপ্রস্তুতি,
ছি—ছি—।
কর্ণকণ্ডুতি—সহসা
আঙ্গিক আকুতি।
কনিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস,
আপেক্ষিক পরিধি-সঙ্কট।
কাঠি চাই……।
পাঁচ মিনিট।
শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু,
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন,
তাৎক্ষণিক।

(বৃক্ষ-রূপ)

বৃক্ষ-রূপ, মানে ব্যাখ্যা-রূপ—
অসংস্কৃত অনাধুনিক প্রাকৃত
পাঠক-সম্প্রদায়ের জন্য।
বিদগ্ধ-সমাজে
বীজরূপই যথেষ্ট রসোদ্বেলক।
সংক্ষিপ্ত অক্ষর-বাহিত ভাব-বীজ
উপ্ত হয় মস্তিষ্ক-টবে
দৃষ্টির মারফৎ।
সার যদি থাকে,
যদি থাকে হৃদয়-তাপ,
সময়-মাফিক স্বতঃই
অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়
সিজ্‌ন-ফুলদল।
বৃক্ষ-ব্যাখ্যা তাদের জন্য,

যারা অমাবস্যার অন্ধকারে
পূর্ণিমা-চাঁদ-রুটি
রস-ঝোলে ডুবিয়ে খেতে পারে না
কায়দা ক'রে।
ইতি ভূমিকা।

ফরফর ক'রে উড়ছিল
খবরের কাগজের পাতাগুলো ;
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর যুদ্ধ—
চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে ক'রে
মানসিক রসনা হতস্বাদ,
দন্ত ক্লান্ত।
ঔপনিষদিক চাটনি চাটলে
যদি কোন ফল হয় এই ভেবে
ঈজি-চেয়ারে শুয়ে
বৃহদারণ্যকের গুরু-গম্ভীর আবহাওয়ায়
তা দিচ্ছিলাম যাজ্ঞবল্ক্য-ডিম্বে।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—গরররর
ডেকে উঠল ট্যাস টেরিয়ার কুকুরটা।
উঠলাম,
উঠতেই চোখে পড়ল চাকরের পিঠ
ডোরা ছিটের ফতুয়া-ঢাকা।
মানস-নয়নে দেখতে পেলাম,
নেপথ্য-বিহারী ক্যাম্বিসের
জুতো-জোড়াকে
খড়ি মাখানো হচ্ছে।
চাকরের কানের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে
তোবড়ানো বালতির কানাটা।
মনে পড়ল তাকে
যার জন্যে কানাটা তুবড়েছিল একদিন,
সে……
সে ভেসে গেল
নবাগত তরঙ্গ-তাণ্ডবে।
নাচতে নাচতে ছুটে এল
পিড়িং ক'রে চড়ুই পাখী,
ফরর করে রঙিন কাগজের টুকরো—
মনে পড়ল ঘুড়ি,
মনে পড়ল ছেলেবেলা,
মনে পড়ল অমূল্য পণ্ডিত ;
তারপর অমূল্য রায় উকিল—
বত্রিশ টাকা দিতে হবে তাকে।
টাকা—
একটা টাকা চলে নি আজ বাজারে।
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শসা, শিম।
এসব ছাড়া জ্যাঠামশায়
আর কিছু খান না—
বহুমূত্র,
ডাক্তার আসে,
ফী চায়।
ট্রিং ট্রিং ট্রিং
(দৃশ্য বদলাল,

সচেতন মনের পালা এইবার)
সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে গেল সাইকেল।
তারপরই
দুদ্দাড় হুড়মুড় ক'রে একটা গরুর গাড়ি,
এক জোড়া যুবক বলীবর্দ্দ উন্মাদ হয়ে
ছুটে চলেছে।
না ছুটে উপায় নেই—
অভিজ্ঞ গাড়োয়ান
পুচ্ছের পাশ দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে
থরথরে পা
নিরুপায় নাভি-নিয়ে,
জিহ্বা তালু এবং নাসা সহযোগে
অমানুষিক শব্দ করছে
নহাঁ নহাঁ নহাঁ।
ড্রেনের ধার ঘেঁষে
ত্রস্ত হয়ে স'রে দাঁড়াল
দিলদার মিঞা,
মখমলী গোল টুপি,
কালো পারসী কোট,
কেয়ারি-করা পাকা দাড়ি,
আতর ফেরি করে।
চোখোচোখি হ'লেই
আদাব ক'রে
হাসিমুখে এগিয়ে আসবে এক্ষুনি,
ফাহা ক'রে আতরের নমুনা দেবে,
আওড়াবে ফারসী বয়েত
এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো
কিনিয়ে ছাড়বে কিছু।
দুঃসময় যাচ্ছে,
ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলুম।
চোখে প'ড়ে গেল
(অবচেতন মনে যাজ্ঞবল্ক্য ঘাই মারছে)
চোখে প'ড়ে গেল
অনাবৃত-দেহা
কুব্জ-ভঙ্গিনী মেয়েটিকে,
মানে মেয়ের ছবিটিকে—
বিজ্ঞাপন এসেছিল,
বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছি।
(মরিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ফুটি ফুটি করছেন)
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার—
পাশের বাড়ির কর্ত্রী।
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুব মারলেন)
অবচেতন মানস-পাথারের অতল থেকে
আবির্ভূতা হলেন সচেতন রঙ্গমঞ্চে
খড়কে-ডুরে-পরা
মৃদুহাসিনী
তন্বী একটি,
এবং তার পাশেই গহনা-গ্রস্তা
জমকালো বেনারসী-পরা
বীভৎস-কান্তি
গলদঘর্ম্মা
আর একজন।
একই ব্যক্তি—
প্রাগ্‌বিবাহ, বিবাহোত্তর।
ছড় ছড় ছড় ছড়
বাচো ধাক্কা বাচো ধাক্কা—
উকিল মোক্তার মক্কেল
শিক্ষক ছাত্র কেরানী
সুস্থ অসুস্থ
রসিক বেরসিক
সকলকে বহন ক'রে ছুটে চলেছে

একার সারি।
কেমন যেন শিরশিরিয়ে উঠল
পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত,
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।
নিতেই
চোখে পড়ল কুশনের ওয়াড়,
ময়লা হয়েছে,
ধোপা সোমবার—
সোমবারে ক্লাবে বই ফেরত দিতে হবে
এইচ. জি. ওয়েল্‌স—
নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞান……।
খুট—
পিওন ঢুকল।
লোকটা মুসলমান,
কিন্তু ঠিক যেন হিন্দু—
দাড়ি নেই,
নিরীহ চেহারা।
চিঠি দিয়ে গেল,
চিঠি প'ড়ে চক্ষু চড়কগাছ—
সদলবলে জনার্দ্দন আসছে পরশু,
এক সপ্তাহ থাকবে।
ফুটে উঠল মানসপটে
ক্রোধ-কুম্ভ হাস্যমুখ গৃহিণী-আলেখ্য,
পলাতক মৈথিল রাঁধুনিটাও—
আবছাভাবে।
(যাজ্ঞবল্ক্য আবার উঁকি দিচ্ছেন)
চাকরকে আদেশ করলাম,
ওরে, বামুন দেখ একটা এখুনি—
গাত্রোত্থান করলে বেচারী,
খড়ি-মাখানো ভিজে ক্যাম্বিসের
জুতা-জোড়াকে
রোদের ফালিটুকুতে শুকুতে দিয়ে
চ'লে গেল।
জুতো-জোড়ার পানে চেয়ে
অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ল
অভিনেত্রীদের—
গ্রীনরুমে।
না না, ছি ছি—
আলজ্জিত হলাম মনে মনে।
হঠাৎ সুড়সুড়িয়ে উঠল কানের ভেতরটা,
ঢোকাতে চেষ্টা করলাম কড়ে আঙুল
কানের গর্ত্তে।
গর্ত্ত ছোট,
আঙুল মোটা,
আকুল চিত্তে উঠলাম
কাঠির সন্ধানে।

শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর ব্যাখ্যা অনুসারে
লিখলাম এই কবিতা।
বলেছিলেন তিনি,
আমাদের সচেতন ও অবচেতন মনে
প্রতি মুহূর্ত্তে যে ছাপ এঁকে যায়
তার অকুণ্ঠিত যথাযথ প্রকাশই
আধুনিক কাব্যের লক্ষণ,
সাজিয়ে গুছিয়ে বলাটা সেকেলে কাণ্ড।
পাঁচ মিনিটের ছাপ আঁকলাম
এই কবিতায়।
এর নামকরণ করেছেন
শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন
তাৎক্ষণিক।

"বনফুল"

পান

ভজহরি বেকার।

ভজহরি বিনামূল্যে শব বহিয়াছে, ধাঙড়-স্ট্রাইকের সময়ে রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে, ইলেক্‌শনের সময়ে একটি সিকি এবং একখানি কাট্‌লেটের বিনিময়ে লরির উপরে মেগাফোন-হাতে ভোট ফর — করিয়াছে, বেকার-সমিতির সম্পাদকত্ব করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই বেকারত্ব ঘোচে নাই। মেস হইতে মেসান্তরে, হোটেল হইতে হোটেলান্তরে ঘুরিয়াছে, ফ্রেণ্ডস চার্জ বাকি পড়িয়াছে, জামার বোতাম পড়িয়া গিয়াছে, দাড়ি গোঁফ বড় হইয়াছে, জুতায় পট্টি লাগিয়াছে, তবু বেকারত্ব ঘোচে নাই।

মেছুয়াবাজারের একটি মেসে ভজহরি আপাতত থাকে। সারাদিন টো টো—রাত্রে একটু ঘুম। নেশার মধ্যে পান। সত্যই, ভজহরি ভীষণ পান খায়। অর্থাৎ, একটা পান না খাইলে ভজহরির ঘুম আসে না।

মেসের পান সব দিন ভাগ্যে জোটে না। কোন দিন থাকেই না, কোন দিন ফুরাইয়া যায়। ভজহরি তাই খাওয়া-দাওয়ার পর একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া রাস্তার মোড়ে যায়। সামনে যে দোকান পায়, সেখান হইতেই এক খিলি পান কিনিয়া খায়।

সেদিন রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। ভজহরি মোড়ের একটি দোকানের পাশে গিয়া বলিল, এক পয়সার পান দাও তো—মিঠে পান।

পানওয়ালা কথা বলে না। সে আপন মনে সামনে সাজানো চেরা এবং আধ-চেরা পানের উপরে খয়েরের গোলা মাখাইতে লাগিল।

ভজহরি বলিল, এক পয়সার পান দাও।

কোন জবাব নাই। পানওয়ালা নির্ব্বিকার চিত্তে পান সাজিতে লাগিল।

ভজহরি পুনরায় বলিল, এক পয়সার পান দাও না হে!

বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

সে আবার কি? আমার নাম তো ভজহরি সরখেল। আমার নামে তোমার কি দরকার? পান এক পয়সার দেবে তো দাও।

তোমার নামের জন্য তো আমার ঘুমই হচ্ছে না। বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

তোমার হেঁয়ালি রাখ। আর একদিন অবসরমত শুনব। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। দাও, এক পয়সার মিঠে পান দাও তো দেখি।

বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

ভাল বিপদ তো! আমি বাপু, তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

নাঃ, কিছু বুঝতে পারছেন না! ন্যাকা!

ভজহরি বড়ই মুশকিলে পড়িল। এদিকে সারাদিনের ব্যর্থ পরিশ্রমের পর ঘুমে চোখ বুজিয়া আসিতেছে, ওদিকে সামনে সাজানো ছাঁচি, বাংলা, মিঠা, মাদ্রাজী, সাজা আর আধ-সাজা পানের রূপে, গন্ধে, রসে, জিভ লালায়িত হইয়া বার বার তালু স্পর্শ করিতেছে। ভজহরি চিন্তায় পড়িল—ব্যাপার কি? নিমাই চাটুজ্জে, নিতাই মুখুজ্জে? কোন দিন নামও তো শুনি নি! অথচ—ভগবান, কেন বেকার করলে? বেকারই যদি করলে, তবে বাঙালী করলে কেন? বাঙালীই যদি করলে, তবে একটু বুদ্ধি দিলে না কেন? আমি কি দুরভিসন্ধি নিয়ে পান কিনতে এসে ন্যাকা সেজে রয়েছি, তা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত

পানওয়ালা জেনে বুঝে ফেললে, অথচ আমি নিজেই জানতে পারলুম না! এই বুদ্ধিটুকু নেই ব'লেই বোধ হয় বেকার হয়ে রয়েছি।

ভজহরি নিতান্ত বোকার মতই কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, দোকানদার অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। দোকানদারের সহিত আর কথা বলিবার প্রবৃত্তি ভজহরির ছিল না। কিন্তু পান তো চাই। শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য ভজহরি আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, নেহাৎই পান দেবে না তা হ'লে? দোকানী কোন কথাই বলিল না। ভজহরি অগত্যা পথে পা বাড়াইল।

ফুটপাথের অপর পারে, গ্যাসের আলোর নীচে কয়েকজন বসিয়া তাস খেলিতেছিল। তাহাদের আকৃতিও প্রায় ভজহরি-জাতীয়। তাসগুলি ময়লা হইয়া এবং পাশগুলি ছিঁড়িয়া যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দুই এক বার খেলিবার পর পিছন দিক হইতেই তাসগুলি চেনা যায়। ভজহরির পান-সমস্যা ইহারাও লক্ষ্য করিয়াছিল। যখন ভজহরি পানের দোকান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, কি-হয়েছে হে?

ভজহরি বলিল, এক পয়সার পান চাইলুম, তা বলে—নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে! এসব হেঁয়ালি তো আমি বুঝতে পারলুম না।

ও, এই কথা। এদিকে এস, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ পাড়ায় দুটো দল আছে। একটা হচ্ছে, নিমাই চাটুজ্জের দল, আর একটা নিতাই মুখুজ্জের দল। এক দলের লোক অন্য দলের লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।

কিন্তু, মাত্র এক পয়সার পান—

এক পয়সাই হোক, আর এক লাখ টাকাই হোক, প্রিন্সিপল্ ইজ প্রিন্সিপল্।

কিন্তু এটা তো একটা পানের দোকান।

দোকানই হোক আর যাই হোক, প্রিন্সিপ্‌ল ইজ প্রিন্সিপ্‌ল।

কিন্তু আমি তো কোন দলে নই।

থাকতেই হবে। ঐ যে ঐ ল্যাম্পপোস্টের পাশে একটা পানের দোকান, ওটা অন্য দলের।

ওখান থেকে তো একদিন পান কিনেছি।

অতএব প্রমাণ হয়ে গেছে, তুমি ঐ দলের।

প্রমাণ হয়ে গেল?

হ্যাঁ, প্রমাণ হয়ে গেল। প্রমাণ যদি নাও হয়, তা হ'লে ধ'রে নেওয়া গেল, অনুমান ক'রে নেওয়া গেল, কল্পনা ক'রে নেওয়া গেল, মানে ঐ একই কথা।

কিন্তু আমি যদি কোন দলে না থাকতে চাই?

থাকতেই হবে। পৃথিবী যেমন জল ও স্থলে বিভক্ত, তেমনই এ পাড়াটা নিতাই চাটুজ্জে আর নিমাই মুখুজ্জেতে বিভক্ত। একটাতে থাকতেই হবে। পড় নি ছেলেবেলায়, Man is a gregarious animal? মানুষ কেন, পৃথিবীর সব জীবেরই দল আছে। বাঘের দল, ভালুকের দল, শেয়ালের দল—

বুঝেছি। তবে এই সব দল বাঁধার মধ্যে সামান্য একটু প্রভেদ আছে। কারও কারও দল বাঁধার পেছনে থাকে একটা instinct of self-preservation, আর কারও কারও দল বাঁধার পেছনে থাকে একটা instinct of suicide। যাকগে। তা হ'লে এ পানওয়ালা?

নিমাই চাটুজ্জে।

ভজহরি পুনরায় রাস্তা পার হইয়া নিমাই চাটুজ্জের দলে নাম লিখাইয়া এক পয়সার মিঠা পান কিনিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মেসে ফিরিল। ঐ পারের তাসের আসরে হরতনের গোলাম তুরুপ হইল।

"ভাস্কর"

রামমোহনই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি স্রষ্টা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্য উচ্চ উপাধি-পরীক্ষার বিষয় হওয়ায়, এক্ষণে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জন্য নূতন করিয়া সেই ইতিহাস প্রণয়নের আবশ্যকতা হইয়াছে; কিন্তু এখনও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বা গৌরব রক্ষার জন্য সেই ইতিহাসকে বিকৃত করিবার চেষ্টার অন্ত নাই। বাংলা সাহিত্যের বিচার ও তাহার পরিচয়ার্থে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দুরূহ ব্রতে যাঁহারা ব্রতী আছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাকুক—যাহারা এ কার্য্যের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, এবং সাহিত্য কাহাকে বলে সে জ্ঞানও যাহাদের নাই—তাহারাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে, বাংলা সাহিত্যের বেওয়ারিশ অবস্থার সুযোগ লইয়া, যাহা ইচ্ছা লিখিয়া সাময়িক-পত্রিকার অনভিজ্ঞ পাঠকগণের অজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতেছে!

এই অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছে এমন সকল ব্যক্তি, যাহারা কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, কারণ, তাহাদের সেই সম্প্রদায়ের পুরুষবিশেষকে মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখাই তাহাদের আসল অভিপ্রায়; সেজন্য তাহারা প্রাণপণে তুচ্ছ ও সামান্যকে মুখ্য করিয়া, এবং অতিশয় দুর্ব্বল যুক্তি ও ততোধিক দুর্ব্বল প্রমাণ প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া, দীপ্ত সূর্য্যের চারি পাশে কুহেলিকার জাল রচনা করিতেছে।

রামমোহন নব্য বাংলা তথা ভারতের জন্মদাতা, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে, এবং শুধু ধর্ম্মে সমাজে শিক্ষায় রাষ্ট্রনীতিতে নয়—বাংলা সাহিত্যেও তিনি নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি স্রষ্টা, এ কথা প্রমাণ করিতে না পারিলে এক দল মনুষ্যের সোয়াস্তি হইতেছে না। বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্ম না হইলেও, সেকালের হিন্দুসমাজের

উপরে একটা বড় আঘাত দিয়াছিলেন—তিনি বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন; এই একটি মাত্র কারণেই তিনিও মহাপুরুষ, এবং সেই মহাপুরুষত্বের মূলে রামমোহনী প্রেরণাই ছিল বলিয়া, তাঁহাকে বাংলা-গদ্যের—জনকত্ব না হইলেও—ধাত্রীত্ব-গৌরব দেওয়া যাইতে পারে। আর বঙ্কিমচন্দ্র? তাঁহার সম্বন্ধে গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে ঘোষ-পণ্ডিত মনোমোহন যে মুরুব্বিয়ানা করিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব। বাংলা দেশে বাঁশঝাড় এখনও আছে, কঞ্চিও দুষ্প্রাপ্য হয় নাই—কেবল পাঠশালার সেই গুরুমহাশয়ের অভাব হইয়াছে; সে যে কত বড় অভাব, তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

* * *

রামমোহন সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক যত কিম্বদন্তী বহুদিন হইতে প্রচার আছে—আজিও তাহা ঠিক তেমনই আছে; ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ যতই উদ্ধার হইয়া থাকুক—তাহা পৌত্তলিকভাবাপন্ন; অতএব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাঁহারা ভগবানের ধ্যান করেন, তাঁহাদের চক্ষু সেদিকেও সমান মুদ্রিত হইয়া আছে। রামমোহন নিজে যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তো সাহিত্যই বটে! তাঁহার ভাষার সেই রস বাংলা-গদ্যের আদি রস; এবং তাঁহারই সাঙ্গোপাঙ্গ ও শিষ্যানুশিষ্যেরা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মত উৎকৃষ্ট সাহিত্য সেকালে কেহ রচনা করেন নাই; এই মর্ম্মে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীযুত গাঙ্গুলি মহাশয় নিশ্চয় ব্রাহ্ম-সমাজের কেহ নহেন—তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশীভূত হইলে, এমন যুক্তি ও এমন প্রমাণ এমনভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'য় যে কয়েকখানা আদি বাংলা গদ্য-রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি—মায় মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থগুলি—যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পুরোহিত ও সেবকগণের রচনার তুলনায় মূল্যহীন, ইহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। এই অপরগুলি যে সাহিত্য, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই, যেহেতু সেগুলি হইতেছে—(১) ব্রাহ্ম-পৌত্তলিক সংবাদ, (২) গীতার অনুবাদ, (৩) পৌত্তলিকতার বিষয়ে একটি পুস্তক, (৪) একটি

উৎকৃষ্ট অভিধান, (৫) জ্যোতিষসারগ্রন্থ, (৬) ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই রামমোহনের সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম-প্রভাবের ফল। আবার মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা', কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষেধক সংবাদ', কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট সাহিত্যই বটে; কিন্তু সেই সকল পণ্ডিতেরা রামমোহনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াই এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহাদের ভাষায় যদি কোন কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহাও রামমোহনকে শত্রুভাবে ভজনা করার ফলেই ঘটিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, সেকালে রামমোহনকে ছাড়িয়া কাহারও গতিমুক্তির উপায় ছিল না। তথাপি গাঙ্গুলি মহাশয় এমনই সত্যসন্ধ এবং সাম্প্রদায়িক-মনোভাববর্জ্জিত যে, রামমোহনের এই ভক্ত বা ভাক্ত-শত্রুগণকে 'তথাকথিত মহারথী' আখ্যা দিয়াও, রামমোহনের সর্ব্বপ্রধান সহচর রামচন্দ্র তর্কবাগীশকেও তাঁহাদের সমকক্ষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্য সেকালে যে কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল, গ্রন্থতালিকা দ্বারা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক, তিনি সেই সাহিত্যের ভাষার একটু নমুনাও এক স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কারণ, এই ভাষাই বিদ্যাসাগর ও তৎপরবর্ত্তী কয়েক জনের (যথা বঙ্কিমচন্দ্র) দ্বারা মাত্র একটু পুষ্ট ও মার্জ্জিত হইয়াছিল। সে ভাষা এইরূপ—

> মাতৃক্রোড়রূপ সুখশয্যাতে উপদেশ ব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বীজ হয়...।...ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমান হইবেক।

লেখক বোধ হয় শুধু এই ভাষাতেই মুগ্ধ হন নাই—এই 'স্বয়ং দেদীপ্যমান' হওয়ার যে ব্রহ্মরস, তাহাও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমরাও এই তত্ত্বটির কথা যতই ভাবিতেছি ততই মুগ্ধ হইতেছি; রামমোহনকে যদি এমনই 'স্বয়ং দেদীপ্যমান' হইবার অবকাশ তাঁহারা দিতেন! তাঁহাকে দেদীপ্যমান করিবার জন্য এতগুলি মৃৎপ্রদীপ এত কাল ধরিয়া—যত নিবিয়া যাইতেছে ততই—জ্বালাইয়া রাখিবার এই আগ্রহ যদি একটু কম হইত!

* * *

এই আলোচনায় গাঙ্গুলি মহাশয়ের দুইটি যুক্তি যেমন অকাট্য, তেমনই সত্যনির্ণয়ে প্রাণান্ত নিষ্ঠার পরিচায়ক। আমরা এই নিষ্ঠার নমুনা দিতেছি। গাঙ্গুলি মহাশয় সেকালের সর্ব্ববিষয়ে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রমাণ করিবার জন্য একটির বিষয়ে লিখিতেছেন—

"...১৮১৯ জুলাই সংখ্যা ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি সংবাদ আছে যে, রামমোহনের সহমরণ সম্পর্কিত পুস্তকটি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হওয়াতে উহার প্রচারের সুবিধা হইয়াছে। তখন বাংলা সংবাদপত্র মাত্র দুইটি ছিল, 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি'। পুস্তকটি দর্পণে প্রকাশিত হয় নাই। গেজেটির ফাইল পাওয়া যায় না। যদি ইণ্ডিয়া গেজেটের কথা সত্য হয় তবে উহা গেজেটিতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রমাণ করে।"

রামমোহন যে এক জন বিরাট যোগী পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নানারূপ ঘনিষ্ঠ যোগের দ্বারাই তিনি এ জাতির নবজন্মদাতা হইয়াছিলেন। গেজেটির ফাইল পাওয়া না যাওয়াটাই এখানে বড় সুবিধাজনক হইয়াছে। লেখক বহু পরিশ্রমে এই তথ্যটি উদ্ধার ও প্রমাণ করিয়া অতঃপর বলিতেছেন—"ইহা রামমোহনের (গেজেটির সঙ্গে) ঘনিষ্ঠ যোগ প্রমাণ করে।" আমরা তো বলিয়াছি যে, রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং অসাক্ষাৎ—শরীরী ও অশরীরী, স্থূল ও সূক্ষ্ম—আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, পিতৃবংশ, মাতুলবংশ অথবা গুরুবংশঘটিত যোগ ঐ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্ব ব্যক্তি, সর্ব্ব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, এবং সর্ব্ব আন্দোলনের ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার প্রণালীও নিতান্ত সহজ। আর একটি অকাট্য যুক্তি এইরূপ। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল—"উপপ্লবকর্ত্তা মহাত্মা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার (বাংলা ভাষার) মুখ খুলিয়া দিলেন।" প্রবন্ধটি স্বাক্ষরযুক্ত না হইলেও "উহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বলিয়াই সুস্পষ্ট বোধ হয়।" প্রথম কারণ—নাম না থাকিলে সম্পাদকীয় বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়—এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা (নিশ্চয়ই—যখন রামমোহনের নামের পূর্ব্বে "উপপ্লবকর্ত্তা" ও "মহাত্মা" প্রভৃতি বিশেষণ রহিয়াছে) এবং লেখার ভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রের না হইয়া পারে না।

তৃতীয়তঃ, যদি তাঁহার নাও হয়, তথাপি তিনি যখন উহা ছাপিতে আপত্তি করেন নাই তখন উহার অন্তর্গত যাহা কিছু মতামত তাহাতে তাঁহার যে পূর্ণ সম্মতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গাঙ্গুলি মহাশয়ের প্রাণান্ত নিষ্ঠার পুরস্কার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা কাহারও উচিত হইবে না। বাংলা ভাষার মুখ যে রামমোহনই খুলিয়া দিলেন—বঙ্কিম সে কথায় আপত্তি করেন নাই, তাহাই না হয় মানিলাম; কিন্তু আমরা আপত্তি করি। বঙ্কিমের আপত্তি না করা আর আমাদের আপত্তি করা—এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। বাংলা ভাষার মুখ খুলিয়া দেওয়া ও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি স্রষ্টা হওয়া এক কথা নয়—এটুকু অন্ততঃ বঙ্কিম জানিতেন; এবং মুখ খুলিয়া দেওয়ার সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর্কের প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই। কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বা রামমোহন যে কেহই সে কাজ করিয়া থাকুন, তাহাতে বঙ্কিমের কোন মাথাব্যথা ছিল না; তিনি তখন ইহাও জানিতেন না যে, অতঃপর তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ মন্তব্য এত বড় একটা গুরুতর মামলার সাক্ষ্যরূপে তাঁহারই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু সবচেয়ে কৌতুককর এই যে, গাঙ্গুলি মহাশয় ঐ প্রবন্ধটির লেখার ভঙ্গিও বঙ্কিমী বলিয়া নিঃসংশয় হইয়াছেন! এই সকল সংশয় নিঃসংশয়ের মূলে কোন্ মনোবৃত্তির চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

* * *

গাঙ্গুলি মহাশয় আরও প্রমাণ দিয়াছেন। যেহেতু, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং এমন কি (তাঁহার যুক্তি অনুসারে) বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত রামমোহনের দাবি সমর্থন করিয়াছেন, অতএব প্রমাণের আর বাকি রহিল কি? কিন্তু হায়, রামমোহন-মোহিত, সর্ব্ব-হিন্দু-প্রতিভা-গজ-সিংহ! প্রমাণ কি এতই সহজ! বাংলা সাহিত্যের সেই অস্ফুট আলো-আঁধারের যুগে—যখন সাহিত্য কাহাকে বলে এমন ধারণা কাহারও ছিল না, যখন ভাষার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ কি সে সংস্কারই জন্মে নাই, তখন কে কাহাকে কি মনে করিয়া কোন্ কথা বলিয়াছিল—তাহাই সেকালের কাঁটাবন

হইতে ভাণ্ডভ্রষ্ট ক্ষুদকণার মত খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটিতে পারে, আমাদের যে চক্ষে জল আসে! রামগতি ও ঈশ্বর গুপ্ত, কাশীপ্রসাদ ও রমেশ দত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যতটুকু জানিতেন, এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সেকালের পণ্ডিতগণের যে ধারণা ছিল, তাহাতেই আজিকার ছাত্র ও শিক্ষকগণের যে চলে না, এবং চলে না বলিয়াই আমাদের যে এই কর্ম্মভোগ, তাহা বুঝাইব কাহাকে? এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য, শুধু এই কারণেই নয়—প্রত্যেকের সম্বন্ধে পৃথক্ কারণেও বটে—একেবারে গ্রহণযোগ্য নহে। গাঙ্গুলি মহাশয় যে-সব নজির উদ্ধার করিতে এমন 'অসাম্প্রদায়িক' সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের কোনটাই সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। আমরা রামমোহনকেই বড় করিবার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিব না। সে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সকল তথ্যকে যেমন ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা অবান্তর বা অকিঞ্চিৎকর তাহাকে বাদ দিতে হইবে—তেমনই, সেই তথ্যগুলিকে সাহিত্যজ্ঞান ও সাহিত্য-বিচারের অধীন করিতে হইবে। রামমোহন বাংলা সাহিত্য ও তাহার ভাষার যে কেহই নহেন, এই জলের মত সহজ তত্ত্বটিকে ইটের মত শক্ত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন যদি থাকে, তবে তাহা বাংলা সাহিত্য-পরিচয়ের জন্য নহে, ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্য; এ কথা চাপা দিবার চেষ্টাও বৃথা। সাহিত্যের কোন সংস্কার বা প্রেরণা রামমোহনের ছিল না। রামমোহনকে তার জন্য দায়ী করাই অন্যায়। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে জন্মিয়া একপ্রকার তীক্ষ্ণধার নৈয়ায়িক বুদ্ধির অধিকারী হইয়া, নিজের মানস-আভিজাত্য ও সামাজিক আভিজাত্যের অভিমান মিটাইবার জন্য সমাজ-সংস্কারে ও ধর্ম্মসংস্কারে একরূপ সৌখিন মনোবৃত্তির চর্চ্চাই যাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার মধ্যে কোনরূপ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা অসম্ভব বলিয়াই, তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে কুত্রাপি তাহার পরিচয় নাই। জ্ঞানবৃত্তির যে উদ্দীপনায় একপ্রকার সাহিত্যের জন্ম হইয়া থাকে তাহাও এইরূপ বাদবিসম্বাদের তাড়নায়, অর্থাৎ, আত্মমত ঘোষণার নিরন্তর চেষ্টায়, সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে,

এই প্রকার প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষায় কোন সাহিত্যের পত্তন যে হয় নাই, রামমোহনের রচনার বিষয় ও ভাষাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। সে ভাষার ছাঁচ ও ভঙ্গি পরীক্ষা করিলে দুইটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়; প্রথম, সেই কালেই তাহা অপেক্ষা সৌষ্ঠবযুক্ত ও সাহিত্যগন্ধী ভাষা, অপর লেখকের রচনায় দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের যে ভাষা, সে ভাষা বাংলা-গদ্যের বিকাশধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; পরবর্ত্তী যুগে যে ছাঁচে যে ভঙ্গিতে বাংলা-গদ্যের ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে রামমোহনের ভাষার চিহ্নমাত্র নাই—সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মত যুক্তি বা প্রমাণ আর কি হইতে পারে? আজ আমাদিগকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে যে সাহিত্যজ্ঞান, যে তথ্যপ্রমাণ ও যে আদর্শ অনুসারে চলিতে হইবে, তাহাতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা ব্যক্তিগত ভক্তির কোন স্থান নাই। রামমোহনের কালে বাংলা সাহিত্যের জন্মই হয় নাই; সাহিত্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের ভাষারও জন্ম হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না; কেবল, যখন কোন সাহিত্যিক প্রতিভার উদয় হয়, তখনই ভাষা ও সাহিত্য রূপসৌষ্ঠব লাভ করে। আজ বিংশ শতাব্দীর এই যুগেও বাংলার শিক্ষিত-সমাজে এইরূপ মূর্খতা যে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, ইহাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষার পক্ষে নিরতিশয় লজ্জাজনক।

* * *

কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়ের দোষ নাই;—অপর ধুরন্ধরটির কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, সে কথা পূর্ব্বের এক প্রসঙ্গে বলিয়াছি। রামমোহনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-ভাষা ও কবি-যুক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির পক্ষে যুক্তি অপেক্ষা প্রাণের আবেগপ্রসূত মনোহারিণী উপমাই অধিকতর স্বাভাবিক হইলেও, রবীন্দ্রনাথ তখন কল্পনাকুঞ্জ ছাড়িয়া বিচারাসনে বসিয়াছেন—কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাসের এমনই দুর্ভাগ্য যে, বিচারপতির বেশে তিনি ওকালতির চরম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে নানা চিন্তাপূর্ণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনার পরে তাঁহার আসল বক্তব্যটি এইরূপে লিপি-

বদ্ধ করিয়াছেন—"নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে গদ্য সাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।" তৎপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'সর্ব্বসাধারণের ভাষা' ও 'সাধারণ সাহিত্যে'র প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'ভাবুক সভার জন্য পদ্য ও জনসভার জন্য গদ্য'—ইহাও ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। তথাপি, রাজা রামমোহনকেই নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বাংলা দেশে গদ্য-সাহিত্যের ভূমি-পত্তনকারী আখ্যা দিয়াছেন। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এমন কি চতুর্থ সৃষ্টিকর্ত্তার কথাও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠে; সে সম্বন্ধে তিনি আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার বিষয়টি "বাংলা জাতীয় সাহিত্য"; রামমোহন সেই সাহিত্যের ভূমি-পত্তন করিয়া থাকিলে—বিদ্যাসাগরের কালে ভূমিষ্ঠ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত যে সাহিত্য বাঙালী হিন্দুর ধ্যান জ্ঞান, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও ভাবনার প্রোজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, উনবিংশ শতকের সেই শেষ পাদে যে সাধনার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব্ব বাণীতে—যে বাণীতে সর্ব্বযুগের ভারতীয় সাধনা—বেদ-পুরাণ-তন্ত্র—একই আত্মার অমৃত পন্থারূপে সমন্বিত হইয়াছিল—সেই সাহিত্যের সেই বাণীর কোন্ অংশে রাজা রামমোহনের বাণীর প্রেরণা আছে? 'জাতীয় সাহিত্য' যদি সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য হয়, তবে রামমোহন জাতির মনে-প্রাণে অবতরণ করিয়া, ভারতীয় সাধনার সর্ব্বযুগাশ্রয়ী বিচিত্র ভাবধারায় তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া, কোন্ চতুর্দ্বারমুক্ত তীর্থমন্দিরে, তাহারই আত্ম-দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়াছিলেন? 'জাতীয় সাহিত্য' অর্থে যদি সাধারণের সাহিত্যই হয়, তাহা হইলে রামমোহনের দ্বারা তেমন সাহিত্য সৃষ্টি কি সম্ভব? রামমোহন ছিলেন ঘোর আভিজাত্যাভিমানী, স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী পুরুষ। তিনি ব্যক্তিজীবনে যেমন ঘোর আত্ম-সচেতন বিষয়ী পুরুষ ছিলেন, দেশের ও দশের কার্য্যও তিনি তেমনই সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে, আত্মগত ধারণা ও অভিরুচি অনুসারে, যেটুকু করিয়াছিলেন, তাহাতে একরোখা মনের ভাব ও নিরাপদ পৌরুষপ্রচারের লক্ষণই পরিস্ফুট। তিনি যত কিছু লেখনী-কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার

বিষয় বা প্রেরণা যেমন সাহিত্যিক নয়, তেমনই তাঁহার ভাষাও বাদ-বিতর্ক ও মত-প্রতিষ্ঠার ভাষা, এবং সে ভাষাও কোন প্রকারে বাক্যের আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। অতএব রামমোহনের সাহিত্য যেমন 'জাতীয় সাহিত্য' নয়, তেমনই তিনি জ্ঞানবিতরণের জন্য যে ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয়—সুপাচ্যও নয়। কিন্তু তাঁহারই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এখন জনসভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল।...রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম-দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।" যদি দ্বার উদ্ঘাটনের কথাই হয়, তবে, কোন্ অর্থে রামমোহনই প্রথম সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন? 'দ্বার উদ্ঘাটন' তো তাঁহার সমসময়ে এবং পূর্ব্বে আরও অনেকে করিয়াছিলেন। আবার, তাঁহারই উদ্ঘাটিত সেই দ্বারপথে পরবর্ত্তীদিগের কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ আকারে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, যথা, কৃষ্ণমোহন বা অক্ষয়কুমার, তাঁহাদের কেহই রামমোহনের সেই গদ্যের ছায়াও মাড়াইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলা যায়, তিনিই প্রথম অতিশয় গুরুতর তত্ত্ব ও চিন্তারাজিকে এক প্রকার সরল গদ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও গদ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় না; কারণ, বিষয় যেমনই হউক, গদ্য-রচনায় ভাষার এমন একটি রীতি ধরাইয়া দেওয়া চাই, যাহা পরবর্ত্তী লেখকগণের সাক্ষাৎ সহায় হইয়াছে দেখা যায়। রামমোহনের গদ্য যে সেরূপ কোন প্রয়োজনে লাগিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের বিকাশমুখে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না। ১৮৪০ হইতে আমরা যে প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সূচনা লক্ষ্য করি তাহাতে রামমোহনকে স্মরণ করা বা তাঁহার গ্রন্থপাঠ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

* * *

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি রামমোহনের সেই সাহিত্যকে 'রাজভোগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এমন রাজভোগ তিনি যে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রাজোচিত বদান্যতার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিত্বকেই ধন্য

করিয়াছেন। রামমোহন যাহা করিয়াছিলেন তাহা যে সর্ব্বসাধারণের দুষ্পাচ্য, অতএব আর যাহাই হউক, সে বস্তু যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়—এই অতিশয় সহজ কথাটাকেই পাশ কাটাইবার জন্য তিনি যে উপমার যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও একাধিক কারণে চমকপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন—

"সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদিগের জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ।...আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানব সাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি সৎকার করিব—আমার অরণ্যে ইহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিব।"

"বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ"—ইহাই সাধারণ নামক মহারাজের রাজভোগ! সেকালে এই রাজভোগ 'সাধারণ নামক মহারাজ' কেমন উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু আজিকার দিনের সেই মহারাজ (আমি গত চল্লিশ বৎসরের কথা বলিতেছি) সে রাজভোগ যে অঙ্গুলি-মুখেও আস্বাদন করিয়া থাকেন, সে সংবাদ তাঁহারাই জানেন—যাঁহাদের মতে সেই রাজাই নব্যবঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা। য়ুরোপে যাঁহারা মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারাই যে সাধারণ নামক মহারাজের রাজভোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন—এ কথা মানি, কেন না, বাইবেল একাধারে কাব্য, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র; এমন গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে পরম উপাদেয় হইবারই কথা; কিন্তু বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদও যে সাধারণের রাজভোগ—এ কথা রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যতত্ত্বদর্শী কবির মুখে যে কারণে বাধিল না—তাহাকে যদি অন্ধ ভক্তি বলা না যায়, তবে তাহা কি?

রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন বলিলে কথাটা যথার্থ হইবে না, তাহা জানি; কিন্তু এইরূপ উক্তির মূলে যাহা আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা স্থানে—হিন্দুসমাজ, হিন্দু-আদর্শ ও হিন্দু-সংস্কারের

বিরোধী, এবং অপর এক তন্ত্রের পক্ষপাতী সেই মনোভাব, তাঁহার কবিপ্রেরণা ও ধর্ম্মগত আদর্শের মূলেও লক্ষ্য করা যাইবে। ইহা যদি ব্যক্তিগত না হইয়া সাম্প্রদায়িক হয়, তবে তাহা আমাদেরও দুর্ভাগ্য।

* * *

রামমোহনকে লইয়া এই যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী। রামমোহন আজিকার দিনের মত ব্রাহ্ম ছিলেন না; তিনি কোন নূতন সমাজ সৃজন করেন নাই, বরং পুরাতন সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষার একান্ত প্রয়াসী ছিলেন—অর্থাৎ কোন বিষয়েই তিনি নির্ব্বোধ ছিলেন না। কোন নূতন ধর্ম্ম স্থাপন নয়—স্বাধীন ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য তিনি যে একটি চক্র গঠন করিয়াছিলেন, সেই সভাতেও গায়ত্রী বা বেদপাঠ ব্রাহ্মণের দ্বারাই হইত; এরূপ সভা-স্থাপন একজন নিষ্ঠাবান্ নৈয়ায়িক বা বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। রামমোহন উপবীত, গঙ্গাজল, ব্রাহ্মণ পাচক—এ সকলেরই মূল্য বুঝিতেন; এবং জ্ঞানে ও ধ্যানে (আত্মীয় সভার উপাসনায়) পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিলেও, দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগে তাঁহার কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই, এক দিকে সেকালের হিন্দুগণ যেমন তাঁহার প্রাপ্য সম্মান ও প্রশংসার বিষয়ে কোন সাম্প্রদায়িক কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, তেমনই তাঁহার মত একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির স্বাধীন মতামত ও কোন কোন কার্য্য আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায়, তাঁহার কথা ও কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

* * *

কিন্তু ইহাও রামমোহনের জীবিতকাল ও তাহার ঠিক পরবর্ত্তী সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র। রামমোহন দেশ ও সমাজকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, অনতিকালের মধ্যেই সে অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন সুরু হইল—এই পরিবর্ত্তন রামমোহনের বাণীতে ঘটে নাই। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দুই পুরুষের মধ্যে, য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষিত হিন্দুসমাজে যে নৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল, তাহা রামমোহনের আবির্ভাব না

হইলেও ঘটিত; এবং রামমোহনের দৃষ্টি যদি সত্যই তেমন ঋষিসুলভ দূরদৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তিনিই এই ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধানমূলক একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। রামমোহনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক চিন্তা ও ভাব—রামমোহন যাহা কল্পনা করেন নাই—তাহারই সহায় হইল, সমাজ হইতে পৃথক্ একটা Protestant বা বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। ইহারাই আসল সমস্যাকে যেন বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়ধ্বজা উত্তোলন করিল। হিন্দু রামমোহনকে তাহাদের সেই নবধর্ম্মের দীক্ষাগুরু বলিয়া, তাঁহার আদর্শ ও অনুষ্ঠানসকলের এক স্বপক্ষ-সমর্থন-মূলক ব্যাখ্যা করিল। তাহার পর হইতেই হিন্দুসমাজের পক্ষে রাম-মোহনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, পরবর্ত্তী ইতিহাসে হিন্দুজাগরণ যে ভাবে ও যে উপায়ে আরম্ভ হইল, তাহাতে রামমোহনের তত্ত্বসর্ব্বস্ব, কল্পনা ও সহানুভূতিহীন, ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শবাদ কোন কাজে লাগিত না; লাগেও নাই। রামমোহনের মনীষা যতই অনন্য-সাধারণ হউক, এবং তাহার সাক্ষাৎ প্রভাবের ফলে নবভাব ও নবচিন্তার যে ধারাই উদ্ভূত হউক, তাহার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিশাল বাঙালী হিন্দুসমাজের কোন সম্বন্ধ ছিল না; বরং সেই ধারার প্রতিমুখে ও প্রতিকূলে পুরাতন হিন্দুসমাজেরই হৃদয়-মৃণালে যে নবভাব, নবসংস্কৃতি, নবজাতীয়তা-ধর্ম্ম—নূতনতর আত্মসংবিৎ—সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়াছিল, তাহা যেমন রামমোহনের ব্রাহ্ম-আদর্শ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবান্, তেমনই সেই আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যাঁহারা রামমোহনকে নব্যবঙ্গের স্রষ্টা—এবং হয়তো সেই হেতুই, তাঁহাকে নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম আদিস্রষ্টা—বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাত্রিকে দিন করিবার বিফল সাধনায় শক্তিক্ষয় ও আত্মক্ষয় করিতেছেন মাত্র। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ যদি রামমোহন-শিষ্য হন, তবে বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতন্য তাহা হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; কারণ, রামমোহনের পরে জন্মিলে তাঁহারাও তাহাই হইতেন! রামমোহনের কালে যাহার সূচনা হইতেছে মাত্র—সেই কালের

অব্যবহিত পরেই সেই ইংরেজী শিক্ষার ফলে, এবং ইংরাজ-শাসনের অন্তর্গত নীতির অলক্ষ্য প্রভাবে, বাঙালীর প্রতিভা ও আত্মচৈতন্য যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহনের বাণীর প্রয়োজন যে হয় নাই—সে যুগের ইতিহাস যাঁহারা ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন। রামমোহন যদি পূর্ব্বাহ্ণেই কয়েকটি চিন্তার অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমরা তাঁহার সেই অসাধারণ বোধশক্তির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান করিব; কিন্তু সে চিন্তাও যেমন তত্ত্বসর্ব্বস্ব, তাহাতে কবি বা ঋষির দৃষ্টি ছিল না, তেমনই, তাহা অনতিদূর ভবিষ্যতের বাস্তব সমস্যাসমাধানে মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ কোন কাজে লাগে নাই বলিয়া, তাঁহাকে বাংলা তথা ভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক গুরু বলিয়া স্বীকার করিব না।

'বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ'

আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় "অ বি আ" উপরের শিরোনামায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসের ক্ল্যাসিক্যাল বেঙ্গলির পাঠ্য-তালিকাভুক্ত 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। এইবার শুধু 'বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ' সম্পর্কেই লেখক যৎ-কিঞ্চিৎ আলোক-নিক্ষেপ করিয়া 'বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশে'র আলোচনা বারান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। আলোচক প্রসঙ্গারম্ভে লিখিয়াছেন, "সুধীসমাজ এ বই পড়েন নাই তাহার প্রমাণ এই যে সুধীসমাজ এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একটি কথাও বলেন নাই।" তাঁহার এ অনুমান সম্পূর্ণ সত্য নহে। উক্ত গ্রন্থ পূর্ব্বেই আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং আমরা উহা পড়িয়াও দেখিয়াছি; কিন্তু এ সম্পর্কে কোন উক্তি করা প্রয়োজন মনে করি নাই। প্রয়োজন মনে করি নাই, তার প্রথম কারণ উক্ত গ্রন্থ সমালোচনার অযোগ্য, দ্বিতীয়ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত এ জাতীয় কোন গ্রন্থ লইয়া আর সমালোচনা করিব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইতে হইলে গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের প্রয়োজন হয় না। তজ্জন্য গ্রন্থকারের একটি

গুণ থাকা চাই ; বর্ত্তমান আলোচকও তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। আমরা হিন্দু, সুতরাং বিশ্বাস করি গয়ায় বিষ্ণুপদতলে পিণ্ডোৎসর্গ করিলে পিতৃপুরুষের সদ্‌গতি হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে দেখিয়াছি, কোন বিশেষ পদতলে গ্রন্থোৎসর্গ করিলে তাহার সদ্‌গতি অনিবার্য্য। কর্ণধার শ্যামাপ্রসাদকে দোষ দিয়া লাভ নাই। একসঙ্গে হিন্দুমহাসভার গোব্রাহ্মণের হিতচিন্তা এবং ভক্তভ্রমরবৃন্দের স্তবগুঞ্জনের বর্ণাশুদ্ধি সম্পর্কে সমভাবে অবহিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং যথাসময়ে এবং যথাস্থানে পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি পৌঁছাইয়া দিলেই মাতৃপ্রসাদ মিলিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

সেইজন্যই আমরা গ্রন্থখানি হাতে পাইয়াও নির্ব্বিকারভাবেই উহা পাঠ করিয়াছি। পি-এচ. ডি-উপাধিক চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, গ্রন্থখানি তাঁহার আট বৎসরের অধ্যাপনার ফল। আট বৎসর ধরিয়া তিনি শত শত ছাত্রছাত্রীর মস্তক চর্ব্বণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসাদাৎ বর্ত্তমানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মস্তক চর্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও আমরা নির্ব্বিকার ছিলাম। কিন্তু 'অ বি আ' যখন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তখন এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এইবার আমরাও উক্ত গ্রন্থের শুধু 'ভাষার ক্রমবিকাশে'র কথাই বলিব। 'সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' বারান্তরের জন্য তোলা রহিল। উক্ত ২০০ পৃষ্ঠার বইয়ের দশ স্তবকের মধ্যে প্রথম সাতটি স্তবকে ভাষার ক্রমবিকাশ আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা, বঙ্গলিপি, বাগ্‌যন্ত্র, ভাষাতত্ত্ব এবং ছন্দ সম্পর্কে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক মহাশয় অনেক শেখা বুলিই কপচাইয়াছেন। মাঝে মাঝে উৎকট গবেষণা-কণ্ডুয়নও তাহাতে আছে। কিন্তু গ্রন্থ পড়িয়া প্রথমেই মনে হইল, গ্রন্থকার মূলেই ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। সংস্কৃত-বাংলার অধ্যাপক মহাশয় 'সংস্কৃত'কে লইয়াই গোলে পড়িয়াছেন। বাংলার 'শব্দসম্পদ্' আলোচনায় তিনি লিখিতেছেন :—

বাঙ্গালা ভাষা যখন মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া নিজ রূপ ধারণ করিল, তখন হইতে বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও সমধিক পরিমাণে প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা হইতে

তাহার সংস্কৃত অংশকে কোন মতেই বাদ দেওয়া চলে না, কারণ সে পঙ্গু হইয়া পড়িবে। মাগধী অপভ্রংশ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ, আর সংস্কৃত তাহার আবরণ। এই ভাষার সংযোগ ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার সভ্যতারক্ষা হয় না। বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, লালিত্য প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পদই সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর করে। আবার বাঙ্গালা ভাষার জননী প্রাকৃতের উপাদান, উপকরণ প্রভৃতি অধিকাংশই সংস্কৃত, কাজেই বাঙ্গালা ভাষা পরোক্ষভাবে বহুল পরিমাণে সংস্কৃতমূলক।...

যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে 'তৎসম' বলে।...

যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে সেই সকল শব্দ 'তদ্ভব'।—পৃ. ৯

অধ্যাপক মহাশয় জানিয়াও জানেন না যে, 'সংস্কৃত' কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত বলিতে ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাচীন যুগের [Old Indo-Aryan] ছান্দস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উপ ও কথিত ভাষা এবং প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সাহিত্যের ভাষাকে বুঝায়। সঙ্কীর্ণ অর্থে পরবর্ত্তীকালে শৌরসেনী প্রাকৃত যে প্রাচীন আর্য্যভাষার শূরসেন অঞ্চলের মৌখিক আধার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পাণিনি-পতঞ্জলির সময়ে সংস্কারকৃত [= সংস্কৃত = Classical SK.] হইয়া যে সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ করে, তাহার নাম সংস্কৃত। কাজেই ব্যাপক অর্থে ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাচীন যুগকে মোটামুটিভাবে বলা হয় সংস্কৃত ; আর সঙ্কীর্ণ অর্থে শুধু অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষার নাম সংস্কৃত। প্রাকৃত-সঞ্জীবনীকার যখন প্রাকৃতের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন 'প্রাকৃতস্য তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ', তখন তিনি সংস্কৃত কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগের মৌখিক ভারতীয় আর্য্যভাষা ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া মধ্যযুগের প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহা আবার মুখে মুখে বদলাইয়া বিভিন্ন অপভ্রংশের ভিতর দিয়া আধুনিক আর্য্য ভাষা-সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই ব্যাপক অর্থে ধরিলে সংস্কৃত প্রাকৃতের জননী এবং বাংলা ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্য ভাষাসমূহের মাতামহী। অধ্যাপক মহাশয় জানিয়া রাখুন যে, সংস্কৃতকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিলে "বাঙ্গালা ভাষার জননী প্রাকৃতের উপাদান, উপকরণ প্রভৃতি অধিকাংশই

সংস্কৃত; কাজেই বাঙ্গালা ভাষা পরোক্ষভাবে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত-মূলক।"—এই কথা বলিলেই খালাস পাওয়া যাইবে না; আর সংস্কৃত বলিতে যদি তিনি অর্ব্বাচীন সাহিত্যের সংস্কৃত বুঝিয়া থাকেন, তবে মাগধী প্রাকৃত এবং বাংলার মূল উপাদান 'তদ্ভব' শব্দগুলির সঙ্গে তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই; শুধু 'তৎসম' উপাদান তাহা হইতে ধার করিয়া আনা হইয়াছে।

অধ্যাপক মহাশয় যে এই সব কথা একেবারেই জানেন না, তাহা নহে। অনেক কিছুই তিনি গলাধঃকরণ করিয়াছেন, কিন্তু হজম করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের বহু স্থানে এই জাতীয় বদহজমের ঢেঁকুর উঠিয়াছে। 'শব্দ-সম্পদ্' ছাড়িয়া প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার পূর্ব্বে অধ্যাপক মহাশয়ের আর একটি কুশিক্ষার সংশোধন করিয়া দিই। মাছিমারা কেরানীর মত তিনি দীনেশবাবুর বহি হইতে বাংলা 'মাছি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রাকৃত 'মচ্ছি' এবং সংস্কৃত 'মক্ষি' হইতে টুকিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, প্রাচীন বাংলার পদান্তের 'ই' [এবং উ] মধ্য বাংলায় অপিনিহিতির ফলে উক্ত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অব্যবহিত পূর্ব্ব ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছে [যথা রাতি > রাইত্ > রা'ত্] কাজেই ঐ সব শব্দের অন্ত্য-ই বর্ত্তমান বাংলায় লুপ্ত। কিন্তু যে সব শব্দের শেষে এখনও আমরা 'ই' পাই [যথা মাছি] সেগুলি দুইটি উদ্বৃত্ত স্বরের মিশ্রণের ফল। কাজেই 'মাছি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইবে মক্ষিকা > মচ্ছিআ > মচ্ছিঅ > মাছি। ঠিক সেই কারণেই 'মাটি' সং 'মৃত্তি' হইতে নয়, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত। তাছাড়া নপ্তা হইতে নত্তিঅ হইয়া নাতি নহে, নপ্তৃক হইতেই নাতি এবং 'ক্ষুর > ছুরু (?) > ছুরি' নহে, ক্ষুরিকা হইতেই ছুরি শব্দের ব্যুৎপত্তি আবিষ্কার করিতে হইবে।

বাংলা ভাষায় মোঙ্গোলপ্রভাব দেখাইতে গিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য জাহির করিয়া বলিয়াছেন,

মোঙ্গোল ভাষায় মহাপ্রাণ বর্ণের আধিক্য খুব বেশী। পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে অল্পপ্রাণ বর্ণকে কতকটা মহাপ্রাণ করিয়া উচ্চারণ করার মূলে মোঙ্গোলপ্রভাব বিদ্যমান। যথা—খাণী (কাণী), খাকা (কাকা), ফুপ্প (পুপ্প) ইত্যাদি।